শ্রীগীতা

ওঁ তৎ সৎ

শ্রীমদ্ভগবদগীতা

মূল, অন্বয়, অনুবাদ, টীকা-টিপ্পনী,
ভাষ্য-রহস্যাদি-সমন্বিত এবং প্রাচীন ও
আধুনিক, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য
গীতা-ব্যাখ্যাতৃগণের মতালোচনা সহ
'গীতার্থ-দীপিকা' ব্যাখ্যা ও 'গীতা-প্রবেশিকা'
নামক বিস্তৃত ভূমিকা-সম্বলিত

'শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম,' 'ভারত-আত্মার
বাণী,' 'Soul of India Speaks,' 'আধুনিক
বাংলা ব্যাকরণ,' 'মাতৃ-ভাষা', 'শিক্ষার্থীর
ধর্মশিক্ষা,' 'কর্মবাণী' প্রভৃতি বিবিধ
গ্রন্থ-প্রণেতা মনস্বী শিক্ষাবিদ্

গীতাশাস্ত্রী
জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.
সম্পাদিত
ও
শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.
কর্তৃক সুসংস্কৃত

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
১৫ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট্‌,
কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩

প্রকাশক ঃ
সুভদ্রা দে (ঘোষ), এম. এস. সি, এম. বি. এ.
প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী
১৫ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট্,
কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩
দূরভাষ ২৪১-৬১৩৮

Jagadish Ch. Ghosh's
Srimat Bhagavad Gita (In English)
Ed. Anil Ch. Ghosh M. A.

মুদ্রক ঃ
ওয়েব ইম্প্রেশান্স (প্রা) লি
৩৪/২ বিডন স্ট্রীট্
কলিকাতা - ৭০০ ০০৬

সমর্পণ

যাঁহাদিগের আশীর্বাদে ও পুণ্যবলে

এই অকৃতী অধমের

শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তনে সুমতি হইয়াছে

সেই

গোলোকগত জনক-জননীর

পবিত্র স্মৃতি

হৃদয়ে ধারণ করিয়া

এই

শ্রীগ্রন্থ

শ্রীভগবানে অর্পণ করিলাম।

দয়াময়, তুমি জান।

॥ ওঁ শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ॥

সাঙ্কেতিক চিহ্ন

ঋক্‌—ঋগ্বেদ ; মণ্ডল, সূক্ত, ঋক্‌। ঈশ—ঈশাবাস্যোপানষৎ। কঠ—কঠোপনিষৎ। কেন—কেনোপনিষৎ। কৌষী—কৌষীতক্যুপনিষৎ। ছান্দোঃ—ছান্দোগ্যোপনিষৎ। তৈত্তি—তৈত্তিরীয় উপনিষৎ। মু বা মুণ্ডক—মুণ্ডকোপনিষৎ। মাণ্ডু—মাণ্ডুক্যোপনিষৎ। মৈত্র্য—মৈত্র্যুপনিষৎ। শ্বেত—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। ব্রঃ সূঃ বা বেঃ সূত্র—বেদান্ত দর্শন বা ব্রহ্মসূত্র। প্রশ্ন—প্রশ্নোপনিষৎ। বৃঃ বা বৃহ—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ। সাঃ সূঃ—সাংখ্যসূত্র। সাঃ কাঃ—সাংখ্যকারিকা। যোঃ সূঃ বা যোগসূত্র—পাতঞ্জল যোগসূত্র। যোঃ বাঃ—যোগবাশিষ্ঠ। ভঃ রঃ সিঃ—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু। ভাঃ—শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ—স্কন্ধ, অধ্যায়, শ্লোক। মভাঃ—মহাভারত—পর্ব (প্রথম অক্ষর বা প্রথম দুই অক্ষর পর্বজ্ঞাপক ; যথা—শাং=শান্তি পর্ব, বন=বন পর্ব), অধ্যায়, শ্লোক। গী, গীঃ বা গীতা—প্রথম সংখ্যা অধ্যায়জ্ঞাপক, পরবর্তী সংখ্যা শ্লোকজ্ঞাপক। বিঃ পুঃ—বিষ্ণুপুরাণ। বৃহঃ নাঃ পুঃ—বৃহন্নারদীয় পুরাণ। চৈঃ চঃ—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ; খণ্ড, অধ্যায়, শ্লোক।

এতদ্ব্যতীত যে সকল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের উল্লেখ আছে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় বলিয়া এস্থলে লিখিত হইল না। যেমন—শঙ্কর=শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যকৃত গীতাভাষ্যাদি, মনু—মনুস্মৃতি, হারীত=হারীতস্মৃতি ইত্যাদি।

যে স্থলে কেবল সংখ্যা উল্লিখিত হইয়াছে তথায় এই গ্রন্থ বুঝিতে হইবে।

নিবেদন

এই সংস্করণের উদ্দেশ্য

শ্রীগীতার অনেক সংস্করণ বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই পকেট সংস্করণ, উহাতে অন্বয় ও অনুবাদ ব্যতীত আর কিছুই নাই। গীতা সর্বশাস্ত্রের সারভূত অপূর্ব রহস্যপূর্ণ গ্রন্থ। উহা কেবল অনুবাদ দেখিয়া কেহ অধিগত করিতে পারিবেন, তাহা সম্ভবপর নহে। তবে গীতা স্বধর্মনিষ্ঠ হিন্দুমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য, তাই অনেকে পকেট সংস্করণ হইতে প্রত্যহ কিছু কিছু পাঠ করিয়া থাকেন। কিন্তু নিয়ম-পাঠ আর শাস্ত্রদৃষ্টিতে গীতা অধ্যয়ন বা উহাতে প্রবেশলাভের চেষ্টা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। অবশ্য গীতার কয়েকখানি সুবৃহৎ সংস্করণও আছে। কিন্তু উহার অধিকাংশই সাম্প্রদায়িক টীকা-বিশেষ অবলম্বন করিয়া ব্যাখ্যাত। কোন কোন সংস্করণে প্রাচীন একাধিক টীকা-ভাষ্যেরও সমাবেশ আছে। কিন্তু সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ পাঠকগণের পক্ষে ঐ সকল গীতাভাষ্যে প্রবেশ লাভ করা সুকঠিন। বঙ্গানুবাদের সাহায্যে কথঞ্চিৎ প্রবেশলাভ করিতে পারিলেও বিভিন্ন মতামতের আবর্তে পতিত হইয়া কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ প্রাচীন উপনিষৎ, জৈমিনিসূত্র, ব্যাসসূত্র, পাতঞ্জল যোগানুশাসন, শাণ্ডিল্যসূত্র, নারদসূত্রাদি নানা শাস্ত্রের সহিত অল্পবিস্তর পরিচয় না থাকিলে ঐ সকল টীকা-ভাষ্যও সম্যক্ বুঝা যায় না, সুতরাং সুবৃহৎ সংস্করণ পাঠ করিয়াও বিশেষ ফল লাভ হয় না। আবার মূল্যাধিক্যবশতঃ উহা সকলের পক্ষে সংগ্রহ করাও সুকঠিন।

এই সকল অসুবিধা দূরীকরণার্থই আমরা এই সংস্করণ প্রকাশে যত্নবান্ হইয়াছি। ইহা অপেক্ষাকৃত সুলভ, অথচ নাতিসংক্ষিপ্ত, নাতিবৃহৎ। ইহাকে আধুনিক সর্বশ্রেণীর পাঠকগণের উপযোগী করিতে যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটি করি নাই, কত দূর কৃতকার্য হইয়াছি তাহা সুধীগণের বিবেচনাধীন। তবে কি প্রণালীতে এই সংস্করণ সম্পাদিত হইয়াছে সে সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি।

এই সংস্করণের বিশেষত্ব

১। এই সংস্করণে প্রতি শ্লোকের শব্দে শব্দে বাংলা প্রতিশব্দ দিয়া **ভাবানুখে অন্বয়** করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে অ-সংস্কৃতজ্ঞ বা অল্প-সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকগণের মূল শ্লোক বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে।

২। প্রাচীন গীতাচার্যগণের অনুসরণে শ্লোকস্থ **কঠিন কঠিন শব্দগুলির ব্যাখ্যা** করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মতভেদস্থলে বিভিন্ন মতগুলির যথাসম্ভব উল্লেখ করা হইয়াছে।

৩। অনুবাদের ভাষা যতদূর সম্ভব সরল ও সুখবোধ্য করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। যে স্থলে কেবল অনুবাদে শ্লোকের মর্ম অধিগত হওয়া সুকঠিন বলিয়া বোধ হইয়াছে, তথায় উহার **তাৎপর্য** সরল ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

৪। গীতার বিভিন্ন স্থলে এমন অনেক কথা আছে যাহা পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই **আপাতবিরোধের** কারণ কি এবং কিরূপে উহার **সামঞ্জস্য** হয়, তাহা সর্বত্রই বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং বিভিন্ন শ্লোকসমূহের এবং অধ্যায়সমূহের **পূর্বাপর সঙ্গতি** কিরূপে রক্ষা হইয়াছে, তাহাও সর্বত্রই স্পষ্টীকৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

৫। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে উহার স্থূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি শ্লোকানুক্রমে বিশ্লেষণ করিয়া দেখান হইয়াছে এবং অধ্যায়ের **সার-সংক্ষেপ** প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে।

৬। গীতার ব্যাখ্যায় নানারূপ সাম্প্রদায়িক মতভেদ আছে। প্রাচীন টীকা-ভাষ্য প্রায় সমস্তই বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক মতের পরিপোষণার্থে লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তকে কি কারণে কোন্ মতের অনুবর্তন করা হইয়াছে তাহা যথাসম্ভব শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে এবং পাঠক যাহাতে মূলগ্রন্থ ও বিভিন্ন মতের পর্যালোচনা করিয়া নিজ মত গঠন করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় স্থলে বিরুদ্ধ মতসমূহেরও উল্লেখ ও অল্পবিস্তর আলোচনা করা হইয়াছে। এরূপ **তুলনামূলক আলোচনা** অনেক বৃহৎ সংস্করণেও নাই।

ভূমিকাতেও প্রাচীন ও আধুনিক, সাম্প্রদায়িক ও অসাম্প্রদায়িক—বিভিন্ন টীকা-ভাষ্যকারগণের সংক্ষিপ্ত মতালোচনা আছে।

৭। প্রাচীন উপনিষৎ, কাপিলসাংখ্য, বেদান্তদর্শন, পূর্বমীমাংসা, পাতঞ্জল-যোগানুশাসন, মহাভারতীয় নারায়ণীয় পর্বাধ্যায় প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের সহিত অল্পবিস্তর পরিচয় না থাকিলে শাস্ত্রের সারভূতা শ্রীগীতায় কথঞ্চিৎ প্রবেশলাভ করাও সুকঠিন। এই হেতু এই **সকল শাস্ত্রের** স্থূল প্রতিপাদ্য বিষয় ও দার্শনিক পরিভাষা প্রভৃতির **সংক্ষিপ্ত পরিচয়** যথাস্থানে সর্বত্রই সন্নিবেশ করা

হইয়াছে এবং ভূমিকাতেও সনাতন-ধর্মের এই সকল বিভিন্ন অঙ্গগুলির ক্রমবিকাশ ও ঐতিহাসিক পৌর্বাপর্য প্রভৃতির আলোচনা দ্বারা গীতার সর্বধর্ম-সমন্বয়-প্রণালী বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

৮। শ্রীগীতা অপূর্ব রহস্যময়ী। অধ্যয়নকালে অনেক স্থলেই সমীচীন ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াও মনে নানারূপ সংশয় উপস্থিত হয়। আমরা স্বয়ং জিজ্ঞাসু শিক্ষার্থী; সুতরাং বিবিধ টীকা-ভাষ্য ও শাস্ত্রালোচনায় এই সকল **রহস্যপূর্ণ সংশয়স্থলগুলির মর্ম** যতদূর বুঝিয়াছি, বিবিধ প্রশ্নোত্তরচ্ছলে তাহা স্পষ্টীকৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

৯। এই গীতায় সর্বত্রই স্থূল স্থূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি প্রসঙ্গাধীন অপরাপর শাস্ত্রের আলোচনাপূর্বক পৃথক্ পৃথক্ নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধাকারে সন্নিবেশ করা হইয়াছে।

১০। গীতায় অনেক সংস্করণেই দুইটি অভাব পরিদৃষ্ট হয়। একটি এই—গীতার প্রথমাংশের যেমন আলোচনা করা হয়, শেষাংশের সেরূপ করা হয় না। কিন্তু গীতার শেষাংশে যে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা আছে তাহা না বুঝিলে প্রথমাংশের অনেক কথাই স্পষ্ট বুঝা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, অনেক বড় সংস্করণেও প্রাচীন সাম্প্রদায়িক টীকা ও ভাষ্যাদির আলোচনা আছে বটে, কিন্তু আধুনিক অসাম্প্রদায়িক গীতা-সমালোচকগণ গীতোক্ত সার্বভৌম ধর্মতত্ত্বের যেরূপ ব্যাখ্যান করেন তাহার আলোচনা নাই। আমরা এই সংস্করণে যথাসম্ভব এই **দুইটি অভাব দূরীকরণের চেষ্টা** করিয়াছি।

১১। 'গীতা-প্রবেশিকা' নামক **বিস্তৃত ভূমিকায়** সনাতন ধর্মের বিভিন্ন অঙ্গের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, উহাদের ক্রম-অভিব্যক্তি, ঐতিহাসিক পরম্পরা, গীতোক্ত ধর্মের সহিত উহাদের সম্বন্ধ নির্ণয়, গীতার সমন্বয়বাদ, গীতার মূল শিক্ষা প্রভৃতি যে সকল বিষয় গীতা বুঝিবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইয়াছে, সে সকলের আলোচনা করা হইয়াছে।

১২। গীতার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে নানা শাস্ত্রের আলোচনাপূর্বক যে সকল প্রয়োজনীয় তত্ত্বের অবতারণা করিতে হইয়াছে, বিস্তৃত **বিবৃতি-সূচীতে** বর্ণমালানুক্রমে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

স্থূলকথা, শ্রীগ্রন্থখানি সর্বাঙ্গসুন্দর করিতে যত্নের ত্রুটী করি নাই। ফলাফল সুধীগণের বিবেচ্য।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা

এই গ্রন্থ সম্পাদনে প্রাচীন ও আধুনিক বহু গীতাচার্যগণের টীকা-ভাষ্যাদি হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। তদ্ব্যতীত স্বামী বিবেকানন্দ, ৺অশ্বিনীকুমার দত্ত, মনস্বী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভাগবতরত্ন কুলদাপ্রসাদ মল্লিক, অধ্যাপক-প্রবর ভাগবতকুমার শাস্ত্রী প্রভৃতির গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি পাঠেও অনেক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি। আধুনিক গীতাচার্যগণের মধ্যে লোকমান্য তিলক, শ্রীঅরবিন্দ, মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্র, বেদান্তরত্ন হীরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষিগণের উপাদেয় গ্রন্থাদি হইতে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীঅরবিন্দের 'Essays on the Gita' নামক অপূর্ব গ্রন্থখানি মনস্বী অনিলবরণ রায় মহাশয় অতি সুন্দররূপে অনুবাদ করিয়া 'অরবিন্দের গীতা' নামে প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহার নিকটও আমি বিশেষভাবে ঋণী আছি। এই সকল গ্রন্থকর্তৃগণের ঔদার্যের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদের গ্রন্থাদি হইতে স্থলে স্থলে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিতেও সাহসী হইয়াছি, এই হেতু ইঁহাদের নিকট চির-ঋণে আবদ্ধ আছি। বস্তুতঃ এই গ্রন্থের কোন বিষয়ে যদি কোন উৎকর্ষ লক্ষিত হয়, তবে সে গুণ তাঁহাদেরই, উহার দোষ-ত্রুটী যাহা কিছু তাহা আমার নিজস্ব। আমি অনধিকারী, সুধীগণ আমার এই অনধিকারচর্চা ক্ষমা করিবেন, আর আশীর্বাদ করিবেন—যিনি আমাকে শিক্ষাদানের জন্য তাঁহার হৃদয়স্বরূপ এই মহাগ্রন্থের আলোচনা করিবার সুমতি দিয়াছেন, অহৈতুক কৃপাসিন্ধু তিনি—তাঁহার কৃপায় যেন কোন দিন তাঁহার দাসের হৃদয়ে শ্রীগীতা স্ব-স্বরূপে উদিত হন।

ঢাকা
পৌষ, ১৩৩২

কৃপা-ভিখারী
শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন। ভগবৎকৃপায় শ্রীগীতার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণে পুস্তকখানি বৃহত্তর আকারে মুদ্রিত হইল এবং ইহাতে অনেক নূতন বিষয় সংযোজিত হইল। পুস্তকের আয়তন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়াতে মুদ্রাঙ্কনাদির ব্যয় অনেক বর্ধিত হইয়াছে, এই কারণে মূল্যও বর্ধিত করা প্রয়োজন হইয়াছে। প্রথম সংস্করণে যে সকল মুদ্রাঙ্কন-প্রমাদ লক্ষ করিয়াছি তাহা সমস্তই সংশোধন করিয়াছি এবং এই সংস্করণে পুস্তকখানি নির্ভুল করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি পাঠকগণ দেখিবেন।

প্রথম সংস্করণের পুস্তকখানি সুধীজনসমাজে সমাদর লাভ করিয়াছে দেখিয়া সুখী হইয়াছি। এ সম্বন্ধে যে সকল চিঠি-পত্র ও অভিমত প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা পাঠ করিয়া অযোগ্যের প্রতিও শ্রীভগবানের কি অপার করুণা, সেই কথাই কেবল মনে আসিতেছে। তাঁহার কৃপায় লেখক, পাঠক, অনুগ্রাহক, গ্রাহক, সকলেরই অভীষ্ট সিদ্ধ হউক।

ভাদ্র, ১৩৩৭ — কৃপা-ভিখারী

ঢাকা — **শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ**

সপ্তম সংস্করণের নিবেদন। শ্রীভগবানের আশীর্বাদে শ্রীশ্রীগীতার সপ্তম সংস্করণ প্রকাশিত হইল। বৃদ্ধ বয়সে (৮৩) দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হওয়াতে মুদ্রণাদি কার্য এক্ষণে স্বয়ং পরিদর্শন করিতে পারি না। অবশ্য সুযোগ্য ব্যক্তিগণের উপরই সে ভার অর্পিত আছে। তথাপি ভুল-প্রমাদ হওয়া অসম্ভব নয়। কোন সহৃদয় পাঠক উহা লক্ষ করিলে অনুগ্রহপূর্বক আমাকে জানাইলে বাধিত হইব।

শ্রাবণ, ১৩৬২ — কৃপা-ভিখারী

৪১ গড়িয়াহাট রোড্, কলিকাতা-১৯ — **শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ**

অষ্টম সংস্করণের নিবেদন। শ্রীভগবানের অপার করুণায় শ্রীগীতার অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হইল। বৃদ্ধবয়সে (৮৬) দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে প্রুফ-সংশোধনাদি সম্পূর্ণ নিজে করিতে পারি না। অবশ্য যোগ্য ব্যক্তিগণের উপর সেই ভার অর্পিত আছে। তথাপি এরূপ পুস্তকের মুদ্রণে ভুল-প্রমাদ হওয়া অসম্ভব নয়। কোন সহৃদয় পাঠক তাহা লক্ষ করিলে অনুগ্রহপূর্বক আমাকে জানাইলে বাধিত হইব।

৯ই বৈশাখ, অক্ষয়া তৃতীয়া, ১৩৬৫ — কৃপা ভিখারী

ইং ২২ এপ্রিল, ১৯৫৮ — **শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ**

৪১ গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা-১৯

গীতা-প্রবেশিকা

ভূমিকা

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥

গীতার মাহাত্ম্য ও প্রভাব। ন্যূনাধিক তিন সহস্র বৎসর হইল শ্রীগীতা বর্তমান আকারে প্রচারিত হইয়াছেন, তদবধি ইনি সর্বশাস্ত্রের শিরোভূষণ এবং সমভাবে সর্ব সম্প্রদায়ের নমস্য হইয়া আছেন। পদ্মপুরাণ, বরাহপুরাণ, শিবপুরাণ প্রভৃতির অন্তর্গত গীতা-মাহাত্ম্য, গীতার অনুকরণে বহু নূতন নূতন 'গীতা' রচনা, আবার স্থলবিশেষে গীতারই সারাংশ অক্ষরশঃ পুরাণাদির মধ্যে সন্নিবেশ—এই সকল হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, পৌরাণিক যুগেও গীতা সর্বমান্যা ছিলেন। উপনিষৎ, গীতা ও বেদান্তদর্শন—এই তিন শাস্ত্রকে 'প্রস্থানত্রয়ী' বলা হয়। 'প্রস্থানত্রয়ীর' অর্থ কেহ বলেন যে, এই তিনটি সনাতন ধর্মের প্রধান স্তম্ভস্বরূপ ; কেহ বলেন, 'প্রস্থান' কথার মর্ম এই যে, এই তিনটি ধ্রুবতারাকে লক্ষ্য করিয়া সংসার-সমুদ্রযাত্রী মোক্ষপথে প্রস্থান করেন। সে যাহা হউক, গীতা প্রাচীন প্রামাণ্য দ্বাদশ উপনিষদের পরবর্তী হইলেও উহাদেরই সমশ্রেণীস্থ ত্রয়োদশ উপনিষৎ বলিয়া গণ্য এবং বেদের ন্যায় সর্বসম্প্রদায়েরই মান্য। এই হেতু পরবর্তী কালে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য, রামানুজাচার্য, শ্রীধর স্বামী, মধ্বাচার্য, বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রমুখ যত শ্রেষ্ঠ ধর্মোপদেষ্টা আবির্ভূত হইয়াছেন, সকলেই গীতাজ্ঞান শিরোধার্য করিয়াছেন এবং স্বীয় স্বীয় সাম্প্রদায়িক মতের পরিপোষণার্থ গীতার টীকাভাষ্য রচনা করিয়াছেন। আধুনিক কালে ইংরেজী, জর্মন প্রভৃতি ভাষায় গীতার অনুবাদ প্রচারিত হওয়ার পর পাশ্চাত্ত্য দেশেও গীতার আদর উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে এবং অনেক চিন্তাশীল পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত গীতাজ্ঞানের ভিত্তিতেই ধর্ম ও নীতি তত্ত্বের আলোচনা করিতেছেন। সুনামখ্যাত মার্কিন-পণ্ডিত এমার্সনের গভীর তত্ত্ব-পূর্ণ সন্দর্ভসমূহে গীতার প্রভাব অতি সুস্পষ্ট। প্রসিদ্ধ জর্মন-পণ্ডিত ডয়সন গীতার নিষ্কাম কর্মযোগের প্রতিপত্তিই সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ

করিয়াছেন এবং তাঁহার অধ্যাত্ম-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থে (Elements of Metaphysics) গীতার "তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর" (৩।১৯), এই শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করিয়া উহার সুসঙ্গত আধ্যাত্মিক বিচার করিয়াছেন।

সনাতনধর্মের বাহিরেও গীতার প্রভাব কম নহে। বৌদ্ধধর্মের মহাযান পন্থার আবির্ভাব হইলে যে পরহিতব্রত নিষ্কামকর্মী সন্ন্যাসী-সঙ্ঘের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাঁহাদেরই প্রযত্নে বৌদ্ধধর্ম তিব্বত, চীন, জাপান, তুর্কীস্থান ও পূর্ব ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। নিবৃত্তিমূলক নিরীশ্বর বৌদ্ধধর্ম হইতে এই প্রবৃত্তিমূলক ভক্তিপর মহাযানপন্থার উদ্ভব গীতার প্রভাবেই হইয়াছিল, ইহা বৌদ্ধধর্মের ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন। এমন কি, এই মহাযানপন্থার উৎপত্তি সম্বন্ধে স্বয়ং বৌদ্ধ-গ্রন্থকারগণই শ্রীকৃষ্ণের নাম পর্যন্ত স্পষ্ট নির্দেশ করিয়াছেন। (লোকমান্য তিলক—গীতারহস্য ; Dr. Kern's Manual of Indian Buddhism)।

বস্তুতঃ জ্ঞানমূলক বৌদ্ধধর্মের সন্ন্যাসবাদের সহিত গীতোক্ত ভক্তিবাদ ও নিষ্কাম কর্মের সংযোগ করিয়া উক্ত ধর্মের যে সংস্কার সাধিত হয়, তাহাই মহাযানপন্থা নামে পরিচিত। এই মহাযানপন্থার বৌদ্ধ যতিগণের প্রাচীনকালে খ্রীস্টের জন্ম ও কর্মস্থান ইহুদীদেশেও যাতায়াত ছিল, ইহা আধুনিক ঐতিহাসিক আলোচনায় সপ্রমাণ হইয়াছে। বৌদ্ধধর্মের সন্ন্যাসবাদ ও গীতার ভক্তিবাদ, ঐ দুইটিই খ্রীস্টীয় ধর্মের মূলতত্ত্ব এবং মহাযান বৌদ্ধশাস্ত্রের এবং গীতার অনেক কথা বাইবেল গ্রন্থেও পাওয়া যায়। অনেক স্থলে গীতা ও বাইবেলের উপদেশ প্রায় শব্দশঃ একরূপ। যেমন—

বাইবেল। "সেই দিন তোমরা জানিতে পারিবে, আমি আমার পিতার মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে আছি।"

গীতা। 'যো মাং পশ্যতি সর্বত্র' ইত্যাদি ৬।৩০। 'যেন ভূতান্যশেষাণি দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি' ৪।৩৫ ; 'ময়ি তে তেষু চাপ্যহং'—৯।২৯।

বাইবেল। তোমরা যাহা আহার কর, যাহা পান কর বা যাহা কিছু কর, ঈশ্বরের জন্যই করিবে—পলের উক্তি (I. Corin.10, 31)।

গীতা। 'যৎ করোষি যদশ্নাসি' ইত্যাদি ৯।২৭।

বাইবেল। 'যে আমার ধর্ম পালন করে ও আমাকে প্রীতি করে, আমিও তাহাকে প্রীতি করি' (জন, ১৫।২১)।

গীতা। "প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ" (৭।১৭) অথবা "শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ" (১২।২০)।

জর্মন ভাষায় গীতার অনুবাদক ডঃ লরিনসর গীতা ও বাইবেলের মধ্যে শতাধিক স্থলে এইরূপ শব্দসাদৃশ্য দেখাইয়াছেন এবং উহা হইতে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, গীতা বাইবেলের পরে রচিত হইয়াছে, গীতাকার বাইবেলের সহিত পরিচিত ছিলেন এবং বাইবেল হইতেই তিনি এই সকল কথা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে ইহা অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, গীতারচনা কালে যীশুখ্রীস্টের আবির্ভাবই হয় নাই। অবশ্য উভয়ের একই তত্ত্ব প্রায় একই ভাষায় স্বতন্ত্রভাবে উপদেশ দেওয়া কিছু বিচিত্র নহে ; কিন্তু একের নিকট হইতে অপরে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাই যদি সাদৃশ্যের কারণ অনুমিত হয়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতেই যীশুখ্রীস্ট গ্রহণ করিয়াছেন, একথা না বলিয়া উপায় নাই ; এবং অনেক পাশ্চাত্ত্য পুরাবৃত্তজ্ঞ পণ্ডিতও সেইরূপ সিদ্ধান্তই স্থির করিয়াছেন। সে সকল ঐতিহাসিক তত্ত্বের বিস্তারিত আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। (Robertson's Christianity and Mythology, Lillie's Buddha and Buddhism ইত্যাদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী, অপূর্ব রহস্যময়ী। গীতা বুঝিবার পক্ষে বিদেশীয় বিবিধ ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় আমাদের তত প্রয়োজন নাই, কেননা গীতা স্বয়ম্ভু, সর্বতঃপ্রসারী, স্বতঃপূর্ণ। গীতা দানই করিয়াছেন, কাহারও নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় বিভিন্ন ধর্মমত ও দার্শনিক তত্ত্বের সহিত অন্ততঃ সাধারণভাবে পরিচিত না হইলে গীতাতত্ত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করা অসম্ভব। হিন্দু-ধর্ম বেদ-মূলক ; বেদ সনাতন, নিত্য ; এই হেতু এই ধর্মের প্রকৃত নাম বৈদিক ধর্ম বা সনাতন ধর্ম। 'হিন্দু' নাম বিদেশীয়। বেদার্থ, বিভিন্ন ঋষিগণ বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং এই হেতুই বৈদিক ধর্মে সাধ্যসাধনা বিষয়ে নানা মত এবং নানা শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। গীতা-প্রচারকালে সাংখ্য-বেদান্তাদি দার্শনিক মত এবং কর্ম, যোগ, জ্ঞান ও প্রতীকোপাসনা প্রভৃতি বিভিন্ন আপাতবিরোধী সাধনমার্গ প্রচলিত ছিল। গীতায় এ সকলেরই সমাবেশ হইয়াছে এবং এই কারণেই বাহ্য দৃষ্টিতে গীতার অনেক কথাই পূর্বাপর অসঙ্গত ও পরস্পর-বিরোধী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। গীতায় শ্রীভগবান্ কোথাও বৈদিক যাগযজ্ঞাদি ও বেদবাদের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন (২।৪২-৪৫, ৫৩), আবার কোথাও বলিতেছেন, যজ্ঞাবশিষ্ট 'অমৃত'-ভোজনকারী সনাতন ব্রহ্মলাভ করেন (৪।৩০)। কোথাও বেদকে ত্রৈগুণ্য-বিষয়ক বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে নিষ্প্রয়োজনীয় বলিতেছেন, (২।৪৫।৪৬।৫২।৫৩), আবার কোথাও 'আমিই সকল বেদে বেদ্য', 'আমিই

বেদ-বেত্তা ও বেদান্তকৃৎ' ইত্যাদি বাক্যে বেদের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছেন (১৫।১৫)। কোথাও বলিতেছেন, আমি সর্বভূতেই সমান, "আমার প্রিয়ও নাই, দ্বেষ্যও নাই" (৯।২৯); কোথাও আবার বলিতেছেন, "আমার ভক্তই আমার প্রিয়, আমার জ্ঞানী ভক্ত, আমার ধর্ম-অনুষ্ঠানকারী ভক্ত, আমার অতীব প্রিয়" (৭।১৭, ১২।১৩-২০)। কোথাও বলিতেছেন, "জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র আর কিছুই নাই, জ্ঞানেই সমস্ত কর্মের পরিসমাপ্তি, জ্ঞানেই মুক্তি, জ্ঞানেই শান্তি" (৪।৩৬-৩৯); কোথাও বলিতেছেন, "সেই পরম পুরুষ একমাত্র অনন্যা ভক্তিদ্বারাই লভ্য, আর কিছুতে নহে।" (৮।১৪,২২, ৯।৩৪, ১৮।৫৫ ইত্যাদি)। আবার কোথাও শান্ত সমাহিত ধ্যানযোগীর নির্বাতনিষ্কম্প প্রদীপবৎ অচঞ্চল চিত্তের বর্ণনা করিয়া শান্ত-রসাস্পদ পরমসুখকর ব্রহ্মনির্বাণ লাভার্থ অধ্যবসায় সহকারে যোগাভ্যাসের উপদেশ দিতেছেন (৬।১৯-২৭), আবার সঙ্গে সঙ্গেই বলিতেছেন, "স্বকর্ম দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হয়, উঠ, যুদ্ধ কর" ৩।৩০, ৪।৪২, ১৮।৪৬।৫৬।৫৭ ইত্যাদি)। একি রহস্য! বস্তুতঃ গীতা অপূর্ব রঙ্গময়ী। ইহার রহস্যভেদ করিতে মহামতি অর্জুনকে বিব্রত হইতে হইয়াছিল এবং তিনিও ভগবান্‌কে বলিয়াছিলেন—'তুমি যেন বড় ব্যামিশ্র বাক্য বলিতেছ' (৩।২, ৫।১)। এইরূপ দুরধিগম্যা বলিয়াই গীতা সম্বন্ধে এই সকল কথা বলা হয়—'কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক্ কিঞ্চিৎ কুন্তীসুতঃ ফলম্' অথবা 'ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা' ইত্যাদি—গীতাতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণই সম্যক্ জানেন, অর্জুন কিঞ্চিৎ ফল অবগত আছেন, ব্যাসদেবও জানেন কি না জানেন বলা যায় না, ইত্যাদি।

কথা এই, নানাত্বের মধ্যে থাকিয়া একত্ব দর্শন করা যায় না। কেবল শাস্ত্রজ্ঞানী, অযুক্ত বদ্ধ জীবের পরমেশ্বর-স্বরূপ ও জ্ঞানকর্মাদি সাধন-তত্ত্ব-বিষয়ক যে জ্ঞান ও ধারণা তাহা অন্ধের হস্তিদর্শনের ন্যায় একদেশদর্শী। চারি অন্ধ হাতীর গায়ে হাত বুলাইয়া ঠিক করিলেন, হাতীটা কেমন বস্তু। কেহ বলিলেন, হাতী একটা প্রাচীরের ন্যায়, কেহ বলিলেন, হাতীটা থামের ন্যায়, কেহ আবার বলিলেন, হাতী কুলার ন্যায়, কেহ বলিলেন, রম্ভা তরুর ন্যায়—কাজেই ভেদবাদ ও বিবাদ। কিন্তু যে চক্ষুষ্মান্ সেই মাত্র হাতীর সমগ্র স্বরূপ দেখিতে পারে ও বুঝিতে পারে যে, ওগুলি একই বস্তুর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাত্র। গীতায়ও শ্রীভগবান্ সনাতন ধর্মের বিভিন্ন অঙ্গগুলির একত্র সমাবেশ করিয়া উহার সমগ্র স্বরূপটিই দেখাইতেছেন। উহা জানিলে আর জানিবার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না (৭।১-২)। আমাদের সংস্কারান্ধ দৃষ্টি অঙ্গবিশেষেই আবদ্ধ থাকে, জ্ঞানচক্ষু ব্যতীত সমগ্র তত্ত্ব হৃদ্গত হয় না। জ্ঞানলাভ তাঁহারই কৃপা-সাপেক্ষ।

সুতরাং তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করিয়া যাহার যতটুকু সামর্থ্য তাহা লইয়াই উহা যৎকিঞ্চিৎ বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

তবে উহাতে প্রবেশ করিতে হইলেও সনাতন ধর্মের বাহ্য স্বরূপটির অল্পবিস্তর জ্ঞান থাকা আবশ্যক। গীতা-প্রচারকালে বৈদিক কর্মবাদ, সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ, উপনিষদের ব্রহ্মবাদ, যোগানুশাসন, প্রতীকোপাসনা ও অবতারবাদ প্রভৃতি বৈদিক ধর্মের প্রধান অঙ্গগুলি সকলই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। গীতা এ সকলই গ্রহণ করিয়াছেন এবং এ সকলের বিরোধ ভঞ্জনপূর্বক অপূর্ব সমন্বয় করিয়া নিজের একটি বিশিষ্ট মতও প্রচার করিয়াছেন। এ সকল বিভিন্ন মতবাদের প্রকৃত তত্ত্ব কি, কি ভাবে গীতা ইহাদের উপপত্তি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা না বুঝিলে গীতা-তত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে কিছুই হৃদয়ঙ্গম হয় না। তাহা বুঝিতে হইলেই বৈদিক ধর্মের ক্রমবিকাশের ঐতিহাসিক পরম্পরা এবং গীতাকালে প্রচলিত ঐ সকল বিভিন্ন মতবাদের অন্ততঃ সাধারণ জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক। এই হেতু আমরা প্রথমে সনাতন ধর্মের ক্রমবিকাশতত্ত্ব ও প্রধান প্রধান অঙ্গগুলির সাধারণ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক বোধ করিতেছি।

বৈদিক ধর্মের ক্রমবিকাশ—সনাতন ধর্মের বিভিন্ন অঙ্গ

১। ঋগ্বেদীয় ধর্ম

ঋগ্বেদই সনাতন ধর্মের প্রথম গ্রন্থ। উহা প্রাচীনতম আর্যধর্মের ও আর্যসভ্যতার অকৃত্রিম প্রতিচ্ছবি। উহার ঋক বা মন্ত্রগুলি প্রায় সমস্তই ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য, বরুণ প্রভৃতি বৈদিক দেবগণের স্তব-স্তুতিতে পূর্ণ। এই সকল মন্ত্রদ্বারা প্রাচীন আর্যগণ দেবগণের উদ্দেশে যাগযজ্ঞ করিয়া অভীষ্ট প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু দেবতা অনেক থাকিলেও তাঁহারা এক ঐশী শক্তিরই বিভিন্ন বিকাশ এবং ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়—এ তত্ত্ব তখনও অবিদিত ছিল না। অনেক মন্ত্রে একথা স্পষ্টরূপেই উল্লিখিত হইয়াছে।—

(১) তিনি এক ও সৎ (নিত্য), তাঁহাকেই বিপ্রগণ বিভিন্ন নাম দিয়া থাকেন—তাঁহাকেই অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা বলা হয়। ('একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি' ইত্যাদি, ঋক্ ১।১৬৪।৪৬)।

(২) 'যিনি আমাদিগের পিতা ও জন্মদাতা, যিনি বিধাতা, যিনি বিশ্ব-ভুবনের সকল স্থান অবগত আছেন, যিনি অনেক দেবগণের নাম ধারণ করেন, কিন্তু এক ও অদ্বিতীয়, ভুবনের লোকে তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করে ('যো দেবানাং নামধা এক এব' ইত্যাদি, ঋক্ ১০।৮২।৩)।

(৩) (ক) তখন (মূলারম্ভে) অসৎও ছিল না, সৎও ছিল না ; অন্তরীক্ষ ছিল না এবং তাঁহার অতীত আকাশও ছিল না ; কে (কাহাকে) আবরণ করিল ? কোথায় ? কাহার সুখের জন্য ? অগাধ ও গহন জল কি তখন ছিল ? (খ) তখন মৃত্যুও ছিল না, অমৃতত্বও ছিল না ; রাত্রি ও দিনের ভেদ ছিল না। সেই এক ও অদ্বিতীয় এক মাত্র আপন শক্তি দ্বারাই, বায়ু ব্যতীত, শ্বাসোচ্ছ্বাস করিয়া স্ফূর্তিমান্ ছিলেন, তাঁহা ব্যতীত অন্য কিছু ছিল না। ('নাসদাসীন্নো সদাসীৎ তদানীং' ইত্যাদি, ঋক্ ১০।১২৯)।

এই শেষোদ্ধৃত অংশটি ঋগ্বেদীয় প্রসিদ্ধ নাসদীয় সূক্তের প্রথম দুই ঋক্। এই সূক্তের দেবতা—পরমাত্মা। সৃষ্টির পূর্বে কি ছিল, এই সূক্তে ঋষি তাহারই উত্তর দিতেছেন। এই নামরূপাত্মক ব্যক্ত দৃশ্যপ্রপঞ্চের অতীত এক অব্যক্ত অদ্বয় তত্ত্ব আছে যাহা হইতে এই জগৎ-প্রপঞ্চ উৎপন্ন হইয়াছে বা যাহাই এই জগৎ-প্রপঞ্চরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে, ইহাই ঋষির বলার অভিপ্রায়। কিন্তু সে তত্ত্ব অজ্ঞেয়, অনির্বাচ্য ; সৎ, অসৎ, অমৃত, মর্ত্য, আলো (দিবা), অন্ধকার (রাত্রি) ইত্যাদির পরস্পর দ্বৈত বা কথার জুড়ী সৃষ্টির পরে উৎপন্ন হইয়াছে ; উহার একটি বলিলেই অপরটির জ্ঞান সঙ্গে সঙ্গেই আসে। কিন্তু যখন এক ভিন্ন দুই ছিল না, সেই এক অদ্বিতীয় তত্ত্ব সম্বন্ধে এই দ্বৈত ভাষায় ব্যবহার করা চলে না ; তাই বলা হইতেছে, সৎও নয়, অসৎও নয় ইত্যাদি। সেইরূপ, জলে বা আকাশে সমস্ত আবৃত ছিল ইত্যাদি যে বলা হয় তাহাও ঠিক নয়, কেননা সমস্তই যখন এক, তখন কে কাহাকে আবৃত করিবে ? সে বস্তু আবার আকাশাদির ন্যায় জড় পদার্থ নয়, চৈতন্যময়—তাই, বলা হইতেছে—'শ্বাসোচ্ছ্বাস করিতেছিলেন।' কিন্তু শ্বাসোচ্ছ্বাসে বায়ুর প্রয়োজন ; বায়ু ত তখন হয় নাই, তাই বলা হইতেছে,—"বিনা বায়ুতে, আত্মশক্তিদ্বারা।" ঋষির অন্তর্দৃষ্টি কত দূর লক্ষ করুন। জগতের আদি অব্যক্ত মূলতত্ত্বের এমন কৌশলময় গভীর মূলস্পর্শী বিচার ও বর্ণনা কোন দেশের কোন ধর্মগ্রন্থে কখনও হয় নাই। আর এ বিচার, এই জ্ঞানের উদয় হইয়াছিল ভারতে কখন ?—সেই সুদূর প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগে আর্য-সভ্যতার প্রাচীনতম অবস্থায়, যখন প্রায় সমস্ত আধুনিক সভ্যজগৎ অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য অজ্ঞেয়বাদিগণ পর্যন্ত এই বৈদিক সূক্তের প্রাচীন তত্ত্ব ও ভাবগাম্ভীর্য চিন্তা করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন। পরবর্তী কালে এই তত্ত্বই উপনিষৎ-সমূহে নানাভাবে বিবৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ, ঋগ্বেদীয় ধর্ম কেবল অগ্নিতে ঘৃতাহুতি এবং নানা দেবতার নিকট গো-বৎসাদির জন্য প্রার্থনা—ইহাই নহে।

আমরা দেখিতেছি—(১) ঋগ্বেদের ঋষি জগৎ-প্রপঞ্চের অতীত অদ্বয় অব্যক্ত তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছিলেন। (২) সেই তত্ত্বই আবার জগতের এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বর ও সৃষ্টিকর্তা এবং দেবতাগণ সেই ঐশী শক্তির বিভিন্ন বিকাশ, ইহা জানিতেন। (৩) যজ্ঞদ্বারা দেবতা পরিতুষ্ট হইলে অভীষ্ট ফল প্রদান করেন, ইহা বিশ্বাস করিতেন এবং তদর্থে স্তব-স্তুতিসহ যজ্ঞ করিতেন। (৪) সেই যজ্ঞাদি শ্রদ্ধার সহিত সম্পন্ন হইত এবং 'অর্চনা' 'বন্দনা, 'নমস্কার' ইত্যাদি ভক্ত্যঙ্গযুক্ত ছিল। ("শ্রদ্ধাং দেবা যজমানা বায়ু গোপা উপাসতে"—ঋক্ ১০।১৫১; "নমঃ ভরংত এমসি" ঋক্ ১।৭; "দেবা বশিষ্টো অমৃতান ববন্দে"—ঋক্ ১০।৬৬; "বিষ্ণবে চার্চত", ইত্যাদি ঋক্)। সুতরাং সনাতন ধর্মের এই প্রাচীন স্বরূপ যজ্ঞপ্রধান হইলেও জ্ঞানভক্তি-বিবর্জিত ছিল না—কর্ম, জ্ঞান ও উপাসনা, তিনেরই উহাতে সমাবেশ ছিল।

২। ত্রয়ীধর্ম—বেদবাদ

ক্রমে সনাতন ধর্মে যাগযজ্ঞাদির প্রাধান্য ক্রমশঃ বর্ধিত হয় এবং বৈদিক ধর্ম সম্পূর্ণ কর্মপ্রধান হইয়া উঠে। ঋক্, যজুঃ, সাম—এই তিন বেদই এই ধর্ম প্রতিপাদন করেন, এই জন্য ইহার নাম 'ত্রয়ীধর্ম'। (অথর্ববেদের যজ্ঞে ব্যবহার নাই বলিয়াই বোধ হয় উহা ত্রয়ীর মধ্যে পরিলক্ষিত হয় নাই)। বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগ এই সকল যাগযজ্ঞের বিস্তৃত বিধি-নিয়মে পরিপূর্ণ। বিভিন্ন ব্রাহ্মণগ্রন্থে বর্ণিত বিবিধ বিধিনিয়মের বিরোধভঞ্জন ও সামঞ্জস্য বিধানার্থ জৈমিনিসূত্র বা পূর্বমীমাংসা দর্শন প্রণীত হয়। কর্মমীমাংসা, যজ্ঞবিদ্যা ইত্যাদি ইহারই নামান্তর। মীমাংসা-দর্শন অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের হইলেও কর্মমার্গ সর্বপ্রাচীন; অধুনা শ্রৌত কর্ম যাগযজ্ঞাদি অধিকাংশই লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু বেদার্থ অনুসরণে ব্যবস্থিত মন্বাদি শাস্ত্রবিহিত পঞ্চমহাযজ্ঞ, বর্ণাশ্রমাচার, দান-ব্রত-নিয়মাদি স্মার্তকর্ম এখনও অনেকাংশে প্রচলিত আছে। কর্মমার্গ বলিতে এক্ষণে উহাই বুঝায়। কিন্তু মীমাংসকগণ বেদোক্ত কর্মকাণ্ড বা ত্রয়ীধর্মের যে ব্যাখ্যা করেন তাহার কিছু বিশেষত্ব আছে। এই মতে যাগযজ্ঞই একমাত্র নিঃশ্রেয়স্, উহাতেই স্বর্গ ও অমৃতত্ব লাভ হয়। যজ্ঞকর্মই জীবের একমাত্র ধর্ম—কারণ উহা বেদের আজ্ঞা। শব্দ নিত্য, বেদমন্ত্রই অপৌরুষেয়, নিত্য, স্বতঃপ্রমাণ—কর্ম উহার বাহ্য অভিব্যক্তি, কর্মই উহার একমাত্র প্রতিপাদ্য। সুতরাং বেদবিহিত কর্মই একমাত্র ধর্ম। মীমাংসকগণ নিত্যশব্দবাদ ও স্ফোটতত্ত্বের বিচারে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও যুক্তিমত্তার পরিচয়

দিয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, উহা তাঁহাদিগকে নিরীশ্বর করিয়াছে। মীমাংসাশাস্ত্রে কোথাও ঈশ্বরের প্রসঙ্গ নাই। ইন্দ্রাদি শরীরধারী দেবতাও তাঁহারা স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে দেবতা মন্ত্রাত্মক ('তদাকারতয়া ধ্যাতস্য মন্ত্রস্য লক্ষিতস্য দেবতাত্বম্')। ব্রহ্ম, ঈশ্বর, দেবতা সকলই অর্থবাদ; জ্ঞান, ভক্তি নিরর্থক। কর্মই কর্তব্য, আর কিছু নাই। ইহার নাম বেদবাদ। গীতায় 'বেদবাদরতাঃ' 'নান্যদস্তীতিবাদিনঃ' ইত্যাদি কথায় এই মতাবলম্বী-দিগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। (২।৪২-৪৪ ও ৫৫-৫৭ পৃঃ দ্রঃ)।

৩। ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদ—বেদান্ত

কিন্তু পরমেশ্বরের জ্ঞান ব্যতীত কেবল কর্মদ্বারাই মোক্ষলাভ হয়, এই মতবাদ সকলের গ্রাহ্য হইবার নহে। আর্য-মনীষা ইহাতে অধিক দিন সন্তুষ্ট থাকিতে পারে নাই। অমৃতের সন্ধানে অনুসন্ধিৎসু আর্য-ঋষিগণ শীঘ্রই বেদার্থচিন্তনে নিমগ্ন হইয়া স্থির করিলেন যে, নামরূপাত্মক দৃশ্য-প্রপঞ্চের অতীত যে নিত্যবস্তু, জ্ঞানযোগে তাহাকেই জানিতে হইবে, তাহাই পরতত্ত্ব, তাহাই ব্রহ্ম ('তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম')। জ্ঞানেই মুক্তি, কর্মে নয়; কর্ম বন্ধনের কারণ। উহাতে স্বর্গাদি লাভ হইতে পারে, কিন্তু স্বর্গ মোক্ষ নহে। বেদের আরণ্যক ও উপনিষদ ভাগে এই ব্রহ্মতত্ত্বও সবিস্তার বিবৃত হইয়াছে। উপনিষৎ বেদের অন্ত বা শিরোভাগ, এই জন্য উহার নাম বেদান্ত। উপনিষৎ-সমূহ বিভিন্ন ঋষিগণ কর্তৃক কথিত হইয়াছে। উহা সংখ্যায় অনেক, তন্মধ্যে ঈশ, ঐতরেয়, কৌষীতকী, তৈত্তিরীয়, বৃহদারণ্যক, কেন, ছান্দোগ্য, প্রশ্ন, কঠ, শ্বেতাশ্বতর, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য—এই দ্বাদশখানিই প্রাচীন ও প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য। উহাদের মধ্যেও পরস্পর মতভেদ আছে। মহর্ষি বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রে সেই সকল বিভিন্ন মতের বিচারপূর্বক উহাদের বিরোধভঞ্জন ও সমন্বয় বিধান করিয়াছেন। বেদান্ত-দর্শন, উত্তর-মীমাংসা শারীরকসূত্র ব্রহ্মসূত্রেরই নামান্তর

এইরূপে বৈদিক ধর্মের দুই স্বরূপ দেখা দিল। বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ ভাগ লইয়া কর্মকাণ্ড এবং আরণ্যক ও উপনিষদ্ ভাগ লইয়া জ্ঞানকাণ্ড। দর্শনসমূহের মধ্যে জৈমিনিসূত্র বা পূর্বমীমাংসায় কর্মমার্গ বিবৃত হইয়াছে। ব্যাসসূত্র বা উত্তর-মীমাংসায় বর্ণিত হইয়াছে জ্ঞানমার্গ।

৪। কাপিল সাংখ্য—পুরুষ-প্রকৃতিবাদ

এইরূপে উপনিষদে অধ্যাত্মতত্ত্বের বিচার আরব্ধ হইলে জীব, জগৎ ও ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে নানারূপ মৌলিক গবেষণা চলিতে থাকে এবং জ্ঞানমার্গেও

মতভেদের সৃষ্টি হইয়া বিবিধ দর্শন-শাস্ত্রের উৎপত্তি হয়। তন্মধ্যে কাপিল সাংখ্যমত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাংখ্যমতে মূলতত্ত্ব একমাত্র ব্রহ্ম নহেন; মূলতত্ত্ব দুই—পুরুষ ও প্রকৃতি। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই অনাদি, নিত্য। প্রকৃতি জড়া, গুণময়ী, পরিণামিনী, প্রসবধর্মিণী অর্থাৎ স্বয়ং সৃষ্টিসমর্থা। পুরুষ চেতন, নির্গুণ, অপরিণামী, অকর্তা, উদাসীন, সাক্ষি-মাত্র। পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগেই সৃষ্টি, এই দুঃখময় সংসার। প্রকৃতি-পুরুষের পার্থক্য-জ্ঞানেই মুক্তি ("তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ"—সাংখ্যকারিকা ২)। আধুনিক কালের ডার্বিন, স্পেনসার, হেকেল প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকগণের ব্যাখ্যাত বিবর্তনবাদ (Evolution Theory) এবং সাংখ্যের প্রকৃতি-পরিণামবাদ প্রায় একরূপ, উভয়েই ঈশ্বর-তত্ত্ব বাদ দিয়াই জগৎ উৎপত্তির মীমাংসা করিয়াছেন, উভয়েই বলেন, 'ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই ('ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ'—সাং সূ ১।৯২)। যাহা হউক, নিরীশ্বর হইলেও সাংখ্যশাস্ত্র সর্বমান্য; পুরাণ, ইতিহাস, মন্বাদি স্মৃতি ও ভাগবত শাস্ত্র, সর্বত্রই সাংখ্যশাস্ত্রের আলোচনা আছে এবং ঐ সকল শাস্ত্রে উহার অনেক সিদ্ধান্তও গৃহীত হইয়াছে। গীতাও সাংখ্যের অনেক সিদ্ধান্তই অবিকল গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা বিস্তারিত যথাস্থানে আলোচিত হইয়াছে। (২৪৬, ৪২৯ পৃঃ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)।

৫। আত্মসংস্থ-যোগ বা সমাধি-যোগ

উপনিষৎ যখন স্থির করিলেন যে, দেহমধ্যে অন্তর্যামিরূপে যিনি বিরাজমান তাহাই ব্রহ্মাণ্ডের মূলতত্ত্ব পরব্রহ্ম—যাহা পিণ্ডে, তাহাই ব্রহ্মাণ্ডে—তখনই উপদেশ হইল, 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ' আত্মাকে দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে, মনন করিবে, ধ্যান করিবে। এইরূপ আত্মচিন্তা-দ্বারা ব্রহ্মোপাসনার যে প্রণালী কথিত হইল উহাই সমাধিযোগের মূল। এইরূপে উপনিষদের জ্ঞানমার্গ হইতেই যোগ-প্রণালীর উদ্ভব হইয়াছে। এই প্রণালীই যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ামাদি বহিরঙ্গ সাধন সংযুক্ত হইয়া ক্রমোন্নতি লাভ করতঃ অষ্টাঙ্গযোগ নামে পরিচিত হইয়াছে। যোগমার্গ অতি প্রাচীন। কথিত আছে, ব্রহ্মা উহার আদি বক্তা—'হিরণ্যগর্ভো যোগস্য বক্তা নান্যঃ পুরাতনঃ'। পতঞ্জলি মুনি উহা সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া পরবর্তী কালে যে যোগানুশাসন প্রবর্তিত করিয়াছেন, 'যোগ' বলিতে এখন তাহাই বুঝায়। উহাই রাজযোগ, পাতঞ্জল-যোগ, অষ্টাঙ্গ-যোগ, আত্মসংস্থ-যোগ ইত্যাদি নামে

অভিহিত হয়। সমাধি বা ইষ্টবস্তুতে চিত্তসংযোগ সর্ববিধ সাধনারই সাধারণ উদ্দেশ্য, সুতরাং যোগ-প্রণালী কোন না কোন ভাবে সকল সম্প্রদায়ই গ্রহণ করিয়াছেন।

৬। প্রতীকোপাসনা—ভক্তিমার্গ

পূর্বে বৈদিক ধর্মের যে বিভিন্ন অঙ্গসমূহের উল্লেখ করা হইল, তাহার কোথাও ভক্তির বিশেষ প্রসঙ্গ নাই। যড়্‌দর্শনসমূহের বেদান্ত ব্যতীত আর সকলই নিরীশ্বর বলিলেও চলে। বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্মবাদেও ভক্তির সমাবেশ হয় না। যাহা নির্গুণ, নির্বিশেষ, নিষ্ক্রিয়, যাহাকে সৃষ্টিকর্তা, প্রভু বা ঈশ্বর কিছুই বলা চলে না—মনুষ্য তাহা ধারণা করিতে পারে না এবং তাহার সহিত ভাব-ভক্তির কোন সম্বন্ধও স্থাপন করিতে পারে না। তাহা অচিন্ত্যস্বরূপ, নিজবোধরূপ,—'মনো যত্রাপি কুণ্ঠিতম্'। অথচ কোন তত্ত্বে চিত্ত স্থির না করিলে আত্মবোধও জন্মে না। এই হেতু নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনায় মন স্থির করিবার জন্য প্রতীকোপাসনা অর্থাৎ যাহা ব্রহ্ম নয় তাহাকে ব্রহ্মরূপে ভাবনা করার ব্যবস্থা আছে। যেমন মনকে ব্রহ্মরূপে ভাবনা করিবে ('মনো ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত')। সূর্যকে ব্রহ্মরূপে ভাবনা করিবে ('আদিত্যো ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত') ইত্যাদি। ইহা অবশ্য প্রকৃতপক্ষে উপাসনা নয়, সগুণ ব্রহ্ম ভিন্ন ভক্তিমূলক উপাসনা সম্ভবপর নহে। কিন্তু ক্রমে রুদ্র, বিষ্ণু প্রভৃতি বৈদিক-দেবতাগণও ব্রহ্মের প্রতীকরূপে কল্পিত হন এবং কোন কোন উপনিষদে রুদ্র, বিষ্ণু প্রভৃতি পরমাত্মা বা পরমেশ্বরেরই রূপ, ইহাও স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে (মৈত্র্য ৭।৭; রাম পূ ১৬; অমৃতবিন্দু ২২)। কোথাও পরব্রহ্মের বর্ণনায় দেব, ঈশ্বর মহেশ্বর, ভগবান্ প্রভৃতি শব্দও ব্যবহৃত হইয়াছে এবং 'যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ' ইত্যাদি কথাও আছে (শ্বেতাশ্বতর)। এ সকল অবশ্য সগুণ ব্রহ্মেরই বর্ণনা। বস্তুতঃ উপনিষদে ব্রহ্মস্বরূপের সগুণ ও নির্গুণ উভয়বিধ বর্ণনাই আছে। 'সন্তি উভয়লিঙ্গাঃ শ্রুতয়ো ব্রহ্মবিষয়াঃ। সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ ইত্যেবমাদ্যাঃ সবিশেষলিঙ্গাঃ। অস্থূলমনণু অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্ ইত্যেবমাদ্যাশ্চ নির্বিশেষলিঙ্গাঃ' (শঙ্কর)। অস্থূল-অনণু, অহ্রস্ব-অদীর্ঘ ইত্যাদি নির্গুণ স্বরূপের বর্ণনা। সর্বকর্মা, সর্বকাম সগুণ স্বরূপের বর্ণনা। শেষোক্ত 'সর্বকর্মা, সর্বকামঃ' ইত্যাদি ছান্দোগ্য উপনিষদের মন্ত্রটির বক্তা শাণ্ডিল্য ঋষি। ইনিই সগুণ উপাসনা বা ভক্তিমার্গের প্রবর্তক বলিয়া পরিচিত ('উপাসনানি সগুণব্রহ্মবিষয়কমানস-ব্যাপাররূপাণি শাণ্ডিল্যবিদ্যাদীনি—

বেদান্তসার ৬)। স্থূলকথা, ভক্তিমার্গ বেদোপনিষদ্ হইতেই বহির্গত হইয়াছে এবং পরে অবতারবাদ ও প্রতিমা পূজার প্রবর্তন হইলে উহা নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

৭। ধর্মশাস্ত্র বা স্মৃতিশাস্ত্র

আমরা দেখিলাম, বৈদিক ধর্মের প্রাথমিক স্বরূপ কর্মপ্রধানই ছিল, ঔপনিষদিক যুগে উহা জ্ঞানপ্রধান হইয়া উঠে এবং পরে পৌরাণিক যুগে উহা ভক্তিপ্রধান হয়। স্মৃতিশাস্ত্রসমূহ এই সকল বিভিন্ন মতবাদ কখন কোন্‌টি কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন তাহাই এখন দ্রষ্টব্য, কেননা ধর্মশাস্ত্রই হিন্দুর ধর্মজীবন ও কর্মজীবনের মুখ্য নিয়ামক। বৈদিক যুগে বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের বিধি নিয়মাদি সংক্ষিপ্তভাবে সঙ্কলিত করিয়া বিবিধ সূত্রগ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল। ইহাদিগকে কল্পসূত্র বলে। কল্পসূত্র তিন ভাগে বিভক্ত। যে ভাগে শ্রৌত যজ্ঞের বিবরণ আছে তাহার নাম শ্রৌতসূত্র, যে অংশে গৃহ্য অনুষ্ঠানের বিবরণ আছে তাহার নাম গৃহ্যসূত্র এবং যাহাতে পারিবারিক ও সামাজিক ধর্ম-কর্মের বিবরণ আছে তাহার নাম ধর্মসূত্র। এক্ষণে শ্রৌত ও গৃহ্যসূত্র প্রায় লুপ্ত হইয়াছে এবং প্রাচীন ধর্মসূত্রগুলি অধিকাংশ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়া ধর্মসংহিতা নাম ধারণ করিয়াছে। বর্তমান সময়ে বৌধায়ন, আপস্তম্ব প্রভৃতি কয়েকখানি ধর্মসূত্র ও মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণু, পরাশর, দক্ষ প্রভৃতি ২০ খানি ধর্মসংহিতা পাওয়া যায়। ইহাই ধর্মশাস্ত্র বা স্মৃতিশাস্ত্র নামে পরিচিত। সংহিতাগুলির মধ্যে মনুসংহিতাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রামাণ্য, অন্যান্যগুলি প্রাচীন নাম-সংযুক্ত থাকিলেও অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে সঙ্কলিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

মন্বাদি ধর্মশাস্ত্রসমূহে কর্মকাণ্ডের বর্ণনা-বাহুল্য থাকিলেও জ্ঞানের উপদেশও যথেষ্ট দেখা যায়। অনেক স্থলে স্পষ্টতঃই ধর্মশাস্ত্রকারগণ জ্ঞান ও কর্ম উভয়ের সমুচ্চয়ই উপদেশ করিয়াছেন। যথা—

তপো বিদ্যা চ বিপ্রস্য নিঃশ্রেয়সকরং পরম্।
তপসা কিল্বিষং হন্তি বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে॥ —মনু ১২।১০৪

—বেদোক্ত কর্মানুষ্ঠান ও জ্ঞান উভয়ই মোক্ষপ্রদ। কর্মের দ্বারা দোষ নষ্ট হইয়া জ্ঞানের দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয়। (তপঃ = বর্ণাশ্রমাচারোচিত কর্ম, মনু ১১।২৩৬)।

দ্বাভ্যামেব হি পক্ষাভ্যাং যথা বৈ পক্ষিণাং গতিঃ।
তথৈব জ্ঞানকর্মাভ্যাং প্রাপ্যতে ব্রহ্ম শাশ্বতম্॥ —হারীত ৭।৯।১১

—পক্ষীর গতি যেমন দুই পক্ষের যোগেই হইয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞান ও কর্ম এই দুইয়ের সমুচ্চয়েই শাশ্বত ব্রহ্ম-লাভ হয়।

পরবর্তী কালে ভক্তিমার্গের প্রবর্তন হইলে ধর্মশাস্ত্রসমূহেরও ভাগবত ধর্মের অনুকূল করিয়া নানারূপ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। ইহাতে প্রাচীন বিধিসমূহ কতক পরিবর্জিত হইয়াছে, কতক সংশোধিত হইয়াছে এবং ভক্তিমার্গের অনুকূল অনেক নূতন ব্যবস্থাও বিধিবদ্ধ হইয়াছে। মনুসংহিতায় কেবল মাত্র বৈদিক যজ্ঞাদি ও বৈদিক দেবগণেরই উল্লেখ আছে, পৌরাণিক দেবতা ও প্রতিমা পূজাদির কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই। কিন্তু পরবর্তী ব্যাস, পরাশর প্রভৃতি সংহিতায় পৌরাণিক ত্রিমূর্তি, নানা দেবতার পূজা-পদ্ধতি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আবার মনুর অষ্ট প্রকার বিবাহ, দ্বাদশ প্রকার পুত্র ইত্যাদি বিষয়ক ব্যবস্থা পরবর্তী কালে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছে। আবার ভাগবত ধর্মের প্রাদুর্ভাবের ফলে শ্রাদ্ধে মাংসাদি ব্যবহার, সন্ন্যাসাশ্রম প্রভৃতি লুপ্তপ্রায় হইলে পরবর্তী কালে এ সমস্তও 'কলিতে নিষিদ্ধ' বলিয়া কথিত হইয়াছে। এইরূপে ধর্মশাস্ত্র যুগে যুগে যুগোপযোগী পরিবর্তন সাধন করিয়া সমাজ ও হিন্দুধর্মকে চিরজীবী করিয়া রাখিয়াছে, হিন্দুধর্ম এইরূপ পরিবর্তনসহ বলিয়াই ইহা সনাতন। সামাজিক আচার-ব্যবহারের পরিবর্তনের অথবা যুগধর্মাদির প্রবর্তনে ধর্মশাস্ত্রের এইরূপ পরিবর্তন অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও সংঘটিত হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত আমাদের বঙ্গদেশে প্রচলিত স্মার্তপ্রবর রঘুনন্দনের স্মৃতি-সংগ্রহ ও বৈষ্ণবাচার্যগণের হরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি বৈষ্ণব-স্মৃতি।

[বিভিন্ন ধর্মসংহিতার মধ্যে নানারূপ মতভেদ আছে। আধুনিক কালে কোন কোন প্রসিদ্ধ স্মার্তপণ্ডিত এই সকল বিভিন্ন মতের যথাসম্ভব সামঞ্জস্য করিয়া সমগ্র ধর্মশাস্ত্রের সার সংগ্রহপূর্বক কতকগুলি বিধি-ব্যবস্থা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। বর্তমান হিন্দুসমাজ তদনুসারেই চলিতেছে। আমাদের বঙ্গীয় স্মার্ত-সমাজ পণ্ডিতপ্রবর রঘুনন্দনের শাসনাধীন।]

বৈদিক ধর্মের ক্রমবিকাশের পৌর্বাপর্য নির্ণয়। পূর্বে বৈদিক ধর্মের বিভিন্ন অঙ্গসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইয়াছে। ঐগুলির ক্রম-বিকাশের ঐতিহাসিক পৌর্বাপর্যের জ্ঞান না থাকিলে শাস্ত্রবিশেষের প্রকৃত তাৎপর্য-বিচার যথাযথরূপে করা যায় না। গীতার্থ-বিচারে উহা বিশেষ প্রয়োজনীয়, কেননা দেখা যায় অনেক সাম্প্রদায়িক টীকাকার পরবর্তী কালের শাস্ত্রসমূহের সাহায্যে প্রাচীন গীতা হইতে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত তত্ত্ব নিষ্কাশন করিয়া থাকেন। এই হেতু, বৈদিক যুগ হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত সনাতন ধর্মের বিভিন্ন শাখাগুলির উৎপত্তিকাল ঐতিহাসিক পরম্পরাক্রমে নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

খ্রীস্ট-পূর্বাব্দ	শাস্ত্র
৪৫০০	ঋগ্বেদ
২৫০০	অন্যান্য বেদ--ব্রাহ্মণগ্রন্থ ; বৈদিক কর্মমার্গ---বেদবাদ।
১৬০০	প্রাচীন উপনিষৎ ; ব্রহ্মবাদ—জ্ঞানমার্গ।
১৪০০	সাংখ্য, যোগ, ন্যায় ; জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়মার্গ ; সূত্র-গ্রন্থাদি। ভক্তিমার্গ ও ভাগবত ধর্মের আবির্ভাব।

গীতোক্ত ধর্মের প্রচার

৯০০	মহাভারত ও গীতার রচনাকাল
৫০০	বৌদ্ধধর্মের প্রচার—ধর্মবিপ্লব।

খ্রীস্টাব্দ

শাণ্ডিল্যসূত্রাদিতে ভক্তির ব্যাখ্যা '

২০০ পৌরাণিক যুগ আরম্ভ—

ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা বর্ণন। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণলীলা ও ভাগবতধর্মের বিস্তৃত বর্ণনা। নারদসূত্র, দেবী ভাগবত প্রভৃতি শাক্ত পুরাণ।

৮০০	শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব, বৈদিক ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, অদ্বৈত মায়াবাদ ও সন্ন্যাসবাদ প্রচার এবং তদনুযায়ী বেদান্ত ও গীতার ব্যাখ্যা।
১০০০	রামানুজাচার্য কর্তৃক মায়াবাদের প্রতিবাদ, বাসুদেবভক্তি ও বিশিষ্টাদ্বৈত মত প্রচার এবং তদনুযায়ী গীতার ব্যাখ্যা।
১১০০-১২০০	নিম্বার্ক, মধ্বাচার্য প্রমুখ কর্তৃক মায়াবাদের প্রতিবাদ ও ভক্তিবাদ প্রচার। শুষ্ক জ্ঞান ও কাম্যকর্মের প্রাবল্য।
১৫০০-১৬০০	শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ও ভক্তিমার্গ প্রচার। গৌড়ীয় গোস্বামিপাদগণ কর্তৃক বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রণয়ন ও প্রচার। গীতার ভক্তিপর ব্যাখ্যা।
১৮ শতক	শাক্ত ও ভক্তের বাদ-বিসংবাদ।
১৯ শতক	পরমহংসদেবের আবির্ভাব ; সমন্বয়বাদ প্রচার। আধুনিক যুগে গীতার অসাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা।

উপরে মোটামুটিভাবে বিভিন্ন শাস্ত্রাদির ঐতিহাসিক কাল-পরম্পরা নির্দেশ করা হইল। এ বিষয়ে নানারূপ মতভেদ আছে। আমরা

অনেক স্থলেই লোকমান্য তিলকের মতের অনুসরণ করিয়াছি, অনেক পাশ্চাত্ত্য প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতও উহার যুক্তিমত্তা স্বীকার করিয়াছেন। প্রাচীনকালে কোন ধর্মমত যখন প্রচারিত হইত, তখনই উহা পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ হইত না, সুতরাং গীতা বা মীমাংসাদি দর্শনশাস্ত্র রচিত হইবার পূর্বেই ঐ সকল ধর্মমত প্রচলিত ছিল, বুঝিতে হইবে। মহাভারত ও পুরাণাদি শাস্ত্রের প্রকৃত সময় নির্দেশ একরূপ দুঃসাধ্য, কারণ আমরা ঐ সকল গ্রন্থ যে আকারে প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা উহাদের মূলস্বরূপ নয়। দৃষ্টান্ত—মহাভারতের নারায়ণীয় পর্বাধ্যায়ে দশাবতারের বর্ণনায় বুদ্ধদেবের উল্লেখ নাই, অথচ ভাগবতে বুদ্ধাবতার, জৈনধর্ম ও দ্রাবিড় দেশীয় বৈষ্ণব-ধর্মাদিরও কথা আছে। সুতরাং বর্তমান ভাগবত অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে সঙ্কলিত হইয়াছে এবং উহাতে অনেক নূতন বিষয় সংযোজিত হইয়াছে, ইহাই অনুমান করিতে হয়। সর্বশাস্ত্রেই এইরূপ প্রাচীন-অর্বাচীনের সংমিশ্রণ দেখা যায়। পৌরাণিক গ্রন্থাদির আলোচনা দুই ভাবে হইতে পারে—এক, ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে, অপর, ভক্ত ও ভাবুকের দৃষ্টিতে। ঐতিহাসিক আলোচনা ভাবুক ভক্তের নিকট বিরক্তিকর এবং উহাতে তাঁহার কোন প্রয়োজনও নাই। যিনি অকৃত্রিম ভক্তি-বলে অপ্রাকৃত নিত্যলীলায় আস্থাবান্, তাঁহার নিকট প্রাকৃত ঐতিহাসিক তত্ত্বের মূল্য কি? কিন্তু সেরূপ ভাগ্যবান্ সুদুর্লভ, আমাদের পুস্তক-প্রকাশও সর্বসাধারণের জন্য, সুতরাং ভক্তিশাস্ত্রের আলোচনায়ও ঐতিহাসিক দৃষ্টি একেবারে বর্জন করা চলে না।

গীতার পূর্ণাঙ্গযোগ—সর্বধর্ম-সমন্বয়

পূর্বোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে প্রতীত হইবে যে, গীতা প্রচারের সময় বেদবাদ ও বৈদিক কর্মমার্গ, বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদ ও জ্ঞানমার্গ, সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতিবাদ ও কৈবল্য জ্ঞান, আত্মসংস্থ-যোগ বা সমাধি-যোগ, অবতারবাদ ও ভক্তি-মার্গ—এ সকলই প্রচলিত ছিল। এইগুলিই সনাতন ধর্মের প্রধান অঙ্গ এবং এগুলি আপাততঃ পরস্পর-বিরোধী বলিয়া বোধ হয়। বর্তমান কালেও কর্ম, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি, এই সকল বিভিন্ন মার্গের পার্থক্য অবলম্বনে নানারূপ সাম্প্রদায়িক মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। গীতা কিন্তু সনাতন ধর্মের এই সকল বিভিন্ন অঙ্গগুলির সমন্বয় করিয়া এক অপূর্ব পূর্ণাঙ্গ যোগ শিক্ষা দিয়াছেন। কিরূপে তাহা করিয়াছেন এবং সেই পূর্ণাঙ্গ যোগ কি তাহা আমরা বিভিন্ন মার্গের ব্যাখ্যায় নানাস্থানে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি (১১৬, ১৯৫-১৯৭, ২৩৮-৪০ প্রভৃতি পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

এস্থলে সাধারণভাবে সেই সমন্বয়-প্রণালীটি পুনরায় আলোচনা করিতেছি।

বৈদিক ধর্মের এক প্রধান বিরোধ 'বেদবাদ' ও বেদান্তবাদে, **কর্ম ও জ্ঞানে**। প্রকৃতপক্ষে এ উভয়ই বেদবাদ, কেননা বেদান্ত বা উপনিষৎ বেদেরই শিরোভাগ। বৈদিক ধর্মের দুই প্রধান শাখা—কর্ম ও জ্ঞান বা প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ। সুতরাং ইহার কোন্‌টি শ্রেয়ঃপথ, সকল শাস্ত্রেই এ প্রশ্ন উঠিয়াছে এবং ইহার বিচারও আছে। মহাভারতের শুকানুপ্রশ্নে (মভাঃশাঃ ২৩৭।৪০) শুকদেব পিতাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

যদিদং বেদবচনং কুরু কর্ম ত্যজেতি চ।
কাং দিশং বিদ্যয়া যান্তি কাং চ গচ্ছন্তি কর্মণা॥

—কর্ম কর, কর্ম ত্যাগ কর, এ দুই-ই বেদের আজ্ঞা; তাহা হইলে জ্ঞানের দ্বারা কোন্ গতি লাভ হয়, আর কর্মদ্বারাই বা কোন্ গতি লাভ হয়? (মভাঃ শাং ২৪০।১)।

মহাভারতের বিভিন্ন স্থলে ইহার দুই রকম উত্তর দেওয়া হইয়াছে। এক উত্তর এই—

'কর্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া তু প্রমুচ্যতে।
তস্মাৎ কর্ম ন কুর্বন্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ॥ —মভাঃশাং ২৪০।৭

—কর্মদ্বারা জীব বদ্ধ হয়, জ্ঞানের দ্বারা মুক্ত হয়, সেই হেতু তত্ত্বদর্শী যতিগণ কর্ম করেন না।

ইহাই **বৈদান্তিক সন্ন্যাসমার্গ** বা নিবৃত্তিমার্গ। কর্মদ্বারা বন্ধন হয়, একথা সর্বসম্মত; কিন্তু সেজন্য কর্ম ত্যাগ না করিলেও চলে, কর্তৃত্বাভিমান ও ফলাসক্তি বর্জন করিয়া কর্ম করিলেই বন্ধন হয় না, কেননা বন্ধনের কারণ আসক্তি, কর্ম নয়। সুতরাং পূর্বোক্ত প্রশ্নেরই উত্তর অন্যত্র এইরূপ দেওয়া হইয়াছে।—

"তদিদং বেদবচনং কুরু কর্ম ত্যজেতি চ।
তস্মাদ্ধর্মানিমান্ সর্বান্নাভিমানাৎ সমাচরেৎ॥"
"তস্মাৎ কর্মসু নিঃস্নেহা যে কেচিৎ পারদর্শিনঃ॥"

কর্ম কর, কর্ম ত্যাগ কর, উভয়ই বেদাজ্ঞা। সেই হেতু কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া সমস্ত কর্ম করিবে (বন ২।৭৪)। সেই হেতু যাঁহারা পারদর্শী তাঁহারা আসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্ম করিয়া থাকেন (অশ্ব ৫১।৩২)।

গীতাও এই কথাই পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন—'তস্মাৎ অসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর' (গীতা ৩।১৯, ৪।১৮-২৩ প্রভৃতি শ্লোক)। **আত্মজ্ঞান লাভ** ব্যতীত আসক্তি ও কর্তৃত্বাভিমান দূর হয় না, এই হেতুই গীতায় কর্মোপদেশের

সঙ্গে সঙ্গেই আত্মজ্ঞানের উপদেশ। এই অংশে গীতা সম্পূর্ণ উপনিষদের অনুবর্তন করিয়াছেন এবং অনেক স্থলে উপনিষদের ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু জ্ঞানলাভ করিয়াও কর্মসন্ন্যাস না করিয়া অনাসক্তভাবে লোকসংগ্রহার্থ কর্ম করাই কর্তব্য, ইহাই গীতার নিশ্চিত মত ; ইহারই নাম **জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়বাদ**। এই মত গীতার পূর্বেও প্রচলিত ছিল এবং প্রাচীন ঈশোপনিষদে জ্ঞান-কর্মের সমুচ্চয় স্পষ্ট ভাষায় উপদেশ করা হইয়াছে ('কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ'); 'বিদ্যাং চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ' ইত্যাদি (ঈশ ২।১১)। বস্তুতঃ বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদিগণের মধ্যেও পূর্বাবধিই দুই পক্ষ ছিল। এক পক্ষ বলিতেন, জ্ঞান ও কর্ম পরস্পর বিরোধী, কর্মত্যাগ অর্থাৎ সন্ন্যাস ব্যতীত মোক্ষলাভ হয় না; এই মত ও কাপিল সাংখ্যের মত এক এবং পরবর্তী কালে এই বৈদান্তিক জ্ঞানমার্গেরই নাম হয় সাংখ্য। পক্ষান্তরে অন্য পক্ষ বলিতেন, জ্ঞানযুক্ত কর্মে অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মে বন্ধন হয় না, সুতরাং মোক্ষার্থ কর্ম ত্যাগের কোন প্রয়োজন নাই। ইহাই **বৈদান্তিক কর্মযোগ** বা যোগমার্গ। জ্ঞানমূলক সন্ন্যাসমার্গ বুঝাইতে **'সাংখ্য'** শব্দ ও জ্ঞানমূলক কর্মমার্গ বুঝাইতে **'যোগ'** শব্দ মহাভারতে ও গীতায় পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে (গীতা ৫।২।৪)। বস্তুতঃ এই বৈদান্তিক কর্মযোগই গীতার প্রতিপাদ্য। গীতার প্রতি অধ্যায়ের শেষে যে ভণিতা আছে তাহাতেও এই কথাই ব্যক্ত করে। উহাতে গীতার পরিচয় এইরূপ আছে—'ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে অর্জুন-বিষাদযোগো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ'। ইহার অর্থ এই—শ্রীভগবান্ কর্তৃক গীত উপনিষৎ বা ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্গত যোগশাস্ত্রে অমুক অধ্যায়। উপনিষৎ শব্দ সংস্কৃতে স্ত্রীলিঙ্গ, এই হেতু উহার বিশেষণ 'গীতা' এই স্ত্রীলিঙ্গ পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা একখানি উপনিষৎ, বস্তুতঃ ইহা প্রাচীন দ্বাদশখানি উপনিষদের তুল্য ত্রয়োদশ উপনিষৎ বলিয়া গণ্য এবং বেদের ন্যায় মান্য। উপনিষৎসমূহে ব্রহ্মবিদ্যারই আলোচনা, কিন্তু তাহাতেও দুই মার্গ আছে—সাংখ্য ও যোগ। গীতা বেদান্তের অন্তর্গত যোগ বা কর্মযোগ মার্গের গ্রন্থ, তাই বলা হইয়াছে, 'ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে'। এই যোগশাস্ত্র অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত, এই হেতু প্রত্যেক অধ্যায়ে প্রধানতঃ যে বিষয়টি আলোচিত হইয়াছে তাহাকেও একটি যোগ বলা হইয়াছে, যেমন অর্জুন-বিষাদ যোগ, শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ যোগ ইত্যাদি। অষ্টাদশ অধ্যায় বা অঙ্গবিশিষ্ট এই যোগশাস্ত্রের একটি অঙ্গ বলিয়াই উহার নাম 'যোগ', নচেৎ 'বিষাদযোগ' ইত্যাদি কথার অন্য অর্থ নাই।

'যোগ' শব্দে পাতঞ্জল যোগ বা সমাধি যোগ এবং 'সাংখ্য' শব্দে কাপিল সাংখ্যও বুঝায়। কিন্তু গীতায় 'যোগ' শব্দ প্রায় ৬০।৬৫ বার ব্যবহৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ৭।৮ স্থলে মাত্র উহা সমাধি-যোগ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (৬ষ্ঠ ১০।১২। ১৬।১৭।১৯।২০)। আর সর্বত্রই বুদ্ধিযুক্ত কর্মযোগ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। 'সাংখ্য' শব্দ প্রায় সর্বত্রই জ্ঞানমূলক সন্ন্যাসমার্গ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (২।৩৯, ৩।৩, ৫।৪-৫ ইত্যাদি)। একস্থলে মাত্র কাপিল সাংখ্য বুঝাইতে 'গুণসংখ্যানে' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে (১৮।১৯)।

এই প্রসঙ্গে, 'কর্ম' শব্দটিও গীতায় কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা বুঝা প্রয়োজন। মীমাংসাদি শাস্ত্রে 'কর্ম' বলিতে যাগযজ্ঞাদিই বুঝায়। কিন্তু গীতায় 'কর্ম' শব্দ সাধারণ ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে (৫৮ পৃঃ দ্রঃ)। মনুষ্য-জীবন কর্মময়, জীবনের সমস্ত কর্ম ('সর্বকর্মাণি') নিষ্কামভাবে ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে লোকসংগ্রহার্থ করিতে পারিলেই উহা যজ্ঞ হয়। এই জীবনযজ্ঞকে কামনাশূন্য করিয়া ঈশ্বরমুখী করাই গীতার উদ্দেশ্য ও উপদেশ—কেননা উহাতেই জীবের মোক্ষ ও জগতের অভ্যুদয় যুগপৎ সাধিত হয়। কাজেই শ্রীভগবান্ গীতায় কামনামূলক যাগযজ্ঞাদির নিন্দা করিলেও নিষ্কাম যাগযজ্ঞাদির প্রশংসা ও ব্যবস্থা করিয়াছেন, কেননা উহা চিত্তশুদ্ধিকর ও লোকরক্ষার অনুকূল (৩।১৪-১৬, ১৮।৫-৬) এবং এইরূপে বেদবাদ বা বৈদিক কর্মমার্গের সহিত বৈদান্তিক জ্ঞানবাদের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। কিন্তু এস্থলে কাপিল সাংখ্যজ্ঞানী ও বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞানী উভয়েরই এক গুরুতর আপত্তি আছে। মায়াবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্ম নির্গুণ, নীরব, নিষ্ক্রিয়, সাংখ্যের পুরুষও তদ্রূপ ; সাংখ্যমতে প্রকৃতি এবং বৈদান্ত মতে মায়া বা অজ্ঞানই কর্ম বা সংসার-প্রপঞ্চের মূল। সাংখ্যমতে পুরুষ যখন প্রকৃতি হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বরূপে ফিরিয়া আসে তখনই প্রকৃতির ক্রিয়া বন্ধ হয়। বেদান্তমতেও মায়ার যখন শেষ হয়, তখন জীব ব্রহ্ম হইয়া যায় ('ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মৈব ভবতি'), কর্ম লোপ পায়। সুতরাং উভয় মতেই জ্ঞান বা মোক্ষ অর্থ কর্মের শেষ, বিশ্বলীলার লোপ। সেই হেতু জ্ঞানবাদীরা বলেন, স্থিতি এবং গতি, আলোক এবং অন্ধকার, জ্ঞান ও অজ্ঞান যেমন যুগপৎ সম্ভবে না, কর্ম ও জ্ঞানও সেইরূপ একত্রিত থাকিতে পারে না।

গীতা **পুরুষোত্তম-তত্ত্ব** দ্বারা এই আপত্তির মীমাংসা করিয়াছেন। অধ্যাত্মতত্ত্বের বিচারে গীতা তিন পুরুষ (১৫।১৬-১৮) ও দুই প্রকৃতির (৭।৪-৫)

উল্লেখ করিয়াছেন এবং উহাদের দ্বারাই নিরীশ্বর সাংখ্যবাদ, নির্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব ও সগুণ ঈশ্বরবাদ বা ভগবত্তত্ত্বের সমন্বয় করিয়াছেন এবং সেই সমন্বয়মূলক দার্শনিক তত্ত্বের ভিত্তিতেই জ্ঞান-কর্ম-ভক্তিমিশ্র অপূর্ব যোগ-ধর্ম শিক্ষা দিয়াছেন। এ সকল তত্ত্বের মর্ম কি, সমন্বয়-প্রণালীটিই বা কি তাহা তত্তৎ স্থলে বিস্তারিত ব্যাখ্যাত হইয়াছে (২৩৮-৪০, ৪৬০ পৃঃ দ্রঃ)। সংক্ষেপে মূল কথাটি এই—নির্গুণ ব্রহ্মবাদীর আপত্তির উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—নির্গুণ ব্রহ্মই বল আর সগুণ ব্রহ্মই বল, আমিই সব। নির্গুণ, সগুণ—দুইই আমার বিভাব। নির্গুণভাবে আমি সম, শান্ত, নিষ্ক্রিয়, নীরব; সগুণভাবে আমি সৃষ্টিকর্তা, বিশ্বপ্রকৃতির সকল কর্মের নিয়ামক। জীবের যখন নানাত্ব-বুদ্ধি বিদূরিত হইয়া একত্ব জ্ঞান হয় তখন জীব সম, শান্ত, নির্মল হইয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয় (১৮।২০।৫৩)। তখন তাহার নিজের কর্ম থাকে না, তা ঠিক (৩।১৭), কিন্তু তখন তাহার কর্ম আমার কর্ম হইয়া যায় ('মৎকর্মকৃৎ' ১১।৫৫), আমার কর্মই তাহার মধ্য দিয়া হয়, সে নিমিত্তমাত্র (১১।৩৩), আমাতে তাহার পরাভক্তি জন্মে (১৮।৫৪), ভক্তিদ্বারা আমার সগুণ-নির্গুণ সমগ্রস্বরূপ অধিগত হয় (১৮।৫৫), তখন সেই মচ্চিত্ত, মদর্পিতকর্মা, মদ্ভক্ত কর্মযোগী কর্ম করিয়াও আমাতেই অবস্থিতি করে (১৮।৫৬, ৬।৩১)। সুতরাং এই কর্মে ও জ্ঞানে কোন বিরোধ নাই। সেইরূপ কাপিল সাংখ্যজ্ঞানীকেও শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—তোমাদের প্রকৃতি ও পুরুষ আমারই অপরা ও পরা প্রকৃতি (৭।৪-৫), আমিই মূলতত্ত্ব। প্রকৃতিই কর্ম করে তা ঠিক (৩।২৭, ১৩।২৯), সে আমারই ইচ্ছা বা অধিষ্ঠানবশতঃ, আমিই প্রকৃতির অধীশ্বর (১৪।৩-৪)। জীবের যখন অহংজ্ঞান বিদূরিত হয়, তখন সে প্রকৃতি হইতে মুক্ত হয় বা ত্রিগুণাতীত হয়। কিন্তু তখনও কর্ম বন্ধ হয় না, আমার বিশ্বলীলা লোপ পায় না, দেহ থাকিতে কর্ম যায় না (১৮।১১), কিন্তু জ্ঞান হইলে 'আমি কর্ম করি' এই ভ্রম লোপ পায়; সুতরাং তখন জীব অনাসক্ত, ফলাফলে উদাসীন, নির্দ্বন্দ্ব ও সমত্ববুদ্ধিযুক্ত হইয়া বিশ্বকর্ম করিতে পারে (১৪।২২-২৩) এবং তাহাই কর্তব্য। এ কর্মে বন্ধন হয় না (১৮।১৭) এবং জ্ঞানের সহিতও ইহার কোন বিরোধ নাই।

সুতরাং দেখা গেল—মীমাংসা, সাংখ্য, বেদান্ত সকল শাস্ত্রেরই উপপত্তি গীতা অংশতঃ গ্রহণ করিয়া পুরুষোত্তম-তত্ত্বদ্বারা উহাদের সুন্দর সমন্বয় করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে পাতঞ্জল-যোগ বা সমাধি-যোগের অবতারণা গীতা কি উদ্দেশ্যে করিয়াছেন তাহাই দ্রষ্টব্য।

চিত্তকে বাহ্য বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া নিত্যবস্তুতত্ত্বে সমাহিত করার জন্য যোগের প্রয়োজন। ধ্যান-ধারণা সকল মার্গেই আবশ্যক; সেই হেতু সাংখ্য, বেদান্ত, ভক্তিশাস্ত্র—সকলেই কোন-না-কোন রূপ যোগের পন্থা অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। গীতায়ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে **পাতঞ্জল-যোগ** বা রাজ-যোগের উপদেশ আছে। কিন্তু উদ্দেশ্য ঠিক এক নহে। সাংখ্য ও পাতঞ্জলের উদ্দেশ্য অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্বীজ সমাধি দ্বারা কৈবল্যলাভ অর্থাৎ 'কেবল' হওয়া বা প্রকৃতি হইতে মুক্ত হওয়া। ইহাতে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ঘটে; এ অবস্থায় চিত্তের সর্ববিধ সংস্কার দগ্ধ হইয়া যায়, চিত্তের বৃত্তি নষ্ট হইয়া যায়, শরীরটা দগ্ধসূত্রের ন্যায় আভাসমাত্রে অবস্থান করে, ইহাতে সুখের বিশেষ সম্পর্ক নাই। ব্রহ্মজ্ঞানী সমাধিদ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করেন—নির্গুণ ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করেন, ইহাতে কেবল আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি নহে, ইহা আত্যন্তিক সুখেরও অবস্থা। গীতায় এই অবস্থার সুন্দর বর্ণনা আছে (৬।২১-২২)। কিন্তু গীতা ইহার উপরে গিয়াছেন, গীতা ব্রহ্মতত্ত্বেরও উপরে ভগবত্তত্ত্ব স্থাপন করিয়াছেন (১৪।২৭, ১৫।১৮)। সাংখ্যে ঈশ্বর নাই, পাতঞ্জলে ঈশ্বরের বিকল্প বিধান, সেও অতি গৌণ ('ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বা'), বেদান্তে নির্গুণ ব্রহ্মে স্থিতি, গীতায় নির্গুণ-গুণী পুরুষোত্তমে চিত্ত-সংযোগ। তাই গীতা ব্রাহ্মীস্থিতির নির্মল অদ্বয় আনন্দ বর্ণনা করিয়াও পরে বলিতেছেন —ব্রহ্মভূত সাধকও সর্বলোকমহেশ্বর সর্বভূতের সুহৃদ্ শ্রীভগবানকে জানিয়া পরম শান্তি লাভ করেন (৫।২৯, ১৯৩-১৯৭ পৃঃ)। বস্তুতঃ গীতায় যোগের প্রসঙ্গে সর্বত্রই ভগবদ্ভক্তির কথা। গীতার যোগানন্দ ঈশ্বরপ্রাপ্তিজনিত ('মৎসংস্থাম্ ৬।১৫), গীতার মতে ভগবদ্ভক্ত যোগীই যুক্ততম (৬।৪৭), গীতোক্ত যোগী আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া সর্বত্র সর্বভূতে ঈশ্বরই দেখেন (৬।২৯-৩০ ও ২২১-২২ পৃঃ) এবং সর্বভূতেই নারায়ণ আছেন জানিয়া নিষ্কাম কর্মদ্বারা সর্বভূতের সেবা করেন (৬।৩১, ২২৩ পৃঃ)। তাই শ্রীভগবানে চিত্তার্পণই, তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণই গীতার সর্বশেষ ও 'গুহ্যতম' উপদেশ ('মন্মনা ভব মদ্ভক্ত' ইত্যাদি ১৮।৬৫-৬৬)। (অপিচ ২৩৮-২৪৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

সুতরাং গীতা, মীমাংসার বেদোক্ত কর্ম রাখিয়াছেন, বৌদ্ধের ন্যায় বেদ উড়াইয়া দেন নাই, কিন্তু বেদের অপব্যাখ্যা যে বেদবাদ তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং মীমাংসার যজ্ঞাদির অর্থ সম্প্রসারণ করিয়া, ভক্তিপূত এবং জ্ঞানসংযুক্ত করিয়া নিষ্কাম করিয়াছেন। বেদান্তের ব্রহ্মবাদ সম্পূর্ণই গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু বেদান্তীর ন্যায় কর্মত্যাগ করিতে বলেন নাই, বিশ্বলীলায়

লোপের ব্যবস্থা করেন নাই, বিশ্বকর্তার কর্মকে বিশ্বকর্মে পরিণত করিয়াছেন। পাতঞ্জল যোগ-প্রণালী গ্রহণ করিয়া উহাকে ঈশ্বরমুখী করিয়াছেন। এইরূপে গীতা **কর্ম, জ্ঞান,** যোগ, ভক্তির সমন্বয়ে অপূর্ব **চতুরঙ্গ যোগধর্ম** শিক্ষা দিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে ইহা বলা আবশ্যক যে—চতুরঙ্গ যোগ বলিতে ইহা মোটেই বুঝায় না যে 'জ্ঞানযোগ', 'ধ্যানযোগ' ইত্যাদি নামে যে চারিটি বিশিষ্ট সাধন-প্রণালী প্রচলিত আছে, প্রত্যেক সাধককেই ক্রমান্বয়ে তাহা অবলম্বন ও অভ্যাস করিতে হইবে। সেই সকল সাধন-প্রণালীর যাহা সারতত্ত্ব তাহা সকলই এই যোগধর্মের অন্তর্ভুক্ত আছে, ঐ সকল ইহাতে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত (পৃঃ ২৪০-৪৩ দ্রঃ)। এই যোগধর্ম একটিই, চারিটি নয়। ইহাই শ্রীভগবানের কথিত **'ভাগবতধর্ম'**। ইহার স্থূলকথা এই—পরমাত্মা পুরুষোত্তমই সমস্ত বেদে বেদ্য (১৫।১৫), তিনি যজ্ঞদান-তপস্যাদির ভোক্তা (৫।২৯), তাঁহাতে চিত্তসংযোগই যোগ (৬।১৫), তাঁহাতে পরাভক্তিই জ্ঞান (১৩।১০), তাঁহার কর্মই পরম ধর্ম (১১।৫৫), তিনিই জীবের পরম গতি। এই তত্ত্বটি নিম্নোক্ত ভাগবত-বাক্যে সংক্ষেপে এইরূপে ব্যক্ত হইয়াছে—

বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ।
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ॥
বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ।
বাসুদেবপরো ধর্মো বাসুদেবপরা গতিঃ॥

—ভাঃ ১ম ২।২৮।২৯

বলা বাহুল্য যে, 'বাসুদেব' শব্দ পরব্রহ্মবাচক। সর্বভূতে বাস করেন বলিয়াই তিনি বাসুদেব ('সবভূতাধিবাসশ্চ বাসুদেবস্ততোহস্ম্যহং') (মভাঃশাং ৩৪১।৪১; বস্—বাস করা), 'ব্রহ্ম' শব্দেরও উহাই অর্থ ('বৃহত্ত্বাৎ ব্রহ্ম', 'যেন সর্বম্ ইদং ততম্' ২।১৭)। এইরূপ, সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন বলিয়াই তিনি আবার 'বিষ্ণু' (বিষ্—বিস্তারে)। ব্রহ্মবাদী বলেন—সমস্তই ব্রহ্ম ('সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম); গীতা বলেন—সমস্তই বাসুদেব ('বাসুদেবঃ সর্বমিতি' ৭।১৯); বিষ্ণুপুরাণ বলেন—জগৎ বিষ্ণুময় ('ইদং বিষ্ণুময়ং জগৎ')। সর্বত্রই এক তত্ত্ব। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের পুত্র বলিয়াই যে বাসুদেব তা নন, শ্রীকৃষ্ণ অবতারের পূর্বেও যাঁহারা পরব্রহ্মের অবতার বলিয়াই পুরাণে বর্ণিত হইয়াছেন, তাঁহারাও ভগবান্ 'বাসুদেব' বলিয়াই আখ্যাত হইয়াছেন (ভাঃ ৫।৫-৬, ৫।৬।১৬)।

পৌরাণিক অবতার-তত্ত্ব, প্রতীকোপাসনা এবং ইষ্টমূর্তির নানাবিধ ধ্যানধারণা প্রভৃতি ভক্তিমার্গের আবশ্যক অঙ্গগুলির প্রকৃত মর্ম হৃদ্‌গত না করিয়া এক অখণ্ড বস্তুকে আমরা নানারূপে খণ্ড খণ্ড করিয়া 'ব্যক্তিরূপে' কল্পনা করিয়া থাকি এবং জড়োপাসকের ন্যায় উহা লইয়া বাদ-বিসংবাদ করি। তাই গীতায় শ্রীভগবান্ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—অল্পবুদ্ধি মানব আমার পরম তত্ত্ব না জানিয়া অব্যক্ত অব্যয়স্বরূপ আমাতে ব্যক্তিত্ব আরোপ করিয়া থাকে ('অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ' ইত্যাদি ৭।২৪)। বস্তুতঃ বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টীয় ইত্যাদি ঈশ্বরবাদী মাত্রেই যাঁহার উপাসনা করেন, বাসুদেব তিনিই। অবতারবাদ ইত্যাদি যাঁহারা মানেন না, তাঁহারাও বাসুদেবেরই উপাসনা করেন এবং বাসুদেবও তাহা অগ্রাহ্য করেন না, ইহা তাঁহারই শ্রীমুখের বাণী ('যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে' ইত্যাদি ৪।১১)। ভগবান্ বাসুদেব কর্তৃক যে উদার সর্বজনীন ধর্মমত গীতায় কথিত হইয়াছে তাহাই ভাগবত ধর্ম।

গীতোক্ত ধর্মের প্রাচীন স্বরূপ

পূর্বে বলা হইয়াছে, গীতায় যে পূর্ণাঙ্গ যোগধর্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে, উহাকে ভাগবত ধর্ম বলে; ইহা অনুমানের কথা নহে। মহাভারতে শান্তিপর্বে নারায়ণীয় পর্বাধ্যায়ে এই ধর্মের বিস্তারিত বর্ণনা আছে এবং তথায় ইহাকে নারায়ণীয় ধর্ম, ঐকান্তিক ধর্ম, সাত্বত ধর্ম ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ভাগবত ধর্মের এই সকল নাম সুপরিচিত। এই ধর্ম বর্ণনপ্রসঙ্গে বৈশম্পায়ন জন্মেজয়কে বলিয়াছেন—

'এবমেষ মহান্ ধর্মঃ স তে পূর্বং নৃপোত্তম।
কথিতো হরিগীতাসু সমাসবিধিকল্পিতঃ॥

—হে নৃপবর, পূর্বে হরিগীতায় এই মহান্ ধর্ম বিধিযুক্ত সংক্ষিপ্ত প্রণালীতে তোমার নিকট কথিত হইয়াছে। (মভাঃ শাং ৩৪৬।১১)

এস্থলে 'হরিগীতা' বলিতে ভগবদ্গীতাই বুঝাইতেছে। এ কথা পরে আরও স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে। এই ধর্ম-তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া জন্মেজয় বলিলেন—"আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, এই একান্তধর্মই শ্রেষ্ঠ ও নারায়ণের প্রিয়তম; যে সমস্ত বিপ্রগণ সযত্ন হইয়া বিধিপূর্বক উপনিষদের সহিত বেদ পাঠ করেন এবং যাঁহারা যতিধর্ম-সমন্বিত, তাঁহাদের অপেক্ষা একান্তি-মানবগণের গতি উৎকৃষ্ট বোধ হইতেছে। এই ধর্ম কোন্ সময় কোন্

দেব বা ঋষি কর্তৃক কথিত হইয়াছে, তাহা শুনিতে আমার বড় কৌতূহল হইতেছে।" তখন বৈশম্পায়ন কহিলেন—

'সমুপোঢ়েষনীকেষু কুরুপাণ্ডবয়োর্মৃধে।
অর্জুনে বিমনস্কে চ গীতা ভগবতা স্বয়ং॥"

সংগ্রামস্থলে কুরু-পাণ্ডব সৈন্য উপস্থিত হইলে যখন অর্জুন বিমনস্ক হইলেন, তখন ভগবান স্বয়ং তাঁহাকে এই ধর্ম উপদেশ দিয়াছিলেন (মভাঃ শাং ৩৪৮।৮)।

কিন্তু এই ধর্ম যে কুরুক্ষেত্রেই প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল তাহা নহে। এই ধর্ম নিত্য ও অব্যয়, উহা কল্পে কল্পে আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়াছে। প্রতি কল্পে উহা কি ভাবে প্রচারিত হইয়াছে নারায়ণীয় উপাখ্যানে তাহার বিস্তারিত বর্ণনা আছে এবং তথায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, বর্তমান কল্পে ত্রেতা যুগের প্রারম্ভে উহা বিবস্বান্-মনু-ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি পরম্পরাক্রমে বিস্তৃত হইয়াছে। ("ত্রেতাযুগাদৌ চ ততো বিবস্বান্ মনবে দদৌ। মনুশ্চ লোকভৃত্যর্থং সুতায়েক্ষ্বাকবে দদৌ। ইক্ষ্বাকুণা চ কথিতো ব্যাপ্য লোকানবস্থিতঃ।" ইত্যাদি শাং ৩৪৮।৫১-৫২)। গীতায়ও ৪র্থ অধ্যায়ের প্রারম্ভে শ্রীভগবান্ ঠিক এই পরম্পরারই উল্লেখ করিয়াছেন (৪।১-৩) এবং এই ধর্মকেই 'যোগ' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং গীতোক্ত এই যোগধর্ম ও নারায়ণীয়োপাখ্যানে বর্ণিত ভাগবত ধর্ম একই, ইহা সুনিশ্চিত। এই নারায়ণীয় ধর্মের সাধ্যসাধন তত্ত্বের আলোচনায়ও সেই সিদ্ধান্তই দৃঢ়ীকৃত হয়। মহাভারতের বর্ণনা অতি বিস্তৃত, দুই-চারিটি মুখ্য কথার মর্মানুবাদ এ স্থানে উদ্ধৃত হইতেছে।

"ইহ সংসারে দ্বিজসত্তমগণ যাহাতে প্রবেশ করিয়া মুক্ত হন, সেই সনাতন বাসুদেবকে পরমাত্মা জানিবে। তিনি নির্গুণ অথচ গুণভোগী এবং গুণস্রষ্টা হইয়াও গুণাধিক (মভাঃ শাং ৩৩৯)। ইনিই বেদসমুদয়ের আশ্রয়, শ্রীমান্, তপস্যার নিধি; ইনিই সাংখ্য, ইনিই যোগ, ইনিই ব্রহ্ম। ইনি ঐশ্বর্য-সমন্বিত এবং সর্বভূতের আবাস, এই নিমিত্ত বাসুদেব নামে অভিহিত হন। ইনি গুণবর্জিত অথচ কার্যবশতঃ অবিলম্বে গুণগণের সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকেন।" (মভাঃ শাং ২৪৭)

"একান্ত ভক্তি-সমন্বিত নারায়ণ-পরায়ণ ব্যক্তি সতত পুরুষোত্তমকে চিন্তা করতঃ মনের অভিলষিত লাভ করেন।" "সুপ্রযুক্ত কর্ম ও অহিংসা ধর্মযুক্ত এই ধর্মজ্ঞান হইলে জগদীশ্বর হরি প্রীত হন।" "সেই নিষ্কাম কর্মকারী একান্ত ভক্তগণের আমিই (ভগবান্ বাসুদেব) আশ্রয়।" "সাংখ্য, যোগ, ঔপনিষদিক

জ্ঞান ও পাঞ্চরাত্র বা ভক্তিমার্গ—এ সকল পরস্পর পরস্পরের অঙ্গস্বরূপ। এই ত তোমার নিকট সাত্বত ধর্ম কথিত হইল।" (মভাঃ শাং ৩৪৮)

এই সকল কথার স্থূলমর্ম এই যে, নির্গুণ-গুণী ভগবান্ পুরুষোত্তম বাসুদেবই পরব্রহ্ম। তিনিই সমস্ত ('বাসুদেবঃ সর্বমিতি'), সর্বভূতে তিনিই আছেন এবং তাঁহাতেই সর্বভূত আছে (৬।২৯-৩৪), এই জ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহাতে একান্ত ভক্তি করা এবং সর্বভূতহিত-কল্পে নিষ্কাম কর্ম করা, ইহাই এই ধর্মের স্থূলকথা। উপরি-উদ্ধৃত বাক্যে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, সাংখ্য, যোগ, আত্মজ্ঞান ও ভগবদ্ভক্তি, এ সকলই এ ধর্মের অঙ্গস্বরূপ। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, গীতোক্ত পূর্ণাঙ্গ যোগধর্ম ঠিক ইহাই (ভূঃ ১৯-২০ পৃঃ)। ইহাই সাত্বত ধর্ম বা ভাগবত ধর্ম।

পরব্রহ্ম বাসুদেবেরই দ্বিধামূর্তি নর-নারায়ণ ঋষি এই ধর্ম প্রথম প্রবর্তন করেন (মভাঃ শাং ৩৩৪)। মহাভারতে ও ভাগবতে উক্ত হইয়াছে যে, এই নারায়ণ ঋষি নিষ্কাম কর্ম শিক্ষা দিয়াছেন এবং নিজেও কর্ম আচরণ করিতেন (গীতা ৫২৯ পৃ, ভাঃ ১১।৪।৬, মভাঃ উদ্যোঃ ৪৯।২০।১১, শাং ২।৭।২)। শ্রীকৃষ্ণও গীতায় নিষ্কাম কর্ম শিক্ষা দিয়াছেন এবং নিজেও কর্ম আচরণ করিতেন। বস্তুতঃ, ভগবান্ নারায়ণ ও নরই দ্বাপরের শেষে কৃষ্ণার্জুনরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ('এষ নারায়ণঃ কৃষ্ণঃ ফাল্গুনশ্চ নরঃ স্মৃত'—মভাঃ উদ্যোঃ ৬৯।২ অপিচ শাং ৩৩৯-৪১)।

এই নর-নারায়ণ ঋষি ভাগবতধর্মের আদি প্রবর্তক বলিয়াই উঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া ভাগবত ধর্মগ্রন্থাদি আরম্ভ করিতে হয় ('নারায়ণং নমস্কৃত্য··· ততো জয়মুদীরয়েৎ'—ভূমিকার শিরোভাগের শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এই শ্লোকের অর্থ এই—নারায়ণ, নরশ্রেষ্ঠ নর, সরস্বতী দেবী ও ব্যাসদেবকে নমস্কার করিয়া 'জয়' অর্থাৎ মহাভারতাদি গ্রন্থ পাঠ করিবে। মহাভারতের প্রাচীন নাম 'জয়' (মভাঃ আদি ৬২।২০) এবং উহাই ভাগবত ধর্মের প্রধান এবং মুখ্য গ্রন্থ। পরবর্তী কালে পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্রেই ভক্তিমার্গ ও ভাগবত ধর্মই কথিত হইয়াছে, এই হেতুই এই সকল শাস্ত্রেরও সাধারণ নাম 'জয়' হইয়াছে। ('অষ্টাদশপুরাণানি রামস্য চরিতং তথা। বিষ্ণুধর্মাদিশাস্ত্রাণি শিবধর্মাশ্চ ভারত।···জয়েতি নাম এতেষাং' ইত্যাদি)।

অধুনা ভাগবতধর্ম বলিতে সাধারণতঃ বৈষ্ণবধর্মই বুঝায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি ভক্তিমার্গের উপাসক সকল সম্প্রদায়ই ভাগবত-ধর্মাবলম্বী; কেননা ইহারা সকলেই অনির্দেশ্য ব্রহ্মতত্ত্বের স্থলে

ভগবত্তত্ত্ব অর্থাৎ ভক্তের ভগবান্ বলিয়া একটি উপাস্য বস্তু স্বীকার করেন, তিনি বিষ্ণুই হউন আর রুদ্রই হউন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। পূর্বে বলা হইয়াছে, সনাতন ধর্ম প্রথমে কর্মপ্রধান ছিল, পরে ঔপনিষদিক যুগে উহাতে অনির্দেশ্য ব্রহ্মবাদেরই প্রাধান্য হয়। পরে যখন ভক্তিমার্গ, অবতার-বাদ ও প্রতীকোপাসনা বা মূর্তিপূজাদির প্রবর্তন হইয়া ঈশ্বরবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তখন বিষ্ণুরুদ্রাদি বৈদিক দেবগণই ঈশ্বরের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু দেবতা একাধিক, সুতরাং ঈশ্বরের স্থান লইয়া তাঁহাদের মধ্যে অর্থাৎ তাঁহাদের ভক্তগণের মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও নানারূপ মতভেদ হইবারই কথা। এইরূপে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি বিভিন্ন উপাসক-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। ইঁহারা সকলেই সগুণ ঈশ্বর, নিত্যা প্রকৃতি, জগতের সত্যতা এবং ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেন অর্থাৎ ইঁহারা সকলেই ভাগবতধর্মী। বৈদিক কর্মবাদ ও বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদ হইতে পৌরাণিক ভাগবত ধর্মের এই সকল বিষয়েই পার্থক্য। বিষ্ণু, রুদ্র প্রভৃতি যে একই মূলতত্ত্বের বিভিন্ন বিকাশ বা মূর্তি তাহা সকল শাস্ত্রই বলেন ('একং সন্তং দ্বিধাকৃতং'; 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি' ইত্যাদি)। একটি দৃষ্টান্ত ধরুন। শক্তিপূজা সম্বন্ধে দেবী-ভাগবতে দেবদেব বলিতেছেন— "নাহং সুমুখি মায়ায়া উপাস্যত্বং ব্রুবে কচিৎ।

মায়াধিষ্ঠানচৈতন্যমুপাস্যত্বেন কীর্তিতম্ ॥"

—"সুমুখি, আমি মায়ার উপাসনার কথা কোথাও বলি নাই, মায়ার অধিষ্ঠান যে চৈতন্য তিনিই উপাস্য, ইহাই বলিয়াছি।"

সুতরাং বুঝা গেল, শক্তি উপাসনা মায়ার অধিষ্ঠাত্রী পুরুষ যে চৈতন্য তাঁহারই উপাসনা। ইনিই সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর, ভক্তের ভগবান্। ইনিই উপনিষদের 'হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং' (মুণ্ডক ২।২।৯) অথবা 'হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং' (ঈশ ১৫)—'এই হিরণ্ময় আবরণে আচ্ছাদিত সত্যই মায়া-উপহিত জ্যোতির্ময় চৈতন্য', ইনিই ভক্তচিত্তে নানারূপে উদিত হন; কেহ বলেন চিন্ময়, কেহ বলেন চিন্ময়ী। ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবত রচনার প্রারম্ভে সমাধিযোগে এই তত্ত্বই উপলব্ধি করিয়াছিলেন— 'অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্—তিনি পূর্ণ পুরুষকে দেখিলেন এবং মায়াকেও দেখিলেন (মায়াঞ্চ), নচেৎ বিশ্বলীলার বর্ণনা হয় না। এইরূপ তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে হরিহরেও কোন ভেদ নাই, থাকিতে পারে না, কেননা, সনাতনধর্ম একেশ্বরবাদী, এক ভিন্ন দুই নাই, তবে ইহাদিগকে দেবতা বলিয়া কল্পনা করিলে ইহাদের উপাসকগণের মনে ভেদবুদ্ধি স্বভাবতঃই হয় এবং তাহা

লইয়া বাদ-বিসম্বাদও হয়। সম্প্রদায় বা দল হইতেই দলাদলি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু দেবতা অনেক থাকিলেও ঈশ্বর এক, সুতরাং যিনি একেশ্বরে বিশ্বাস করেন, যিনি প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহার ভেদবুদ্ধি নাই, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র—

যথা শিবময়ো বিষ্ণুরেবং বিষ্ণুময়ঃ শিবঃ।
যথান্তরং ন পশ্যামি তথা মে স্বস্তিরায়ুষি ॥ —স্কন্দোপনিষৎ

'বিষ্ণু যে প্রকার শিবময়, শিবও সেই প্রকার বিষ্ণুময়, আমার জীবন এমন মঙ্গলময় হউক যেন আমি ভেদ দর্শন না করি।'

সুতরাং দেখা গেল, উপনিষদে, ভাগবত-পুরাণে বা দেবী-ভাগবতে—সর্বত্রই মূলতত্ত্ব একই। গীতায় সর্বত্রই এই মূলতত্ত্বেরই উপপাদন—কোথাও বিশেষভাবে কোন মূর্তি-বিশেষের উল্লেখ নাই। এই হেতুই গীতা বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব প্রমুখ সকল সম্প্রদায়েরই মান্য।

গীতা ও ভাগবত—আধুনিক বৈষ্ণব মত

ভাগবত ধর্মের বিশিষ্ট গ্রন্থ যে সকল এক্ষণে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে শ্রীগীতা, মহাভারতের নারায়ণীয়োপাখ্যান, শাণ্ডিল্যসূত্র, শ্রীভাগবত পুরাণ, নারদ-পঞ্চরাত্র, নারদসূত্র, ভরদ্বাজসংহিতা, ব্রহ্মসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ এবং আধুনিক যুগের শ্রীরামানুজাচার্য, শ্রীমধ্বাচার্য প্রমুখের ও গৌড়ীয় গোস্বামিপাদগণের বৈষ্ণব গ্রন্থাদিই প্রধান। এগুলি যেরূপ পৌর্বাপর্যক্রমে লিখিত হইল, উহাই উহাদের আবির্ভাবের কাল-পরম্পরা অর্থাৎ উহাদের মধ্যে শ্রীগীতা সর্বপ্রাচীন এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্য সর্বাপেক্ষা আধুনিক। সুতরাং সর্বপ্রাচীন শ্রীগীতায় ভাগবতধর্মের যে স্বরূপ দৃষ্ট হয়, আধুনিক বৈষ্ণব-শাস্ত্রে ও বৈষ্ণব আচারে তাহার অনেকটা পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এই পরিবর্তন কি কারণে কিরূপে সংঘটিত হইল তাহাই এক্ষণে দ্রষ্টব্য। ভাগবত পুরাণ গীতার পরবর্তী হইলেও সর্বমান্য এবং আধুনিক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বেদস্বরূপ। তবে কি গীতায় ও ভাগবতে কোন পার্থক্য আছে? উভয়ই ভাগবতধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য গ্রন্থ, সুতরাং উভয়ে কোন পার্থক্য থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ এই দুই গ্রন্থে কোন পার্থক্য নাই। উভয়ের ধর্মতত্ত্ব একই, পার্থক্য যাহা কিছু শাস্ত্র-ব্যাখ্যায়, সাম্প্রদায়িক মতবাদে।

সমগ্র গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ প্রিয়ভক্ত অর্জুনকে যে সকল তত্ত্ব উপদেশ দিয়াছেন, ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ভগবদ্-উদ্ধব-সংবাদে ভাগবত-ধর্ম বর্ণনায় (৭ম হইতে ২৯শ অধ্যায়ে) ভক্তরাজ উদ্ধবকেও ঠিক সেই সকল

তত্ত্বই উপদেশ দিয়াছেন। সাংখ্যযোগ, আত্মতত্ত্ব, বেদবাদের নিন্দা, নিষ্কাম কর্ম, ভগবানে কর্ম সমর্পণ, ধ্যানযোগ, প্রকৃতিপুরুষ-বিবেক ও ত্রিগুণ-তত্ত্ব, বিভূতি-বর্ণনা, চাতুর্বর্ণ্য ধর্ম, স্বধর্ম-পালন ইত্যাদি গীতার সমস্ত কথাই ভাগবতে আছে এবং গীতার ন্যায় সকলগুলিই ভক্তিসংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভাগবতের অন্যান্য স্থলে নবযোগীন্দ্রগণ, ভগবান্ কপিলদেব প্রমুখ কর্তৃক ভাগবতধর্মের বর্ণনাও গীতারই অনুরূপ (২২৪ পৃঃ উদ্ধৃত অংশ দ্রষ্টব্য) এবং অনেক স্থানে শব্দশঃ একরূপ। বিস্তারিত উভয় গ্রন্থে দ্রষ্টব্য, এস্থলে দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই-চারিটি বিষয় ভাগবত হইতে উল্লেখ করিতেছি।

নিষ্কামকর্ম—স্বধর্মপালন—'ইতি মাং যঃ স্বধর্মেণ ভজেন্নিত্যমনন্যভাক্। সর্বভূতেষু মদ্ভাবো মদ্ভক্তিং বিন্দতে দৃঢ়াম্' ১১।১৮।৪৪, 'স্বধর্মস্থো যজন্ যজ্ঞৈরনাশীঃকাম উদ্ধব' ইত্যাদি ১১।২০।১০। 'কুর্যাৎ সর্বাণি কর্মাণি মদর্থং শনকৈঃ স্মরন্' ইত্যাদি ১১।২৯।৯; অপিচ ১১।১০।১, ১১।১০।৪, ১১।২০।১১, ১১।১৮।৪৬, ১১।২০।৮।৯ শ্লোক।

জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি—'তস্মাজ্‌জ্ঞানেন সহিতং জ্ঞাত্বা স্বাত্মানমুদ্ধব। জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্নো ভজ মাং ভক্তিভাবিতঃ। ১১।১৯।৫, 'জ্ঞানী প্রিয়তমোঽতো মে জ্ঞানেনাসৌ বিভর্তি মাম্। ১১।১৯।৩, 'সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ' ইত্যাদি ১১।২।৪৩, অপিচ ১১।১৮।৪৫, ১১।২৯।১২, ১১।২৯।১৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি, ভগবানে কর্মার্পণ—৫২৮-২৯, ৩২৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত বাক্যগুলি দ্রষ্টব্য। **সর্বধর্মত্যাগ**—৫৩৯-৪০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত শ্লোক দ্রষ্টব্য।

ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, নিষ্কাম কর্ম, স্বধর্মপালন, সর্বভূতে ভগবদ্ভাব, ভগবানে আত্মসমর্পণ ইত্যাদি গীতোক্ত ধর্মের যাহা সারকথা, ভাগবতেও সে সমস্তই আছে। কিন্তু এ সকল ব্যতীত ভাগবতে আরো কিছু বেশী আছে, যাহা গীতায় নাই। সেটি হইতেছে ব্রজলীলা এবং তাহার মধ্যমণি রাস-পঞ্চাধ্যায়। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—এই পাঁচটি মুখ্য স্থায়ী ভাবের মধ্যে শান্ত ও দাস্য ভাব মহাভারত, গীতা ও সমস্ত ভক্তিশাস্ত্রেরই অভিধেয়, কিন্তু সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাব ব্রজলীলা ব্যতীত আর কোথাও নাই। তন্মধ্যে মধুরভাব বা কান্তাপ্রেম 'সাধ্য শিরোমণি'—'সেই মহাভাব-স্বরূপিণী রাধাঠাকুরাণী।' শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই রাধাভাব অঙ্গীকার করিয়া জীবকে এই মহাভাবের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন—গম্ভীরা-লীলায় দ্বাদশবর্ষ দিবারাত্রি 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া আর্তি-দৈন্য-হাসি-কান্নায় তপ্ত-ইক্ষুরসবৎ অন্তঃস্নিগ্ধ বহির্জ্বালাময় কৃষ্ণবিরহে সুখ-দুঃখে অতিবাহিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্য-

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪

কেহই কেবল পুণ্য বা কেবল পাপ করে না। সকলে কিছু না কিছু পুণ্যকর্মও করে, পাপকর্মও করে। সুতরাং যাহার জন্য অনন্ত স্বর্গবাসের ব্যবস্থা হইল, তাহার পাপের শাস্তি হইল না; পক্ষান্তরে, যাহার পক্ষে অনন্ত নরকবাস লিখিত হইল, তাহার পুণ্যের পুরস্কার হইল না। এ কি অবিচার নহে? বলিতে পার, প্রত্যেক জীবের পাপপুণ্যের হিসাব-নিকাশ করিয়া পাপ ও পুণ্যের আধিক্য অনুসারে অনন্ত নরকবাস বা স্বর্গবাসের ব্যবস্থা হয়, কিন্তু অনন্তকালের তুলনায় মানুষের এই জীবনকাল কতটুকু? ক্ষণস্থায়ী এ জীবনের পাপাধিক্য বা পুণ্যাধিক্যের জন্য অনন্তকাল ব্যাপিয়া নরকবাস বা স্বর্গবাসের ব্যবস্থা, ইহাতে কি এক পক্ষে অতি-নিষ্ঠুরতা অপর পক্ষে অতি-উদারতা প্রকাশ পায় না?

এ সম্বন্ধে **হিন্দুমত** এই যে—স্বর্গ বা নরক ভোগ জীবের চরম গতি নয়। যাহা হইতে জীবের উদ্ভব, সেই পরব্রহ্মে লীন হওয়া বা ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হওয়াই জীবের পরম লক্ষ্য ও চরম গতি। যে পর্যন্ত জীব তাহার উপযোগী না হয়, সে পর্যন্ত তাহাকে কৃতকর্মানুসারে পুনঃ পুনঃ দেহ ধারণ করিয়া কর্মফল ভোগ করিতে হয়। ভোগ ভিন্ন প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় হয় না। জীবের এই যে জন্মমৃত্যুচক্রে পরিভ্রমণ, ইহারই নাম সংসার (সং-সৃ—গমন করা)। এই সংসার ক্ষয় হইয়া কিরূপে জীবের ব্রহ্মনির্বাণ বা ভগবৎ-প্রাপ্তি হইতে পারে, তাহাই সমগ্র হিন্দুদর্শন ও হিন্দুশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। অবশ্য হিন্দুশাস্ত্রে, জীবের কৃতকর্মানুসারে স্বর্গাদি ভোগের ব্যবস্থাও আছে, কিন্তু তাহা অনন্ত কালের জন্য নহে। যে কর্মবিশেষের ফলে স্বর্গাদি লাভ হয়, সেই কর্মের ফলভোগ শেষ হইলে তাহাকে আবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। মোক্ষ বা ভগবৎ-প্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত জন্মকর্মের নিবৃত্তি নাই।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ —গীতা ৮।১৬

১৪। হে কৌন্তেয়, মাত্রাস্পর্শাঃ (ইন্দ্রিয়ের বিষয়-সংস্পর্শ) তু শীতোষ্ণ-সুখদুঃখদাঃ (শীতোষ্ণাদি সুখদুঃখদায়ী) আগম-অপায়িনঃ (উৎপত্তিবিনাশ-শীল) [সুতরাং] অনিত্যাঃ [অতএব] হে ভারত, তান্ তিতিক্ষস্ব (সেগুলি সহ্য কর)।

জীবে দয়া—সর্বসাধারণের জন্য এই সকলের ব্যবস্থা, ইহাই বৈধী মার্গ। উহা জ্ঞানকর্মবর্জিত হইতে পারে না, উহাতে যে জ্ঞান-কর্মের নিষেধ তাহা গীতোক্ত জ্ঞানকর্ম নয়, তাহা ভক্তিহীন শুষ্কজ্ঞান ও কাম্য কর্মাদি। উহা নিষেধের জন্যই শ্রীচৈতন্যাবতার। বৌদ্ধ-যুগের শেষে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য বৈদান্তিক জ্ঞানমার্গ ও কুমারিল ভট্ট বৈদিক কর্মমার্গের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন ও এই দুই মার্গই কালক্রমে এককপ নিরীশ্বর হইয়া পড়িয়াছিল। জ্ঞান ও কর্মের সঙ্গে ভক্তির সম্পর্ক ছিল না। সে কালের জ্ঞানিগণের দুই-একটি দৃষ্টান্ত দেখুন। কথিত আছে, কোন পণ্ডিতকে মৃত্যুকালে ঈশ্বরের নাম করিতে বলা হইয়াছিল, তখন তিনি 'পেলব, পরমাণু' 'পেলব, পরমাণু' বলিতে বলিতে চক্ষু মুদিলেন। ইনি কণাদের পরমাণু-বাদই সার ভাবিয়াছিলেন—এই মতে পরমাণুই জগতের মূল কারণ, সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর কেহ নাই। আর একটি পণ্ডিত অদ্বৈতবাদ স্থাপনার্থ এক গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়া সংস্কারবশতঃ শিষ্টাচারের অনুবর্তী হইয়া গ্রন্থারম্ভে ঈশ্বরের নমস্ক্রিয়াসূচক কিছু লিখিতে উদ্যোগী হইলেন, অমনি তাঁহার সোঽহংজ্ঞান উদিত হইল, কি ভ্রম! আমিই ত তিনি—'অব্ধি অপার স্বরূপ মম লহরী বিষ্ণু মহেশ'—প্রণাম করিব কাহাকে—'কহাঁ করুঁ প্রণাম?'—কাজেই আর তাঁহার প্রণাম করা হইল না। সেকালে বিদ্যার কেন্দ্রস্থল নবদ্বীপে দেখা যাইত, পণ্ডিতগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া—তাল ঢুপ্ করিয়া পড়ে, না পড়িয়া ঢুপ্ করে—এই অপূর্ব তত্ত্ব নির্ণয়ার্থ ছল-তর্ক-বাদ-বিতণ্ডার ঢেউ উঠাইতেছেন। এই সকল ছিল সেকালের জ্ঞানের চর্চা ও পাণ্ডিত্যের লক্ষণ। আর কর্মের ত অন্তই ছিল না। বেদের তেত্রিশ দেবতা তেত্রিশ কোটী হইয়াছিলেন—তার পর উপদেবতা, অপদেবতা, গ্রাম্যদেবতাও অনেক ছিলেন, এমন কি জ্বর, বসন্ত প্রভৃতিও দেবতার স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তন্ত্র-মন্ত্রের অসদ্ব্যবহার, অভিচার, ব্যভিচারাদিরও অন্ত ছিল না। নিত্যনৈমিত্তিক কর্মে ধর্মধ্বজিতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল, ধর্মপ্রাণতা ছিল না। প্রভুত্ব, প্রতিষ্ঠা, কামিনী-কাঞ্চনাদির কামনায় কলুষিত চিত্তে এই সকল 'ধর্মকর্ম' বা ধর্মবাণিজ্য সম্পন্ন হইত, উহাতে ভক্তির প্রসঙ্গ ছিল না (৩১৬-১৭ পৃঃ দ্রঃ)। এইরূপে যখন শোচনীয় ধর্মের গ্লানি, তখনই শ্রীচৈতন্য অবতার, ভক্তিহীন জ্ঞান-মার্গ ও কর্ম-মার্গের সম্পূর্ণ পরিহার এবং প্রেমভক্তি ও হরিনাম প্রচার। ইহার নাম যুগধর্ম। এই যুগধর্মে কোন্ অবস্থায় কি কারণে কিরূপ কর্ম ও কিরূপ জ্ঞানের বর্জন উপদিষ্ট হইয়াছিল তাহা বুঝা প্রয়োজন, নচেৎ উহাদের সর্বথা

পরিহারে সঙ্কীর্ণতা ও অকর্মণ্যতা বৃদ্ধি পায়। এই ধর্মে অধিকারভেদে রাগানুগা ভক্তি ও বৈধী ভক্তির এবং নিবৃত্ত কর্ম ও সন্ন্যাসের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এক্ষণে রাগমার্গ ও বৈধীমার্গ, কর্ম ও সন্ন্যাস, বৈষ্ণব ও স্মার্ত আচারের সংমিশ্রণে এই ধর্মের বর্তমান স্বরূপ অনেকটা বিমিশ্র হইয়া পড়িয়াছে। গীতা ও ভাগবতের তত্ত্বালোকে এই অত্যুদার ধর্মমত ব্যাখ্যাত ও স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে বর্তমান সময়ে দেশের অশেষ কল্যাণের আকর হইতে পারে।

গীতার শিক্ষা—সার্বভৌম ধর্মোপদেশ

গীতা কোন সম্প্রদায়-বিশেষের ধর্মগ্রন্থ নহে, ইহা মানব-ধর্মগ্রন্থ। গীতায় সার্বভৌম ধর্মোপদেশ; জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলেই উহা গ্রহণ করিতে পারেন। গীতার সেই সার্বজনীন স্থূল উপদেশগুলি কি এবং সেই উপদেশের অনুবর্তী হইয়া কি ভাবে স্বকীয় ধর্মজীবন ও কর্মজীবন নিয়মিত করিলে সকলেই ঐহিক ও পারলৌকিক কল্যাণ লাভ করিতে পারেন, তাহাই এক্ষণে বিবেচ্য। সংক্ষেপে বলিতে গেলে গীতোক্ত উপদেশের সারমর্ম এই—

১। ধর্মে উদারতা, ২। কর্মে নিষ্কামতা, ৩। জ্ঞানে ব্রহ্মসদ্ভাব—সর্বভূতে ভগবদ্ভাব, ৪। যোগে বা ধ্যানে ভগবানে চিত্ত-সংযোগ, ৫। ভক্তিতে ভগবৎ-শরণাগতি, ৬। নীতিতে আত্মৌপম্যদৃষ্টি—সাম্যবুদ্ধি, ৭। উপাসনা—ভগবৎকর্ম, জীবসেবা, স্বধর্মপালন, ৮। সাধনা—ত্যাগানুশীলন।

এ কথাগুলি সমগ্র গীতার সারোদ্ধার, গীতা-ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিভিন্ন স্থানে এগুলির আলোচনা করা হইয়াছে। গীতা-পাঠকালে পাঠক এই স্থূল তত্ত্বগুলির প্রতি লক্ষ রাখিবেন।

১। **ধর্মে উদারতা**—ধর্ম শব্দ এস্থলে "কোন বিশেষ সাম্প্রদায়িক মত বা সাধন-প্রণালী" এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ধর্মমত লইয়া বাদ-বিতর্ক বিরোধ-বিদ্বেষ কেবল আমাদের দেশে নহে, সকল দেশেই আছে। আমাদের দেশে তবু এই বিরোধ কেবল বিদ্বেষ-বহ্নি উদ্গীরণ করিয়াই ক্ষান্ত আছে, অন্যান্য দেশে ধর্মের নামে অমানুষিক নির্যাতন ও ভীষণ হত্যাকাণ্ড-সকল সংঘটিত হইয়াছে। ইহার কারণ, অনেক ধর্মোপদেষ্টাই বলেন—একমাত্র এই ধর্মই সত্য ও মুক্তিদায়ক, অন্য ধর্ম

মিথ্যা। বিধর্মীকে পাশবিক শক্তিবলে স্বীয় ধর্মে দীক্ষিত করাও পুণ্যকর্ম বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিতেছেন সম্পূর্ণ বিপরীত কথা—"লোকে যে পথই অবলম্বন করুক সকল পথেই আমাতেই পৌছিবে, যে আমাকে যে ভাবে ভজনা করে আমি তাহাকে সেই ভাবে সন্তুষ্ট করি (৪।১১ শ্লোক ও ১৪৩ পৃঃ)। অদ্বৈত জ্ঞান বা দ্বৈত ভক্তি, যে পথেই যাও সগুণ-নির্গুণ যাহাই চিন্তা কর, আমাকেই পাইবে, কেননা মূলতত্ত্ব একমাত্র আমিই (১২।২-৪, ৯।১৫)। জ্ঞান, ধ্যান, কর্ম, উপাসনা সকল মার্গেই আত্মস্বরূপ আমাকে পাওয়া যায় (১৩।২৪-২৫)। নিরাকারবাদী, সাকারবাদী, বৈষ্ণব, শাক্ত, হিন্দু, অহিন্দু—গীতোক্ত ধর্মে সকলেরই স্থান আছে।

২। **কর্মে নিষ্কামতা**—কর্মশিক্ষা, কর্ম-প্রেরণা, গীতার একটি বিশেষত্ব। গীতার এবং মহাভারতের অন্যান্য স্থলেও শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ কর্ম-মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন, সনাতন ধর্ম-সাহিত্যে অন্যত্র তাহা অধিক দৃষ্ট হয় না। বস্তুতঃ প্রাচীন ভারত কর্মবলেই শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল—শৌর্যবীর্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, সুখসমৃদ্ধি, শিক্ষা-সভ্যতায় জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু বর্তমান ভারতবাসী, কর্মবিমুখ, অদৃষ্টবাদী, পুরুষকারহীন, বাক্যবাগীশ বলিয়া উপহাসাস্পদ—এরা কেবল 'ঘরেতে বসে গর্ব করে পূর্ব পুরুষের।' পক্ষান্তরে দেখা যায়, যীশুখ্রীস্ট সর্বত্রই সন্ন্যাসের উপদেশ দিয়াছেন (ম্যাথু ১৯।১৬-৩০, ১০।৯, লুক ১৪।২৬-৩৩ ইত্যাদি); কিন্তু খ্রীস্টীয় জগৎ এক্ষণে কর্মকেই সারসর্বস্ব করিয়াছেন। খ্রীস্টীয়ান বাইবেল গুটাইয়া রাখিয়াছেন, আমরা গীতা ভুলিয়াছি। আমরা এক্ষণে পাশ্চাত্ত্যের নিকট কর্ম-মাহাত্ম্য শিক্ষা করিতেছি, কর্ম-জীবনে তাঁহারাই আমাদের আদর্শ-স্থানীয় হইয়াছেন। কিন্তু সে আদর্শ গীতোক্ত কর্মের আদর্শ নহে, উহা ভারতীয় শিক্ষা-সভ্যতার সম্পূর্ণ বিরোধী। পাশ্চাত্ত্যের কর্ম-জীবনের মূলে অভিমান, আত্মপ্রতিষ্ঠা, বিশ্বময় আমিত্বের প্রসার; গীতার কর্মসূত্রের মূল নিরভিমানিতা, অহংত্যাগ, জগতে সচ্চিদানন্দ প্রতিষ্ঠা। পাশ্চাত্ত্য কর্মী রাজস কর্তা—অশান্ত, ফলাকাঙ্ক্ষী, সুখান্বেষী (১৮।২৭)। গীতোক্ত কর্মযোগী সাত্ত্বিক কর্তা—নিষ্কাম, সম, শান্ত, 'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ' (২।৫৬, ১৮।২৬)। পাশ্চাত্ত্যের কর্ম—ভোগ, বন্ধন; গীতোক্ত কর্ম—যোগ, মোক্ষ-সেতু।

অনেকে গীতোক্ত-কর্মযোগের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পাঠকের মানসপটে পাশ্চাত্ত্যের কর্ম-জীবনের উজ্জ্বল আদর্শ অঙ্কিত করিয়া দেন। উহাতে গণেশ গড়িতে

বানর গড়া হয়—'বিনায়কং প্রকুর্বাণো রচয়ামাস বানরম্।' পাশ্চাত্ত্যের কর্মসূত্রের যে উচ্চতম আদর্শ, তাঁহাও গীতোক্ত আদর্শের নিম্নে। কথাটা আরো একটু স্পষ্টীকৃত করা প্রয়োজন হইতেছে। ইংরেজীতে একটি সুন্দর কথা আছে—

'I slept and dreamt that life was Beauty,
I woke and found that life was Duty'

ইহার ভাবানুবাদ এইরূপ করা হইয়াছে—

'নিদ্রায় দেখিনু হায়! মধুর স্বপন,—
কি সুন্দর সুখময় মানব-জীবন।
জাগিয়া মেলিনু আঁখি, চমকিনু পুনঃ দেখি—
কঠোর কর্তব্য-ব্রত জীবন-যাপন।' —প্রভাতচিন্তা

এস্থলে কবি বলিতেছেন, জীবনকে সুখময় মনে করা স্বপ্ন দেখা মাত্র, জীবন কঠোর কর্তব্যময়। এটি অতি উচ্চ কথা, কিন্তু গীতার আদর্শ উচ্চতর। অবশ্য, কর্তব্য-জ্ঞান ও কর্মনিষ্ঠা পাশ্চাত্ত্যের নিকট আমরা এক্ষণে শিখিতে পারি, কেননা আমরা তমোগুণাক্রান্ত, জড়ভাবাপন্ন, কর্মবিমুখ হইয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে প্রথমতঃ সমাজে রজোগুণের উদ্রেকের প্রয়োজন এবং পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহই উহার আদর্শস্বরূপ। এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই অনেক আধুনিক কৃতবিদ্য ব্যক্তি গীতাকে কর্তব্যশাস্ত্র (Gospel of Duty) বলিয়া থাকেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, কর্তব্যপালন (Duty) ও কর্মযোগ ঠিক এক কথা নহে। কর্তব্যপালনে কর্তার অহংজ্ঞান থাকে, ফলের দিকে সাগ্রহ দৃষ্টি থাকে, অনেক সময় একটা কঠোরতার অনুভূতিও থাকে এবং সর্বদাই অন্যের প্রতি বাধ্যবাধকতার ভাব থাকে। কিন্তু গীতোক্ত কর্মযোগী এ সকলের উপরে। তিনি অনহংবাদী, মুক্তসঙ্গ, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্বিকার (১৮।২৬)। তিনি আত্মারাম, আত্মতৃপ্ত; তাঁহার নিজের কোন কর্তব্য নাই ('তস্য কার্যং ন বিদ্যতে' ৩।১৭), তিনি সমস্ত কর্তব্য ত্যাগ করিয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন ('সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য,' ইত্যাদি ১৮।৬৬)। ভগবানের কার্য তাঁহার মধ্য দিয়া হইতেছে ('নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্' ১১।৩৩)। কর্তা ঈশ্বর, তিনি যন্ত্রমাত্র; এই হেতুই ('তস্মাৎ' ৩।১৯) তিনি অনাসক্ত বুদ্ধিতে যথাপ্রাপ্ত কর্ম করিতে পারেন। কর্তব্যজ্ঞানের প্ররোচনা থাকিতে একেবারে নিষ্কাম হওয়া যায় না।

কথা হইতেছে এই, গীতা লৌকিক কর্তব্যাকর্তব্য-নির্ণায়ক গ্রন্থ নহে, উহার কর্মোপদেশের সহিত গভীর অধ্যাত্মজ্ঞান ও ঐকান্তিক ভগবদ্-ভক্তি

মিশ্রিত। কিন্তু পাশ্চাত্তাগণ কর্মতত্ত্বের বিচার করেন কেবল আধিভৌতিক দৃষ্টিতে; আত্মা, ঈশ্বর, বন্ধ, মোক্ষ, জ্ঞান-ভক্তির সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাই। পাশ্চাত্ত্য জর্মন-পণ্ডিত নিৎসে কর্ম-মাহাত্ম্য বা শক্তি-সাধনা, যুদ্ধের কর্তব্যতা, আদর্শ মনুষ্যত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক তাত্ত্বিক বিচার করিয়াছেন এবং তৎপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে পরমেশ্বর গতাসু হইয়াছেন এবং ভবিষ্য আদর্শ মানব-সমাজে খ্রীস্টের স্থান নাই। গীতায়ও আদ্যোপান্ত কর্মপ্রেরণা, যুদ্ধপ্রেরণা, কিন্তু গীতায় শ্রীভগবান্ এতৎপ্রসঙ্গে কি বলিতেছেন? "মামনুস্মর যুধ্য চ'—আমাকে স্মরণ কর আর যুদ্ধ কর (৮।৭), আমাতে চিত্ত রাখ, ফলাশা ত্যাগ কর, আমাতে কর্ম অর্পণ কর, আর যুদ্ধ কর ইত্যাদি (৩।৩০ ১৮।৫৭)। 'গীতায় আদ্যোপান্ত ঈশ্বরবাদ। পাশ্চাত্ত্যের সর্বোচ্চ আদর্শ 'অধিক লোকের অধিক সুখ'। গীতার উপদেশ—সুখদুঃখের অতীত হও—নির্দ্বন্দ্ব, নিত্যসত্ত্বস্থ, নির্যোগক্ষেম এবং আত্মবান্ হও (২।৪৫)। ইহা অধ্যাত্মতত্ত্বের শেষ কথা। বস্তুতঃ নিষ্কাম কর্ম মানবীয় কর্ম নহে, ঐশ্বরিক কর্ম, উহাতে ঐশ্বরিক প্রকৃতি লাভ করিতে হয়। ('মম সাধর্ম্যমাগতাঃ' ১৪।২)। সামাজিক কর্তব্যজ্ঞানের সহিত উহার তুলনা হয় না।

"That which the Gitā teaches is not a human but a divine action; not the performance of social duties but the abandonment of all other standards of duty or conduct for a selfless performance of divine will working through our nature.

"...In other words, the Gitā is not a book of practical ethics but of spiritual life." —*Sree Aurobindo, Essays on the Gita*

৩। **জ্ঞানে ব্রহ্মসদ্ভাব—সর্বভূতে ভগবদ্ভাব, সমত্ববুদ্ধি**। গীতার অনেক স্থলেই 'ব্রহ্মভাব', 'ব্রহ্মভূত', 'ব্রাহ্মীস্থিতি', 'সাম্যবুদ্ধি' ইত্যাদি কথা আছে এবং এই ভাব লাভ করিয়াই কর্ম করিতে হইবে এবং এই ভাব লাভ হইলেই ভগবানে পরাভক্তি জন্মে, এরূপ কথাও আছে (২।৭২, ৪।৪১, ৫।১০, ৫।১৯, ১৪।২৬, ১৮।৫৩-৫৫ ইত্যাদি)। 'ব্রহ্ম' বলিতে বুঝায় যাহা সর্ব-বৃহৎ, যাহা সর্বব্যাপী; যিনি সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন, যাঁহাতে সমস্ত আছে, যাঁহার সত্তায় সমস্ত সত্তাবান্, সেই অদ্বয় নিত্যবস্তুই ব্রহ্ম। ইহা পরমেশ্বরের নির্বিশেষ নির্গুণ বিভাব। এই ব্রহ্মসত্তার অনুভূতির নামই ব্রহ্মসদ্ভাব বা ব্রহ্মজ্ঞান। এই জ্ঞান লাভ হইলে সমস্ত

ভেদবুদ্ধি বিদূরিত হয়, নানাত্বের মধ্যে একত্ব দর্শন হয় (১৮।২০), জীব প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হয় (১৩।৩০), ঈশ্বরের প্রকৃতি লাভ করে, (১৪।২), তখন আত্মাতে ও ভগবানে সর্বভূত এবং সর্বভূতে ভগবদ্দর্শন হয় (৪।৩৫, ৬।২৬-৩০), তখন সাধক ভগবানের মধ্যেই বাস করেন (৬।৩১)। তখনই ভগবানে পরাভক্তি জন্মে (১৮।৫৪), সর্বভূতে প্রীতি জন্মে (২২৪-২৫ পৃঃ), সর্বত্র সমত্ববুদ্ধি জন্মে (৫।১৮-১৯), নিষ্কাম কর্মে অধিকার জন্মে, তখন তাঁহার নিজের কর্ম থাকে না (৩।১৭); সর্বকর্ম ভস্মসাৎ হইয়া যায় (৪।৩৭), বিশ্বময়ের বিশ্বকর্ম তাঁহার মধ্য দিয়া হইতে থাকে। কিন্তু মায়াবাদী বেদান্তী ব্রহ্মজ্ঞানের যে ব্যাখ্যা করেন, গীতোক্ত ব্রহ্মভাব ঠিক তাহা নহে। মায়াবাদীর ব্রহ্মভাবে জীব, জগৎ, ঈশ্বর সকলই লোপ পায়; কেননা এ সকল মায়ার বিজৃম্ভণ—এক অদ্বয়, নীরব, নিষ্ক্রিয়, নির্বিশেষ তত্ত্বই থাকে,—সুতরাং উহাতে কর্ম ও ভক্তির কোন প্রসঙ্গই নাই। কিন্তু গীতোক্ত ব্রহ্মভাব নির্গুণ-গুণী পুরুষোত্তম পরমেশ্বরেরই নির্গুণ বিভাব, উহা তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত (১৪।২৭), তিনি অক্ষর ব্রহ্ম হইতেও উত্তম (১৫।১৮), তিনি কেবল নির্গুণ ব্রহ্ম নহেন, তিনি জগতের সৃষ্টিকর্তা, পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহ, প্রভু, সখা, শরণ ও সুহৃদ্ (৯।১৭-১৮। সুতরাং গীতোক্ত ব্রহ্মভাবে জীবকে নিষ্ক্রিয় নীরবতার মধ্যে স্থাপিত করে না, উহাতে জীবকে নিষ্কাম ভগবৎকর্মের অধিকার দেয় এবং ভগবানে পরাভক্তি প্রদান করে। এই হেতু গীতায় ও ভাগবতে জ্ঞানীকেই 'শ্রেষ্ঠভক্ত' ও 'ভাগবতোত্তম' বলা হইয়াছে (গীতা ৭।১৭-১৮, ভাঃ ১১।২।৪৩, গী ২৩৯-৪১ পৃঃ)। এই গীতোক্ত পুরুষোত্তম-তত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব না বুঝিলে গীতার বহু কথা পরস্পর অসমঞ্জস ও অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় (১৯৩ ও ৪৬১-৬২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

৪। **যোগে বা ধ্যানে ভগবানে চিত্তসংযোগ**। 'যোগ' শব্দ এস্থলে ধ্যানযোগ, আত্মসংস্থ-যোগ বা সমাধি-যোগ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। পাতঞ্জল দর্শনে যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগ বিবৃত হইয়াছে। চিত্ত স্থির করিবার জন্য সকল সাধনায়ই যোগসাধনের প্রয়োজন। গীতায়ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে যোগসাধনের উপদেশ আছে, কিন্তু উদ্দেশ্য ঠিক এক নহে। পাতঞ্জল যোগের উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে যোগ নহে, বিয়োগ,—প্রকৃতি-পুরুষের বিয়োগ ('পুংপ্রকৃত্যোর্বিয়োগোঽপি যোগ ইত্যুদিতো যয়া'—ভোজবৃত্তি)। এই বিয়োগেই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি—কৈবল্যলাভ ('তদাভাবাৎ কৈবল্যম্'—সাঃ সূঃ ২।২৫)। কিন্তু গীতোক্ত যোগের উদ্দেশ্য, বিয়োগের পর আবার যোগ অর্থাৎ প্রকৃতি

হইতে মুক্ত হইয়া ভগবানে চিত্তসংযোগ, সুতরাং উহাতে কেবল আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি নয়, উহা আত্যন্তিক সুখেরও অবস্থা ('অত্যন্তং সুখমশ্নুতে', ৬।২১-২৮)। এই সুখ ভগবানে স্থিতিলাভ-জনিত('মৎসংস্থাং' ; ৬।১৫)। এইরূপ যোগী যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন—ধ্যানস্তিমিতনেত্রে তূষ্ণীভাবে অবস্থানই করুন বা সংসারী সাজিয়া ভগবানের কর্মই করুন, তিনি সর্বদা ভগবানেই অবস্থান করেন ('সর্বথা বর্তমানোঽপি' ইত্যাদি ৬।৩১।৪১ ও ২৪০-৪১ পৃঃ দ্রঃ)। এই হেতু যোগোপদেশ প্রসঙ্গে গীতায় সর্বত্রই এই কথা—মনঃ-সংযম করিয়া চিত্ত আমাতে সমাহিত কর, মচ্চিত্ত হও, মদ্ভক্ত হও, আমার ভক্ত যোগীই যুক্ততম—('মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তঃ' ইত্যাদি ৬।১৪, ৬।৪৭)। গীতার কর্ম, জ্ঞান, যোগ সকল মার্গেই ঈশ্বরবাদ জড়িত, সর্বত্রই ভগবান্—'আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে।'

৫। **ভক্তিতে ভগবৎ-শরণাগতি**। কর্মে নিষ্কামতা, ব্রহ্মভাব, সমত্ববুদ্ধি, সমাধিযোগ—এ সকল তত্ত্ব পূর্বে বিবৃত হইয়াছে। এ সকলেরই মূলকথা হইতেছে প্রকৃতি বা মায়ার হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া—মোক্ষলাভ বা ভগবানে স্থিতি লাভ করা। এই মায়া ত্যাগের উপায় সম্বন্ধে শাস্ত্র ও ধর্মোপদেষ্টৃগণ দুই রকম কথা বলেন। কেহ বলেন—মায়া হইতেছে অজ্ঞান ('অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ' ৫।১৫)। জ্ঞান ব্যতীত অজ্ঞান বা মায়া দূর হয় না, মোক্ষলাভও হয় না। মোক্ষ বিষয়ে জীবের আত্ম-স্বাতন্ত্র্য আছে, সে সদ্গুরুর আশ্রয়ে আত্মপ্রযত্নে বা আত্মসংস্থযোগ বা আত্মানাত্ম-বিবেক বিচার দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে। ইহাই জ্ঞানমার্গ। গীতায়ও অনেক স্থলে এই মার্গের উল্লেখ আছে ('উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং' ইত্যাদি ৬।৫-৬ ও ৫৩৯-৪০ পৃঃ দ্রঃ)। ইহা পুরুষকার-সাপেক্ষ। পুরুষকারের প্রতিমূর্তি, জ্ঞান-গুরু ভগবান্ বশিষ্ঠদেব সর্বত্রই এই মার্গেরই উপদেশ দিয়াছেন এবং ভক্তিমার্গে ভগবৎকৃপার উপর নির্ভর করা অজ্ঞানতার ফল, এই কথা বলিয়াছেন।

'যাবৎ প্রবোধো বিমলো নোদিতস্তাবদেব সঃ।
মৌর্খ্যাদ্দীনতয়া রাম ভক্ত্যা মোক্ষোঽভিবাঞ্ছ্যতে ॥'

—রাম, যাবৎ বিমল জ্ঞানের উদয় না হয়, সেই পর্যন্তই লোকে মূর্খতা-বশতঃ ভক্তিদ্বারা মোক্ষলাভের বাঞ্ছা করিয়া থাকে (যোঃ বাঃ)।

পক্ষান্তরে, ভক্তিমার্গ ও ভাগবতধর্মের উপদেষ্টা ভগবান্ ব্যাসদেব সর্বত্র ভক্তিরই প্রাধান্য দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, ভক্তিদ্বারাই ভগবৎকৃপায় জ্ঞান হয়, জ্ঞানেই মোক্ষ, সুতরাং ভক্তিই মোক্ষদায়িনী—'ভক্তির্জনিত্রী

জ্ঞানস্তু ভক্তির্মোক্ষপ্রদায়িনী (অধ্যাত্ম রামায়ণ, যুদ্ধ ৭, অপিচ, অরণ্য ১০)। গীতায়ও শ্রীভগবান্ স্পষ্টই বলিয়াছেন—আমার মায়া দুরত্যয়া, যে আমাকে আশ্রয় করে সে-ই মায়া অতিক্রম করিতে পারে (৭।১৪) এবং প্রিয় ভক্তকে শেষে এইরূপ 'সর্বগুহ্যতম' উপদেশ দিয়াছেন—তুমি সর্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণ লও, আমি তোমাকে সর্বপাপ হইতে মুক্ত করিব (১৮।৬৬)। ইহাই ভগবৎ-শরণাগতি—'আমি তোমারই, তুমি আমার একমাত্র গতি, প্রভো, রক্ষা কর'—এই ভাব অবলম্বন করিয়া একান্তভাবে আত্ম-সমর্পণ – ইহাই গীতার শেষ উপদেশ (৫৩৯-৪০ পৃঃ দ্রঃ)।

ভক্তিমার্গের আর একটি উচ্চতর ভাব হইতেছে 'তুমি আমার'। যেমন—ব্রজাঙ্গনা বলিতেছেন—

'হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াদ্ যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে ॥'

—'হে কৃষ্ণ, তুমি জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেলে, ইহাতে তোমার পৌরুষ কি ? যদি আমার হৃদয় ছাড়িয়া বলপূর্বক চলিয়া যাইতে পার, তবেই বুঝি তোমার পৌরুষ।'

এ বড় জোরের কথা। ইহাই প্রেমভক্তি—ব্রজের ভাব। এখানে 'রক্ষা কর' মুক্ত কর' ইত্যাদির কোন প্রসঙ্গই নাই, কেননা যিনি ভগবান্‌কে হৃদয়ে বসাইয়াছেন, 'মুক্তি তার দাসী'। এখানে কেবল বিশুদ্ধ প্রেম—কেবল রসাস্বাদন। এই রসের পরিপকাবস্থায় 'আমিই তুমি' এই ভাব উপস্থিত হয়। তখন কেবল 'আমি কৃষ্ণ, আমি কৃষ্ণ'—'কৃষ্ণোঽহং ইতি চাপরা' (বিষ্ণুপুরাণ ৫।১৩ ; ভাগবত ১০।৩০।১৪)। ইহাই ভক্তিশাস্ত্রের অধিরূঢ় ভাব, বেদান্তের সোঽহং জ্ঞান, পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলন। এই স্থলে বেদান্ত ও ভাগবত এক হইয়া গেলেন। এই হেতুই বলা হইয়াছে, ভাগবত বেদান্তের ভাষ্যস্বরূপ ('অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং'—গারুড়ে ; 'ব্রহ্মসূত্রাণামকৃত্রিম ভাষ্যভূত ইত্যর্থঃ'—তত্ত্বসন্দর্ভ)।

৬। **নীতিতে আত্মৌপম্যদৃষ্টি—সাম্যবুদ্ধি।** 'নীতি' শব্দে বুঝায় কর্তব্যাকর্তব্য-নির্ণায়ক সূত্র বা বিধি-নিয়ম। আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে 'ধর্ম' শব্দই এই অর্থে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় এবং কর্তব্যাকর্তব্য-নির্ণায়ক শাস্ত্রকেই 'ধর্মশাস্ত্র' বলা হয়। ধর্মের দুই দিক্—একটি বহির্মুখ বা ব্যবহারিক ধর্ম, অপরটি অন্তর্মুখ বা মোক্ষধর্ম। পারিবারিক, সামাজিক বা জাগতিক সম্পর্কে অপরের সহিত যেরূপ ব্যবহার কর্তব্য, তাহারই নাম লৌকিক বা ব্যবহারিক ধর্ম ; পাশ্চাত্যগণ ইহাকেই 'নীতি' (Morality) বলেন। আর

পরমেশ্বরের জ্ঞান বা সাক্ষাৎকার লাভার্থ যে সকল বিশিষ্ট সাধন-প্রণালী নির্দিষ্ট আছে তাহারই নাম মোক্ষধর্ম; পাশ্চাত্ত্যগণ ইহাকে ধর্ম বা Religion বলেন। আমাদের নীতিশাস্ত্র বা ধর্মশাস্ত্রের বিধি-ব্যবস্থা সকলই মোক্ষানুকূল; এই হেতু প্রাচীন শাস্ত্রে 'নীতি' ও 'ধর্মে' বিশেষ কোন পার্থক্য করা হয় নাই। কিন্তু পাশ্চাত্ত্যগণের নীতি-তত্ত্বের ভিত্তি আধিভৌতিক, উহা আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এই হেতু তাহারা নীতি-তত্ত্বকে (Morality) মোক্ষতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব (Religion) হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া ফেলিতেছেন। এক্ষণে দ্রষ্টব্য এই, আমাদের শাস্ত্রে এবং গীতাতে নীতির মূলভিত্তি কি?—উহা হইতেছে সর্বভূতাত্মৈক্য-জ্ঞান। পূর্বে বলা হইয়াছে—'আমাতে ও সর্বভূতে একই আত্মা—সর্বত্রই ভগবান্'—এই জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান, উহাতেই মোক্ষ, এই জ্ঞানলাভ হইলে সর্বত্র সমত্ব-বুদ্ধি জন্মে; তখনই জীব বুঝিতে পারে, আমার যাহাতে সুখ অপরের তাহাতে সুখ, আমার যাহাতে দুঃখ অপরের তাহাতে দুঃখ। ইহাই আত্মৌপম্য-দৃষ্টি। এইরূপ বিশুদ্ধ সাম্যবুদ্ধি লাভ করিলে তাহাকে আর পৃথক্ পৃথক্ উপদেশ দিতে হয় না—'পরের দ্রব্য চুরি করিও না', 'অপরকে হিংসা করিও না', 'প্রতিবেশীকেও আপনার মত ভালবাসিবে' ইত্যাদি। কেননা, তখন আপন ও পর উভয়ের সমাবেশ ভগবানে, তাই গীতার উপদেশ—এই আত্মৌপম্য-দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া সকলের সহিত ব্যবহার করিবে (৬।২৯-৩১ শ্লোক এবং উহাদের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। কেবল গীতাতেই নয়, উপনিষদে, মহাভারতে, মন্বাদি শাস্ত্রে এই নীতিই পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে—

'ন তৎ পরস্য সন্দধ্যাৎ প্রতিকূলং যদাত্মনঃ।
এষ সংক্ষেপতো ধর্মঃ কামাদন্যঃ প্রবর্ততে ॥'

—'আপনার যাহা প্রতিকূল বা দুঃখজনক বলিয়া বোধ কর অন্য লোকের সহিত সেরূপ ব্যবহার করিবে না, ইহাই সমস্ত ধর্মের সার, অন্য যাহা কিছু কামনা-প্রসূত।' (মভাঃ অনু ১১৩।৮; অপিচ অনু ১১৩।১০।৬, উদ্যোঃ ৩৮।৭২, শাং ১৬৭।৯; বৃহঃ ২।৪।১৪, ঈশ ৬, মনু ১২।৯১।১২৫)।

পাশ্চাত্ত্য নীতি-শাস্ত্রে (Ethics) নীতি-তত্ত্ব বিষয়ে প্রধানতঃ দুই মত। সদসদ্‌বিবেকবাদ (Conscience বা Intuition Theory); এই নীতি সার্বজনীন হইতে পারে না, কেননা সকলের বিবেক বা ধর্মবুদ্ধি এক রূপ হয় না। (৫১৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। অপর মত হইতেছে, হিতবাদ বা অধিকতম লোকের অধিকতম সুখ (Utility, the greatest good of the greatest

number)। এই নীতির এক প্রধান দোষ এই যে, ইহাতে কর্তার বুদ্ধির কোন বিচারই হয় না, কেবল কর্মের বাহ্যফল দেখিয়া নীতির বিচার করিতে হয়। কিন্তু গীতা বলেন, কর্মের বাহ্যফল অপেক্ষা কর্তার বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং তাহাই নীতি-বিচারের কষ্টিপাথর (৬২ পৃঃ ও ৫১১ পৃঃ দ্রঃ)। কাণ্ট্, গ্রীন, জয়সন প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য নীতি-তত্ত্ববিদ্‌গণও এ বিষয়ে গীতার মতেরই অনুবর্তন করিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য হিতবাদের আর একটি ত্রুটি এই যে, অধিক লোকের অধিক সুখের জন্য আমি চেষ্টা করিব, স্বার্থ অপেক্ষা পরার্থ শ্রেষ্ঠ কেন—হিতবাদী ইহার কোন উত্তর দিতে পারেন না ; সে উত্তর দিয়াছেন আমাদের বেদান্ত ও গীতা ; কারণ, 'তৎ ত্বম্ অসি'—তুমি তাহাই (২২৬-২৭ পৃঃ দ্রঃ)। সুতরাং সর্বভূতে একই বস্তু, এই জ্ঞানলাভ করিয়া আত্মৌপম্য-দৃষ্টিতে সবভূতহিতে রত হও, ইহাই গীতার উপদেশ।

৭। **উপাসনা—ভগবৎকর্ম, জীব-সেবা, স্বধর্ম পালন।** উপাসনাই ভক্তিমার্গের প্রাণ। গীতার উপদিষ্ট উপাসনা কি ?—ভগবৎকর্ম ('মৎকর্মকৃৎ' 'মৎকর্মপরমো ভব' ১১।৫৫, ১২।১০)। 'ভগবৎকর্ম' বলিতে বুঝায় ভগবানের কর্ম বা ভগবানের উদ্দেশে কৃত কর্ম। সে কর্ম কি ?—ভগবৎস্বরূপ যিনি যে ভাবে গ্রহণ করেন, ভগবৎকর্মও তাঁহার সেইরূপই হয়। সাকার উপাসক যোড়শোপচারে প্রতিমা পূজা করেন। গ্রীষ্মে ব্যজন, শীতে পশমী বস্ত্রদ্বারা শ্রীমূর্তি আবরণ করেন। তিনি মনে করেন উহাই ভগবৎকর্ম ; অবশ্য, যিনি শীত-গ্রীষ্মের জন্মদাতা, যাঁহার শাসনে চন্দ্রসূর্য, বায়ু-বরুণাদি অহর্নিশ স্ব-স্ব কার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে—তিনি যে শীত-গ্রীষ্মে কষ্ট পান, ইহা কল্পনামাত্র। তবে ভাবগ্রাহী জনার্দন ভাবের কাঙ্গাল, দ্রব্যের নহেন, তাই তিনি ভক্তের ভক্তিভাবটুকুই গ্রহণ করিয়া প্রীত হন। কিন্তু এ উপাসনায় একটি আশঙ্কা আছে। মূর্তিতে ভগবান্ আছেন, ইহা ঠিক, কিন্তু এই 'ধারণা অজ্ঞের নিকট হইয়া উঠে, মূর্তিই বাস্তব ভগবান্—'অজ্ঞা যজন্তি বিশ্বেশং পাষাণাদিষু সর্বদা' (বৃহঃ নাঃ পুঃ)। ভগবান্ কেবল মূর্তিতে নন, ভগবান্ সর্বভূতে। সুতরাং সর্বভূতের ভজনাই ঈশ্বরের উপাসনা। জ্ঞানীর পক্ষে উহাই ভগবৎকর্ম ('সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ', ইত্যাদি ৬।৩১ ও ২২৩ পৃঃ)। এই হেতু ভাগবতশাস্ত্রে মূর্তিপূজা অপেক্ষা জীবসেবার অধিক প্রশংসা। শ্রীভাগবত বলেন—যে সর্বভূতে অবস্থিত নারায়ণকে উপেক্ষা করিয়া প্রতিমাতে নারায়ণের অর্চনা করে, সে ভস্মে ঘৃতাহুতি দেয় ('মৌঢ্যাদ্‌ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ' ২২৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। তবে কি প্রতিমা পূজার প্রয়োজন নাই ? না ঠিক তাহাও নয়।

যে পর্যন্ত সর্বভূতে নারায়ণ-জ্ঞান না হয়, সে পর্যন্ত উহার প্রয়োজন আছে, কিন্তু উহাই চরম উদ্দেশ্য নয়, উহা চরমে পৌছিবার উপায় মাত্র।

'অর্চাদাবর্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্বভূতেষবস্থিতম্ ॥'

'যে ব্যক্তি স্বকর্মে নিরত সে যত দিন আপনার হৃদয়ে সর্বভূতস্থিত ঈশ্বরকে জানিতে না পারে তত দিন প্রতিমাদিতে ঈশ্বরকে অর্চনা করিবে' (ভাঃ ৩।২৯।২০)।

সুতরাং জীবসেবাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা, নিষ্কামভাবে যথাপ্রাপ্ত স্বধর্মপালন, সর্বভূতেরই ভজনা, কেননা উহার প্রেরণা লোকসংগ্রহ (৩।২৫), স্বার্থাভিসন্ধি নহে। উহা প্রকৃতপক্ষে ভগবানের কর্ম, নিজের কর্ম মনে করাটাই অজ্ঞানতা। কেননা যদি সকলেই স্বকর্ম বা স্বধর্মপালনে বিরত হয়, তাহা হইলে বিশ্বলীলা লোপ পায়; বস্তুতঃ প্রত্যেক জীবেরই স্বকর্ম বিশ্বময়ের বিশ্বকর্ম এবং উহাই তাঁহার উপাসনা, উহাতেই সিদ্ধি ('স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ' ১৮।৪৬), কিন্তু এই জ্ঞান চাই যে উহা ভগবানের কর্ম, আমার কর্ম নহে (৩৮৪-৮৫ পৃঃ দ্রঃ)।

৮। **সাধনা—ত্যাগানুশীলন**। উপাসনা ভক্তিমার্গের সাধনা, শ্রবণ-মননাদি জ্ঞানমার্গের সাধনা, প্রাণায়ামাদি যোগমার্গের সাধনা; ত্যাগ সকল মার্গেরই সাধনা। ত্যাগ ব্যতীত জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্ম—কোন পথেই সিদ্ধিলাভ হয় না। কেননা ত্যাগ সকল সাধনার মূল। এই হেতু গীতায় সর্বত্রই ত্যাগানুশীলনের উপদেশ, কিন্তু গীতায় ত্যাগ অর্থ কর্মত্যাগ বা সন্ন্যাসমার্গ নহে, গীতোক্ত ত্যাগ কামনা-ত্যাগ, কর্মফলত্যাগ (১৮।১১ শ্লোক ও ৫২৮ পৃঃ)। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বর্ণনায় আদ্যোপান্ত কামনা-ত্যাগের কথা (২।৫৫-৭১)। কর্মযোগে ফলত্যাগই মুখ্য কথা, সুতরাং কর্মযোগপ্রসঙ্গে সর্বত্রই সেই উপদেশ। দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিযোগের বর্ণনা-প্রসঙ্গেও পূজার্চনা-ধ্যানাদি অপেক্ষা কর্মফলত্যাগেরই শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে (১২।১১-১২) এবং উহার পরেই ভগবদ্ভক্তের যে সকল লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, ত্যাগই তাহার মূলকথা; ইহাকেই 'ধর্মামৃত' বলা হইয়াছে (১২।১৩-২০)। আবার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জ্ঞানের সাধনা বা জ্ঞানীর যে লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, তাহারও মূল কথা ত্যাগ (১৩।৭-১১)। বস্তুতঃ কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি, যোগ সকল মার্গেই ত্যাগেরই শ্রেষ্ঠতা এবং গীতোক্ত পূর্ণাঙ্গ যোগধর্মে এ সকলেরই সমন্বয়; সুতরাং গীতার সাধনতত্ত্বের মূলসূত্র ত্যাগ।

গীতার প্রকৃত মর্ম কি ? এ কথার উত্তরে পরমহংসদেব বলিয়াছেন—'গীতা' শব্দটি তিন চারি বার উচ্চারণ করিলেই উহা পাওয়া যায় অর্থাৎ 'গীতা' 'গীতা' বার বার বলিতে বলিতে বর্ণ-বিপর্যয়ে উহার বিপরীত 'তাগী বা ত্যাগী' শব্দ উচ্চারিত হয়। উহাই গীতার সার-মর্ম। কেমন সুন্দর সরল ভাষায় সারগর্ভ মর্মস্পর্শী উপদেশ !

গীতার টীকা-ভাষ্য

(১) সাম্প্রদায়িক টীকা-ভাষ্য

সনাতন ধর্ম-সাহিত্যে শ্রীগীতা যে সর্বমান্য গ্রন্থ, তাহার আর একটি প্রমাণ—ইহার অসংখ্য টীকা-ভাষ্য। বিগত সহস্র বৎসর যাবৎ এ দেশে যত বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে, তাঁহাদের সকলেই নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক মতের পরিপোষণার্থ শ্রীগীতার টীকা-ভাষ্য প্রণয়ন করা আবশ্যক বোধ করিয়াছেন, কেননা শ্রীগীতার (এবং উপনিষৎ ও বেদান্ত দর্শনের) অনুকূল না হইলে কোন ধর্ম এ দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। এই তিন শাস্ত্র সনাতন-ধর্মের স্তম্ভ বা ভিত্তিস্বরূপ, এই হেতু উহাদিগকে **প্রস্থানত্রয়ী** বলে। অতি-আধুনিক কালেও শ্রীগীতার নব নব টীকা-ভাষ্য বাহির হইতেছে। মহাত্মা গান্ধীর অহিংসাবাদের সহিত-সকলে পরিচিত আছেন। তাঁহার মতে যুদ্ধাদি হিংসাত্মক কর্ম কোন অবস্থাতেই কর্তব্য নহে। গীতোক্ত ধর্মের সহিত এই গান্ধীবাদের বা অহিংসানীতির (Pacifism) আপাত-বিরোধ দৃষ্ট হয়, কেননা শ্রীগীতায় তত্ত্বকথার মধ্যে মধ্যে যুদ্ধ-প্রেরণাও আছে। এই বিরোধ খণ্ডনের জন্যই সম্প্রতি শ্রীগীতার গান্ধী-ভাষ্য প্রকাশিত হইয়াছে, কারণ শ্রীগীতার বিরুদ্ধ মত এ দেশে সর্বাদৃত হইবার সম্ভাবনা কম (ভূঃ ৪৩-৪৫ পৃঃ দ্রঃ)।

জীব, জগৎ, ব্রহ্ম—এই তিনের পরস্পর সম্বন্ধ কি, এ বিষয়ে নানারূপ বিভিন্ন দার্শনিক মত প্রচলিত আছে। যথা—অদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ, বিবর্তবাদ, পরিণামবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ইত্যাদি। আবার সাধন-প্রণালী সম্বন্ধেও জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, রাজযোগ ইত্যাদি বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে এবং তদনুযায়ী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। শ্রীগীতা সর্বমান্য, সুতরাং প্রত্যেক সম্প্রদায়ই টীকা-ভাষ্য রচনা করিয়া ইহা সপ্রমাণ করিতে আগ্রহশীল যে, শ্রীগীতায় সেই সম্প্রদায়ের স্বীকৃত মতই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহা করিতে হইলেই অনেক স্থলে শব্দার্থের ও ব্যাকরণের অনেক প্রকার 'টানাবুনা' ও মারপ্যাচ করিতে হয়। সেকালের

সাম্প্রদায়িক ধর্মাচার্যগণ ইহা দোষাবহ মনে করেন নাই। এ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—

'আমরা দেখিতে পাই অদ্বৈতবাদী যে শ্লোকগুলিতে বিশেষভাবে অদ্বৈত বাদের শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে সেগুলি যথাযথ রাখিয়া দিতেছেন, কিন্তু যে শ্লোকগুলিতে দ্বৈতবাদ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের উপদেশ সেইগুলি টানিয়া অদ্বৈত অর্থ করিতেছেন। আবার দ্বৈতবাদী আচার্যগণ দ্বৈত শ্লোকগুলির যথাযথ অর্থ করিয়া অদ্বৈত শ্লোকগুলিও টানিয়া দ্বৈত অর্থ করিতেছেন। শঙ্করাচার্যের ন্যায় বড় বড় ভাষ্যকারেরা পর্যন্ত নিজ নিজ মত-পোষকতার জন্য স্থলে স্থলে শাস্ত্রের এরূপ অর্থ করিয়াছেন যাহা আমার সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। অবশ্য ইঁহারা মহাপুরুষ, আমাদের গুরুপদবাচ্য। তবে ইহাও কথিত হইয়াছে যে, 'দোষা বাচ্যা গুরোরপি।'—গুরুরও দোষ বলা উচিত।

'আমাদের পণ্ডিতদিগের মধ্যে এই ধারণা দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে একটি মাত্র সত্য হইতে পারে, আর সমস্তই মিথ্যা। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, উহারা পরস্পর পরস্পরের বিরোধী নহে। আমাদের শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই। অধিকারভেদের অপূর্ব রহস্য বুঝিলে উহা তোমাদের নিকট অতি সহজ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। এই বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক কলহ-দ্বন্দ্বের ভিতর এমন এক জনের অভ্যুদয় হইল যিনি ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সামঞ্জস্য রহিয়াছে, সেই সামঞ্জস্য কার্যে পরিণত করিয়া নিজ জীবনে দেখাইয়াছিলেন। আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলিতেছি।'

শ্রীগীতার এই সকল সাম্প্রদায়িক বিকৃত ব্যাখ্যায় ব্যথিত হইয়া প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্র-টীকাকার বামন পণ্ডিত এইরূপ লিখিয়াছেন—

"হে ভগবান্, এই কলিযুগে যে যে গীতার্থ যোজিত হইয়াছে তাহা নিজ নিজ মতানুরূপ। কোন কারণে কোন লোক গীতার্থের অন্যথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ঐ বড় লোকদের কাজ আমার ভাল লাগে না, কি করিব ভগবান্।"

শ্রীগীতার যে সকল প্রাচীন টীকা-ভাষ্য এক্ষণে পাওয়া যায়, সে সকলের মধ্যে শাঙ্কর-ভাষ্যই প্রাচীনতম। শঙ্করের পূর্বেও অবশ্য গীতার অনেক ভাষ্য রচিত হইয়াছিল, একথা শাঙ্কর-ভাষ্য হইতে জানা যায়। শ্রীমৎ **শঙ্করাচার্যের** আবির্ভাব-কাল নিশ্চিতরূপে নির্ধারিত করা যায় না, খুব সম্ভবতঃ তিনি খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের শেষপাদ ও নবম শতকের প্রথমপাদে বিদ্যমান ছিলেন (খ্রীঃ ৭৮৮-৮২০)। এই সময়ে এই অদ্বিতীয় তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষের

আবির্ভাব না হইলে হিন্দুর বেদোপনিষদের কি হইত বলা দুষ্কর। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে সনাতনধর্মের অতি শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছিল। তিনিই উহার গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি সমস্ত প্রাচীন উপনিষৎ, বেদান্তদর্শন ও শ্রীগীতার টীকা-ভাষ্য প্রণয়ন করেন, আসমুদ্রহিমাচল সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়া ধর্মপ্রচার করেন এবং ভারতের চতুঃসীমায় চারিটি মঠ স্থাপন করিয়া সনাতন ধর্মের ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়েরই উদ্দিষ্ট বিষয় দুইটি—তত্ত্ব-নির্দেশ আর সাধন-নির্দেশ। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে নির্গুণ ব্রহ্মবাদ, অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ এবং সাধন-পথে সন্ন্যাস ও জ্ঞানমার্গ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই মতের পরিপোষণার্থই তাঁহার সমস্ত টীকা-ভাষ্য রচিত হইয়াছে। এই মতানুসারে জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় হয় না এবং ভক্তিরও ইহাতে বিশেষ উপযোগিতা নাই। কিন্তু শ্রীগীতায় জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি সমভাবেই উপদিষ্ট হইয়াছে, কাজেই কর্ম ও ভক্তির গৌণত্ব এবং সন্ন্যাস ও জ্ঞানের প্রাধান্য স্থাপনার্থ তাঁহাকে অনেক বিচার-বিতর্কের অবতারণা করিতে হইয়াছে। এই সকল গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায় যে অপূর্ব মনীষার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে বিস্ময় জন্মে, কিন্তু সকল স্থলে সংশয়ের নিরসন হয় না। আবশ্যকবোধে এই পুস্তকে কোন কোন স্থলে এই সকল আলোচনার সারমর্ম সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইয়াছে।

গীতা-বেদান্তাদি শাস্ত্রের আলোচনায় এক কালে শাঙ্কর-ভাষ্যের অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। পরবর্তী কালে **আনন্দগিরি** (১৩শ শতক, টীকা), শ্রীমৎ **মধুসূদন সরস্বতী** ('গূঢ়ার্থদীপিকা', ষোড়শ শতক) প্রভৃতি অনেক শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক এই মত অবলম্বন করিয়াই গীতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আধুনিক কালে শ্রীমৎ **কৃষ্ণানন্দ স্বামী** প্রভৃতি অনেকেই এই মতানুসরণেই গীতার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্বনামখ্যাত অধ্যাপক **মোক্ষমূলর** (Maxmuller) কর্তৃক প্রকাশিত 'প্রাচ্য ধর্মগ্রন্থমালায়' যে ভগবদ্গীতার অনুবাদ আছে, তাহাতেও প্রধানতঃ শাঙ্কর-ভাষ্যেরই অনুসরণ করা হইয়াছে।

কিন্তু অতি প্রাচীন কালেই শাঙ্কর-মায়াবাদের প্রতিবাদও প্রচারিত হইয়াছিল। কথিত আছে, দ্রাবিড়-ভূমিতে **নাথমুনি** বা **শ্রীরঙ্গনাথাচার্য** শাঙ্কর-অদ্বৈতবাদের প্রতিবাদ করিয়া স্বীয় মত প্রচার করেন এবং শ্রী-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পৌত্র **শ্রীযামুনাচার্য** এই মতাবলম্বনেই গীতার ভাষ্য প্রণয়ন করেন ('গীতার্থসংগ্রহঃ', একাদশ শতক)। তাঁহার পরবর্তী **শ্রীরামানুজাচার্যই** শ্রী-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা (একাদশ শতক)।

এই সম্প্রদায়ের দার্শনিক মত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও সাধনপথ বাসুদেব-ভক্তি (৩৫ পৃঃ)। এই মতের পরিপোষণার্থই তিনি ব্রহ্মসূত্র ও গীতার ভাষ্য এবং 'বেদার্থসংগ্রহঃ' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ইহার পর দ্বাদশ শতকে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। শ্রীনিম্বার্ক (১১০০-১১৬২) অন্ধ্র ব্রাহ্মণ, তিনি তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে ভেদাভেদবাদ এবং সাধনমার্গে রাধাকৃষ্ণ-ভক্তি প্রচার করেন। এই মতের পরিপোষণার্থ **শ্রীনিম্বার্কাচার্য** বেদান্ত সম্বন্ধে একখানি ভাষ্য রচনা করেন এবং এই সম্প্রদায়ের কেশব কাশ্মীরী ভট্টাচার্য গীতার টীকা প্রণয়ন করেন ('তত্ত্ব-প্রকাশিকা')। শ্রীনিম্বার্ক স্বয়ং বৃন্দাবনবাসী হন এবং তাঁহার মত উত্তর ভারতে, মথুরা অঞ্চলে এবং বাংলা দেশে অনেকটা প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

অতঃপর ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে কর্ণাটভূমিতে মাধ্ব-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। **শ্রীমধ্বাচার্য** (**আনন্দতীর্থ**) (১১৯৯-১২৭৬ খ্রীঃ) এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। তিনি শুদ্ধ দ্বৈতবাদী, তাঁহার মতে ভক্তিই চরম নিষ্ঠা। তিনি শাঙ্কর-মতের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি প্রস্থানত্রয়ীর (উপনিষদ, বেদান্ত ও গীতা) ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, এই সকল গ্রন্থ দ্বৈতবাদের প্রতিপাদক। 'গীতাভাষ্য' ও 'গীতাতাৎপর্য' নামক গ্রন্থে তিনি গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই সময়ে মহারাষ্ট্রে ভক্ত-কবি জ্ঞানদেব বা জ্ঞানেশ্বর (১২৭৫-৯৬ খ্রীঃ) ষোড়শ বর্ষ বয়সে **'জ্ঞানেশ্বরী'** নামক ৯ হাজার শ্লোক-সম্বলিত গীতার পদ্য ব্যাখ্যা মারাঠী ভাষায় প্রণয়ন করেন; ইহা মারাঠীদের নিত্যপাঠ্য আরাধ্য গ্রন্থ। ইহাতে বিশেষভাবে ভক্তিমার্গেরই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, যদিও অদ্বৈতবাদও স্বীকৃত হইয়াছে।

স্বনামখ্যাত টীকাকার **শ্রীধর স্বামীও** ('সুবোধিনী', ১৪শ শতক) এই মতাবলম্বী। তিনি তত্ত্বদৃষ্টিতে অদ্বৈতবাদ স্বীকার করিয়াও সাধনপথে ভক্তিরই প্রাধান্য দিয়াছেন। তাঁহার মতে একান্ত ভক্তিযোগে শ্রীভগবানের শরণ লইলেই তাঁহার প্রসাদে আত্মবোধ জন্মে এবং মোক্ষলাভ হয়, ইহাই গীতার তাৎপর্য। শ্রীগীতায় ৮।২২, ১০।১০, ১৮।৫৪-৫৫ প্রভৃতি শ্লোকের অর্থ বিচার করিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভক্তিই মোক্ষহেতু।

'ভগবদ্ভক্তিযুক্তস্য তৎপ্রসাদাত্মবোধতঃ।
সুখং বন্ধবিমুক্তিঃ স্যাদিতি গীতার্থসংগ্রহঃ॥'
'তস্মাৎ ভগবদ্ভক্তিরেব মোক্ষহেতুরিতি সিদ্ধং'। —(সুবোধিনী)

ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগে অন্ধ্রদেশে **শ্রীবল্লভাচার্য** (১৪৭৮-১৫৩০) রাধাকৃষ্ণ-ভক্তিপর বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন। এই সম্প্রদায়ের মত এই যে মায়াবদ্ধ জীবের মোক্ষলাভ ঈশ্বরানুগ্রহ ব্যতীত হইতে পারে না এবং ঈশ্বরের এই অনুগ্রহকে **পুষ্টি** বা পোষণ বলা হয়; এই হেতু এই সাম্প্রদায়িক মতকে **পুষ্টিমার্গ** বলে। এই সম্প্রদায়ের 'তত্ত্বদীপিকাদি' ভাষ্যগ্রন্থে শ্রীগীতার ১৮।৬৫-৬৬ প্রভৃতি শ্লোকের উল্লেখ করিয়া ইহাই প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, শ্রীগীতায় জ্ঞান ও কর্মের উল্লেখ থাকিলেও শেষাংশে পুষ্টিমার্গীয় ভক্তিরই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে এবং ইহাই গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়।

এই সময়েই বাংলা দেশে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব-প্রবর্তিত (১৪৮৬-১৫৩৪) গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রভাবে বৈষ্ণব-ধর্মে ও বৈষ্ণব-সাহিত্যে এক নূতন যুগের উদ্ভব হয়। জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধ বিষয়ে এই সম্প্রদায়ের যে দার্শনিক মত, তাহাকে বলা হয় **অচিন্ত্য-ভেদাভেদ** (৪৫৪ পৃঃ দ্রঃ)। এই সম্প্রদায়ের সাধনমার্গ সুপরিচিত, এ বিষয়ে বিস্তারিত অন্যত্র উল্লেখ করা হইয়াছে (ভূঃ দ্রঃ)। শ্রীমদ্ **বিশ্বনাথ চক্রবর্তী** (১৭-১৮শ শতক, 'সারার্থবর্ষিণী') এবং শ্রীমদ্ **বলদেব বিদ্যাভূষণ** (১৮শ শতক, 'গীতাভূষণ-ভাষ্য') এই সম্প্রদায়ের মতানুযায়ী গীতা-ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই সম্প্রদায়ও শঙ্করমতের বিরোধী।

এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে পূর্বোক্ত বিভিন্ন টীকা-ভাষ্যকারগণের মতের উল্লেখ আছে এবং আবশ্যক স্থলে সংক্ষিপ্ত আলোচনাও আছে। শঙ্কর, রামানুজ, শ্রীধর প্রভৃতি প্রাচীন গীতাচার্যগণের টীকা-ভাষ্যাদির সংক্ষিপ্ত সার-সঙ্কলন সহ ৺রামদয়াল মজুমদার-কর্তৃক সম্পাদিত একখানি বৃহৎ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ব্যাখ্যা-বিবৃতিতে প্রধানতঃ শাঙ্কর-ভাষ্যেরই অনুবর্তন করা হইয়াছে, তবে বিভিন্ন শাস্ত্র-সমন্বয়ের প্রয়াসও আছে। ৺দামোদর মুখোপাধ্যায়-সঙ্কলিত এইরূপ একখানি বৃহৎ সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

কয়েক বৎসর হইল **মহাত্মা গান্ধী** 'অনাসক্তি যোগ' নাম দিয়া গুজরাতী ভাষায় ভাষ্য ও অনুবাদ সহ শ্রীগীতার একখানি সংস্করণ প্রকাশিত করেন; শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত উহার বাংলা অনুবাদ স্বলিখিত উপক্রমণিকা সহ **'গান্ধী-ভাষ্য'** নামে প্রকাশিত করিয়াছেন। গান্ধীজীর মতে শ্রীগীতায় যে যুদ্ধের প্রেরণা আছে উহা ভৌতিক যুদ্ধ নহে, নৈতিক যুদ্ধ, উহা রূপকের ভাষা। তিনি লিখিয়াছেন—'ইহা ঐতিহাসিক গ্রন্থ নহে, পরন্তু রূপকের ভিতর দিয়া প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ের ভিতর যে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ নিরন্তর চলিতেছে,

ইহাতে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।' দাশগুপ্ত মহাশয় এই রূপকটি এই ভাবে বিশদ করিয়াছেন—"দেহ রথ, রথী অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণ সারথি, ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব ও লাগাম মন। রথ যে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাই কুরুক্ষেত্ররূপ হৃদয়ক্ষেত্র। দৈবী ও আসুরী, হৃদয়স্থ এই দুই বৃত্তি দুই পক্ষ। এই যুদ্ধ নিয়তই মানুষের হৃদয়ক্ষেত্রে চলিতেছে। সেই যুদ্ধে যাহাতে দৈবী পক্ষই জয়ী হয়, তজ্জন্য ভগবান্ সারথি বেশে অনুভবসিদ্ধ জ্ঞান অজ্ঞ-দেহী অর্জুনকে দিয়াছেন।"

অন্তর্যুদ্ধের এইরূপ রূপক বর্ণনা মহাভারত, কঠোপনিষৎ এবং অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থেও আছে। শ্রীগীতাতেও এই তত্ত্বটির উল্লেখ আছে এবং তথায়ও যুদ্ধের ভাষাই ব্যবহৃত হইয়াছে। তথায় শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—"কামনা বাসনাই জীবের প্রবল শত্রু; উহাই সর্ববিধ পাপের মূল, তুমি এই কামরূপ দুর্জয় শত্রুকে সংহার কর ('জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্')।" কিরূপে সংহার করিতে হইবে তাহাও বলিয়াছেন। (গী ৩।৩৬-৪৩)।

সাধারণভাবে কেহ যদি বলেন যে, ইহাই গীতার সারকথা, মূল তাৎপর্য, তাহা অসঙ্গত হয় না। কিন্তু গীতার আদ্যোপান্ত নানা তত্ত্বালোচনার মধ্যে মধ্যে 'যুদ্ধ কর', 'যুদ্ধ কর' এইরূপ প্রেরণা আছে। সে সকলের দ্বারা যে এই অন্তর্যুদ্ধের প্রতিই লক্ষ্য করা হইয়াছে, ইহা বড়ই কষ্টকল্পনা বলিয়া বোধ হয়।

তবে ইহা মনে রাখা উচিত যে, যুদ্ধপ্রেরণাই গীতার মূলকথা নহে। কর্ম-তত্ত্বের আলোচনাপ্রসঙ্গেই উহা উল্লিখিত হইয়াছে। অর্জুন স্বজনাদিবধ পাপজনক মনে করিয়া যুদ্ধে বিরত হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রবোধার্থই গীতার অপূর্ব অধ্যাত্মতত্ত্বপূর্ণ কর্মোপদেশ এবং এই হেতুই উহার মধ্যে যুদ্ধপ্রেরণার কথা আসিয়াছে। **অহিংসানীতি** গীতারও মান্য, তবে গীতা বলেন, অহিংস হইয়াও যুদ্ধ করা চলে, স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়াও যুদ্ধ করা চলে, কেননা হিংসা অহিংসা বুদ্ধিতে, কর্মে নহে (১১।৫৫ ব্যাখ্যা দ্রঃ)। ফলত্যাগী, কর্তৃত্বাভিমানশূন্য, সমত্ববুদ্ধিযুক্ত কর্মযোগীর কর্মে পাপ স্পর্শে না, উহার ফল যাহাই হউক (গী ২।৪৯-৫১ ও ১৮।১৭ প্রভৃতি দ্রঃ)। কিন্তু মহাত্মাজী বলেন, 'ভৌতিক যুদ্ধের সহিত স্থিতপ্রজ্ঞের সম্বন্ধ থাকিতে পারে না।' এই স্থলেই মহাত্মাজীর অহিংসাবাদ [যাহাকে গান্ধীবাদ (Gandhism) বলা হয়, ২১৭ পৃঃ] এবং গীতোক্ত অহিংস যুদ্ধবাদে পার্থক্য। এ প্রসঙ্গে মহাত্মাজী লিখিয়াছেন,—'ভৌতিক যুদ্ধ সম্পূর্ণ কর্মফলত্যাগী দ্বারাও হইতে পারে, এ কথা গীতাকারের ভাষায় অক্ষরে অক্ষরে মানে করিলেও করা যায়। কিন্তু গীতার

শিক্ষা ব্যবহারে আনিবার জন্য প্রায় ৪০ বৎসর পর্যন্ত সতত প্রযত্ন করিবার পর নম্রতাপূর্বক আমাকে একথা বলিতে হইবে যে, সত্য ও অহিংসা পালন না করিলে সম্পূর্ণ কর্মফলত্যাগ মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব।' এ কথা সকলের শিরোধার্য। কিন্তু অহিংসাটা কর্মে না বুদ্ধিতে এ বিষয়ে মতভেদের অবকাশ আছে (৬৯।৭০ ও ৩৮৮ পৃঃ দ্রঃ)।

(২) অসাম্প্রদায়িক টীকা-ভাষ্য

পূর্বে শঙ্কর-রামানুজাদি যে সকল টীকা-ভাষ্যকারগণের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহারা অনেকেই সম্প্রদায়-প্রবর্তক এবং সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি অবলম্বন করিয়াই গীতার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতেও গীতার আলোচনা পূর্বাবধিই চলিতেছে। বর্তমান কালে **বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়** (গীতা সমন্বয়ভাষ্য), **লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক** (গীতারহস্য), বেদান্তরত্ন **হীরেন্দ্রনাথ দত্ত** (গীতায় ঈশ্বরবাদ), **অরবিন্দ ঘোষ** (Essays on the Gitā) প্রমুখ অনেকে অসাম্প্রদায়িক ভাবেই গীতার আলোচনা করিয়াছেন।

লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলকের মতে গীতায় যে বিশিষ্ট যোগধর্ম-উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা জ্ঞান-ভক্তিমিশ্র **কর্মযোগ**। তিনি শঙ্করাদি প্রাচীন বৈদান্তিক গীতাচার্যগণের সন্ন্যাসবাদাত্মক ব্যাখ্যার নানারূপ অসঙ্গতি প্রদর্শন করিয়াছেন এবং উহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে তিনি অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদও স্বীকার করেন, তবে মায়াতত্ত্বের একটু বিশিষ্ট অর্থ করেন (২৭৬ পৃঃ)।

শ্রীঅরবিন্দের মতে গীতোক্ত যোগে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি এ তিনেরই সমন্বয় আছে এবং উহাই পূর্ণাঙ্গ যোগ। তাঁহার মতে কেবল নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব ও মায়া-মিথ্যাত্ববাদ গ্রহণ করিলে গীতার সরল ব্যাখ্যা করা যায় না, কেননা মায়াবাদে কর্মের স্থান অতি গৌণ, উহা মায়াই, উহার সহিত জ্ঞানের সমুচ্চয় হয় না এবং নির্গুণতত্ত্বে ভাব-ভক্তিরও উপযোগিতা নাই। নির্গুণ-গুণী ঈশ্বরতত্ত্ব স্বীকার না করিলে জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির সমন্বয় হয় না। ইহাই পঞ্চদশ অধ্যায়োক্ত পুরুষোত্তমবাদ (১৫।২৮)। কিন্তু এই তত্ত্বটি পূর্বাচার্যগণ বিশেষ আলোচনা করেন নাই। এই তত্ত্বালোকেই শ্রীঅরবিন্দ জ্ঞান-কর্ম-ভক্তিমিশ্র পূর্ণাঙ্গ যোগের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র, বেদান্তরত্ন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ আধুনিক সমালোচকগণ অনেকেই এই সমন্বয়মূলক ব্যাখ্যারই পক্ষপাতী। এই পুস্তকের ভূমিকায় এবং অন্যত্রও এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আছে। পরবর্তী পরিচ্ছেদেও এই তত্ত্বটি মনস্তত্ত্বের আলোকে পুনরায় আলোচনা করা হইয়াছে।

বিদেশী ভাষায় গীতা

'পৃথিবীর ছত্রিশটি ভাষায় গীতার যে পঁচিশ শতাধিক সংস্করণ হইয়াছে, তাহার মধ্যে সাতাশটি ভাষায় প্রায় এগার শত সংস্করণের নমুনা-গীতা কলিকাতার বাঁশতলা গলিস্থিত গীতা লাইব্রেরীতে সংগৃহীত আছে।' (স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)। গীতার প্রসারের পরিচয় আমরা মধ্যযুগ হইতে লক্ষ্য করি। বিদেশী ভাষায় গীতার প্রচারেরও সংবাদ আমরা মধ্যযুগ হইতে পাই। সম্রাট্ আকবরের মন্ত্রী আবুল ফজল ও তাঁহার ভ্রাতা ফৈজী ফার্সী ভাষায় গীতার দুইটি অনুবাদ করেন। ফৈজীর ফার্সী গীতা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু বার মুদ্রিত হইয়াছে। মুঘল আমলে গীতার আরো ফার্সী ও আরবী অনুবাদ হয়।

গীতার সর্বপ্রথম ইংরেজী অনুবাদ করেন চার্লস উইলকিন্স্ (১৭৪৯।৫০-১৮৩৬ খ্রীঃ)। উইলকিন্স ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কেরানী হইয়া এদেশে আসেন এবং ফার্সী ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। গীতার অনুবাদে তৎকালীন ভারতের প্রথম বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁহাকে উৎসাহ দান করেন। হেস্টিংস তাঁহার গীতার পাণ্ডুলিপি লণ্ডনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আপিসে পাঠাইয়া দেন এবং কোম্পানির খরচে উহা ছাপিবার সুপারিশ করেন। হেস্টিংস নিজে উহাতে একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখিয়া দেন। তিনি নিজেও গীতার প্রশংসক ছিলেন। তিনি মনে করিতেন, গীতার বাণী কোন জাতিকে গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত করিতে পারে। ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডন হইতে (পরে 'স্মর') উইলকিন্সের ইংরেজী গীতা হেস্টিংসের ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়। এই দুর্লভ গ্রন্থের এক কপি কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে।

১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দে নভিকভ রুশ ভাষায় গীতা অনুবাদ করেন। ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে জর্মন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত শ্লেগেল গীতার মূল শ্লোক দেবনাগরী অক্ষরে এবং অনুবাদ ল্যাটিন ভাষায় প্রকাশ করেন। ইউজেন্ বুর্নফ ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে ফরাসী ভাষায় গীতা অনুবাদ করেন এবং ডোমোট্রিয়া নামে একজন গ্রীক পণ্ডিত ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে গ্রীক ভাষায় গীতার অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে এফ্. লরিঞ্জর

জর্মন ভাষায় টীকাসহ গীতার অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইহা ছাড়াও ইউরোপ ও এশিয়ায় বিভিন্ন ভাষায় গীতা অনূদিত হয়, কোন কোন ভাষায় একাধিক অনুবাদও প্রকাশিত হয়।

বর্তমানে ইংরেজী ভাষায় গীতার অনেকগুলি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী স্বরূপানন্দ, স্বামী পরমানন্দ, স্বামী প্রভবানন্দ, স্বামী বীরেশ্বরানন্দ ও স্বামী নিখিলানন্দের অনূদিত গীতা বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে স্বামী প্রভবানন্দ ও কবি ক্রীস্টোফার ঈশারউডের পদ্যে-গদ্যে গীতার অনুবাদটি অত্যন্ত সুন্দর হইয়াছে। উহাতে মনীষী অল্ডাস হাক্সলি যে ভূমিকা লিখিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হাক্সলি লিখিয়াছেন,—"আনন্দ কুমারস্বামী তাঁহার 'হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম' নামক বিখ্যাত পুস্তকে লিখিয়াছেন, 'এই গ্রন্থ (গীতা) পূর্বতন বেদ, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের যাবতীয় মতবাদের সার-সংগ্রহ, এবং ইহা পরবর্তী ভারতীয় সকল চিন্তাধারার ভিত্তিমূল, সুতরাং ইহাকে ভারতীয় তাবৎ ধর্মের মিলন-বিন্দু (focus) বলা যায়।' ভারতীয় ধর্মের এই মিলন-বিন্দু সনাতন দর্শনেরও (Perennial Philosophy) প্রাঞ্জলতম ও পূর্ণতম সংক্ষিপ্তসার। এই হেতু ইহার স্থায়ী মূল্য শুধু ভারতীয়গণের জন্য নয়, সমগ্র মানব-জাতির জন্যই।...ভগবদ্গীতা সনাতন দর্শনের সম্ভবতঃ সবাপেক্ষা সুসমঞ্জস আধ্যাত্মিক বিবৃতি।"

এডুইন আর্নল্ড-কৃত গীতার ইংরেজী পদ্য অনুবাদ 'সংগ্ সেলেসশিয়াল, (Song Celestial) গীতার বাণী জনপ্রিয় করিতে সহায়তা করিয়াছে। এ্যানি বেসান্টের ইংরেজী পকেট গীতাখানিও (গদ্য) অনেক কাল যাবৎ সুপ্রচলিত। বড় বইর মধ্যে ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের ইংরেজী-গীতাখানি মূল্যবান্ ভূমিকা ও টীকা-টিপ্পনীসহ মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা এদেশে ও বিদেশে সর্বত্রই সমাদৃত। অধুনা আমাদের এই গীতাখানিরও ইংরেজীতে একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মূল্যবান্ ভূমিকাসহ প্রকাশিত হইয়াছে। বিংশ শতাব্দীতে ইংরেজীতে গীতার সবচেয়ে বিখ্যাত ও বিস্ময়কর মৌলিক ব্যাখ্যান শ্রীঅরবিন্দের—তাঁহার Essays on the Gita (এসেজ্ অন দি গীতা)। মহাযোগীর সাধনালব্ধ উপলব্ধির স্বাক্ষর এই গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে প্রোজ্জ্বল। শ্রীঅরবিন্দের গ্রন্থখানি নিবিষ্টচিত্ত তন্ময় পাঠককে আকর্ষণ করিয়া সর্বগুহ্যতম পরমশ্রেয়ঃ পথে চালিত করিবে, তাহার হৃদয়-কন্দরে স্ফুরিত হইবে শ্রীভগবানের সর্বশেষ বাণী—'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।'

গীতোক্ত ধর্মের মূলকথা—ভাগবত জীবন লাভ, জগতে সচ্চিদানন্দ প্রতিষ্ঠা

পূর্বে গীতার সমন্বয়-তত্ত্ব ও গীতার শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহার স্থূলমর্ম এই যে, গীতোক্ত ধর্মে জ্ঞান কর্ম ভক্তি—এই তিনের সমাবেশ আছে। গীতার টীকা-ভাষ্যের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি, অনেকে গীতায় কোন একটি বিশেষ মার্গই প্রতিপাদিত হইয়াছে, ইহাই প্রতিপন্ন করিতে আগ্রহশীল। কেহ বলেন গীতা ভক্তিশাস্ত্র, কেহ বলেন গীতা কর্মযোগশাস্ত্র, কেহ বলেন গীতা ব্রহ্মবিদ্যা—'তৎ-ত্বম্-অসি' ('তুমিই সেই ব্রহ্ম') বেদান্তের এই মহাবাক্যই উহার একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু আধুনিক গীতা সমালোচকগণ প্রায় সকলেই সমন্বয়বাদেরই পক্ষপাতী; তবে তাঁহারা কেহ বলেন, গীতায় জ্ঞান-ভক্তিমিশ্র কর্মযোগেরই প্রাধান্য; কেহ বলেন, উহাতে জ্ঞান-কর্মমিশ্র ভক্তিরই প্রাধান্য। বস্তুতঃ গীতোক্ত পূর্ণাঙ্গ ধর্মে জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির সমন্বয় কেন করা হইয়াছে, জীব-ব্রহ্মস্বরূপ ও মোক্ষ-তত্ত্বের আধ্যাত্মিক বিচারেও তাহা বুঝা যায়। গীতার সর্বত্রই দেখা যায়, মোক্ষ বা সিদ্ধাবস্থার বর্ণনায় শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—'মদ্ভাবমাগতাঃ', 'মম সাধর্ম্যমাগতাঃ' 'মদ্ভাবায়োপপদ্যতে' ইত্যাদি। এই সকল কথার মর্ম এই, সাধনবলে জীব আমার ভাব প্রাপ্ত হয়। ভগবানের ভাব কি?—তিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ ('ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ" (ব্রহ্মসংহিতা), 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম', 'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' (তৈত্তি, ২।১।৩, বৃহ ৩।৯।২৮)। সৎ চিৎ, আনন্দ—এই তিনটি তাঁহার ভাব। এই তিন ভাবে তাঁহার **ত্রিবিধ শক্তি**—সন্ধিনী, সংবিৎ, হ্লাদিনী শক্তি ('হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্বসংশ্রয়ে' —বিষ্ণুপুরাণ)। শক্তির প্রকাশ ক্রিয়াতে। সৎ ভাবে যে শক্তি ক্রিয়া করে তাহার নাম সন্ধিনী—জগতে যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু সত্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে, এই যে জগৎ-সৃষ্টি, এই জীবজগতের কর্মপ্রবাহ, কর্ম-প্রবৃত্তি ('যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাম্'), ইহার মূলে যে শক্তি ক্রিয়া করে তাহাই সন্ধিনী শক্তি ('যয়া অস্তি ভাবয়তি, করোতি কারয়তি চ'—the Principle of Creative Life)। চিৎ-ভাবের যে শক্তি তাহার নাম সংবিৎ, এই শক্তির ক্রিয়াতেই তিনি স্বতঃচেতন, ইহাদ্বারাই তিনি জীব-জগৎকে সচেতন করেন, জ্ঞানবুদ্ধির প্রেরণা দেন ('যয়া বেত্তি বেদয়তি চ'; 'যেন চেতয়তে বিশ্বং'; 'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ'—the Principle of Knowledge)। আনন্দ ভাবের যে শক্তি তাহার নাম

হ্লাদিনী। এই শক্তির ক্রিয়াতেই তিনি নিজে আনন্দময়, নিজের স্বরূপানন্দ উপভোগ করেন এবং জীব-জগৎকে আনন্দিত করেন ('যয়া হ্লাদতে, হ্লাদয়তি চ'—ভাগবতসন্দর্ভ); ('এষ হ্যেবানন্দয়তি' —তৈত্তি— the Principle of Delight)।

এই তো সচ্চিদানন্দ-তত্ত্ব—সচ্চিদানন্দের ভাব ও শক্তি। জীব ও ভাব কিরূপে লাভ করিবে? জীব-তত্ত্ব কি তাহা পর্যালোচনা করিলেই উহা বুঝা যাইবে। 'জীব ব্রহ্মের অংশ ('মমৈবাংশো জীবভূতঃ') ব্রহ্ম-কণা, ব্রহ্ম-অগ্নিরই স্ফুলিঙ্গ; স্ফুলিঙ্গে অগ্নির লক্ষণ থাকিবেই, কাজেই জীবেও ব্রহ্ম-লক্ষণ আছে ('সত্যং জ্ঞানমনন্তঞ্চেত্যস্তীহ ব্রহ্মলক্ষণম্'—পঞ্চদশী)। কিন্তু জীবে উহা অস্ফুট, বীজাবস্থ, ব্রহ্মে পূর্ণ-উচ্ছ্বসিত, এই হেতু ব্রহ্ম জীব হইতে অধিক ('অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ'—ব্রঃ সূঃ)। জীব একাধারে কর্তা, জ্ঞাতা ও ভোক্তা। সুতরাং উহার ত্রিবিধ শক্তি—কর্মশক্তি, যাহার ক্রিয়ায় ইনি কর্তা, জ্ঞানশক্তি, যাহার ক্রিয়ায় ইনি জ্ঞাতা এবং ইচ্ছাশক্তি, যাহার ক্রিয়ায় ইনি ভোক্তা। কর্মশক্তির বিকাশ চেষ্টনায় (পাশ্চাত্ত্য মনোবিজ্ঞান ইহাকে বলে Conation)। জ্ঞানশক্তির বিকাশ ভাবনায় (পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের Cognition)। ইচ্ছাশক্তির বিকাশ কামনায় (পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের Emotion)। ইংরেজীতে সাধারণ কথায় ইহাদিগকে বলে—Action, Thought, Desire—এ সকল বৈজ্ঞানিক সত্য এবং স্বানুভবসিদ্ধ। জীবের যে এই তিনটি শক্তি, উহা ব্রহ্ম-শক্তিরই অনুরূপ, কিন্তু অস্ফুট, অবিশুদ্ধ। জীবের মধ্যে যে কর্মশক্তি উহাই উচ্চতম গ্রামে সন্ধিনী, যাহার ফল প্রতাপ (Power); জীবের মধ্যে যে জ্ঞান-শক্তি তাহাই উচ্চতম গ্রামে সংবিৎ, যাহার ফল প্রজ্ঞা (Wisdom); এবং জীবের মধ্যে যে ইচ্ছাশক্তি উহাই উচ্চতম গ্রামে হ্লাদিনী, যাহার ফল প্রেম (Love)।

সৎ-চিৎ-আনন্দ—কর্ম, জ্ঞান, প্রেম (Life, Light and Love) —এই তিনটি জীবে অস্ফুট, অপূর্ণ, প্রকৃতি-জড়িত অবিশুদ্ধ অবস্থায় থাকে। সাধন-বলে এই তিনটি বিশুদ্ধ ও ঈশ্বরমুখী হইয়া পূর্ণরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হইলে জীবও ঐশ্বরিক প্রকৃতি বা ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হয় ('মদ্ভাবমাগতাঃ', 'মম সাধর্ম্যমাগতাঃ'—গীতা; 'ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ'—ভাঃ ইত্যাদি)। ভাগবতশাস্ত্রে ইহা পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে।

জীবের অন্তর্নিহিত এই যে তিনটি শক্তি আছে, তদনুসারে সাধনের তিনটি পথের নামকরণ হইয়াছে—কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ। জীবের যে

অস্ফুট সদ্‌ভাব উহার প্রকাশ তাহার কর্মে, সুতরাং তাহার কর্ম ঈশ্বরমুখী হইলেই উহা বিশুদ্ধ হইয়া নিষ্কাম কর্মযোগ হয়। জীবের মধ্যে যে চিদ্‌ভাব উহার প্রকাশ তাহার জ্ঞানে, ভাবনায়, উহা ঈশ্বরমুখী হইয়া সমত্ব প্রাপ্ত হইলেই জ্ঞানযোগ হয়। জীবের মধ্যে যে আনন্দভাব উহার প্রকাশ তাহার কামনায়, উহা ঈশ্বরমুখী হইয়া বিশুদ্ধ হইলেই প্রেমভক্তিযোগ হয়। এই তিনটি যুগপৎ অনুষ্ঠানই জীবের পূর্ণবিকাশ, সচ্চিদানন্দের সাধর্ম্যলাভ ('মম সাধর্ম্যমাগতাঃ')।

"শ্রীভগবান্ সমন্বয়ের উচ্চ চূড়ায় আরূঢ় হইয়া ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, জীবকে সচ্চিদানন্দে পূর্ণবিকশিত হইতে হইলে এই মার্গত্রয়কে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে হয়। সেই জন্য গীতায় দেখি, কর্মবাদ, জ্ঞানবাদ ও ভক্তিবাদের অপূর্ব সামঞ্জস্য বিধান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ এক অদ্ভুত যুক্তত্রিবেণীসঙ্গম রচনা করিয়াছেন, যে পুণ্যতর কল্যাণতর ত্রিবেণীতে সরস্বতীর কর্মধারা, যমুনার জ্ঞানধারা এবং গঙ্গার ভক্তিধারা সমান উজ্জ্বল, সমস্রোতে প্রবহমান।" —বেদান্তরত্ন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

গীতোক্ত যোগসাধনা—'জগদ্ধিতায়'

বলা বাহুল্য, মার্গত্রয়ের অর্থ মোটেই ইহা নহে যে, সাধককে প্রচলিত তিনটি মার্গই অবলম্বন করিতে হইবে; মার্গ একটিই, তাহার মধ্যেই জ্ঞান-কর্ম ভক্তির সমন্বয় ও সামঞ্জস্য আছে, বিরোধ নাই (২৪০-৪৩ পৃঃ দ্রঃ)। অবশ্য প্রচলিত জ্ঞানযোগ বা রাজযোগেও সিদ্ধিলাভ হইতে পারে, কিন্তু গীতাতত্ত্বের আলোকে আমরা বুঝিতে পারি যে, সেই সিদ্ধি এবং গীতোক্ত সাধর্ম্য-সিদ্ধি এক নহে, উভয়ের উদ্দেশ্যও এক নহে। রাজযোগীর বা জ্ঞানযোগীর উদ্দেশ্য কৈবল্যসিদ্ধি লাভ করিয়া 'কেবল' বা এক হইয়া যাওয়া। কিন্তু একই যে বহু হইয়াছেন, একই যে বহুর মধ্যে আছেন, তাহা তিনি বিস্মৃত হন। জীব-জগতের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। গীতোক্ত যোগীও একই দেখেন, কিন্তু এককে তিনি বহুর মধ্যে দেখেন, বহুকে তিনি একের মধ্যে দেখেন। ইহার ফলে তিনি সর্বভূতে সমদর্শী এবং সর্বভূতহিতসাধনে রত থাকেন। (গী ৬।২৯-৩২ শ্লোক ও ব্যাখ্যা দ্রঃ)

প্রচলিত ভক্তিযোগের সাধক জগৎকে অস্বীকার করেন না। তিনি রস-ব্রহ্মের উপাসক; রসলিপ্সায় বিভোর হইয়া তিনি জীবজগৎ হইতে যেন দূরে সরিয়া যান, এই জগৎলীলা যে সেই রসময়েরই রাসলীলা, আনন্দলীলা,—তিনি যে সর্বভূতময়, তাহা বিস্মৃত হইয়া যান। তিনি ভুলিয়া যান ভগবদুক্তি—

সর্বভূতে আমার স্বরূপ চিন্তা করা এবং মন, বাক্য ও শরীর-বৃত্তিদ্বারা সর্বভূতের সেবা করাই ভক্তের শ্রেষ্ঠ ধর্ম ('মদ্ভাবঃ সর্বভূতেষু মনোবাক্‌কায়বৃত্তিভিঃ'—ভাঃ ১১।২৯।১৯)। ভাগবত-শক্তি জীবকে শুধু রসগ্রাহী ভোক্তা করেন নাই, বিশ্বলীলার সহায়কারী কর্তাও করিয়াছেন। তাই লোকরক্ষার্থ যজ্ঞস্বরূপে স্বীয় স্বীয় কর্ম করিয়া জাগতিক স্থিতি অব্যাহত রাখিলেই ভগবানের তুষ্টি হয়, তাহাতেই ভগবানের অর্চনা হয়, ইহাই ভাগবত শাস্ত্রের বিধান ('স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্'—ভাঃ ; 'স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ'—গী ১৮।৪৬)। তাই ভক্তের প্রতি শ্রীভগবানের উপদেশ—তুমি জ্ঞানী হও, তুমি ভক্ত হও, তুমি কর্মী হও, নিষ্কামতা দ্বারা কর্মের বন্ধন ঘুচাইয়া উহাকে মোক্ষদায়ক আমার কর্মে—ভাগবত কর্মে পরিণত কর ('মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ'—গী ১১।১৫, 'জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো ভজ মাং ভক্তিভাবিতঃ'—ভাঃ)। ইহাই পূর্ণাঙ্গ যোগ। জ্ঞান, কর্ম ও প্রেম—এই তিনটি বৃত্তি মানুষে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, উহাদের পৃথক্ করিলে যোগ পূর্ণাঙ্গ হয় না।

শ্রীভাগবতে ভক্তরাজ প্রহ্লাদের একটি উক্তি আছে—

'প্রায়েণ দেবমুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা
মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ।'

—মুনিগণ কেবল নিজেদের মুক্তির জন্য নির্জনে মৌনাবলম্বন করিয়া তপস্যা করেন, তাঁহারা তো অন্য জীবের দিকে চাহেন না, তাঁহারা তো পরার্থনিষ্ঠ নন।

কিন্তু গীতোক্ত যোগী বিশ্বকর্মী, তাঁহার সাধনা কেবল নিজের মুক্তির জন্য নহে, বিশ্বমানবকে শুদ্ধ ও মুক্ত করিবার জন্য। জগতে মানবমাত্রেই যখন জাতিধর্মনির্বিশেষে এই উদার ধর্মমত গ্রহণ করিবে, সর্বদাই যখন এই ধর্ম সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইবে,—

জ্ঞানে যখন সকলেই সর্বভূতে সমদর্শী হইবে,
প্রেমে যখন সর্বভূতে প্রীতিমান্ হইবে,
কর্মে যখন সর্বভূতহিতসাধনে রত হইবে,

তখনই জগতে **সচ্চিদানন্দ প্রতিষ্ঠা** হইবে। এই সার্বভৌম ধর্ম জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে সকল ব্যক্তিই আত্মবান্, সমদর্শী, নিষ্কাম কর্মী, সর্বভূতহিতে রত ও ভগবানে ভক্তিমান্ হইবে। তখন হিংসাদ্বেষ, যুদ্ধ-বিবাদ, অশান্তি-

উপদ্রব সমস্ত দূরীভূত হইবে—জগতে অখণ্ড অনাবিল শান্তি বিরাজ করিবে। ইহাই ভাগবত ধর্মের মহান্ আদর্শ।

অধুনা পাশ্চাত্ত্য দেশে এবং এদেশেও সমাজতান্ত্রিক মতবাদ বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে। আধুনিক সমাজতান্ত্রিকগণ যে আদর্শ মানব-সমাজের পরিকল্পনা করেন তাহা এইরূপ—এই সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজ রক্ষার্থে সাধ্যানুসারে স্বীয় স্বীয় কর্তব্য কর্ম সম্পন্ন করিবে, সেই কর্মের দ্বারা উৎপন্ন ধন বা দ্রব্যজাত সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে। উহা সমাজের সকলের মধ্যে প্রয়োজনানুরূপ বিতরিত হইবে; কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকিবে না। সমাজে উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন, ধনিক-শ্রমিক, ভূস্বামি-প্রজা ইত্যাদি শ্রেণী-বিভেদ থাকিবে না। সুখ-স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রার সর্ববিধ প্রয়োজনে প্রত্যেক ব্যক্তি সাধারণ ধন-ভাণ্ডার হইতে অর্থাদি পাইবে। সুতরাং আমার ধন, আমার জন, আমি ধনী, আমি মানী ইত্যাদি ব্যক্তিগত অহংবুদ্ধি সমাজ হইতে ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইবে। সকলেই নিঃস্বার্থভাবে সমাজের কল্যাণার্থে সোৎসাহে কর্ম-নিরত থাকিবে। এই সমাজে ব্যক্তিগত ধন-সংসৃষ্ট হিংসাদ্বেষ, বিবাদ-বিসংবাদ লোপ পাইবে। দুর্বলের উপর প্রবলের প্রভুত্ব লোপ পাইবে এবং সমাজে সাম্য মৈত্রী ও অনাবিল শান্তি বিরাজ করিবে।

বলা বাহুল্য, পূর্বে যে অহিংসক সর্বভূতহিতে রত নিষ্কামকর্মী আদর্শ মানব-সমাজের বর্ণনা করা হইয়াছে, সেই সমাজ এবং আধুনিক সমাজতান্ত্রিক-গণের পরিকল্পিত মানব-সমাজ আদর্শতঃ এক। তবে পার্থক্য এই, সমাজতান্ত্রিকগণের মধ্যে অনেকে ধর্ম বস্তুটিকে একেবারে বাদ দিয়াছেন। কিন্তু সকল সমাজতান্ত্রিক আদর্শে ধর্ম অস্বীকৃত হয় নাই। বস্তুতঃ অজ্ঞ কুসংস্কারান্ধ জনসাধারণের উপর সেকালের উন্নতি-বিরোধী ধর্মযাজক-সম্প্রদায়ের নিরঙ্কুশ আধিপত্য যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ধর্ম বস্তুটির প্রতি এতাদৃশ বিদ্বেষ কিছু বিচিত্র নহে। বৈদান্তিক সমত্ব-জ্ঞান ও গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম যে ধর্মের মূলভিত্তি সেই উচ্চাঙ্গের ধর্মের সহিত যদি তাঁহারা পরিচিত থাকিতেন, তবে তাঁহারাও ধর্ম বস্তুটিকে এমন সরাসরি বাদ দিতে পারিতেন না। কেননা, তাঁহারা যে কর্মনীতি প্রচার করেন, ইহলৌকিক দৃষ্টিতে গীতোক্ত ধর্মের কর্মনীতিও প্রায় তাহাই, পারলৌকিক তত্ত্ব যাহাই হউক। সমাজতন্ত্রবাদের একটি মূলনীতি (maxim) এই যে, সমাজের সকলকে সমভাবে ভোগ করিতে না দিয়া, নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যক্তিগত ধন-সম্পত্তি সঞ্চয় করা চৌর্য মাত্র ('Property is theft')। আমরা দেখিতে

পাই, ভাগবতশাস্ত্রে গার্হস্থ্য ধর্মের বর্ণনা-প্রসঙ্গে অনুরূপ ভাষায় ঠিক এই নীতিরই উল্লেখ আছে—

'যাবদ্ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্।
অধিকং যোঽভিমন্যেত **স স্তেনো দণ্ডমর্হতি** ॥'

—'যে পরিমাণ ধনাদিতে নিজের ভরণ-পোষণ হয়, তাবন্মাত্রেই দেহীদিগের স্বত্ব। যে তাহার অতিরিক্ত ধন-সম্পত্তির অভিলাষ করে সে চৌর; সে দণ্ড পাইবার যোগ্য' (ভাঃ ৭।১৪।৮)।

এই প্রসঙ্গে শ্রীমৎ শ্রীশঙ্করাচার্য (ডঃ কুর্তোকোটি) ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে হিন্দু মহাসভার সভাপতিরূপে যে- অভিভাষণ দিয়াছিলেন, তাঁহার নিম্নলিখিত কথা কয়েকটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

"The Aryan principle, for instance, has already provided us the practice of equality and the principle of equableness as evinced by সমত্বযোগ of Bhagavad Gitā. If socialist creed are to be imported in the land...I should advise...first of all to adjust them to our national brand of সমত্ব-যোগ which will refine and sublimate the equality of the West."......(The Leader).

—ভগবদ্গীতার সমত্ব-যোগ হইতেই প্রমাণিত হয় যে, আর্যধর্ম আমাদিগকে সাম্যনীতি ও তন্মূলক নিষ্কাম কর্মপন্থাই প্রদান করিয়াছে। যদি সমাজতান্ত্রিক মতবাদসমূহ এদেশে আনিতে হয়, তাহা আমাদের স্বদেশীয় সমত্ব-যোগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে, তবেই পাশ্চাত্ত্যের সাম্যবাণী ঊর্ধ্বস্তরে উন্নীত হইবে।

বস্তুতঃ সর্বভূতে সাম্যদৃষ্টি ও সর্বভূতহিতসাধনার্থ বা নিষ্কাম কর্মনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রকার অত্যাচার ও শোষণ-বর্জিত আদর্শ মানব-সমাজের পরিকল্পনা ভারতে প্রথম হইয়াছে।

প্লেটো, এরিস্টটল, এপিক্যুরস প্রভৃতি প্রাচীন গ্রীক-তত্ত্বজ্ঞগণ পূর্ণজ্ঞানী শুদ্ধতত্ত্ব আদর্শ মানব-সমাজের বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু অনেক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতের মত এই যে, উহা কল্পনা-প্রসূত উচ্চ আদর্শমাত্র, বাস্তব জগতে এরূপ অবস্থা কখনও হয় নাই, হইবেও না। কিন্তু আমাদের শাস্ত্র বলেন যে, এ অবস্থা অত্যন্ত দুর্লভ বটে ('একান্তিনো হি পুরুষা দুর্লভা বহবো নৃপাঃ'—মভাঃ শাং ৩৪৮।৬২), কিন্তু ইহা কাল্পনিক নহে। সত্যযুগে

এই ধর্মই প্রচলিত ছিল ('ততো হি সাত্বতো ধর্মো ব্যাপ্য লোকানবস্থিতঃ' ইত্যাদি মভাঃ শাঃ ৩৪৮।৩৪।২৯) এবং পুনরায় বিশ্বময় এই ধর্ম অনুষ্ঠিত হইলে সত্যযুগের আবির্ভাব হইবে (শাঃ ৩৪৮।৬৩)।

"যদ্যেকান্তিভিরাকীর্ণং জগৎ স্যাৎ কুরুনন্দন।
অহিংসকৈরাত্মবিদ্ভিঃ সর্বভূতহিতে রতৈঃ।
ভবেৎ কৃতযুগপ্রাপ্তিঃ আশীঃকর্মবিবর্জিতা॥"

—অহিংসক, আত্মজ্ঞানী, সর্বভূতহিতে রত, একান্তী অর্থাৎ ভাগবত-ধর্মাবলম্বী দ্বারা যদি জগৎ পরিপূর্ণ হয়, তবে জগতে স্বার্থবুদ্ধিতে কৃত কর্ম লোপ পায় এবং পুনরায় সত্যযুগের আবির্ভাব হয় (মভাঃ শাঃ ৩৪৮।৬২।৬৩)।

তাই পুণ্যাত্মা ৺অশ্বিনীকুমারের ভাষায় বলিতেছিলাম—ভাগবত কৃত ধর্মের উদ্দেশ্য, জীবের একমাত্র লক্ষ্য—'বিশ্বময় সর্বত্র সচ্চিদানন্দোপলব্ধি, সচ্চিদানন্দাবলম্বন ও সচ্চিদানন্দ প্রতিষ্ঠা।'

জীবের জীবন্মুক্তির এবং জগতের ভাবী উন্নতির ইহা অপেক্ষা উচ্চ ধারণা অন্য কোন ধর্ম-সাহিত্যে পাওয়া যায় কি? ভগবদ্ভক্তি, বিশ্বপ্রীতি ও কর্মনীতির ইহা অপেক্ষা উচ্চ আদর্শ আর কিছু আছে কি? এইরূপ উদার অসাম্প্রদায়িক সার্বভৌম ধর্মমত আর প্রচারিত হইয়াছে কি?

বিশ্বধর্ম, বিশ্বপ্রেম, বিশ্বমানবতা।
কে শিখালো জগতেরে?—ভারতের গীতা।
তাই—
দেশে দেশে অনূদিতা আদৃতা অধীতা;
জগতের ধর্মগ্রন্থ ভারতের গীতা॥

।।ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ।।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

প্রথম অধ্যায়

অর্জুনবিষাদ-যোগ

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥ ১

১। ধৃতরাষ্ট্রঃ উবাচ (কহিলেন)—[হে] সঞ্জয়, ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে (পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে) যুযুৎসবঃ (যুদ্ধাভিলাষী) মামকাঃ (আমার পুত্রগণ) পাণ্ডবাঃ চ এব (এবং পাণ্ডবেরা) সমবেতাঃ [সন্তঃ] [সমবেত হইয়া] কিম্ অকুর্বত (কি করিলেন)?

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়, পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধাভিলাষী আমার পুত্রগণ এবং পাণ্ডুপুত্রগণ সমবেত হইয়া কি করিলেন? ১

[যুদ্ধারম্ভের পূর্বে ব্যাসদেব অন্ধরাজকে যুদ্ধদর্শনার্থ দিব্যচক্ষু প্রদান করিতে চাহিলেন। ধৃতরাষ্ট্র তাহাতে অসম্মত হইয়া বলিলেন—আমি জ্ঞাতি-কুটুম্বের নিধন দেখিতে চাই না, আপনার তপঃপ্রভাবে যাহাতে যুদ্ধের সমস্ত বৃত্তান্ত যথাযথ শ্রবণ করিতে পারি, আপনি তাহাই করুন। তখন ব্যাসদেব রাজ-অমাত্য সঞ্জয়কে বর প্রদান করেন। সেই বরপ্রভাবে তিনি দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া যুদ্ধাদি সন্দর্শন ও উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের বাক্যাদি শ্রবণ ও মনোভাব সমস্ত পরিজ্ঞাত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন। গীতার সমস্তই সঞ্জয়-বাক্য। মভা, ভীষ্ম ১।২৪]

সঞ্জয়ের দিব্যচক্ষু প্রাপ্তি। "পরম যোগশক্তির আধার মহামুনি ব্যাস যে এই দিব্য চক্ষু সঞ্জয়কে দিতে সক্ষম ছিলেন, তাহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখিতে পাই না"—শ্রীঅরবিন্দ। যাঁহারা ইহাকে 'আষাঢ়ে গল্প' বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান, তাঁহারা মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দের 'গীতার ভূমিকা' নামক উপাদেয় গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত আলোচনা পাঠ করিবেন।

প্রশ্ন। এখানে যুদ্ধের কথা হইতেছে, কুরুক্ষেত্রও যুদ্ধক্ষেত্র। এস্থলে 'ধর্মক্ষেত্র' বিশেষণটি আবার কেন?

উত্তর। কুরুক্ষেত্র চিরকালই পরম পুণ্যভূমি বলিয়া পরিচিত। জাবাল উপনিষদে ও শতপথব্রাহ্মণে ইহাকে দেবযজন অর্থাৎ দেবতাদের 'যজ্ঞস্থান' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার প্রাচীন নাম সমন্তপঞ্চক। পরশুরাম একুশ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া এই স্থানে পিতৃ-তর্পণ করিয়াছিলেন। দুর্যোধনাদির পূর্বপুরুষ বিখ্যাত কুরু রাজা এই স্থানে হল চালনা করিয়া এই বর লাভ করিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি এই স্থানে তপস্যা করিবে অথবা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিবে, সে স্বর্গে গমন করিবে। তদবধিই ইহার নাম কুরুক্ষেত্র। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে সর্বত্রই কুরুক্ষেত্রকে ধর্মক্ষেত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বনপর্বের তীর্থযাত্রা পর্বাধ্যায়ে কুরুক্ষেত্রকে তিন লোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; সুতরাং 'ধর্মক্ষেত্র' এই বিশেষণটি একান্ত সুসঙ্গত ও প্রয়োজনীয়।

অনেক টীকাকারের মতে, এই শব্দটির গূঢ় তাৎপর্যও আছে। তাঁহারা বলেন, ধৃতরাষ্ট্র মনে করিয়াছিলেন যে, ধর্মক্ষেত্রের প্রভাবে উভয় পক্ষের অন্তঃকরণে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইলে একটা সন্ধি হওয়াও বিচিত্র নহে। তাঁহার মনে যুদ্ধ সম্বন্ধে এইরূপ সংশয়ের উদয় হওয়াতেই তিনি প্রশ্ন করিলেন—"যুদ্ধার্থী ইহারা কি করিতেছে?" নচেৎ যুদ্ধার্থী যুদ্ধই করিবে—এস্থলে "কি করিতেছে" এরূপ প্রশ্ন সঙ্গত হয় না; প্রশ্ন হইতে পারে "কিরূপে যুদ্ধ করিতেছে?" ইত্যাদি। এইরূপে ইঁহারা 'ধর্মক্ষেত্র' বিশেষণের সার্থকতা ও আপাত-অসঙ্গত "কি করিতেছে" প্রশ্নের সুসঙ্গত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, ধর্মক্ষেত্রের প্রভাবে অর্জুনের মনে সাত্ত্বিক ভাবের প্রাবল্য হওয়াতেই তিনি যুদ্ধরূপ নৃশংস ব্যাপারে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু অর্জুনের মনে স্বজনাদি বধের আশঙ্কায় যে কাতরতা ও বিষাদ উপস্থিত হইয়াছিল, শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন উহা হৃদয়-দৌর্বল্য, স্মৃতিবিভ্রম, অজ্ঞানজনিত মোহ। এই মোহ দূরীকরণার্থেই গীতার অপূর্ব ধর্মব্যাখ্যা। সেই ব্যাখ্যা শেষ হইলে অর্জুন স্বয়ং বলিলেন—"নষ্টো-মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত (১৮।৭৩)।" তমোভাবপ্রসূত এই মোহকে সত্ত্বভাব বলিয়া বর্ণনা করিলে মূলেই ভুল করা হয় না কি? বস্তুতঃ ধৃতরাষ্ট্রের মনে যুদ্ধ সম্বন্ধে এরূপ কোন সংশয় আসিতেই পারে না, কারণ এই প্রশ্ন হইয়াছিল ভীষ্মদেবের পতনের পর, যুদ্ধারম্ভের পূর্বে নহে। (মভা, ভীষ্ম, ২৫ অঃ)। অথচ,

সঞ্জয় উবাচ

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্যোধনস্তদা।
আচার্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ॥ ২
পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা॥ ৩
অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ॥ ৪

অনেকেই পূর্বোক্তরূপ ব্যাখ্যা গতানুগতিক ভাবে আবৃত্তি করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন।

২। সঞ্জয়ঃ উবাচ (কহিলেন)—তদা (তৎকালে) পাণ্ডব-অনীকং (পাণ্ডব-সৈন্যগণকে) ব্যূঢ়ং (ব্যূহাকারে সজ্জিত) দৃষ্ট্বা তু (দেখিয়া) রাজা দুর্যোধনঃ আচার্যম্ উপসঙ্গম্য (আচার্যসমীপে যাইয়া) বচনম্ অব্রবীৎ (এই কথা বলিলেন)।

উভয় পক্ষীয় সৈন্য বর্ণন ২-১১

সঞ্জয় কহিলেন, তখন রাজা দুর্যোধন পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে ব্যূহাকারে সজ্জিত দেখিয়া দ্রোণাচার্য সমীপে যাইয়া এই কথা বলিলেন। ২

৩। হে আচার্য (গুরো), তব (আপনার) ধীমতা শিষ্যেণ দ্রুপদপুত্রেণ (ধীমান্ শিষ্য দ্রুপদ-পুত্র কর্তৃক) ব্যূঢ়াং (ব্যূহবদ্ধ) পাণ্ডুপুত্রাণাম্ (পাণ্ডব-গণের) এতাং (এই) মহতীং চমূং (মহতী সেনা) পশ্য (দেখুন)।

গুরুদেব, আপনার ধীমান্ শিষ্য দ্রুপদপুত্র কর্তৃক ব্যূহবদ্ধ পাণ্ডব-দিগের এই বিশাল সৈন্যদল দেখুন। ৩

"আপনার ধীমান্ শিষ্য" এ কথাটি দুর্যোধন শ্লেষাত্মক ভাবেই ব্যবহার করিয়াছেন। আবার 'ধৃষ্টদ্যুম্ন' না বলিয়া 'দ্রুপদপুত্র' বলিয়া দ্রোণাচার্যের পূর্বশত্রুতা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। 'আপনার বুদ্ধিমান্ শিষ্যটি যুদ্ধার্থে সসৈন্যে আপনার সম্মুখে দণ্ডায়মান, দেখুন'—এই ভাব। ৩

৪-৬। অত্র (এই সেনামধ্যে) শূরাঃ (শৌর্যশালী) মহেষ্বাসাঃ (মহাধনুর্ধর) যুধি ভীমার্জুনসমাঃ (যুদ্ধে ভীমার্জুনের সমকক্ষ) যুযুধানঃ (সাত্যকি), বিরাটশ্চ, মহারথঃ দ্রুপদশ্চ, ধৃষ্টকেতুঃ, চেকিতানঃ, বীর্যবান্ কাশীরাজশ্চ,

ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬
অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭

পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ, নরপুঙ্গবঃ (নরশ্রেষ্ঠ) শৈব্যশ্চ, বিক্রান্তঃ (বিক্রমশালী) যুধামন্যুশ্চ, বীর্যবান্ উত্তমৌজাশ্চ, সৌভদ্রঃ (অভিমন্যু), দ্রৌপদেয়াশ্চ (দ্রৌপদী-তনয়েরা)—এতে সর্বে এব মহারথাঃ (ইঁহারা সকলেই মহারথী)।

এই সেনার মধ্যে ভীমার্জুনের সমকক্ষ মহাধনুর্ধারী বহু বীরপুরুষ রহিয়াছেন। সাত্যকি, বিরাট, মহারথ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীর্যবান্ কাশীরাজ, কুন্তিভোজ পুরুজিৎ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, বীর্যবান্ উত্তমৌজা, সুভদ্রা-পুত্র (অভিমন্যু), দ্রৌপদীর পুত্রগণ (প্রতিবিন্ধ্যাদি)—ইঁহারা সকলেই মহারথী। ৪-৬

মহারথঃ—একো দশসহস্রাণি যোধয়েদ্ যস্তু ধন্বিনাম্।
শস্ত্রশাস্ত্রপ্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতঃ ॥

যিনি একাকী দশ সহস্র ধনুর্ধারীর সহিত যুদ্ধ করেন এবং যিনি শস্ত্রশাস্ত্রে প্রবীণ, তিনিই মহারথ।

কুন্তিভোজ পুরুজিৎ—একই ব্যক্তি, বিভিন্ন ব্যক্তি নহেন। কুন্তিভোজ কৌলিক নাম। ইনি ভীমসেনাদির মাতুল। ধৃষ্টকেতু, শিশুপালের পুত্র। মহাভারতের উদ্যোগপর্বে ১৬৬-১৭১ অধ্যায়ে উভয় পক্ষীয় রথী, মহারথী, অতিরথী প্রমুখের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

৭। [হে] দ্বিজোত্তম (বিপ্রশ্রেষ্ঠ), অস্মাকং তু (আমাদেরও) যে (যাঁহারা) বিশিষ্টাঃ (প্রধান) মম সৈন্যস্য নায়কাঃ (আমার সৈন্যের নায়ক) তান্ (তাঁহাদিগকে) নিবোধ (অবগত হউন); তে (তব) সংজ্ঞার্থং (সম্যক্-অবগতির জন্য) তান্ ব্রবীমি (সে সকল বলিতেছি)।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আমার সৈন্যমধ্যেও যে সকল প্রধান সেনানায়ক আছেন তাঁহাদিগকে অবগত হউন। আপনার সম্যক্ অবগতির জন্য তাঁহাদিগের নাম বলিতেছি। ৭

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥ ৮
অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধ-বিশারদাঃ ॥ ৯
অপর্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥ ১০

৮। ভবান্ (আপনি), ভীষ্মঃ চ, কর্ণঃ চ, সমিতিঞ্জয়ঃ (সমরবিজয়ী) কৃপঃ চ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণঃ, সৌমদত্তিঃ, জয়দ্রথঃ।

আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, যুদ্ধজয়ী কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্তপুত্র এবং জয়দ্রথঃ। ৮

সমিতিঞ্জয়ঃ—সমিতি (সংগ্রাম) জয় করে যে=যুদ্ধজয়ী। অন্বয়ে এই পদটিকে কেবল কৃপের বিশেষণ না করিয়া দ্রোণাদি সকলেরই বিশেষণ করা হয়। **কৃপ**—দ্রোণাচার্যের শ্যালক, ইনিও কৌরবদিগের অস্ত্রগুরু। **অশ্বত্থামা**—দ্রোণপুত্র। **বিকর্ণ**—দুর্যোধনের অন্যতম কনিষ্ঠ ভ্রাতা। **সৌমদত্তি**—সোমদত্ত-পুত্র বিখ্যাত ভূরিশ্রবা। **জয়দ্রথ**—সিন্ধুদেশের রাজা, দুর্যোধনের ভগিনীপতি। ভীষ্মের পূর্বে দ্রোণের নাম, বাক্‌চাতুর্য লক্ষ করুন।

এই শ্লোকের 'সৌমদত্তিস্তথৈব চ' এইরূপ পাঠান্তর আছে।

৯। মদর্থে (আমার জন্য) ত্যক্তজীবিতাঃ (জীবনত্যাগে প্রস্তুত) অন্যে চ বহবঃ (আরও অনেক) নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ (বিবিধ যুদ্ধাস্ত্রধারী) শূরাঃ (বীরপুরুষ) [সন্তি=আছেন], তে সর্বে (তাঁহারা সকলে) যুদ্ধবিশারদাঃ (যুদ্ধে পারদর্শী)।

আমার জন্য জীবন ত্যাগে প্রস্তুত আরও অনেক নানাশস্ত্রধারী বীরপুরুষ আছেন। তাঁহারা সকলেই যুদ্ধবিশারদ। ৯

১০। ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ (ভীষ্মকর্তৃক রক্ষিত) অস্মাকম্ (আমাদের) তৎ বলং (সেই সৈন্য) অপর্যাপ্তম্ (অপরিমিত)। এতেষাং তু (কিন্তু ইহাদিগের) ভীমাভিরক্ষিতং (ভীমকর্তৃক রক্ষিত) ইদম্ বলম্ (এই সেনা) পর্যাপ্তম্ (পরিমিত)।

ভীষ্মকর্তৃক সম্যক্ রক্ষিত আমাদের সেনা অপরিমিত। আর ভীমকর্তৃক রক্ষিত পাণ্ডবদের সেনা পরিমিত (অপেক্ষাকৃত অল্প)। ১০

অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব এব হি ॥ ১১
তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥ ১২

তাৎপর্য এই, আমাদের সৈন্য অপরিমিত অর্থাৎ অতি বৃহৎ, তাহাতে বীরশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম আমাদের সেনাপতি; আর উহাদের সৈন্য পরিমিত অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, আর নগণ্য ভীম উহাদের সেনাপতি—সুতরাং আমাদের জয় হইবে না কেন? ১০

'পর্যাপ্ত ও অপর্যাপ্ত' শব্দের দুইটি অর্থ আছে।— (১) পর্যাপ্ত (পরি-আপ্ +ক্ত) শব্দের ধাত্বর্থ, যাহা আয়ত্ত করা যায়; পরিমাণ করা যায়, **পরিমিত, সীমাবদ্ধ**; আর 'অপর্যাপ্ত' অর্থ—**অপরিমিত, অসংখ্য**। অনুবাদে এই অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। (২) পর্যাপ্ত শব্দের অপর অর্থ প্রয়োজনের পক্ষে **যথেষ্ট, সমর্থ**, এবং 'অপর্যাপ্ত' অর্থ **অপ্রচুর, অসমর্থ**। শ্রীধর স্বামীর টীকায় শেষোক্ত ব্যাখ্যাই আছে এবং অনেকেই উহার অনুবর্তন করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে, পরের শ্লোক 'সকলে ভীষ্মকে রক্ষা করুন' এ কথায় বুঝা যায় যে, দুর্যোধনের মনে কিছু ভয়ের উদ্রেক হইয়াছিল এবং তিনি নিজের সৈন্যবল অপ্রচুর বা অসমর্থ মনে করিতেছেন। কিন্তু দুর্যোধনের ভয় পাওয়ার কথা মহাভারতের কোথাও নাই। বরং ঠিক ইহার বিপরীত কথাই আছে। ইহার পূর্বে দুর্যোধন পিতাকে বলিতেছেন—'আমার সৈন্যবল পাণ্ডবদের সৈন্যবল অপেক্ষা অনেক বেশী, স্বয়ং ভীষ্ম আমার সেনাপতি, প্রধান প্রধান রাজন্যবৃন্দ আমার জন্য প্রাণদানে প্রস্তুত, আপনি ভয় করিবেন না' ('ন ভেতব্যং মহারাজ' ইত্যাদি—মভা, উ ১-৬৯)। আবার পরেও দ্রোণাচার্যের নিকট নিজ সৈন্য বর্ণনায় সৈন্যদলকে উৎসাহিত করিবার জন্য এইরূপ কথাই বলিয়াছেন এবং অবিকল এই শ্লোকটিই তথায় আছে (মভা, ভীষ্ম ৫১।৬।৯)। সুতরাং এস্থলেও এ সকল কথা যে সকলকে উৎসাহ-দানার্থই বলা হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। এই কারণে লোকমান্য তিলক প্রমুখ অনেকে পূর্বোক্ত প্রথম অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন।

তবে 'সকলে ভীষ্মকে রক্ষা করুন' এ কথা বলা হইল কেন? পরবর্তী শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ॥ ১৩

১১। **ভবন্তঃ** সর্বে এব হি (আপনারা সকলেই) সর্বেষু চ অয়নেষু (সকল ব্যূহপ্রবেশ-পথে) যথাভাগম্ (স্ব স্ব বিভাগানুসারে) **অবস্থিতাঃ** (**অবস্থিত** হইয়া) **ভীষ্মম্** এব (ভীষ্মকেই) অভিরক্ষন্তু (রক্ষা করিতে থাকুন)।

আপনারা সকলেই স্ব স্ব বিভাগানুসারে সমস্ত ব্যূহদ্বারে অবস্থিত থাকিয়া ভীষ্মকেই সকল দিক্ হইতে রক্ষা করিতে থাকুন। ১১

ভীষ্ম সমরে অপরাজেয়, তাঁহার জন্য দুর্যোধনের এত আশঙ্কা কেন এবং 'সকলে ভীষ্মকে রক্ষা করুন' একথা বলেন কেন?—আশঙ্কার কারণ আছে এবং সে কথা দুর্যোধন পূর্বে স্পষ্টই বলিয়াছেন (মভা, ভীষ্ম, ১৫।১৪-২০)। সে স্থলে দুর্যোধন বলিতেছেন—'ভীষ্ম একাই সসৈন্য পাণ্ডবগণকে বধ করিতে পারেন, কিন্তু তিনি শিখণ্ডীকে বধ করিবেন না, সুতরাং সকলে সতর্ক হইয়া সর্ব দিক্ হইতে ভীষ্মকে রক্ষা করিবেন, আমরা যেন জম্বুক-শিখণ্ডী দ্বারা অতর্কিতভাবে ভীষ্মসিংহকে বধ না করাই' ('মা সিংহং জম্বুকেনেব ঘাতয়ামঃ শিখণ্ডিনা')।

১২। প্রতাপবান্ কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ (ভীষ্ম) তস্য (তাঁহার) **হর্ষং** (আনন্দ) সংজনয়ন্ (জন্মাইয়া) উচ্চৈঃ সিংহনাদং বিনদ্য (উচ্চ সিংহনাদ করিয়া) শঙ্খং দধ্মৌ (শঙ্খধ্বনি করিলেন)।

উভয় পক্ষের শঙ্খধ্বনি ১২-২০

তখন প্রতাপশালী কুরুবৃদ্ধ পিতামহ তাঁহার (দুর্যোধনের) আনন্দ জন্মাইয়া উচ্চ সিংহনাদ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন। ১২

১৩। ততঃ (তদনন্তর) শঙ্খাঃ চ ভের্যঃ চ (শঙ্খ ও ভেরীসকল) পণব-আনক-গোমুখাঃ (পণব, আনক ও গোমুখ প্রভৃতি) সহসা এব অভ্যহন্যন্ত (সহসা বাদিত হইলে); সঃ শব্দঃ (সেই শব্দ) তুমুলঃ অভবৎ (তুমুল হইয়া উঠিল)।

তখন শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনক, গোমুখ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সহসা বাদিত হইলে সে শব্দ তুমুল হইয়া উঠিল। ১৩

[**পণব=মৃদঙ্গ, আনক=ঢাক, গোমুখ=রণশঙ্খ**; সেকালেও যুদ্ধসময়ে নানাবিধ রণবাদ্য হইত। সেকালের বিউগ্‌ল্ (bugle) ছিল শঙ্খ।]

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ॥ ১৪
পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ॥ ১৫
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ॥ ১৬
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ॥ ১৭
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্॥ ১৮

১৪। ততঃ (তদনন্তর) শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ যুক্তে (শ্বেতবর্ণ অশ্বযুক্ত) মহতি স্যন্দনে (মহারথে) স্থিতৌ (স্থিত, আরূঢ়) মাধবঃ পাণ্ডবঃ চ এব (শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন) দিব্যৌ শঙ্খৌ (দিব্য শঙ্খদ্বয়) প্রদধ্মতুঃ (বাজাইলেন)।

অনন্তর শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথে স্থিত শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন দিব্য-শঙ্খ-ধ্বনি করিলেন। ১৪

১৫-১৬। হৃষীকেশঃ (শ্রীকৃষ্ণ) পাঞ্চজন্যং (পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ), ধনঞ্জয়ঃ (অর্জুন) দেবদত্তং (দেবদত্ত নামক শঙ্খ), ভীমকর্মা (লোকের ভীতিজনক কর্মকারী) বৃকোদরঃ (ভীম) মহাশঙ্খং পৌণ্ড্রং (পৌণ্ড্র নামক বৃহৎ শঙ্খ) দধ্মৌ (বাজাইলেন), কুন্তীপুত্রঃ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ অনন্তবিজয়ং (অনন্তবিজয় নামক শঙ্খ), নকুলঃ সহদেবঃ চ (নকুল ও সহদেব) সুঘোষ-মণিপুষ্পকৌ (সুঘোষ ও মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ) [দধ্মৌ = বাজাইলেন]।

শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য নামে শঙ্খ, অর্জুন দেবদত্ত নামক শঙ্খ এবং ভীমকর্মা ভীম পৌণ্ড্র নামক মহাশঙ্খ বাজাইলেন। কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় নামক শঙ্খ, নকুল সুঘোষ নামক শঙ্খ এবং সহদেব মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ বাজাইলেন। ১৫-১৬

১৭-১৮। [হে] পৃথিবীপতে (রাজন্), পরমেষ্বাসঃ (মহাধনুর্ধর) কাশ্যঃ চ (কাশীরাজ), মহারথঃ শিখণ্ডী চ, ধৃষ্টদ্যুম্নঃ, বিরাটঃ চ, অপরাজিতঃ সাত্যকিঃ চ

স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্॥ ১৯
অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে॥ ২০

অর্জুন উবাচ

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত॥ ২১

দ্রুপদঃ, দ্রৌপদেয়াঃ চ (দ্রৌপদীর পুত্রগণ), মহাবাহুঃ সৌভদ্রঃ চ (এবং সুভদ্রা-নন্দন), সর্বশঃ (সকলে, সকল দিক্ হইতে) পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খান্ দধ্মুঃ (শঙ্খ বাজাইলেন)।

হে রাজন্, মহাধনুর্ধর কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট রাজা, অজেয় সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, মহাবাহু সুভদ্রা-পুত্র—ইঁহারা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খ বাজাইলেন। ১৭-১৮

১৯। সঃ (সেই) তুমুলঃ (উৎকট) ঘোষঃ (শব্দ) নভঃ চ পৃথিবীং চ এব (আকাশ ও পৃথিবীকে) অভি-অনুনাদয়ন্ (প্রতিধ্বনিপূর্ণ করিয়া) ধার্তরাষ্ট্রাণাং (ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয়গণের) হৃদয়ানি (হৃদয়) ব্যদারয়ৎ (বিদীর্ণ করিল)।

সেই তুমুল শব্দ আকাশ ও পৃথিবীতে প্রতিধ্বনিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ ও তৎপক্ষীয়গণের হৃদয় বিদীর্ণ করিল। ১৯

২০। [হে] মহীপতে (রাজন্), অথ (অনন্তর) কপিধ্বজঃ পাণ্ডবঃ (কপিধ্বজ পাণ্ডুপুত্র অর্জুন) ধার্তরাষ্ট্রান্ (ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয়দিগকে) ব্যবস্থিতান্ (যুদ্ধোদ্যোগে অবস্থিত) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) শস্ত্রসম্পাতে (শস্ত্র নিক্ষেপে) প্রবৃত্তে (প্রবৃত্ত হইলে) ধনুঃ উদ্যম্য (ধনু উত্তোলন করিয়া) তদা (তখন) হৃষীকেশম্ (কৃষ্ণকে) ইদং বাক্যং (এই বাক্য) আহ (বলিলেন)।

হে রাজন্, অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয়দিগকে যুদ্ধোদ্যোগে অবস্থিত দেখিয়া শস্ত্রনিক্ষেপে প্রবৃত্ত কপিধ্বজ অর্জুন ধনু উত্তোলন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন। ২০

২১-২৩। অর্জুনঃ উবাচ (কহিলেন)—হে অচ্যুত, যাবৎ (যতক্ষণ) অহং (আমি) যোদ্ধুকামান্ অবস্থিতান্ (যুদ্ধকামনায় অবস্থিত) এতান্

যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ২২
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥ ২৪
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥ ২৫

(ইহাদিগকে) নিরীক্ষে (দেখি), [তাবৎ] উভয়োঃ (উভয়) সেনয়োঃ (সেনার) মধ্যে রথং স্থাপয় (রথ স্থাপন কর); অস্মিন্ (এই) রণসমুদ্যমে (যুদ্ধ ব্যাপারে, যুদ্ধোদ্‌যোগে) কৈঃ সহ (কাহাদিগের সহিত) ময়া যোদ্ধব্যম্ (আমার যুদ্ধ করিতে হইবে) [তাহা দেখি]; যুদ্ধে দুর্বুদ্ধেঃ (দুষ্টবুদ্ধি) ধার্তরাষ্ট্রস্য (দুর্যোধনের) প্রিয়চিকীর্ষবঃ (হিতৈষীগণ) যে এতে (এই যে সকল রাজা) অত্র (এখানে) সমাগতাঃ (উপস্থিত হইয়াছেন) যোৎস্যমানান্ [তান্] (যুদ্ধার্থী তাহাদিগকে) অহং (আমি) অবেক্ষে (দেখি)।

সৈন্য নিরীক্ষণ ২১-২৭

অর্জুন বলিলেন, হে অচ্যুত, যুদ্ধকামনায় অবস্থিত ইহাদিগকে যে পর্যন্ত আমি দর্শন করি, সে পর্যন্ত (তুমি) উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর, এই যুদ্ধ-ব্যাপারে কাহাদিগের সহিত আমার যুদ্ধ করিতে হইবে আমি দেখি ; দুর্বুদ্ধি দুর্যোধনের হিতকামনায় যাঁহারা এখানে উপস্থিত হইয়াছেন সেই সকল যুদ্ধার্থিগণকে আমি দেখি। ২১-২৩

২৪-২৫। সঞ্জয়ঃ উবাচ (কহিলেন)—[হে] ভারত, গুড়াকেশেন (অর্জুন কর্তৃক) এবম্ (এইরূপ) উক্তঃ (অভিহিত হইয়া) হৃষীকেশঃ (শ্রীকৃষ্ণ) উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে (উভয় সেনার মধ্যে) ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাং মহীক্ষিতাং চ [প্রমুখতঃ] (ভীষ্ম-দ্রোণ ও সকল রাজাদিগের সম্মুখে) রথোত্তমং (উৎকৃষ্ট রথ) স্থাপয়িত্বা (স্থাপন করিয়া), "হে পার্থ (অর্জুন),

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথপিতামহান্।
আচার্যান্মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬
তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২৭

এতান্ সমবেতান্ (এই সকল সমবেত) কুরূন্ (কুরুগণকে) পশ্য (দেখ)”— ইতি (ইহা) উবাচ (বলিলেন)।

সঞ্জয় বলিলেন, হে ভারত, অর্জুনকর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ উভয় সেনার মধ্যে ভীষ্ম-দ্রোণ এবং সমস্ত রাজগণের সম্মুখে উৎকৃষ্ট রথ স্থাপন করিয়া বলিলেন, “হে অর্জুন, সমবেত কুরুগণকে দেখ।” ২৪-২৫

ভারত—(এখানে) ধৃতরাষ্ট্র। অন্যত্র অর্জুনকেও ‘ভারত’ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ ইঁহারা উভয়েই দুষ্মন্ত রাজার পুত্র ভরতের বংশধর। **গুড়াকেশ**—গুড়াকা (নিদ্রা, আলস্য) তাহার ঈশ, অর্থাৎ যিনি নিদ্রা জয় করিয়াছেন, নিদ্রালস্যজয়ী অর্জুন। **হৃষীকেশ**—হৃষীক ইন্দ্রিয়, তাহার ঈশ, ইন্দ্রিয়গণের প্রভু, শ্রীকৃষ্ণ।

২৬। অথ পার্থঃ তত্র (তথায়) উভয়োঃ সেনয়োঃ অপি (উভয় সেনার মধ্যেই) স্থিতান্ (অবস্থিত) পিতৄন্ (পিতৃব্যগণকে), পিতামহান্, আচার্যান্, মাতুলান্, ভ্রাতৄন্, পুত্রান্, পৌত্রান্, তথা সখীন্ (এবং মিত্রগণকে), শ্বশুরান্ চ এব সুহৃদঃ (সুহৃদ্‌গণকে) অপশ্যৎ (দেখিলেন)।

তখন অর্জুন উভয় সেনার মধ্যেই অবস্থিত পিতৃব্যগণ, পিতামহগণ, আচার্যগণ, মাতুলগণ, ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ, পৌত্রগণ, মিত্রগণ, শ্বশুরগণ ও সুহৃদগণকে দেখিলেন। ২৬

সখা—সমান প্রকৃতিবিশিষ্ট বয়স্যস্থানীয় আত্মীয়; **সুহৃদ্—শুভানুধ্যায়ী,** সাহায্যকারী আত্মীয়।

২৭। সঃ কৌন্তেয়ঃ (সেই অর্জুন) অবস্থিতান্ (যুদ্ধার্থে প্রস্তুত) তান্ সর্বান্ বন্ধূন্ (সেই সমস্ত বন্ধুজনকে) সমীক্ষ্য (দেখিয়া) পরয়া কৃপয়া আবিষ্টঃ (পরম কৃপাবিষ্ট) [অতএব] বিষীদন্ (বিষণ্ণ হইয়া) ইদম্ অব্রবীৎ (ইহা বলিলেন)।

অর্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেমাম্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাং ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥ ২৯

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০

সেই কুন্তীপুত্র অর্জুন বন্ধুবান্ধবদিগকে যুদ্ধার্থে অবস্থিত দেখিয়া নিতান্ত করুণার্দ্র হইয়া বিষাদপূর্বক এই কথা বলিলেন। ২৭

২৮। অর্জুনঃ উবাচ—হে কৃষ্ণ, যুযুৎসূন্ (যুদ্ধেচ্ছু) ইমান্ স্বজনান্ (এই সকল আত্মীয়-স্বজনকে) সমবস্থিতান্ (সম্মুখে অবস্থিত) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া), মম গাত্রাণি সীদন্তি (আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে), মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি (মুখও শুষ্ক হইতেছে)।

অর্জুন-বিষাদ ২৮-৩৭

অর্জুন বলিলেন, হে কৃষ্ণ, যুদ্ধেচ্ছু এই সকল স্বজনদিগকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে এবং মুখ শুষ্ক হইতেছে। ২৮

২৯। মে (আমার) শরীরে বেপথুঃ চ (কম্প) রোমহর্ষঃ চ (ও রোমাঞ্চ) জায়তে (হইতেছে); হস্তাৎ (হাত হইতে) গাণ্ডীবং স্রংসতে (খসিয়া পড়িতেছে), ত্বক্ চ (এবং চর্মও) পরিদহ্যতে (জ্বালা করিতেছে)।

আমার শরীরে কম্প ও রোমাঞ্চ হইতেছে; হাত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িতেছে এবং চর্ম জ্বালা করিতেছে। ২৯

৩০। [হে] কেশব, [অহং] অবস্থাতুং চ (অবস্থান করিতে) ন শক্নোমি (পারিতেছি না); মে (আমার) মনঃ চ ভ্রমতিইব(যেন ঘুরিতেছে); বিপরীতানি নিমিত্তানিচ(কুলক্ষণ সকলও)পশ্যামি (দেখিতেছি)।

হে কেশব, আমি স্থির থাকিতে পারিতেছি না; আমার মন যেন ঘুরিতেছে; আমি দুর্লক্ষণসকল দেখিতেছি। ৩০

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥ ৩১
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥ ৩২
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥ ৩৪

৩১। আহবে (যুদ্ধে) স্বজনং হত্বা (স্বজনগণকে নিহত করিয়া) **শ্রেয়ঃ** (**মঙ্গল**) **ন চ অনুপশ্যামি** (দেখিতেছি না); হে কৃষ্ণ, বিজয়ং রাজ্যং সুখানি চ (বিজয়, রাজ্য, সুখ) ন কাঙ্ক্ষে (চাহি না)।

যুদ্ধে স্বজনদিগকে নিহত করিয়া আমি মঙ্গল দেখিতেছি না। হে কৃষ্ণ, আমি জয়লাভ করিতে চাহি না, রাজ্যও চাহি না, সুখভোগও চাহি না। ৩১

৩২-৩৪। [হে] গোবিন্দ, যেষাম্ অর্থে (যাহাদের জন্য) নঃ (আমাদের) রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ (রাজ্য, ভোগ ও সুখ) কাঙ্ক্ষিতং (কামনা করা যায়) তে ইমে (সেই এই সকল) আচার্যাঃ (আচার্যগণ), পিতরঃ (পিতৃব্যগণ) পুত্রাঃ চ, তথা এব পিতামহাঃ (পুত্রগণ ও পিতামহেরা), মাতুলাঃ, শ্বশুরাঃ, পৌত্রাঃ, শ্যালাঃ (শ্যালকেরা) তথা (ও) সম্বন্ধিনঃ (কুটুম্বগণ) প্রাণান্ ধনানি চ ত্যক্ত্বা (ধনপ্রাণ ত্যাগ করিয়া) অবস্থিতাঃ (যুদ্ধে অবস্থিত রহিয়াছেন), [অতএব] নঃ (আমাদের) রাজ্যেন কিম্ (রাজ্যে কি প্রয়োজন)? ভোগৈঃ জীবিতেন বা কিম্ (ভোগ বা জীবনেই বা কি প্রয়োজন)? হে মধুসূদন, ঘ্নতঃ অপি (আমাকে হত্যা করিলেও) [আমি] এতান্ (ইহাদিগকে) হন্তুম্ (হত্যা করিতে) ন ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি না)।

হে গোবিন্দ, যাঁহাদিগের জন্য রাজ্য ভোগ সুখাদি কামনা করা যায় সেই আচার্য, পিতৃব্য-পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক ও কুটুম্বগণ যখন ধনপ্রাণ ত্যাগ স্বীকার করিয়াও যুদ্ধার্থে উপস্থিত, তখন আমাদের রাজ্যেই বা কি কাজ? আর সুখভোগ বা জীবনেই

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দন ॥ ৩৫
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৬

বা কি কাজ ? হে মধুসূদন, যদি ইঁহারা আমাকে মারিয়াও ফেলেন, তথাপি আমি ইঁহাদিগকে মারিতে ইচ্ছা করি না। ৩২-৩৪

একাকী কেহ রাজ্যভোগ করিতে পারে না। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব লইয়াই রাজ্যভোগ করিয়া থাকে। তাঁহারাই যখন যুদ্ধার্থে উপস্থিত, তখন আর রাজ্যে কি প্রয়োজন ?

৩৫। হে জনার্দন (কৃষ্ণ), ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য (ত্রৈলোক্য রাজ্যের), হেতোঃ অপি (নিমিত্তও), মহীকৃতে (পৃথিবীর জন্য) কিং নু (কি কথা ?), ধার্তরাষ্ট্রান্ (ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে) নিহত্য (বধ করিয়া) নঃ (আমাদের) কা প্রীতিঃ স্যাৎ (কি সুখ হইবে) ?

হে কৃষ্ণ, পৃথিবীর রাজত্বের কথা দূরে থাক, ত্রৈলোক্য রাজ্যের জন্যই বা দুর্যোধনাদিকে বধ করিলে আমাদের কি সুখ হইবে ? ৩৫

৩৬। আততায়িনঃ (আততায়ী) [অপি = হইলেও] এতান্ (ইঁহাদিগকে) হত্বা (বধ করিয়া) অস্মান্ (আমাদিগকে) পাপম্ এব (পাপই) আশ্রয়েৎ (আশ্রয় করিবে)। তস্মাৎ (সেই হেতু) বয়ং (আমরা) সবান্ধবান্ (সবান্ধব) ধার্তরাষ্ট্রান্ (ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগকে) হন্তুং ন অর্হাঃ (বধ করিতে পারি না) ; হি যেহেতু), হে মাধব, স্বজনং হত্বা কথং (স্বজন বধ করিয়া কি প্রকারে) সুখিনঃ স্যাম (সুখী হইব) ?

যদিও ইহারা আততায়ী (এবং আততায়ী শাস্ত্রমতে বধ্য), তথাপি এই আচার্যাদি গুরুজনকে বধ করিলে আমরা পাপভাগীই হইব। অতএব আমরা সবান্ধব ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগকে বধ করিতে পারি না। হে মাধব, স্বজন-বধ করিয়া আমরা কি প্রকারে সুখী হইব ? ৩৬

আততায়ী—অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ।
ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ।

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্॥ ৩৭
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দন॥ ৩৮
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্মোঽভিভবত্যুত॥ ৩৯

অগ্নিদ (যে ঘরে আগুন দেয়), গরদ (যে বিষ দেয়), বধার্থ অস্ত্রধারী, ধনাপহারী, ভূমি-অপহারী, দারাহরণকারী—এই ছয় জন আততায়ী। দুর্যোধনাদি প্রায় এ সমস্ত কর্মই করিয়াছেন; সুতরাং তাহারা আততায়ী।

শাস্ত্রমতে আততায়ী বধে পাপ নাই (মনু, ৮।৩৫০-৫১)। কিন্তু অর্জুন বলিতেছেন, আততায়ী হইলেও ইঁহাদিগের বধে পাপ হইবে। কেন? টীকাকারগণ বলেন, শাস্ত্র দুই প্রকার—অর্থশাস্ত্র (law) ও ধর্মশাস্ত্র (morality)। অর্থশাস্ত্রে আছে, আততায়ী বধ্য; কিন্তু ধর্মশাস্ত্রে আবার আছে, 'অহিংসা পরম ধর্ম', 'গুরুজনাদি অবধ্য', 'ন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাৎ' ইত্যাদি। "অর্থশাস্ত্রাত্তু বলবদ্ধর্মশাস্ত্রম্"—অর্থশাস্ত্র হইতে ধর্মশাস্ত্র বলবৎ। সুতরাং আততায়ী হইলেও গুরুজনাদি বধে পাপভাগী হইতে হইবে, ইহাই অর্জুনোক্তির মর্ম।

কুলক্ষয়াদি পাপের পরিণাম চিন্তা ৩৮-৪৪

৩৭-৩৮। যদ্যপি লোভোপহতচেতসঃ (লোভে অভিভূত-চিত্ত) এতে (ইঁহারা) কুলক্ষয়কৃতং দোষং (কুলক্ষয়কৃত দোষ) মিত্রদ্রোহে পাতকং চ (এবং মিত্রদ্রোহে পাপ) ন পশ্যন্তি (দেখিতেছে না), [হে] জনার্দন, **কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভিঃ** (কুলক্ষয়কৃত দোষের দর্শক) **অস্মাভিঃ** (আমাদিগকর্তৃক) অস্মাৎ পাপাৎ (এই পাপ হইতে) নিবর্তিতুম্ কথং ন **জ্ঞেয়ম্** (নিবৃত্ত হইবার জ্ঞান কেন না হইবে)?

যদিও ইঁহারা লোভে হতজ্ঞান হইয়া কুলক্ষয়জনিত দোষ এবং মিত্রদ্রোহ-জনিত পাতক দেখিতেছেন না, কিন্তু হে জনার্দন, আমরা কুলক্ষয়-জনিত দোষ দেখিয়াও সে পাপ হইতে নিবৃত্ত হইব না কেন? ৩৭-৩৮

৩৯। কুলক্ষয়ে সনাতনাঃ কুলধর্মাঃ প্রণশ্যন্তি (বিনষ্ট হয়); উত ধর্মে

অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥ ৪০

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥ ৪১

নষ্টে (ও ধর্ম নষ্ট হইলে) অধর্মঃ কৃৎস্নং (সমগ্র) কুলম্ (কুলকে) অভিভবতি (অভিভূত করে।)।

কুলক্ষয় হইলে সনাতন কুলধর্ম নষ্ট হয়; এবং ধর্ম নষ্ট হইলে সমগ্র কুল অধর্মে অভিভূত হয়। ৩৯

সনাতন কুলধর্ম—পূর্বপুরুষ-পরম্পরাগত ধর্ম। বংশের বয়স্ক পুরুষগণ সমস্ত বিনষ্ট হইলে কুলাগত আচার-নিয়মাদি রক্ষা করা হয় না। সুতরাং বংশের স্ত্রী ও বালকগণ ক্রমশঃ উন্মার্গগামী হওয়াতে বংশ অধর্মাক্রান্ত হইয়া উঠে। ৩৯

৪০। হে কৃষ্ণ, অধর্মাভিভবাৎ (অধর্মাভিভব হইতে) কুলস্ত্রিয়ঃ (কুলস্ত্রীগণ) প্রদুষ্যন্তি (ব্যভিচারিণী হয়); হে বার্ষ্ণেয় (কৃষ্ণ), স্ত্রীষু দুষ্টাসু (স্ত্রীগণ দুষ্টা হইলে) বর্ণসঙ্করঃ জায়তে (বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়)।

হে কৃষ্ণ, কুল অধর্মে অভিভূত হইলে কুলস্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী হয়। হে বার্ষ্ণেয় (বৃষ্ণিবংশীয়), কুলনারীগণ ব্যভিচারিণী হইলে বর্ণসঙ্কর জন্মে। ৪০

বার্ষ্ণেয়—বৃষ্ণিবংশসম্ভূত (কৃষ্ণ)। **বর্ণসঙ্কর**—বিভিন্ন বর্ণের স্ত্রী-পুরুষ সংযোগে সন্তান-উৎপত্তি।

৪১। সঙ্করঃ (বর্ণসঙ্কর) কুলঘ্নানাং (কুলনাশকারীদিগের) কুলস্য চ (এবং কুলের) নরকায় এব (নরকের নিমিত্তই) [হয়]; হি (যেহেতু) এষাং (ইহাদের) লুপ্ত-পিণ্ড-উদক-ক্রিয়াঃ (শ্রাদ্ধ-তর্পণ-বিরহিত) পিতরঃ (পিতৃপিতামহগণ) পতন্তি (পতিত হয়)।

বর্ণসঙ্কর, কুলনাশকারীদের এবং কুলের নরকের কারণ হয়। শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি ক্রিয়ার লোপ হওয়াতে ইহাদের পিতৃপুরুষ নরকে পতিত হয়। (সদ্গতি প্রাপ্ত হয় না)। ৪১

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪২
উৎসন্নকুলধর্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ৪৩
অহোবত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৪
যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৫

৪২। কুলঘ্নানাং (কুলনাশকারীদিগের) এতৈঃ (এই সকল) বর্ণসঙ্করকারকৈঃ (বর্ণসঙ্করকারক) দোষৈঃ (দোষে) শাশ্বতাঃ (সনাতন) জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাঃ চ (জাতিধর্ম-কুলধর্মাদি) উৎসাদ্যন্তে (উৎসন্ন যায়) ('চ' পদে আশ্রমধর্মাদিও গ্রহণীয়)।

কুলনাশকারীদের বর্ণসঙ্করকারক ঐ দোষে সনাতন জাতিধর্ম, কুলধর্ম ও আশ্রমধর্মাদিও উৎসন্ন যায়। ৪২

জাতিধর্ম—বর্ণধর্ম, যথা—ব্রাহ্মণের অধ্যাপনাদি, ক্ষত্রিয়ের প্রজারক্ষাদি, বৈশ্যের কৃষি-বাণিজ্যাদি, শূদ্রের পরিচর্যাদি। **কুলধর্ম**—কৌলিক উপাসনা-পদ্ধতি ও আচার-নিয়মাদি। **আশ্রমধর্ম**—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস। ৪২

৪৩। [হে] জনার্দন, উৎসন্ন-কুলধর্মাণাং (যাহাদের কুলধর্ম উৎসন্ন গিয়াছে) মনুষ্যাণাং (সেই মানুষদিগের) নিয়তং (চিরদিন) নরকে বাসঃ ভবতি (হইয়া থাকে) ইতি (ইহা) অনুশুশ্রুম (আমরা শুনিয়াছি)।

হে জনার্দন, যে মনুষ্যদিগের কুলধর্ম উৎসন্ন যায়, তাহাদের নিয়ত নরকে বাস হয়, ইহা আমরা শুনিয়াছি। ৪৩

৪৪। অহোবত (হায় কি কষ্ট), বয়ং (আমরা) মহৎ পাপং কর্ত্তুং (মহাপাপ করিতে) ব্যবসিতাঃ (প্রবৃত্ত, কৃতনিশ্চয়); যৎ (যেহেতু) রাজ্যসুখলোভেন (রাজ্যসুখ-লোভে) স্বজনং হন্তুং উদ্যতাঃ (স্বজনগণকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি)।

হায়, আমরা রাজ্যসুখ-লোভে স্বজনগণকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়া মহাপাপে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ৪৪

৪৫। যদি অপ্রতীকারম্ (প্রতিকারে বিরত) অশস্ত্রম্ (শস্ত্রহীন)

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৬

মাং (আমাকে) শস্ত্রপাণয়ঃ (শস্ত্রধারী) ধার্তরাষ্ট্রাঃ (ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রেরা) রণে হন্যুঃ (যুদ্ধে বধ করে) তৎ (তাহা) মে (আমার) ক্ষেমতরং (অধিকতর কল্যাণকর) ভবেৎ (হইবে)।

যুদ্ধ না করা অভিপ্রায়—ধনুর্বাণ ত্যাগ ৪৫-৪৬

আমি শস্ত্রত্যাগ করিয়া প্রতিকারে বিরত হইলে যদি শস্ত্রধারী দুর্যোধনাদি আমাকে যুদ্ধে বধ করে, তাহাও আমার পক্ষে অধিকতর মঙ্গলকর হইবে। ৪৫

৪৬। সঞ্জয়ঃ উবাচ (কহিলেন)—শোকসংবিগ্নমানসঃ (শোকাকুলচিত্ত) অর্জুনঃ এবম্ উক্ত্বা (এইরূপ বলিয়া) সংখ্যে (যুদ্ধে) সশরং চাপং (শরসহিত ধনু) বিসৃজ্য (ত্যাগ করিয়া) রথোপস্থে (রথোপরি) উপাবিশৎ (উপবেশন করিলেন)।

সঞ্জয় কহিলেন, শোকাকুলিত অর্জুন এইরূপ বলিয়া যুদ্ধমধ্যে ধনুর্বাণ ত্যাগ করিয়া রথোপরি উপবেশন করিলেন। ৪৬

প্রথম অধ্যায়—বিশ্লেষণ ও সার-সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ের নাম **'সৈন্যদর্শন'** বা **'অর্জুন-বিষাদ'** যোগ। ইহাতে তত্ত্ব-কথা কিছু নাই, কিন্তু কাব্যাংশে ইহা অতুলনীয়। কুরুক্ষেত্রে মহাযুদ্ধ আরব্ধপ্রায়, উভয়পক্ষীয় সুসজ্জিত সৈন্যগণ ব্যূহবদ্ধ হইয়া পরস্পর সম্মুখীন, যোদ্ধগণ মহোৎসাহে সিংহনাদ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন—রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল—শস্ত্রসম্পাত আরম্ভ হইল। তখন অর্জুনের মহানির্বেদ উপস্থিত। তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল, মুখ শুকাইল, দেহ অবসন্ন হইল, হস্ত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িল। কৃপাবিষ্ট অর্জুনের মোহভাব কাব্যতুলিকায় নিঃস্বার্থ উদার করুণরসে অনুরঞ্জিত, যেমন চিত্তমোহকর তেমন প্রাণস্পর্শী।

ইতি শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে **অর্জুনবিষাদ-যোগো নাম** প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাংখ্যযোগ

সঞ্জয় উবাচ

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১

শ্রীভগবান্ উবাচ

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন ॥ ২

১। সঞ্জয়ঃ উবাচ—মধুসূদনঃ তথা (উক্ত প্রকারে) কৃপয়া আবিষ্টং (কৃপাবিষ্ট) অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্ (অশ্রুপূর্ণাকুললোচন) বিষীদন্তম্ (বিষণ্ণ) তম্ (তাহাকে অর্থাৎ অর্জুনকে) ইদং বাক্যম্ উবাচ (এই বাক্য কহিলেন)।

শ্রীভগবানের ক্ষত্রোচিত তিরস্কার ও উৎসাহ-বাক্য ১-৩

সঞ্জয় বলিলেন, তখন মধুসূদন কৃপাবিষ্ট অশ্রুপূর্ণলোচন বিষণ্ণ অর্জুনকে এই কথা বলিলেন। ১

দয়া ও কৃপা—দয়া ও কৃপা স্বতন্ত্র ভাব। লোকের দুঃখে দুঃখিত হইয়া যে দুঃখমোচনের প্রবল প্রবৃত্তি তাহাকে দয়া বলে। পরের দুঃখচিন্তায় বা দুঃখ দর্শনে কাতর হওয়া, এই ভাবকে কৃপা বলে। কাতরতা দয়া নহে, কৃপা। দয়া বলবানের ধর্ম।—শ্রীঅরবিন্দ।

২। শ্রীভগবান্ উবাচ—হে অর্জুন, বিষমে (সঙ্কট কালে) কুতঃ (কোথা হইতে) অনার্যজুষ্টম্ (অনার্য-জনোচিত, শিষ্টবিগর্হিত), অস্বর্গ্যম্ (স্বর্গহানিকর), অকীর্তিকরম্ (অযশস্কর), ইদম্ (এইরূপ) কশ্মলম্ (মোহ) ত্বা (তোমাকে) সমুপস্থিতম্ (প্রাপ্ত হইল)?

শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে অর্জুন, এই সঙ্কট সময়ে অনার্য-জনোচিত, স্বর্গহানিকর, অকীর্তিকর তোমার এই মোহ কোথা হইতে উপস্থিত হইল? ২

অনার্যজুষ্টম্—যাহা আর্যজনোচিত নহে, যেমন ন্যায়যুদ্ধে পরাঙ্মুখতা।

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩

অর্জুন উবাচ

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪

৩। [হে] পার্থ, ক্লৈব্যং (কাতরতা, পৌরুষহীনতা) মাস্ম গমঃ (প্রাপ্ত হইও না); এতৎ (ইহা) ত্বয়ি (তোমাতে) ন উপপদ্যতে (উপযুক্ত হয় না)। হে পরন্তপ, ক্ষুদ্রং (তুচ্ছ) হৃদয়দৌর্বল্যং (হৃদয়ের দুর্বলতা) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) উত্তিষ্ঠ (উত্থান কর)।

হে পার্থ, কাতর হইও না। এইরূপ পৌরুষহীনতা তোমাতে শোভা পায় না। হে পরন্তপ, তুচ্ছ হৃদয়ের দুর্বলতা ত্যাগ করিয়া (যুদ্ধার্থে) উত্থিত হও। ৩

"যে কৃপার বশে অস্ত্র পরিত্যাগ করে, ধর্মে পরাঙ্মুখ হয়, কাঁদিতে বসিয়া ভাবে আমার কর্তব্য করিতেছি, আমি পুণ্যবান্—সে ক্লীব।" "শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, অর্জুন কৃপায় আবিষ্ট হইয়াছেন, বিষাদ তাঁহাকে গ্রাস করিয়াছে। এই তামসিক ভাব অপনোদন করিবার জন্য অন্তর্যামী তাঁহার প্রিয়সখাকে ক্ষত্রিয়োচিত তিরস্কার করিলেন, তাহাতে যদি রাজসিক ভাব জাগরিত হইয়া তমঃকে দূর করে।"—শ্রীঅরবিন্দ।

৪। অর্জুনঃ উবাচ (বলিলেন)—[হে] অরিসূদন (শত্রুমর্দন) মধুসূদন (কৃষ্ণ), কথং অহং (আমি) সংখ্যে (যুদ্ধে) পূজার্হৌ (পূজনীয়) ভীষ্মং দ্রোণং চ (ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত) ইষুভিঃ (বাণের দ্বারা) প্রতিযোৎস্যামি (প্রতিযুদ্ধ করিব)?

অর্জুনের উত্তর—কর্তব্য-নির্ণয়ার্থ উপদেশ প্রার্থনা। ৪-১০

অর্জুন বলিলেন, হে শত্রুমর্দন মধুসূদন, আমি যুদ্ধকালে পূজনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত কিরূপে বাণের দ্বারা প্রতিযুদ্ধ করিব? (অর্থাৎ তাঁহারা আমার শরীরে বাণ নিক্ষেপ করিলেও আমি গুরুজনের অঙ্গে অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে পারিব না)। ৪

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধির-প্রদিগ্ধান্ ॥ ৫
ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬

৫। মহানুভাবান্ (মহানুভব) গুরূন্ অহত্বা হি (গুরুজনদিগকে বধ না করিয়া) ইহলোকে (এই সংসারে) ভৈক্ষ্যম্ অপি (ভিক্ষান্নও) ভোক্তুং ভোজন করা) শ্রেয়ঃ। তু (কিন্তু) গুরূন্ হত্বা (গুরুজনদিগকে হত্যা করিয়া) ইহ (এই সংসারে) রুধির-প্রদিগ্ধান্ এব (রুধিরলিপ্ত, রক্তমাখা) অর্থকামান্ ভোগান্ (অর্থকামরূপ ভোগ্য-সমূহ) ভুঞ্জীয় (ভোগ করিতে হইবে)।

মহানুভব গুরুজনদিগকে বধ না করিয়া ইহলোকে ভিক্ষান্ন-ভোজন করাও শ্রেয়ঃ। কেননা গুরুজনদিগকে বধ করিয়া ইহলোকে যে অর্থকাম ভোগ করিব তাহা ত (গুরুজনের) রুধির-লিপ্ত। ৫

৬। যৎ বা জয়েম (যদি বা আমরা জয়লাভ করি), যদি বা (অথবা) নঃ (আমাদিগকে) [এতে] জয়েয়ুঃ (ইঁহারা জয় করেন), [এতয়োর্মধ্যে] (এই দুইয়ের মধ্যে) কতরৎ (কোন্‌টি) নঃ গরীয়ঃ (আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর) এতৎ চ (ইহাও) ন বিদ্মঃ (জানি না); যান্ এব হত্বা (যাহাদিগকে বধ করিয়া) ন জিজীবিষামঃ (বাঁচিয়া থাকিতে চাহি না), তে ধার্তরাষ্ট্রাঃ (সেই ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ) প্রমুখে অবস্থিতাঃ (সম্মুখে অবস্থিত রহিয়াছেন)।

আমরা জয়ী হই অথবা আমাদিগকে ইহারা জয় করুক, এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেয়স্কর তাহা বুঝিতে পারিতেছি না—যাহাদিগকে বধ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাহি না, সেই ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ সম্মুখে অবস্থিত। ৬

তাৎপর্য। তুমি ভিক্ষান্ন ভোজনের কথা বলিতেছ, কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তি ত ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নহে। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম—'সংগ্রামেষ্বনিবৃত্তিত্বং প্রজানাঞ্চৈবপালনম্'

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ৭

(মনু)—যুদ্ধে বিমুখ না হওয়া ও প্রজা পালন করা।—তা ঠিক, কিন্তু যুদ্ধে যদি পরাজয় হয়, তবে ফলে সেই ভিক্ষাদ্বারাই হয়ত দিনপাত করিতে হইবে। আর যদি জয় হয়, তবে ভোগসুখ লাভ হইবে বটে, কিন্তু আত্মীয়-গুরুজনদিগকে বধ করিয়া ; এ ক্ষেত্রে জয় এবং পরাজয় ইহার কোন্‌টি যে শ্রেয় সে বিষয়ে আমি সন্দেহাকুল।

৭। কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ (কার্পণ্য দোষে অভিভূত) ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ (ধর্মসম্বন্ধে বিমূঢ়চিত্ত) অহং (আমি) ত্বাং পৃচ্ছামি (তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি) ; যৎ মে শ্রেয়ঃ স্যাৎ (যাহা আমার শ্রেয়) তৎ নিশ্চিতং ব্রূহি (তাহা নিশ্চিতরূপে বল) ; অহং তে (তোমার) শিষ্য, ত্বাং প্রপন্নম্ (তোমার শরণাগত), মাং শাধি (আমাকে উপদেশ দাও)।

(গুরুজনদিগকে বধ করিয়া কিরূপে প্রাণ ধারণ করিব এইরূপ চিন্তাপ্রযুক্ত) চিত্তের দীনতায় আমি অভিভূত হইয়াছি ; প্রকৃত ধর্ম কি এ সম্বন্ধে আমার চিত্ত বিমূঢ় হইয়াছে ; যাহা আমার ভাল হয়, আমাকে নিশ্চিত করিয়া তাহা বল, আমি তোমার শিষ্য, তোমার শরণাপন্ন, আমাকে উপদেশ দাও। (আমাকে আর তুমি সখা বলিয়া মনে করিও না, আমি তোমার শিষ্য)। ৭

পুত্র বা শিষ্যরূপে জিজ্ঞাসু না হইলে গুরু তত্ত্বোপদেশ দেন না, কাজেই তত্ত্বজিজ্ঞাসু অর্জুন লৌকিক 'সখ্য' ভাব ত্যাগ করিয়া ভগবানের 'শিষ্যত্ব' স্বীকার করিলেন। **একান্ত শ্রদ্ধার বশে সম্পূর্ণভাবে ভগবানের শরণাগত হওয়াই গীতার প্রধান শিক্ষা। ইহাই আত্মসমর্পণ।** এই গভীর শ্রদ্ধাবলেই অর্জুন গীতোক্ত শিক্ষার শ্রেষ্ঠপাত্র বলিয়া গৃহীত।

কার্পণ্যদোষোপহতঃ—কৃপণের ভাব কার্পণ্য, কিন্তু এখানে কৃপণ শব্দের অর্থ কি ? কেহ বলেন, কৃপণ অর্থে 'দীন', 'মহাব্যসনপ্রাপ্ত'। যথা—"মহদ্ বা ব্যসনং প্রাপ্তো দীনঃ কৃপণ উচ্যতে"—বাচস্পত্যে তারানাথ-উদ্ধৃত রামায়ণ-বচন। **নীলকণ্ঠও** বলেন—'কার্পণ্যং দীনত্বং।' শ্রীধর বলেন—"ইঁহাদিগকে বধ করিয়া

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্॥ ৮

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ॥ ৯
তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ॥ ১০

কিরূপে বাঁচিয়া থাকিব" অর্জুনের এই যে বুদ্ধি ইহাই কার্পণ্য। আনন্দগিরি প্রভৃতি বলেন—'কৃপণ' শব্দ শ্রুতিতে 'অজ্ঞানী', 'অব্রহ্মবিৎ' এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ—১৮।৬৬ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৮। ভূমৌ (পৃথিবীতে) অসপত্নম্ (প্রতিদ্বন্দ্বিহীন, নিষ্কণ্টক) ঋদ্ধং (সমৃদ্ধ) রাজ্যং (রাজ্য) সুরাণামপি আধিপত্যং চ (দেবতাদিগেরও আধিপত্য) অবাপ্য (পাইয়াও) যৎ (যাহা) মম ইন্দ্রিয়াণাম্ উচ্ছোষণং (আমার ইন্দ্রিয়গণের শোষক) শোকম্ (শোককে) অপনুদ্যাৎ (নিবারণ করিতে পারে) [তৎ] ন হি প্রপশ্যামি (তাহা দেখিতেছি না)।

পৃথিবীতে নিষ্কণ্টক সমৃদ্ধ রাজ্য এবং সুরলোকের আধিপত্য পাইলেও যে শোক আমার ইন্দ্রিয়গণকে বিশোষণ করিবে তাহা কিসে যাইবে, আমি দেখিতেছি না। ৮

৯। সঞ্জয়ঃ উবাচ (কহিলেন)—পরন্তপঃ (শত্রুতাপন) গুড়াকেশঃ (অর্জুন) হৃষীকেশং গোবিন্দম্ (হৃষীকেশ গোবিন্দকে) এবম্ উক্ত্বা (ইহা বলিয়া) [অহং] ন যোৎস্যে (আমি যুদ্ধ করিব না) ইতি উক্ত্বা (এই কথা বলিয়া) তূষ্ণীং বভূব (নীরব হইলেন)।

সঞ্জয় কহিলেন—শত্রুতাপন অর্জুন হৃষীকেশ গোবিন্দকে এইরূপ বলিয়া 'আমি যুদ্ধ করিব না' এই কথা কহিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন (নীরব রহিলেন)। ৯

১০। [হে] ভারত (ধৃতরাষ্ট্র), হৃষীকেশঃ (শ্রীকৃষ্ণ) প্রহসন্ ইব

শ্রীভগবান্ উবাচ

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥ ১১

(হাসিতে হাসিতে) উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে (উভয় সেনার মধ্যে) বিষীদন্তং (বিষাদাপন্ন) তম্ (তাহাকে) ইদম্ বচঃ (এই বাক্য) উবাচ (বলিলেন)।

হে ভারত (ধৃতরাষ্ট্র), হৃষীকেশ উভয় সেনার মধ্যে বিষাদপ্রাপ্ত অর্জুনকে হাসিয়া এই কথা বলিলেন। ১০

প্রহসন্ ইব—ঈষৎ হাসিয়া, উপহাসের ভাবে। পরবর্তী শ্লোকের মর্ম এই—"তুমি পণ্ডিতের ন্যায় বড় বড় কথা কহিতেছ বটে, কিন্তু পাণ্ডিত্যের লক্ষণ তোমাতে দেখা যায় না।" ইহা একটু উপহাসের ভাবেই বলা হইয়াছে।

১১। শ্রীভগবান্ উবাচ (বলিলেন)—ত্বং (তুমি) অশোচ্যান্ (যাহাদিগের জন্য শোক করা অনুচিত তাহাদিগের জন্য) অন্বশোচঃ (শোক করিতেছ), প্রজ্ঞাবাদান্ চ (আবার পণ্ডিতের ন্যায় তত্ত্বকথা) ভাষসে (কহিতেছ); পণ্ডিতাঃ (পণ্ডিতেরা) গতাসূন্ অগতাসূন্ চ (মৃত বা জীবিত কাহারো জন্য); ন অনুশোচন্তি (শোক করেন না)।

আত্মার অশোচ্যত্ব ও অবিনাশিতা ১১-১৩

শ্রীভগবান্ বলিলেন, যাহাদিগের জন্য শোক করার কোন কারণ নাই তুমি তাহাদিগের জন্য শোক করিতেছ, আবার পণ্ডিতের ন্যায় কথা বলিতেছ। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী তাঁহারা কি মৃত কি জীবিত, কাহারও জন্য শোক করেন না। ১১

"পণ্ডিতের ন্যায় কথা বলিতেছ" কিরূপ?—যেমন, গুরুজন বধ, জাতিধর্ম ও কুলধর্ম নাশ—এর চেয়ে ভিক্ষাবৃত্তিও ভাল, মৃত্যুও ভাল, ইত্যাদি অনেক কথাই অর্জুন বলিয়াছেন। 'জীবিতের জন্য শোক করেন না'—একথার অর্থ কি? অর্থ এই, জীবিতের মরণাশঙ্কায় শোক করেন না। স্থূল কথা এই, কাহারো দেহটা যাক বা থাক, সে চিন্তায় জ্ঞানী ব্যক্তিরা উদ্বিগ্ন হন না।

পণ্ডিতেরা কাহারও জন্য শোক করেন না—কেন? কারণ, প্রকৃতপক্ষে কেহই মরে না, দেহটিমাত্র বিনষ্ট হয়, আত্মার মৃত্যু নাই, আত্মা অবিনশ্বর। পরবর্তী শ্লোকসমূহে এই কথাই নানাভাবে স্পষ্টীকৃত করা হইয়াছে।

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃপরম্ ॥ ১২

অর্জুনের মোহ

এই স্থলেই প্রকৃতপক্ষে গীতা আরম্ভ। গীতোক্ত ধর্ম কি তাহা বুঝিতে হইলে কি উপলক্ষে এই ধর্মের প্রচার হইয়াছিল তাহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। পাঠক মনে রাখিবেন, অর্জুন পূর্বাপরই যুদ্ধার্থে উদ্যোগী ছিলেন, যুদ্ধের কর্তব্যতা সম্বন্ধে কখনও তাঁহার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয় নাই। বরং শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ অনিবার্য জানিয়াও যুদ্ধ নিবারণার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন—এমন কি স্বয়ং দৌত্যকার্যেও ব্রতী হইয়াছিলেন। সেই যুদ্ধ যখন আসন্ন, শস্ত্র-সম্পাত যখন আরম্ভ হইয়াছে, তখন অর্জুনের বিষম নির্বেদ উপস্থিত, তিনি যত ধর্মশাস্ত্র খুঁজিয়া খুজিঁয়া যুদ্ধের অকর্তব্যতা প্রতিপাদন করিতে উন্মুখ। 'ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ', 'এতান্ ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন' ইত্যাদি অর্জুনের মনোরম বাক্যগুলি শুনিয়া আমাদের মনে হয়, কি উচ্চ অন্তঃকরণের কথা। কি উদার নিঃস্বার্থ ভাব! কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কি বলিতেছেন?—ভগবান্ একটু হাসিয়া বলিলেন, এগুলি জ্ঞানীর ভাষায় মূর্খের কথা। তোমার এ মোহ কোথা হইতে উপস্থিত হইল? অর্জুনের এই মোহ দূরীকরণের চেষ্টাতেই গীতাশাস্ত্রের উদ্ভব। অর্জুনের মোহ উপলক্ষ্য করিয়া ভগবান্ সমগ্র মানব-জাতির অশেষ কল্যাণকর এই অপূর্ব ধর্মতত্ত্ব জগতে প্রচার করিলেন। ১১

১২। অহং (আমি) জাতু (কদাচিৎ) ন আসম্ (ছিলাম না), ত্বং ন [আসীঃ] (তুমি ছিলে না), ইমে জনাধিপাঃ (এই রাজগণ) ন [আসন্] (ছিলেন না) [ইতি] ন তু (ইহা নহে); অতঃপরং চ (ইহার পরেও), সর্বে বয়ং (আমরা সকলে) ন ভবিষ্যামঃ (থাকিব না) [ইতি] ন এব (তাহাও নহে)।

আমি পূর্বে ছিলাম না, বা তুমি ছিলে না বা এই নৃপতিগণ ছিলেন না, এমন নহে (অর্থাৎ সকলেই ছিলাম)। আর, পরে আমরা সকলে থাকিব না তাহাও নহে (অর্থাৎ পরেও সকলে থাকিব)। ১২

আত্মার অবিনাশিতা—পূর্বে বলা হইয়াছে, তত্ত্বজ্ঞানীরা কাহারও জন্য শোক করেন না। কেন শোক করেন না? কারণ, কেহ মরে না, দেহটি অনিত্য,

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩

উহাই বিনষ্ট হয়, কিন্তু আত্মা নিত্য, উহার নাশ নাই। নিত্য কিরূপ? যাহা পূর্বে ছিল, এখন আছে, পরেও থাকিবে। আমি এখন 'বাসুদেব'রূপে আবির্ভূত, তুমি মধ্যম পাণ্ডবরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, পূর্বে আমরা অন্যরূপে ছিলাম, পরেও অন্যরূপে থাকিব। এইরূপ সকলেই। 'মৃত্যু' অর্থ দেহের নাশ, আত্মা জন্মমরণহীন, আত্মার পক্ষে জন্ম অর্থ দেহ গ্রহণ, মৃত্যু অর্থ দেহত্যাগ বা দেহান্তর-প্রাপ্তি। দেহান্তর-প্রাপ্তি অবস্থার পরিবর্তন মাত্র, বিনাশ নহে। তাহাই পরবর্তী শ্লোকে বলা হইতেছে।

১৩। যথা দেহিনঃ (দেহীর) অস্মিন্ (এই) দেহে কৌমারং যৌবনং জরা (বার্ধক্যাবস্থা), তথা (সেইরূপ) দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ; তত্র (তাহাতে) ধীরঃ (জ্ঞানবান্ ব্যক্তি) ন মুহ্যতি (মোহগ্রস্ত হন না)।

জীবের এই দেহে বাল্য, যৌবন ও বার্ধক্য কালের গতিতে উপস্থিত হয়। তেমনি কালের গতিতে দেহান্তর-প্রাপ্তিও হয়। জ্ঞানিগণ তাহাতে মোহগ্রস্ত হন না। ১৩

বাল্যাবস্থার পরে যৌবনাবস্থা উপস্থিত হয়, উহা অবস্থান্তরমাত্র, এজন্য কেহ শোক করে না। সেইরূপ এক দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য দেহ গ্রহণও জীবাত্মার একটি অবস্থান্তর মাত্র। সুতরাং ইহাতে শোকের কারণ নাই।

জন্মান্তরবাদ—এখানে 'মৃত্যু' না বলিয়া বলা হইয়াছে, 'দেহান্তর-প্রাপ্তি', সুতরাং মানিয়া লওয়া হইল মরিলেও জন্ম হয়। ইহাই জন্মান্তরবাদ। **আত্মার অবিনাশিতা ও পুনর্জন্ম, হিন্দুধর্মের এই দুইটি প্রধান তত্ত্ব।** সমগ্র হিন্দুশাস্ত্র এই জন্মান্তরবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধধর্মেরও ইহাই মূলতত্ত্ব। খ্রীষ্টীয় ধর্ম আত্মার অবিনাশিতা স্বীকার করেন, কিন্তু পুনর্জন্ম স্বীকার করেন না। এখন প্রশ্ন এই—আত্মা যদি অবিনাশী, তবে দেহনাশের পরে ইহার কি গতি হয়।

এ সম্বন্ধে **খ্রীস্টীয় ধর্মের মত** এই যে, পরমেশ্বর বিচার করিয়া জীবের সুকৃতি ও দুষ্কৃতি অনুসারে দেহান্তে পুণ্যবান্‌কে অনন্ত স্বর্গে ও পাপীকে অনন্ত নরকে প্রেরণ করেন। এই ধর্মমতের অনুকূলে যুক্তি বেশী কিছু নাই। বিশ্বাসই ইহার মূল ভিত্তি। কিন্তু ইহার প্রতিকূলে প্রধান আপত্তি এই যে, ঈশ্বরের এই যে বিচার ইহা অবিচার বলিয়াই বোধ হয়, কেননা এই সংসারে

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪

কেহই কেবল পুণ্য বা কেবল পাপ করে না। সকলে কিছু না কিছু পুণ্যকর্মও করে, পাপকর্মও করে। সুতরাং যাহার জন্য অনন্ত স্বর্গবাসের ব্যবস্থা হইল, তাহার পাপের শাস্তি হইল না; পক্ষান্তরে, যাহার পক্ষে অনন্ত নরকবাস লিখিত হইল, তাহার পুণ্যের পুরস্কার হইল না। এ কি অবিচার নহে? বলিতে পার, প্রত্যেক জীবের পাপপুণ্যের হিসাব-নিকাশ করিয়া পাপ ও পুণ্যের আধিক্য অনুসারে অনন্ত নরকবাস বা স্বর্গবাসের ব্যবস্থা হয়, কিন্তু অনন্তকালের তুলনায় মানুষের এই জীবনকাল কতটুকু? ক্ষণস্থায়ী এ জীবনের পাপাধিক্য বা পুণ্যাধিক্যের জন্য অনন্তকাল ব্যাপিয়া নরকবাস বা স্বর্গবাসের ব্যবস্থা, ইহাতে কি এক পক্ষে অতি-নিষ্ঠুরতা অপর পক্ষে অতি-উদারতা প্রকাশ পায় না?

এ সম্বন্ধে **হিন্দুমত** এই যে—স্বর্গ বা নরক ভোগ জীবের চরম গতি নয়। যাহা হইতে জীবের উদ্ভব, সেই পরব্রহ্মে লীন হওয়া বা ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হওয়াই জীবের পরম লক্ষ্য ও চরম গতি। যে পর্যন্ত জীব তাহার উপযোগী না হয়, সে পর্যন্ত তাহাকে কৃতকর্মানুসারে পুনঃ পুনঃ দেহ ধারণ করিয়া কর্মফল ভোগ করিতে হয়। ভোগ ভিন্ন প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় হয় না। জীবের এই যে জন্মমৃত্যুচক্রে পরিভ্রমণ, ইহারই নাম সংসার (সং-সৃ—গমন করা)। এই সংসার ক্ষয় হইয়া কিরূপে জীবের ব্রহ্মনির্বাণ বা ভগবৎ-প্রাপ্তি হইতে পারে, তাহাই সমগ্র হিন্দুদর্শন ও হিন্দুশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। অবশ্য হিন্দুশাস্ত্রে, জীবের কৃতকর্মানুসারে স্বর্গাদি ভোগের ব্যবস্থাও আছে, কিন্তু তাহা অনন্ত কালের জন্য নহে। যে কর্মবিশেষের ফলে স্বর্গাদি লাভ হয়, সেই কর্মের ফলভোগ শেষ হইলে তাহাকে আবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। মোক্ষ বা ভগবৎ-প্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত জন্মকর্মের নিবৃত্তি নাই।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ —গীতা ৮।১৬

১৪। হে কৌন্তেয়, মাত্রাস্পর্শাঃ (ইন্দ্রিয়ের বিষয়-সংস্পর্শ) তু শীতোষ্ণ-সুখদুঃখদাঃ (শীতোষ্ণাদি সুখদুঃখদায়ী) আগম-অপায়িনঃ (উৎপত্তিবিনাশ-শীল) [সুতরাং] অনিত্যাঃ [অতএব] হে ভারত, তান্ তিতিক্ষস্ব (সেগুলি সহ্য কর)।

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫

দেহ ও সুখ-দুঃখাদির অনিত্যতা ও অনাত্মধর্মিতা ১৪-১৫

হে কৌন্তেয়, ইন্দ্রিয়বৃত্তির সহিত বিষয়াদির সংযোগেই শীতোষ্ণাদি সুখদুঃখ প্রদান করে। সেগুলির একবার উৎপত্তি হয়, আবার বিনাশ হয়, সুতরাং ওগুলি অনিত্য। অতএব সে সকল সহ্য কর। ১৪

মাত্রাস্পর্শাঃ—মীয়ন্তে জ্ঞায়ন্তে বিষয়া আভিরিতি মাত্রা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ তাসাং স্পর্শাঃ বিষয়ৈঃ সহ সম্বন্ধাঃ (শ্রীধর স্বামী)। **মাত্রা**—ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ, তাহাদের বিষয়ের সহিত স্পর্শ।

তিতিক্ষা—মানিলাম, আত্মা অবিনশ্বর, সুতরাং কাহারও মৃত্যুতে বা মৃত্যু-আশঙ্কায় শোক অকর্তব্য। কিন্তু স্বজনাদি বিয়োগে হৃদয় যখন দারুণ দুঃখে দগ্ধ হয়, সে ত তত্ত্বকথা শুনে না, জনার্দন। ইহার উপায় কি? তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—বিষয়স্পর্শজনিত সুখদুঃখ সকলই অনিত্য; আসে যায়, থাকে না, উহা সহ্য করার অভ্যাস কর্তব্য। দেহে (ত্বগিন্দ্রিয়ে) জলের স্পর্শ হইলেই শীতের অনুভূতি হয়, উহা অনিত্য। উহা সহ্য করিতে অভ্যাস করিলে আর দুঃখ থাকে না। স্বজনাদি বিয়োগজনিত দুঃখও এইরূপ অনিত্য, উহাতে বিচলিত না হইয়া সহ্য করাই কর্তব্য—কিন্তু দেহে জলের স্পর্শ সংঘটন যদি নিবারণ করিতে পারি, তবে তাহা না করিয়া দুঃখ সহ্য করিব কেন?—ইহার প্রথম উত্তর এই, নিবারণ করিলে যদি অধর্ম হয় তবে সহ্যই করিতে হইবে। মাঘস্নান যাহার পক্ষে ধর্ম বলিয়া বিধি, শীতের ভয়ে স্নান না করা তাহার অধর্ম। যুদ্ধ যাহার ধর্ম, আত্মীয় বিনাশ ভয়ে যুদ্ধ না করা তাহার অধর্ম। দ্বিতীয়তঃ, এই যে তিতিক্ষা (অর্থাৎ শীতোষ্ণ, সুখদুঃখ, মান-অপমানাদি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা)—ইহা মহাফলপ্রদ, ইহা জীবনকে মধুময় করে, মানবকে অমৃতত্ব প্রদান করে (পরের শ্লোক দ্রষ্টব্য)। ১৪

১৫। হে পুরুষর্ষভ (পুরুষশ্রেষ্ঠ), এতে (এই সকল মাত্রাস্পর্শ) সমদুঃখসুখং (সুখদুঃখে সমভাবাপন্ন, নির্বিকারচিত্ত) যং ধীরং পুরুষং (যে ধীর পুরুষকে) ন ব্যথয়ন্তি (ব্যথিত করে না), সঃ (তিনি) অমৃতত্বায় কল্পতে (অমৃতত্ব লাভের অধিকারী হন)।

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, যে স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তি এই সকল বিষয়স্পর্শ-জনিত সুখদুঃখ সমভাবে গ্রহণ করেন, উহাতে বিচলিত হন না, তিনি অমৃতত্ব লাভে সমর্থ হন। ১৫

অমৃতত্ব বলিতে কি বুঝায়

এই স্থূল শরীর লইয়া চিরকাল বর্তমান থাকাকে অমৃতত্ব বা অমরত্ব বলে না; তাহা কেহ থাকিতে পারে না; কারণ ভৌতিক দেহ বিনাশশীল, মৃত্যুর অধীন ('জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ' ২।২৭)। মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম শরীরে বিদ্যমান থাকাকেও অমৃতত্ব বলে না, উহা সকলেই থাকে (১৫।৮-৯) এবং পুনরায় নূতন দেহ গ্রহণ করে ('ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ' ২।২৭)। এই জন্মমৃত্যুর চক্র হইতে নিষ্কৃতি লাভই অমৃতত্ব লাভ, ইহাকেই মোক্ষ বলা হয়।

আমরা এই অনিত্য দেহটা লইয়াই 'আমি' 'আমি' করি, কিন্তু দেহের মধ্যে যে দেহী (আত্মা) আছেন (২।৩০) তাঁহার খোঁজ লই না। দেহটাকেই যে 'আমি' বোধ ইহার নাম দেহাত্মবোধ, আর আত্মা যে দেহ হইতে পৃথক্ বস্তু এই যে জ্ঞান তাহাকে বলে দেহাত্মবিবেক। এই জ্ঞানলাভের নামই অমৃতত্ব লাভ।

আত্মা আনন্দস্বরূপ; অনিত্যবস্তুতে আসক্তিহেতু সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব-জনিত অজ্ঞানদ্বারা আত্মার অদ্বয় আনন্দ আচ্ছন্ন থাকে, উহাই মৃত্যু; অজ্ঞান কাটিয়া গেলেই আত্মার স্বভাবসিদ্ধ বিমল আনন্দ উদ্ভাসিত হয়। উহাই অমৃতত্ব—আত্মানন্দ, নিত্যানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, প্রেমানন্দ।

এক তত্ত্বই ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্, এই ত্রিবিধ নামে অভিহিত হন এবং সাধকের ভাব-বৈশিষ্ট্যহেতু ত্রিবিধ ভাবে প্রকাশিত হন। সাধক যখন এই দেহচৈতন্যের ঊর্ধ্বে উঠিয়া ব্রহ্মচৈতন্যে (সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে, ৬।২৮) অথবা আত্মচৈতন্যে (সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি, ৬।২৯) অথবা ভাগবত-চৈতন্য ('যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি', ৬।৩০) অবস্থান করেন, তখনই তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন।

এই শ্লোকে বলা হইল, যাঁহার সুখদুঃখে সমভাব তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন। এই সমতা বা সাম্যবুদ্ধির কথা পরেও আমরা পাইব, শ্রীগীতায় ইহাকেই যোগ বলা হইয়াছে (২।৪৮।৫০, ৬।৩৩)। সুখদুঃখে সাম্যভাব সমতাযোগের একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত মাত্র।

কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, বিষয়ের স্পর্শে সুখদুঃখ ইত্যাদি দ্বন্দ্ব আসিবেই। সংসারে থাকিয়া, বিষয়ের মধ্যে থাকিয়া উহা বর্জন করা যায় না, তবে কর্তব্য কি?—সংসার-ত্যাগ, বিষয়-ত্যাগ, কর্ম-ত্যাগ?

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ ১৬

অনেক শাস্ত্র সেই উপদেশই দেন। কিন্তু গীতাশাস্ত্র বলেন, ত্যাগ অর্থ আসক্তি ত্যাগ, কামনা-বাসনা ত্যাগ। আসক্তিই সুখদুঃখাদি চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ। সংসার-আসক্তি ত্যাগ করিয়াও সংসার করা যায়, বিষয়-কামনা না করিয়াও বিষয় ভোগ করা যায়, ফল কামনা না করিয়াও কর্ম করা যায় এবং শ্রীগীতার উপদেশ, তাহাই কর্তব্য। কামনাই অর্থের মূল, উহাকে শাস্ত্রে হৃদয়-গ্রন্থি বলে, এই গ্রন্থি ছিন্ন করিতে পারিলেই মর মানুষ অমর হইতে পারে।

যদা সর্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহগ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদ্ধ্যনুশাসনম্॥ (কঠ, ২।৩।১৫)

—জীবিতাবস্থায়ই (ইহ) যখন হৃদয়ের গ্রন্থিসকল (কামনাসমূহ) বিনষ্ট হয়, তখন মর মানুষ অমর হয়, এইটুকুই সমগ্র বেদান্তশাস্ত্রের সারকথা।

উহা শ্রীগীতারও সারকথা। অবশ্য বড় কঠিন কথা। তবে ভক্তিপথে অগ্রসর হইলে, একমাত্র তাঁহার শরণ লইলে, তাঁহার কৃপায় হৃদয়গ্রন্থি ক্রমে শিথিল হয়, জীবন মধুময় হয়। শ্রীগীতার ইহাই শেষ গুহ্যতম উপদেশ (১৮।৬৪-৬৬)। ভক্তিশাস্ত্রে বলা হয়, পরাভক্তিই অমৃতস্বরূপ, উহা পাইলেই সাধক সিদ্ধ হন, অমর হন, তৃপ্ত হন। উহা পাইলে আর কিছু পাইবার আকাঙ্ক্ষা থাকে না, মোক্ষেরও না। ('সা তস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা, অমৃতস্বরূপা চ)। যল্লব্ধ্বা পুমান্ সিদ্ধো ভবত্যমৃতো ভবতি তৃপ্তো ভবতি। যৎ প্রাপ্য ন কিঞ্চিৎ বাঞ্ছতি ন শোচতি ন দ্বেষ্টি'।—(ভক্তিসূত্র)।

১৬। অসতঃ (অসৎ বস্তুর) ভাবঃ (সত্তা, স্থায়িত্ব) ন বিদ্যতে (নাই) সতঃ (সৎ বস্তুর) অভাবঃ (নাশ) ন বিদ্যতে (নাই) তত্ত্বদর্শিভিঃ তু (কিন্তু তত্ত্বদর্শিগণ কর্তৃক) অনয়োঃ উভয়োঃ অপি (এই উভয়েরই) অন্তঃ দৃষ্টঃ (অন্ত দৃষ্ট হইয়াছে)।

সদসদ্বিবেক—আত্মার নিত্যতা-বিষয়ক উপদেশ দ্বারা শোকমোহ দূরীকরণের চেষ্টা ১৬-৩০

অসৎ বস্তুর ভাব (সত্ত্বা, স্থায়িত্ব) নাই, সৎবস্তুর অভাব (নাশ) নাই; তত্ত্বদর্শিগণ এই সদসৎ উভয়েরই চরম দর্শন করিয়াছেন (স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন)। ১৬

অস্ ধাতু হইতে 'সৎ' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অস্ ধাতুর অর্থ থাকা। যাহা থাকে তাহাই সৎ, নিত্য। যাহা থাকে না, আসে যায়, তাহা অসৎ, অনিত্য। আত্মাই সৎ; জগৎপ্রপঞ্চ, দেহাদি ও তৎসংসৃষ্ট সুখদুঃখাদি অসৎ (২।১৯ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রঃ)। সুতরাং অর্থ হইল,—'আত্মার বিনাশ নাই, দেহাদি ও সুখদুঃখাদির স্থায়িত্ব বা অস্তিত্ব নাই।' এখন, দেহাদির স্থায়িত্ব নাই, একথা বুঝা গেল, কিন্তু 'দেহাদির অস্তিত্ব নাই', এ কথার অর্থ কি?

যাঁহারা মায়াবাদী, তাঁহারা বলেন, এক আত্মাই (ব্রহ্মই) সত্য, জগৎ মিথ্যা—মায়া-বিজৃম্ভিত। ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুর পারমার্থিক সত্তা নাই (পরের শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

কিন্তু জগৎ যে মিথ্যা এই মতবাদ অনেকেই স্বীকার করেন না এবং গীতাও এ মত সমর্থন করেন বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং তাঁহারা 'নাসতো বিদ্যতে ভাবো' এই শ্লোকাংশের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী বলেন—'অসতোঽনাত্মধর্মত্বাদবিদ্যমানস্য শীতোষ্ণ-দেরাত্মনি ভাবঃ সত্তা ন বিদ্যতে'—এই শ্লোকের সদসৎ বস্তুর স্বরূপ বর্ণনায় আত্মার নিত্যতা এবং সুখ-দুঃখাদির অনিত্যতা ও অনাত্মধর্মিতাই লক্ষ্য করা হইয়াছে, ইহাই টীকাকারের অভিপ্রায়।

সুখদুঃখের অনাত্মধর্মিতা—এই কথার অর্থ কি? এ কথার অর্থ এই যে, সুখদুঃখ আত্মার ধর্ম নহে, উহা অন্তঃকরণের ধর্ম। অন্তঃকরণ আত্মা নহে। অন্তঃকরণ কি? মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার—এইগুলি মিলিয়া যাহা হয়, তাহার সাধারণ নাম অন্তঃকরণ। হিন্দু-দার্শনিকগণ মনস্তত্ত্বের যে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহার সম্যক্ আলোচনা এ স্থলে সম্ভবপর নহে। স্থূলতঃ এইটুকু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এ সকলই প্রকৃতির বিকৃতি বা পরিণাম, পুরুষ বা আত্মার সহিত উহাদের কোন নিত্য সম্বন্ধ নাই। তবে যে আত্মা সুখদুঃখের ভোক্তা বলিয়া প্রতীয়মান হন, উহা প্রকৃতির সংযোগবশতঃ। সৃষ্টিকালে পুরুষ ও প্রকৃতি পরস্পর সংযুক্ত থাকাতে পুরুষের ধর্ম প্রকৃতিতে ও প্রকৃতির ধর্ম পুরুষে উপচরিত হয়। এই কারণেই বস্তুতঃ অচেতন হইলেও প্রকৃতিকে চেতন বলিয়া মনে হয় এবং বস্তুতঃ অকর্তা হইলেও আত্মাকে কর্তা-ভোক্তা বলিয়া বোধ হয়। পুরুষ (আত্মা) ও প্রকৃতির পার্থক্য যখন উপলব্ধি হয়, তখন আর এ অজ্ঞানতা থাকে না। তাই সাংখ্যদর্শন বলেন,—'জ্ঞানান্মুক্তি'—জ্ঞান হইতে মুক্তি। এ কিসের জ্ঞান? প্রকৃতি ও পুরুষের পার্থক্য-জ্ঞান। গীতাতে

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্ ।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি ॥ ১৭

ইহাই ত্রিগুণাতীত অবস্থা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই অবস্থায় সুখদুঃখের পরানিবৃত্তি,তখন জীব 'অমৃতত্বায় কল্পতে' (২।১৫, ২।৪৫, ১৪।২২-২৬ শ্লোক দ্রঃ)।

'নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'—এ কথায় এই বুঝায় যে, যাহা নাই তাহা হইতে পারে না এবং যাহা আছে তাহার অভাব হয় না অর্থাৎ কোন পদার্থই নূতন উৎপন্ন হয় না এবং কিছুই বিনষ্ট হয় না, পরিবর্তন হয় মাত্র। ইহা সাংখ্যদর্শনের একটি প্রধান সিদ্ধান্ত ('নাসদ্ উৎপদ্যতে ন সদ্ বিনশ্যতি'—সাংখ্যসূত্র) এবং এই সিদ্ধান্তের উপরেই সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত (৭।৪ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রঃ)। ইহাকে বলে **সৎকার্যবাদ**। অনেকে শ্রীগীতার এই শ্লোকার্ধও এই তত্ত্ব বুঝাইতে ব্যবহার করেন।

১৭। যেন (যাহা কর্তৃক) ইদং সর্বং (এই সমস্ত) ততং (ব্যাপ্ত) তৎ তু এব (তাঁহাকেই) অবিনাশি (বিনাশরহিত) বিদ্ধি (জানিও); কশ্চিৎ (কেহই) অস্য অব্যয়স্য (এই অব্যয়স্বরূপের) বিনাশং কর্তুং ন অর্হতি (বিনাশ করিতে পারে না)।

যিনি এই সকল (দৃশ্য জগৎ) ব্যাপিয়া আছেন তাঁহাকে অবিনাশী জানিও। কেহই এই অব্যয় স্বরূপের বিনাশ করিতে পারে না। ১৭

অব্যয়—যাহার উপচয় (বৃদ্ধি) ও অপচয় (ক্ষয়) নাই, যাহা সর্বদাই একরূপ। যাহা সত্তারূপে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, যাহা সর্বব্যাপী, তাহা অবিনাশী ও অব্যয়, কেননা তাহার বিনাশ বা অপচয়-উপচয় হইলে সর্বব্যাপিত্ব থাকে না।

ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ ॥ প্রকৃতি, জীব, জগৎ

প্রশ্ন। কথা হইতেছে, ভীষ্মাদির জন্য শোক অকর্তব্য, কেননা কেহ মরিবে না, আত্মা অবিনাশী। এ অবশ্য জীবাত্মা। আবার ভগবান্ ১২শ শ্লোকে বলিলেন, আমি, তুমি, রাজগণ সকলেই পূর্বেও ছিলাম, পরেও থাকিব। এই ভগবান্ 'আমি' কে? জীবাত্মা না পরমাত্মা? 'তুমি' ও 'রাজগণ' বলিতে অবশ্য জীবাত্মাই বুঝায়। এই শ্লোকে আবার বলা হইতেছে—'যাহা দ্বারা সকল ব্যাপ্ত' অর্থাৎ সর্বব্যাপী। সর্বব্যাপী কে? জীবাত্মা না পরমাত্মা? সর্বব্যাপী ত ঈশ্বর, ভীষ্মাদির আত্মা কি সর্বব্যাপী? এইরূপ নানা সংশয় মনে উঠিতেছে।

উত্তর। এস্থলে কয়েকটি দার্শনিক স্থূল তত্ত্ব সংক্ষেপে বলিতে হইতেছে। আত্মা, পরমাত্মা, ব্রহ্ম, ভগবান্, পুরুষ, প্রকৃতি প্রভৃতি কথাগুলির কোন্‌টিতে

কি তত্ত্ব প্রকাশ পায় তাহা না বুঝিলে গীতোক্ত কোন কথাই স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে না। গীতার মূল শ্লোকে অনেক স্থলেই দেখা যায়, যৎ, তৎ, যেন, তেন, অহং, মাং ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে। ব্যাখ্যায় ঐ সকলস্থলে আত্মা, পরমাত্মা, ভগবান্ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়। যাহা 'তৎ' পদার্থের পরিজ্ঞাপক তাহাই তত্ত্ব। সেই মূল তত্ত্ব কি ?

'বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতিপরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥' —ভাঃ ১।২।১১

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই শ্লোকের মর্মার্থ এইরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে—

অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ তিন তাঁর রূপ ॥

একেরই তিন রূপ বা বিভাব। যে তাঁহাকে যে-ভাবে চিন্তা করে তাহার নিকট তিনি তাহাই। জ্ঞানীর নিকট তিনি জ্যোতির্ময় **ব্রহ্ম,** যোগীর নিকট তিনি চিদাত্মস্বরূপ **পরমাত্মা,** ভক্তের নিকট তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ **ভগবান্**। সাধনাভেদে একেরই ত্রিবিধ প্রকাশ।

জ্ঞান, যোগ, ভক্তি তিন সাধনার বশে।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে ॥ —চৈঃ চঃ

সুতরাং আমরা গীতার ভগবদুক্তিতে যখন 'অহং' (আমি), 'মাং' (আমাকে) ইত্যাদি শব্দ পাইব, তখন অর্থসঙ্গতি বুঝিয়া স্থলবিশেষে এই তিনের কোন একটি ভাব গ্রহণ করিতে হইবে। যখন তিনি বলেন—পত্র, পুষ্প, জল, যাহা-কিছু ভক্তি-উপহার আমি সাদরে গ্রহণ করি,—তখন বুঝিব তিনি ভক্তবৎসল ভগবান্। আবার যখন তিনি বলেন, যোগিগণ আমাতেই প্রবেশ করেন,—তখন বুঝিব তিনিই চিদাত্মস্বরূপ পরমাত্মা, ইত্যাদি।

আত্মা বলিতে কি বুঝায় ? দার্শনিকগণ বলেন—আত্মা "অহম্প্রত্যয়-বিষয়াহম্পদ-প্রত্যয়লক্ষিতার্থঃ"। এ কথার স্থূল মর্ম এই যে, 'অহং বা আমি' বলিতে যাহা বুঝি তাহাই আত্মা; 'আমি' সুখী, 'আমি' দুঃখী, 'আমি' আছি, 'আমি' চিন্তা করি, 'আমি' সঙ্কল্প করি, 'আমি' কার্য করি, সর্বত্রই 'আমি' জ্ঞান আছে। কিন্তু এই 'আমি' কে ? 'আমি' দেহ নয়, ইন্দ্রিয়াদি নয়, কেননা উহারা জড়পদার্থ, 'আমি' কিন্তু চৈতন্যময়; সুতরাং দেহাবস্থিত অথচ দেহাতিরিক্ত চৈতন্যস্বরূপ কোন বস্তু আছে, যাহা এই অহংপ্রত্যয়ের অধিগম্য। সেই বস্তুই আত্মা। এই আত্মাই জীব, জীবাত্মা, প্রত্যগাত্মা, ক্ষেত্রজ্ঞ ইত্যাদি

নানা নামে অভিহিত হন। সাংখ্যদর্শনে আত্মার নাম **পুরুষ** এবং জড় জগতের যে মূল উপাদান তাহার নাম মূল **প্রকৃতি**। জগৎ এই মূল প্রকৃতিরই বিকৃতি বা পরিণাম। সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বর, সুতরাং সাংখ্যমতে পুরুষ ও প্রকৃতিই মূলতত্ত্ব। কিন্তু গীতায় আমরা দেখিব, এই পুরুষ ও প্রকৃতি ভগবানের পরা ও অপরা প্রকৃতি (৭।৪-৫), আর তিনি পুরুষোত্তম, পরমেশ্বর বা মহেশ্বর বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

এই যে তিনটি বস্তু—জগৎ, জীব, ব্রহ্ম—অথবা প্রকৃতি, পুরুষ, পরমেশ্বর—অথবা দেহ, জীবাত্মা, পরমাত্মা—এই তিনের প্রকৃত স্বরূপ ও পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয়ই বেদান্তাদি শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়।

উপনিষৎ, ব্রহ্মসূত্র (বেদান্তদর্শন) ও গীতা—এই তিনই ব্রহ্মতত্ত্ব-প্রতিপাদক শাস্ত্র। কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্বের ব্যাখ্যায় প্রাচীন ভাষ্যকার আচার্যগণের মধ্যে নানারূপ মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। এই সকল বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে **অদ্বৈতবাদ** ও **বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই** প্রধান। এই মতদ্বৈধ না বুঝিলে গীতাভাষ্যাদির প্রকৃত অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম হয় না।

অদ্বৈতবাদী বলেন, —"শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ ॥"

—"যাহা কোটি কোটি গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, তাহা আমি অর্ধশ্লোকে বলিতেছি—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা ; জীব ব্রহ্মই, অন্য কিছু নহে।" সুতরাং **অদ্বৈতমতে**—(১) জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন, যেমন ঘটাকাশ ও মহাকাশ। পাঁচটি শূন্য ঘটে যে আকাশ আছে, উহা আধারভেদে বিভিন্ন বোধ হইলেও মূলতঃ একই। ঘট পাঁচটি ভাঙ্গিয়া দিলে আর ভেদ থাকে না, তখন সকলেই এক মহাকাশ। এইরূপ বিভিন্ন দেহাধিষ্ঠিত আত্মা দেহভেদে ভিন্ন বোধ হইলেও স্বরূপতঃ অভিন্ন। দেহবন্ধন-বিমুক্ত হইলেই উহার **স্ব-স্বরূপ** পরমাত্মরূপ প্রতিভাত হয়। (২) দ্বিতীয়তঃ, এই মতে, এক ব্রহ্মই সত্য, অদ্বিতীয় বস্তু, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুর সত্তা নাই ; জগৎ মিথ্যা। এই যে দৃশ্য জগৎ প্রত্যক্ষ হইতেছে, উহা ভ্রমমাত্র ; যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্তিতে রজতভ্রম, সূর্য-রশ্মিতে মরীচিকাভ্রম। এ ভ্রম হয় কেন ? মায়াবাদী বলেন, উহা ব্রহ্মের 'অঘটন-ঘটন-পটীয়সী' মায়াশক্তির প্রভাবে। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে এই মায়া কাটিয়া যায়, তখনই 'সোঽহম্' 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এইরূপ আত্মস্বরূপ অধিগত হয়। (৩) তৃতীয়তঃ, অদ্বৈতমতে ব্রহ্ম নির্বিশেষ, নির্বিকল্প, নিরুপাধি, নির্গুণ ; সুতরাং অজ্ঞেয়, অচিন্ত্য, অমেয়—মনোবুদ্ধির অগোচর।

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮

পক্ষান্তরে **বিশিষ্টাদ্বৈতমতে**—(১) ব্রহ্ম ও জীব স্বতন্ত্র বস্তু। ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয় সর্বব্যাপী; জীব এক নহে, বহু অণু-পরিমাণ, প্রতি শরীরে বিভিন্ন। (২) এই মতে জগৎ মিথ্যা নহে, উহার প্রকৃত সত্তা আছে, উহা ব্রহ্মের মায়া-শক্তি-প্রসূত। জগৎ ব্রহ্মেরই শরীর। (৩) এইমতে সবিশেষ ব্রহ্মই শ্রুতিসিদ্ধ। ব্রহ্ম নির্গুণ নহেন, সগুণ। তিনি অজ্ঞেয়, অচিন্ত্য নহেন। ব্রহ্মই জগতের কর্তা ও উপাদান।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদকে অনেকে দ্বৈতবাদও বলেন। এতদ্ব্যতীত **শুদ্ধ-দ্বৈতবাদীও** আছেন। তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ তিনই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও পৃথক্ তত্ত্ব।

এইরূপ মর্মান্তিক মতদ্বৈধ স্থলে গীতার মত কি? তাহা আমরা ক্রমশঃ পাইব এবং সেই সেই স্থলে আলোচনা করিব। আমরা দেখিব যে, গীতামতে একই ব্রহ্মের দুই বিভাব—সগুণ ভাব ও নির্গুণ ভাব। 'সগুণ' ও 'নির্গুণ' ভিন্ন তত্ত্ব নহে। আমরা ইহাও দেখিব যে, জগৎ মিথ্যা নহে। ভগবানের 'পরা' ও 'অপরা' এই উভয় প্রকৃতির সংযোগে এই জগৎ। আমরা আরও দেখিব যে, শ্রীগীতায় এমন কথা আছে যাহাতে বুঝা যায়, জীব ও ব্রহ্ম, আত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন। এই শ্লোকেই আত্মাকে সর্বব্যাপী বলা হইয়াছে। সর্বব্যাপিত্ব ব্রহ্ম বা পরমাত্মার লক্ষণ। সুতরাং আত্মা বলিতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়কেই বুঝায়। আবার এ কথাও আছে যে, 'জীব আমার অংশ'। ইহাতে বুঝা যায়, জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন। এই অংশ কিরূপ এবং **জীব ও ব্রহ্মের ভেদাভেদ** তত্ত্বটি কি, তাহা পরে বিচার করা হইয়াছে। (১৫।৭ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। এই কথাগুলি স্মরণ রাখিলেই ৩২ পৃষ্ঠার প্রশ্নে উল্লিখিত সকল সংশয়েরই নিরসন হইবে।

১৮। নিত্যস্য (অবিকারী) অনাশিনঃ (অবিনাশী) অপ্রমেয়স্য (প্রমাণদ্বারা অনুপলব্ধ) শরীরিণঃ (আত্মার) ইমে দেহাঃ (এই সকল দেহ) অন্তবন্তঃ (বিনাশশীল) উক্তাঃ (কথিত হইয়াছে), হে ভারত, তস্মাৎ যুধ্যস্ব (অতএব যুদ্ধ কর)।

দেহাশ্রিত আত্মার এই সকল দেহ নশ্বর বলিয়া উক্ত হইয়াছে। (কিন্তু) আত্মা নিত্য, অবিনাশী, অপ্রমেয় (স্বপ্রকাশ)। অতএব,

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥ ১৯

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ ২০

হে অর্জুন, যুদ্ধ কর (আত্মার অবিনাশিতা ও দেহাদির নশ্বরত্ব স্মরণ করিয়া কাতরতা ত্যাগ কর। স্বধর্ম পালন কর)। ১৮

নিত্য ও অনাশী—এই দুইটি পদ প্রায় সমার্থক বলিয়া ব্যাখ্যা এইরূপ—'নিত্য অর্থাৎ সর্বদা একরূপ, অতএব অবিনাশী'—শ্রীধর স্বামী। **শরীরী**—যাহার শরীর আছে তাহা শরীরী। শরীর আশ্রয় করেন বলিয়া আত্মাকে দেহী বা শরীরী এবং 'আত্মার এই দেহ' এইরূপ বলা হয়, বস্তুতঃ আত্মার শরীর নাই, আত্মা অ-শরীরী, চৈতন্য-স্বরূপ। **অপ্রমেয়**—প্রমাণ দ্বারা যাহার উপলব্ধি হয় না, যাহা প্রমাণসিদ্ধ নয়। প্রমাণ দ্বারা উহার যাথাতথ্য নির্ণয় হয় না। কেন? নির্ণয় করিবে কে? 'আমি'। 'আমি' না থাকিলে বস্তু নির্ণয় হয় না। সেই 'আমিই' ত আত্মা। সুতরাং আত্মা প্রমাতা, প্রমেয় ন'ন। 'যেনেদং সর্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ' (শ্রুতি)—যাহা হইতে সকল জ্ঞান, তাহাকে কোন্ জ্ঞানে জানিবে?

১৯। যঃ (যে) এনং (ইহাকে—আত্মাকে) হন্তারং (হন্তা) বেত্তি (জানে), যঃ চ (এবং যে) এনং হতং মন্যতে (ইহাকে হত বলিয়া মনে করে), তৌ উভৌ (তাহারা উভয়েই) ন বিজানীতঃ (জানে না), অয়ং (ইনি, আত্মা) ন হন্তি (হনন করেন না), ন হন্যতে (হত হন না)।

যে আত্মাকে হন্তা বলিয়া জানে এবং যে উহাকে হত বলিয়া মনে করে, তাহারা উভয়েই আত্মতত্ত্ব জানে না। ইনি হত্যা করেন না, হতও হন না। ১৯

'হত্যা করেন না' অর্থাৎ ইনি অকর্তা সাক্ষিস্বরূপ; 'হত হ[illegible] অবিনাশী। (২০ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। ১৯

২০। অয়ং (এই আত্মা) কদাচিৎ ন জায়তে (জন্মগ্রহণ করেন না) বা ম্রিয়তে (বা মরেন না), ভূত্বা বা ভূয়ঃ (পুনঃ) ন ভবিতা (জন্মিয়া বিদ্যমান

থাকেন না—জন্মগ্রহণের পর ইহার অস্তিত্ব হয় না)। অয়ং অজঃ (জন্মরহিত), নিত্যঃ (সর্বদা একরূপ), শাশ্বতঃ (অপক্ষয়শূন্য), [এবং] পুরাণঃ (পরিণামশূন্য), শরীরে হন্যমানে (শরীর বিনষ্ট হইলেও) [অয়ং] ন হন্যতে (বিনষ্ট হন না)।

এই আত্মা কখনও জন্মেন না বা মরেন না। ইনি অন্যান্য জাত বস্তুর ন্যায় জন্মিয়া অস্তিত্ব লাভ করেন না অর্থাৎ ইনি সংরূপে নিত্য বিদ্যমান। ইনি জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত এবং পুরাণ; শরীর হত হইলেও ইনি হত হন না।

শাস্ত্রে ষড়্‌বিধ বিকারের উল্লেখ আছে। যথা—জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ—এইগুলি লৌকিক বস্তুর বিকার। 'জন্মেন না, মরেন না'—ইহার দ্বারা জন্ম ও বিনাশ প্রতিষিদ্ধ হইল। জন্মের পরে যে বিদ্যমানতা তাহার নাম অস্তিত্ব-বিকার। 'নায়ং ভূত্বা ন ভবিতা' (জন্মিয়া বিদ্যমানতা লাভ করেন না) এই বাক্যদ্বারা 'অস্তিত্ব' রূপ বিকার প্রতিষিদ্ধ হইল। 'নিত্য' ও 'শাশ্বত' শব্দ দ্বারা বৃদ্ধি ও অপক্ষয় নিবারিত হইল, পুরাণ অর্থাৎ সনাতন, চির-নবীনতায় বিদ্যমান, ইহাদ্বারা 'বিপরিণাম' নিবারিত হইল। সুতরাং ইনি ষড়্‌বিধ বিকারশূন্য; অবিক্রিয়। এই হেতু ইঁহাতে কর্তৃত্ব বা কর্মত্ব আরোপিত হয় না। ২০

আত্মা অকর্তা হইলেও জীব পাপপুণ্য-ভাগী হয় কেন?

১৯শ ও ২০শ—এই শ্লোকদুইটি কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত ভাবে কঠোপনিষদে আছে। প্রাচীন টীকাকারগণ বলেন—আত্মার অবিক্রিয়ত্ব ও অকর্তৃত্ব প্রতিপাদনার্থ শ্রুতির এই মন্ত্র দুইটি গীতায় গ্রহণ করা হইয়াছে। অর্জুন যেন বলিতেছেন—বুঝিলাম আত্মা অবিনাশী কেহ মরিবে না; ভীষ্মাদির জন্য শোকমোহ বরং নিবারিত হইল। কিন্তু আমি তাহাদের হন্তা হইব, প্রাণি-হত্যার কর্তা হইব, এ পাপ নিবারিত হইবে কিসে? তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—তুমি যে তাহাদের হন্তা, এবং তাহারা যে হত হইবেন, এ উভয় ধারণাই তোমার ভ্রম, কারণ আত্মা হতও হন না, কাহাকে হত্যাও করেন না। আত্মা অবিক্রিয়, অকর্তা; আত্মা কিছু করেন না।

প্রশ্ন। দার্শনিক বিচার বুঝা গেল। কিন্তু আত্মা অকর্তা বলিয়া কি প্রাণিহত্যায় পাপ হয় না? তবে ত লৌকিক ধর্মকর্ম, পাপপুণ্য, কিছুই থাকে না।

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্॥ ২১

উঃ। গীতায় অন্যত্রও বহু স্থলে আত্মার অকর্তৃত্ব-প্রতিপাদক বাক্যাদি আছে এবং আত্মা অকর্তা হইলেও জীব পাপ-পুণ্যভাগী হয় কেন, তাহার যুক্তিও আছে। ১৮শ অঃ ১৬।১৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

উহার মর্ম এই—অজ্ঞতাবশতঃ যে স্বতন্ত্র আত্মাকে কর্তা বলিয়া দেখে, সে দুর্মতি দেখিতে পায় না। যাঁহার অহঙ্কার বুদ্ধি নাই, যাঁহার বুদ্ধি নির্লিপ্ত, তিনি হত্যা করিয়াও কিছু হত্যা করেন না এবং তজ্জন্য 'ফলভোগী' হন না।

"অহংকৃত ভাবঃ" অর্থাৎ আমি করিতেছি এই ভাব, অহঙ্কার। অহং আত্মা। এই 'অহং' এবং 'অহঙ্কারে' পার্থক্য বুঝা আবশ্যক।

অহং অর্থাৎ আত্মা অকর্তা হইলেও অহঙ্কার (আমি করিতেছি এই বুদ্ধি) যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ কর্মের বন্ধন যায় না। সুতরাং আত্মা অকর্তা বলিয়া যে অর্জুনের হত্যাজনিত পাপ হইবে না তাহা নহে। যদি অর্জুনের এই জ্ঞান জন্মে যে, আমি অকর্তা, আমি কিছুই করিতেছি না, প্রকৃতিই প্রকৃতির কাজ করিতেছে, আমি নিঃসঙ্গ, নির্লিপ্ত, তবেই তাহার ফল ভোগ বারিত হইবে। এইরূপ জ্ঞানই, এই কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগই গীতায় পুনঃ পুনঃ উপদিষ্ট হইয়াছে (৩।২৭-২৮, ৫।৮-৯, ১৪।১৯, ১৮।১৬ ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

২১। যঃ এনম্ (এই আত্মাকে) অবিনাশিনং, নিত্যং, অজং, অব্যয়ং বেদ (জানেন), হে পার্থ, সঃ পুরুষঃ কথং (কি প্রকারে) কং (কাহাকে) ঘাতয়তি (বধ করান) [বা] কং হন্তি (বধ করেন)?

যিনি আত্মাকে অবিনাশী, নিত্য, অজ, অব্যয় বলিয়া জানেন, হে পার্থ, সে পুরুষ কি প্রকারে কাহাকে হত্যা করেন বা করান? ২১

এ কথার তাৎপর্য এই যে—যাহার এই জ্ঞান হইয়াছে যে, আত্মা অবিনাশী, সে কাহারও বিনাশের কারণ হইল বলিয়া দুঃখিত হইবে কিরূপে? বিনাশই যখন নাই, তখন বিনাশ করিবে কাকে, কিরূপে? সুতরাং তোমারও কোন দুঃখের কারণ নাই, আর আমি প্রয়োজক বলিয়া আমারও দুঃখের কারণ নাই। ২১

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, জ্ঞান চাই, নিত্যানিত্য বিবেক চাই, নচেৎ এ যুক্তির মূল্য নাই।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্যোঽয়মুচ্যতে ॥ ২৪

২২। যথা নরঃ জীর্ণানি বাসাংসি (জীর্ণ বস্ত্রসকল) বিহায় (পরিত্যাগ করিয়া) অন্যানি নবানি (অন্য নূতন বস্ত্রসকল) গৃহ্লাতি (গ্রহণ করে). তথা দেহী (আত্মা) জীর্ণানি শরীরাণি বিহায় (জীর্ণ শরীরসকল ত্যাগ করিয়া) অন্যানি নবানি (অন্য নূতন দেহ) সংযাতি (প্রাপ্ত হন)।

যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ আত্মা জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন শরীর পরিগ্রহ করে। ২২

আত্মার দেহত্যাগ মানুষের জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নব বস্ত্র পরিধানের ন্যায়। তাহাতে শোক-দুঃখের কি আছে? বরং পুণ্যাত্মারা উত্তম লোকে উৎকৃষ্টতর দেহ-ই প্রাপ্ত হন। যথা—"অন্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে" ইত্যাদি শ্রুতি (বৃ-উ ৪।৪।৪)। ২২

২৩। শস্ত্রাণি (শস্ত্রসকল) এনং (এই আত্মাকে) ন ছিন্দন্তি (ছেদন করে না), পাবকঃ (অগ্নি) এনং ন দহতি (ইহাকে দহন করে না), আপঃ চ (জলও) এনং ন ক্লেদয়ন্তি (ইহাকে আর্দ্র করে না). মারুতঃ (বায়ু) (এনং) ন শোষয়তি (ইহাকে শুষ্ক করে না)।

শস্ত্রসকল ইহাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নিতে দহন করিতে পারে না, জলে ভিজাইতে পারে না। ২৩

আত্মার অবিক্রিয়ত্বের কথাই পুনরায় বিশেষভাবে তিন শ্লোকে বলা হইতেছে। আত্মার অবযব নাই, সুতরাং অস্ত্রাদিতে উহার কিছু করিতে পারে না। ২৩

২৪। অয়ম্ (এই আত্মা) অচ্ছেদ্যঃ, অয়ম্ অদাহ্যঃ, অয়ম্ অক্লেদ্যঃ অশোষ্যঃ চ এব ; অয়ং নিত্যঃ, সর্বগতঃ, স্থাণুঃ (স্থির), অচলঃ সনাতনঃ,

তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি। ২৫
অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি॥ ২৬
জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ ২৭

অয়ম্ অব্যক্তঃ (ইন্দ্রিয়াদির অগোচর), অয়ম্ অচিন্ত্যঃ, অয়ম্ অবিকার্যঃ উচ্যতে (উক্ত হন)।

এই আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য। ইনি নিত্য, সর্বব্যাপী, স্থির, অচল, সনাতন, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অবিকার্য বলিয়া কথিত হন। ২৪

সর্বগত—সর্বব্যাপী। স্থাণু—স্থিরস্বভাব। অচল—পূর্বরূপ-অপরিত্যাগী। সনাতন—অনাদি, চিরন্তন। অব্যক্ত—চক্ষুরাদির অগোচর। অচিন্ত্য—মনের অবিষয়—"যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" অবিকার্য—সর্বপ্রকার বিকার-রহিত। এই সমস্ত শ্লোকে এক কথায়ই পুনরুক্তি কেবল দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ।

২৫। তস্মাৎ (এই হেতু) এনং (এই আত্মাকে) এবং (এই প্রকার) বিদিত্বা (জানিয়া) অনুশোচিতুং ন অর্হসি (শোক করা উচিত নয়)।

অতএব আত্মাকে এই প্রকার জানিয়া তোমার শোক করা উচিত নয়। ২৫

২৬। অথ চ (আর যদি) এনং (আত্মাকে) নিত্যজাতং (নিত্য জন্মশীল) নিত্যংবা মৃতং (নিত্য মরণশীল) মন্যসে (মনে কর), হে মহাবাহো, তথাপি ত্বং এনং শোচিতুং ন অর্হসি।

আর যদি তুমি মনে কর যে, আত্মা সর্বদা দেহের সঙ্গে জন্মে এবং দেহের সঙ্গেই বিনষ্ট হয়, তথাপি, হে মহাবাহো, তোমার শোক করা উচিত নয়। ২৬

দেহনাশে আত্মারও নাশ হয় ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও শোক করা উচিত নয়। কেননা, জন্মমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী (পরের শ্লোক)। ২৬

২৭। হি (যে হেতু) জাতস্য (জাত ব্যক্তির) মৃত্যুঃ ধ্রুব (নিশ্চিত);

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮

মৃতস্য চ (মৃত ব্যক্তিরও) জন্ম ধ্রুবং ; তস্মাৎ (সেই হেতু) অপরিহার্যে অর্থে (অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে) ত্বং শোচিতুং ন অর্হসি (তোমার শোক করা উচিত নয়)।

যে জন্মে তাহার মরণ নিশ্চিত, যে মরে তাহার জন্ম নিশ্চিত ; সুতরাং অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে তোমার শোক করা উচিত নয়। ২৭

২৮। হে ভারত, ভূতানি (জীবসকল) অব্যক্তাদীনি (আদিতে অব্যক্ত) ব্যক্তমধ্যানি (মধ্যকালে ব্যক্ত), অব্যক্তনিধনানি এব (বিনাশান্তে অব্যক্ত), তত্র কা পরিদেবনা (তাহাতে শোক কি) ?

হে ভারত (অর্জুন), জীবগণ আদিতে অব্যক্ত, মধ্যে ব্যক্ত এবং বিনাশান্তে অব্যক্ত থাকে। তাহাতে শোক বিলাপ কি ? ২৮

অব্যক্ত শব্দের বিভিন্ন অর্থানুসারে এই শ্লোকের দুই রকম অর্থ হয়। (১) শঙ্করাচার্য বলেন—অব্যক্তমদর্শনমনুপলব্ধির্যেষাং—অর্থাৎ 'যাহাদের দর্শন বা উপলব্ধি নাই'। এই মতে 'অব্যক্ত' অর্থ চক্ষুরাদির অতীত, অজ্ঞাত। সুতরাং শ্লোকের অর্থ এই—

যাহারা জন্মের পূর্বে অজ্ঞাত ছিল, মধ্যে ক্ষণকালের জন্য জ্ঞাত হইয়াছে, বিনাশান্তে পুনরায় অজ্ঞাত হইবে, তাহাদের জন্য শোক কিসের ? পুত্র, কলত্র, সুহৃৎ মিত্রাদি, ইহারা পূর্বে তোমার কে ছিল, বিনাশান্তেই বা ইহাদের সহিত কি সম্বন্ধ থাকিবে, তাহা জান না। এই যে কিছুকালের জন্য পরিচয়, ইহা নিশাতে পান্থশালায় পথিকগণের অথবা বৃক্ষে বায়সগণের সম্মেলন—'প্রভাত হইলে দশদিকেতে গমন,'—সুতরাং সাংসারিক ক্ষণিক সম্বন্ধে মুগ্ধ হইয়া শোক করিও না।

(২) শ্রীধর স্বামী বলেন—'অব্যক্তম্ প্রধানম্'। জগতের নির্বিশেষ মূল উপাদানের নাম প্রকৃতি বা প্রধান। ইহার অপর নাম অব্যক্ত। সৃষ্টির পূর্বে জগৎ অব্যক্ত অবস্থায় প্রকৃতিতে লীন থাকে, সৃষ্টিকালে নামরূপাদি প্রাপ্ত হইয়া ব্যক্ত হয়, সৃষ্টির অবসানে আবার প্রকৃতিতে লীন হয়। এই ত ভৌতিক দেহাদির পরিণাম। ইহার জন্য আবার শোক কি ? (৮।১৮ শ্লোক দ্রঃ)।

আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯
দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০

২৯। কশ্চিৎ (কেহ) এনম্ (এই আত্মাকে) আশ্চর্যবৎ পশ্যতি (দেখেন), তথৈব চ (সেইরূপ) অন্যঃ (অন্য কেহ) আশ্চর্যবৎ বদতি (বলেন), অন্যঃ চ (আবার অন্য কেহ) এনম্ আশ্চর্যবৎ শৃণোতি (শ্রবণ করেন), কশ্চিৎ চ (কেহ) শ্রুত্বা অপি এব (শুনিয়াও) এনং ন বেদ (ইহাকে জানিতে পারেন না)।

কেহ আত্মাকে আশ্চর্যবৎ কিছু বলিয়া বোধ করেন, কেহ ইহাকে আশ্চর্যবৎ কিছু বলিয়া বর্ণনা করেন, কেহ বা ইনি আশ্চর্যবৎ কিছু, এই প্রকার কথাই শুনেন। কিন্তু শুনিয়াও কেহ ইহাকে জানিতে পারেন না। ২৯

তাৎপর্য। দেখা যায়, বিজ্ঞ ব্যক্তিরাও শোকে অভিভূত হন। ইহার কারণ, আত্মতত্ত্ব বড় দুর্জ্ঞেয়, সকলের নিকটেই আত্মা বিস্ময়ের বস্তুমাত্র, ইহার প্রকৃত স্বরূপ কেহই সম্যক্ অবগত নহেন।

বেদান্তাদি শাস্ত্রে যেরূপ বর্ণনা আছে তাহা পাঠ করিলেই আত্মা কিরূপ 'আশ্চর্যবৎ' বলিয়া অনুভূত, উপদিষ্ট বা শ্রুত হন, তাহা বুঝা যায়। দুই-একটি দৃষ্টান্ত দেখুন—'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্'—তিনি অণু হইতেও অণু, তিনি মহান্ হইতেও মহান্। 'অন্যত্র ধর্মাদন্যত্রাধর্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ। অন্যত্র-ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ'।—তিনি ধর্ম হইতেও পৃথক্, অধর্ম হইতে স্বতন্ত্র, কার্য হইতে স্বতন্ত্র, কারণ হইতে ব্যতিরিক্ত, অতীত হইতে ভিন্ন, ভবিষ্যৎ হইতে অন্য। 'ন সৎ ন চাসৎ শিব এব কেবলঃ'—তিনি সৎ নহেন অসৎও নহেন, কেবল শিব। ইত্যাদি।

৩০। হে ভারত, অয়ং দেহী সর্বস্য (সকলের) দেহে নিত্যং অবধ্যঃ তস্মাৎ (সেই হেতু) ত্বং (তুমি) সর্বাণি ভূতানি (সকল প্রাণীকেই) শোচিতুং (শোক করিতে) ন অর্হসি (যোগ্য নও)।

স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে॥ ৩১
যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্॥ ৩২

হে ভারত, জীবসকলের দেহে আত্মা সর্বদাই অবধ্য, অতএব কোন প্রাণীর জন্যই তোমার শোক করা উচিত নহে। ৩০

আত্মার অবিনাশিতা-বিষয়ক কথা এই স্থানে শেষ হইল। কিন্তু আত্মতত্ত্ব কি পদার্থ তাহা শুনিলেই বোঝা যায় না। পূর্ব শ্লোকে 'আশ্চর্যবৎ পশ্যতি' ইত্যাদি বাক্যে তাহা স্পষ্ট বলা হইয়াছে। তাহা যদি হইত তবে বোধ হয় গীতা এই স্থানেই সমাপ্ত হইত। সুতরাং এখন অন্যরূপ উপদেশ আরম্ভ হইবে।

৩১। স্বধর্মং অপি চ (স্বধর্মও) অবেক্ষ্য (দেখিয়া) (তুমি) বিকম্পিতুম্ (কম্পিত হইতে) ন অর্হসি (যোগ্য নও)। হি (যেহেতু) ধর্ম্যাৎ যুদ্ধাৎ (ধর্ম্যযুদ্ধ অপেক্ষা) ক্ষত্রিয়স্য (ক্ষত্রিয়ের) অন্যৎ শ্রেয়ঃ (আর কিছু শ্রেয়) ন বিদ্যতে (নাই)।

স্বধর্ম পালনের আবশ্যকতা দেখাইয়া যুদ্ধার্থ উপদেশ ৩১-৩৭

স্বধর্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াও তোমার ভীত-কম্পিত হওয়া উচিত নহে। ধর্ম্যযুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয়ঃ আর কিছু নাই। ৩১

স্বধর্ম—স্বধর্ম অর্থাৎ নিজের ধর্ম। অর্জুন ক্ষত্রিয়, যুদ্ধ-ব্যবসায়ী, সুতরাং যুদ্ধ তাহার স্বধর্ম; তবে ধর্ম্যযুদ্ধও আছে, অধর্ম্যযুদ্ধও আছে। পরস্বাপহরণ জন্য যে যুদ্ধ তাহা অধর্ম্য যুদ্ধ; ধর্মরক্ষা, আত্মরক্ষা, সমাজরক্ষা, স্বদেশরক্ষা, প্রজারক্ষার জন্য যে যুদ্ধ তাহাই ধর্ম্যযুদ্ধ। এইরূপ ধর্ম্যযুদ্ধে পরাঙ্মুখতা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে পরম অধর্ম, ইহাই শাস্ত্রের অনুশাসন। যথা—'ন নিবর্তেত সংগ্রামাৎ ক্ষাত্রং ধর্মমনুস্মরন্'।—মনু।

শোক-মোহে অর্জুনের শরীরে কম্প হইতেছিল ('বেপথুশ্চ শরীরে মে' ইত্যাদি ১।২৯ শ্লোক)। এই জন্য 'বিকম্পিতুম্' শব্দের ব্যবহার। ৩১

৩২। হে পার্থ, যদৃচ্ছয়া চ উপপন্নং (স্বয়ং উপস্থিত) অপাবৃতং স্বর্গদ্বারম্ [ইব] (মুক্ত স্বর্গদ্বার স্বরূপ) ঈদৃশং যুদ্ধং (ঈদৃশ যুদ্ধ) সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ [এব] (ভাগ্যবান্ ক্ষত্রিয়েরাই) লভন্তে (লাভ করেন)।

অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্মং কীর্তিং চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩

অকীর্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্ ॥ ৩৫

হে পার্থ, এই যুদ্ধ আপনা হইতেই উপস্থিত হইয়াছে, ইহা মুক্ত স্বর্গদ্বার স্বরূপ। ভাগ্যবান্ ক্ষত্রিয়েরাই ঈদৃশ যুদ্ধ লাভ করিয়া থাকেন। ৩২

দুর্যোধনাদির বিদ্বেষবুদ্ধিবশতঃ এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে। তোমার স্বার্থাভিসন্ধিতে ইহা উপস্থিত হয় নাই। এরূপ ধর্ম্যযুদ্ধের সুযোগ যে ক্ষত্রিয়েরা প্রাপ্ত হন, তাঁহারাই সুখী। "ইহাদিগকে হত্যা করিয়া আমি কিরূপে সুখী হইব" (১।৩৬) ইত্যাদি বাক্যের উত্তরে ইহা বলা হইল।

৩৩। অথ (পক্ষান্তরে) চেৎ (যদি) ত্বম্ (তুমি) ইমং ধর্ম্যং সংগ্রামং (এই ধর্ম্যযুদ্ধ) ন করিষ্যসি (না কর), ততঃ (তাহা হইলে) স্বধর্মং কীর্তিং চ হিত্বা (ত্যাগ করিয়া) পাপং অবাপ্স্যসি (পাপ প্রাপ্ত হইবে)।

আর যদি তুমি ধর্ম্যযুদ্ধ না কর, তবে স্বধর্ম ও কীর্তি ত্যাগ করিয়া তুমি পাপযুক্ত হইবে। ৩৩

ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ম্যযুদ্ধে পরাঙ্মুখতা অতীব পাপজনক, এ সম্বন্ধে শাস্ত্রের অতি কঠোর অনুশাসন (মনু ৭।৯৪।৯৫)।

৩৪। অপিচ (আরও) ভূতানি (সকল লোকে) তে (তোমার) অব্যয়াং (চিরস্থায়ী) অকীর্তিং (কুযশঃ) কথয়িষ্যন্তি (ঘোষণা করিবে), সম্ভাবিতস্য (সম্মানিত, প্রতিষ্ঠাবান্ পুরুষের) অকীর্তিঃ মরণাৎ চ (মৃত্যু অপেক্ষাও) অতিরিচ্যতে (অধিক হইয়া থাকে)।

আরও দেখ, সকল লোকে চিরকাল তোমার অকীর্তি ঘোষণা করিবে। সম্মানিত ব্যক্তির পক্ষে অকীর্তি মরণ অপেক্ষাও অধিক, অর্থাৎ অকীর্তি অপেক্ষা মরণও শ্রেয়ঃ। ৩৪

৩৫। মহারথাঃ চ (মহারথগণও) ত্বাং (তোমাকে) ভয়াৎ (ভয়বশতঃ)

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥ ৩৬
হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭

রণাৎ (যুদ্ধ হইতে) উপরতং (নিবৃত্ত) মংস্যন্তে (মনে করিবেন); ত্বং যেষাং (যাহাদিগের) বহুমতঃ (সম্মানিত) ভূত্বা চ (হইয়াও) [ইদানীং] লাঘবং (লঘুতা) যাস্যসি (প্রাপ্ত হইবে)।

মহারথগণ মনে করিবেন, তুমি ভয়বশতঃ যুদ্ধে বিরত হইতেছ, (দয়াবশতঃ নহে)। সুতরাং যাঁহারা তোমাকে বহু সম্মান করেন, তাঁহাদিগের নিকট তুমি লঘুতা প্রাপ্ত হইবে। ৩৫

৩৬। তব অহিতাঃ চ (তোমার শত্রুরাও) তব সামর্থ্যং নিন্দন্তঃ (তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিয়া) বহূন্ অবাচ্যবাদান্ (বহু অবাচ্য কথা) বদিষ্যন্তি (বলিবে), ততঃ (তাহা অপেক্ষা) দুঃখতরং (অধিক দুঃখকর) কিং নু (আর কি আছে) ?

তোমার শত্রুরাও তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিয়া অনেক অবাচ্য কথা বলিবে ; তাহা অপেক্ষা অধিক দুঃখকর আর কি আছে ? ৩৬

৩৭। হতঃ বা (হত হইলে) স্বর্গং প্রাপ্স্যসি (পাইবে), জিত্বা বা (জয় লাভ করিলে) মহীং (পৃথিবী) ভোক্ষ্যসে (ভোগ করিবে); হে কৌন্তেয়, তস্মাৎ (সেই হেতু) যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ সন্ (যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া) উত্তিষ্ঠ (উত্থান কর)।

যুদ্ধে হত হইলে স্বর্গ পাইবে, জয়লাভ করিলে পৃথিবী ভোগ করিবে, সুতরাং হে কৌন্তেয়, যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া উত্থান কর। ৩৭

তোমার জয়েও লাভ, পরাজয়েও লাভ। 'ন চৈতদ্বিদ্মঃ' ইত্যাদি (২।৬) কথার উত্তরে এই কথা বলা হইতেছে।

এই অধ্যায়ের ৩০ শ্লোক পর্যন্ত শ্রীভগবান্ জ্ঞানগর্ভ আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু আত্মতত্ত্ব অতি দুর্জ্ঞেয়, উহা কেবল উপদেশে অধিগত হয় না, আর অধিগত না হইলে শোক-মোহও বিদূরিত হয় না। তাই পরে ৩১-৩৭ শ্লোকে সহজ কথায় বুঝাইলেন যে, স্বধর্মের দিক্ দিয়া দেখিলেও অর্জুনের এই ধর্ম্যযুদ্ধ করাই কর্তব্য। ইহাতে বিরত হইলে লোক-নিন্দা, জয়

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮

হইলে পৃথিবী-ভোগ, পরাজয় হইলেও স্বর্গপ্রাপ্তি। **কিন্তু** লোক-নিন্দার ভয়ে, পৃথিবী ভোগের জন্য বা স্বর্গলাভের জন্য যে ধর্মপালন তাহা বড় শ্রেষ্ঠ ধর্ম নহে। অর্জুন স্বধর্ম বা স্বীয় কর্তব্য না বুঝেন তাহা নহে। তাঁহার সন্দেহ হইতেছে যে, এই স্বধর্ম পালন করিতে যাইয়া যদি গুরুজনাদি হত্যা করিতে হয়, তবে তাহার পাপ কর্তাকে স্পর্শে কিনা। এ কথার উত্তরেই অপূর্ব কর্মযোগের অবতারণা করিতে হইয়াছে, পরবর্তী শ্লোকে তাহাই আরম্ভ হইয়াছে।

৩৮। ততঃ (সেই হেতু) সুখদুঃখে (সুখ ও দুঃখকে) সমে কৃত্বা (সমান জ্ঞান করিয়া) লাভালাভৌ (লাভ-অলাভকে) জয়াজয়ৌ (জয় ও পরাজয়কে) [সমৌ কৃত্বা] যুদ্ধায় যুজ্যস্ব (যুদ্ধার্থ উদ্‌যুক্ত হও); এবং (এইভাবে যুদ্ধ করিলে) পাপং ন অবাপ্স্যসি (পাপযুক্ত হইবে না)।

অতএব সুখদুঃখ, লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয়, তুল্যজ্ঞান করিয়া যুদ্ধার্থ উদ্‌যুক্ত হও। এইরূপ করিলে পাপভাগী হইবে না। ৩৮

সাংখ্যজ্ঞানের উপসংহার করিয়া কর্মযোগের বর্ণনা আরম্ভ—কর্মযোগের অল্প আচরণও শুভকর ৩৮-৪০

যুদ্ধাদি হিংসাত্মক ব্যাপার নিশ্চিতই পাপকর্ম, আততায়ী হইলেও গুরুজনাদি বধে পাপভাগী হইতে হইবে, অর্জুনের এই এক প্রধান আপত্তি (১।৩৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। আত্মতত্ত্ব এবং পরে স্বধর্ম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও সে সন্দেহ দূর হইতেছে না। কেননা, আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিলেই আত্মজ্ঞ হওয়া যায় না (২।২৯ শ্লোক), আর শাস্ত্রে স্বধর্ম পালনের বিধান থাকিলেও কর্তার যদি উহা পাপজনক বলিয়া মনে হয়, তবে কেবল শাস্ত্রবাক্যে তাহার মন প্রবোধ মানে না। কথা এই, অর্জুনের এখনও কর্তৃত্বাভিমান যায় নাই। সুতরাং কামনা ও কর্তৃত্বাভিমান বর্জনপূর্বক কিরূপে কর্তব্য কর্ম করিলেও পাপ স্পর্শে না, ভগবান্ এখন তাহাই উপদেশ দিতেছেন। সেই উপদেশ এই—যুদ্ধ কর, কর্ম কর, কিন্তু ফলাসক্তি ত্যাগ কর, লাভালাভ, সিদ্ধি-অসিদ্ধি সমজ্ঞান করিয়া কর্ম কর। সিদ্ধিলাভেও হৃষ্ট হইও না, অসিদ্ধিতেও কষ্ট বোধ করিও না। কর্ম, বন্ধের কারণ নয়, কামনাই বন্ধের কারণ। অনাসক্ত হইয়া, ফল কামনা ত্যাগ করিয়া.

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯

সমত্ববুদ্ধিযুক্ত হইয়া কর্তব্য কর্ম করিলে তাহা যুদ্ধাদি হিংস্র কর্ম হইলেও তাহাতে পাপ স্পর্শে না। এই সমত্ববুদ্ধিকেই যোগ বলা হইয়াছে। ইহাই গীতোক্ত **নিষ্কাম কর্মযোগ** (২।৪৮)। পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে এবং তৃতীয় অধ্যায়ে এই কর্মযোগ বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ৩৮

৩৯। হে পার্থ, সাংখ্যে (আত্মতত্ত্ব-বিষয়ে) এষা বুদ্ধিঃ (এই জ্ঞান) তে অভিহিতা (তোমাকে কথিত হইল); যোগে তু (কর্মযোগ বিষয়ে) ইমাং শৃণু (এই জ্ঞান শ্রবণ কর); যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ [সন্] (যে বুদ্ধিদ্বারা যুক্ত হইলে) কর্মবন্ধং (কর্মবন্ধন) প্রহাস্যসি (ত্যাগ করিতে পারিবে)।

হে পার্থ, তোমাকে এতক্ষণ সাংখ্যনিষ্ঠা-বিষয়ক জ্ঞান উপদেশ দিলাম, এক্ষণ যোগবিষয়ক জ্ঞান শ্রবণ কর (যাহা এক্ষণ বলিতেছি); এই জ্ঞান লাভ করিলে কর্মবন্ধন ত্যাগ করিতে পারিবে। ৩৯

সাংখ্য। "সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বমনয়া ইতি সংখ্যা সম্যক্ জ্ঞানম্, তস্যাং প্রকাশমানমাত্মতত্ত্বং সাংখ্যং"—শ্রীধর স্বামী। সম্যক্ প্রকাশিত হয় বস্তুতত্ত্ব যাহা দ্বারা তাহা সংখ্যা (সম্যক্ জ্ঞান), তাহাতে প্রকাশমান আত্মতত্ত্ব সাংখ্য। 'সাংখ্যে পরমার্থবস্তুবিবেকবিষয়ে।' —শাঙ্কর-ভাষ্য

সাংখ্য ও যোগ—সাংখ্য শব্দের অর্থ তত্ত্বজ্ঞান। সনাতন ধর্মে অতি প্রাচীন কাল হইতেই দুইটি সাধনমার্গ বা মোক্ষপথ প্রচলিত আছে—একটি সাংখ্য বা জ্ঞানমার্গ, অপরটি কর্মমার্গ। জ্ঞানমার্গ-অবলম্বিগণ প্রায় সকলেই কর্মত্যাগী, কর্ম হইতে নিবৃত্ত, এই জন্য ইহাকে সন্ন্যাসমার্গ বা নিবৃত্তিমার্গও বলে। কর্মমার্গ-অবলম্বীরা জ্ঞানলাভ করিয়াও কর্মের যোগ ছেদন করেন না, কর্মে প্রবৃত্ত থাকেন, এই জন্য ইহাকে প্রবৃত্তিমার্গ বলে ("প্রবৃত্তিলক্ষণো যোগো জ্ঞানং সন্ন্যাসলক্ষণম্"—অনুগীতা)। কর্ম আবার দ্বিবিধ—সকাম কর্ম ও নিষ্কাম কর্ম। যাগযজ্ঞাদি কাম্য কর্মকেও কর্মযোগ কহে, উহা বৈদিক কর্মযোগ। গীতা বলেন, এ সব কর্মও নিষ্কাম ভাবে করিতে হইবে। সুতরাং গীতায় 'যোগ' বলিতে নিষ্কাম কর্মযোগই বুঝায়। ইহাই বৈদান্তিক কর্মযোগ (ঈশ ২, ভূঃ 'গীতায় পূর্ণাঙ্গ যোগ' পরিচ্ছেদ দ্রঃ)। জ্ঞানমার্গ বুঝাইতে 'সাংখ্য' শব্দ ও

নিষ্কাম কর্মযোগ বুঝাইতে 'যোগ' শব্দ গীতায় পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। (৩।৩, ৫।৩, ৫।৪, ৫।৫ ইত্যাদি দ্রঃ)।

জ্ঞানমার্গেরই একটি বিশিষ্ট প্রাচীন স্বরূপ মহর্ষি কপিলদেব-প্রণীত পুরুষ-প্রকৃতিবিবেক বা সাংখ্যদর্শনে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু এস্থলে সাংখ্য শব্দে সাংখ্যদর্শন বুঝায় না। যোগ বলিলে সাধারণতঃ আসন-প্রাণায়ামাদি পাতঞ্জল দর্শনোক্ত অষ্টাঙ্গযোগ বা সমাধিযোগ বুঝায়। এস্থলে যোগ শব্দ এ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। গীতায় সমাধিযোগ ও সাংখ্য দর্শনেরও অনেক তত্ত্বই সন্নিবিষ্ট আছে (৭।৪, ৬ষ্ঠ অধ্যায় ও ১৪শ অধ্যায়)। সুতরাং 'যোগ' ও 'সাংখ্য' শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা স্মরণ রাখা আবশ্যক।

শ্রীভগবান্ অর্জুনের শোকমোহ অপনোদন করিবার জন্য, প্রথমে আত্মার অবিনাশিতা, দেহের নশ্বরতা, সুখদুঃখের আত্মধর্মিতা ইত্যাদি অনেক তত্ত্ব-কথা বলিয়াছেন। কিন্তু জ্ঞানমার্গের তত্ত্বানুসারে কর্মসন্ন্যাস না করিয়া কর্মে প্রবৃত্ত হইব কেন, যুদ্ধ করিব কেন, এ প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। বস্তুতঃ অর্জুনেরও উহাতে প্রবোধ হয় নাই। তাই এক্ষণে জ্ঞানগর্ভ কর্মযোগ-তত্ত্ব বলিতে আরম্ভ করিলেন। উহার মূলকথা এই, জ্ঞানলাভ করিয়াও নিষ্কাম বুদ্ধিতে স্বাধিকারানুরূপ কর্তব্য কর্ম করাই উচিত। এই তত্ত্বই পরবর্তী অধ্যায়সমূহেও নানাভাবে আলোচিত হইয়াছে।

কর্মবন্ধ। আমরা যে কর্মই করি না কেন, তাহার ফল আমাদিগকে ভোগ করিতে হইবেই।

"নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটিশতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভাশুভম্॥"

"শত কোটি কল্পেও ভোগ ভিন্ন কর্মক্ষয় হয় না, কৃতকর্মের শুভাশুভ ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।" এই কর্মফল ভোগের জন্য আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু-জরাব্যাধি-সঙ্কুল সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয়। ইহাই কর্মবন্ধন। তবে, কর্মযোগ দ্বারা কিরূপে কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যাইবে ?—এই নিষ্কাম কর্মযোগ দ্বারাই তাহা সম্ভবপর। বন্ধের কারণ কামনা ও কর্তৃত্বাভিমান, কর্ম নহে। আমরা যদি ফল ত্যাগ করিয়া সিদ্ধি ও অসিদ্ধি সমজ্ঞান-করিয়া কর্তৃত্বাভিমান বর্জন করিয়া কর্ম করিতে পারি, তবে সে কর্মে বন্ধন হয় না। 'সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে' (অপিচ ৫।৯, ৫।১২ ১৮।১৭ ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য)। ৩৯

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১

৪০। ইহ (এই নিষ্কাম কর্মযোগে) অভিক্রমনাশঃ (আরব্ধ কর্মের নিষ্ফলতা) ন অস্তি (নাই), প্রত্যবায়ঃ ন বিদ্যতে (ত্রুটি-বিচ্যুতি-জনিত পাপও হয় না); অস্য ধর্মস্য (এই ধর্মের) স্বল্পমপি (অতি অল্পমাত্রও) মহতঃ ভয়াৎ (মহাভয় হইতে) ত্রায়তে (রক্ষা করে)।

ইহাতে (নিষ্কাম কর্মযোগে) আরব্ধ কর্ম নিষ্ফল হয় না এবং (ত্রুটি-বিচ্যুতি-জনিত) পাপ বা বিঘ্ন হয় না, এই ধর্মের অল্প আচরণও মহাভয় হইতে ত্রাণ করে। ৪০

তাৎপর্য—কামনামূলক যাগযজ্ঞ ব্রত-তপস্যাদি যদি আরম্ভ করিয়া সুসম্পন্ন করা না যায় তবে উহা নিষ্ফল হয়, যেটুকু করা হইল তাহাও ব্যর্থ হয়, পুনরায় নূতন আরম্ভ করিতে হয়। আবার উহাতে ত্রুটি-বিচ্যুতি বা অঙ্গহানি হইলে প্রত্যবায় বা পাপ আছে, শাস্ত্র একথাও বলেন। কিন্তু নিষ্কাম কর্মযোগে এইরূপ কোন আশঙ্কা নাই। যিনি কর্মযোগে আরূঢ়, অর্থাৎ যিনি সমস্ত কর্তব্য কর্মই স্বার্থাভিসন্ধি ও কামনা ত্যাগ করিয়া সম্পন্ন করিতে সতত চেষ্টা করেন (২।৪৭, ২।৪৮, ১৮।১৭), 'যিনি মনে করেন কর্ম তাঁহার, ফলাফল তাঁহার, আমি যন্ত্রস্বরূপ'—যিনি এইরূপে কর্ম ও কর্মফল ভগবানে অর্পণ করিয়া একান্ত ভাবে তাঁহার আশ্রয় লন—তাঁহার চিত্ত স্বতঃই ঈশ্বরে আকৃষ্ট হয়, বুদ্ধি ক্রমশঃ শুদ্ধ হইয়া নিষ্কাম হইতে থাকে, আত্মোন্নতির পথ ক্রমেই প্রশস্ততর হয়। এক জন্মে না হউক, জন্মান্তরেও তাহার সিদ্ধি লাভ ঘটে (৬।৪০-৪৫)। এই জন্যই বলা হইয়াছে ইহার অল্প আচরণেও মানবকে মহাভয় হইতে ত্রাণ করে—কেননা, মুমুক্ষু মানবের প্রধান শত্রুই হইতেছে বাসনা। এই বাসনাটাকে যিনি সর্বদাই খর্ব করিতে চেষ্টা করেন এবং তজ্জন্য যাহার বুদ্ধি বহির্মুখিতা ত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ ঈশ্বরমুখী হয়, তাহার আর ভয় কি? এই কর্মযোগই তাহার সকল ভয় দূর করে, পরমা শান্তি প্রদান করে। পক্ষান্তরে, যাহাদের সমস্ত কর্মই কামনা-কলুষিত তাহাদের চিত্ত কিছুতেই ঈশ্বরে একনিষ্ঠ হয় না, অনন্ত

বাসনাতরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া নানা পথে ধাবিত হয় এবং তাহাদিগকে ক্রমশঃ অধঃপাতিত করে (পরের শ্লোক)।

এই শ্লোকে ও পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে সকাম ও নিষ্কাম কর্মের ভেদ প্রদর্শিত হইতেছে।

৪১। হে কুরুনন্দন, ইহ (এই নিষ্কাম কর্মযোগে) ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ (নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি) একা এব (একনিষ্ঠই হয়); অব্যবসায়িনাং (অস্থিরচিত্ত সকামদিগের) বুদ্ধয়ঃ (বুদ্ধি) বহুশাখাঃ হি অনন্তাঃ চ (বহু শাখায় বিভক্ত ও অনন্তরূপ)।

নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ও অস্থিরবুদ্ধি বর্ণনা—
বেদবাদের প্রতিবাদ ৪১-৪৬

ইহাতে (এই নিষ্কাম কর্মযোগে) ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি (নিষ্কাম ভাবে কর্ম করিয়াই ত্রাণ পাইব এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি) একই হয় অর্থাৎ একনিষ্ঠ থাকে, নানাদিকে ধাবিত হয় না। কিন্তু অব্যবসায়ীদিগের (অস্থিরচিত্ত সকাম ব্যক্তিগণের) বুদ্ধি বহুশাখাবিশিষ্ট ও অনন্ত (সুতরাং নানাদিকে ধাবিত হয়)। ৪১

বুদ্ধি, মন, বাসনা—'বুদ্ধি' শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। সাধারণ ভাবে 'বোধ', 'জ্ঞান' অর্থে বুদ্ধি শব্দের সর্বদাই প্রয়োগ হয়। ২।৩৯ শ্লোকে এই অর্থেই ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে। দার্শনিক পরিভাষায় বুদ্ধিকে বলে ব্যবসায়াত্মিকা বা নিশ্চয়াত্মিকা মনোবৃত্তি বা অতিরিন্দ্রিয়। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-সংযোগে মনে নানারূপ জ্ঞান বা সংস্কার জন্মে এবং ইহা কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টি মন্দ, কোন্‌টি গ্রাহ্য, কোন্‌টি ত্যাজ্য, ইহা এই প্রকার না ঐ প্রকার, মনে এইরূপ সঙ্কল্প-বিকল্প উপস্থিত হয়। তখন বুদ্ধি, বিচার করিয়া কোন্‌টি গ্রাহ্য বা কর্তব্য তাহা নির্ণয় করিয়া দেয়। এই হেতু মনকে সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক এবং বুদ্ধিকে ব্যবসায়াত্মিকা ইন্দ্রিয় বলে। সংস্কৃত ভাষায় এইরূপ কার্যাকার্য নির্ণয় করার ব্যাপারকেই 'ব্যবসায়' কহে। 'বুদ্ধি' কিছু স্থির নিশ্চয় করিয়া দিলে মন আবার সেই দিকে ধাবিত হয়, সেই কার্যে আসক্ত হয়। ইহাকেই 'বাসনা' বলে, ইহাকে অনেক সময় বুদ্ধি বা 'বাসনাত্মিকা বুদ্ধি' বলা হয়। এই শ্লোকে প্রথম পংক্তিতে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরই স্পষ্ট উল্লেখ আছে, কিন্তু দ্বিতীয় পংক্তিতে 'বুদ্ধয়ঃ' শব্দে বুঝায় বাসনাত্মিকা বুদ্ধি বা বাসনাতরঙ্গ। বস্তুতঃ, জ্ঞান, বিচার, ব্যবসায়

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥ ৪২
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩
ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪

(perceptive choice), বাসনা (will), উদ্দেশ্য (motive)—এই সকলগুলি গীতায় স্থলবিশেষে এক 'বুদ্ধি' শব্দদ্বারাই প্রকাশিত হয়, ইহা মনে রাখা কর্তব্য।

কাম্যকর্ম ও নিষ্কাম কর্মে পার্থক্য—যাহাতে চিত্ত ঈশ্বরে একনিষ্ঠ হয় তাহাই যোগ, তাহা কর্ম, জ্ঞান, ধ্যান, ভক্তি, যাহাই হউক না কেন। এখানে কর্মোপদেশ দেওয়া যাইতেছে। কোন্ কর্মে চিত্ত ঈশ্বরে একনিষ্ঠ হয়, ঈশ্বর-বিষয়িণী নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি জন্মে?—সমত্ব-বুদ্ধিযুক্ত নিষ্কাম কর্মে। কেননা কেবলমাত্র ঈশ্বর-প্রীতিই এই কর্মের উদ্দেশ্য, অন্য কামনা নাই। কিন্তু সকাম ব্যক্তিগণের বুদ্ধি অনন্ত পথে ধাবিত হয়, কেননা, কামনা অনন্ত। ইহকালে পুত্র চাই, ধন চাই, মান চাই, কত কিছু চাই, আবার পরকালের সম্বল চাই, সুতরাং স্বর্গও চাই। এই জন্য যাগযজ্ঞাদি কত কিছুর ব্যবস্থা আছে। পাছে, অর্জুন কর্ম বলিতে এই সকল কাম্যকর্ম বুঝেন, এই জন্য কাম্যকর্ম ও নিষ্কাম কর্মের পার্থক্য প্রদর্শিত হইতেছে। এই সকল কাম্যকর্মের ব্যবস্থা কোথায় আছে?— বেদের কর্মকাণ্ডে (পরের শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

৪২-৪৪। হে পার্থ, অবিপশ্চিতঃ (অল্পবুদ্ধি, অবিবেকী) বেদবাদরতাঃ (বেদোক্ত কাম্যকর্মের প্রশংসাবাদে অনুরক্ত), অন্যৎ ন অস্তি ইতি বাদিনঃ (তদ্ভিন্ন আর কিছু নাই এই মতবাদী), কামাত্মানঃ (কামনাকুলচিত্ত) স্বর্গপরাঃ (স্বর্গই যাহাদের পরম পুরুষার্থ এরূপ ব্যক্তিগণ), জন্মকর্ম-ফলপ্রদাং (জন্মরূপ কর্মফল প্রদানকারী) ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি (ভোগ ও ঐশ্বর্য লাভের উপায়ভূত) ক্রিয়াবিশেষবহুলাং (বিবিধ ক্রিয়া-কলাপের প্রশংসাসূচক) যাম্ ইমাং পুষ্পিতাং বাচং (এই যে শ্রুতিমনোহর বাক্য) প্রবদন্তি (বলে), তয়া (সেই বাক্যদ্বারা) অপহৃতচেতসাং (বিমুগ্ধচিত্ত) ভোগৈশ্বর্য-প্রসক্তানাং (ভোগৈশ্বর্যে আসক্ত ব্যক্তিগণের) ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ (কার্যাকার্যের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি) সমাধৌ ন বিধীয়তে (সমাধিস্থ হয় না, এক বিষয়ে স্থির হয় না)।

হে পার্থ, অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ বেদের কর্মকাণ্ডের স্বর্গফলাদি প্রকাশক প্রীতিকর বাক্যে অনুরক্ত, তাহারা বলে বেদোক্ত কাম্য-কর্মাত্মক ধর্ম ভিন্ন আর কিছু ধর্ম নাই, তাহাদের চিত্ত কামনা-কলুষিত, স্বর্গই তাহাদের পরম পুরুষার্থ, তাহারা ভোগৈশ্বর্য লাভের উপায়-স্বরূপ বিবিধ ক্রিয়াকলাপের প্রশংসাসূচক আপাতমনোরম বেদবাক্য বলিয়া থাকে। এই সকল শ্রবণ-রমণীয় বাক্যদ্বারা অপহৃতচিত্ত, ভোগৈশ্বর্যে আসক্ত ব্যক্তিগণের কার্যাকার্য-নির্ণায়ক বুদ্ধি এক বিষয়ে স্থির থাকিতে পারে না (ঈশ্বরে একনিষ্ঠ হয় না)। ৪২-৪৪

বেদের কর্মকাণ্ড—বেদের চারি ভাগ—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ ভাগ লইয়া কর্মকাণ্ড এবং আরণ্যক ও উপনিষৎ ভাগ লইয়া জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ডে বিবিধ যাগযজ্ঞাদির ব্যবস্থা আছে এবং বিহিত প্রণালীতে ঐ সমস্ত কর্ম সম্পন্ন হইলে স্বর্গাদি লাভ হয়, এইরূপ ফলশ্রুতিও আছে। সাধারণতঃ 'ধর্মকর্ম' বলিতে লোকে এই সকল কর্মকেই বুঝিয়া থাকে। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, ঐ সকল কাম্যকর্মে ভোগ-বাসনা বিদূরিত হয় না, বরং আরও বর্ধিত হয়। চিত্ত ভোগবাসনায় বিক্ষিপ্ত থাকিলে কখনই ঈশ্বরে একনিষ্ঠ হইতে পারে না। আমি যে নিষ্কাম কর্মের কথা বলিতেছি, কেবল মাত্র তাহাতেই চিত্ত স্থির হইয়া ঈশ্বরাভিমুখী হয়।

বেদবাদরতাঃ—বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদি প্রশংসাবাদে অনুরক্ত। **নান্যদস্তীতি-বাদিনঃ**—এতদ্ভিন্ন অর্থাৎ কাম্য-কর্মাত্মক যে ধর্ম তাহা ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম নাই, এই মতবাদী। ষড়্দর্শনের মধ্যে মীমাংসা দর্শন (পূর্ব-মীমাংসা) কর্মবাদী, অন্যান্যগুলি জ্ঞানবাদী। মীমাংসা মতে যজ্ঞাদিই ধর্ম এবং স্বর্গই পরম পুরুষার্থ, তদ্ভিন্ন ঈশ্বরতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়া কিছু আছে বলিয়া ইঁহারা স্বীকার করেন না। এই শ্লোকে এই কর্মবাদী মীমাংসকদিগকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

জন্মকর্মফলপ্রদাং—যে সকল বাক্য জন্মরূপ কর্মফলপ্রদ—শাঙ্কর-ভাষ্য (কর্ম করিলেই তাহার ফলভোগ আছেই, এবং ফলভোগের জন্যই জন্ম হয়, সুতরাং কর্মের ফলই জন্ম); অথবা জন্ম, কর্ম ও ফলপ্রদ—শ্রীধরস্বামী (কাম্য-কর্মের ফলে জন্ম, জন্মিলেই পুনরায় কর্ম এবং তাহার ফলভোগ আছেই। **পুষ্পিতাং**—শ্রুতিসুখকর, কেননা, স্বর্গলাভ, রাজ্যলাভাদি ফলবাদে পূর্ণ।

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥ ৪৫

ক্রিয়াবিশেষবহুলাং—যাহাতে ভোগৈশ্বর্য প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ বিবিধ ক্রিয়াকলাপের বিধান আছে। ৪২-৪৪

৪৫। হে অর্জুন, বেদাঃ (বেদসমূহ) ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ (ত্রিগুণাত্মক); ত্বং (তুমি) নিস্ত্রৈগুণ্যঃ (ত্রিগুণাতীত, নিষ্কাম) ভব (হও), নির্দ্বন্দ্বঃ (সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব-রহিত), নিত্যসত্ত্বস্থঃ (নিত্য সত্ত্বভাবাশ্রিত, অথবা নিত্য ধৈর্যশীল), নির্যোগক্ষেম (যোগ ও ক্ষেম রহিত), আত্মবান্ (অপ্রমত্ত অথবা পরমেশ্বরে নির্ভরশীল) [ভব—হও]।

হে অর্জুন, বেদসমূহ ত্রৈগুণ্য-বিষয়ক, তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও—তুমি নির্দ্বন্দ্ব, নিত্যসত্ত্বস্থ, যোগ-ক্ষেমরহিত ও আত্মবান্ হও। ৪৫

ব্যাখ্যা। **ত্রৈগুণ্য-বিষয়ক**—ত্রিগুণাত্মক যে সংসার তাহার প্রকাশক (শাঙ্কর-ভাষ্য), অথবা ত্রিগুণাত্মক ব্যক্তিগণের অর্থাৎ সকাম ব্যক্তিদিগের কর্মফল-প্রতিপাদক (শ্রীধর স্বামী); উভয় ব্যাখ্যা মূলতঃ এক। **নিস্ত্রৈগুণ্য**—নিষ্কাম (শাঙ্কর-ভাষ্য, শ্রীধর স্বামী)। সত্ত্ব, রজঃ তমঃ—এই তিন গুণ। ত্রিগুণের কর্ম, ভাব বা সমাহার ত্রৈগুণ্য; এই ত্রিগুণের কার্য দেখি কোথায়? —সৃষ্টিতে, সংসারে। এই তিন গুণদ্বারা প্রকৃতি জীবকে দেহে বা সংসারে আবদ্ধ রাখেন (১৪।৫-৮)। আসক্তি এই বন্ধনের কারণ। কাম্য-কর্মাত্মক বেদ জীবের সংসার-আসক্তিরই প্রতিপাদক, মোক্ষের প্রতিপাদক নহে। সুতরাং তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও, অর্থাৎ ত্রিগুণের যে ভাব তাহা ত্যাগ করিয়া নিষ্কাম হও। নিস্ত্রৈগুণ্যের লক্ষণ কি? নির্দ্বন্দ্ব ইত্যাদি।

নির্দ্বন্দ্ব—শীতোষ্ণ, সুখ-দুঃখাদি পরস্পর-বিরোধী ভাবদ্বয়কে দ্বন্দ্ব বলে। যিনি এই উভয় তুল্য জ্ঞান করেন, তিনি নির্দ্বন্দ্ব।

নিত্যসত্ত্বস্থ—নিত্যসত্ত্বগুণাশ্রিত। 'নিস্ত্রৈগুণ্য হও' বলিয়া আবার 'নিত্যসত্ত্বগুণাশ্রিত হও', বলাতে পরস্পর-বিরুদ্ধ কথা হইতেছে না কি?—এই হেতু 'নিস্ত্রৈগুণ্য' শব্দের ব্যাখ্যাস্থলে টীকাকারগণ 'ত্রিগুণাতীত' শব্দ না বলিয়া 'নিষ্কাম' বলিয়াছেন। কেহ কেহ 'নিত্যসত্ত্বস্থ' অর্থ করিয়াছেন 'নিত্যধৈর্যশীল।' বস্তুতঃ, এখানে কোন বিরোধ নাই। 'ত্রৈগুণ্য' বলিতে বুঝায় সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সমাহার। এই ত্রিগুণের ভাব বর্জন করিতে হইলেই তমঃ ও

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥ ৪৬

রজোগুণকে দমন করিয়া শুদ্ধ সত্ত্বগুণের আশ্রয় লইতে হয়। এই সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ দ্বারাই শেষে স্বতঃই ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ হয়। তাই শ্রীভাগবত বলিয়াছেন—"বিদ্বান্ মুনি সত্ত্বগুণ সেবন দ্বারা রজস্তমঃ জয় করিবেন, শান্তবুদ্ধি বিদ্বান্ উপশমাত্মক সত্ত্ব দ্বারাই আবার সত্ত্বকে জয় করিবেন"—(ভা, ১১, ২৫, ৩৪-৩৫)। বস্তুতঃ, নিত্য সত্ত্বগুণাশ্রিত যে অবস্থা তাহাই সিদ্ধাবস্থা, ইহার পর আর সাধনার প্রয়োজন হয় না। যাঁহারা ত্রিগুণের ভাব বর্জন করিয়াও দেহ রক্ষা করেন এবং লোকহিতার্থ কর্ম করেন, তাঁহাদিগকে সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিয়াই থাকিতে হয়; ভগবান্ অর্জুনকেও কর্মযোগ উপদেশ দিতেছেন; সুতরাং ত্রিগুণের ভাব ত্যাগ করিয়া নিত্য সত্ত্বগুণে থাকিয়া লোকহিতার্থ নিষ্কাম কর্ম করিতে বলিয়াছেন। (অপিচ, ১৪।৬ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

যোগ-ক্ষেম-রহিত—অলব্ধ বস্তুর উপার্জনকে 'যোগ' এবং লব্ধ বস্তুর রক্ষণকে 'ক্ষেম' বলে। অর্থ এই—তুমি উপার্জন ও রক্ষা এই উভয় বিষয়েই চিন্তা ত্যাগ কর।

ক্ষুধা-তৃষ্ণা ত আছে? তজ্জন্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও রক্ষণ না করিলে চলিবে কিরূপে? তুমি **আত্মবান্** হও, আত্মাকে যিনি পাইয়াছেন, তিনি ক্ষুধাতৃষ্ণার চিন্তায় প্রমত্ত হন না (নীলকণ্ঠ); যাঁহার চিত্ত ঈশ্বরে নিত্যযুক্ত, যিনি পরমেশ্বরে নির্ভরশীল, তাঁহার দেহরক্ষার ভার ঈশ্বরই গ্রহণ করেন (মধুসূদন, বিশ্বনাথ)। (৯।২২ শ্লোক দ্রঃ)।

ত্রিগুণের কার্য, ত্রিগুণাতীতের লক্ষণ, ত্রৈগুণ্য লাভের উপায় ইত্যাদি বিস্তারিত ১৪শ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

৪৬। উদপানে (বাপীকূপতড়াগাদি ক্ষুদ্র জলাশয়ে) যাবান্ (যে পরিমাণ) অর্থঃ (প্রয়োজন) [সিদ্ধ হয়], সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে (বিস্তীর্ণ মহাজলাশয়ে) [তাবান্ অর্থঃ (সেই পরিমাণ প্রয়োজন)] সিদ্ধ [হয়], [সেই প্রকার] সর্বেষু বেদেষু (সকল বেদে) [যাবান্ অর্থঃ (যে সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হয়)] তাবান্ (সে সমস্ত) বিজানতঃ (ব্রহ্মবেত্তা) ব্রাহ্মণস্য (ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষের) [লাভ হয়]।

ব্যাপীকূপতড়াগাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ে যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, এক বিস্তীর্ণ মহাজলাশয়ে সেই সমস্তই সিদ্ধ হয়; সেইরূপ বেদোক্ত

কাম্যকর্মসমূহে যে ফল লাভ হয়, ব্রহ্মবেত্তা ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষের সেই সমস্তই লাভ হয়। ৪৬

তাৎপর্য এই যে, সকাম ব্যক্তিগণ বেদোক্ত কাম্যকর্মজনিত স্বর্গভোগাদি হইতে যে আনন্দ লাভ করেন, নিষ্কাম কর্মী তাহা হইতেও বঞ্চিত হন না, কেননা নিষ্কাম কর্মদ্বারা যে ভূমা আত্মানন্দ লাভ হয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভোগানন্দসকল তাহারই অন্তর্গত। প্রাণিসকল সেই ভূমানন্দের কণিকামাত্র ভোগ করিয়া আনন্দে কালাতিপাত করে। যিনি ব্রহ্মানন্দের অধিকারী, তাঁহার ক্ষুদ্র ভোগানন্দের অভাব হয় না, আকাঙ্ক্ষা হয় না।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য এবং তদনুসরণে প্রাচীন টীকাকারগণ সকলেই এই শ্লোকের পূর্বোক্তরূপ অন্বয় ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এইরূপ অন্বয় যে নিতান্ত কষ্টকল্পিত তাহা সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। লোকমান্য তিলক, বঙ্কিমচন্দ্র-প্রমুখ আধুনিক ব্যাখ্যাকর্তৃগণের অনেকেই এই শ্লোকের নিম্নোক্তরূপ অন্বয় ও ব্যাখ্যা করেন।—

সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে সতি (সকল স্থান জলে প্লাবিত হইলে) উদপানে যাবান্ অর্থঃ, বিজানতঃ ব্রাহ্মণস্য সর্বেষু বেদেষু তাবান্ [অর্থঃ] [ন প্রয়োজনমিতিভাবঃ]।—সকল স্থান জলে প্লাবিত হইলে কূপাদি ক্ষুদ্র জলাশয়ে যে প্রয়োজন, তত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষের সমস্ত বেদেও সেই প্রয়োজন। ৪৬

তাৎপর্য এই যে, সকল স্থান জলে প্লাবিত হইলে যেমন কূপাদি ক্ষুদ্র জলাশয়ের কোন প্রয়োজন হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষের বেদে কোন প্রয়োজন নাই। কেননা, যিনি ব্রহ্মজ্ঞ, যিনি ঈশ্বরকে জানিয়াছেন, তাঁহার আর বেদে কি প্রয়োজন ?

এইরূপ অন্বয় ও ব্যাখ্যায় কোন কষ্টকল্পনা নাই। কিন্তু প্রাচীন ব্যাখ্যাকর্তৃগণ কেহই ইহা গ্রহণ করেন নাই। না করিবার কারণ এই বোধ হয় যে, ইহা স্পষ্টই বেদ-নিন্দার মত শুনায়। ব্রহ্মজ্ঞই হউন আর যাহাই হউন বেদে কাহারও প্রয়োজন নাই, এরূপ কথা যাহাতে না বলা হয় তাঁহারা সেইরূপ ব্যাখ্যারই অন্বেষণ করিয়াছেন। বেদে প্রাচীনদিগের এইরূপই প্রগাঢ় আস্থা ছিল।

রহস্য—গীতা ও বেদ

প্রশ্ন। প্রাচীনদিগের কথাই বা কেন ? বর্তমান হিন্দু-সমাজও ত বেদশাসিত ; হিন্দুর ধর্মকর্ম সকলই বেদমূলক। পুরাণাদি সকলই বেদের ব্যাখ্যা-

স্বরূপ। সনাতন ধর্ম কি?—এ কথার উত্তরে সমস্ত শাস্ত্র-পুরাণ এক বাক্যে বলেন—'যাহা বেদমূলক তাহাই ধর্ম'। কিন্তু গীতাশাস্ত্র বলিতেছেন—এই যে বেদমূলক কাম্যকর্মাত্মক ধর্ম—উহা শ্রেয়ঃপথ নহে; যদি তাহাই হইত, তবে বেদে এ সকল 'জন্মকর্মফলপ্রদ' কর্মকাণ্ডের বিধি-ব্যবস্থা কেন? এ কয়েকটি শ্লোক বেদবিরোধী নয় কি?

উত্তর। না, তা নয়। 'যাহা' বেদমূলক তাহাই ধর্ম—এ কথা ঠিক। কিন্তু বেদ কি তাহা আমরা জানি না। বেদের প্রকৃত তাৎপর্য কি তাহা বুঝি না। মোক্ষমূলর বা ৺রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ পড়িয়া তাহা জানা যায় না। প্রাচীন নিরুক্তকারগণের (বেদের ব্যাখ্যাকর্তৃগণের) মধ্যেও মর্মান্তিক মতভেদ দৃষ্ট হয়; দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রাদি বেদ শিরোধার্য করিয়াও পরস্পর বিরুদ্ধ মতাবলম্বী। অতি প্রাচীনকালে বেদের গূঢ়ার্থ গুরু-শিষ্য-পরম্পরাক্রমে অধিগত হইত, উহা লিপিবদ্ধ হইত না। উহা বহু পূর্বেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। পরে বেদার্থ যিনি যেরূপ বুঝিয়াছেন তিনি সেইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং তদনুসারে নানা মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। দ্বাপরযুগের শেষকালে কিরূপ বিষম ধর্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা মহাভারতে অশ্বমেধ পর্বে বর্ণিত আছে (৪৯ অঃ ২-১২)। এই সময় একটি ধর্মমত (বা অধর্মমত) বড় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহা এই কাম্যকর্মবাদ, ইহাকেই **বেদবাদ** বলা হইয়াছে (২।৪২)। কর্মবাদী বলেন, বেদের কর্মকাণ্ডই সার্থক, যাগযজ্ঞাদিই একমাত্র ধর্ম, স্বর্গই একমাত্র পুরুষার্থ, উহাতেই সমস্ত দুঃখনিবৃত্তি, এতদ্ব্যতীত ঈশ্বরতত্ত্ব বলিয়া আর কিছুই নাই। সুতরাং যাগযজ্ঞ কর, আর সব মিথ্যা। এই আপাতমনোরম কর্মমার্গ, যাহা ইহকালে ধনৈশ্বর্য, পরকালে উর্বশী-পারিজাতাদির আশাপ্রদ, তাহা যে লোকপ্রিয় হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। ফলে যাগযজ্ঞাদির ঘটা বাড়িয়া গেল। অশ্বমেধ, গো-মেধ, নরমেধাদি 'মেধে'র মাত্রা বৃদ্ধি পাইল, প্রাণিবধই ধর্মে পরিণত হইল। এইরূপ যখন ধর্মের গ্লানি, অধর্মের অভ্যুত্থান, তখনই ধর্ম সংস্থাপনার্থ শ্রীভগবানের অবতার—গীতা-প্রচার (৪র্থ অঃ ৭।৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। তাই শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—এই নিরীশ্বর 'বেদবাদরত' 'নান্যদস্তীতি'-বাদী, মূঢ়গণের কথায় মুগ্ধ হইও না, ওপথে যাইও না, উহাতে বুদ্ধি ঈশ্বরে একনিষ্ঠ হয় না। ইহা বেদ-নিন্দা নহে, বেদের অপব্যাখ্যাকারী কর্মবাদিগণের নিন্দা।

বেদকে যে 'ত্রৈগুণ্য-বিষয়ক' বলা হইয়াছে উহা অবশ্য সংহিতাভাগ বা

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ॥ ৪৭

কর্মকাণ্ডকে লক্ষ করিয়া। বেদের জ্ঞানকাণ্ড বা উপনিষৎ ভাগ নিস্ত্রৈগুণ্য, উহা ব্রহ্মতত্ত্ব-প্রতিপাদক, ব্রহ্মবিদ্যা। কর্মকাণ্ড ত্রিগুণাত্মক, ইহা সকলেরই স্বীকার্য, সুতরাং 'ব্রহ্মজ্ঞের ইহাতে প্রয়োজন নাই' একথায় নিন্দা হয় না।

প্রশ্ন—কিন্তু যাহাতে জ্ঞানীর প্রয়োজন নাই, যাহা সংসারবন্ধের কারণ, সেই ক্ষণস্থায়ী, অল্পফলদায়ী ত্রিগুণাত্মক ধর্মের ব্যবস্থায় বেদ প্রবৃত্ত হইলেন কেন?

ইহার **উত্তর** এই—ত্রিগুণাতীত ব্রহ্মের এই ত্রিগুণাত্মক জগৎ সৃষ্টি কেন? জগৎ ত্রিগুণাত্মক, সংসার ত্রিগুণাত্মক, দেহাভিমানী জীব ত্রিগুণে অভিভূত—সে ত্রিগুণ ত্যাগ করিতে না পারিলে, নিবৃত্তি-মার্গ অবলম্বন করিতে না পারিলে—কোন্ ধর্ম লইয়া থাকিবে? তাহার উচ্ছৃঙ্খল কামনা বিধিবদ্ধ না করিলে সংসার রক্ষা পাইবে কিরূপে? কামনা পূরণার্থ যাগযজ্ঞ ও দেবার্চনাদির ব্যবস্থা, স্বর্গের প্রলোভন, প্রবৃত্তির প্রতিরোধার্থ নরকাদির ভয়, প্রায়শ্চিত্তাদির বিধান, এই সকল না থাকিলে কামনাকুল জীব স্বেচ্ছাচারী হইয়া আত্মঘাতী হইয়া উঠিত। তাই লোকবৎসল বেদ—অজ্ঞ নিম্ন অধিকারীর জন্য এই সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং উহাতে রুচি জন্মাইবার জন্য স্বর্গফলাদির বর্ণনা করিয়াছেন। ('রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ')। উচ্চাধিকারী ব্যক্তি ঐ সকল কর্ম ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া করিবেন, উহাতে কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সিদ্ধিলাভ করিবেন। যথা ভাগবতে—

বেদোক্তমেব কুর্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্যাং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ ॥ ভাঃ ২১।৩।৪৬

তাই শ্রীভগবান্ প্রিয় সখা ও শিষ্যকে বলিতেছেন—তুমি ওপথ ত্যাগ কর, উহা প্রেয়ের (আপাত-মনোরম সাংসারিক সুখ) পথ। তুমি শ্রেয়ের পথে যাও—সে পথ কর্মত্যাগ নহে, ফলত্যাগ (পরের শ্লোক)। ৪৬

৪৭। কর্মণি এব (কর্মেই) তে (তব) অধিকারঃ, কদাচন (কদাচ) ফলেষু (কর্মফলে) মা (নাই); [তুমি] কর্মফলহেতুঃ (কর্মফলাশায় কর্মে প্রবৃত্ত) মা ভূঃ (হইও না), অকর্মণি (কর্ম ত্যাগে) তে সঙ্গঃ (তোমার প্রবৃত্তি) মা অস্তু (না হউক)।

সাম্যবুদ্ধি-যুক্ত নিষ্কাম কর্মের উপদেশ—উহাই যোগ ৪৭-৪৮

কর্মেই তোমার অধিকার, কর্মফলে কখনও তোমার অধিকার নাই। কর্মফল যেন তোমার কর্মপ্রবৃত্তির হেতু না হয়, কর্মত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়। ৪৭

কর্মফলহেতুঃ—কর্মফলং হেতুঃ প্রবৃত্তিহেতুঃ যস্য তথাভূতঃ—কর্মফলই যাহার কর্মপ্রবৃত্তির হেতু বা কারণ (শ্রীধর স্বামী)।

নিষ্কাম কর্মযোগ—পূর্বে বলা হইয়াছে, কর্মবাদিগণ স্বর্গাদিফলপ্রদ কাম্য কর্মকেই একমাত্র ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। অপর পক্ষে জ্ঞানবাদিগণ, কর্মমাত্রই বন্ধনের কারণ বলিয়া সর্বকর্মত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণই শ্রেয়োমার্গ বলিয়া প্রচার করিতেছিলেন (১৮।৩)। ইহাই সন্ন্যাসবাদ। কিন্তু শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, না, ওটিও তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃপথ নহে।—(১) তোমার অধিকার কর্মে, (২) ফলে নয়। তোমাকে যথাধিকার কর্ম করিতে হইবে, (৩) কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া কর্মে প্রবৃত্ত হইও না। (৪) আর ফলাকাঙ্ক্ষা নাই বলিয়া কর্মত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়। এই শ্লোকের চারিটি চরণ **কর্মযোগের চতুঃসূত্রী** (তিলক)।

পরবর্তী শ্লোকসমূহের আলোচনায় এ তত্ত্ব ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইবে। পরের শ্লোকে ইহাকেই যোগ বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত কয়েকটি কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য। এই কর্মযোগের **তিনটি লক্ষণ**—

১ম—**ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন**—সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমত্ব বুদ্ধি। (২।৪৮)

২য়—**কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ**—(৩।২৭, ৫।৮-৯, ১৮।১৬-১৭ ইত্যাদি)।

৩য়—**ঈশ্বরে সর্বকর্ম সমর্পণ**—(৩।৯, ৩।৩০, ৫।১০, ১৮।৫৭ ইত্যাদি)।

কর্ম কি? অনেকে গীতোক্ত 'কর্ম' অর্থে বুঝেন শ্রৌত-স্মার্ত কর্ম, ইষ্টাপূর্ত, এই সব। ইষ্ট অর্থ যাগযজ্ঞাদি, পূর্ত অর্থ বাপীকূপখননাদি। এইগুলি প্রায় সকলই কাম্যকর্ম। তাঁহারা বলেন, এই সকল কাম্য-কর্মই নিষ্কামভাবে করিতে হইবে, ইহাই গীতোক্ত কর্মযোগ। একথা ঠিক, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, 'নিষ্কাম কাম্যকর্ম' ব্যাপারটা অনেক স্থলেই নিরর্থক হইয়া উঠে। ধরুন, পুত্রেষ্টি যাগ; ইহার উদ্দেশ্যই পুত্রলাভ। যে পুত্রাকাঙ্ক্ষা করে না, সে উহা করিবে কেন, আর করিয়াই বা লাভ কি? বস্তুতঃ গীতায় 'কর্ম' শব্দ এরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, তাহা গীতাতেই স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। 'তুমি যুদ্ধ কর', 'জনকাদিও কর্ম করিয়াছেন', 'আমি লোকরক্ষার্থ

স্বয়ং কর্ম করি', 'কর্ম না করিয়া কেহ ক্ষণকালও থাকিতে পারে না', 'কর্ম ব্যতীত শরীর-যাত্রাও নির্বাহ হয় না' ইত্যাদি বাক্যে ইষ্টাপূর্তের কোন প্রসঙ্গ নাই। (৩।৫, ৩।৮-৯, ৩।২২, ১৮।১১ ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য)। তবে 'কর্ম' অর্থ 'নিয়ত কর্ম'—ইহা বলা হইয়াছে। 'নিয়ত কর্ম' কি পরে পাওয়া যাইবে। (৩।৮)

রহস্য—নিষ্কাম কর্ম কি সম্ভবপর ?

প্রঃ। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত এবং তাঁহাদের এ দেশীয় শিষ্যগণ বলেন—ফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া, সিদ্ধি-অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করিয়া কর্ম করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকিলে কর্ম করিবে কেন? উদ্দেশ্য (motive) ভিন্ন কর্ম হয় না।

উঃ। উদ্দেশ্য ভিন্ন কর্ম হয় না, তাহা ঠিক। 'প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ততে'—উদ্দেশ্য ব্যতীত মূঢ়লোকেও কর্মে প্রবৃত্ত হয় না। কিন্তু ফলাফলে উদাসীনতা ও উদ্দেশ্যহীনতা এক কথা নহে। নিষ্কাম কর্মও উদ্দেশ্যহীন নহে, 'লোক-সংগ্রহ', ভগবানের সৃষ্টিরক্ষাই উহার উদ্দেশ্য; উহা ভগবানের কর্ম, জগৎ রক্ষার জন্য, প্রকৃতির প্রেরণায় জীবের মধ্য দিয়া হয়। এই হেতুই নিষ্কাম কর্মী সমস্ত কর্মফল 'জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়' সমর্পণ করেন। বস্তুতঃ, ইহা ভগবানের অর্চনা (১৮।৪৬)। যখন ভাগবত ইচ্ছা ও কর্মীর ইচ্ছা এক হয়, তখনই প্রকৃত নিষ্কাম কর্ম সম্ভবপর, তখন কর্তার ব্যক্তিত্ব থাকে না। এরূপ অবস্থায় ফলাফলে সমত্ব-বুদ্ধি অসম্ভব ব্যাপার তো নহেই, ফলতঃ উহা স্বাভাবিকই হইয়া উঠে। বালকেরা দুই দল বাঁধিয়া খেলা করে, তাহাদের উদ্দেশ্য আমোদ লাভ, উহাই তাহাদের স্বভাব। খেলায় জয়-পরাজয়ে তাহারা অনেকটা উদাসীন। কিন্তু যাহারা জুয়া খেলে, তাহারা জয়-পরাজয়ে উদাসীন হইতে পারে না, কেননা, তাহাদের উদ্দেশ্যই স্বপক্ষের জয় ও বিপক্ষের পরাজয়। (অপিচ ৩।২০ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রঃ)

প্রঃ। অনেকে একথাও বলেন যে, এরূপ ভাবে কর্ম করা সম্ভবপর হইলেও এ কর্মের 'moral value' (নৈতিক মূল্য) নাই, উহা 'mechanical', যেন যন্ত্রচালিত পুতুলের কাজ অর্থাৎ কার্য ভাল হউক মন্দ হউক—সে জন্য পুতুল দায়ী নহে, যে তাহাকে চালায় সে-ই দায়ী।

উঃ। এ কথা অবশ্য স্বীকার্য। তবে এস্থলে তাঁহারা মূলেই একটা মস্ত ভুল করেন। তাঁহারা যাহাকে 'moral value' (নৈতিক মূল্য) বলেন, গীতার অধ্যাত্ম-তত্ত্ব উহার অনেক উপরে। ঐ moral valueটিকে—ঐ

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥ ৪৮

কর্মফলের দায়িত্বটা—ত্যাগ করাই নিষ্কাম কর্মীর লক্ষ্য। উহাই কর্মবন্ধ। উহার ফল স্বর্গ বা নরক বা পুনর্জন্ম। হিন্দু-সাধক ইহার কোনটিই চাহেন না। তিনি জানিতে চাহেন তাঁহাকে, যাঁহা হইতে তাহার উদ্ভব, যাঁহা হইতে তাহার কর্মপ্রবৃত্তি। সুতরাং তিনি নিজেকে যন্ত্রস্বরূপ মনে করিয়া সেই যন্ত্রীর উপরই আত্মসমর্পণ করেন। রাজসিক কর্মীর কর্মজীবনের মূলমন্ত্র 'অহং'-প্রতিষ্ঠা, সাত্ত্বিক হিন্দুর কর্মজীবনের প্রথম ও শেষ কথা 'অহং'-ত্যাগ। তাই হিন্দু প্রত্যহ শয্যা হইতে উঠিয়া কর্মারম্ভের পূর্বে বলিয়া থাকেন—'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।'

৪৮। হে ধনঞ্জয়, যোগস্থঃ [সন্] (যোগে অবস্থিত হইয়া) সঙ্গং ত্যক্ত্বা (ফলাসক্তি বর্জন করিয়া) সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ (সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে) সমঃ ভূত্বা (সম অর্থাৎ হর্ষবিষাদশূন্য হইয়া) কর্মাণি কুরু (কর্ম কর); (এইরূপ) সমত্বং (সমতা) যোগঃ উচ্যতে (যোগ বলিয়া উক্ত হয়)।

হে ধনঞ্জয়, যোগস্থ হইয়া, ফলাসক্তি বর্জন করিয়া, সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তুল্যজ্ঞান করিয়া তুমি কর্ম কর। এইরূপ সমত্ব-বুদ্ধিকেই যোগ কহে। ৪৮

কর্মে তোমার অধিকার, কর্ম করিতেই হইবে। তবে কি ভাবে কর্ম করিবে? **যোগস্থ** হইয়া কর্ম করিবে। যোগ কি? 'যোগ' শব্দ এখানে যে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে যে সমত্ববুদ্ধি তাহাই যোগ। সিদ্ধিতে হর্ষ অথবা অসিদ্ধিতে বিষাদ উভয় ত্যাগ করিয়া কর্ম করিবে। সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে হর্ষবিষাদশূন্য হইতে পারে কে?—যে ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে পারে। সুতরাং ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া সিদ্ধি ও অসিদ্ধি সমজ্ঞান করিয়া কর্ম কর।—এই শ্লোকের শেষার্ধ প্রথমার্ধের সম্প্রসারণ বা ব্যাখ্যাস্বরূপ।

শ্রীধরস্বামী—'যোগ' অর্থ করেন 'পরমেশ্বরৈকপরতা' এবং 'সঙ্গ' অর্থ করেন 'কর্তৃত্বাভিনিবেশ'। কিন্তু 'যোগ' শব্দের অর্থ এই শ্লোকেই ভগবান্ বলিয়া দিয়াছেন, তখন অন্য অর্থ গ্রহণ করার প্রয়োজন কি? 'ফলাসক্তি ত্যাগ' এই অর্থে 'সঙ্গ ত্যাগ' শব্দ পুনঃ পুনঃ গীতায় ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং অন্য

দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯

অর্থ গ্রহণ করা নিষ্প্রয়োজন। পুনরুক্তি আশঙ্কায় বোধ হয় তিনি এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু 'এই শ্লোকের শেষার্ধ প্রথমার্ধের সম্প্রসারণ বা ব্যাখ্যা-স্বরূপ, সুতরাং পুনরুক্তি নহে' (মধুসূদন)। কিন্তু শ্রীধর স্বামিকৃত ব্যাখ্যা এস্থলে অনাবশ্যক হইলেও সুসঙ্গত। ঈশ্বরে সর্ব কর্ম সমর্পণ ও কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ —ইহাও নিষ্কাম কর্মেরই লক্ষণ (২।৭১, ৩।৯, ৩।২৭, ৩।৩০, ৫।১০, ৯।২৭-২৮, ১৩।২৯, ১৮।১৬-১৭, ১৮।৫৭ ইত্যাদি)।

৪৯। হে ধনঞ্জয়, কর্ম (কেবল বাহ্য কর্ম) বুদ্ধিযোগাৎ (সমত্ব বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা) দূরেণ হি (নিতান্তই) অবরং (নিকৃষ্ট, গৌণ); (অতএব তুমি) বুদ্ধৌ (সমত্ববুদ্ধিতে) শরণম্ অন্বিচ্ছ (আশ্রয় প্রার্থনা কর), ফলহেতবঃ (ফল-কামিগণ) কৃপণাঃ (দীন, নিকৃষ্ট, কৃপার পাত্র)

সাম্যবুদ্ধিই কর্মযোগের মূল—উহারই নাম স্থিরপ্রজ্ঞা—উহাতেই সিদ্ধি। ৪৯-৫৩

হে ধনঞ্জয়, কেবল বাহ্যকর্ম বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা নিতান্তই নিকৃষ্ট, অতএব তুমি সমত্ববুদ্ধির আশ্রয় লও; যাহারা ফলের উদ্দেশ্যে কর্ম করে, তাহারা দীন, কৃপার পাত্র। ৪৯

তাৎপর্য—এ স্থলে বলা হইল, বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা কর্ম নিকৃষ্ট অর্থাৎ কর্ম অপেক্ষা সাম্যবুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ। এই কথার মর্ম এই যে, কর্মতত্ত্বের বিচারে কর্মের বাহ্য ফলের বিচার গৌণ, কর্তার বুদ্ধির বিচারই মুখ্য। কর্তার বুদ্ধি যদি স্থির, শুদ্ধ, সম ও নিষ্কাম হয়, তবে কর্মের ফল যাহাই হউক না কেন, কর্তার তাহাতে পাপপুণ্য স্পর্শে না, তিনি কর্মফল-ভোগী হন না (২।৫০-৫১) সুতরাং তুমি সাম্যবুদ্ধির আশ্রয় লও, ফলাফলে সমচিত্ত হও, যাহারা কেবল ফলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কর্ম করে, তাহারা নিকৃষ্ট হতভাগ্য। স্বধর্ম পালনে পুণ্য হইবে, আবার গুরুজনাদি বধে পাপ হইবে, এই যে কর্তব্য-সঙ্কট বা কর্মফলের বিতর্ক, ওদিকে মন দিও না; কর্মটা নিতান্ত গৌণ, বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ, তুমি শুদ্ধ সাম্য বুদ্ধির আশ্রয় লইয়া কর্ম কর, তবেই কর্মফল হইতে মুক্ত হইবে।

পূর্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে যে সমত্ববুদ্ধি তাহাই যোগ। এই সমত্ববুদ্ধি-রূপ যোগ বা সমত্ববুদ্ধির যোগকেই এখানে বুদ্ধিযোগ বলা

হইয়াছে। এই শ্লোকে 'বুদ্ধি' অর্থ সমত্ববুদ্ধি। কোন কোন প্রাচীন ব্যাখ্যাকর্তা 'বুদ্ধি' অর্থ করেন 'সাংখ্যবুদ্ধি' 'পরমাত্মবুদ্ধি' এবং 'বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ' এই শ্লোকাংশের অর্থ করেন—'পরমার্থবিধায়ক জ্ঞানমার্গে বিচরণ কর' ইত্যাদি। কিন্তু জ্ঞানযোগের এখানে কোন প্রসঙ্গ দেখা যায় না। পরবর্তী শ্লোকেও 'যোগ' অর্থ কর্মের কৌশল বা কর্মযোগ ইহাই বলা হইয়াছে।

বুদ্ধিযোগ—কর্ম অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ—এই তত্ত্বটি গীতোক্ত কর্মযোগেরই মূল ভিত্তি এবং এই জন্য ইহাকে বুদ্ধিযোগও (বুদ্ধির যোগ বা বুদ্ধিরূপ যোগ) বলা হয়। কর্মাকর্মের নৈতিক বিচারেও ইহাই শ্রেষ্ঠ কষ্টিপাথর অর্থাৎ কোন্ কর্ম ভাল, কোন্ কর্ম মন্দ, কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ, কোন্‌টি নিকৃষ্ট, ইহা বিচার করিবার সময় কর্মের বাহ্য ফলের দিকে দৃষ্টি না করিয়া, কর্তা কি উদ্দেশ্যে, কিরূপ বুদ্ধিতে কার্য করেন তাহাই দেখিতে হইবে এবং তদনুসারেই কর্মের ভাল-মন্দ বিচার করিতে হইবে। দৃষ্টান্ত—'রাজা বাহাদুর' হইবার আশায় কেহ দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডারে লক্ষ টাকা দান করিলেন, তাহাতে বহু লোকের জীবন রক্ষা হইল। আবার কোন দরিদ্র ব্যক্তি অনাহারে থাকিয়া নিজের জন্য প্রস্তুত অন্ন বুভুক্ষু অতিথিকে দান করিলেন, তাহাতে মাত্র একটি লোকের উপকার হইল। কোন্ দান শ্রেষ্ঠ? নৈতিক বিচারে দরিদ্রের দান শ্রেষ্ঠ, কেননা এস্থলে দরিদ্র কর্তার বুদ্ধি শুদ্ধ, পবিত্র, নিষ্কাম ; ধনী কর্তার বুদ্ধি কামনা-কলুষিত।

কর্মাকর্মের নৈতিক বিচারে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনেকেই এই বুদ্ধিতত্ত্বই গ্রহণ করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ জার্মান তত্ত্ববিদ্ মনস্বী কাণ্ট লিখিয়াছেন—"The moral worth of an action cannot be anywhere but in the principle of the will, without regard in the ends which can be attained by action."—(Kant's Theory of Ethics quoted by Lok. Tilak)। গীতার 'বুদ্ধি' শব্দের যথাযথ ইংরেজী অনুবাদ করিতে গেলে বলিতে হয়, 'intelligent will' (*Aurobindo*)।

আবার আধ্যাত্মিক বিচারে বা মোক্ষদৃষ্টিতে দেখিতে গেলেও বুঝা যায়, এই বুদ্ধির উপপত্তিই গীতোক্ত কর্মতত্ত্বের মুখ্য কথা। সন্ন্যাসবাদীরা বলেন—কর্মমাত্রই বন্ধনের কারণ, সুতরাং কর্মত্যাগ ব্যতীত মোক্ষ হয় না। গীতা বলেন, বন্ধনের কারণ কর্ম নহে, কামনা ফলাসক্তি বা বাসনা। কর্তার ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি যদি সমাহিত হয়, বাসনাত্মিকা বুদ্ধি যদি নিষ্কাম হইয়া শুদ্ধ হয়, সিদ্ধি অসিদ্ধিতে যদি তাহার সমত্ব-বোধ জন্মে, তবে তিনি যে কর্মই

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্ ॥ ৫০

করুন না কেন, তাহাতে তাঁহার বন্ধন হয় না—সে কর্ম যুদ্ধকর্মই হউক আর যাহাই হউক। যে নিষ্কাম বুদ্ধি দ্বারা কর্মের বন্ধকত্ব দূর হয় তাহাকেই গীতায় সাম্যবুদ্ধি বলা হইয়াছে এবং ইহাকেই যোগ বলা হইয়াছে। ইহা লাভ করিতে হইলে কামনা ও কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করা চাই, ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে কর্ম করা চাই, চিত্ত একনিষ্ঠ হওয়া চাই—অর্থাৎ জ্ঞান, ভক্তি, ধ্যান—সমস্তেরই ইহাতে সমাবেশ করা হইয়াছে। এই জন্য এই সকল তত্ত্বই গীতায় ক্রমশঃ বিস্তার করা হইয়াছে।

'এক্ষণে বুঝা গেল, বুদ্ধিযোগ বলিতে কি বুঝায়, অভ্রান্ত বুদ্ধির সহিত এবং সেই জন্য অভ্রান্ত ইচ্ছার সহিত, অনন্যচিত্ত হইয়া সর্বভূতে এক আত্মা জানিয়া, আত্মার শান্ত সমতা হইতে কার্য করা, অনন্ত কামনার বশে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি না করা, ইহাই 'বুদ্ধিযোগ'।' —শ্রীঅরবিন্দের গীতা (অনিলবরণ)

৫০। বুদ্ধিযুক্তঃ (সমত্ববুদ্ধিযুক্ত কর্মযোগী) ইহ (এই লোকেই) উভে সুকৃতদুষ্কৃতে (পুণ্যপাপ উভয়ই) জহাতি (ত্যাগ করেন); তস্মাৎ (সেই হেতু) যোগায় যুজ্যস্ব (যোগের অনুষ্ঠান কর); যোগঃ কর্মসু কৌশলম্ (কর্মে কৌশলই যোগ)।

সমত্ববুদ্ধিযুক্ত নিষ্কাম কর্মী ইহলোকেই সুকৃত দুষ্কৃত উভয়ই ত্যাগ করেন, সুতরাং তুমি যোগের অনুষ্ঠান কর, কর্মে কৌশলই যোগ। ৫০

বুদ্ধিযোগ কাহাকে বলে পূর্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে। সেই সাম্যবুদ্ধিতে যিনি যুক্ত তিনি বুদ্ধিযুক্ত অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মযোগী। স্বর্গাদি যে সকল কর্মের ফল তাহা সুকৃত বা পুণ্য কর্ম, নরকাদি যাহার ফল তাহা দুষ্কৃত বা পাপকর্ম। বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি এ উভয়ই ত্যাগ করেন। কেননা, উভয়ই বন্ধের কারণ। তবে কি তিনি সদসৎ কোন কর্মই করেন না? না, তা নয়। একথার অর্থ এই যে, তিনি স্বর্গাদির কামনায় বা নরকাদির ভয়ে কোন কর্ম করেন না, তিনি ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জিত, সমত্ববুদ্ধিযুক্ত—সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, ভয়-অভয়, লাভালাভ ইত্যাদি সর্বপ্রকার দ্বন্দ্ব হইতে নির্মুক্ত। সুতরাং তুমি এইরূপ যোগ অবলম্বন কর—কর্মের কৌশলটি শিক্ষা কর। কর্মের কৌশল কি? সমত্ব-বুদ্ধিযুক্ত হইয়া কর্ম করাই কর্মের কৌশল। উহাই যোগ। কর্ম সকলেই করে; কিন্তু যে সমত্ববুদ্ধিযুক্ত হইয়া কর্ম করিতে পারে সে-ই কৌশলী, সে-ই

কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১
যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ ৫২

চতুর : কেননা, সে কর্ম করিয়াও কর্মবন্ধ হইতে মুক্ত হয় (পরের শ্লোক) জল অবিশুদ্ধ বলিয়া জলপান ত্যাগ করা চলে না, কৌশলে বিশুদ্ধ করিয়া লইতে হয়। সেইরূপ কর্ম দোষাবহ বলিয়া কর্ম ত্যাগ করা চলে না, কৌশলে দোষ পরিহার করিয়া কর্ম করিতে হয়, এই কৌশলই যোগ।

৫১। বুদ্ধিযুক্তাঃ মনীষিণঃ (সমত্ববুদ্ধিযুক্ত জ্ঞানিগণ) কর্মজং ফলং ত্যক্ত্বা (কর্মজনিত ফল ত্যাগ করিয়া) জন্মবন্ধবিনির্মুক্তা [সন্তঃ] (জন্মরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া) অনাময়ং (ক্লেশশূন্য, সর্বোপদ্রবরহিত) পদং (পরম পদ, মোক্ষ) গচ্ছন্তি হি (নিশ্চিতই লাভ করেন)।

সমত্ববুদ্ধিযুক্ত জ্ঞানিগণ কর্ম করিলেও কর্মজনিত ফলে আবদ্ধ হন না, সুতরাং তাঁহারা জন্মরূপ বন্ধন অর্থাৎ সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সর্বপ্রকার উপদ্রবরহিত বিষ্ণুপদ বা মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন। ৫১

অনাময়ং পদং—সর্বোপদ্রবরহিতং পরমানন্দপ্রাপ্তিরূপং মোক্ষাখ্যং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং (শ্রীধর, মধুসূদন), বৈকুণ্ঠং (বলদেব)।

স্বর্গলাভ ও মোক্ষলাভ—কর্মমাত্রই বন্ধের কারণ, সে সুকৃতই হউক আর দুষ্কৃতই হউক,—যেমন স্বর্ণ-শৃঙ্খল আর লৌহ-শৃঙ্খল। পুণ্যফলে স্বর্গাদিপ্রাপ্তি মোক্ষ নহে, উহাও অস্থায়ী ভোগের বিষয়মাত্র। স্বর্গ হইতেও পতন অনিবার্য। কিন্তু সমত্ববুদ্ধিযুক্ত নিষ্কাম কর্মী কর্মের ফল যে জন্ম বা সংসারবন্ধন তাহাতে বদ্ধ হন না, তিনি মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন। কারণ কামনাই বন্ধের কারণ, তিনি তাহা ত্যাগ করিয়াছেন (৩।১৯, ৪।২২, ২৩ দ্রষ্টব্য)। ৫১

৫২। যদা (যখন) তে বুদ্ধিঃ (তোমার বুদ্ধি) মোহকলিলং (অবিবেকরূপ কলুষ, অজ্ঞানরূপ গহন কানন), ব্যতিতরিষ্যতি (পরিত্যাগ করিবে, অতিক্রম করিবে) তদা (তখন) শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ (শ্রোতব্য ও শ্রুত বিষয়ের) নির্বেদং (বৈরাগ্য) গন্তাসি (প্রাপ্ত হইবে)।

যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ গহনকানন অতিক্রম করিবে, তখন তুমি শ্রুত ও শ্রোতব্য বিষয়ে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে। ৫২

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩

মোহকলিলম্—মোহাত্মকমবিবেকরূপং কালুষ্যম্, যেন বিষয়ং প্রত্যন্তঃকরণং প্রবর্ত্ততে (শাঙ্কর-ভাষ্য)। দেহাভিমানলক্ষণং মোহময়ং গহনং দুর্গং (শ্রীধর); মোহ = অজ্ঞানতা, অবিবেক, যাহাতে অসত্যে সত্যবোধ, অনিত্যে নিত্যবোধ, দেহে আত্মবোধ ইত্যাদি বুদ্ধি-বিপর্য্যয় জন্মে। **শ্রুত ও শ্রোতব্য** বিষয়ে—স্বর্গাদি ফললাভের কথায়, যাহা পূর্বে শুনিয়াছ এবং পরেও শুনিবে।

কিন্তু স্বর্গলাভ, রাজ্যভোগাদি যে পুণ্যকর্মের ফল, তাহা সর্বশাস্ত্রেই শুনি, ঐ সকল বিষয়ে আকাঙ্ক্ষাও স্বাভাবিক, সুতরাং ফলতৃষ্ণা বর্জন করা অসম্ভবই বোধ হয়।

সর্বশাস্ত্রের কথা যে বলিতেছ, ঐ সকল অধ্যাত্মশাস্ত্র নয়, মোক্ষ-প্রতিপাদক নয়, উহাতে আত্মানাত্মবিবেক জন্মে না, উহাতে 'আমি' 'আমার' ভাব বৃদ্ধি করে, বিষয়-বাসনা বৃদ্ধি করে। এই 'আমি' 'আমার' ভাবই, এই বিষয়-বাসনাই মোহ। যখন তোমার বুদ্ধি এই স্তরের মোহ অতিক্রম করিবে, তখন স্বর্গফলাদির বিষয় যাহা শুনিয়াছ বা শুনিবে, সে সকলই তোমার নিকট তুচ্ছ বোধ হইবে, কাম্যকর্ম বিষয়ে বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে। তখন তোমার সুখদুঃখে পাপপুণ্যাদিতে সমত্ব-বোধ জন্মিবে। ৫২

৫৩। যদা (যখন) শ্রুতিবিপ্রতিপন্না (নানা ফলশ্রুতিদ্বারা বিক্ষিপ্ত) তে বুদ্ধিঃ (তোমার বুদ্ধি) সমাধৌ (সমাধিতে) নিশ্চলা (নিশ্চল হইয়া) অচলা স্থাস্যতি (স্থির হইয়া থাকিবে), তদা (তখন) যোগম্ অবাপ্স্যসি (যোগ প্রাপ্ত হইবে)।

লৌকিক ও বৈদিক নানাবিধ ফলকথা শ্রবণে বিক্ষিপ্ত তোমার বুদ্ধি যখন সমাধিতে নিশ্চল হইয়া থাকিবে তখন তুমি (সাম্যবুদ্ধিরূপ) যোগ প্রাপ্ত হইবে। ৫৩

নিশ্চলা, অচলা—এই দুইটি শব্দের অর্থে পার্থক্য এই—'নিশ্চলা বিষয়ান্তরৈরনাকৃষ্টা, অতএব অচলা অভ্যাসপাটবেন তত্রৈব স্থিরা'—শ্রীধরস্বামী। অর্থাৎ যখন বুদ্ধি নানা বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া নানা দিকে ধাবিত না হইয়া (নিশ্চলা), পুনঃ পুনঃ অভ্যাসহেতু ধ্যেয় বস্তুতে স্থির (অচলা) হইয়া থাকিবে।

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না—শ্রুতিদ্বারা বিপ্রতিপন্ন। 'শ্রুতি' শব্দের দুই অর্থ—(১) বেদ, (২) শ্রবণ। 'বিপ্রতিপন্না' অর্থ বিক্ষিপ্তা। 'শ্রুতি' শব্দে বেদ

অর্জুন উবাচ

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥ ৫৪

গ্রহণ করিলে অর্থ এইরূপ—বেদে কাম্যকর্ম ও স্বর্গফলাদির যে সকল কথা আছে তাহাদ্বারা বিক্ষিপ্ত (৪২-৪৪ শ্লোকে এই কথাই বলা হইয়াছে)। কিন্তু প্রাচীন টীকাকারগণ প্রায় সকলেই শ্রুতি অর্থ 'শ্রবণ' ধরিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—'নানাবিধ ফল শ্রবণে বিক্ষিপ্ত।' তবে শ্রীধরস্বামী কথাটা অধিকতর স্পষ্টীকৃত করিয়াছেন। যথা—'নানা লৌকিক-বৈদিকার্থশ্রবণৈঃ'। আমরা তদনুরূপই অনুবাদ করিয়াছি।

সমাধৌ—'সমাধীয়তে চিত্তমস্মিন্ ইতি সমাধিরাত্মা তস্মিন্'—শাঙ্কর-ভাষ্য। যাহাতে চিত্ত সমাহিত হয় তাহা সমাধি—তাহা কি?—আত্মা (শঙ্কর), পরমাত্মা (মধুসূদন), পরমেশ্বর (শ্রীধর), অর্থাৎ যাহা ধ্যেয় বস্তু তাহাই সমাধি, তাহাতে যখন বুদ্ধি নিশ্চল হইবে, তখন যোগ প্রাপ্ত হইবে, এই অর্থ। কিন্তু যে অবস্থায় ধ্যেয় বস্তুতে বুদ্ধি অচলা হইয়া থাকে, সাধারণতঃ সেই অবস্থাকেই 'সমাধি' বলে। এই প্রচলিত অর্থই গ্রহণ করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ, যে অবস্থায় বুদ্ধি কামনা-কলুষ-নির্মুক্ত হইয়া আত্মনিষ্ঠ হয় এবং তজ্জনিত নির্মল আত্মপ্রসাদ লাভ করে, তাহাই গীতোক্ত সমাধির অবস্থা (২।৬৫)। যিনি এই অবস্থা লাভ করেন তাহাকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলে (পরের শ্লোক)।

৫৪। অর্জুনঃ উবাচ, হে কেশব, সমাধিস্থস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য (সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের) কা ভাষা (কি লক্ষণ)? স্থিতধীঃ (স্থিতপ্রজ্ঞ) কিং প্রভাষেত (কিরূপ কথা বলেন)? কিং আসীত (কিরূপে অবস্থান করেন)? কিং ব্রজেত (কিরূপে বিচরণ করেন)?

স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বর্ণনা—ইন্দ্রিয়-সংযম ও কামনাত্যাগই শ্রেষ্ঠ সাধন ৫৪-৭০

অর্জুন কহিলেন—হে কেশব, যিনি সমাধিস্থ হইয়া স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়াছেন তাঁহার লক্ষণ কি? স্থিতধী ব্যক্তি কিরূপ কথা বলেন? কিরূপে অবস্থান করেন? কিরূপে চলেন? ৫৪

ভাষা—লক্ষণ; ভাষ্যতেঽনয়েতি ভাষা, লক্ষণমিতি যাবৎ—শ্রীধরস্বামী।

শ্রীভগবান্ উবাচ

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬

শ্রীভগবান পূর্বে অর্জুনকে বলিয়াছেন যে, কর্মফল সম্বন্ধে নানারূপ মনোমোহকর কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তাঁহার বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি সমাহিত না হইলে অর্থাৎ পরমেশ্বরে স্থির না হইলে তিনি যোগ প্রাপ্ত হইবেন না। যাঁহার বুদ্ধি এইরূপ স্থির হয় তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বা স্থিতধী বলে। এই কথা শুনিয়া অর্জুন স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি তাহা বিস্তারিত জানিতে চাহিতেছেন (অপিচ, ১৪।২১-২৫ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

৫৫। শ্রীভগবান্ উবাচ—হে পার্থ, আত্মনি এব (আপনাতেই) আত্মনা (আপনি) তুষ্টঃ (তুষ্ট হইয়া) [যোগী] যদা (যখন) মনোগতান্ (মনোগত) সর্বান্ কামান্ (সকল কামনা) প্রজহাতি (পরিত্যাগ করেন) তদা (তখন) (তিনি) স্থিতপ্রজ্ঞঃ উচ্যতে (স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া উক্ত হন)।

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে পার্থ, যখন কেহ সমস্ত মনোগত কামনা বর্জন করিয়া আপনাতেই আপনি তুষ্ট থাকেন, তখন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া কথিত হন। ৫৫

"আপনাতেই আপনি তুষ্ট"—পরমানন্দস্বরূপ আত্মাতেই স্বয়ং পরিতুষ্ট। ঈদৃশ ব্যক্তিই 'আত্মারাম' বলিয়া কথিত হন।

স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ—এই শ্লোকে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বলা হইতেছে। পরবর্তী শ্লোকসমূহে এই কথারই সম্প্রসারণ। যিনি সর্ববিধ কামনা বর্জন করিয়াছেন, সুতরাং বাসনা-জনিত চিত্তবিক্ষেপ বিদূরিত হওয়াতে যিনি বিশুদ্ধ আত্মানন্দ উপভোগ করিতেছেন, তিনিই আত্মারাম।

৫৬। দুঃখেষু (দুঃখসমূহে) অনুদ্বিগ্নমনাঃ (উদ্বেগ-শূন্য চিত্ত), সুখেষু (সুখসমূহে) বিগতস্পৃহঃ (স্পৃহাশূন্য), বীতরাগ-ভয়ক্রোধঃ (অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধশূন্য) [পুরুষ] স্থিতধীঃ মুনিঃ উচ্যতে (স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি বলিয়া উক্ত হন)।

যিনি দুঃখে উদ্বেগশূন্য, সুখে স্পৃহাশূন্য, যাঁহার অনুরাগ, ভয় এবং ক্রোধ নিবৃত্ত হইয়াছে, তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি বলা যায়। ৫৬

যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭
যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮

রাগ—বিষয়ানুরাগ ; **ভয়**—বিষয়-বিনাশের আশঙ্কা ; **ক্রোধ**—বিষয়-বাসনা প্রতিহত হইলে প্রতিকারোন্মুখ জ্বলনাত্মক চিত্ত-বিকার ; বিষয়-ব্যসনার পূরণে সুখ, অপূরণে দুঃখ। সুতরাং সুখ, দুঃখ, রাগ, ভয়, ক্রোধ—সকলেরই মূল কামনা ; কামনাত্যাগী স্থিতধী।

প্রঃ। কামনা পূরণে অর্থাৎ ভোগেই সুখ। কামনা বর্জন করিয়া ভোগ-সুখ ত্যাগ করিয়া কি তবে জড়পিণ্ডবৎ হইতে হইবে? এ কি অস্বাভাবিক ধর্ম নয়? পাশ্চাত্ত্যেরা যাহাকে Asceticism বলে, এ কি তাই নয়?

উঃ। না, তা নয়। "ভোগ—দ্বিবিধ, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ। শুদ্ধ ভোগে সুখদুঃখ নাই, পুরুষের চিরন্তন স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম আনন্দই আছে। অশুদ্ধ ভোগে সুখ ও দুঃখ আছে ; হর্ষশোকাদি দ্বন্দ্ব অশুদ্ধ ভোগীকে বিচলিত ও বিক্ষুব্ধ করে। কামনা অশুদ্ধতার কারণ। কামীমাত্রেই অশুদ্ধ, যে নিষ্কাম সে শুদ্ধ।" —শ্রীঅরবিন্দ

গীতায় এই শুদ্ধ ভোগই বিহিত, অশুদ্ধ ভোগ নিষিদ্ধ। ইন্দ্রিয়-সংযমই বিহিত, ইন্দ্রিয়ের ধ্বংস বিহিত নয়, বরং নিষিদ্ধ (২।১৫, ২।৬৪, ৩।৭, ৩।৩৩, ৩।৩৪, ১৭।৬ ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

৫৭। যঃ (যিনি) সর্বত্র (সকল বিষয়ে) অনভিস্নেহঃ (স্নেহশূন্য, মমতাশূন্য), তত্তৎ (সেই সেই) শুভ-অশুভম্ (প্রিয় বা অপ্রিয় বিষয়) প্রাপ্য (পাইয়া) ন অভিনন্দতি (আনন্দিত হন না), ন দ্বেষ্টি (অসন্তোষও প্রকাশ করেন না), তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা (তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে)।

যিনি দেহ-জীবনাদি সকল বিষয়েই মমতাশূন্য, তত্তৎ বিষয়ে শুভ-প্রাপ্তিতে সন্তোষ বা অশুভ-প্রাপ্তিতে অসন্তোষ প্রকাশ করেন না, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। ৫৭

যিনি সসম্মান পান-ভোজনাদি প্রাপ্ত হইলেও হৃষ্ট হইয়া আশীর্বাদ করেন না, অথবা তর্জন-মুষ্টিপ্রহারাদি পাইলেও নিন্দা-অভিশাপাদি করেন না, তিনি সম্পূর্ণ উদাসীনভাবে কথা বলেন। এই শ্লোকে 'কিং প্রভাষেত—কিরূপ কথা বলেন' এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল। ৫৭

৫৮। কূর্মঃ অঙ্গানি ইব (কচ্ছপ যেমন অঙ্গসকল সংহরণ করে সেইরূপ)

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে ॥ ৫৯

যদা চ অয়ং (যখন ইনি, যোগিপুরুষ) ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে), ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহ) সর্বশঃ সংহরতে (সর্বপ্রকারে সংহরণ করেন), (তখন) তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা (তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়)।

কচ্ছপ যেমন কর-চরণাদি অঙ্গসকল সঙ্কুচিত করিয়া রাখে, তেমনি যিনি রূপরসাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সকল সংহরণ করিয়া লন, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। ৫৮

কিম্ আসীত—"কিরূপে অবস্থান করেন" এই প্রশ্নের উত্তরে এই কয়েকটি শ্লোকে ইন্দ্রিয়-সংযমের কথা বলা হইতেছে। তিনি কূর্মের ন্যায়, বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সকল সংহৃত করিয়া অবস্থান করেন। এই উপমাতে একটি বিষয় দ্রষ্টব্য এই যে, কূর্ম কর-চরণাদি সঙ্কুচিত করিয়া রাখে, ধ্বংস করে না, প্রয়োজনমত ব্যবহারও করে। ইন্দ্রিয়-সংযমই কর্তব্য, ধ্বংস বিধেয় নহে, ইহাই গীতার উপদেশ। (২।৬৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য)

৫৯। নিরাহারস্য (ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় উপভোগে অপ্রবৃত্ত) দেহিনঃ (ব্যক্তির) বিষয়াঃ বিনিবর্তন্তে (বিষয় উপভোগে নিবৃত্ত) [কিন্তু) রসবর্জম্ (অভিলাষ ব্যতীত, অর্থাৎ বিষয়-তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় না); পরম্ (পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে) দৃষ্ট্বা (সাক্ষাৎ করিয়া) অস্য (ইহার, স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির) রসঃ অপি (অভিলাষও) নিবর্ততে (নিবৃত্তি পায়)।

নিরাহারস্য—"ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়াণামাহরণং গ্রহণমাহারঃ। নিরাহারস্য ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়গ্রহণমকুর্বতঃ"—**শ্রীধরস্বামী**। আহার—ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়গ্রহণ, সুতরাং নিরাহার—ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়গ্রহণে অপ্রবৃত্ত। **রসবর্জম্**—'রসো রাগোঽভিলাষঃ তদ্‌বর্জম্।' রস = বিষয়ানুরাগ, বিষয়তৃষ্ণা, তদ্‌বর্জম্—তাহা ব্যতীত। সুতরাং রসবর্জম্ = বিষয়-তৃষ্ণা ব্যতীত।

'নিরাহার' শব্দের সাধারণ অর্থ আহার গ্রহণে অপ্রবৃত্ত, উপবাসী। এ অর্থও গ্রহণ করা যায়। তাহাতে এই বুঝায় যে, আহার গ্রহণে বিরত হইলে ইন্দ্রিয়গণ দুর্বল হইয়া বিষয়োপভোগে অশক্ত হয় বটে, কিন্তু তাহাতে বিষয়-তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় না। গীতা অত্যধিক উপবাসাদি কৃচ্ছ্র সাধন অনুমোদন করেন না

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০
তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১

(৬।১৭, ১৭।৬ দ্রঃ)। সুতরাং এ অর্থও সঙ্গতই হয়। লোকমান্য তিলক এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন।

ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়গ্রহণে অপ্রবৃত্ত ব্যক্তির বিষয়োপভোগ নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু বিষয়-তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় না। কিন্তু সেই পরম পুরুষকে দেখিয়া স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির বিষয়-বাসনা নিবৃত্ত হয়। ৫৯

ইন্দ্রিয়-সংযম কাহাকে বলে—ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় উপভোগ না করিলেই জিতেন্দ্রিয় হয় না, স্থিতপ্রজ্ঞ হয় না। জরাগ্রস্ত, রুগ্ন, বিকলেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ উপভোগে অসমর্থ, লোকনিন্দা ভয়ে অনেকেই ইন্দ্রিয় ভোগে বিরত, স্বর্গাদি ফলকামনায় অনেকে কৃচ্ছ্রসাধন তপস্যাদিতে নিযুক্ত,—ইহারা কি স্থিতপ্রজ্ঞ? তা নয়। ইহাদের উপভোগ নাই, কিন্তু বাসনার অভাব নাই। বাসনার নিবৃত্তি না হইলে প্রজ্ঞা স্থির হয় না। বাসনার নিবৃত্তি হয় কিসে? একমাত্র পরমেশ্বরে চিত্ত সমাহিত হইলেই বিষয়-বাসনা বিনষ্ট হয়। ('পরং দৃষ্ট্বা—পরমপুরুষকে দেখিয়া), ইহার এমন অর্থ নয় যে, স্বচক্ষে দেখিতে হইবে (৬১ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

৬০। হে কৌন্তেয়, প্রমাথীনি (প্রমাথী, চিত্ত-বিক্ষেপকারী, বলবান্) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণ) যততঃ (যত্নশীল) বিপশ্চিতঃ (বিবেকী) পুরুষস্য অপি (পুরুষেরও) মনঃ প্রসভং হরন্তি হি (মনকে বলপূর্বক হরণ করে)।

হে কৌন্তেয়, প্রমাথী ইন্দ্রিয়গণ সংযমে যত্নশীল, বিবেকী পুরুষেরও চিত্তকে বলপূর্বক হরণ করে (বিষয়াসক্ত করে)। ৬০

তবে উপায় কি?—পরের শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৬১। মৎপরঃ (আমার একান্ত ভক্ত, আত্মপরায়ণ পুরুষ) তানি সর্বাণি (সেই সকল ইন্দ্রিয়গণকে) সংযম্য (সংযত করিয়া) যুক্তঃ [সন্] (সমাহিত হইয়া) আসীত (অবস্থান করেন)। হি (ফলতঃ) যস্য ইন্দ্রিয়াণি বশে (যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত) তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা (তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে)।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥ ৬২
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩

যিনি আমার অনন্যভক্ত তিনি সেই সকল ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া আমাতে চিত্ত সমাহিত করিয়া অবস্থান করেন। তাদৃশ সমাহিতচিত্ত ব্যক্তিরই ইন্দ্রিয়সকল বশীভূত হয়, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। ৬১

ইন্দ্রিয়-সংযমের উপায়। বিবেক-বিচার দ্বারা ইন্দ্রিয়-জয় হয় না, দুর্জয় ইন্দ্রিয়গণ বিবেকীরও চিত্ত হরণ করিয়া থাকে। তবে উপায় কি? তাই শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—যে 'মৎপর', আমার অনন্যভক্ত, আমার শরণাগত, তাহারই চিত্ত সমাহিত হয়। ঈশ্বরানুরাগ জন্মিলে বিষয়ানুরাগ দূরীভূত হয়, চিত্ত নির্মল হয়, ইন্দ্রিয়গণ সংযত হইয়া আসে। ভগবচ্চিন্তাই ইন্দ্রিয়-সংযমের মহৌষধ।

ইন্দ্রিয়-জয় সহজ কথা নহে। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রোপদেশ, বিধিনিষেধ রাশীকৃত রহিয়াছে; কেননা সকল ধর্মপথেরই মূলকথা চিত্তসংযম। ঐ সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ তিনটি শব্দেই সমগ্র উপদেশের সার কথাটি বলিয়া দিলেন—**'যুক্ত আসীত মৎপরঃ।'** এই কথাটি শেষ অধ্যায়ে 'মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ' 'মামেকং শরণং ব্রজ' ইত্যাদি কথায় বিশেষভাবে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে (১৮।৬৫-৬৭)। চিত্তসংযমের উপায় সম্বন্ধে শ্রীভাগবতও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন—

বিদ্যাতপঃ-প্রাণনিরোধমৈত্রীতীর্থাভিষেকব্রতদানজপ্যৈঃ।
নাত্যন্তশুদ্ধিং লভতেঽন্তরাত্মা যথা হৃদিস্থে ভগবত্যনন্তে। ভা ১২।৩।৪৮

—ভগবান্‌কে হৃদয়ে ধারণ করিলে যেরূপ আত্যন্তিক চিত্তশুদ্ধি হয়, দেবতা-উপাসনা, তপ, বায়ুনিরোধযোগ, মৈত্রী, তীর্থস্থান, ব্রত, দান, বিদ্যা ও জপের দ্বারা তাহা হয় না।

এক্ষণে বাসনা কিরূপে উৎপন্ন হয় এবং যে ভগবচ্চিন্তা করে না, কেবল বিষয়-চিন্তা করে, তাহার ক্রমে কিরূপে অধোগতি হয়, পরবর্তী দুই শ্লোকে তাহাই বলা হইতেছে।

৬২-৬৩। বিষয়ান্ (বিষয়সকল) ধ্যায়তঃ (চিন্তা করিতে করিতে) পুংসঃ (মনুষ্যের) তেষু (তাহাতে) সঙ্গঃ (আসক্তি) উপজায়তে (জন্মে); সঙ্গাৎ (আসক্তি হইতে) কামঃ (কামনা) সংজায়তে (জন্মে); কামাৎ ক্রোধঃ অভিজায়তে (জন্মে); ক্রোধাৎ সম্মোহঃ (অবিবেক) ভবতি (হয়);

সম্মোহাৎ (মোহ হইতে) স্মৃতিবিভ্রমঃ (স্মৃতিশক্তির ব্যতিক্রম); স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ, বুদ্ধিনাশাৎ (বুদ্ধিনাশ হইতে) (মনুষ্যঃ) প্রণশ্যতি (বিনষ্ট হয়)

বিষয়-চিন্তা করিতে করিতে মনুষ্যের তাহাতে **আসক্তি** জন্মে, আসক্তি হইতে **কামনা** অর্থাৎ সেই বিষয় লাভের অভিলাষ জন্মে, সেই কামনা কোন কারণে প্রতিহত বা বাধাপ্রাপ্ত হইলে প্রতিরোধকের প্রতি **ক্রোধ** জন্মে, ক্রোধ হইতে **মোহ**, মোহ হইতে **স্মৃতিভ্রংশ**, স্মৃতিভ্রংশ হইতে **বুদ্ধিনাশ**, বুদ্ধিনাশ হইতে **বিনাশ**, ঘটে। ৬২-৬৩

মোহ—বিপর্যয়বুদ্ধি ; চিত্তের যে অবস্থায় সকল বস্তুই অযথাবৎ প্রতীয়মান হয়, যাহা যা নয়, তাহা তাই বলিয়া জ্ঞান হয়। **স্মৃতিভ্রংশ**—শাস্ত্রাচার্যোপদেশ বা কার্যকারণ সম্বন্ধাদির বিস্মৃতি বা অন্তর পুরুষের স্মৃতি।

বিষয়-চিন্তার বিষময় ফল—বিষয়চিন্তাই সর্ব অনর্থের মূল। যাহা অবিরত চিন্তা করা হয়, তাহাতেই আসক্তি হয়। আসক্তি হইতে তাহা প্রাপ্তির কামনা জন্মে। কামনা প্রতিহত হইলে ক্রোধ জন্মে। ক্রোধ হইতে মোহ বা বুদ্ধি-বিপর্যয় ঘটে, তদ্দরুণ শাস্ত্রাচার্য-মিত্রাদির উপদেশ বা কার্যকারণ সম্বন্ধবিষয়ে সম্পূর্ণ বিস্মৃতি উপস্থিত হয় ; সুতরাং কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয়ের ক্ষমতা থাকে না। যে কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয়ে অক্ষম, তাহার মনুষ্যত্ব লোপ পায়, সে পশুত্ব প্রাপ্ত হয়, ইহাই বিনাশ।

বঙ্কিমচন্দ্র সীতারাম-চরিত্রে এই কথাগুলি উদাহরণ দ্বারা পরিস্ফুট করিয়াছেন। নিম্নে দৃষ্টান্তস্বরূপ সাংসারিক জীবনের একটি ঘটনা সংক্ষেপে বিবৃত হইল—

নলিনীবাবু বিদেশে চাকুরি করিতেন, বিদেশেই থাকিতেন ; সচ্চিন্তা, সদালাপ, সৎগ্রন্থাদিপাঠ এই সব ভালবাসিতেন। বিষয়ী হইলেও একেবারে বিষয়-কীট ছিলেন না। দেশে একটু তালুক ছিল, তাহা অপরেই ভোগ করিত, সে দিকে বড় লক্ষ ছিল না। কেহ সে কথা উল্লেখ করিলে বলিতেন—"কার তালুক কে খায়? সকলকেই তিনি (ঈশ্বর) খাওয়াইতেছেন।" কালক্রমে তিনি পেন্সন লইয়া বাড়ি আসিয়া বসিলেন। আয় কমিয়া গেল, তখন তাঁহার ভাবনা হইল, দেশের সম্পত্তিদ্বারা কিছু আয় বৃদ্ধি করা যায় কিনা (**বিষয়চিন্তা**)। মনে করিলেন, কিছু খামারজমি করিতে পারিলে বেশ সুবিধা হয় (**আসক্তি**)। নিজেরই অনেক জমি ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর, ভোগোত্তর আদি রূপে ন্যায়তঃ অন্যায়তঃ অনেকে ভোগ করিতেছিল, তাহার

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪

কতক দখল করিতে ইচ্ছা করিলেন (**কামনা**)। কিন্তু যাহারা একবার গ্রাস করিয়াছে, তাহারা ছাড়িবে কেন? বাধা দিল। তাহাতে তাঁহার বিদ্বেষ ও আক্রোশ আরও বাড়িয়া গেল (**ক্রোধ**)। তিনি বলিতে লাগিলেন,—'আমার জমি পরে খাবে, আর আমি উপবাসী থাকব? দুষ্ট রাহু চন্দ্র, গিলে, চকোর উপবাসী? তা হবে না' (**মোহ**)। পূর্বে কিন্তু বলিতেন, 'কার তালুক কে খায়?' দেবোত্তরসম্পত্তি বে-দখল করা অধর্ম, পূর্বে অন্যায়তঃ অধিকৃত হইয়া থাকিলেও দীর্ঘকালের দখলীস্বত্ব নষ্ট হয় না, এ সব কথা তিনি না জানিতেন তা নয়, অনেকে এইরূপ হিতোপদেশও দিলেন, কিন্তু তিনি তাহা শুনিলেন না (**স্মৃতিভ্রংশ**)। তখন তাঁহার বিবেক-বুদ্ধি অন্তর্হিত হইল; কৃত্রিমদলিলের সাহায্যে তিনি মোকদ্দমা আরম্ভ করিলেন (**বুদ্ধিনাশ**)। দলিলাদির কৃত্রিমতা প্রকাশ পাইল। তিনি আদালতে শাস্তিপ্রাপ্ত, সমাজে লজ্জিত, ব্যয়ভারে ঋণগ্রস্ত হইয়া বিনষ্ট হইলেন (ব্যবহারিকজগতে বিনাশ); তাঁহার বিষয়ের প্রতি যে নিস্পৃহভাবটুকু ছিল তাহা উড়িয়া গেল, স্মৃতিভ্রংশহেতু উপদেশাদি কার্যকরী হইল না, সংযমবুদ্ধি লোপ পাইল—তিনি পুনরায় ঘোর সংসার-কূপে পতিত হইলেন (আধ্যাত্মিক জগতে **বিনাশ** বা মৃত্যু)। ৬২-৬৩

সংসারে থাকিলেই বিষয়-চিন্তা অনিবার্য। বিষয়-চিন্তায় আধ্যাত্মিক জীবনের বিনাশ। তবে কি সন্ন্যাসই শ্রেয়োমার্গ?—না (পরের শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

৬৪। রাগদ্বেষবিমুক্তৈঃ তু (কিন্তু অনুরাগ ও বিদ্বেষ হইতে বিমুক্ত) আত্মবশ্যৈঃ (আত্মবশীভূত) ইন্দ্রিয়ৈঃ (ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা) বিষয়ান্ চরন্ (বিষয়সমূহ উপভোগ করিয়া) বিধেয়াত্মা (সংযতমনা পুরুষ) প্রসাদম্ অধিগচ্ছতি (আত্মপ্রসাদ লাভ করেন)।

কিন্তু যিনি বিধেয়াত্মা অর্থাৎ যাহার মন নিজের বশবর্তী, তিনি অনুরাগ ও বিদ্বেষ হইতে বিমুক্ত, আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়গণদ্বারা বিষয় উপভোগ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। ৬৪

বিধেয়াত্মা—'বিধেয়ো বশবর্তী আত্মা মনঃ যস্য সঃ'—শ্রীধরস্বামী। '**কিঙ্করীকৃতমনাঃ**'—নীলকণ্ঠ।

রাগদ্বেষবিমুক্ত—ইন্দ্রিয়ের অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে বিদ্বেষ অবশ্যম্ভাবী (৩।৩৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য), এই উভয় হইতে মুক্ত।

কিরূপে বিষয় ভোগ করিতে হয়—নির্লিপ্ত সংসারী

প্রশ্ন। পূর্বে বলা হইল, ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিবে, বিষয়-চিন্তাও মনে স্থান দিবে না—তবে কি সকলকেই সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে হইবে ? বিষয়-ভোগ একেবারে নিষিদ্ধ ?

উত্তর। এইরূপ সংশয় নিরসনার্থই এই শ্লোকে স্পষ্ট বলা হইতেছে যে, বিষয়-ভোগ নিষিদ্ধ নহে, বিষয়ের উপভোগ করিয়াও চিত্তপ্রসাদ লাভ করা যায়, তাহার উপায় আছে। সে কিরূপে ? প্রথমতঃ মনকে বশীভূত করিতে হইবে, অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ বা প্রতিকূল বিষয়ে বিদ্বেষ উভয়ই ত্যাগ করিতে হইবে। মন বশীভূত হইলে ইন্দ্রিয়গণও আজ্ঞাধীন হইবে, বলপূর্বক চিত্তহরণ করিতে পারিবে না। ইন্দ্রিয়গণ যাহার বশীভূত সেই স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তি আত্মবশ্য ইন্দ্রিয়গণদ্বারা বিষয়-ভোগ করিলেও তাঁহার চিত্ত বিষয়ে আকৃষ্ট হয় না, রাগদ্বেষজনিত চিত্তবিক্ষেপ তাঁহার জন্মে না, সুতরাং তিনি নির্মল চিত্তপ্রসাদ লাভ করেন। পূর্ব শ্লোকের ব্যাখ্যায় উল্লিখিত নলিনীবাবু যদি বে-দখলী জমির প্রতি অনুরাগ ও বে-দখলকারদিগের প্রতি বিদ্বেষ, এই উভয় ত্যাগ করিয়া, তাঁহার যেটুকু ছিল তাহাই অনাসক্তচিত্তে ভোগ করিতে থাকিতেন, তবে তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতির বিঘ্ন হইত না। কিন্তু ভগবানে সম্পূর্ণ আসক্তি না জন্মিলে, অনাসক্তভাবে বিষয় ভোগ করা যায় না। তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে না পারিলে—পরমহংসদেবের অমৃতোপম কথায় 'তাঁহাকে বকল্‌মা দিতে না পারিলে',—বিষয়-ভাবনা দূর হয় না, আসক্তিও একেবারে লোপ পায় না। আমরা অনেক সময় মনে করি, অনাসক্তচিত্তে বাধ্য হইয়াই বিষয়ের মধ্যে আছি, 'অনিচ্ছায় ইচ্ছা হইতেছে'—কিন্তু ইহা আত্ম-প্রতারণামাত্র।

যাঁহার মন ঈশ্বরে লিপ্ত, ইন্দ্রিয়-বিষয়ে লিপ্ত হইলেও তাঁহার দোষ হয় না, এইরূপ ব্যক্তিকেই নির্লিপ্ত সংসারী বলে।

'তুমি সংসারে থাক তাহাতে দোষ নাই, সংসার তোমাতে না থাকিলেই হয়। জলের উপর নৌকা থাকিতে পারে, কিন্তু নৌকায় জল উঠিলেই ডুবে যায়।' —ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ।

প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫

বিষয়ে থাকিয়া ঈশ্বর-চিন্তা কিরূপ ?

প্রশ্ন। কিন্তু যাহার মধ্যে সংসার নাই, যে বিষয়ে বিরক্ত, মমত্ববর্জিত, সে সংসারে থাকিয়া স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, সমাজ, স্বদেশ প্রভৃতির প্রতি স্বীয় কর্তব্য কিরূপে প্রতিপালন করিতে পারে ?

উঃ। 'যেমন গৃহস্থের বাটীর দাসীরা সংসারের যাবতীয় কার্য করিয়া থাকে, সন্তানদিগকে লালন-পালন করে, উহারা মরিয়া গেলে রোদনও করে, কিন্তু মনে জানে যে, ইহারা তাহাদের কেহই নহে।'—শ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ (তত্ত্ব-প্রকাশিকা)।

প্রঃ। কিন্তু একটা মন ঈশ্বরে ও বিষয়ে উভয়ত্রই কিরূপে থাকিবে? আর মন যখন ঈশ্বরেই রাখিতে হইবে, তখন কেবল ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় ভোগই বা কিরূপে সম্ভবপর ?

উঃ। ইহাতে আশ্চর্য কিছুই নাই। অভ্যাস করিলে সকলই সম্ভব। 'যেমন ছুতারদের স্ত্রীলোকেরা চিড়া কুটিবার সময় ডান হাত দিয়া চিড়া উল্টাইয়া দেয়, বাম হাত দিয়া ভাজনাখোলার চাউলগুলি উল্টাইয়া দেয়, উনুন নিবিয়া যাইতে দেখিলে তুষগুলি উনুনের মধ্যে ঠেলিয়া দেয়, আবার ছেলে কাঁদিলে তাহাকেও স্তনার্পণ করে। মনটির প্রায় বার আনাই কিন্তু ডান হাতেই থাকে।'
—শ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ

এ সম্বন্ধে আর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে—"মৌলিস্থ-কুম্ভপরিরক্ষণধীর্নটীব" —নর্তকী যেমন মস্তকে কুম্ভ রাখিয়া নৃত্য করে। তাহার হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়গণ কর্ম করে, কিন্তু মন থাকে মস্তকস্থিত কুম্ভে।

'বিষয়াসক্ত জীব মুখে নাম জপ করে, কিন্তু মনে বিষয় চিন্তা করে। উহা উল্টাইয়া লও।'—৺রামদয়াল মজুমদার

২।৫৪ শ্লোকোক্ত 'ব্রজেত কিম্'—'কিরূপে বিচরণ করেন' এই প্রশ্নের উত্তর ২।৬৪ ও ২।৭১ শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে।

৬৫। **প্রসাদে [সতি]** (এইরূপে চিত্তপ্রসাদ জন্মিলে) **অস্য** (ইহার) **সর্বদুঃখানাং** (সমস্ত দুঃখের) **হানিঃ** (নিবৃত্তি, নাশ) **উপজায়তে** (হয়), **হি** (যেহেতু) **প্রসন্নচেতসঃ** (প্রসন্নচেতার) **বুদ্ধিঃ** (প্রজ্ঞা) **আশু** (শীঘ্র) **পর্যবতিষ্ঠতে** (প্রতিষ্ঠিত হয়, উপাস্যে স্থিতিলাভ করে)।

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥ ৬৬
ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৬৭

চিত্তপ্রসাদ জন্মিলে এই পুরুষের সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তি হয় ; যেহেতু প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি শীঘ্র উপাস্যে (ঈশ্বরে) স্থিতি লাভ করে। ৬৫

পূর্বে বলা হইয়াছে, বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও যিনি অনাসক্ত, সংযতচিত্ত, রাগদ্বেষ-বর্জিত, তিনি চিত্তপ্রসাদ লাভ করেন। এই চিত্তপ্রসাদ জন্মিলে কোন প্রকার দুঃখই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না, তাঁহার বুদ্ধি একমাত্র ঈশ্বরে সমাহিত থাকে। নির্মল প্রসন্ন চিত্তই ভগবানের প্রিয় অধিষ্ঠানভূমি। ৬৫

৬৬। অযুক্তস্য (অসমাহিতান্তঃকরণ, অজিতেন্দ্রিয়ব্যক্তির) বুদ্ধিঃ (প্রজ্ঞা) নাস্তি (নাই), অযুক্তস্য ভাবনা চ (আত্মচিন্তা, ঈশ্বরচিন্তাও) ন (নাই), অভাবয়তঃ চ (ঈশ্বর-চিন্তা-পরাঙ্মুখ ব্যক্তির) শান্তিঃ ন (নাই), অশান্তস্য (অশান্তচিত্তব্যক্তির) সুখং কুতঃ (সুখ কোথায়)?

যিনি অযুক্ত অর্থাৎ যাঁহার চিত্ত অসমাহিত ও ইন্দ্রিয় অবশীভূত, তাঁহার আত্ম-বিষয়া বুদ্ধিও হয় না, চিন্তাও হয় না। যাঁহার (আত্ম-বিষয়া) চিন্তা নাই, তাঁহার শান্তি নাই, যাঁহার শান্তি নাই, তাঁহার সুখ কোথায়। ৬৬

বুদ্ধি—আত্মবোধিনী প্রজ্ঞা, ঈশ্বর-মুখী বুদ্ধি। **ভাবনা**—আত্মচিন্তা, ঈশ্বর-চিন্তা, ধ্যান, নিদিধ্যাসন। **শান্তি**—বিষয়তৃষ্ণা-ক্ষয়জনিত চিত্ত-প্রসন্নতা। **সুখ**—পরমানন্দ, আত্মানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, প্রেমানন্দ।

লোকে বিশুদ্ধ সুখ বা পরমানন্দ ভোগ করিতে পারে না কেন? অশান্ত বলিয়া। অশান্ত কেন?—বিষয়-তৃষ্ণায় বহির্মুখ বলিয়া, আত্মচিন্তায় অন্তর্মুখ হয় না বলিয়া। আত্মচিন্তায় অন্তর্মুখ হয় না কেন?—আত্মবিষয়া প্রজ্ঞা জন্মে না বলিয়া। আত্মবিষয়া প্রজ্ঞা হয় না কেন?—ইন্দ্রিয়গণ অবশীভূত বলিয়া। অবশীভূত ইন্দ্রিয়গণ চিত্তবিক্ষেপ জন্মাইয়া প্রজ্ঞা হরণ করে। (পরের শ্লোক দ্রষ্টব্য)

৬৭। হি (যেহেতু) চরতাম্ (বিষয়ে প্রবর্তমান) ইন্দ্রিয়াণাম্ (ইন্দ্রিয়গণের) যৎ (যেটিকে) মনঃ অনুবিধীয়তে (মন অনুবর্তন করে), তৎ (সেই ইন্দ্রিয়)

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮

বায়ুঃ অম্ভসি নাবম্ ইব (বায়ু যেমন জলের উপর নৌকাকে চালিত করে সেইরূপ), অস্য (ইহার, পুরুষের বা মনের) প্রজ্ঞাম্ (বুদ্ধি) হরতি (হরণ করে)।

মন বিষয়ে প্রবর্তমান ইন্দ্রিয়গণের যেটিকে অনুবর্তন করে, সেই একটি ইন্দ্রিয়ই, যেমন বায়ু জলের উপরিস্থিত নৌকাকে বিচলিত করে, তদ্রূপ উহার প্রজ্ঞা হরণ করে। ৬৭

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যথাক্রমে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ—এই পাঁচটি বিষয়। ইহার কোন একটি ইন্দ্রিয়কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া যদি মন সেই বিষয়ে আসক্ত হয়, তবেই উহার বিবেক-বুদ্ধি লোপ পায়। পাঁচটির দিকেই যাহার মন ধাবিত হয়, তাহার কি শোচনীয় অবস্থা।

এ বিষয়ে একটি সুন্দর সংস্কৃত বচন ও দোহা আছে—

শব্দাদিভিঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চত্বমাপুঃ স্বগুণেন বদ্ধাঃ।
কুরঙ্গ-মাতঙ্গ-পতঙ্গ-মীন-ভৃঙ্গাঃ নরঃ পঞ্চভিঃ রঞ্জিতঃ কিম্ ॥

একের পাছে যেয়ে পাঁচ, পাঁচে পাঁচ মিশায়।
পাঁচের পাছে ফিরে যেই, তার কি উপায় ?

পাঁচটি প্রাণী প্রত্যেকে এক একটি ইন্দ্রিয়-বিষয়ে লুব্ধ হইয়া পাঁচে পাঁচ মিশায় অর্থাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। যথা—পতঙ্গ রূপে (অগ্নিতে), মাতঙ্গ স্পর্শে (অন্য হস্তীর স্পর্শসুখে লুব্ধ হইয়া হস্তিশিকারীদের খনিত গর্তে পতিত হয়), ভৃঙ্গ পুষ্পের গন্ধে, কুরঙ্গ বাঁশীর শব্দে, মীন রসে (বড়শীর খাদ্যে) মোহিত হইয়া প্রাণ হারায়। যে মানুষ পাঁচটি ইন্দ্রিয়-বিষয়েই যুগপৎ আসক্ত তাহার কি গতি হইবে ?

৬৮। হে মহাবাহো, তস্মাৎ (সেই হেতু) যস্য ইন্দ্রিয়াণি (যাহার ইন্দ্রিয়গণ) ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (বিষয়সমূহ হইতে) সর্বশঃ (সর্বপ্রকারে) নিগৃহীতানি (বিমুখীকৃত হইয়াছে), তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা (তাহারই প্রজ্ঞা স্থির হইয়াছে)।

হে মহাবাহো, (যখন ইন্দ্রিয়াধীন মন এবং মনের অধীন প্রজ্ঞা) সেই হেতু, যাহার ইন্দ্রিয় সর্বপ্রকারে বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে, তাহারই প্রজ্ঞা স্থির হইয়াছে। ৬৮

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ ৬৯

আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০

৬৯। সর্বভূতানাম্ (সর্বভূতের) যা নিশা (যাহা রাত্রিস্বরূপ) তস্যাং (তাহাতে) সংযমী (জিতেন্দ্রিয় পুরুষ) জাগর্তি (জাগ্রত থাকেন); যস্যাং (যাহাতে) ভূতানি (সাধারণ ব্যক্তিগণ) জাগ্রতি (জাগিয়া থাকে), পশ্যতঃ মুনেঃ (আত্মদৃষ্টিযুক্ত মুনির) সা নিশা (তাহা রাত্রিস্বরূপ)।

সাধারণ প্রাণিগণের পক্ষে যাহা (আত্মনিষ্ঠা) নিশাস্বরূপ, তাহাতে (আত্মনিষ্ঠাতে) সংযমী ব্যক্তি জাগ্রত থাকেন; যাহাতে (বিষয়-নিষ্ঠাতে) অজ্ঞ প্রাণিসাধারণ জাগরিত থাকে, আত্মদর্শী মুনিদিগের তাহা (বিষয়নিষ্ঠা) রাত্রিস্বরূপ। ৬৮

তাৎপর্য—অজ্ঞ জনসাধারণ আত্মনিষ্ঠায় নিদ্রিত, বিষয়ে জাগ্রত। সংযমী যোগিপুরুষ আত্মনিষ্ঠায় জাগ্রত, বিষয়ে নিদ্রিত, অর্থাৎ অজ্ঞ ব্যক্তিগণ বিষয়-চিন্তায় নিরত, আত্মচিন্তায় বিরত; সংযমী বিষয়ে বিরত, আত্মচিন্তায় নিরত। ৬৯

৭০। যদ্বৎ (যেমন) আপঃ (বারিরাশি) আপূর্যমাণম্ (পরিপূর্ণ) অচলপ্রতিষ্ঠম্ (স্থিরভাবে অবস্থিত) সমুদ্রং (সাগরে) প্রবিশন্তি (প্রবেশ করে), তদ্বৎ (তেমনি) সর্বে কামাঃ (সকল বিষয়রাশি) যম্ (যে পুরুষে) প্রবিশন্তি (প্রবেশ করে) সঃ শান্তিম্ আপ্নোতি (তিনি শান্তি প্রাপ্ত হন), কামকামী (বিষয়কামী পুরুষ) ন (শান্তি পায় না)।

যেমন নদ-নদীর জলে পরিপূরিত প্রশান্ত সমুদ্রে অপর জলরাশি আসিয়া প্রবেশ করিয়া বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ যে মহাত্মাতে বিষয়সকল প্রবেশ করিয়াও কোনরূপ চিত্তবিক্ষেপ উৎপন্ন করে না, তিনি শান্তিলাভ করেন, যিনি ভোগকামনা করেন, তিনি শান্তি পান না। ৭০

সমুদ্র নদ-নদীর অন্বেষণ করে না, তবু সবদাই পরিপূর্ণ; সেই স্বতঃপূর্ণ সমুদ্রে অবিরত জলরাশি প্রবেশ করিতেছে, কিন্তু তাহাতে সমুদ্রের কোনরূপ

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১

বিক্ষোভ উপস্থিত হয় না; সমুদ্র সর্বদাই স্থির, প্রশান্ত। সেইরূপ, চিত্ত যাহার ঈশ্বরে নিত্যযুক্ত, বিষয়সমূহ তাঁহার ইন্দ্রিয়গোচর হইলেও তাহাতে তাঁহার চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয় না; তিনি সর্বাবস্থায়ই স্থির, ধীর, প্রশান্ত। সুতরাং তিনি বিষয়ভোগ করিয়াও সর্বদুঃখনিবৃত্তিরূপ পরম শান্তি লাভ করেন। কিন্তু যে সর্বদা ভোগের কামনায় আকুল সে শান্তি পায় না; কেননা কামনার অপূরণে দুঃখ; পূরণেও তৃপ্তি নাই—"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি"। ঈদৃশ ব্যক্তিকেই নির্লিপ্তসংসারী কহে। (২।৬৪ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

রাজর্ষি জনক এইরূপ আত্মনিষ্ঠ নির্লিপ্তসংসারী ছিলেন। তাই তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন—'মিথিলায়াং প্রদগ্ধায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চন'—'সমগ্র মিথিলা দগ্ধ হইলেও আমার কিছুই দগ্ধ হয় না।' তিনি সংসারে ছিলেন, কিন্তু সংসার তাঁহাতে ছিল না—

ভবিষ্যৎ নানুসন্ধত্তে নাতীতং চিন্তয়ত্যসৌ।
বর্তমাননিমেষন্তু হসন্নেবাভিবর্ততে ॥ —বাশিষ্ঠে

তিনি ভবিষ্যতে কি হইবে তাহার অনুসন্ধানে ব্যস্ত হন না, অতীতের চিন্তা করেন না, বর্তমান সময়টি হাসিতে হাসিতে যাপন করেন। ইহাই প্রকৃত চিত্তপ্রসাদ, প্রকৃত শান্তির লক্ষণ। ৭৪

৭১। যঃ পুমান্ (যে পুরুষ) সর্বান্ কামান্ (সকল কামনা) বিহায় (ত্যাগ করিয়া) নিঃস্পৃহঃ, নিরহঙ্কারঃ, নির্মমঃ [সন্ (হইয়া)] চরতি (বিচরণ করেন), সঃ শান্তিম্ অধিগচ্ছতি (তিনি শান্তিপ্রাপ্ত হন)।

কামনা ত্যাগেই শান্তি—উহাই ব্রাহ্মীস্থিতি ৭১-৭২

যে ব্যক্তি সমস্ত কামনা ত্যাগ করিয়া নিস্পৃহ হইয়া বিচরণ করেন, যিনি মমতাশূন্য ও অহঙ্কারশূন্য, তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হন। ৭১

নিঃস্পৃহঃ—দেহজীবনধনাদি প্রাপ্ত অপ্রাপ্ত সর্ববিষয়ে স্পৃহাশূন্য। **নির্মমঃ**—মমতাশূন্য; আমার দেহ, আমার গৃহ, আমার ধনজন ইত্যাদি 'আমার' 'আমার' বুদ্ধিই মমতা। যাহার এই ভ্রম দূর হইয়াছে তিনিই নির্মম। **নিরহঙ্কারঃ**—আমি ধনী, আমি জ্ঞানী, আমি কর্তা, আমি দাতা—ইত্যাদি 'আমি' 'আমি' বুদ্ধিই অহঙ্কার, যাহার এই 'আমি' জ্ঞান নাই তিনি নিরহঙ্কার। **চরতি**—

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২

বিচরণ করেন—গৃহী হইলে, 'বিষয়ে বিচরণ করেন', নির্লিপ্তভাবে বিষয় ভোগ করেন, গীতোক্ত কর্মযোগীর পক্ষে এই অর্থই গ্রহণীয় (২।৬৪); সন্ন্যাসী হইলে 'যথেচ্ছ পর্যটন করেন', এইরূপ অর্থ করিতে হয়।

এই 'আমি', 'আমার' জ্ঞান কখন লোপ পায়? সর্বকামনার কখন ত্যাগ হয়? দেহজীবনাদিতেও স্পৃহা কখন দূর হয়? যখন যোগী আত্মাতেই আপনি সন্তুষ্ট থাকেন, যখন আত্মাতেই নিষ্ঠা, আত্মাতেই তাহার স্থিতি, তখনই এই অবস্থা হয়, সুতরাং ইহাই ব্রহ্মনিষ্ঠা (পরের শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

৭২। হে পার্থ, এষা ব্রাহ্মী স্থিতি (ইহাই ব্রহ্মনিষ্ঠা), এনাং প্রাপ্য (ইহাকে পাইয়া) ন বিমুহ্যতি (কেহ সংসারে মুগ্ধ হয় না); অন্তকালে অপি (মৃত্যুকালেও) অস্যাং স্থিত্বা (এই অবস্থায় থাকিয়া) ব্রহ্মনির্বাণম্ ঋচ্ছতি (ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন)।

হে পার্থ, ইহাই ব্রাহ্মীস্থিতি (ব্রহ্মজ্ঞানে অবস্থান)। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে জীবের আর মোহ হয় না। মৃত্যুকালেও এই অবস্থায় থাকিয়া তিনি ব্রহ্মনির্বাণ বা ব্রহ্মে মিলনরূপ মোক্ষ লাভ করেন। ৭২

অন্তকালেও—এ কথা বলার তাৎপর্য এই যে, ইহা স্থায়ী সিদ্ধাবস্থা, এই ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিলে আর পতনের আশঙ্কা নাই। এই অবস্থা লাভ করিয়া নিষ্কামভাবে আজীবন যথাধিকার কর্ম করিয়াও পরকালে সদ্গতি লাভ হয়। কেননা, নিষ্কামকর্মে মনোমালিন্য জন্মে না, বুদ্ধি বাসনানির্মুক্ত হইয়া সর্বদাই ঈশ্বরে একনিষ্ঠ থাকে। মৃত্যুকালের মানসিক অবস্থানুসারেই জীবের পরকালের গতি নির্দিষ্ট হয়, একথা উপনিষদে ও গীতাতেও পরে উক্ত হইয়াছে। (গী ৮।৫-৬, ছান্দো ৩।১৪)।

এই অবস্থা কি?—সর্বকামনা ত্যাগ, ইন্দ্রিয়সংযম, আত্মাভিমান ও মমত্ববুদ্ধি বর্জনপূর্বক আত্মচিন্তায় বা ঈশ্বরে একনিষ্ঠ হওয়া। ইহাই ব্রাহ্মীস্থিতি। কি গৃহী, কি সন্ন্যাসী, কি যোগী—সকলেরই ইহাতে অধিকার আছে। গৃহী, ঈশ্বরে চিত্তার্পণপূর্বক তাঁহারই প্রীত্যর্থ জগতের হিতার্থ নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াও এই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারেন। অর্জুনের প্রতি সেই উপদেশ; ইহাই কর্মযোগের সিদ্ধি। (২।৫৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

দ্বিতীয় অধ্যায়—বিশ্লেষণ ও সার-সংক্ষেপ

১—৩ শ্রীকৃষ্ণের ক্ষত্রোচিত তিরস্কার ও উদ্দীপনা। ৪—৯ অর্জুনের উত্তর; কর্তব্য-বিষয়ে মোহ ও কার্যাকার্য নির্ণয়ের উপদেশ প্রার্থনা। ১০—৩০ আত্মার অশোচ্যত্ব, দেহ ও সুখ-দুঃখাদির অনিত্যতা, আত্মার নিত্যতা-বিষয়ক উপদেশ দ্বারা শোকমোহ দূরীকরণের চেষ্টা; ৩১—৩৭ স্বধর্ম-পালনের আবশ্যকতা দেখাইয়া যুদ্ধ করিবার উপদেশ; ৩৮—৩৯ সাংখ্যজ্ঞানের উপসংহার করিয়া কর্মযোগের বর্ণনা আরম্ভ; ৪০ কর্মযোগের স্বল্প আচরণও শুভকর · ৪১—৪৬ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি ও অস্থিরবুদ্ধির বর্ণনা—মীমাংসকদিগের বেদবাদের প্রতিবাদ ৪৭—৪৮ সাম্যবুদ্ধিযুক্ত কর্মের লক্ষণ; ৪০—৫৩ সাম্যবুদ্ধিই কর্মযোগের মূল—উহারই নাম স্থিরপ্রজ্ঞা-—উহাতেই সিদ্ধি; ৫৪—৭০ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বর্ণনা—ইন্দ্রিয়সংযম ও কামনাত্যাগই শ্রেষ্ঠ সাধন; ৭১—৭২ কামনা, মমতা ও অহঙ্কার-ত্যাগেই পরমা শান্তি, উহাই ব্রাহ্মীস্থিতি—উহাতেই মোক্ষ।

এই অধ্যায়ের নবম শ্লোক পর্যন্ত প্রথম অধ্যায়োক্ত অর্জুন-বিষাদ ও কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয়বিষয়ে উপদেশ প্রার্থনা (১—৯)। একাদশ শ্লোক হইতে **আত্মতত্ত্বের** আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। এই স্থানেই প্রকৃত **গীতারম্ভ**। আত্মীয় গুরুজনাদির নিধনাশঙ্কায় শোককাতর অর্জুনকে শ্রীভগবান্ বুঝাইতেছেন যে, আত্মজ্ঞ পণ্ডিতগণ কাহারও মৃত্যুতে শোক করেন না, কেননা প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু নাই। দেহের বিনাশ হয় সত্য, কিন্তু আত্মা দেহাতিরিক্ত অবিনাশী নিত্য বস্তু, উহার বিনাশ নাই। আত্মার পক্ষে মৃত্যু অর্থ দেহান্তর-প্রাপ্তি, উহা অবস্থার পরিবর্তন মাত্র, বিনাশ নহে। অতএব ভীষ্মাদির মৃত্যু-আশঙ্কায় তোমার শোকের কারণ নাই। দেহাত্ম-বিবেক অর্থাৎ **দেহের নশ্বরতা ও আত্মার অবিনাশিতা** বিষয়ে জ্ঞানোপদেশই এ কয়েকটি শ্লোকের বর্ণিত বিষয় (১০—৩০)। পরবর্তী সাতটি শ্লোকে স্বধর্মপালনের কর্তব্যতা, 'ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্মযুদ্ধে পরাঙ্মুখতা অকর্তব্য, অকীর্তিকর ও নিন্দাজনক', এইরূপ ধর্মশাস্ত্রীয় লৌকিক উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে (৩১—৩৭)। কিন্তু এ সকল কথায় অর্জুনের চিত্ত প্রবুদ্ধ হইতেছে না। তাঁহার সংশয় এই—আত্মা অবিনাশী বলিয়া কি লোকহত্যায় পাপ হয় না? মানিলাম, যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম—কর্তব্যকর্ম—তাই বলিয়া রাজ্যলাভ কামনায় গুরুজনাদি বধ করিতে হইবে। এমন নৃশংস কর্তব্যকর্মের পরিবর্জনই কর্তব্য? অর্জুনের এবংবিধ মনোভাব

বুঝিয়া শ্রীভগবান্ অপূর্ব যোগধর্মের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—তুমি রাজ্যলাভ কামনায় যদি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, তবে অবশ্যই তজ্জনিত কর্মফল তোমাকে ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু যদি তুমি যোগস্থ হইয়া কর্ম করিতে পার অর্থাৎ ফল কামনা বর্জন করিয়া লাভালাভ, সিদ্ধি-অসিদ্ধি সমজ্ঞান করিয়া যুদ্ধ করিতে পার, তজ্জন্য পাপভাগী হইবে না। এই সমত্বই যোগ, এই সমত্ববুদ্ধিরূপ যোগই বুদ্ধিযোগ, এই সাম্যবুদ্ধিযুক্ত কর্মই **নিষ্কাম কর্ম**। তুমি পাপপুণ্য, স্বর্গনরকাদির কথা বলিতেছ। এ সকল কাম্যকর্মের ফল। সাম্যবুদ্ধিযুক্ত নিষ্কামকর্মী স্বর্গাদির আশায় বা নরকাদির ভয়ে কোন কর্ম করেন না। তিনি পাপপুণ্য উভয়ই পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষাখ্য পরমপদ লাভ করেন। কাম্যকর্মের নানাবিধ ফলকথাশ্রবণে তোমার বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তোমার বিক্ষিপ্তবুদ্ধি যখন পরমেশ্বরে সমাহিত হইবে, তখন তোমার বিষয়ে আসক্তি বিদূরিত হইবে—তোমার প্রজ্ঞা স্থির হইবে, তুমি যোগে সিদ্ধ হইবে। যিনি সংযতেন্দ্রিয়, বিষয়-বাসনা, আত্মাভিমান ও মমত্ব-বুদ্ধি বর্জনপূর্বক ঈশ্বর চিন্তায় একনিষ্ঠ, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। **স্থিতপ্রজ্ঞ** ব্যক্তি আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা কর্ম করিয়াও কর্মে আবদ্ধ হন না। এই অবস্থার নামই ব্রাহ্মীস্থিতি। এই অবস্থা লাভ করিয়া সাধক নিষ্কামভাবে যথাধিকার কর্ম করিয়াও মৃত্যুকালে ব্রহ্মনির্বাণ বা মোক্ষ লাভ করেন।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই দুইটি সাধনমার্গ প্রচলিত ছিল—সাংখ্য ও যোগ বা কর্মসন্ন্যাস-মার্গ ও কর্মযোগ-মার্গ। এই দুই মার্গে পরস্পর বিরোধ ও বিবাদও পূর্বাবধিই চলিতেছিল। এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই বিরোধের উল্লেখ করিয়াই (২।৩৯) শ্রীগীতার অধ্যাত্ম-উপদেশ আরম্ভ হইয়াছে এবং পরে, অর্জুনের মুখে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন তুলিয়া তদুত্তরে এই বিরোধের খণ্ডন করা হইয়াছে এবং সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে। (গী. ৩।১-৪, ৫।১-৪, ১৮।১-৬ দ্রঃ)। অধিকন্তু, জ্ঞান ও কর্মের সহিত ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তির সংযোগ করিয়া শ্রীগীতা নিজস্ব অপূর্ব যোগধর্ম শিক্ষা দিয়াছেন। প্রাচীন বৈদিক কর্মযোগ এবং বৈদান্তিক জ্ঞানযোগে ভক্তির প্রসঙ্গ নাই, কিন্তু পরে আমরা দেখিব শ্রীগীতায় জ্ঞান ও কর্মোপদেশ সর্বত্রই ভক্তিপূত, ভগবদ্ভক্তির সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভক্তির প্রসঙ্গ অধিক নাই, মাত্র তিনটি কথায় সূত্রাকারে উহার

ইঙ্গিত করা হইয়াছে—'যুক্ত আসীত মৎপরঃ' (গী. ২৬১)। উহাই শ্রীগীতার মূলমন্ত্র, পরবর্তী অধ্যায়-সমূহে নানাভাবে উহার সম্প্রসারণ করা হইয়াছে এবং পরিশেষে উহাই পরম গুহ্যতম সাধনতত্ত্ব বলিয়া শ্রীভগবান্ প্রিয় সখা ও শিষ্যকে সর্বশেষ উপদেশ দিয়াছেন। (গী. ৪।১০-১১, ৫।২৯, ৬।৪৭, ৭।১৬, ২৮।২৯, ৮।১৪, ২১, ৯।১৩-১৪, ২২, ২৬-২৭, ৩০-৩২, ৩৪, ১০।৯-১১, ১১।৫৪-৫৫, ১১।২, ৬-৮, ২০, ১৪।২৬-২৭, ১৫।১৯, ১৮।৫৫-৫৭, ৬৫-৬৬ দ্রঃ)।

এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ আত্মতত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞানের কথা আলোচিত হইয়াছে। এই হেতু ইহাকে সাংখ্যযোগ কহে। সমগ্র গীতায় জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি এই ত্রিবিধ যোগ এবং প্রসঙ্গক্রমে ত্রিগুণ, পুরুষ-প্রকৃতি, সংসার-মোহ, মোক্ষ ইত্যাদি বিষয় বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই সকলই সূত্রাকারে বিভিন্ন স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। এই জন্য এই অধ্যায়কে **'গীতার্থ-সূত্র'** বলে।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে **সাংখ্যযোগো** নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তৃতীয় অধ্যায়

কর্মযোগ

অর্জুন উবাচ

জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন।
তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥ ২

১-২। অর্জুনঃ উবাচ (কহিলেন)—হে জনার্দন, চেৎ (যদি) কর্মণঃ (কর্ম অপেক্ষা) বুদ্ধিঃ (জ্ঞান) জ্যায়সী (শ্রেষ্ঠ) তে মতা (তোমার মত হয়), হে কেশব, তৎ কিং (তাহা হইলে কি জন্য) ঘোরে কর্মণি (হিংসাত্মক কর্মে) মাং নিয়োজয়সি (আমাকে নিযুক্ত করিতেছ)? ব্যামিশ্রেণ ইব বাক্যেন (বিমিশ্র বাক্যের দ্বারা) মে বুদ্ধিং (আমার বুদ্ধি) মোহয়সি ইব (যেন মোহিত করিতেছ); যেন (যাহাদ্বারা) অহং শ্রেয়ঃ আপ্নুয়াম্ (শ্রেয় লাভ করিতে পারি) তৎ একং (সেই একটি) নিশ্চিত্য বদ (নিশ্চয় করিয়া বল)।

জ্ঞান ও কর্ম—ইহার কোন্‌টি শ্রেয়ঃ মার্গ? ১-২

অর্জুন বলিলেন, হে জনার্দন, যদি তোমার মতে কর্ম হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, তবে হে কেশব, আমাকে হিংসাত্মক কর্মে কেন নিযুক্ত করিতেছ? বিমিশ্রবাক্যদ্বারা কেন আমার মনকে মোহিত কবিতেছ? যাহা দ্বারা আমি শ্রেয় লাভ করিতে পারি, সেই একটি (পথ) আমাকে নিশ্চিত করিয়া বল। ১-২

ব্যামিশ্রেণ ইব বাক্যেন—বিমিশ্র বাক্যদ্বারা, কোথাও জ্ঞানের প্রশংসা, কোথাও কর্মের প্রেরণা, এইরূপ সন্দেহজনক বাক্যদ্বারা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথমতঃ শ্রীভগবান্ মোক্ষসাধন আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়া পরে 'যোগস্থ' হইয়া কর্ম করিতে উপদেশ দিলেন এবং বলিলেন যে, ফলাফলে সাম্যবুদ্ধিই যোগ। এই সাম্যবুদ্ধি লাভ করিতে হইলে ইন্দ্রিয়সংযম ও কামনা বর্জনপূর্বক প্রজ্ঞা স্থির করিতে হয়। স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থায়ই ব্রাহ্মীস্থিতি, ইহাতেই মোক্ষ। প্রকৃতপক্ষে, এ সকলই জ্ঞানমার্গের

শ্রীভগবান্ উবাচ

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩

কথা এবং ২।৪৯ শ্লোকে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, তত্ত্বদৃষ্টিতে কর্ম অতি গৌণ, বুদ্ধিযোগই শ্রেষ্ঠ।

অর্জুন এক্ষণে শ্রীভগবানের সেই কথাই আবৃত্তি করিয়া বলিতেছেন যে, কর্ম অপেক্ষা সাম্যবুদ্ধিই যদি শ্রেষ্ঠ হয় এবং উহাতেই যদি মোক্ষ হয়, তবে জ্ঞানের সাধনা দ্বারা উহা লাভ করিলেই তো হয়, তবে আবার আমাকে কর্মে নিযুক্ত কর কেন? আর সে কর্মটাও যে-সে কর্ম নয়, নিদারুণ যুদ্ধকর্ম। একবার বল—'লাভ কর ব্রাহ্মীস্থিতি, স্থির কর মন', আবার সঙ্গে সঙ্গেই বলিতেছ,—'রণাঙ্গনে ধর প্রহরণ।' তোমার কথাগুলি যেন বড় এলো-মেলো বোধ হইতেছে।

শ্রীভগবান্ বরাবর প্রেরণা দিতেছেন কর্মের, কিন্তু উপদেশ দিতেছেন জ্ঞানের, যে যোগ অবলম্বন করিয়া কর্ম করিতে বলিতেছেন, সে যোগের নাম দিয়াছেন বুদ্ধিযোগ (২।৪৯)। 'কর্মযোগ' শব্দটিও এ পর্যন্ত ব্যবহার করেন নাই। এক্ষণে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে পরের শ্লোকে কথাটা স্পষ্ট করিয়াছেন এবং কর্মযোগ শব্দটিই উল্লেখ করিয়াছেন।

বস্তুতঃ দ্বিতীয় অধ্যায়ে কর্ম ও জ্ঞান সম্বন্ধে ভগবদুক্তি কিছু বিমিশ্র রকমেরই বটে, ইহা শ্রীভগবান্ বা গীতাকারের কৌশল। কেননা অর্জুনের এই প্রশ্নের এস্থলে বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এই প্রশ্নের উত্তরে পরবর্তী তিন অধ্যায়ে কর্ম ও জ্ঞানের স্বরূপ নির্ণয় এবং উহাদের পরস্পর সামঞ্জস্য ও সমন্বয় বিধায়ক যে অপূর্ব উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা অধ্যাত্মতত্ত্বের সারতত্ত্ব, তাহা কেবল হিন্দুর নহে, সমগ্র জগতের অশেষ কল্যাণকর। ১-২

৩। শ্রীভগবান্ উবাচ (কহিলেন)—হে অনঘ (বিশুদ্ধান্তঃকরণ অর্জুন), অস্মিন্ লোকে (এই সংসারে) দ্বিবিধা নিষ্ঠা (দুই প্রকার নিষ্ঠা) ময়া পুরা প্রোক্তা (মৎকর্তৃক পূর্বে কথিত হইয়াছে)। জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাম্ (জ্ঞানযোগের দ্বারা সাংখ্যদিগের), কর্মযোগেন যোগিনাম্ (নিষ্কামকর্মযোগের দ্বারা কর্মীদিগের) [নিষ্ঠা উক্ত হইয়াছে]।

ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪

জ্ঞানমার্গ (সন্ন্যাসমার্গ) ও কর্মযোগমার্গ—দুইই মোক্ষ-পথ—অনাসক্তভাবে কর্ম করাই কর্তব্য ৩-৮

হে অনঘ, ইহলোকে দ্বিবিধা নিষ্ঠা আছে ইহা পূর্বে বলিয়াছি। সাংখ্যদিগের জন্য জ্ঞানযোগ এবং কর্মীদিগের জন্য কর্মযোগ। ৩

নিষ্ঠা—মোক্ষনিষ্ঠা, মোক্ষলাভের মার্গ বা পথ।

সাংখ্য—যাঁহারা ব্রহ্মচর্যের পরই সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা বেদান্ত-বিজ্ঞানের মর্মজ্ঞ এবং জ্ঞানভূমিতে সমারূঢ়, ঈদৃশ পরমহংসপরিব্রাজক প্রভৃতি (শঙ্কর)। **জ্ঞানযোগ**—বিবেক, বৈরাগ্য ও শমাদিকে সহায় করিয়া গুরূপদিষ্ট তত্ত্বমস্যাদি বেদান্তবাক্যের শ্রবণ ও মনন ও ধ্যানাদিরূপ সাধনমার্গ। **যোগী**—কর্মযোগী। **কর্মযোগ**—২।৪৭ দ্রষ্টব্য। **পুরা**—পূর্বাধ্যায়ে ২।৩৯ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। অথবা 'সৃষ্টির প্রারম্ভে' এইরূপ অর্থও হয়। মহাভারতে উক্ত আছে, ভগবান্ সৃষ্টির প্রারম্ভেই কর্ম ও সন্ন্যাস-মার্গ (প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি) এই দুই মার্গ উৎপন্ন করিয়াছিলেন (মভা, শাঃ ৩৪০)।

৪। কর্মণাম্ অনারম্ভাৎ (কর্মের অনমুষ্ঠানেই) পুরুষঃ (পুরুষ) নৈষ্কর্ম্যং (কর্মবন্ধন হইতে মুক্তি) ন অশ্নুতে (প্রাপ্ত হয় না), সংন্যসনাৎ এব চ (সন্ন্যাস গ্রহণ অর্থাৎ কর্মত্যাগ করিলেই) সিদ্ধিং ন সমধিগচ্ছতি (সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না)।

কর্মচেষ্টা না করিলেই পুরুষ নৈষ্কর্ম্যলাভ করিতে পারে না, আর (কামনাত্যাগ ব্যতীত) কর্মত্যাগ করিলেই সিদ্ধি লাভ হয় না। ৪

নৈষ্কর্ম্য লাভ—শাস্ত্রে 'নৈষ্কর্ম্য' শব্দ একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কর্মমাত্রই বন্ধনের কারণ, এই কর্মবন্ধন হইতে মুক্তি বা নিষ্কৃতির অবস্থাকে **নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি** বা মোক্ষ বলে (১৮।৪৯)। সন্ন্যাসবাদিগণ বলেন, কর্মত্যাগ করিয়া জ্ঞানমার্গে বিচরণ করিলেই নৈষ্কর্ম্য বা মোক্ষ লাভ হয়। শ্রীগীতা বলেন, তাহা হয় না। সন্ন্যাসমার্গে মোক্ষ লাভ হয় ঠিক, তাহা হয় জ্ঞানের ফলে, কর্মত্যাগের ফলে নয়। কর্ম বন্ধনের কারণ নয়, অহঙ্কার ও কামনাই বন্ধনের কারণ। কামনাত্যাগেও জ্ঞানের প্রয়োজন এবং সেই হেতুই নিষ্কাম-কর্মও মোক্ষপ্রদ) মোক্ষের জন্য চাই, অহঙ্কার ও ফলাসক্তি ত্যাগ, কর্মত্যাগ

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৫
কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬

প্রয়োজন করে না। বস্তুতঃ দেহধারী জীব একেবারে কর্মত্যাগ করিতেই পারে না (পরের শ্লোক)।

৫। জাতু (কখনও) কশ্চিৎ (কেহ) ক্ষণমপি (ক্ষণকালও) অকর্মকৃৎ (কর্ম না করিয়া) ন হি তিষ্ঠতি (থাকিতেই পারে না) হি (যেহেতু) প্রকৃতিজৈঃ গুণৈঃ (প্রকৃতিজাত গুণদ্বারা) অবশঃ (অবশ হইয়া) সর্বঃ (সকলেই) কর্ম কার্যতে (কর্ম করিতে বাধ্য হয়)।

প্রকৃতিজৈঃ গুণৈঃ—সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ—প্রকৃতির এই গুণত্রয় হইতেই রাগদ্বেষাদির উৎপত্তি, উহা হইতেই কর্মপ্রেরণা, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসাদি স্বাভাবিক কর্মও প্রকৃতির প্রেরণায়ই হইয়া থাকে (৩।২৭।২৯)

কেহই কখনও ক্ষণকালও কর্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, কেননা, প্রকৃতির গুণে অবশ হইয়া সকলেই কর্ম করিতে বাধ্য হয়। ৫

অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন—মোক্ষলাভের দুইটি মার্গ আছে, একটি জ্ঞানমার্গ বা সন্ন্যাসমার্গ, অপরটি কর্মযোগ-মার্গ। আমি তোমাকে কর্মযোগ-মার্গ অবলম্বন করিতে বলিতেছি। এই যোগমার্গের ভিত্তি সাম্যবুদ্ধি বা সম্যক্ জ্ঞান এবং এই জ্ঞানই মোক্ষ। এই জন্যই সাম্যবুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা বর্ণনা করিয়াছি। তোমাকে কর্মোপদেশ দিতেছি, কারণ প্রকৃতির গুণে বাধ্য হইয়া সকলকেই কর্ম করিতে হয়। কর্ম যদি করিতেই হয়, তবে এমনভাবে কর্ম কর, যেন উহা বন্ধনের কারণ না হইয়া মোক্ষের কারণ হয় ; ইহাই কর্মযোগ। ৫

৬। যঃ বিমূঢ়াত্মা (যে মূঢ়) মনসা (মনের দ্বারা) ইন্দ্রিয়ার্থান্ (শব্দরসাদি ইন্দ্রিয়বিষয়সকল) স্মরন্ (স্মরণ করিয়া) কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য (হস্তপদাদি কর্মেন্দ্রিয়সকল সংযত করিয়া) আস্তে (অবস্থিতি করে) সঃ মিথ্যাচারঃ উচ্যতে (সে মিথ্যাচার বলিয়া উক্ত হয়)।

যে ভ্রান্তমতি হস্তপদাদি কর্মেন্দ্রিয়সকল সংযত করিয়া অবস্থিতি করে, অথচ মনে মনে ইন্দ্রিয়-বিষয়সকল স্মরণ করে, সে মিথ্যাচারী। ৬

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুন।
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭
নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ ॥ ৮

কর্মত্যাগ করিলেই সিদ্ধিলাভ হয় না কেন তাহা এই শ্লোকে বলা হইল। মনে মনে বিষয়-চিন্তা করিয়া বাহিরে বিষয়ভোগ ত্যাগ করা মিথ্যাচার মাত্র। ৬

৭। হে অর্জুন, যঃ তু (কিন্তু যিনি) ইন্দ্রিয়াণি (জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল) মনসা নিয়ম্য (মনের দ্বারা সংযত করিয়া) অসক্তঃ (অনাসক্ত হইয়া) কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ (কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা) কর্মযোগম্ আরভতে (কর্মযোগের অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন), সঃ বিশিষ্যতে (তিনি বিশিষ্ট, শ্রেষ্ঠ)।

কিন্তু যিনি মনের দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল সংযত করিয়া অনাসক্ত হইয়া কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্মযোগের অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ। ৭

ইন্দ্রিয়াণি—জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি (জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল, ২।৬৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। **নিয়ম্য**—ঈশ্বরপরাণি কৃত্বা (ঈশ্বরে নিবিষ্ট করিয়া)। **পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়**—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ।

মিথ্যাচারী—শব্দের অর্থ প্রায় সকলেই 'কপটাচারী' করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বলেন, ইহা সঙ্গত নহে; কারণ যাঁহারা সিদ্ধিলাভের আশায় ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়া কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনাদি করেন, অথচ মনকে নির্বিষয় করিতে পারেন না, তাঁহারা সকলেই ভণ্ড নহেন, ভণ্ডামি করিয়া লোকে এত কষ্ট সহ্য করিতে পারে না। এই মাত্র বলা যায় যে, তাঁহারা ভ্রান্তমতি (বিমূঢ়াত্মা), তাঁহাদের আচার মিথ্যা, অর্থাৎ বৃথা, ব্যর্থ, উহাতে কোন ফল হয় না; অবশ্য ভণ্ড সন্ন্যাসীও আছে, কিন্তু যাঁহারা ভণ্ড নহেন, তাঁহাদেরও কৃচ্ছ্রসাধন নিষ্ফলই হয়, গীতোক্তির ইহাই মর্ম। ৬

মিথ্যাচারী ও কর্মযোগী—হস্তপদাদি সংযত করিয়া ধ্যানে বসিয়াছি। মন বিষয়ে ভ্রমণ করিতেছে। আমি মিথ্যাচারী (৩।৬)। এই অবস্থা উল্টাইয়া লইতে পারিলে আমি কর্মযোগী হইব। অর্থাৎ যখন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়-কর্ম করিতেছি, কিন্তু মন ঈশ্বরে নিবিষ্ট আছে, বিষয়-কর্মও তাঁহারই কর্ম মনে করিয়া কর্তব্যবোধে করিতেছি, উহাতে আসক্তি নাই, ফলাকাঙ্ক্ষা নাই। সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে হর্ষ-বিষাদ নাই। (২।৪৭, ২।৬৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

৮। ত্বং (তুমি) নিয়তং কর্ম কুরু (নিয়ত কর্ম কর); হি (যেহেতু) অকর্মণঃ (কর্ম না করা অপেক্ষা) কর্ম জ্যায়ঃ (শ্রেষ্ঠ); অকর্মণঃ চ তে (কর্ম-

শূন্য হইলে তোমার) শরীর-যাত্রা অপি (দেহ-যাত্রাও) ন প্রসিধ্যেৎ (নির্বাহ হইতে পারে না)।

তুমি নিয়ত কর্ম কর; কর্মশূন্যতা অপেক্ষা কর্ম শ্রেষ্ঠ, কর্ম না করিলে তোমার দেহযাত্রাও নির্বাহ হইতে পারে না। ৮

নিয়তকর্ম কি? প্রাচীন টীকাকারগণ প্রায় সকলেই নিয়তকর্মের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্যকর্ম এবং শ্রাদ্ধাদি নৈমিত্তিক কর্ম।" শাস্ত্রবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম হিন্দুর অবশ্যকর্তব্য, সুতরাং এ ব্যাখ্যায় আপত্তি হইতে পারে না। তবে কথা এই, এস্থলে শ্রীভগবান্ অর্জুনকে যুদ্ধকর্মে প্রেরণা দিতেছেন এবং কর্ম না করিলে জীবিকানির্বাহ হইবে না, একথাও বলিতেছেন; কিন্তু সন্ধ্যোপাসনা বা শ্রাদ্ধ এ সকল কর্মের মধ্যে নয়। সুতরাং কেবল এই দুইটির উল্লেখ করিয়া কাজের কথাটা ইত্যাদির মধ্যে রাখিলে ব্যাখ্যা সুসঙ্গত হয় না। "যুদ্ধ প্রজাপালনাদি বিহিত কর্ম" বলিলে অর্থবোধ হয়, অধিকতর সুস্পষ্ট হয়,—এ অর্থ অবশ্য অর্জুনের পক্ষে। সাধারণতঃ, নিয়তকর্ম অর্থ শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য কর্ম, স্বধর্ম—লোকমান্য তিলক প্রভৃতি অধিকাংশেরই এই মত।

এই শ্লোকে এবং ৩।১৯, ১৮।৭, ১৮।৯ শ্লোকে 'নিয়তং কর্ম,' 'কার্যং কর্ম' ব্যবহৃত হইয়াছে। উহাতে, যাহার পক্ষে যাহা বিহিত বা কর্তব্য সেই কর্মই বুঝায়। শ্রীঅরবিন্দের মতে, কর্তব্য কর্ম (duty) এবং গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মের পার্থক্য আছে (ভূমিকা দ্রঃ) এবং এখানে 'নিয়ত কর্ম' অর্থে পূর্ব শ্লোকের মর্মানুসারে, ইন্দ্রিয়সকল সংযত করিয়া (নিয়মা) যে কর্ম করা যায় তাহাই বুঝায় (controlled action), কিন্তু ১৮।৭ শ্লোকে ঠিক এরূপ অর্থ খাটে না।

রহস্য। গীতা ও ধর্মশাস্ত্র

প্রঃ। গীতায় দেখি, সার্বজনীন ধর্মোপদেশ; ইহার ভাষাও সঙ্কীর্ণতা-বর্জিত; 'কর্তব্য কর্ম' কে না বুঝে? এজন্য শাস্ত্রটাকে টানিয়া আনা হয় কেন? যে অ-হিন্দু, যে শাস্ত্র মানে না, তাহার জন্য কি গীতা নয়?

উঃ। 'শাস্ত্রটা'কে কেহ টানিয়া আনিতেছে না। কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণে শাস্ত্রই প্রমাণ—এ কথা গীতায়ই আছে—"তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ" (১৬।২৪)। ইহাতে গীতার সার্বজনীনতাও নষ্ট হয় না। শাস্ত্র কি? স্বেচ্ছাচারিতা, উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণপূর্বক ধর্ম ও লোকরক্ষার উদ্দেশ্যে যে সকল বিধি-নিষেধ প্রবর্তিত হইয়াছে তাহাই শাস্ত্র।

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯

শাস্ত্র সকল সম্প্রদায়ের, সকল সমাজের, সকল জাতিরই আছে। হিন্দুর হিন্দুশাস্ত্র, অহিন্দুর অ-হিন্দু শাস্ত্র। সকলের পক্ষেই শাস্ত্রবিহিত কর্মই কর্তব্য কর্ম। হিন্দুর কর্মজীবনে ও ধর্মজীবনে পার্থক্য নাই, তাই হিন্দুর সাংসারিক-কর্ম-নিয়ামক শাস্ত্রও ধর্মশাস্ত্র। তিন সহস্র বৎসর পূর্বে প্রবর্তিত কোন শাস্ত্রবিধি যদি অবস্থাপরিবর্তনে সমাজরক্ষার প্রতিকূল বোধ হয়, তবে তাহা অবশ্যই ত্যাজ্য, কেননা, যুক্তিহীন, গতানুগতিক ভাবে শাস্ত্র অনুসরণ করিলে ধর্মহানি হয়—

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন-বিচারেণ ধর্মহানিঃ প্রজায়তে ॥—বৃহস্পতি
অন্যং তৃণমিব ত্যাজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা—বশিষ্ঠ

—স্বয়ং ব্রহ্মাও যদি অযৌক্তিক কথা বলেন, তবে তাহা তৃণবৎ পরিত্যাগ করিবে।

৯। যজ্ঞার্থাৎ কর্মণঃ (যজ্ঞার্থে সম্পাদিত কর্ম ভিন্ন) অন্যত্র (অন্য কর্মানুষ্ঠানে) অয়ং লোকঃ (লোকসকল) কর্মবন্ধনঃ (কর্মবদ্ধ হয়); হে কৌন্তেয় [তুমি] মুক্তসঙ্গঃ (নিষ্কাম হইয়া) তদর্থং (সেই উদ্দেশ্যে) কর্ম সমাচর (কর্ম কর)।

সৃষ্টিরক্ষার্থে অনাসক্তভাবে যজ্ঞাদি ত্যাগমূলক কর্ম কর্তব্য ৯-১৬

যজ্ঞার্থ যে কর্ম তদ্ভিন্ন অন্য কর্ম মনুষ্যের বন্ধনের কারণ। হে কৌন্তেয়, তুমি সেই উদ্দেশ্যে (যজ্ঞার্থ) অনাসক্ত হইয়া কর্ম কর। ৯

কর্মবন্ধ—২।৩৯ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

'যজ্ঞার্থ' কর্ম কি?—'যজ্ঞ' বলিতে সাধারণতঃ বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপ বুঝায়, কিন্তু এ সকল কাম্য কর্ম গীতার অনুমোদিত নহে, উহা বন্ধনের কারণ, পূর্বে বলা হইয়াছে (২।৪২-৪৫)। অথচ এস্থলে বলা হইতেছে, যজ্ঞার্থ কর্ম ভিন্ন অন্য কর্ম বন্ধনের কারণ। এই 'যজ্ঞ' শব্দের অর্থ কি?

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য বলেন—"যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" ইতি শ্রুতের্যজ্ঞ ঈশ্বরঃ। শ্রুতিতে বিষ্ণুকে যজ্ঞ বলা হইয়াছে, এস্থলেও যজ্ঞ অর্থ বিষ্ণু অর্থাৎ ঈশ্বর। সুতরাং শ্লোকের অর্থ এই—ঈশ্বরোদ্দেশ্যে অর্থাৎ ঈশ্বরের আরাধনার্থ বা প্রীতিকামনায় যে কর্ম তদ্ভিন্ন অন্য কর্ম বন্ধনের কারণ। প্রাচীন টীকাকারগণ অনেকেই এই মতের অনুসরণ করিয়াছেন।

নিষ্কাম কর্ম ঈশ্বরোদ্দেশ্যেই কৃত হয়, আমাতেই সর্ব কর্ম অর্পণ কর, মৎকর্ম-পরায়ণ হও ইত্যাদি কথা গীতার নানা স্থানেই আছে। সুতরাং এ ব্যাখ্যা সুসঙ্গত সন্দেহ নাই। কিন্তু অনেকেই মনে করেন 'যজ্ঞ' শব্দে যে ঈশ্বর বুঝায় এ সম্বন্ধে আচার্যদেবের বেদের প্রমাণ অতি ক্ষীণ এবং গীতাকার যে 'ঈশ্বর' অর্থই 'যজ্ঞ' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, ইহা সন্দেহের বিষয়। এ প্রসঙ্গে **বঙ্কিমচন্দ্র** উল্লিখিত বেদমন্ত্রাদির আলোচনা করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন যে—যজ্ঞ বিষ্ণুর নাম নয়। বিষ্ণু সর্বব্যাপক বলিয়া যজ্ঞ বিষ্ণু, অতএব 'যজ্ঞার্থে' বলিলে 'বিষ্ণু-অর্থে' বুঝিতে হইবে, এই কথা খাটে না। এরূপ কথা গীতার ভিতর সন্ধান করিলেও পাওয়া যায় ('অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ' ইত্যাদি গী, ৯।১৬)। দ্বিতীয়তঃ, এই শ্লোকের পরবর্তী কয়েক শ্লোকেও 'যজ্ঞ' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। সেখানে 'যজ্ঞ' শব্দে ঈশ্বর বুঝায় না। ৯ম শ্লোকে 'যজ্ঞ' শব্দ এক অর্থে ব্যবহার করিয়া তাহার পরেই ভিন্নার্থে সেই শব্দ ব্যবহার করা অসম্ভব।

শ্রীঅরবিন্দ গীতোক্ত 'যজ্ঞ' শব্দের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব অতি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনা তাঁহার ব্যাখ্যাত গীতোক্ত পুরুষোত্তম-তত্ত্বের সহিত সংশ্লিষ্ট (১৫।১৪ ব্যাখ্যা দ্রঃ)। পরমেশ্বর বা গীতার পুরুষোত্তম যেমন সম, শান্ত, নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ, অখিলাত্মা, তেমনি আবার তিনিই গুণপালক, গুণধারক, কর্মের প্রেরয়িতা, যজ্ঞ-তপস্যার ভোক্তা, সর্বলোক মহেশ্বর। তাঁহারই প্রেরণায় প্রকৃতি তাঁহারই কর্ম করেন। অজ্ঞজীব মনে করে, কর্ম 'আমার', কর্ম করি 'আমি'। এই 'আমি' যতদিন থাকে ততদিন সমাজের জন্য, দেশের জন্য, সর্বভূতহিতের জন্য কর্ম করিলেও তাহা গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম হয় না, যদিও অনেকে মনে করেন উহাই নিষ্কাম কর্ম। কিন্তু যখন জীব বুঝিতে পারে যে কর্ম ঈশ্বরের, তিনিই সর্ব কর্মের নিয়ন্তা, যজ্ঞ তপস্যার ভোক্তা—এইরূপ জ্ঞানে যখন সর্ব কর্ম তাহাকে উৎসর্গ করিতে পারে, তখনই তাহা 'যজ্ঞার্থ কর্ম' হয়। এইরূপ কর্মে বন্ধন হয় না, অন্য কর্ম বন্ধনের কারণ। শুধু বেদোক্ত যজ্ঞাদি এবং সামাজিক কর্তব্য কর্ম নহে, সকল কর্মই যজ্ঞার্থ করা যাইতে পারে।

প্রচলিত কর্মমূল বেদবাদ ও জ্ঞানমূল বেদান্তবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য গীতা এস্থলে বেদের ভাষায়ই বেদোক্ত যজ্ঞাদি উল্লেখ করিয়াছেন এবং উহার অর্থের সম্প্রসারণ করিয়াছেন। গীতামতে দেবতত্ত্ব ঈশ্বর-তত্ত্বেরই অন্তর্ভুক্ত (৯।২৩-২৪), সুতরাং দেবোদ্দেশে কৃত যজ্ঞাদিও অনাসক্তভাবে করিলে উহাতেই স্বর্গাদি লাভ না হইয়া মোক্ষ লাভ হয়, গীতার এই মত।

৩।১৫ শ্লোকে 'তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্' এ কথায় ইহাই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। বস্তুতঃ এস্থলে বেদোক্ত যজ্ঞাদির উল্লেখ থাকিলেও গীতার দৃষ্টি আধ্যাত্মিক। পরে চতুর্থ অধ্যায়ে 'যজ্ঞ' শব্দের অর্থ আরও সম্প্রসারণ করিয়া মোক্ষদৃষ্টিতে উহার প্রকৃত তত্ত্ব স্পষ্টীকৃত করা হইয়াছে (পরে 'গীতায় যজ্ঞবিধি' ৩।১২-১৬ শ্লোকের ব্যাখ্যা এবং চতুর্থ অধ্যায়ে 'গীতায় যজ্ঞতত্ত্ব' শীর্ষক পরিচ্ছেদ দ্রঃ। ৪।২৩ শ্লোকের ব্যাখ্যা)।

বেদান্তরত্ন হীরেন্দ্রনাথ দত্তও এইরূপ অভিমতই ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন—"যজ্ঞের মর্মভাব ত্যাগ, অতএব যজ্ঞার্থে কর্ম করার এরূপ অর্থও অসঙ্গত নহে যে ত্যাগের ভাবে কর্মানুষ্ঠান করা। এইরূপ কর্মানুষ্ঠান যখন অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন মানব-জীবন একটি মহাযজ্ঞের আকার ধারণ করে। সেই যজ্ঞের বেদী জগতের হিত, ত্যাগ, আত্মবলিদান এবং যজ্ঞেশ্বর স্বয়ং ভগবান্।"

লোকমান্য তিলকের মতে এ শ্লোকে 'যজ্ঞ' শব্দে বেদোক্ত যজ্ঞাদিই বুঝায়। তিনি বলেন, এই শ্লোকের প্রথম চরণে যজ্ঞ সম্বন্ধে মীমাংসকদিগের মত এবং দ্বিতীয় চরণে গীতার সিদ্ধান্ত উক্ত হইয়াছে। মীমাংসকগণ বলেন, বেদ যাগযজ্ঞাদি কর্ম মানুষের জন্য নিয়ত করিয়া দিয়াছেন এবং সৃষ্টিরক্ষার জন্য ইহা বজায় রাখা আবশ্যক। যজ্ঞ করিতে হইবে—ইহা বেদেরই আদেশ, সুতরাং যজ্ঞার্থ যে কর্ম উহাতে কর্তার বন্ধন হইতে পারে না। এই কথাই এই শ্লোকের প্রথম চরণে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু গীতা ও ভাগবত শাস্ত্র বলেন, যজ্ঞও তো কর্মই এবং যজ্ঞাদির স্বর্গপ্রাপ্তিরূপ ফল যে শাস্ত্রে আছে তাহাও না হইয়া পারে না; কিন্তু স্বর্গপ্রাপ্তিরূপ ফল মোক্ষপ্রাপ্তির বিরোধী (গীতা ২।৪২-৪৪, ৯।২০-২১)। এই হেতু এই শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে আবার বলা হইয়াছে যে, মনুষ্যের যজ্ঞার্থ যাহা কিছু নিয়ত কর্ম করিতে হয় তাহাও কামনা ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ কেবল কর্তব্য বুঝিয়া করিবে এবং এই অর্থেরই প্রতিপাদন পরে সাত্ত্বিক যজ্ঞের ব্যাখ্যা করিবার সময় করা হইয়াছে (১৭।১১)। যজ্ঞচক্র ব্যতীত জগতের ব্যবহার বজায় থাকিতে পারে না, ইহা গীতারও মান্য ও পরবর্তী শ্লোকসমূহে তাহাই উক্ত হইয়াছে। স্মরণ রাখিতে হইবে 'যজ্ঞ' শব্দ এখানে কেবল শ্রৌত যজ্ঞেরই অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই, উহাতে স্মার্ত যজ্ঞের এবং চাতুর্বর্ণ্যাদি যথাধিকার সমস্ত ব্যবহারিক কর্মের সমাবেশ আছে। বস্তুতঃ, এই স্থলে বর্ণিত যজ্ঞচক্র পরে ২০শ শ্লোকে বর্ণিত **'লোক-সংগ্রহের'ই এক আকার** (গীতারহস্য)।

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ১০

বস্তুতঃ, এই শ্লোকে ও পরবর্তী শ্লোকসমূহে 'যজ্ঞ' শব্দ এক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। তবে মনে রাখিতে হইবে, বৈদিক যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ড সমস্তই রূপকাত্মক, উহাদের অন্তর্নিহিত গূঢ় অর্থ আছে। যজ্ঞের মূল কথা হইতেছে,—পরার্থে, লোকরক্ষার্থে, ঈশ্বরের সৃষ্টি রক্ষার্থে আত্মোৎসর্গ, ত্যাগ। এইরূপ ত্যাগের দ্বারা, পরস্পর আদান-প্রদানের দ্বারাই লোকরক্ষা হয়। গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মের উদ্দেশ্য তাহাই, এই হেতু উহা যথার্থ কর্ম। পরবর্তী শ্লোকসমূহে এই মূলতত্ত্বই বৈদিক যজ্ঞাদির বর্ণনায় পরিস্ফুট করা হইয়াছে (হীরেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রণীত 'গীতায় যজ্ঞতত্ত্ব', ৪।২৩ শ্লোক ও উহার ব্যাখ্যা দ্রঃ)।

১০। পুরা (পূর্বে, সৃষ্টির প্রারম্ভে) প্রজাপতিঃ (ব্রহ্মা) সহযজ্ঞাঃ (যজ্ঞের সহিত) প্রজাঃ সৃষ্ট্বা (প্রজাসকল সৃষ্টি করিয়া) উবাচ (বলিয়াছিলেন), অনেন (এই যজ্ঞদ্বারা) প্রসবিষ্যধ্বম্ (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও), এষঃ (এই যজ্ঞ) বঃ (তোমাদিগের) ইষ্টকামধুক্ (অভীষ্ট ভোগপ্রদ) অস্তু (হউক)।

সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রজা সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন—তোমরা এই যজ্ঞদ্বারা উত্তরোত্তর বর্ধিত হও; এই যজ্ঞ তোমাদের অভীষ্টপ্রদ হউক। ১০

সহযজ্ঞাঃ—'যজ্ঞের সহিত প্রজা সৃষ্টি করিলেন'—এ কথার অর্থ এই যে, যখন প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করেন, তখন প্রজারক্ষার্থ তাঁহাদের কর্মনীতিও নির্দেশ করেন, উহার সাধারণ নাম যজ্ঞ।

শাস্ত্রে কোথাও আছে ব্রহ্মদেব যজ্ঞার্থই চাতুর্বর্ণ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, কোথাও আছে লোকসকলের ধারণ-পোষণের জন্য যজ্ঞচক্রের বা প্রবৃত্তিপ্রধান ধর্মের সৃষ্টি করিয়াছেন। এ সকল কথার মর্ম এই যে, লোকসৃষ্টি ও লোকরক্ষার জন্য কর্মকাণ্ড সৃষ্টি এক সঙ্গেই হইয়াছে। মহাভারতে আছে—'চাতুর্বর্ণ্যস্য কর্মাণি চাতুর্বর্ণ্যঞ্চ কেবলম্। অসৃজৎ স হি যজ্ঞার্থে পূর্বমেব প্রজাপতিঃ'—পূর্বকালে প্রজাপতি যজ্ঞের নিমিত্ত চাতুর্বর্ণ্যের কর্মসমূহ এবং কেবল চাতুর্বর্ণ্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। (মভা, অনু. ৪৮, ৩)। অপিচ. মভা. শাং. ৩৩৬, ৩৩৭, মনু ১১।২৩৬ দ্রঃ)।

প্রজাপতি-কথিত যজ্ঞতত্ত্বের অর্থাৎ পরস্পর আদান-প্রদান ও ত্যাগের ভিত্তি অবলম্বন করিয়াই পরবর্তী কালে কর্মকাণ্ডের বিধি-ব্যবস্থা হইয়াছে এবং সে

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২

সমস্তই প্রজাপতির নামোল্লেখে চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এইরূপই আমাদের শাস্ত্রকারগণের রীতি। প্রজাপতি সৃষ্টিকালেই যে এই বিপুল কর্মকাণ্ডের তালিকা নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন, ইহা মনে না করিলেও চলে।

কিন্তু গীতায় কাম্য কর্মের স্থান নাই। এ যজ্ঞ কি কাম্য কর্ম নয়? না, প্রজাপতি একথা বলেন নাই যে, তোমরা ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া যজ্ঞ কর। তিনি বলিয়াছেন, তোমরা লোকরক্ষার্থ কর্তব্যানুরোধেই নিয়মিত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিবে, কিন্তু ফলের কামনা না করিলেও কর্মের স্বভাবগুণেই উহা স্বতঃই প্রাপ্ত হইবে। ফলের কামনায় লোকে আম্রবৃক্ষ রোপণ করে; কিন্তু ছায়া ও মুকুলের সুগন্ধ কামনা না করিয়াও পায় (মধুসূদন)।

১১। অনেন (এই যজ্ঞদ্বারা) [তোমরা] দেবান্ (দেবগণকে) ভাবয়ত (সংবর্ধন কর), তে দেবাঃ (সেই দেবগণ) বঃ ভাবয়ন্তু (তোমাদিগকে সংবর্ধিত করুন); [এইরূপে] পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ (পরস্পরের সংবর্ধনা দ্বারা) পরং শ্রেয়ঃ (পরম মঙ্গল) অবাপ্স্যথ (লাভ করিবে)।

এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা দেবগণকে (ঘৃতাহুতি প্রদানে) সংবর্ধনা কর, সেই দেবগণও (বৃষ্ট্যাদি দ্বারা) তোমাদিগকে সংবর্ধিত করুন; এইরূপে পরস্পরের সংবর্ধনা দ্বারা পরম মঙ্গল লাভ করিবে। ১১

দেবগণ বৃষ্ট্যাদি দ্বারা পৃথিবী শস্যশালিনী করেন, লোকরক্ষা করেন। তাঁহারা হবির্ভোজী। মনুষ্যের যজ্ঞাদি দ্বারা তাঁহাদিগকে সংবর্ধনা করা উচিত। ইহাই দৈবযজ্ঞ। ইহা কর্তব্য, ত্যাজ্য নহে। ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া অনাসক্ত চিত্তে ইহা করিতে হয়, ইহাই গীতার মত (১৮।৫-৬)।

১২। হি (যেহেতু), দেবাঃ যজ্ঞভাবিতাঃ [সন্তঃ] (যজ্ঞদ্বারা সংবর্ধিত হইয়া) ইষ্টান্ ভোগান্ (অভীষ্ট ভোগ্যবস্তু সকল) বঃ দাস্যন্তে (তোমাদিগকে দিবেন); তৈঃ দত্তান্ [ভোগান্] (তাঁহাদিগের প্রদত্ত ভোগ্যবস্তু সকল) এভ্যঃ অপ্রদায় (তাঁহাদিগকে প্রদান না করিয়া) যঃ ভুঙ্‌ক্তে (যে ভোগ করে) সঃ স্তেনঃ এব (সে নিশ্চয়ই চোর)।

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩

যেহেতু, দেবগণ যজ্ঞাদিদ্বারা সংবর্ধিত হইয়া তোমাদিগকে অভীষ্ট ভোগ্যবস্তু প্রদান করেন, সুতরাং তাঁহাদিগের প্রদত্ত অন্নপানাদি যজ্ঞাদি দ্বারা তাহাদিগকে প্রদান না করিয়া যে ভোগ করে সে নিশ্চয়ই চোর (দেবস্বাপহারী)। ১২

১৩। যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ (যজ্ঞাবশেষ-ভোজী) সন্তঃ (সজ্জনগণ) সর্বকিল্বিষৈঃ মুচ্যন্তে (সর্বপাপ হইতে মুক্ত হন); যে তু (কিন্তু যাহারা) আত্মকারণাৎ পচন্তি (কেবল নিজের জন্য পাক করে) তে পাপাঃ (সেই পাপিষ্ঠগণ) অঘং ভুঞ্জতে (পাপ ভোজন করে)।

যে সজ্জনগণ যজ্ঞাবশেষ অন্ন ভোজন করেন অর্থাৎ দেবতা অতিথি প্রভৃতিকে অন্নাদি প্রদান করিয়া অবশিষ্ট ভোজন করেন, তাঁহারা সর্বপাপ হইতে মুক্ত হন। যে পাপাত্মারা কেবল আপন উদর-পূরণার্থ অন্ন পাক করে, তাহারা পাপরাশিই ভোজন করে। ১৩

ঋগ্বেদে এবং মনুসংহিতাতেও ঠিক এইরূপ কথা আছে ('কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী'—ঋক্ ১০, ১১৭, ৬; 'অঘং স কেবলং ভুংক্তে যঃ পচত্যাত্মকারণাৎ' মনু ৩।১১৮। কুটুম্ব, অতিথি প্রভৃতির ভোজন হইবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাকে 'বিঘস' এবং যজ্ঞ হইবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাকে 'অমৃত' বলে। গৃহস্থের প্রতিদিন এই ভুক্তাবশিষ্ট এবং যজ্ঞাবশিষ্ট বস্তুদ্বারাই জীবনরক্ষা করিতে হয়, নচেৎ সে প্রতিগ্রাসে পাপ সঞ্চয় করে ('বিঘসাশী ভবেন্নিত্যং নিত্যং বামৃতভোজনঃ। বিঘসো ভুক্তশেষন্তু যজ্ঞশেষং তথামৃতম্' ॥—মনু)

পঞ্চমহাযজ্ঞ। প্রাচীন টীকাকারগণ বলেন, এস্থলে 'যজ্ঞ' শব্দে হিন্দুর নিত্যকর্তব্য পঞ্চ মহাযজ্ঞকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

মানুষ, জীবনরক্ষার্থ অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রাণিহিংসা করিতে বাধ্য হয়। শাস্ত্রকারগণ গৃহস্থের পাঁচ প্রকার 'সূনা' অর্থাৎ জীবহিংসাস্থানের উল্লেখ করেন। যথা—"কণ্ডনী পেষণী চুল্লী উদকুম্ভী চ মার্জনী" (উদূখল, জাঁতা, চুল্লী, জলকুম্ভ ও ঝাঁটা)। এগুলি গৃহস্থের নিত্য-ব্যবহার্য, অথচ এগুলিতে কীটপতঙ্গাদি প্রাণিবধও অনিবার্য, সুতরাং তাহাতে পাপও অবশ্যম্ভাবী। এই পাপমোচনার্থ পঞ্চমহাযজ্ঞের ব্যবস্থা, "পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য পঞ্চযজ্ঞাৎ প্রণশ্যতি।" পঞ্চ যজ্ঞ কি? 'অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্। হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্ ॥'

অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ॥ ১৪
কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥ ১৫
এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥ ১৬

অধ্যাপনা (এবং সন্ধ্যোপাসনাদি) ব্রহ্মযজ্ঞ বা ঋষিযজ্ঞ, তর্পণাদি পিতৃযজ্ঞ, হোমাদি দৈবযজ্ঞ, কাকাদি জীবজন্তুকে খাদ্য প্রদান ভূতযজ্ঞ, অতিথি-সৎকার নৃযজ্ঞ। মানুষের সকলের প্রতিই কর্তব্য আছে, এই কর্তব্যকেই শাস্ত্রে 'ঋণ' বলে। ত্যাগমূলক পঞ্চযজ্ঞদ্বারা পিতৃঋণ, দেবঋণ ইত্যাদি পরিশোধ করিতে হয়। উদ্দেশ্য উদার, আদর্শ উচ্চ—দৃষ্টি 'বিশ্বমানবের'ও উপরে, বিশ্বাত্মার দিকে। ব্যবস্থা হিন্দুশাস্ত্রেরই যোগ্য। কিন্তু বুঝে কে? বুঝিয়া কাজ করে কে? যেটুকু আছে কেবল বাহ্য। "আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু"—(ব্রহ্মা হইতে তৃণশিখা পর্যন্ত সমস্ত জগৎ মদ্দত্ত সলিলদ্বারা তৃপ্ত হউক) মন্ত্র পড়িয়া জলের ছিটা দিয়া আহারে বসিলাম। কিন্তু কি দুর্দৈব। বিড়ালটি আসিয়া হঠাৎ জলপাত্রে মুখ দিয়াছে। অমনি কাষ্ঠ-পাদুকার নিদারুণ প্রহার। বেচারী সেই প্রহারেই গৃহ ছাড়িল। আমার হিন্দুয়ানির কোন ক্ষতি হইল না, কিন্তু হিন্দুত্বের শেষ। বস্তুতঃ, ভূতযজ্ঞাদির মন্ত্রগুলির উদার ভাব স্মরণ করিলে বঙ্কিমচন্দ্রের কথাটাই মনে পড়ে—'আমরা কি সেই হিন্দু?'

১৪-১৬। অন্নাৎ (অন্ন হইতে) ভূতানি ভবন্তি (প্রাণিসকল উৎপন্ন হয়), পর্জন্যাৎ (মেঘ হইতে) অন্নসম্ভবঃ (অন্নের উৎপত্তি[হয়]), যজ্ঞাৎ (যজ্ঞ হইতে) পর্জন্যঃ ভবতি (মেঘ জন্মে), যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ (যজ্ঞ কর্ম হইতে উৎপন্ন); কর্ম (কর্ম) ব্রহ্মোদ্ভবং (বেদ হইতে উৎপন্ন), ব্রহ্ম (বেদ) অক্ষরসমুদ্ভবং (পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন) বিদ্ধি (জানিও); তস্মাৎ (সেই হেতু) সর্বগতং ব্রহ্ম (সর্বব্যাপী পরব্রহ্ম) নিত্যং (সদা) যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ (যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন)। হে পার্থ, ইহ (ইহলোকে) এবং প্রবর্তিতং (এইরূপে প্রবর্তিত) চক্রং (কর্মচক্র, জগচ্চক্র) যঃ (যে) ন অনুবর্তয়তি (অনুবর্তন না করে), ইন্দ্রিয়ারামঃ (ইন্দ্রিয় সুখাসক্ত) অঘায়ুঃ (পাপজীবন) সঃ (সেই ব্যক্তি) মোঘং জীবতি (বৃথা জীবন ধারণ করে)।

প্রাণিসকল অন্ন হইতে উৎপন্ন হয়, মেঘ হইতে অন্ন জন্মে, যজ্ঞ হইতে মেঘ জন্মে, কর্ম হইতে যজ্ঞের উৎপত্তি, কর্ম বেদ হইতে উৎপন্ন জানিও এবং বেদ পরব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভূত ; সেই হেতু সর্বব্যাপী পরব্রহ্ম সদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। এইরূপে প্রবর্তিত জগচ্চক্রের যে অনুবর্তন না করে, (অর্থাৎ যে যজ্ঞাদি কর্মদ্বারা এই সংসার-চক্র পরিচালনের সহায়তা না করে) সে ইন্দ্রিয়সুখাসক্ত ও পাপজীবন ; হে পার্থ, সে বৃথা জীবন ধারণ করে। ১৪-১৬

শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামীর অনুসরণে ১৫শ শ্লোকে প্রথম চরণে ব্রহ্ম শব্দের 'বেদ' এবং দ্বিতীয় চরণে ব্রহ্ম শব্দের 'পরব্রহ্ম' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। ব্রহ্ম অর্থ 'প্রকৃতি'ও হয় (১৪।৩)

শ্রীমৎ রামানুজাচার্য ও লোকমান্য তিলক এই শ্লোকের সর্বত্রই ব্রহ্ম শব্দের 'প্রকৃতি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা হইলে অর্থ এই যে, প্রকৃতি হইতে কর্ম এবং পরমেশ্বর হইতে প্রকৃতি উৎপন্ন হইয়াছে এবং সমস্ত জগৎ-সৃষ্টি ('সর্বগতং ব্রহ্ম') যজ্ঞকে আশ্রয় করিয়াই বর্তমানে আছে। 'অনুযজ্ঞং জগৎ সর্বম্'—মভা শা, ২৬৭)।

শ্রীঅরবিন্দ 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ করেন 'প্রকৃতিতে ক্রিয়াশীল সগুণ ব্রহ্ম'। ইহার ব্যাখ্যা ৯৮ পৃষ্ঠায় 'গীতায় যজ্ঞবিধি' শীর্ষক পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

জগচ্চক্র। ঈশ্বর-প্রবর্তিত এই কর্মপ্রবাহ চক্রবৎ আবর্তিত হইয়া জগৎকে চালাইতেছে, এই জন্য ইহাকে জগচ্চক্র বা সংসার বলা হয়। চক্রটি কিরূপে চলিতেছে দেখা যাউক। এই প্রাণি-শরীর কিরূপে উৎপন্ন হয়?—অন্ন হইতে। ভুক্ত অন্নই শুক্র-শোণিতরূপে পরিণত হয়, তাহা হইতে জীবোৎপত্তি। অন্ন (শস্য) জন্মে মেঘ হইতে ; মেঘ জন্মে যজ্ঞ হইতে। কিরূপে?—যজ্ঞের ধূমে মেঘ হয়, যাহা হইতে বৃষ্টি হয় ; দেবতাগণ যজ্ঞদ্বারা সংবর্ধিত হইয়া বৃষ্টি প্রদান করেন, এরূপ-কথাও প্রসিদ্ধ। যজ্ঞের উদ্ভব কোথায়? ঋত্বিক্-যজমানের কর্মবিশেষই যজ্ঞ, সুতরাং কর্ম হইতে। কর্মের উদ্ভব কোথা হইতে? বেদ হইতে। বেদের উদ্ভব কোথা হইতে? পরব্রহ্ম হইতে—'তব নিঃশ্বসিতং বেদাঃ'। এইভাবে জগচ্চক্রের গতি। যজ্ঞাদি কর্ম না করিলে এই জগচ্চক্র বা সৃষ্টি রক্ষা হয় না।

যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি হয়—ইহা অবশ্য ঠিক বৈজ্ঞানিক সত্য নয়। তবে মনে রাখিতে হইবে—জলীয় বাষ্প ও যজ্ঞীয় বাষ্প উভয়ই মেঘ। স্থূলকথা এই—

দেবগণ বৃষ্ট্যাদি দ্বারা নরলোকের হিতসাধন করেন, সুতরাং মনুষ্যের কর্তব্য দেবলোকের পুষ্টিসাধন করা। তাহার উপায় যজ্ঞানুষ্ঠান—কারণ দেবগণ হবির্ভোজী।

অবশ্য যাঁহারা দেবতা ও দেবলোকে বিশ্বাসবান্ নহেন, তাঁহাদের নিকট এ শ্লোকগুলির বিশেষ মূল্য নাই। কিন্তু দেবতত্ত্ব গীতায়ও স্বীকৃত, তাঁহারা প্রকৃতিতে ভগবানেরই শক্তি। গীতার অন্যত্রও যজ্ঞাদির প্রশংসা আছে। সুতরাং বিষয়টির সম্যক্ আলোচনা আবশ্যক (পরে 'গীতায় যজ্ঞবিধি' ও 'গীতায় যজ্ঞতত্ত্ব' ৪।২৩ দ্রষ্টব্য)।

গীতায় যজ্ঞবিধি। যাগযজ্ঞ স্বর্গাদি ফলপ্রদ বটে, কিন্তু উহা মোক্ষপ্রদ নহে এবং গীতার অনুমোদিত নহে (২।৪২-৪৪, ৮।২৭, ৯।২, ৯।২০-২১)। কিন্তু পূর্বোক্ত কয়েকটি শ্লোকে (৩।১০-১৬) বেদোক্ত যজ্ঞাদি কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। গীতার অন্যত্রও যজ্ঞাদির প্রশংসাবাদ আছে (৪।৩১-৩২, ১৭।২৪-২৫)। যজ্ঞাদির কর্তব্যতা সম্বন্ধে এইরূপ বিভিন্ন মত আপাততঃ পরস্পর-বিরোধী বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ, তাহা নহে। গীতা সকাম-যজ্ঞেরই বিরোধী, নিষ্কাম-যজ্ঞের বিরোধী নহে। যজ্ঞ, দান ও তপস্যা—এই সকল কর্ম চিত্তশুদ্ধিকর, উহা অবশ্যকর্তব্য; কিন্তু আসক্তি ও ফলকামনা ত্যাগ করিয়া এই সকল কর্ম করিতে হইবে, ইহাই গীতার মত (১৮।৫-৬)। অন্যত্র, যজ্ঞাদিও ভগবদুদ্দেশেই কর্তব্য; এবং তিনিই সকল যজ্ঞের ভোক্তা, এ কথাও আছে (৯।২৭, ৯।২৪)। বস্তুতঃ, অনাসক্তি, ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ, শ্রীকৃষ্ণে সর্বকর্ম সমর্পণ ইত্যাদি নিষ্কাম কর্মের যাহা মূলকথা, যজ্ঞকর্মেও তাহাই প্রযোজ্য। পূর্বে যে পঞ্চযজ্ঞাদির উল্লেখ আছে তাহা সকলই ত্যাগমূলক, কামনামূলক নহে। সুতরাং ঐ সকল গীতোক্ত ধর্মের বিরোধী নয়। চতুর্থ অধ্যায়ে 'যজ্ঞ' শব্দ আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, সে সকলেরই মূলে ত্যাগ ও সংযম। (৪।২৫-৩৩)।

এ প্রসঙ্গে **শ্রীঅরবিন্দ** বলেন, এ শ্লোকগুলিতে যে যজ্ঞের বিধান আছে তাহাতে যদি আমরা কেবল আনুষ্ঠানিক যজ্ঞই বুঝি তাহা হইলে আমরা গীতোক্ত কর্ম-তত্ত্ব ঠিকরূপ বুঝিতে পারিব না; বস্তুতঃ, এই শ্লোকগুলির মধ্যে গভীর গূঢ়ার্থ আছে। ১৫শ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম হইতে কর্ম সমুদ্ভূত হয়। এই ব্রহ্ম শব্দে শব্দব্রহ্ম বা বেদ বুঝায় না—"এই ব্রহ্ম প্রকৃতির ক্রিয়ার মধ্যস্থিত সক্রিয় সগুণ ব্রহ্ম—ইনি অক্ষর, সম, শান্ত, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভূত অর্থাৎ তাঁহারই এক বিভাব—ইনি ক্ষরজগতে সকল কর্মের স্রষ্টা ও

উদ্ভবকর্তা—প্রকৃতিতে ক্রিয়াশীল পুরুষ। ভগবান্ পুরুষোত্তমের দুই বিভাব—সর্বগুণের অতীত অক্ষরই তাঁহার সমতার অবস্থা—তথা হইতেই প্রকৃতির গুণে ও বিশ্বলীলার মধ্যে তাঁহার আত্মপ্রকাশ; এই প্রকৃতিস্থ পুরুষ হইতে, এই সগুণ ব্রহ্ম হইতে—বিশ্বশক্তির সমস্ত কর্মের উৎপত্তি; এই কর্ম হইতেই যজ্ঞের তত্ত্ব উদ্ভূত। এমন কি, দেবতা ও মনুষ্যগণের মধ্যে যে দ্রব্যাদির আদান-প্রদান তাহাও এই তত্ত্বেরই অনুসরণে ঘটিয়া থাকে। যথা—যে বৃষ্টি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়, সেই বৃষ্টি এই কর্মের উপর নির্ভর করে এবং অন্ন হইতে ভূতগণের শরীরের উদ্ভব হয়। কারণ প্রকৃতির সকল ক্রিয়াই প্রকৃতপক্ষে যজ্ঞ এবং ভগবান্ই সকল কর্ম ও যজ্ঞের ভোক্তা এবং সর্বভূতের মহেশ্বর ('ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বভূতমহেশ্বরম্')। এই 'সর্বগতং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্' ভগবান্‌কে জানাই প্রকৃত বৈদিকজ্ঞান। পরম শ্রেয়ঃ তখনই লাভ করা যায়, যখন আর শুধু দেবগণের উদ্দেশে যজ্ঞ না করিয়া সেই সর্বব্যাপী যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত পরমেশ্বরের উদ্দেশে করা হয়। পরম শ্রেয়োলাভ তখনই হয়, যখন মানুষ নিম্ন প্রকৃতির কামনা পরিত্যাগ করে, নিজে সমস্ত করিতেছে এই অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতিকেই সকল কর্মের প্রকৃত কর্ত্রী বলিয়া বুঝিতে পারে এবং নিজেকে ভোক্তা বলিয়া মনে না করিয়া বিশ্বাত্মা পরম পুরুষকেই প্রকৃতির সকল কার্যের ভোক্তা বলিয়া উপলব্ধি করে। নিজের ব্যক্তিগত ভোগ নহে, কিন্তু পরমাত্মাতেই তখন পরম শান্তি, তৃপ্তি ও বিমল আনন্দ ভোগ করে। তখন কর্ম ও কর্মশূন্যতায় তাহার লাভালাভ থাকে না—কিন্তু সে শুধু ভগবানের জন্যেই যজ্ঞরূপে আসক্তি ও কামনাশূন্য হইয়া কর্ম করে। এইরূপে যজ্ঞ হয় তাহার পরম শ্রেয়োলাভের পথ।"

—শ্রীঅরবিন্দের গীতা (সংক্ষিপ্ত সারোদ্ধার)।

"বাস্তবিক যজ্ঞের প্রধান উপাদান ত্যাগ। প্রজাপতি যে বিরাট্ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, পুরুষ-সূক্তে তাহার ইঙ্গিত করা আছে। সে মহাযজ্ঞ আর কিছুই নহে, জীবের হিতার্থ ভগবানের বিপুল আত্মত্যাগ। এইরূপ জগতের পোষণের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যে ত্যাগ, আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাহাকেই যজ্ঞ নামে অভিহিত করিতেন। যজ্ঞকে এখন আমরা 'যগ্‌গিতে' পরিণত করিয়াছি; একটা ধূমধাম হৈ চৈ ব্যাপারই আমাদের দৃষ্টিতে যজ্ঞ। যজ্ঞের কিন্তু আদিম অর্থ এরূপ নহে। যজ্ঞের মর্মভাব ত্যাগ (sacrifice)"। —বেদান্তরত্ন ৺হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

রহস্য—যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞাদি

প্রশ্ন—যজ্ঞের আদিম অর্থ যাহাই হউক, যজ্ঞোপলক্ষে রাজসিক "ধুমধাম হৈ চৈ" ব্যাপার সেকালেও ছিল। বড় বড় রাজারা আড়ম্বরের সহিত রাজসূয়, অশ্বমেধ যজ্ঞাদি করিতেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরও রাজসূয় যজ্ঞাদি করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সম্মতি ও উপদেশক্রমেই তাহা সম্পন্ন হইয়াছিল। গীতোক্ত ধর্মের সহিত উহার সামঞ্জস্য কোথায়?

উত্তর। কামনামূলক রাজসিক যজ্ঞাদি তখনও ছিল, একথা ঠিক। গীতায়ও সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ত্রিবিধ যজ্ঞের উল্লেখ আছে এবং ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত অবশ্যকর্তব্য বোধে অনুষ্ঠিত সাত্ত্বিক যজ্ঞের প্রশংসা আছে (১৭।১১-১৩)। গীতায় কাম্য-কর্মের স্থান নাই। রাজসূয় যজ্ঞ 'কাম্য-কর্ম' বটে এবং যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শক্রমেই উহার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, কিন্তু নিষ্কামভাবে, কর্তব্যানুরোধে। এ সম্বন্ধে যুধিষ্ঠির কি বলেন, দেখুন—

'নাহং কর্মফলান্বেষী রাজপুত্রি চরাম্যুত।'
'দদামি দেয়মিত্যেব যজে যষ্টব্যমিত্যুত॥'
'ধর্ম-বাণিজ্যকো হীনো জঘন্যো ধর্মবাদিনাম্।'—বনপর্ব ৩১।২৫

'রাজপুত্রি, আমি কর্মফলান্বেষী হইয়া কোন কর্ম করি না; দান করিতে হয় তাই দান করি, যজ্ঞ করিতে হয় তাই যজ্ঞ করি; ধর্মাচরণের বিনিময়ে যে ফল চাহে, সে ধর্মবণিক, ধর্মকে সে পণ্যদ্রব্য করিয়াছে। সে হীন, জঘন্য।'

শ্রীকৃষ্ণানুগতপ্রাণ, শ্রীকৃষ্ণভক্তের উপযুক্ত কথাই বটে, কিন্তু এই ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত রাজসূয় যজ্ঞের অবশ্যকর্তব্যতা হইল কিসে? তাহা বুঝা যায় শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে (মভা, সভা ১৪।১৫শ অঃ)। ইহার উদ্দেশ্য প্রধানতঃ জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি ধর্মদ্বেষী অত্যাচারী 'অসুরগণ'কে নত বা নিহত করিয়া একচ্ছত্র ধর্মরাজ্য সংস্থাপন (৪।৮)। এই জরাসন্ধ এক শত রাজাকে বলিদান করিয়া এক নিদারুণ রাজসূয় বা 'রাজমেধ' যজ্ঞ করিবার আয়োজন করিয়াছিল। এ জন্য ৮৬ জন নৃপতি পরাজিত, ধৃত ও শৃঙ্খলিত হইয়া মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছিলেন। শত সংখ্যা পূর্ণ হইলেই এই পাশবিক যজ্ঞ সংঘটিত হইত। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজনে উহা ব্যর্থ হইল। যুদ্ধাবসানে যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞও করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণেরই আদেশে। এ সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ যে অনুপম ধর্মোপদেশ প্রদান করেন তাহা 'কামগীতা' নামে প্রসিদ্ধ।

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে॥ ১৭

কামনা ও অহংকার বর্জনই উহার প্রধান কথা। বনগমনোন্মুখ শোককাতর ধর্মরাজকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"বিষয়-ত্যাগে কামনা ত্যাগ হয় না, বনে যাইও না, অনাসক্ত ভাবে রাজধর্ম পালন কর; সাত্ত্বিক যজ্ঞ, দান, তপস্যাদি চিত্তশুদ্ধিকর কর্মদ্বারা কামনা ত্যাগের চেষ্টা কর।" রোগানুযায়ী ঔষধের ব্যবস্থা। এ ত গীতারই কথা, সুতরাং গীতোক্তধর্মের সহিত কোথাও অসামঞ্জস্য নাই। কিন্তু ঈদৃশ অশ্বমেধ যজ্ঞ অপেক্ষাও যে বিশুদ্ধ ত্যাগ-লক্ষণ নৃযজ্ঞাদির শ্রেষ্ঠতা কম নহে, মহাভারতকার স্বর্ণনকুল-উপাখ্যানে তাহাও প্রদর্শন করিয়াছেন।

স্বর্ণনকুল উপাখ্যানটি কি?—এক নকুল যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞস্থলে আসিয়া অবিরত লুণ্ঠিত হইতেছিল। দেখা গেল, নকুলটির মুখ ও শরীরের অর্ধাংশ স্বর্ণময়। অদ্ভুত জীবটির অদ্ভুত কর্মের কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে নকুল বলিল,—দেখিলাম কুরুক্ষেত্রে এক উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ সপরিবারে উপবাসী থাকিয়া অতিথিকে সঞ্চিত সমস্ত যবচূর্ণ প্রদান করিলেন। সেই অতিথির ভোজনপাত্রে যৎকিঞ্চিৎ উচ্ছিষ্ট অবশিষ্ট ছিল, সেই পবিত্র যবকণার সংস্পর্শে আমার মুখ ও দেহার্ধ স্বর্ণময় হইয়াছে ('যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ', 'যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো' ইত্যাদি দ্রষ্টব্য (৩।১৩, ৪।৩০)। অপরার্ধ স্বর্ণময় করিবার জন্য আমি নানা যজ্ঞস্থলে যাইয়া লুণ্ঠিত হইলাম, কিন্তু দেখিলাম এ যজ্ঞ অপেক্ষা সেই ব্রাহ্মণের শক্তুযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ (কেননা আমার দেহ স্বর্ণময় হইল না)।

১৭। যঃ তু মানবঃ (কিন্তু যে ব্যক্তি), আত্মরতিঃ এব (আত্মাতেই প্রীত), আত্মতৃপ্তঃ চ (এবং আত্মাতেই পরিতৃপ্ত), আত্মনি এব চ সন্তুষ্টঃ (আত্মাতেই সন্তুষ্ট) স্যাৎ (হন), তস্য কার্যং ন বিদ্যতে (তাঁহার কিছু কর্তব্য নাই)।

আত্মরতি—আত্মাতে যাহার আসক্তি বা প্রীতি, বিষয়ে নয়।

আত্মতৃপ্ত—আত্মাতেই যিনি তৃপ্ত, অন্য ভোগ্য বস্তু-নিরপেক্ষ।

আত্মসন্তুষ্ট—আত্মাতেই যাঁহার সুখ, বিষয়ে নয়। ইহারাই আত্মারাম।

আত্মতৃপ্ত জ্ঞানী ব্যক্তির নিজের কোন কর্ম নাই, কোন স্বার্থ নাই, সেইরূপ নিষ্কামভাবে কর্তব্য কর্ম করিবে ১৭-১৯

কিন্তু যিনি কেবল আত্মাতেই প্রীত, যিনি আত্মাতেই তৃপ্ত, যিনি কেবল আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁহার নিজের কোন প্রকার কর্তব্য নাই। ১৭

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮
তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ ॥ ১৯

এইরূপ আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ 'আত্মারাম' পদবাচ্য। বস্তুতঃ ইঁহারা কর্মাকর্ম-নিরপেক্ষ মুক্ত পুরুষ। পূর্বোক্ত যজ্ঞাদিতে ইঁহাদের নিজেদের কোন প্রয়োজন নাই, কেবল লোকশিক্ষার্থ ও লোকরক্ষার্থ ইঁহারা কর্ম করিয়া থাকেন।

১৮। ইহ (এই জগতে) কৃতেন (কর্মানুষ্ঠান দ্বারা) তস্য (তাঁহার) অর্থঃ ন এব (প্রয়োজন নাই), অকৃতেন চ (কর্মের অকরণেও) কশ্চন (কোনও) [অর্থঃ (প্রয়োজন)] ন (নাই)। সর্বভূতেষু(সর্বভূতে) কশ্চিৎ (কেহ) অস্য (ইহার) অর্থব্যপাশ্রয়ঃ ন (স্বপ্রয়োজনে আশ্রয়ণীয় নাই)।
অর্থব্যপাশ্রয়ঃ—অর্থাৎ স্বপ্রয়োজনায় ব্যপাশ্রয়ঃ আশ্রয়ণীয়ঃ, মোক্ষার্থ আশ্রয়ণীয়।

যিনি আত্মারাম তাঁহার কর্মানুষ্ঠানে কোন প্রয়োজন নাই, কর্ম হইতে বিরত থাকারও কোন প্রয়োজন নাই। সর্বভূতের মধ্যে কাহারও আশ্রয়ে তাঁহার প্রয়োজন নাই (তিনি কাহারও আশ্রয়ে সিদ্ধকাম হইবার আবশ্যকতা রাখেন না)। ১৮

কর্ম করা না করা ইঁহাদের পক্ষে উভয়ই সমান। কাজেই ইঁহারা সম্পূর্ণ স্বার্থাভিসন্ধিশূন্য হইয়া যথাপ্রাপ্ত কর্ম করিতে পারেন। তুমিও তদ্রূপ অনাসক্তভাবে স্বীয় কর্তব্য কর্ম করিবে (পরের শ্লোক)।

১৯। তস্মাৎ (অতএব) অসক্তঃ (অনাসক্ত হইয়া) সততম্ (সর্বদা) কার্যং কর্ম (কর্তব্য কর্ম) সমাচর (অনুষ্ঠান কর); হি (যেহেতু) পুরুষঃ অসক্তঃ [সন্] (নিষ্কাম হইয়া) কর্ম আচরন্ (কর্ম করিলে) পরম্ (পরমপদ, মোক্ষ) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন)।

অতএব তুমি আসক্তিশূন্য হইয়া সর্বদা কর্তব্যকর্ম সম্পাদন কর, কারণ অনাসক্ত হইয়া কর্মানুষ্ঠান করিলে পুরুষ পরমপদ (মোক্ষ) প্রাপ্ত হন। ১৯

জ্ঞানীর কর্ম—১৭।১৮।১৯ এই তিনটি শ্লোক পরস্পর হেতু-অনুমান-যুক্ত, সুতরাং একসঙ্গে ধরিতে হইবে। ১৭।১৮ শ্লোকে আত্মনিষ্ঠ আত্মতৃপ্ত জ্ঞানী পুরুষের কথা বলা হইয়াছে। তাঁহার নিজের করণীয় কিছু নাই, কেননা তিনি

সিদ্ধ মুক্ত পুরুষ, তাঁহার সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে। তবে কি তিনি কর্মত্যাগী, সন্ন্যাসী? না,—তাঁহার কর্মের অকরণে অর্থাৎ কর্ম হইতে বিরত থাকারও কোন প্রয়োজন নাই। কর্ম করা না করা তাঁহার উভয়ই সমান। প্রকৃত পক্ষে, দেহধারী জীব একেবারে কর্মত্যাগ করিতে পারেই না (৩।৫), দেহ থাকিলে প্রকৃতির কর্ম চলিতেই থাকে ; অজ্ঞানী বুঝে কর্ম হইতেছে আমার ; জ্ঞানী বুঝেন কর্তা ঈশ্বর, কর্ম তাঁহার, তিনি যন্ত্রমাত্র, তাই অনাসক্ত বুদ্ধিতে যথাপ্রাপ্ত কর্ম করিতে পারেন। তাই শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বলিতেছেন, অতএব ('তস্মাৎ') তুমিও জ্ঞানী পুরুষদিগের অনুসরণে অনাসক্ত বুদ্ধিতে যে কর্ম করিতে হয় তাহা কর। জনকাদিও এইরূপ ভাবে কর্ম করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, আমি নিজেও কর্ম করি। জ্ঞানী পুরুষ কর্ম করিবেন কেন, তাহার কারণও দেখাইতেছেন (পরের শ্লোকসমূহ দ্রষ্টব্য)।

"উচ্চতর সত্যের অভিমুখ হইলেই কর্ম ত্যাগ করিতে হইবে না—সেই সত্য লাভ করিবার পূর্বে ও পরে নিষ্কাম কর্ম সাধনই গূঢ় রহস্য। মুক্ত পুরুষের কর্মের দ্বারা লাভ করিবার কিছুই নাই, তবে কর্ম হইতে বিরত থাকিয়াও তাঁহার কোন লাভ নাই এবং কোন ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য তাঁহাকে কর্ম করিতে বা কর্ম ত্যাগ করিতে হয় না, অতএব যে কর্ম করিতে হইবে (জগতের জন্য, লোক-সংগ্রহার্থে, ৩।২০) সর্বদা অনাসক্ত হইয়া তাহা কর।"

—শ্রীঅরবিন্দের গীতা

কিন্তু সন্ন্যাসবাদী টীকাকারগণ বলেন—"আত্মনিষ্ঠ জ্ঞানী পুরুষের কোন কর্তব্য নাই" একথার অর্থ, জ্ঞানী ব্যক্তি সর্বকর্ম ত্যাগ করিয়া থাকেন, কেননা জ্ঞান লাভ হইলে আর কর্ম থাকে না।" ইহাই প্রচলিত বৈদান্তিক মায়াবাদ। জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়ই গীতার প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু মায়াবাদিগণ তাহা স্বীকার করিতে পারেন না। কেননা, মায়াবাদে কর্মই মায়া বা অজ্ঞান, জ্ঞান লাভের পর জীব, জগৎ, ঈশ্বর সমস্ত লোপ পায়, মাত্র নির্গুণ অদ্বৈত-তত্ত্বই থাকে (মায়া-তত্ত্ব দ্রঃ), তখন আবার কর্ম কি? এই মত এক সময়ে এদেশে পণ্ডিত-সমাজে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। প্রাচীন টীকাকারগণ সকলে মায়াবাদী না হইলেও সকলেই সন্ন্যাসবাদী এবং তাঁহারা সন্ন্যাসবাদের পরিপোষক-রূপেই এই শ্লোক দুইটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে অনেক কষ্টকল্পনা করিতে হইয়াছে এবং পূর্বাপর অসঙ্গতি ঘটিয়াছে। যেমন—

১৮শ শ্লোকে আছে, নাকৃতেনেহ কশ্চন (অর্থঃ)—জ্ঞানীর কর্মের অকরণে অর্থাৎ কর্ম হইতে বিরত থাকিয়াও কোন লাভ নাই। এস্থলে পূর্বোক্ত 'অর্থ'

শব্দটিই অধ্যাহার করিতে হয়। কিন্তু ইঁহারা সে স্থলে 'প্রত্যবায়' শব্দ অধ্যাহার করিয়া বলেন—জ্ঞানীর কর্ম না করিলেও প্রত্যবায় নাই। 'প্রত্যবায়' শব্দ মূলে নাই। কিন্তু ইহা মানিয়া লইলেও, পরের শ্লোকে দেখা যায়, শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বলিতেছেন—সেই হেতু ('তস্মাৎ') তুমি অনাসক্ত ভাবে কর্ম কর। 'জ্ঞানী' কর্ম করেন না, অতএব তুমি কর্ম কর—এ কেমন কথা? ইঁহারা বলেন, অর্জুন অজ্ঞান, জ্ঞান লাভে অনধিকারী, সেই হেতু তাহাকে কর্ম করিতে বলিতেছেন, তাহা হইলে 'তস্মাৎ' শব্দ একেবারেই খাটে না, বাক্য আরম্ভ করিতে হয়, 'কিন্তু তুমি অজ্ঞান' ইত্যাদি শব্দ দিয়া। যাহা হউক অর্জুনকে অজ্ঞান বলিয়া মানিয়া লইলেও, ইহার পরেই আবার শ্রীভগবান্ দৃষ্টান্ত দিতেছেন রাজর্ষি জনকাদির এবং স্বয়ং নিজের (৩।২০-২২), ইঁহারা অবশ্য অজ্ঞানীর পর্যায়ভুক্ত নহেন। ইহাতে এইরূপ অনুমান করিতে হয় যে, জ্ঞানীর নিজের কোন কর্তব্য না থাকিলেও, তিনি যেমন অনাসক্তভাবে কর্ম করেন, আমার কোন কর্তব্য না থাকিলেও (৩।২২) আমিও যেমন কর্ম করি, তুমিও সেই আদর্শ অনুসরণ করিয়া কর্ম কর। বস্তুতঃ, এটি অনুমানও করিতে হয় না, পরে ২৫শ শ্লোকে জ্ঞানীরও কর্ম করা উচিত, এ কথা স্পষ্ট বলা হইয়াছে। গীতার অন্যত্রও নানাভাবে এই কথা বলা হইয়াছে (৩।৭, ৪।২৩, ৬।১, ১৮।৬-৯, ইত্যাদি)। সুতরাং, এইরূপ ব্যাখ্যা গীতোক্ত কর্মযোগতত্ত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। অথচ প্রচলিত প্রায় সমস্ত গীতার সংস্করণেই পাঠক এই সন্ন্যাসবাদাত্মক ব্যাখ্যাই পাইবেন, কারণ এসকল প্রাচীন সাম্প্রদায়িক টীকা ভাষ্যেরই অনুবাদ মাত্র।

লোকমান্য তিলক তাঁহার গীতারহস্যে এ সম্বন্ধে অতি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং নানা প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে শ্লোকাদি উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সন্ন্যাসবাদাত্মক ব্যাখ্যাই ভ্রমাত্মক। একটি দৃষ্টান্ত দেখুন, যোগবাশিষ্ঠে আছে,—

'মম নাস্তি কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
যথাপ্রাপ্তেন তিষ্ঠামি হ্যকর্মণি ক আগ্রহঃ॥'

'কর্ম করা না করা আমার পক্ষে একই, যখন উভয়ই এক, তখন কর্ম না করার আগ্রহই বা কেন? শাস্ত্রানুসারে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা করিয়া থাকি।' গীতায় ৩।১৭-১৮ শ্লোকের মর্ম ঠিক ইহাই।

কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি ॥ ২০
যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ ২১

২০। জনকাদয়ঃ (জনকাদি) কর্মণা এব হি (কর্মের দ্বারাই) সংসিদ্ধিম্ আস্থিতাঃ (সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন); লোক-সংগ্রহম্ এব অপি (লোকরক্ষার দিকেও) সংপশ্যন্ (দৃষ্টি রাখিয়া) কর্তুম্ অর্হসি (কর্ম করা কর্তব্য)।

জনকাদি ও স্বয়ং ভগবানের দৃষ্টান্ত ২০-২৪

জনকাদি মহাত্মারা কর্মদ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। লোকরক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াও তোমার কর্ম করা কর্তব্য। ২০

লোকসংগ্রহ—লোকরক্ষা, সৃষ্টিরক্ষা। পূর্বে বলা হইল, নিষ্কাম কর্ম দ্বারাই সিদ্ধি লাভ হয়। এক্ষণে বলা হইতেছে যে, সিদ্ধ মুক্ত পুরুষদিগেরও লোক-রক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াও কর্ম করা কর্তব্য। কিন্তু জ্ঞানী কর্ম না করিলেই সকল লোক উৎসন্ন যাইবে কেন?—সাধারণে শ্রেষ্ঠ লোকেরই অনুবর্তন করে, ইত্যাদি পরের শ্লোক দ্রষ্টব্য। **জনকাদি**—(২।৭০ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। ২০

এস্থলে 'লোক' শব্দের অর্থ ব্যাপক। শুধু মনুষ্য-লোকের নহে, দেবাদি সমস্ত লোকের ধারণ-পোষণ হইয়া পরস্পরের শ্রেয়ঃ সম্পাদন করিবে, এই অর্থই লোক-সংগ্রহ পদে ভগবদ্গীতায় বিবক্ষিত হইয়াছে। জ্ঞানী পুরুষ সমস্ত জগতের চক্ষু, ইঁহারা যদি নিজের কর্ম ত্যাগ করেন, তাহা হইলে অন্ধতমসাচ্ছন্ন হইয়া সমস্ত জগৎ ধ্বংস না হইয়া যায় না। লোকদিগকে জ্ঞানী করিয়া উন্নতির পথে আনয়ন করা জ্ঞানী পুরুষদিগেরই কর্তব্য। এই কথা মনে করিয়াই শান্তিপর্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন—লোক-সংগ্রহকারক সূক্ষ্মধর্মার্থ-নিরত সাধুদিগের উত্তমচরিত বিধাতারই বিধান। (মভা, শা ২৫৮।২৫)—লোকমান্য তিলক।

২১। শ্রেষ্ঠঃ জনঃ (শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি) যৎ যৎ আচরতি (যাহা যাহা করেন) ইতরঃ (অন্য সাধারণ লোকে) তৎ তৎ এব (তাহাই করে); সঃ (তিনি) যৎ প্রমাণং কুরুতে (যাহা প্রামাণ্য বলিয়া মনে করেন,), লোকঃ তৎ অনুবর্ততে (অন্য লোকে তাহাই অনুসরণ করে)।

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি ॥ ২২
যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ২৩

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা আচরণ করেন, অপর সাধারণেও তাহাই করে। তিনি যাহা প্রামাণ্য বলিয়া বা কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করেন, সাধারণ লোকে তাহারই অনুবর্তন করে। ২১

জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যেরূপ আচরণ করেন, যাহা প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করেন, যে আদর্শ প্রদান করেন, প্রাকৃত লোকেও তাহাই অনুসরণ করে। তুমি জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ, তুমি স্বধর্ম প্রতিপালন না করিলে সাধারণেও তোমারই অনুসরণ করিয়া স্বধর্ম ত্যাগ করিবে। ইহা স্মরণ করিয়াও তোমার যুদ্ধাদি কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করা উচিত, কর্ম ত্যাগ করা কর্তব্য নহে।

সমাজে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ ও জ্ঞানী, সাধারণে তাঁহাদিগকেই অনুসরণ করে। কেবল ধর্মকর্ম নহে, আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, কথাবার্তা, সকল বিষয়েই একথা সত্য। মধ্যযুগে সমাজের জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ সন্ন্যাসবাদ প্রচার করায় যে বিশেষ কুফল ফলিয়াছিল, একথা ঐতিহাসিকগণও বলেন (৩।২৬ দ্রষ্টব্য)।

২২। হে পার্থ, ত্রিষু লোকেষু (ত্রিলোক মধ্যে) মে (আমার) কিঞ্চন কর্তব্যং নাস্তি (কিছু কর্তব্য নাই); অনবাপ্তম্ (অপ্রাপ্ত) অবাপ্তব্যম্ (প্রাপ্য) ন (কিছু নাই); [তথাপি আমি] কর্মণি বর্তে এব চ (কর্মেই ব্যাপৃত আছি)।

হে পার্থ, ত্রিলোক মধ্যে আমার করণীয় কিছু নাই, অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছু নাই, তথাপি আমি কর্মানুষ্ঠানেই ব্যাপৃত আছি। ২২

শ্রীভগবান্ পূর্বে বলিয়াছেন, লোকসংগ্রহার্থ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের কর্ম করা কর্তব্য। জনকাদি জ্ঞানী ব্যক্তিরাও কর্ম করিয়াছেন। এক্ষণে কর্মের মাহাত্ম্য আরও পরিস্ফুট করিবার জন্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন। ২১

২৩। হে পার্থ, যদি অহম্ (আমি) জাতু (কদাচিৎ) অতন্দ্রিতঃ (অনলস হইয়া) কর্মণি ন বর্তেয়ম্ (কর্মানুষ্ঠান না করি) [তাহা হইলে] মনুষ্যাঃ (মানবগণ) মম বর্ত্ম হি (আমার পথই) সর্বশঃ অনুবর্তন্তে (সর্বপ্রকারে অনুসরণ করিবে)।

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪

হে পার্থ, যদি অনলস হইয়া কর্মানুষ্ঠান না করি, তবে মানবগণ সর্বপ্রকারে আমার পথের অনুবর্তী হইবে (কেহই কর্ম করিবে না)। ২৩

২৪। চেৎ (যদি) অহং কর্ম ন কুর্যাম্ (আমি কর্ম না করি) [তাহা হইলে] ইমে লোকাঃ উৎসীদেয়ুঃ (এই লোকসকল উৎসন্ন হইয়া যাইবে); [আমি] সঙ্করস্য কর্তা স্যাম্ (বর্ণসঙ্করাদির কর্তা হইব) চ (এবং) ইমাঃ প্রজাঃ উপহন্যাম্ (এই প্রজাগণের ধ্বংসের কারণ হইব)।

যদি আমি কর্ম না করি তাহা হইলে এই লোকসকল উৎসন্ন হইয়া যাইবে। আমি বর্ণ-সঙ্করাদি সামাজিক বিশৃঙ্খলার হেতু হইব এবং ধর্মলোপহেতু প্রজাগণের বিনাশের কারণ হইব। ২৪

সঙ্কর। 'সঙ্কর' অর্থ পরস্পরবিরুদ্ধ পদার্থের মিলন বা মিশ্রণ, উহার ফল সামাজিক বিশৃঙ্খলা। বর্ণসঙ্কর উহার প্রকারবিশেষ। বর্ণসঙ্কর, কর্মসঙ্কর, নানা ভাবেই সাঙ্কর্য উপস্থিত হইতে পারে। লোকে স্বধর্মানুসারে কর্তব্য-পালন না করিলেই এইরূপ সাঙ্কর্য বা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। এস্থলে সঙ্কর শব্দের সাধারণ ব্যাপক অর্থই গ্রহণ কর্তব্য।

আমি কর্ম না করিলে আমার দৃষ্টান্তের অনুসরণে সকলে স্বীয় স্বীয় কর্তব্য-কর্ম ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিবে। স্বেচ্ছাচারে সাঙ্কর্য ও বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী। সামাজিক বিশৃঙ্খলায় ধর্মলোপ, সমাজের বিনাশ। সুতরাং লোক-শিক্ষার্থ, লোক-সংগ্রহার্থ আমি কর্ম করি, তুমিও তাহাই কর।

হিন্দুর জাতীয় আদর্শ শ্রীকৃষ্ণ

'আপনি আচরি ধর্ম লোকেরে শিখায়'—কথাটি শ্রীচৈতন্য লীলাপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণও বলিতেছেন, আমি লোকশিক্ষার্থ স্বয়ং কর্ম করি। বস্তুতঃ, লোকশিক্ষার্থই ঈশ্বরের অবতার, মানব-দেহ ধারণ। অবতারগণ মানবধর্ম স্বীকার করিয়া মানবী-শক্তির সাহায্যেই কর্ম করিয়া থাকেন, নচেৎ লোকে তাঁহাদের আদর্শ ধরিতে পারে না। এইভাবে দেখিলে, তাঁহারা আদর্শ মনুষ্য। শ্রীচৈতন্য, ভক্তরূপে স্বয়ং আচরণ করিয়া প্রেমভক্তি শিক্ষা দিয়াছেন। বুদ্ধদেব, ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রতিমূর্তি। শ্রীরামচন্দ্রে কর্তব্য-নিষ্ঠার চরমোৎকর্ষ। আর শ্রীকৃষ্ণ সর্বতঃপূর্ণ, সর্বকর্মকৃৎ। কৃষ্ণই হিন্দুর জাতীয় আদর্শ।

সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।
কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫

"হিন্দুর আবার জাতীয় আদর্শ আছে নাকি? নাই বটে সত্য, থাকিলে আমাদের এমন দুর্দশা হইবে কেন? কিন্তু এক দিন ছিল। তখন হিন্দুই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। সে আদর্শ হিন্দু কে? রামচন্দ্রাদি ক্ষত্রিয়গণ সেই আদর্শ-প্রতিমার নিকটবর্তী, কিন্তু যথার্থ হিন্দু-আদর্শ **শ্রীকৃষ্ণ**। শ্রীকৃষ্ণ একাধারে সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের আদর্শ।...হিন্দুধর্মের আদর্শ-পুরুষ সর্বকর্মকৃৎ, এখনকার হিন্দু সর্বকর্মে অকর্মা।...যেদিন সে আদর্শ হিন্দুদিগের চিত্ত হইতে বিদূরিত হইল, সেই দিন হইতে আমাদের সামাজিক অবনতি। এখন আবার সেই আদর্শ পুরুষকে জাতীয় হৃদয়ে জাগ্রত করিতে হইবে।"—বঙ্কিমচন্দ্র

২৫। হে ভারত, কর্মণি সক্তাঃ (কর্মে আসক্তিযুক্ত হইয়া) অবিদ্বাংসঃ (অজ্ঞ ব্যক্তিগণ) যথা কুর্বন্তি (যেমন কর্ম করে), বিদ্বান্ অসক্তঃ [সন্] (জ্ঞানী ব্যক্তি অনাসক্ত হইয়া) লোকসংগ্রহং চিকীর্ষুঃ (লোকরক্ষার্থ, লোক হিতসাধনার্থ) তথা কুর্যাৎ (সেইরূপ কর্মানুষ্ঠান করিবেন)।

জ্ঞানী ও অজ্ঞানের কর্মে পার্থক্য ২৫-২৯

হে ভারত, অজ্ঞ ব্যক্তিরা কর্মে আসক্তিবিশিষ্ট হইয়া যেরূপ কর্ম করিয়া থাকে, জ্ঞানী ব্যক্তিরা অনাসক্ত চিত্তে লোকরক্ষার্থে সেইরূপ কর্ম করিবেন। ২৫

নিষ্কাম কর্মের উদ্দেশ্য—লোক-সংগ্রহ

অনেকে বলেন, নিষ্কাম কর্মে প্রণোদনা নাই, উহা উদ্দেশ্যবিহীন। তাহা ঠিক নহে। গীতা বলেন, নিষ্কাম কর্মের দুইটি উদ্দেশ্য—প্রথম, ইহা যোগ, সাধনমার্গ, ভগবানের অর্চনা—এই কর্ম ভোগের জন্য নহে, নিষ্কামভাবে ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কৃত কর্মদ্বারাই সিদ্ধিলাভ হয়—'স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ' (১৮।৪৬)।

দ্বিতীয়তঃ, ইহা দ্বারা সৃষ্টি হয়। এই যে বিচিত্র জগৎ, ইহা প্রকৃতিরই লীলা। প্রকৃতি আর কি, সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাশক্তি বা সৃষ্টিশক্তি। এই যে খেলা ভগবান্ জীবের সঙ্গে খেলিতেছেন, তাঁহার ইচ্ছা, জীব এই খেলার সাথী হউক। কর্মেই সৃষ্টি, কর্মদ্বারাই সৃষ্টিরক্ষা, তাই প্রকৃতি সকলকেই কর্ম করান। জীবের কর্তব্য এই যে, সেই কর্মটিকে নিষ্কাম করিয়া ভাগবত কর্মে

পরিণত করা অর্থাৎ নিজের বাসনা-কামনার ঊর্ধ্বে উঠিয়া ভগবদিচ্ছার যন্ত্র-স্বরূপে কর্ম করা। উহাই কর্মযোগ। জ্ঞানী যদি কর্মত্যাগী হন, তবে জগতে জ্ঞান প্রচার করিবে কে? কর্মে নিষ্কামতা শিক্ষা দিবে কে? সংসার-কীট কর্মীকে ভগবানের দিকে আকর্ষণ করিবে কে? কর্মী যদি স্বার্থান্বেষী হন, তবে জগতের দুঃখ মোচন করিবে কে? তাই প্রহ্লাদ দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

প্রায়েণ দেবমুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা।
মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ ॥—ভাগবত (৭।৯।৪৪)

'প্রায়ই দেখা যায়, মুনিরা নির্জনে মৌনাবলম্বন করিয়া তপস্যা করেন, তাঁহারা ত লোকের দিকে দৃষ্টি করেন না। তাঁহারা ত পরার্থনিষ্ঠ ন'ন, তাঁহারা নিজের মুক্তির জন্যই ব্যস্ত, সুতরাং স্বার্থপর।' অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে, তাই বলিয়াছেন, 'প্রায়েণ'। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, এই পুণ্যভূমি বঙ্গভূমিতেই ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। তাহার সাক্ষী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত। সেই আত্মারাম কর্মযোগীর কর্মের ফলেই বিবেকানন্দ ও সেবাধর্মী সন্ন্যাসিবৃন্দ। আবার তাঁহাদেরই কর্মের প্রেরণার ফলে রামকৃষ্ণ মিশন ও অন্যান্য সেবা-প্রতিষ্ঠান—নগরে, পল্লীতে, তীর্থক্ষেত্রে সেবাশ্রম—নিয়ত নারায়ণসেবা, আর্ত, পীড়িত, দুঃখদৈন্যগ্রস্ত শত সহস্র জীবের কল্যাণ-সাধন। ইহা লোক-সংগ্রহেরই অন্তর্গত।

কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে, স্বামী বিবেকানন্দের কর্মজীবনের আদর্শ কেবল সমাজ-সেবা বা ভূতহিত নয়, উহা তাঁহার শিক্ষার আনুষঙ্গিক ফল এবং উচ্চস্তরে উঠিবার সোপানমাত্র। তাঁহার শিক্ষার মূল কথা ভাগবত জীবন-লাভ, সর্বজীবকে সত্ত্বশুদ্ধ করিয়া ভগবানের দিকে আকৃষ্ট করা। বর্তমান ভারতবাসী তমোগুণাক্রান্ত, রজোগুণের উদ্রেক না হইলে সত্ত্বে যাওয়া যায় না, এই জন্য তিনি কর্মের উপর এত জোর দিয়াছেন। গীতার শিক্ষার মূলতত্ত্বও আধ্যাত্মিক, কেবল সামাজিক কর্তব্যপালনাদি নৈতিক কর্মোপদেশই উহার মূলকথা নহে। গীতায় কর্মযোগের উদ্দেশ্য জীবলোককে ভাগবত জীবনের আদর্শ দেখাইয়া ভাগবত-ধর্মী করা (মৎকর্মকৃৎ), যেন কর্ম করিতে করিতেই সে সেই শাশ্বত অব্যয় পদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে (১৮।৫৬)। ইহাই লোকসংগ্রহের গূঢ়ার্থ। "দেশপ্রেম, বিশ্বপ্রেম, সমাজসেবা, সমষ্টির সাধনা, এই সমস্ত যে আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া অপরের জীবনের সহিত নিজের একত্ব উপলব্ধি করিবার

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥ ২৬

প্রকৃষ্ট উপায় তাহাতে কোন সন্দেহ-নাই। আদিম স্বার্থপরতার পর ইহা দ্বিতীয় অবস্থা। কিন্তু গীতা আরও উচ্চ তৃতীয় অবস্থার কথা বলিয়াছেন। দ্বিতীয় অবস্থাটি সেই তৃতীয় অবস্থায় উঠিবার আংশিক উপায় মাত্র। সেই এক সর্বাতীত সার্বজনীন ভাগবত সত্তা ও চৈতন্যের মধ্যে মানবের সমগ্র ব্যক্তিত্বকে হারাইয়া, ক্ষুদ্র আমিকে হারাইয়া, বৃহত্তর আমাকে পাইয়া যে ভাগবত অবস্থা লাভ করা যায়, গীতায় তাহারই নিয়ম বর্ণিত হইয়াছে।"

—শ্রীঅরবিন্দের গীতা (সংক্ষিপ্ত)

২৬। অজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্ (অজ্ঞ কর্মাসক্ত ব্যক্তিগণের) বুদ্ধিভেদং ন জনয়েৎ (বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না), বিদ্বান্ (জ্ঞানী ব্যক্তি) যুক্তঃ (অবহিত হইয়া) সর্বকর্মাণি সমাচরন্ (সর্ব কর্ম করিয়া) যোজয়েৎ (তাহাদিগকে কর্মে নিযুক্ত রাখিবেন)।

জ্ঞানীরা কর্মে আসক্ত অজ্ঞানদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না। আপনারা অবহিত হইয়া সকল কর্ম অনুষ্ঠান করিয়া তাহাদিগকে কর্মে নিযুক্ত রাখিবেন। ২৬

জ্ঞানী ব্যক্তিগণ যদি কর্ম ত্যাগ করেন এবং গৃহী অনধিকারী ব্যক্তিগণকে সন্ন্যাসধর্মের উপদেশ দেন, তবে তাহারা অবশ্যই মনে করিবে যে, কর্মত্যাগই শ্রেয়ঃপথ। ইহা কর্তব্য নহে। বরং জ্ঞানিগণ নিজেরা অনাসক্তভাবে কর্ম করিয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা কর্মাসক্তদিগকে কর্মেই নিযুক্ত রাখিবেন। ২৬

সন্ন্যাসবাদে ভারতের দুর্দশা

প্রাচীন ভারত কর্মদ্বারাই গৌরবলাভ করিয়াছিল, শিক্ষা-সভ্যতায়, শিল্প-সাহিত্যে, শৌর্য-বীর্যে জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। সেই ভারতবাসী আজ অলস, অকর্মা, বাক্যবাগীশ বলিয়া জগতে উপহাসাস্পদ। এ দুর্দশা কেন? ভারতকে কর্ম হইতে বিচ্যুত করিল কে? ভারতে এ বুদ্ধিভেদ জন্মিল কিরূপে?

বুদ্ধদেবের অষ্টাঙ্গ পথ, শঙ্করের মায়াবাদ, পরবর্তী ধর্মাচার্যগণের দ্বৈতবাদ, এ-সকলে জ্ঞান, বৈরাগ্য, প্রেম, ভক্তি সবই আছে, কিন্তু কর্মের প্রেরণা নাই, কর্মপ্রশংসা নাই, কর্মোপদেশ নাই। কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢাত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭

যে শঙ্খধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল,—'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন' সে ধ্বনির আর কেহ প্রতিধ্বনি করেন নাই, তেমন কথা ভারতবাসী তিন সহস্র বৎসরের মধ্যে আর শুনে নাই। মধ্যযুগে সে কেবল শুনিয়াছে—'কর্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে' ('কর্মে জীবের বন্ধন, জ্ঞানেই মুক্তি'), 'দণ্ডগ্রহণমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ' ('সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই মানুষ নারায়ণ হয়') এই সব। ফলে, সংসারে জাতবিতৃষ্ণ, কর্মবিমুখ অদৃষ্টবাদীর সৃষ্টি, দলে দলে অনধিকারীর সন্ন্যাস গ্রহণ, ধর্মধ্বজী ভিক্ষোপজীবীর সংখ্যাবৃদ্ধি। এইরূপে কালে সমাজ হইতে রজোগুণের সম্পূর্ণ অন্তর্ধান হইল, সত্ত্বগুণাশ্রিত অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জ্ঞানভক্তির চর্চায় নিযুক্ত রহিলেন—তমোগুণাক্রান্ত নিদ্রাভিভূত জনসাধারণ শত্রুর আক্রমণে চমকিত হইয়া 'কপালং কপালং কপালং মূলং' বলিয়া চিত্তকে প্রবোধ দিল।

পূর্বে যে সকল মহাপুরুষের কথা উল্লিখিত হইল ইঁহারা সকলেই যুগাবতার। সনাতন ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হইলে, সেই গ্লানি নিবারণ করিয়া উহার বিশুদ্ধি ও সময়োপযোগী পরিবর্তন সাধন জন্যই যুগধর্মের প্রবর্তন হয়। তত্তৎকালে ঐ সকল ধর্মপ্রবর্তনের প্রয়োজন ছিল বলিয়াই এই যুগাবতারগণের আবির্ভাব। ইঁহারা কখনও অনধিকারীকে সোঽহং জ্ঞান বা সন্ন্যাসাদি উপদেশ দেন নাই। কিন্তু কালের গতিতে যুগধর্মেরও ব্যভিচার হয়, লোকে উহার প্রকৃত মর্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া নানারূপ উপধর্মের সৃষ্টি করে, উহাতেই কুফল ঘটে।

২৭। প্রকৃতেঃ গুণৈঃ (প্রকৃতির গুণসকলের দ্বারা) সর্বশঃ (সর্বপ্রকারে) কর্মাণি ক্রিয়মাণানি (কর্মসকল সম্পন্ন হয়); অহঙ্কার-বিমূঢাত্মা (যাহার বুদ্ধি অহঙ্কারে বিমুগ্ধ সে) অহং কর্তা (আমি কর্তা) ইতি মন্যতে (ইহা মনে করে।

প্রকৃতির গুণসমূহদ্বারা সর্বতোভাবে কর্মসকল সম্পন্ন হয়। যে অহঙ্কারে মুগ্ধচিত্ত সে মনে করে আমিই কর্তা। ২৭

এক্ষণে জ্ঞানী ও অজ্ঞানের কর্মে পার্থক্য কি এ-দুটি শ্লোকে তাহাই দেখাইতেছেন।

প্রকৃতেঃ গুণৈঃ—প্রকৃতেঃ গুণৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ—(রামানুজ); সত্ত্বরজস্তমসাং গুণানাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ তস্যাঃ গুণৈর্বিকারৈঃ, প্রকৃতিকার্যৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ—(শাঙ্করভাষ্য, শ্রীধর)। রামানুজ বলেন,—প্রকৃতির গুণের দ্বারা অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ তমঃ গুণের দ্বারা; শঙ্করাদি বলেন,—সত্ত্ব, রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি; সুতরাং প্রকৃতির গুণ বলিতে প্রকৃতির বিকার বা পরিণাম মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি বুঝায়। উভয় অর্থ মূলতঃ একই—যেমন, সমুদ্র আর সমুদ্রের তরঙ্গ।

কর্ম করে কে ?—প্রকৃতি। প্রকৃতি কি ? সাংখ্যমতে জগতের অপরিচ্ছিন্ন নির্বিশেষ মূল উপাদানই প্রকৃতি। বেদান্তমতে পরব্রহ্মের মায়াশক্তি বা সৃষ্টিশক্তিই প্রকৃতি। এই প্রকৃতি ত্রৈগুণ্যময়ী; সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি, প্রকৃতির বৈষম্যাবস্থাই ত্রিগুণ; প্রকৃতির পরিণামই এই বিচিত্র জগৎ। মন, বুদ্ধি, দেহেন্দ্রিয়াদি প্রকৃতিরই পরিণাম; বিষয়ের সহিত মন, বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির সংযোগেই কর্মের উৎপত্তি। কর্ম প্রকৃতির দ্বারাই সম্পন্ন হয়। পুরুষ বা আত্মা উহা হইতে স্বতন্ত্র; তিনি সাক্ষিস্বরূপ, নিষ্ক্রিয়, অকর্তা। যিনি আত্মাকে প্রকৃতি হইতে পৃথক্ বলিয়া জানেন তিনি তত্ত্ববিৎ; তিনি জানেন 'আমি' কিছুই করি না। যিনি প্রকৃতিকেই আত্মা বলিয়া মনে করেন, তিনি মূঢ়। এই প্রকৃতিতে অর্থাৎ দেহ, মন, ইন্দ্রিয়াদিতে যে আত্মাভিমান ইহাই অহংকার। যিনি অহঙ্কারে মুগ্ধচিত্ত তিনি মনে করেন, আমিই কর্ম করি। (প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্ব বিস্তারিত ৭।৪।৫, ১৩।৫।৬, ১৩।১৯।২৩, ১৪।৩।২৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য, অপিচ, ২।১৭, ২।২০ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

কর্মী ও কর্মযোগী—জ্ঞানীও কর্ম করেন, অজ্ঞানও কর্ম করেন, তবে জ্ঞানী ও অজ্ঞানে পার্থক্য কি ?—পার্থক্য এই, অজ্ঞান ব্যক্তি মনে করেন, কর্ম করি আমি, জ্ঞানী মনে করেন, কর্ম করেন প্রকৃতি। যাঁহার অহংজ্ঞান নাই, তাঁহার কর্মে আসক্তি নাই, ফলাকাঙ্ক্ষা নাই। অজ্ঞান 'আমি'টাকে কর্মের সহিত যোগ করিয়া দেন বলিয়াই ফলাসক্ত হন। সুতরাং অজ্ঞানের কর্ম ভোগ, জ্ঞানীর কর্ম যোগ। কর্মী হইলেই কর্মযোগী হয় না। কর্তৃত্বাভিমান বর্জন ব্যতীত কর্ম যোগে পরিণত হয় না। কর্তৃত্বাভিমান বর্জন করিতে পারে কে ? যাঁহার আত্মার স্বরূপ-বোধ জন্মিয়াছে অর্থাৎ যিনি আত্মজ্ঞানী। সুতরাং, জ্ঞান ও কর্ম পরস্পর সাপেক্ষ, নিরপেক্ষ নহে। এইরূপে গীতোক্ত ধর্মে **জ্ঞান ও কর্মের সুসঙ্গত সমন্বয়**। ইহাই কর্মযোগে জ্ঞানসাধন বা জ্ঞানীর কর্মসাধনা। (২।৪৭, ২।৫৩ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

রহস্য—'কাঁচা আমি' ও 'পাকা আমি'

প্রঃ। কিন্তু অহং-জ্ঞান যখন যায়, তখন ত কোন জ্ঞানই থাকে না। তখন সমুদয় মানসিক ক্রিয়াদির বিরাম হয় ('বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্বঃ' ইত্যাদি যোগসূত্র)। অহং গেলেই সোঽহং—তখন জীব ব্রহ্ম এক। তখন আবার কর্ম কি?

উঃ। পূর্বোক্ত যোগসূত্রে বর্ণিত সমাধির অবস্থা এবং গীতোক্ত মুক্ত যোগীর অবস্থা সম্পূর্ণ পৃথক্। আর, অহং গেলেই সোঽহং হয় তা ঠিক, সোঽহংটি আবার 'তস্যাহং' বা 'দাসোঽহং' রূপেও থাকিতে পারে। এ-সকল পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে (৫।২৯ শ্লোকের ব্যাখ্যা ও ভূমিকা এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ের পরে 'গীতোক্ত যোগী ও যোগধর্ম' দ্রষ্টব্য)।

তত্ত্বটা দুরূহ। পুঁথিতে ইহার উত্তর মিলে না। নানা রকম কথা আছে। যাঁহারা এ অবস্থায় উঠিয়াছেন, যাঁহারা আত্মারাম হইয়াও লোকশিক্ষার্থ সংসারে আছেন, তাঁহারাই ইহার উত্তর দিতে পারেন। ভাগ্যবলে আমরা সে উত্তর পাইয়াছি। পরমহংসদেব অতি সোজা কথায় তত্ত্বটি খোলসা করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন—"মানুষের ভিতর 'কাঁচা আমি' ও 'পাকা আমি', এই দুই রকম 'আমি' আছে। অহঙ্কারী আমি কাঁচা আমি। এ আমি মহাশত্রু। ইহাকে সংহার করা চাই। মুক্তি হবে কবে, অহং যাবে যবে। সমাধি হ'লে তাঁর সঙ্গে এক হওয়া যায়, আর অহং থাকে না। জ্ঞান হবার পর যদি অহং থাকে তবে জেনো সে বিদ্যার আমি, ভক্তির আমি, দাস আমি, সে অবিদ্যার আমি নয়। সে পাকা আমি। প্রহ্লাদ, নারদ, হনুমান, এঁরা সমাধির পর ভক্তি রেখেছিলেন; শঙ্করাচার্য, রামানুজ, এঁরা বিদ্যার আমি রেখেছিলেন।" —শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উপদেশ।

শ্রীঅরবিন্দ এ সম্বন্ধে অতি বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি কথা নিম্নে দিলাম। বিস্তারিত তাঁহার "The Life Divine" প্রভৃতি অনুপম গ্রন্থাদিতে দ্রষ্টব্য।—

"আমাদের মধ্যে দুইটি আত্মা (আমি) রহিয়াছে—একটি হইতেছে আভাস আত্মা, কাঁচা আমি, বাসনা-কামনাময় আত্মা—ইহা সম্পূর্ণভাবে গুণত্রয়ের দ্বারাই গঠিত ও পরিচালিত—ইহা প্রকৃতির গুণেরই সমবায় মাত্র। আর আমাদের যে প্রকৃত আত্মা, আমাদের বড় বা পাকা আমি, তাহা বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃতির ভর্তা, ভোক্তা ঈশ্বর বটে, কিন্তু তাহা নিজে নিত্য

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্তন্তে ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮

পরিবর্তনশীল প্রাকৃত নামরূপের সহিত এক নহে। তাহা হইলে মুক্তির উপায় হইতেছে এই,—"কাঁচা আমি'র বাসনা-কামনা বর্জন করা এবং আত্মা সম্বন্ধে মিথ্যা ধারণা বর্জন করা।"—শ্রীঅরবিন্দের গীতা (অনিলবরণ) সংক্ষিপ্ত।

সমাধিস্থ লোকের লক্ষণ ইহা নহে যে, তাঁহার বাহ্য বিষয়ে জ্ঞান লোপ পাইবে, তাঁহার শরীর ও মনের জ্ঞানও লোপ পাইবে, এমন কি তাঁহার শরীর দগ্ধ করিলেও জ্ঞান হইবে না। সাধারণতঃ সমাধি বলিতে এই অবস্থাই বুঝায়, কিন্তু ইহা সমাধির প্রধান চিহ্ন নহে, ইহা শুধু এক বিশেষ গভীর অবস্থা। সমাধি হইলেই যে এইরূপ অবস্থা হইবে তাহা নহে। সমাধিস্থ ব্যক্তির প্রধান লক্ষণ এই যে, তাঁহার ভিতর হইতে সমস্ত কামনা দূর হয়, সংসারের শুভাশুভ, সুখ-দুঃখ, কর্ম-কোলাহলে মন সম্পূর্ণ অবিচলিত থাকে, তিনি আত্মার আনন্দেই তৃপ্ত থাকেন—যখন সাধারণের চক্ষুতে তাঁহাকে দেখায় যে, তিনি সাংসারিক বাহ্য ব্যাপারে ব্যস্ত, তখন সম্পূর্ণরূপে ভগবানের দিকেই তাঁহার লক্ষ থাকে।

সংসার ও সংসারের কাজের সহিত ব্রহ্মনির্বাণের কোন বিরোধ নাই। কারণ যে সকল ঋষি এই নির্বাণ লাভ করিয়াছেন তাঁহারা নরজগতের মধ্যে ভগবান্‌কে দেখিতে পান এবং কর্মের দ্বারা তাঁহার সহিত নিবিড় ভাবে সংযুক্ত থাকেন—সর্বভূতহিতে রতাঃ (৫।২৫ শ্লোক)—শ্রীঅরবিন্দ।

২৮। তু (কিন্তু), হে মহাবাহো, গুণকর্মবিভাগয়োঃ (গুণ-বিভাগ ও কর্ম-বিভাগের) তত্ত্ববিৎ (যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ) গুণাঃ (গুণসমূহ, সত্ত্বরজস্তমোগুণ ও উহাদের পরিণাম ইন্দ্রিয়াদি) গুণেষু (গুণবিষয়ে অর্থাৎ রূপরসাদি ইন্দ্রিয় বিষয়ে) বর্তন্তে (প্রবৃত্ত রহিয়াছে) ইতি মত্বা (ইহা জানিয়া) ন সজ্জতে (আসক্ত হন না, অহং কর্তা—এই অভিমান করেন না)।

গুণকর্মবিভাগয়োঃ তত্ত্ববিৎ—গুণবিভাগ ও কর্মবিভাগের তত্ত্বজ্ঞ। "যিনি সত্ত্বরজস্তমোগুণান্বিতা প্রকৃতির পরিণাম মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদির বিভাগ-তত্ত্ব জানিয়াছেন, তিনি গুণবিভাগের তত্ত্ববিৎ। যিনি মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদির পৃথক্ পৃথক্ কর্ম-বিভাগ জানিয়াছেন, তিনি কর্ম-বিভাগের তত্ত্ববিৎ। (প্রকৃতি ও গুণকর্ম বিভাগাদি ৭।৪ ও ১৩।৫-২০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য)। 'গুণ' বলিতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণ বুঝায় ; প্রকৃতির পরিণাম দেহ, মন, ইন্দ্রিয়াদিও বুঝায়, আবার রূপ-রসাদি ইন্দ্রিয়-বিষয়ও বুঝায়। অথবা, গুণ ও কর্ম উভয়ই আমা (আত্মা) হইতে ভিন্ন ইহা যিনি জানিয়াছেন, এরূপ অর্থও হয় (লোকমান্য তিলক)।

প্রকৃতেগুর্ণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ। ২৯

গুণা গুণেষু বর্ততে—প্রকৃতির গুণসকল পরস্পরের উপর ক্রিয়া করিতেছে, কখনও সত্বগুণ প্রবল হইয়া রজস্তমকে দমন করে, কখনও রজোগুণ প্রবল হইয়া সত্ব ও তমোগুণকে দমন করে ইত্যাদি ১৪।১৩ দ্রঃ (অরবিন্দ); গুণসমূহের নিজেদের মধ্যেই খেলা চলিতেছে (লোকমান্য তিলক)।

কিন্তু হে মহাবাহো, যিনি সত্বরজস্তমগুণ ও মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদির বিভাগ ও উহাদের পৃথক্ পৃথক্ কর্ম-বিভাগতত্ত্ব জানিয়াছেন, তিনি ইন্দ্রিয়াদি ইন্দ্রিয়বিষয়ে প্রবৃত্ত আছে ইহা জানিয়া কর্মে আসক্ত হন না, কর্তৃত্বাভিমান করেন না। ২৮

ইন্দ্রিয়াদির সহিত ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়ের অর্থাৎ রূপ-রসাদির যে সংযোগ তাহাই কর্ম। যিনি আত্মজ্ঞানী তিনি জানেন আত্মা নিষ্ক্রিয়, 'আমি' কিছু করি না, প্রকৃতি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদিই কর্ম করে। যিনি আত্মজ্ঞানী নন, তিনি মনে করেন, আমিই কর্ম করিলাম, আমিই ইহার ফলভোগী, কাজেই তিনি কর্মফলে আসক্ত হন (১৪।২৩ দ্রষ্টব্য)। 'কিন্তু গুণসমূহের নিজেদের মধ্যেই এই খেলা চলিতেছে, জ্ঞানী ব্যক্তি ইহা বুঝিয়া আসক্ত হন না' (লোকমান্য তিলক)। ২৮

২৯। প্রকৃতেঃ গুণসংমূঢ়া (প্রকৃতির গুণে বিমোহিত ব্যক্তিগণ) গুণকর্মসু (গুণের কর্মে অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদির কর্মে) সজ্জন্তে (আসক্ত হয়); কৃৎস্নবিৎ (সর্বজ্ঞ ব্যক্তি) তান্ অকৃৎস্নবিদঃ মন্দান্ (সেই অল্পজ্ঞ মন্দমতি-দিগকে) ন বিচালয়েৎ (বিচালিত করিবেন না)।

যাহারা প্রকৃতির গুণে মোহিত তাহারা দেহেন্দ্রিয়াদি কর্মে আসক্তিযুক্ত হয়; সেই সকল অল্পবুদ্ধি মন্দমতিদিগকে জ্ঞানিগণ কর্ম হইতে বিচালিত করিবেন না। ২৯

প্রকৃতির গুণে মোহিত হইয়াই অজ্ঞ লোকে বিষয়াসক্ত হইয়া কর্ম করে। তাহাদিগকে কর্মত্যাগের উপদেশ দেওয়া কর্তব্য নহে। শমদমাদি অভ্যস্ত না হইলে, চিত্ত ঈশ্বরে একনিষ্ঠ না হইলে, বিষয়াসক্তি কিছুতেই দূর হয় না। সুতরাং এরূপ উপদেশে কেবল মিথ্যাচারী, আত্মপ্রতারক, অকর্মা লোকের সৃষ্টি হয়। উহারা সমাজের কণ্টকস্বরূপ। (৩।২৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

গুণকর্মসু—দেহেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির যে কর্ম তাহাই গুণকর্ম, কেননা এগুলি ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিরই বিকার।

মযি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০

৩০। মযি (আমাতে) সর্বাণি কর্মাণি (সমস্ত কর্ম) অধ্যাত্মচেতসা (বিবেকবুদ্ধি দ্বারা) সংন্যস্য (সমর্পণ করিয়া) নিরাশীঃ (নিষ্কাম), নির্মমঃ (মমতাশূন্য), বিগতজ্বরঃ চ ভূত্বা (এবং শোকশূন্য হইয়া) যুধ্যস্ব (যুদ্ধ কর)।

অধ্যাত্মচেতসা—(১) বিবেকবুদ্ধ্যা, অহং কর্তেশ্বরায় ভৃত্যবৎ করোমীত্যনয়া বুদ্ধ্যা (শাঙ্কর-ভাষ্য),—কর্তা যিনি ঈশ্বর তাঁহারই জন্য তাঁহার ভৃত্যস্বরূপ এই কাজ করিতেছি, এইরূপ বুদ্ধিতে ; (২) চিত্তকে আত্মসংস্থ করিয়া (With the thoughts resting on the Supreme Self—*Annie Besant*)। **নির্মমঃ**—মদর্থমিদংকর্মেত্যেবং মমতাশূন্যঃ (শ্রীধর), এ কর্ম আমার, ইহা আমার প্রয়োজনে করিতেছি, এইরূপ মমত্ববুদ্ধিশূন্য। **বিগতজ্বরঃ**—শোক সন্তাপ হইতে মুক্ত (of mental fever cured—*Annie Besant.*)

একণে পূর্বোক্ত উপদেশসমূহের সারমর্ম এই শ্লোকে ব্যক্ত করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণোক্ত কর্মযোগের মর্মকথা ৩০-৩২

কর্তা ঈশ্বর, তাঁহারই উদ্দেশে ভৃত্যবৎ কর্ম করিতেছি, এইরূপ বিবেক-বুদ্ধি সহকারে সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া কামনাশূন্য ও মমতাশূন্য হইয়া শোকত্যাগপূর্বক তুমি যুদ্ধ কর। ৩০

পূর্বোক্ত অন্বয়ে অধ্যাত্মচেতসা পদটি সংন্যস্য ক্রিয়ার বিশেষণ করা হইয়াছে। তাহা না করিয়া 'অধ্যাত্মচেতসা নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব' এইরূপও অন্বয় করা যায়, তাহা হইলে বঙ্গানুবাদ হইবে—"সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পণ করিয়া, চিত্তকে আত্মসংস্থ করিয়া কামনা ও মমত্ববুদ্ধি বর্জনপূর্বক বিগতশোক হইয়া যুদ্ধ কর"। ৩০

কর্মযোগীর লক্ষণ—জ্ঞান, কর্ম, ভক্তির সমন্বয়—নিষ্কাম কর্মযোগের তিনটি লক্ষণ—(১) ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন—'নিরাশী' শব্দদ্বারা তাহাই কথিত হইল; (২)কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ—'অধ্যাত্মচেতসা' ও 'নির্মম' শব্দদ্বারা তাহাই বলা হইয়াছে, 'আমি' 'আমার' জ্ঞান থাকিলে নির্মম হওয়া যায় না, চিত্তও আত্মসংস্থ হয় না। (৩) সর্বকর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ (মযি=আমাতে অর্থাৎ পরমেশ্বরে); এই শ্লোকে এই তিনটি লক্ষণই নির্দেশ করা হইল। যিনি সর্বকর্ম ঈশ্বরে সমর্পণপূর্বক 'আমি তাঁহার ভৃত্যস্বরূপ কর্ম করিতেছি' এই জ্ঞানে কর্ম করেন, তিনি পরম ভক্ত, সুতরাং কর্মযোগই ভক্তিযোগ; যিনি

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্মভিঃ ॥ ৩১
যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২

চিত্তকে আত্মসংস্থ করিয়াছেন, 'আমি' 'আমার' জ্ঞান ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, তিনি পরমজ্ঞানী, সুতরাং কর্মযোগই জ্ঞানযোগ; এইরূপ ভাবে যিনি সর্বকর্ম অর্থাৎ যুদ্ধাদি লৌকিক কর্ম ও পূজার্চনা, দান-তপস্যাদি বৈদিক বা শাস্ত্রীয় কর্ম সম্পন্ন করেন, তিনিই প্রকৃত কর্মী, ইহাই কর্মযোগ; সুতরাং ইহাতে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি তিনের সমন্বয়। (২।৪৭, ২।৫৩, ২।৫৭, ৪।৪১ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

৩১। যে মানবাঃ (যে মানবগণ) শ্রদ্ধাবন্তঃ (শ্রদ্ধাবান্) অনসূয়ন্তঃ (অসূয়াশূন্য) [হইয়া] মে ইদং মতং (আমার এই মতের) নিত্যং অনুতিষ্ঠন্তি (সর্বদা অনুসরণ করে) তে অপি (তাহারাও) কর্মভিঃ মুচ্যন্তে (কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়)।।

যে মানবগণ শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াশূন্য হইয়া আমার এই মতের অনুষ্ঠান করে, তাহারাও কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। ৩১

অনসূয়ন্ত—অসূয়াশূন্য হইয়া। 'গুণেষু দোষাবিষ্করণমসূয়া'—গুণের মধ্যে দোষ আবিষ্কার করার যে অভ্যাস তাহাই অসূয়া।

আমার এই মত—এই কথায় ইহাই বুঝা যায় যে, ইহার বিরুদ্ধ মতও প্রচলিত ছিল। বস্তুতঃ প্রচলিত সন্ন্যাসবাদকে লক্ষ করিয়াই পূর্বোক্ত কথাগুলি বলা হইয়াছে। সন্ন্যাসবাদীরা বলেন, কর্ম বন্ধনের কারণ, কর্মত্যাগেই মুক্তি (১৮।৩)। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, কর্মত্যাগ জীবের পক্ষে সম্ভবপর নয়, কর্মত্যাগে লোকরক্ষাও হয় না, সুতরাং নিষ্কামভাবে কর্ম করাই কর্তব্য। ফলত্যাগই ত্যাগ। নিষ্কাম কর্মীরাও কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। সে জন্য কর্মত্যাগের প্রয়োজন হয় না। 'তাহারাও' বলার ইহাই তাৎপর্য। শ্রীকৃষ্ণের এই মত কেবল শ্রীগীতায় নহে, মহাভারতের সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণোক্তিতে এই কর্ম-প্রশংসা দেখা যায়। সঞ্জয়যান পর্বাধ্যায়ে কর্ম-মাহাত্ম্যের যে অপূর্ব বর্ণনা আছে জগতের সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই।

৩২। যে তু (কিন্তু যাহারা) অভ্যসূয়ন্তঃ (অসূয়াপরবশ হইয়া) মে এতৎ মতং ন অনুতিষ্ঠন্তি (আমার এই মতের অনুষ্ঠান করে না), অচেতসঃ

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩

তান্ (বিবেকশূন্য তাহাদিগকে) সর্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্ (সর্বজ্ঞানবিমূঢ়) নষ্টান্ (বিনষ্ট) বিদ্ধি (জানিও)।

যাহারা অসূয়াপরবশ হইয়া আমার এই মতের অনুষ্ঠান করে না, সেই বিবেকহীন ব্যক্তিগণকে সর্বজ্ঞান-বিমূঢ় ও বিনষ্ট বলিয়া জানিও। ৩২

৩৩। জ্ঞানবান্ অপি (জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও) স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ সদৃশং (নিজ প্রকৃতির অনুরূপ) চেষ্টতে (কার্য করেন) ; ভূতানি (প্রাণিসকল) প্রকৃতিং যান্তি (প্রকৃতির অনুসরণ করে), নিগ্রহঃ (নিরোধ, পীড়ন) কিং করিষ্যতি (কি করিবে) ?

ইন্দ্রিয় স্ববশে রাখিয়া স্বধর্ম পালন করিবে ৩৩-৩৬

জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও নিজ প্রকৃতির অনুরূপ কর্ম করিয়া থাকেন। প্রাণিগণ প্রকৃতির অনুসরণ করে ; ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে কি করিবে ? ৩৩

নিগ্রহ—ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ; কেহ কেহ বলেন, 'নিগ্রহ' অর্থ শাস্ত্রাদির শাসন। কিন্তু পরবর্তী শ্লোকে ইন্দ্রিয়ের কথাই বলা হইতেছে। সুতরাং 'ইন্দ্রিয়-নিগ্রহই' সঙ্গত বোধ হয়। এখানে নিগ্রহ অর্থ জোর-জবরদস্তি করিয়া ইন্দ্রিয়নিরোধ করা।

স্বভাব কাহাকে বলে ?—জীবমাত্রেই একটি বিশেষ প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং প্রকৃতির অনুগামী হইয়া সে কর্ম করে। এই প্রকৃতি কি ? শাস্ত্রকারগণ বলেন, পূর্বজন্মার্জিত ধর্মাধর্ম-জ্ঞানেচ্ছাদি-জনিত যে সংস্কার তাহা বর্তমান জন্মে অভিব্যক্ত হয় ; এই সংস্কারের নামই প্রকৃতি। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির প্রেরণায়ই জীব কর্ম করে (৩।২৭-২৯)। বস্তুতঃ, এই প্রাক্তন সংস্কারের মূলেও সেই ত্রিগুণ। পূর্ব-জন্মের ধর্মাধর্ম কর্মফলে গুণবিশেষের প্রাবল্য বা হ্রাস হইয়া স্বভাবের যে অবস্থা দাঁড়ায়, তাহাই প্রাচীন সংস্কার বা অভ্যাস। কাহারও মধ্যে সত্ত্বগুণের, কাহাতে রজোগুণের, কাহাতে তমোগুণের প্রাবল্য। আবার গুণত্রয়ের সংযোগে নানাবিধ মিশ্রগুণের উৎপত্তি হয় ; যথা—সত্ত্ব-রজঃ, রজ-স্তমঃ ইত্যাদি যখন যাহার মধ্যে যে গুণ প্রবল হয়, তখন তাহার মধ্যে সেই গুণের কার্য হইয়া থাকে। ইহাকেই স্বভাবজ কর্ম বলে। এস্থলে বলা হইতেছে, জীবের প্রবৃত্তি স্বভাবেরই অনুবর্তন করে, স্বভাবই বলবান্, ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহে বা শাস্ত্রাদির শাসনে কোন ফল হয় না। তবে আত্মোন্নতির উপায় কি ? (পরের শ্লোক)।

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪
শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫

৩৪। ইন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রিয়স্য অর্থে (সকল ইন্দ্রিয়েরই স্ব স্ব বিষয়ে) রাগদ্বেষৌ (অনুরাগ ও বিদ্বেষ) ব্যবস্থিতৌ (অবশ্যম্ভাবী), তয়োঃ (তাহাদের) বশং ন আগচ্ছেৎ (বশীভূত হইবে না), হি (যেহেতু) তৌ (তাহারা) অস্য (জীবের অথবা শ্রেয়োমার্গের) পরিপন্থিনৌ (শত্রু, বিঘ্নকারক)।

সকল ইন্দ্রিয়েরই স্ব স্ব বিষয়ে রাগদ্বেষ অবশ্যম্ভাবী। ঐ রাগদ্বেষের বশীভূত হইও না; উহারা জীবের শত্রু (অথবা শ্রেয়োমার্গের বিঘ্নকারক)। ৩৪

রাগদ্বেষ—অনুকূল বিষয়ে রাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ; যেমন মিষ্টদ্রব্যে জিহ্বার অনুরাগ, তিক্তদ্রব্যে দ্বেষ। **অস্য**—ইহার, কেহ বলেন—পুরুষের, কেহ বলেন—শ্রেয়োমার্গের; কথা একই।

স্বভাবই প্রবল, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে ফল হয় না—তবে কি জীবের স্বাতন্ত্র্য নাই, তাহার আত্মোন্নতির উপায় নাই? আছে। ইন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহ বা পীড়ন না করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিতে হইবে। স্ব স্ব বিষয়ে রাগদ্বেষ ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক, কিন্তু জীবের রাগদ্বেষের বশে যাওয়া উচিত নয়। যিনি রাগদ্বেষ হইতে বিমুক্ত, তিনি ইন্দ্রিয়ের অধীন নন, ইন্দ্রিয়গণই তাঁহার অধীন হয়। এইরূপ আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয় দ্বারা স্বকর্ম করিতে হইবে, স্বধর্ম পালন করিতে হইবে (২।৬৪)। ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত না হইলে লোকে স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া আপাতমনোরম পরধর্মের অনুসরণ করিয়া থাকে।

কিন্তু কোন ক্ষত্রিয় যদি ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধাদি ক্রূর কর্ম ত্যাগ করিয়া কৃষিবাণিজ্যাদি বা অন্য রূপ নির্দোষবৃত্তি অবলম্বন করে, তাহা কি শ্রেয়স্কর নয়? না (পরের শ্লোক)।

৩৫। স্বনুষ্ঠিতাৎ (উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত) পরধর্মাৎ (পরধর্ম হইতে) বিগুণঃ (কিঞ্চিৎ দোষবিশিষ্ট) স্বধর্ম (স্বীয় ধর্ম, স্বকর্ম) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ); স্বধর্মে (স্বকর্মে) নিধনং (নিধন) শ্রেয়ঃ (কল্যাণকর), পরধর্মো (পরের ধর্ম) ভয়াবহঃ (ভয়সঙ্কুল, অনিষ্টকর)।

স্বধর্ম কিঞ্চিদ্দোষবিশিষ্ট হইলেও উহা উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। স্বধর্মে নিধনও কল্যাণকর, কিন্তু পরধর্ম গ্রহণ করা বিপজ্জনক। ৩৫

স্বধর্ম বলিতে কি বুঝায়

'স্বধর্ম' অর্থ নিজের ধর্ম বা কর্তব্য কর্ম। যাহার যাহা কর্তব্য কর্ম তাহাই তাহার স্বধর্ম। এই 'স্বধর্ম' শব্দের নানারূপ ব্যাখ্যা আছে, সে-সকল আলোচনা করিবার পূর্বে শ্রীভগবান্ 'স্বধর্ম' শব্দে কোন্ ধর্ম লক্ষ্য করিয়াছেন এবং অর্জুনই বা কি বুঝিয়াছেন, তাহাই প্রধানতঃ দ্রষ্টব্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৩১, ৩৩ শ্লোকে এ কথা স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, অর্জুনের পক্ষে যুদ্ধাদি ক্ষত্রিয়োচিত কর্মই স্বধর্ম। 'স্বধর্ম' 'সহজ কর্ম' 'স্বভাবনিয়ত কর্ম,'—এই সকল শব্দ গীতায় এবং মহাভারতের সর্বত্র একার্থকরূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে। অষ্টাদশ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণেরও বর্ণ-ধর্ম বা স্বভাবনিয়ত কর্ম কি তাহা বর্ণনা করিয়া তৎপর স্বধর্মপালনের কর্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে (১৮।৪১-৪৮) এবং তথায় ঠিক এই শ্লোকটিই কিঞ্চিৎ পরিবর্তিতরূপে পুনরুক্ত হইয়াছে (১৮।৪৭)। সুতরাং অর্জুনের পক্ষে স্বধর্ম অর্থ শাস্ত্রনির্দিষ্ট যুদ্ধাদি ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম, এবং পরধর্ম ভিক্ষাবৃত্তি ও কৃষিবাণিজ্যাদি কর্ম, ইহাই শ্রীভগবানের অভিপ্রেত এবং অর্জুনও তাহাই বুঝিয়াছেন। শঙ্করাচার্য প্রমুখ প্রাচীন ভাষ্যকার-টীকাকারগণ সকলেই এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। যথা—

"যৎ বর্ণাশ্রমং প্রতি যো বিহিতঃ স তস্য স্বধর্মঃ বিগুণো হিংসাদিমিশ্রোঽপি কিঞ্চিদঙ্গহীনোঽপি পরধর্মাৎ হিংসাদিদোষরহিতধর্মাপেক্ষয়া শ্রেয়ান্" ইত্যাদি—বর্ণাশ্রমবিহিত যাহার যে ধর্ম তাহাই তাহার স্বধর্ম, উহা বিগুণ অর্থাৎ হিংসাদিমিশ্রিত হইলেও হিংসাদিরহিত পরধর্মাপেক্ষাও শ্রেয়।

'প্রতি বর্ণ ও প্রতি আশ্রমের শাস্ত্রবিহিত ধর্মই উহার স্বধর্ম। এক বর্ণ ও আশ্রমের ধর্ম, অন্য বর্ণ ও অন্য আশ্রমের পরধর্ম।'—৺রামদয়াল মজুমদার। বস্তুতঃ, 'স্বধর্ম' 'স্বকর্ম', 'কর্তব্য কর্ম' 'নিয়ত কর্ম' ইত্যাদি শব্দে সর্বত্রই শাস্ত্রবিহিত কর্মই গীতার অভিপ্রেত (৩।৮, ১৬।২৪ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

অবশ্য গীতার ভাবা সঙ্কীর্ণতাবর্জিত, সুতরাং যাঁহারা বর্ণাশ্রমধর্ম মানেন না, তাঁহারা এরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থও গ্রহণ করেন না; তাঁহারা 'স্বধর্ম' অর্থ করেন

নিজের 'কর্তব্য কর্ম'। বিদেশীয় ভাষায় অনুবাদকগণ সকলেই এইরূপই অর্থ করিয়াছেন। যথা—

'To die performing *duty* is no ill ;
But who seeks other roads shall wander still.'

—*Arnold* (*The Song Celestial*)

'Better death in the discharge of one's
Own *duty* ; the *duty* of another is full of danger'.

—*Annie Besant*

এখন বিবেচ্য—বর্তমান হিন্দুসমাজে বর্ণভেদ আছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বর্ণধর্ম নাই। ব্রাহ্মণগণ জীবিকানির্বাহার্থ বৈশ্য-শূদ্রাদির কর্ম গ্রহণ করিয়াছেন; শ্ব-বৃত্তি (কুকুরবৃত্তি বা চাকুরী) আপৎকালেও ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ, কিন্তু উহা ত্যাগ করা এখন তাঁহাদের পক্ষে একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। পক্ষান্তরে শূদ্রাদিও উচ্চ বর্ণের কর্ম গ্রহণ করিয়া জীবিকার্জন করিতেছেন। এইরূপ শাস্ত্রোক্ত ধর্মের নানারূপ ব্যভিচার দৃষ্ট হইতেছে। এখন 'স্বধর্ম' বলিতে আমরা বর্তমান হিন্দুগণ কি বুঝিব? গীতার মূল কথা, স্বধর্ম-পালন। স্বধর্মই যদি নির্দেশ করিতে না পারিলাম, তবে গীতোক্ত ধর্মানুসারে কর্মজীবন নিয়মিত করিব কিরূপে? এ সমস্যার উত্তর কি? এ সম্বন্ধে আধুনিক হিন্দুগণের মধ্যে প্রধানতঃ দুই মত—দুই দল। এক দল রক্ষণশীল, অপর দল সংস্কারক বা পরিবর্তবাদী।

(১) **রক্ষণশীল দল** বলেন—বর্ণাশ্রমধর্ম ত্যাগ করিলে হিন্দুধর্ম থাকে না। শ্রীভগবান্ স্বয়ং গীতায় বর্ণাশ্রমধর্ম পালনের কর্তব্যতা নির্দেশ করিয়াছেন, ইহার উপরে টীকা-টিপ্পনী চলে না। যাহাতে হিন্দু-সমাজে আবার বর্ণাশ্রমধর্ম সম্যক্‌রূপে সংস্থাপিত হয়, তাহাই কর্তব্য।

"প্রাচীন সংস্কারবশতঃ মানুষ এক একটি মুখ্য অভ্যাস লইয়া জন্মগ্রহণ করে। যাহার যে অভ্যাস বা সংস্কারে জন্ম সে সেই ভাব লইয়াই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। এ জন্য বর্ণাশ্রম-ধর্ম স্বাভাবিক।"—৺রামদয়াল মজুমদার।

(২) **কিন্তু পরিবর্তবাদিগণ** 'স্বধর্ম' শব্দের এরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থ গ্রহণ করেন না। তাঁহারা বলেন, "সমাজমাত্রেই কর্মানুসারে শ্রেণী-বিভাগ আছে। যাঁহারা ধর্ম ও জ্ঞান চর্চা করেন এবং লোকশিক্ষা দেন তাঁহারাই ব্রাহ্মণ, যাঁহারা দেশ রক্ষা করেন তাঁহারা ক্ষত্রিয়, যাঁহারা কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য দ্বারা দেশের অন্নবস্ত্রের

ব্যবস্থা করেন তাঁহারা বৈশ্য এবং এই তিন শ্রেণীর সাহায্যার্থে যাঁহারা পরিচর্যাত্মক কর্ম করেন তাঁহারা শূদ্র।" "এই সকল কর্মের মধ্যে যিনি যাহা গ্রহণ করেন, উপজীবিকার জন্যই হউক আর যে কারণেই হউক, যাহার ভার আপনার উপর গ্রহণ করেন, তাহাই তাঁহার অনুষ্ঠেয় কর্ম, তাঁহার duty, তাহাই তাঁহার স্বধর্ম।—বঙ্কিমচন্দ্র।

* * * যাহা ভগবদুক্তি—গীতাই হউক, Bibleই হউক, স্বয়ং অবতীর্ণ ভগবানের স্বমুখনির্গতই হউক বা তাঁহার অনুগৃহীত মানুষের মুখনির্গতই হউক—যখন উহা প্রচারিত হয়, উহা তখনকার ভাষায় ব্যক্ত হইয়া থাকে এবং তখনকার সমাজের ও লোকের শিক্ষা ও সংস্কারের অবস্থার অনুগত যে অর্থ তাহাই তৎকালে গৃহীত হয়। কিন্তু সমাজের অবস্থা ও লোকের শিক্ষা ও সংস্কার-সকল কালক্রমে পরিবর্তিত হয়। তখন ভগবদুক্তির ব্যাখ্যারও সম্প্রসারণ আবশ্যক হয়। * * * প্রাচীনকালে বর্ণাশ্রম বুঝিলেই ঈশ্বরোক্তির কালোচিত ব্যাখ্যা করা হয়; আমি যেরূপ বুঝাইলাম এখন সেইরূপ বুঝিলেই কালোচিত ব্যাখ্যা করা হয়।" —বঙ্কিমচন্দ্র

তবে, আধুনিক চিন্তাশীল লেখকগণের সকলেই স্বীকার করেন যে, বর্ণধর্ম অধুনা পালন করা অসম্ভব হইলেও, বর্ণভেদ বা ধর্মভেদ যে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত, আমাদের ঐ মূলতত্ত্বের উপর লক্ষ্য রাখিয়াই স্বধর্ম নির্ণয় করা প্রয়োজন, নচেৎ সফলতা সম্ভবপর নহে। সে মূলতত্ত্ব কি?—"কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ" (১৮।৪১)—প্রকৃতিজাত গুণানুসারেই চতুর্বর্ণের কর্মসকল বিভক্ত হইয়াছে। এ কথার তাৎপর্য কি এবং স্বধর্ম অপেক্ষা পরধর্ম ভয়াবহ কেন তাহা স্বনামখ্যাত সুপণ্ডিত চিন্তাশীল লেখক ও তৎকালীন রাষ্ট্রীয় নেতা স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন—

"স্বধর্ম বলিতে ভগবান্ প্রত্যেক জীবের নিজস্ব প্রকৃতির যে ধর্ম তাহাকেই নির্দেশ করিয়াছেন। জীবপ্রকৃতি সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন গুণের দ্বারা বিশিষ্ট হইয়া মোটের উপর তিন ভাবে বিভক্ত হইয়াছে। যাহার প্রকৃতি তামসিক, তাহার ধর্মও তামসিক হইবে। এই ধর্মের অনুশীলন করিয়াই এই তামসিক প্রকৃতি ক্রমে ক্রমে রজঃপ্রাধান্য লাভ করিয়া রাজসিক হইয়া উঠিবে। প্রকৃতি যাহার তামসিক, প্রকৃতি যাহার আলস্য, নিদ্রা, মূঢ়তার দ্বারা আচ্ছন্ন, তাহার রাজসিক অনুষ্ঠান সহজ নয়, ক্লেশকর হইয়া উঠে। যাহা ক্লেশকর তাহাতে জীবের অনুরাগ জন্মে না। অনুরাগ ব্যতীত অন্তরের পরিবর্তনও হয় না। তামসিক প্রকৃতির পক্ষে রাজসিক ধর্মের অনুশীলন বাহিরের

অনুষ্ঠানেই আবদ্ধ হইয়া থাকে ; যজমানের অন্তরকে স্পর্শ করে না ; তাহা ভয়াবহ পরধর্মই হইয়া থাকে। আবার প্রকৃতি যাহার রাজসিক—সুখ ও প্রভুত্ব যে চাহে, সুখ ও প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষা যাহার প্রকৃতির অস্থি-মজ্জাগত হইয়া আছে, তাহাকে ত্যাগপ্রধান সাত্ত্বিক বিশ্বধর্মের অনুশীলনে প্রবৃত্ত করিলে তাহাও ভয়াবহ পরধর্মই হইয়া রহিবে। এইরূপ প্রকৃতি যাহার সাত্ত্বিক নির্লোভ, অমানিত্ব অদম্ভিতা সত্য এবং সারল্য বা ঋজুতা যাহার সহজ-সিদ্ধ তাহাকে রাজসিক বা তামসিক ধর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করাইলে, ইহাও ভয়াবহ পরধর্মই হইয়া উঠে। যাহার প্রকৃতি যাহা নহে, সে তাহা করিতে গেলে, ভাল করিয়া তাহা করিতে পারে না, অথচ সকল দিকেই কেবল নিষ্ফলতা আহরণ করে। এই জন্যই ভগবান্ কহিয়াছেন যে, অসম্যক্-আচরিত বা বিগুণ স্বধর্ম বা প্রকৃতিগত ধর্মও সম্যক্-আচরিত নিজের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ পরধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। নিজের প্রকৃতির অনুযায়ী যে ধর্ম, তাহার অনুসরণ করিতে যাইয়া জীব যদি সংসারে সাংসারিক অর্থে বিনাশও প্রাপ্ত হয়, তাহাও শ্রেয়স্কর। কিন্তু পরধর্ম সর্বদাই ভয়াবহ। তাহাতে জীবের একূল ওকূল দুই কূলই নষ্ট হইয়া যায়।"

সুতরাং স্বধর্ম যে স্বভাবনিয়ত ধর্ম ইহা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু কোন্‌টি নিজ স্বভাব, তাহা নির্ণয় করিব কিরূপে? এই স্থলেই মত-পার্থক্য। রক্ষণশীল দল বলেন—স্বভাব অর্থাৎ প্রাচীন সংস্কারবশতঃই জীবের ব্রাহ্মণাদি বিভিন্ন বর্ণে জন্ম হয়। সুতরাং যিনি যে বর্ণে দেহধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করেন, সেই বর্ণোচিত স্বভাবই তাঁহার নিজের স্বভাব। যিনি ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার স্বভাব সত্ত্বগুণ-প্রধান, যিনি শূদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার স্বভাব তমোগুণ-প্রধান, ইহাই সমীচীন সিদ্ধান্ত। বংশানুক্রমদ্বারা স্বভাবের বিশুদ্ধি এবং স্বভাবানুগত কর্ম-কুশলতা পুরুষানুক্রমে রক্ষিত। এই জন্য জাতিভেদ বংশানুগত। "যেমন ব্যাঘ্রের শিশু ব্যাঘ্রই হয়, আম্রবীজ হইতে আম্রবৃক্ষই জন্মে, সেইরূপ ব্রাহ্মণ নিজশক্তির ব্যভিচার না করিলে তাঁহার সন্তান ব্রাহ্মণই হইয়া থাকেন।"

পরিবর্তবাদিগণ বলেন—অনাদি কাল হইতে আম্রবীজ হইতে আম্রবৃক্ষই জন্মিতেছে, ব্যাঘ্রের শিশু ব্যাঘ্রই হইতেছে; কিন্তু সত্ত্বগুণ-প্রধান আদি ব্রাহ্মণ হইতে কেবল শমদমাদিগুণসম্পন্ন সন্তানের জন্ম হইতেছে না, পক্ষান্তরে তমোগুণপ্রধান আদি শূদ্রের বংশধরগণের মধ্যেও সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন লোক পরিদৃষ্ট হইতেছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে বংশানুক্রম স্বভাবের

অর্জুন উবাচ

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬

শ্রীভগবান্ উবাচ

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩৭

বিশুদ্ধিরক্ষার বা স্বভাব নির্ণয়ের একমাত্র নিয়ামক নহে, ইহা নিশ্চিত। সুতরাং "ন জাতিঃ পূজ্যতে রাজন্ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ" (গৌতম সংহিতা) ইত্যাদি শাস্ত্র-সিদ্ধান্তই সমীচীন বোধ হয়। বস্তুতঃ, কালের গতিতে, অবস্থার পরিবর্তনে, জীবের কর্মফলে ব্যক্তিগত ও জাতিগত স্বভাবের নিয়ত পরিবর্তন হইতেছে; সুতরাং ব্রাহ্মণাদি জাতির সত্ত্বাদি স্বাভাবিক গুণের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইতেছে; সুতরাং তদনুসারে তাহাদের স্বধর্মের বা স্বকর্মের পরিবর্তন না করিলে বর্ণভেদের মূলসূত্র রক্ষিত হয় না, শাস্ত্রানুগত স্বধর্ম পালনও হয় না। এইরূপে সময়োপযোগী পরিবর্তন সাধন জন্যই যুগধর্ম প্রবর্তন হয়। এইরূপে সনাতন ধর্মের বিশুদ্ধি রক্ষিত হয়। হিন্দুধর্ম এইরূপ পরিবর্তনসহ বলিয়াই উহা সনাতন, নিত্য; উহার কখনও লোপ হয় না। সুতরাং ধর্ম-ব্যবস্থার সময়োপযোগী পরিবর্তন সনাতন-ধর্মসম্মত ও সমাজরক্ষার অনুকূল। উহাই যুগধর্ম, তদনুসারেই আমাদের স্বধর্ম নির্ণয় করা প্রয়োজন।

স্বধর্ম—স্বভাবনিয়ত কর্ম। কালের গতিতে স্বভাবের অভিব্যক্তি ও পরিণতি হয়। কালের গতিতে মানুষে যে সাধারণ স্বভাব গঠিত হয়, সেই স্বভাবনিয়ত ধর্ম যুগধর্ম। জাতির কর্মগতিতে যে জাতীয় স্বভাব গঠিত হয়, সেই স্বভাবনিয়ত কর্ম জাতির ধর্ম। ব্যক্তির কর্মগতিতে যে স্বভাব গঠিত হয়, সেই স্বভাবনিয়ত কর্ম ব্যক্তির ধর্ম। এই নানা ধর্ম সনাতন ধর্মের সাধারণ আদর্শ দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত ও শৃঙ্খলিত হয়। সাধারণ ধার্মিকের পক্ষে এই ধর্মই স্বধর্ম।—শ্রীঅরবিন্দ (৪।১৩ এবং ১৮।৪১ শ্লোকের ব্যাখ্যাও দ্রষ্টব্য)।

৩৬। অর্জুনঃ উবাচ—হে বার্ষ্ণেয় (কৃষ্ণ), অথ কেন প্রযুক্তঃ (কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া) অয়ং পূরুষঃ (এই মনুষ্য) অনিচ্ছন্ অপি (ইচ্ছা না করিলেও) বলাৎ নিয়োজিত ইব (যেন বলপূর্বক নিয়োজিত হইয়া) পাপং চরতি (পাপাচরণ করে)।

অর্জুন কহিলেন—হে কৃষ্ণ, লোকে কাহাদ্বারা প্রযুক্ত হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন বলপূর্বক নিয়োজিত হইয়াই পাপাচরণ করে? ৩৬

তুমি বলিতেছ—ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের রাগদ্বেষ অবশ্যম্ভাবী, উহার অধীন হইও না। বুঝিলাম, ভাল কথা। কিন্তু ইচ্ছা না থাকিলেও কে যেন বলপূর্বক ইন্দ্রিয়ের বশীভূত করায়, মনুষ্যকে স্বধর্মচ্যুত করায়, পাপে প্রবৃত্ত করায়। কাহার প্রেরণায় এইরূপ হয়? ৩৬

৩৭। শ্রীভগবান্ উবাচ, এষঃ কামঃ (ইহা কাম) এষঃ ক্রোধঃ (ইহা ক্রোধ)। [এষ এব] রজোগুণ-সমুদ্ভবঃ (রজোগুণ হইতে উৎপন্ন) মহাশনঃ (দুষ্পূরণীয়) মহাপাপ্মা (অতিশয় উগ্র); ইহ (সংসারে) এনং বৈরিণং বিদ্ধি (ইহাকে শত্রু বলিয়া জানিবে)।

কামনাই সর্বপাপের মূল—ইন্দ্রিয় সংযম ও আত্মশক্তি প্রয়োগে উহা দমনের উপায় ৩৬-৪৩

শ্রীভগবান্ বলিলেন, ইহা কাম, ইহাই ক্রোধ। ইহা রজোগুণোৎপন্ন, ইহা দুষ্পূরণীয় এবং অতিশয় উগ্র। ইহাকে সংসারে শত্রু বলিয়া জানিবে। ৩৭

ইহাই কাম, ইহাই ক্রোধ—'কাম' অর্থ কামনা, বিষয়বাসনা। কাম প্রতিহত হইলেই ক্রোধে পরিণত হয়, সুতরাং কাম ও ক্রোধ একই, এই হেতু উভয়ের নামোল্লেখ করিয়াও একবচন ব্যবহৃত হইয়াছে (২।৫৫, ২।৬২ শ্লোক)। **মহাশন**—যে অধিক আহার করে; কামনা দুষ্পূরণীয়, উহার কিছুতেই তৃপ্তি নাই, এই জন্য মহাশন। **মহাপাপ্মা**—মহাপাপ [অত্যুগ্র]। **ইহ**—এই সংসারে বা মোক্ষপথে। **কাম**—কাম শব্দে রিপুবিশেষকেও বুঝায়, কিন্তু এ স্থলে সেরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থে ইহা ব্যবহৃত হয় নাই।

পথের কণ্টক—বাসনা, ষড়্রিপু

শাস্ত্রকারগণ আত্মোন্নতির প্রধান অন্তরায়গুলির নাম দিয়াছেন ষড়্রিপু—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য। রূপরসাদি ইন্দ্রিয় বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়গণের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ তাহারই নাম **কাম**। ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে এটি বড় দারুণ, সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়-দোষ বলিতে ইহাই বুঝায় এবং সঙ্কীর্ণ অর্থে ইহাকে **কাম** বলে। বস্তুতঃ 'কাম' অর্থ কামনা, যে-কোন রূপ ভোগবাসনা। বাসনা প্রতিহত হইলেই **ক্রোধের** উদ্রেক হয়, কেহ আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিলেই আমাদের ক্রোধ জন্মে। আবার এই বাসনা মিষ্টরসাদি বা ধনাদির দিকে অতিমাত্রায় আকৃষ্ট হইলেই তাহাকে **লোভ** বলে।

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৩৮
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯

এই বিষয়-বাসনাই আমাদিগকে অনিত্য বস্তুতে আসক্ত করিয়া রাখে, আত্মজ্ঞান আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, উহার অতীত যে নিত্যবস্তু তাহা দেখিতে দেয় না। ইহারই নাম **মোহ**, অজ্ঞান বা মায়া (৩।৩৯)। এই অজ্ঞানতাটাই যখন 'আমি ধনী', 'আমি জ্ঞানী' এইরূপ অহমিকার আকার ধারণ করে, তখন তাহাকে বলে **মদ**। এই অহমিকাটা আবার যখন পরের উন্নতি দর্শনে বাধাপ্রাপ্ত বা সঙ্কুচিত হয় অর্থাৎ অমুকে আমা অপেক্ষা ধনী, অমুকে আমা অপেক্ষা জ্ঞানী, এই অপ্রীতিকর সত্যটা যখন আমার ধনগর্ব বা জ্ঞানগর্বকে খর্ব করিয়া দেয় তখন যে চিত্তক্ষোভ উপস্থিত হয়, তাহারই নাম **মাৎসর্য** বা পরশ্রীকাতরতা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রিপুগুলির সকলেরই মূল হইতেছে কাম, কামনা বা বাসনা। এইগুলি এক বস্তুরই বিভিন্ন বিকাশ, এক ভাবেরই বিভিন্ন বিভাব। তাই অর্জুনের প্রশ্নোত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, কামনাই সকল অনর্থের মূল, উহাই মানবের একমাত্র শত্রু ; এই কামনা ত্যাগ করিতে পারিলেই সকল অনর্থ ঘুচিয়া পরমার্থ লাভ হয় (৩।৭১।৭৩)।

৩৮। যথা (যেমন) বহ্নিঃ (অগ্নি) ধূমেন আব্রিয়তে (ধূমের দ্বারা আবৃত হয়), যথা আদর্শঃ (দর্পণ) মলেন (ধূলিদ্বারা) [আবৃত হয়], যথা গর্ভঃ উল্বেন (জরায়ুদ্বারা) আবৃতঃ তথা (সেইরূপ) তেন (সেই কামদ্বারা) ইদম্ (ইহা, জ্ঞান) আবৃতম্ (আবৃত হয়)।

ইদং—এই শ্লোকে 'ইদম্' শব্দদ্বারা 'জ্ঞান'কে লক্ষ করা হইয়াছে। পরের শ্লোক দ্রষ্টব্য। অথবা, ইদম্—এই সমস্ত, এই সংসার। কামনাই সংসারবন্ধের মূল।

যেমন ধূমদ্বারা বহ্নি আবৃত থাকে, মলদ্বারা দর্পণ আবৃত হয়, জরায়ুদ্বারা গর্ভ আবৃত থাকে, সেইরূপ কামের দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে। ৩৮

বিষয়-বাসনা থাকিতে আত্মজ্ঞানের উদয় হয় না। যেমন ধূম অপসারিত হইলে অগ্নি প্রকাশিত হয়, ধূলিমল অপসারিত হইলে দর্পণের স্বচ্ছতা প্রতিভাত হয়, প্রসবের দ্বারা জরায়ু প্রসারিত হইলে ভ্রূণের প্রকাশ হয়, সেইরূপ বিষয়-বাসনা বিদূরিত হইলে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় (সংসারের ক্ষয় হয়)।

৩৯। হে কৌন্তেয় (অর্জুন), জ্ঞানিনঃ নিত্যবৈরিণা (জ্ঞানীর চিরশত্রু)

ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্॥ ৪০
তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্॥ ৪১

এতেন কামরূপেণ দুষ্পূরেণ অনলেন চ (এই কামরূপ দুষ্পূরণীয় অগ্নির দ্বারা) জ্ঞানম্ আবৃতম্ (জ্ঞান আবৃত হইয়া থাকে)।

হে কৌন্তেয়, জ্ঞানীদিগের নিত্যশত্রু এই দুষ্পূরণীয় অগ্নিতুল্য কামদ্বারা জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে। ৩৯

কাম অগ্নিতুল্য, কেননা উহা নিদারুণ সন্তাপদায়ক। কাম দুষ্পূরণীয়, উপভোগে কখনই বাসনার নিবৃত্তি হয় না।—"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।" —মনু ৩৯

৪০। ইন্দ্রিয়াণি মনঃ বুদ্ধিঃ (ইন্দ্রিয়সকল, মন ও বুদ্ধি) অস্য অধিষ্ঠানম্ উচ্যতে (ইহার আশ্রয় বলিয়া কথিত হয়); এষঃ (এই কাম) এতৈঃ (ইহাদিগের দ্বারা) জ্ঞানম্ আবৃত্য (জ্ঞানকে আবৃত করিয়া) দেহিনং বিমোহয়তি (জীবকে মুগ্ধ করে)।

ইন্দ্রিয়সকল, মন ও বুদ্ধি—ইহারা কামের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়স্থান বলিয়া কথিত হয়। কাম ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়া জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া জীবকে মুগ্ধ করে। ৪০

মন, বুদ্ধি—'মনো নাম সঙ্কল্পবিকল্পাত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তিঃ বুদ্ধির্নাম নিশ্চয়াত্মিকান্তঃকরণবৃত্তিঃ'—বেদান্তসার। মন সঙ্কল্পবিকল্পাত্মিকা বৃত্তি, বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি। মন নানারূপ সঙ্কল্প-বিকল্প করে, বুদ্ধি একটি নিশ্চয় করে। (২।৪১ ব্যাখ্যা দ্রঃ)

ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই তিনটি কামের আশ্রয় বা অবলম্বন। কাম মনকে আশ্রয় করিয়া বহুবিধ সুখের কল্পনা করে, বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া নিশ্চয় করে, শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহকে আশ্রয় করিয়া রূপরসাদি বিষয় ভোগ করে, হস্তপদাদি কর্মেন্দ্রিয়সমূহকে আশ্রয় করিয়া বিরুদ্ধ কর্ম করে। এইরূপ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সাহায্যে পুরুষকে বিষয়ে লিপ্ত করিয়া তাহাকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তাহার আত্মজ্ঞানের স্ফূর্তি হইতে পারে না। সুতরাং কামের আশ্রয়স্বরূপ ইন্দ্রিয়াদিকে প্রথম বশীভূত করা কর্তব্য (পরের শ্লোক)।

৪১। হে ভরতর্ষভ (ভরত-শ্রেষ্ঠ), তস্মাৎ (সেই হেতু) ত্বম্ (তুমি) আদৌ (প্রথমে) ইন্দ্রিয়াণি নিয়ম্য (ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া) জ্ঞানবিজ্ঞান-

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যোবুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥ ৪২
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৪৩

নাশনং (জ্ঞান ও বিজ্ঞানের নাশকারী) পাপ্মানং এনং (পাপরূপ ইহাকে, অর্থাৎ কামকে) প্রজহি (বিনষ্ট কর, অথবা, পরিত্যাগ কর)।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ, সেই হেতু তুমি অগ্রে ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া জ্ঞানবিজ্ঞান-বিনাশী পাপস্বরূপ কামকে বিনষ্ট কর (বা পরিত্যাগ কর)। ৪১

কাম, প্রবল শত্রু। ইন্দ্রিয়াদি উহার অবলম্বন বা আশ্রয়স্বরূপ। তুমি প্রথমে কামের অবলম্বনস্বরূপ ইন্দ্রিয়দিগকে জয় কর, তবেই কাম জয় করিতে পারিবে। ৪১

জ্ঞান ও বিজ্ঞান—"জ্ঞানং শাস্ত্রত আচার্যতশ্চ আত্মাদীনামববোধঃ, বিজ্ঞানং বিশেষস্তদনুভবঃ"—শঙ্কর। শাস্ত্র ও আচার্যের উপদেশে আত্মাদি সম্বন্ধে যে বোধ জন্মে তাহা জ্ঞান। নিদিধ্যাসন বা ধ্যানাদি দ্বারা আত্মার যে অনুভব তাহাই বিজ্ঞান। **প্রজহি**—পরিত্যজ (শঙ্কর), ঘাতয় (শ্রীধর), 'পরিত্যাগ কর' বা 'বিনাশ কর' উভয় অর্থই হয়।

৪২। [পণ্ডিতগণ] ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণকে) পরাণি (শ্রেষ্ঠ) আহুঃ (করিয়া থাকেন); ইন্দ্রিয়েভ্যঃ (ইন্দ্রিয়গণ হইতে) মনঃ পরং (মন শ্রেষ্ঠ); মনসঃ তু বুদ্ধিঃ পরা (মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ); যঃ তু (যিনি) বুদ্ধেঃ পরতঃ (বুদ্ধির উপরে) সঃ (তিনিই আত্মা)।

ইন্দ্রিয়সকল শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়; ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ; মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ; বুদ্ধি হইতে যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই আত্মা। ৪২

৪৩। হে মহাবাহো, এবং (এইরূপে) বুদ্ধেঃ পরং (বুদ্ধির শ্রেষ্ঠ আত্মাকে) বুদ্ধ্বা (জানিয়া) আত্মনা (আত্মাদ্বারা) আত্মানং (আত্মাকে) সংস্তভ্য (নিশ্চল করিয়া) কামরূপং দুরাসদং শত্রুং জহি (কামরূপ দুর্জয় শত্রুকে নাশ কর)।

হে মহাবাহো, এইরূপে বুদ্ধির সাহায্যে বুদ্ধিরও উপরে অবস্থিত পরমাত্মা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া, আত্মাকে আত্মশক্তির প্রয়োগেই ধীর ও নিশ্চল কর এবং দুর্নিবার শত্রু কামকে বিনাশ কর (শ্রীঅরবিন্দ)।

অথবা, নিজেই নিজেকে সংযত করিয়া কামরূপ দুর্জয় শত্রুকে মারিয়া ফেল (লোকমান্য তিলক)। অথবা, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিদ্বারা মনকে নিশ্চল করিয়া কামরূপ দুর্জয় শত্রু (কামকে) বিনাশ কর (শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা)। ৪৩

বলা হইল, ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ ; ইন্দ্রিয়গণ হইতে মন শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি। ইন্দ্রিয়গণ কি হইতে শ্রেষ্ঠ ?—অর্থাৎ স্থূল ভূত হইতে ? শ্রেষ্ঠ কেন ? কেননা উহা সূক্ষ্ম, প্রকাশক ও দেহাদির পরিচালক। মনকে অন্তরিন্দ্রিয় বলে, উহা বহিরিন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি মনকে চালায়, এই জন্য বুদ্ধি মন হইতে শ্রেষ্ঠ ; বুদ্ধি হইতে যিনি শ্রেষ্ঠ, যিনি সাক্ষিরূপে সকলের অন্তরে আছেন—তিনিই আত্মা।

সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা—আত্মাদ্বারা আত্মাকে নিশ্চল করিয়া, আত্মাকে আত্মশক্তি দ্বারাই নিশ্চল করিয়া (শ্রীঅরবিন্দ) ; নিজেই নিজেকে সংযত করিয়া (লোকমান্য তিলক) ; অথবা, এস্থলে প্রথমোক্ত 'আত্মা' শব্দে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, পরবর্তী 'আত্মা' শব্দে মন বুঝাইতেছে। —শ্রীধরস্বামী

পূর্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে, কাম জয়ার্থ প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়দিগকে নিয়মিত করিতে হইবে ; কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ বিষয়োপভোগে বিরত থাকিলেও বিষয়াভিলাষ বিদূরিত হয় না, কিন্তু ইন্দ্রিয়াদি হইতে যে শ্রেষ্ঠ ও স্বতন্ত্র আত্মা তাহাতে চিত্ত সমাহিত হইলেই বিষয়-বাসনা বিদূরিত হইতে পারে, সুতরাং চিত্তকে আত্মসংস্থ কর, তবেই কামজয় হইবে (২।৫৫, ২।৫৯ দ্রষ্টব্য)।

আত্ম-স্বাতন্ত্র্য ও প্রকৃতির বশ্যতা

অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন যে, কামনাই সকল অনর্থের মূল—উহা প্রকৃতির রজোগুণ হইতে উদ্ভূত। কিন্তু পূর্বে বলা হইয়াছে, জ্ঞানী ব্যক্তিও প্রকৃতির অনুবর্তন করেন ; ইন্দ্রিয়াদির উপর জোর-জবরদস্তি করিয়া কোন ফল নাই (৩।৩৩), তবে কি জীবের আত্ম-স্বাতন্ত্র্য নাই, তাহার আত্মোন্নতির উপায় নাই ? জীব কি সর্বতোভাবে প্রকৃতিরই বশীভূত ? না, তাহা নহে। যে জীব প্রকৃতির বশীভূত, সে 'কাঁচা আমি', আভাস আত্মা,—সে মনে করে আমি কামনা করি, কর্ম করি ; মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় সকলই আমার, আমিই কর্তা ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়াদি প্রকৃতির যন্ত্র এবং কর্ত্রীও প্রকৃতিই। কিন্তু এই দেহেন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধিরও উপরে যিনি আছেন তিনিই 'পাকা আমি', প্রকৃত আত্মা ; তিনি নিত্যমুক্ত-স্বভাব হইয়াও

দেহোপাধিবশতঃ বদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হন এবং দেহাধিষ্ঠিত কালে জীবাত্মা বলিয়া কথিত হন; বস্তুতঃ তিনি বদ্ধ নন, তিনি প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য স্বতঃই প্রেরণা দিতেছেন—জীব যখন তাঁহাকে জানিতে পারে, তাঁহার প্রেরণা বুঝিতে পারে, তখন আর তাহার প্রকৃতির বশ্যতা থাকে না, 'আমি' 'আমি' মোহ থাকে না, কামনা-কলুষ থাকে না; 'পাকা আমি'র জ্ঞানের দ্বারা 'কাঁচা আমি' দূরীভূত হন, ইহাকেই বলা হইতেছে—আত্মার দ্বারা আত্মাকে স্থির করা বা নিজেই নিজেকে স্থির করা। ইহারই নাম আত্ম-স্বাতন্ত্র্য। **জ্ঞানমার্গে** আত্মতত্ত্বের স্মরণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারাই এই আত্ম-স্বাতন্ত্র্য লাভ করা যায়। **যোগমার্গে** প্রত্যাহার ধ্যানধারণাদি দ্বারা মনকে নিশ্চল করিলে এই আত্মস্বরূপ প্রকাশিত হন (পূর্বোক্ত স্বামিকৃত ব্যাখ্যার মর্ম ইহাই)। **ভক্তিমার্গে** বলা হয় যে, আত্মজ্ঞান বা আত্মার শুদ্ধ প্রেরণা পরমাত্মারূপ শ্রীভগবান্ হইতেই আসে, তাঁহাতে চিত্ত স্থির করিতে পারিলেই, অনন্যভক্তিযোগে তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিলেই, প্রকৃতির বন্ধন দূর হয়, ইন্দ্রিয়-বিষয়ে রাগদ্বেষ লোপ পায়, কামনা দূর হয়। শ্রীগীতায় এই কথাই পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে (২।৬১, ৩।৩০-৩১।৩৪, ১০।১০-১১, ১২।৬-৮, ১৪।২৬, ১৮।৬১, ১৮।৬৫-৬৬), যদিও গীতা অন্যান্য মার্গ স্বীকার করেন এবং যথাস্থানে তাহার আলোচনা ও উল্লেখ আছে (১২।৩-৪, ৫।২৭-২৮, ১৩।২৪-২৫ ইত্যাদি)। অপিচ ৬।৫-৬, ১৮।৬১-৬৩ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় অধ্যায়—বিশ্লেষণ ও সার-সংক্ষেপ

১—২ অর্জুনের প্রশ্ন—কর্ম ও জ্ঞান, ইহার কোন্‌টি শ্রেয়োমার্গ? ৩—৮ শ্রীভগবানের উত্তর—জ্ঞান (সাংখ্য) ও কর্ম (যোগ)—এই দুই নিষ্ঠা উক্ত হইয়াছে—কিন্তু কর্ম না করিয়া থাকা যায় না, সুতরাং অনাসক্ত ভাবে কর্ম করাই কর্তব্য। ৯—১৬ যজ্ঞার্থ কর্মও মুক্তসঙ্গ হইয়া করা কর্তব্য—সৃষ্টিরক্ষার্থ যজ্ঞাদির কর্তব্যতা। ১৭—১৯ আত্মতৃপ্ত জ্ঞানী ব্যক্তির নিজের কোন কর্ম নাই, কর্ম করা না করা তাঁহার সমান; সেইরূপ নিঃস্বার্থভাবে কর্তব্য কর্ম করিবে। ২০—২৪ জনকাদির এবং স্বয়ং ভগবানের দৃষ্টান্ত। ২৫—২৯ জ্ঞানী ও অজ্ঞানের পার্থক্য—জ্ঞানী নিষ্কাম কর্মাচরণের আদর্শ দ্বারা অজ্ঞানকে কর্ম-মাহাত্ম্য দেখাইবেন। ৩০—৩২ সর্বকর্ম ভগবানে সমর্পণপূর্বক নিষ্কাম হইয়া যুদ্ধার্থ উপদেশ। ৩৩—৩৫ স্বভাব বলবান্, ইন্দ্রিয়পীড়ন বা বিনাশ করিয়া লাভ নাই—

ইন্দ্রিয় স্ববশে রাখিয়া পালন করিবে—পরধর্মে লোভ করিবে না। ৩৬—৪৩ কামনাই সর্বপাপের মূল—ইন্দ্রিয়-সংযম ও আত্মশক্তি প্রয়োগ কামদমনের উপায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বর্ণনায় আত্মসংযম এবং কামনা ও অহঙ্কার বর্জনাদির উপদেশ দিয়া শ্রীভগবান্ বলিলেন যে, স্থিতপ্রজ্ঞতাই—এই অবস্থাই—ব্রাহ্মীস্থিতি বা ব্রহ্মজ্ঞানে অবস্থান। পূর্বে একথাও বলিয়াছেন যে, কর্ম অপেক্ষা সাম্যবুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ, তাই এক্ষণে অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কর্ম অপেক্ষা সাম্যবুদ্ধিই যদি শ্রেষ্ঠ হয়, তবে আমাকে তুমি দারুণ হিংসাত্মক কর্মে নিযুক্ত করিতেছ কেন?

সর্বকামনা বর্জনপূর্বক সাম্যবুদ্ধি লাভ করিলেই তো জীবের মোক্ষলাভ হয়, কর্মের আবশ্যকতা কি? তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন—পূর্বে বলিয়াছি, মোক্ষলাভের দুই মার্গ আছে,—এক সন্ন্যাস-মার্গ বা সাংখ্য-মার্গ, আর কর্মযোগ-মার্গ। সন্ন্যাসমার্গে যে মোক্ষলাভ হয় তাহা জ্ঞানের ফলে, কর্ম-ত্যাগের দরুণ নয়; আর কর্মযোগে যে সিদ্ধি লাভ হয় তাহাও সমত্ব বুদ্ধি বা সম্যক্ জ্ঞানের ফলে, এই জন্যই তোমাকে কর্মোপদেশ দিতেছি অথচ সাম্যবুদ্ধির প্রশংসা করিতেছি, উহা ব্যতীত কর্ম নিষ্কাম হয় না। কিন্তু জ্ঞান শ্রেষ্ঠ বলিয়াই কি তুমি কর্ম ত্যাগ করিতে পার? প্রকৃতির গুণে বাধ্য হইয়াই তোমাকে কর্ম করিতে হইবে। দেহধারী জীব একেবারে কর্ম ত্যাগ করিতেই পারে না। যাহারা বাহ্যতঃ কর্ম ত্যাগ করিয়া মনে মনে বিষয়-চিন্তা করে তাহারা মিথ্যাচারী, কিন্তু যাঁহারা ইন্দ্রিয়সকল সংযত করিয়া অনাসক্তভাবে কর্ম করেন তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ। অতএব তুমি অনাসক্তভাবে কর্তব্য কর্ম কর, কর্ম ত্যাগ অপেক্ষা কর্মই শ্রেষ্ঠ। জগতের ধারণ-পোষণের জন্যই যজ্ঞাদি কর্মের সৃষ্টি হইয়াছে। যে কর্ম যাহার পক্ষে বিহিত তাহাই তাহার পক্ষে যজ্ঞস্বরূপ। এইরূপ নিয়ত কর্ম অনাসক্ত চিত্তে ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে করিতে পারিলে উহাই যথার্থ কর্ম হয়, উহাতে বন্ধন হয় না। আত্মারাম আত্মতৃপ্ত জ্ঞানী পুরুষদিগের নিজের কোন কর্ম নাই। তাঁহাদের কর্ম কেবল লোক-শিক্ষার্থ ও লোক-সংগ্রহার্থই হয়।

জনকাদি রাজর্ষিগণ কর্ম দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। আমিও লোক-শিক্ষার্থ স্বয়ং কর্মে ব্যাপৃত আছি, তুমিও তাহাই কর। নিষ্কাম কর্মের তিনটি লক্ষণ মনে রাখিও—(১) সর্বকর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ, (২) ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন,

দেহোপাধিবশতঃ বদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হন এবং দেহাধিষ্ঠিত কালে জীবাত্মা বলিয়া কথিত হন ; বস্তুতঃ তিনি বদ্ধ নন, তিনি প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য স্বতঃই প্রেরণা দিতেছেন—জীব যখন তাঁহাকে জানিতে পারে, তাহার প্রেরণা বুঝিতে পারে, তখন আর তাহার প্রকৃতির বশ্যতা থাকে না, 'আমি' 'আমি' মোহ থাকে না, কামনা-কলুষ থাকে না, 'পাকা আমি'র জ্ঞানের দ্বারা 'কাঁচা আমি' দূরীভূত হন, ইহাকেই বলা হইতেছে—আত্মার দ্বারা আত্মাকে স্থির করা বা নিজেই নিজেকে স্থির করা। ইহারই নাম আত্ম-স্বাতন্ত্র্য। **জ্ঞানমার্গে** আত্মতত্ত্বের স্মরণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারাই এই আত্ম-স্বাতন্ত্র্য লাভ করা যায়। **যোগমার্গে** প্রত্যাহার ধ্যানধারণাদি দ্বারা মনকে নিশ্চল করিলে এই আত্মস্বরূপ প্রকাশিত হন (পূর্বোক্ত স্বামিকৃত ব্যাখ্যার মর্ম ইহাই)। **ভক্তিমার্গে** বলা হয় যে, আত্মজ্ঞান বা আত্মার শুদ্ধ প্রেরণা পরমাত্মারূপ শ্রীভগবান্ হইতেই আসে, তাঁহাতে চিত্ত স্থির করিতে পারিলেই, **অনন্য**ভক্তিযোগে তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিলেই, প্রকৃতির বন্ধন দূর হয়, ইন্দ্রিয়-বিষয়ে রাগদ্বেষ লোপ পায়, কামনা দূর হয়। শ্রীগীতায় এই কথাই পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে (২।৬১, ৯।৩০-৩১।৩৪, ১০।১০-১১, ১২।৬-৮, ১৪।২৬, ১৮।৬১, ১৮।৬৫-৬৬), যদিও গীতা অন্যান্য মার্গ স্বীকার করেন এবং যথাস্থানে তাহার আলোচনা ও উল্লেখ আছে (১২।৩-৪, ৫।২৭-২৮, ১৩।২৪-২৫ ইত্যাদি)। অপিচ ৬।৫-৬, ১৮।৬১-৬৩ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় অধ্যায়—বিশ্লেষণ ও সার-সংক্ষেপ

১—২ অর্জুনের প্রশ্ন—কর্ম ও জ্ঞান, ইহার কোন্‌টি শ্রেয়োমার্গ? ৩—৮ শ্রীভগবানের উত্তর—জ্ঞান (সাংখ্য) ও কর্ম (যোগ)—এই দুই নিষ্ঠা উক্ত হইয়াছে—কিন্তু কর্ম না করিয়া থাকা যায় না, সুতরাং অনাসক্ত ভাবে কর্ম করাই কর্তব্য। ৯—১৬ যজ্ঞার্থ কর্মও মুক্তসঙ্গ হইয়া করা কর্তব্য—সৃষ্টিরক্ষার্থ যজ্ঞাদির কর্তব্যতা। ১৭—১৯ আত্মতৃপ্ত জ্ঞানী ব্যক্তির নিজের কোন কর্ম নাই, কর্ম করা না করা তাঁহার সমান ; সেইরূপ নিঃস্বার্থভাবে কর্তব্য কর্ম করিবে। ২০—২৪ জনকাদির এবং স্বয়ং ভগবানের দৃষ্টান্ত। ২৫—২৯ জ্ঞানী ও অজ্ঞানের পার্থক্য—জ্ঞানী নিষ্কাম কর্মাচরণের আদর্শ দ্বারা অজ্ঞানকে কর্ম-মাহাত্ম্য দেখাইবেন। ৩০—৩২ সর্বকর্ম ভগবানে সমর্পণপূর্বক নিষ্কাম হইয়া যুদ্ধার্থ উপদেশ। ৩৩—৩৫ স্বভাব বলবান্, ইন্দ্রিয়পীড়ন্ বা বিনাশ করিয়া লাভ নাই—

ইন্দ্রিয় স্ববশে রাখিয়া পালন করিবে—পরধর্মে লোভ করিবে না। ৩৬—৪৩ কামনাই সর্বপাপের মূল—ইন্দ্রিয়-সংযম ও আত্মশক্তি প্রয়োগ কামদমনের উপায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বর্ণনায় আত্মসংযম এবং কামনা ও অহঙ্কার বর্জনাদির উপদেশ দিয়া শ্রীভগবান্ বলিলেন যে, স্থিতপ্রজ্ঞতাই—এই অবস্থাই—ব্রাহ্মীস্থিতি বা ব্রহ্মজ্ঞানে অবস্থান। পূর্বে একথাও বলিয়াছেন যে, কর্ম অপেক্ষা সাম্যবুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ, তাই এক্ষণে অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কর্ম অপেক্ষা সাম্যবুদ্ধিই যদি শ্রেষ্ঠ হয়, তবে আমাকে তুমি দারুণ হিংসাত্মক কর্মে নিযুক্ত করিতেছ কেন?

সর্বকামনা বর্জনপূর্বক সাম্যবুদ্ধি লাভ করিলেই তো জীবের মোক্ষলাভ হয়, কর্মের আবশ্যকতা কি? তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন--পূর্বে বলিয়াছি, মোক্ষলাভের দুই মার্গ আছে,—এক সন্ন্যাস-মার্গ বা সাংখ্য-মার্গ, আর কর্মযোগ-মার্গ। সন্ন্যাসমার্গে যে মোক্ষলাভ হয় তাহা জ্ঞানের ফলে, কর্ম-ত্যাগের দরুণ নয়; আর কর্মযোগে যে সিদ্ধি লাভ হয় তাহাও সমত্ব বুদ্ধি বা সম্যক্ জ্ঞানের ফলে, এই জন্যই তোমাকে কর্মোপদেশ দিতেছি অথচ সাম্যবুদ্ধির প্রশংসা করিতেছি, উহা ব্যতীত কর্ম নিষ্কাম হয় না। কিন্তু জ্ঞান শ্রেষ্ঠ বলিয়াই কি তুমি কর্ম ত্যাগ করিতে পার? প্রকৃতির গুণে বাধ্য হইয়াই তোমাকে কর্ম করিতে হইবে। দেহধারী জীব একেবারে কর্ম ত্যাগ করিতেই পারে না। যাহারা বাহ্যতঃ কর্ম ত্যাগ করিয়া মনে মনে বিষয়-চিন্তা করে তাহারা মিথ্যাচারী, কিন্তু যাঁহারা ইন্দ্রিয়সকল সংযত করিয়া অনাসক্তভাবে কর্ম করেন তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ। অতএব তুমি অনাসক্তভাবে কর্তব্য কর্ম কর, কর্ম ত্যাগ অপেক্ষা কর্মই শ্রেষ্ঠ। জগতের ধারণ-পোষণের জন্যই যজ্ঞাদি কর্মের সৃষ্টি হইয়াছে। যে কর্ম যাহার পক্ষে বিহিত তাহাই তাহার পক্ষে যজ্ঞস্বরূপ। এইরূপ নিয়ত কর্ম অনাসক্ত চিত্তে ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে করিতে পারিলে উহাই যথার্থ কর্ম হয়, উহাতে বন্ধন হয় না। আত্মারাম আত্মতৃপ্ত জ্ঞানী পুরুষদিগের নিজের কোন কর্ম নাই। তাঁহাদের কর্ম কেবল লোক-শিক্ষার্থ ও লোক-সংগ্রহার্থই হয়।

জনকাদি রাজর্ষিগণ কর্ম দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। আমিও লোক-শিক্ষার্থ স্বয়ং কর্মে ব্যাপৃত আছি, তুমিও তাহাই কর। নিষ্কাম কর্মের তিনটি লক্ষণ মনে রাখিও—(১) সর্বকর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ, (২) ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন,

(৩) কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ। সুতরাং সর্ব কর্ম আমাতে অর্পণ করিয়া ফলাকাঙ্ক্ষা ও মমত্ববুদ্ধি বর্জনপূর্বক যুদ্ধ কর।

ইন্দ্রিয়গণের অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে বিদ্বেষ অবশ্যম্ভাবী। তুমি রাগদ্বেষের বশবর্তী হইও না, তাহা হইলেই ইন্দ্রিয়গণ তোমাকে বিপথে চালিত করিতে পারিবে না, তাহারা বশীভূত হইবে। এইরূপ আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়গণদ্বারা স্বধর্ম সম্পাদন কর, স্বধর্ম পালন কর। স্বধর্ম অঙ্গহীন হইলেও পরধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। লোকে কামনার বশবর্তী হইয়া পাপ আচরণ করে, স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম গ্রহণ করে, কর্তব্যভ্রষ্ট হয়। কামনাই সকল অনর্থের মূল। উহা দুষ্পূরণীয় ও দুর্জয়, শ্রেয়োমার্গের পরম শত্রু। মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় উহার অধিষ্ঠান-ভূমি, সুতরাং তুমি বুদ্ধিরও উপরে অবস্থিত পরমাত্মা সম্বন্ধে সচেতন হও, ইন্দ্রিয়সকল সংযমপূর্বক আত্মাকে আত্মজ্ঞানের প্রয়োগেই নিশ্চল করিয়া আত্মনিষ্ঠ হও, পরমেশ্বরে চিত্ত সমাহিত কর; তাহা হইলেই কামনা জয় করিতে পারিবে, নিষ্কাম কর্মযোগ সাধনে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।

পূর্ব অধ্যায়ে যে জ্ঞান ও কর্মের বিরোধের উল্লেখ করা হইয়াছে, এই অধ্যায়ে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে সেই বিরোধেরই নিরসন করিয়া জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে এবং জ্ঞানীদিগেরও নিষ্কামভাবে যথাপ্রাপ্ত কর্তব্য-কর্ম করা উচিত, পুনঃ পুনঃ এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, যাহারা অজ্ঞান, যাহারা সংসারাসক্তিবশতঃ কর্মে নিযুক্ত আছে, তাহাদিগকেও কর্ম হইতে বিচলিত করা কর্তব্য নহে, এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে (৩।২৬।২৯); এই কর্মপ্রবণতার যুগে এরূপ উপদেশ আমাদের নিকট অনাবশ্যক বোধ হইতে পারে। কিন্তু সেকালে সন্ন্যাসবাদের প্রভাব বড় বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং কর্মদ্বারা বন্ধন হয়, এই মতটি বড় প্রবল হইয়াছিল। উহাতে লোক-সমাজের অনিষ্টের সম্ভাবনা ছিল। এই জন্যই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, আমার এই মত অনুসরণ করিলেই কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ইহাই গীতোক্ত যোগ। ইহার কিরূপে উদ্ভব হইয়াছে এবং প্রচার হইয়াছে, তাহা পরবর্তী অধ্যায়ের প্রথমে বলা হইয়াছে।

কর্ম-মাহাত্ম্য ও কর্ম-প্রেরণাই এই অধ্যায়ের প্রধান বর্ণিত বিষয়, সুতরাং এই অধ্যায়ের নাম **কর্মযোগ**।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে **কর্মযোগো** নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

চতুর্থ অধ্যায়

জ্ঞানযোগ

শ্রীভগবান্ উবাচ

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ১

১। শ্রীভগবান্ উবাচ—অহম্ (আমি) ইমম্ অব্যয়ং যোগং (এই অব্যয় যোগ) বিবস্বতে প্রোক্তবান্ (সূর্যকে বলিয়াছিলাম); বিবস্বান্ (সূর্য) মনবে প্রাহ (মনুকে বলিয়াছিলেন); মনু ইক্ষ্বাকবে অব্রবীৎ (মনু ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন)।

গীতোক্ত-যোগধর্মের প্রাচীন পরম্পরা ১-৩

শ্রীভগবান্ বলিলেন—এই অব্যয়যোগ আমি সূর্যকে বলিয়াছিলাম। সূর্য (স্বপুত্র) মনুকে এবং মনু (স্বপুত্র) ইক্ষ্বাকুকে ইহা বলিয়াছিলেন। ১

অব্যয়—'অব্যয়ফলত্বাদব্যয়ম্'=এই যোগের ফল অব্যয়, এই জন্য এই যোগকে অব্যয় বলা হইয়াছে। **বিবস্বান্** হইতে যে বংশের উৎপত্তি তাহাকেই সূর্য বংশ বলে, কেননা বিবস্বান্ শব্দে সূর্য বুঝায়। বিবস্বানের পুত্র মনু, মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু। এই বৈবস্বত মনু হইতে ৫৮ম অধস্তন পুরুষ শ্রীরামচন্দ্র। **ইমং যোগং**—এই যোগ অর্থাৎ পূর্ব অধ্যায়ে যে যোগের কথা বলা হইল। ইহাই গীতোক্ত জ্ঞান-ভক্তিমিশ্র কর্মযোগ; ইহাতে কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি, তিনের সমন্বয় আছে। ইহাকে 'বুদ্ধিযুক্ত কর্মযোগ' অথবা নিষ্কাম কর্মমিশ্র ভক্তিযোগও বলা যায়। (২।৪৮-৫০, ৩।৩০, ৬।৪৬-৪৭ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

গীতোক্ত ধর্ম বুঝিবার পক্ষে এই শ্লোকটি বিশেষ প্রয়োজনীয়। এখানে যে যোগধর্মের কথা উল্লেখ করা হইল, ইহাই মহাভারতের শান্তিপর্বে কথিত নারায়ণীয় ধর্ম বা সাত্বত ধর্ম। কল্পে কল্পে এই ধর্ম কিরূপে আবির্ভূত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে তথায় তাহার বিস্তারিত পরম্পরা দেওয়া হইয়াছে। এস্থলে মাত্র ব্রহ্মার সপ্তম জন্মে অর্থাৎ বর্তমান কল্পে ত্রেতা যুগের প্রথমে এই ধর্ম কিরূপে প্রচারিত হইয়াছিল, সেই পরম্পরা দেওয়া হইয়াছে। ইহা ঠিক মহাভারতের বর্ণিত পরম্পরারই অনুরূপ (বিস্তারিত ভূমিকায় 'গীতোক্ত ধর্মের প্রাচীন স্বরূপ' পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)।

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২
স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩

অর্জুন উবাচ

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪

২। এবং পরম্পরাপ্রাপ্তম্ ইমং (এইরূপ পরম্পরাপ্রাপ্ত এই যোগ) রাজর্ষয়ঃ বিদুঃ (রাজর্ষিগণ অবগত ছিলেন); হে পরন্তপ, ইহ (এই লোকে) সঃ যোগঃ (সেই যোগ) মহতা কালেন নষ্টঃ (দীর্ঘকালবশে নষ্ট হইয়াছে)।

এইরূপে পুরুষপরম্পরাপ্রাপ্ত এই যোগ রাজর্ষিগণ বিদিত ছিলেন। হে পরন্তপ, ইহলোকে সেই যোগ দীর্ঘকালবশে নষ্ট হইয়াছে। ২

রাজর্ষি—রাজা হইয়াও যিনি ঋষি, যেমন জনকাদি। সুতরাং যাঁহারা জ্ঞানী ও কর্মী, ইহা তাঁহাদেরই অধিগম্য।

৩। [তুমি] মে ভক্তঃ সখা চ অসি ইতি (তুমি আমার ভক্ত ও সখা, এই জন্য) অয়ং সঃ এব পুরাতনঃ যোগঃ (এই সেই পুরাতন যোগ) অদ্য ময়া তে এব প্রোক্তঃ (অদ্য মৎকর্তৃক তোমাকে কথিত হইল); হি এতৎ উত্তমং রহস্যম্ (যেহেতু ইহা উত্তম গুহ্য তত্ত্ব)।

তুমি আমার ভক্ত ও সখা, এই জন্য সেই পুরাতন যোগ অদ্য তোমাকে বলিলাম; কারণ, ইহা উত্তম গুহ্য তত্ত্ব। ৩

৪। অর্জুনঃ উবাচ—ভবতঃ জন্ম অপরং (আপনার জন্ম পরবর্তী), বিবস্বতঃ জন্ম পরং (বিবস্বানের জন্ম পূর্ববর্তী)। ত্বম্ আদৌ প্রোক্তবান্ (আপনি প্রথমে বলিয়াছিলেন) এতৎ কথম্ বিজানীয়াম্ (ইহা কিরূপে বুঝিব)?

অবতার-তত্ত্ব—অবতারের উদ্দেশ্য ও কর্ম ৪-৮

অর্জুন বলিলেন—আপনার জন্ম পরে, বিবস্বানের জন্ম পূর্বে; সুতরাং আপনি যে পূর্বে ইহা বলিয়াছিলেন তাহা কিরূপে বুঝিব? ৪

বসুদেব-গৃহে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের কথা অর্জুন বলিতেছেন। এ কথায়, শ্রীকৃষ্ণের সর্বেশ্বরত্ব এবং অবতার-তত্ত্ব যে অর্জুন জানিতেন না, এইরূপই অনুমান করিতে হয়। ১১।৪১ শ্লোকের অর্জুনোক্তিতে তাহাই বুঝা যায়। কিন্তু ভীষ্ম, বিদুর

শ্রীভগবান্ উবাচ

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ ৫
অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬

প্রভৃতি জ্ঞানী ভক্তগণ তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতেন এবং তৎপ্রসঙ্গে সেইরূপ কথাই বলিতেন। পাণ্ডবগণ তাঁহাকে ঈশ্বরের ন্যায় ভক্তি করিতেন বটে, কিন্তু আবার যেন তাঁহার ঈশ্বরত্ব ভুলিয়া, সখা ও সুহৃদের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। শ্রীভগবান্ও আত্মগোপন করিয়াই কুরুক্ষেত্রের বহু পূর্ব হইতেই প্রিয় ভক্তগণের নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। এই আত্মগোপন লীলারই কৌশল। ঐশ্বর্য প্রকাশে লীলাপুষ্টি হয় না। নন্দ, যশোদা, গোপীগণ তাঁহার ঈশ্বরত্বের নানা পরিচয় পাইয়াও তাহা ভুলিয়া যাইতেন।

৫। শ্রীভগবান্ উবাচ—হে অর্জুন, মে তব চ (আমার এবং তোমার) বহূনি জন্মানি (বহু জন্ম) ব্যতীতানি (অতীত হইয়াছে); অহং (আমি) তানি সর্বাণি (সেই সকল) বেদ (জানি); হে পরন্তপ, ত্বং (তুমি) ন বেত্থ (জান না)।

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে অর্জুন, আমার এবং তোমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে; আমি সে সকল জানি, হে পরন্তপ, তুমি জান না। ৫

আমি দেহধারণ করিলেও অবিদ্যা বা অজ্ঞানের বশ নহি, সুতরাং আমার সর্বজ্ঞতা লুপ্ত হয় না। তুমি অবিদ্যা দ্বারা আবৃত, অজ্ঞানদ্বারা তোমার জ্ঞানসূত্র ছিন্ন হয়, এই হেতু তোমার পূর্বজন্মের কথা স্মরণ থাকে না। ৫

৬। [আমি] অজঃ সন্ অপি (জন্মরহিত হইয়াও), অব্যয়াত্মা (অবিনশ্বরস্বভাব) [হইয়াও], ভূতানাম্ ঈশ্বরঃ সন্ অপি (সর্বভূতের ঈশ্বর হইয়াও), স্বাং প্রকৃতিম্ (নিজ প্রকৃতিকে) অধিষ্ঠায় (অধিষ্ঠান করিয়া) আত্মমায়য়া (নিজ মায়াদ্বারা) সম্ভবামি (জন্মগ্রহণ করি)।

আমি জন্মরহিত, অবিনশ্বর এবং সর্বভূতের ঈশ্বর হইয়াও স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া আত্মমায়ায় আবির্ভূত হই। ৬

অব্যয়াত্মা—অবিনশ্বরস্বভাবঃ (শ্রীধরস্বামী)। **ঈশ্বরঃ**—কর্মপারতন্ত্র্য-রহিতঃ (শ্রীধর) ধর্মাধর্ম-কর্মবশেই জন্ম, কিন্তু আমার জন্ম কর্মনিবন্ধন হয় না, কেননা আমি কর্মপরতন্ত্র নহি। **অধিষ্ঠায়**—বশীকৃত্য (শঙ্কর); স্বীকৃত্য (শ্রীধর)।

প্রকৃতিং—ত্রিগুণাত্মিকাং মায়াং (শঙ্কর); স্বভাবং স্বরূপং (রামানুজ)।
আত্মমায়য়া—আত্মসঙ্কল্পেন (রামানুজ); পরমার্থতো ন লোকবৎ (শঙ্কর)।

পরবর্তী ভারতীয় দার্শনিক চিন্তায়, বিশেষতঃ শাঙ্কর দর্শনের প্রভাবে, মায়া শব্দটির অর্থের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে এবং গীতায় 'পরমেশ্বরের অপূর্ব সৃষ্টি-কৌশল'এই অর্থেই 'মায়া', 'যোগমায়া' বা 'যোগ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে (৭।২৫ দ্রষ্টব্য)। বস্তুতঃ 'মায়া' বলিতে অবস্তু বা ভ্রমাত্মক কোন কিছু (Illusion) বুঝায় না। নিজের অব্যক্ত স্বরূপ হইতে সমস্ত জগৎ নির্মাণ করিবার পরমেশ্বরের এই অচিন্ত্য শক্তিকেই গীতাতে 'মায়া' বলা হইয়াছে (তিলক), এবং এই অর্থ গ্রহণ করিয়াই শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে প্রকৃতিকে 'মায়া' এবং পরমেশ্বরকে 'মায়ী' বলা হইয়াছে ('মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্', 'অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ।'— শ্বেত, ৪।৯।১০)।

অবতার-তত্ত্ব

আমি জন্মমৃত্যু-রহিত সর্বভূতেশ্বর, অতএব ধর্মাধর্মের অনধীন, সুতরাং প্রাণিগণের যেরূপ জন্মমৃত্যু হয়, আমার আবির্ভাব সেরূপে হয় না। কিরূপে হয়?—স্বাং প্রকৃতিং অধিষ্ঠায় আত্মমায়য়া সম্ভবামি। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য ইহার অর্থ করেন—আমার ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া অর্থাৎ উহার স্বাতন্ত্র্য নিরাকৃত করিয়া আমার ইচ্ছার অধীন করিয়া মায়াবলে আবির্ভূত হই অর্থাৎ যেন দেহবিশিষ্ট হই।

প্রকৃত পক্ষে আমার এই শরীর মায়া-শরীর। কিন্তু ভক্তিপন্থী শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি বলেন—আমার নিজ প্রকৃতিতে অর্থাৎ স্ব-স্বরূপে অধিষ্ঠান করিয়া অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতি স্বীকার করিয়া বিশুদ্ধ উজ্জ্বল সত্ত্বমূর্তিদ্বারা স্বেচ্ছাক্রমে অবতীর্ণ হই। বস্তুতঃ, ভক্তগণ যাঁহাকে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপে চিন্তা করেন, তাঁহার রূপ যে মায়িক, ইহা তাঁহারা কল্পনা করিতে পারেন না। তাঁহারা বলেন, উহাই তাঁহার নিত্যরূপ, উহা জড়রূপ নহে, নিত্যসিদ্ধ-চিদ্রূপ।

এই অবতার-তত্ত্ব সম্বন্ধে নানারূপ মতভেদ আছে। মহাভারতে নারায়ণীয় পর্বাধ্যায়ে যে দশ অবতারের উল্লেখ আছে তাহাতে বুদ্ধ অবতার নাই, প্রথমে হংস অবতার। পরবর্তী পুরাণসমূহে বুদ্ধ অবতার লইয়াই দশ অবতারের গণনা হইয়াছে। ভাগবতে দ্বাবিংশ অবতারের উল্লেখ আছে, এবং এই প্রসিদ্ধ শ্লোকাংশ আছে—"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, পরব্রহ্ম; সমস্ত অবতার তাঁহারই অংশ ও কলা।

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭

[এ সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের বিস্তারিত আলোচনা শ্রীলঘুভাগবতামৃত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। আধুনিক বৈষ্ণব সাহিত্যিকগণমধ্যে স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল এই তত্ত্বের সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন।]

অবশ্য যাঁহারা অবতার-বাদ স্বীকার করেন না, তাঁহারা এ-সম্বন্ধে নানা তর্ক উপস্থিত করেন; যেমন, অনন্ত ঈশ্বর সান্ত হইবেন কিরূপে? যিনি নিরাকার তিনি সাকার হন কিরূপে? ইত্যাদি। এ-সকল প্রশ্নের একমাত্র উত্তর এই যে, যিনি সর্বশক্তিমান্ তাঁহাতে সকলই সম্ভব।—"তাদৃশঞ্চ বিনা শক্তিং ন সিদ্ধেৎ পরমেশতা" (শ্রীলঘুভাগবতামৃত)—ইহা স্বীকার না করিলে পরমেশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা অস্বীকার করা হয়।

এই সকল আপত্তি মনে করিয়াই গীতার গুরু স্বয়ংই পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন—আমি অজ হইয়াও জন্মগ্রহণ করি, অকর্তা হইয়াও কর্ম করি, অব্যক্ত হইয়াও ব্যক্তরূপ ধারণ করি (৪।৬, ৪।১৩, ৯।১১ ইত্যাদি)। বস্তুতঃ যাঁহারা ঈশ্বর-তত্ত্ব বলিতে এমন বস্তু বুঝেন যিনি বিশ্বের উপরে, জীবজগতের বাহিরে, যিনি কেবল সৃষ্টিকর্তা, পার্থিব রাজার মত জগতের শাসনকর্তা, নিয়ামক, তাঁহাদের নিকট অবতার-বাদ অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। তাঁহাদের মতে, সৃষ্টিকর্তা কখনও সৃষ্ট জীবরূপে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন না, যিনি ঈশ্বর তিনি কখনও মানবীয় কর্মের মধ্যে মানবীয় শরীরের মধ্যে বদ্ধ হইতে পারেন না। যিনি পূর্ণ তিনি কখনও অপূর্ণতা পরিগ্রহ করিতে পারেন না। কিন্তু বেদান্তবাদী হিন্দু ঈশ্বরতত্ত্ব সেরূপভাবে বুঝেন না। বেদান্তমতে ঈশ্বর কেবল এক নন, তিনি অদ্বিতীয়, একমেবাদ্বিতীয়ম্, তিনিই সমস্ত, তিনি ছাড়া আর কিছু নাই, তিনি জগদ্রূপে পরিণত, সকলই তাঁহার সত্তায় সত্তাবান্, সকলেই তাঁহার মধ্যেই আছে, তিনি সকলের মধ্যেই আছেন, জীবমাত্রই নারায়ণ। সুতরাং অজ আত্মার দেহ-সম্পর্ক গ্রহণ করা অসম্ভব তো নহেই, বরং সেই সম্পর্কেই জগতের অস্তিত্ব। কাজেই হিন্দুর পক্ষে অবতার-বাদ কেবল ভক্তি-বিশ্বাসের বিষয়মাত্র নহে, উহা বেদান্তের দৃঢ় ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু অবতারের প্রয়োজন কি?—তাহা শ্রীভগবান্ স্বয়ংই পরের শ্লোকে বলিতেছেন।

৭। হে ভারত, যদা যদা হি (যে যে সময়ে) ধর্মস্য গ্লানিঃ (ধর্মের হানি,

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮

ক্ষীণতা), অধর্মস্য অভ্যুত্থানম্ (অধর্মের উদ্ভব) ভবতি (হয়), তদা (তখন) অহম্ (আমি) আত্মানং সৃজামি (আপনাকে সৃষ্টি করি)।

হে ভারত (অর্জুন), যখনই যখনই ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, আমি সেই সময়ে নিজেকে সৃষ্টি করি (দেহ ধারণপূর্বক অবতীর্ণ হই)। ৭

৮। সাধূনাং পরিত্রাণায় (সাধুদিগের রক্ষার জন্য), দুষ্কৃতাং বিনাশায় (দুষ্টদিগের বিনাশের জন্য) ধর্মসংস্থাপনার্থায় চ (এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য) [আমি] যুগে যুগে সম্ভবামি (যুগে যুগে অবতীর্ণ হই)।

সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্টদিগের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। ৮

যুগে যুগে—তত্তদবসরে, তত্তৎ সময়ে (শ্রীধর, বলদেব)—যখনই ধর্মের গ্লানি হয়, তখনই অবতার ; (এক যুগে একাধিক অবতারও হয়)।

শ্রীকৃষ্ণ অবতার—উদ্দেশ্য ও কার্য

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, আমার অবতারের উদ্দেশ্য—(১) দুষ্কৃতদিগের বিনাশ, (২) সাধুদিগের পরিত্রাণ ও (৩) ধর্মসংস্থাপন।

দ্বাপরযুগের শেষভাগে ভারতে ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল। সর্বত্র অধর্ম রাজত্ব করিতেছিল। সে সময়ে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায়, তখন ধর্মদ্রোহী দুর্বৃত্তগণের অত্যাচারে দেশে বিষম আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল। ধর্মরাজ রাজসূয় যজ্ঞের কর্তব্যতা সম্বন্ধে উপদেশ চাহিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—"আপনার সাম্রাজ্য লাভে অধিকার আছে সত্য, কিন্তু রাজন্যবর্গের উপর আপনার আধিপত্য নাই। সে আধিপত্য আছে জরাসন্ধের, জরাসন্ধই এখন প্রকৃতপক্ষে ভারতের সম্রাট্।"

পূর্বে বলা হইয়াছে (১০০ পৃঃ)—এই **জরাসন্ধ** এক শত রাজাকে বলিদান-পূর্বক এক পাশবিক যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করিতেছিলেন এবং তদুদ্দেশ্যে ৮৬ জন রাজাকে ধৃত ও শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইঁহার ভয়ে দক্ষিণ পাঞ্চাল, পূর্ব কোশল, শূরসেন প্রভৃতি দেশের রাজগণ সকলেই পলায়নপর হইয়া দক্ষিণ ও পশ্চিম দেশে আশ্রয় লইয়াছিলেন। পশ্চিম ভারতে এই জরাসন্ধের জামাতা **কংস**, পিতা উগ্রসেনকে কারারুদ্ধ করিয়া মথুরার সিংহাসন অধিকার

করিয়াছিলেন এবং জ্ঞাতিগণের উপর নিদারুণ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। দক্ষিণ-ভারতে, চেদিরাজ **শিশুপাল** জরাসন্ধের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। পূর্বাঞ্চলের কামরূপের রাজা **নরক**, শোণিতপুরের (বর্তমান তেজপুর) রাজা **বাণ** এবং পুণ্ড্ররাজ্যের (উত্তর বঙ্গ) অধিপতি **বাসুদেব**—ইঁহারা সকলেই জরাসন্ধের অনুগত ছিলেন। এই বাসুদেব, শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন ধারণ করিয়া আপনাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া পরিচয় দিতেন—'আদত্তে সততং মোহাদ্ যঃ স চিহ্নঞ্চ মামকম্' (মভা, সভাপর্ব, ১৪ অধ্যায়)।

শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে এই সকল দুর্বৃত্তদিগকে নিহত বা নত করিয়া কারারুদ্ধ রাজন্যবর্গ ও বাসুদেব, দৈবকী প্রভৃতিকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহা পুরাণাদিতে বর্ণিত আছে।

সমগ্র ভারতে একত্ব স্থাপনের চেষ্টা, অসপত্ন সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস চিরকালই ভারতে শক্তিশালী রাজগণের পুণ্যকর্মের মধ্যে পরিগণিত ছিল। ইহার নাম রাজসূয় যজ্ঞ। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ এই প্রাচীন প্রথার অনুবর্তন করিয়াই ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের দ্বারা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধর্মরাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্য-শ্রী তাঁহার জ্ঞাতিগণের অসহ্য হইল। দুর্যোধনের ঈর্ষ্যানল যুধিষ্ঠিরকে নির্বাসিত করিল। ভীমার্জুনের বাহুবলে যে রাজন্যবৃন্দ যুধিষ্ঠিরের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই দুর্যোধনের পক্ষাবলম্বন করিলেন। প্রবল মিত্রপক্ষের সহায়তা লাভ করিয়া দুর্যোধন দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিলেন—মৈত্রী স্থাপনের সমস্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। ক্ষাত্রতেজ ধর্মসংযুক্ত না হইলে ভয়াবহ হইয়া উঠে। শ্রীকৃষ্ণ জানিতেন, এই মদদৃপ্ত ক্ষত্রিয়কুল নির্মূল না হইলে ভারতে ধর্ম ও শান্তি স্থাপন সম্ভবপর হইবে না। তাই তিনি এই উদ্দাম ক্ষাত্রতেজ বিধ্বস্ত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ফলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ,—যুদ্ধের ফল নিষ্কণ্টক ধর্মরাজ্য স্থাপন।

কিন্তু পুরাণাদিতে অবতারের অসুর-বিনাশাদিরূপে যে লীলা-বর্ণনা আছে, ধর্ম-সংস্থাপন বলিতে কেবল তাহাই বুঝায় না। ধর্মের দুইটি দিক, একটি বাহ্য বা ব্যবহারিক, অপরটি আভ্যন্তরীণ বা আধ্যাত্মিক। শ্রীকৃষ্ণ-অবতারেরও দুইটি উদ্দেশ্য, দুইটি দিক্—একটি হইতেছে অন্তর্জগতে মানবাত্মার উন্নতি সাধন, অপরটি হইতেছে বাহ্য জগতে মানব-সমাজের রাষ্ট্রীয় বা নৈতিক পরিবর্তন সাধন। পুরাণে ইহাকেই ধরাভারহরণ, অসুর-নিধনাদি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু কেবল ইহাই অবতারের উদ্দেশ্য নয়। বুদ্ধ, খ্রীস্ট, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতিকেও অবতার বলা হয়, কিন্তু এ-সকল অবতারের অসুর-

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥ ৯

বিনাশ নাই, এ-সকল অবতারের একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে মানবাত্মাকে দিব্য প্রেম-পবিত্রতা-জ্ঞান-শক্তির অনুপ্রেরণা দেওয়া। পক্ষান্তরে পৌরাণিক নৃসিংহাদি অবতারের অসুর-বিনাশ ব্যতীত আর বেশী কিছু প্রয়োজন দেখা যায় না। কিন্তু **শ্রীকৃষ্ণ অবতারের দুইটিই আছে।** বাহ্যতঃ, দুষ্কৃতদিগের বিনাশ করিয়া সাধুদিগের সংরক্ষণ ও ধর্মরাজ্য সংস্থাপন, দ্বিতীয়তঃ, মানবকে দিব্য কর্মের আদর্শ দেখাইয়া দিব্য-জীবনের অধিকারী করা (৪।১০ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য), সার্বভৌম ভাগবত ধর্মের প্রচার দ্বারা জীবকে ভগবানের দিকে আকৃষ্ট করা। এই সার্বভৌম ধর্মতত্ত্বই গীতায় কথিত হইয়াছে।

এই সময় বহু ধর্মমত প্রচলিত ছিল, বহু উপধর্মেরও সৃষ্টি হইয়াছিল। যে সনাতন যোগধর্ম বহু বার প্রচারিত হইয়া বহু বার লয় পাইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাই পুনরায় প্রচলন করিলেন, ইহা তাঁহারই শ্রীমুখের বাণী। এই গীতোক্ত ধর্মকে কেহ বলেন নিষ্কাম কর্মযোগ, কেহ বলেন উহা কর্মসাপেক্ষ জ্ঞানযোগ, কেহ বলেন উহা কর্ম-জ্ঞানমিশ্র ভক্তিযোগ। বস্তুতঃ উহাতে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি—তিনেরই সমন্বয়। উহা মুমুক্ষুর মোক্ষসেতু, সংশয়ীর জ্ঞানাঞ্জন, দুর্বলের বলাধানের মন্ত্র, সর্বধর্মের সারোদ্ধার—সমাজতত্ত্বের শেষ কথা। আধুনিকগণ দেখিবেন, নিট্‌সের যুদ্ধবাদ হইতে টলস্টয়ের বিশ্বপ্রেম পর্যন্ত সকল তত্ত্বই উহার অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু সর্বত্রই ঈশ্বরবাদ জাজ্বল্যমান।

৯। হে অর্জুন, মে এবং দিব্যং জন্ম কর্ম চ (আমার এইরূপ দিব্য জন্ম ও কর্ম) যঃ তত্ত্বতঃ বেত্তি (যিনি স্বরূপতঃ জানেন), সঃ (তিনি) দেহং ত্যক্ত্বা (দেহ ত্যাগ করিয়া) পুনঃ জন্ম ন এতি (পুনর্বার জন্ম অর্থাৎ সংসার প্রাপ্ত হন না), [কিন্তু] মাম্ এতি (আমাকেই প্রাপ্ত হন)।

দিব্য—অপ্রাকৃত, ঐশ্বর (শঙ্কর, রামানুজ)। প্রাকৃত জনের জন্ম হয় কর্মফলে, আমার জন্ম স্বেচ্ছায়। প্রাকৃত জনের ন্যায় আমার গর্ভবাসাদি ক্লেশ নাই। আমার জন্ম অপ্রাকৃত। **তত্ত্বতঃ**—স্বরূপতঃ, আমি জন্মরহিত হইয়াও লোকানুগ্রহার্থ দেহ ধারণ করি, কর্ম করি ইত্যাদি তত্ত্ব বিচারপূর্বক।

শ্রীভগবানের জন্মকর্মের তত্ত্বজ্ঞানে মোক্ষ ৯-১০

হে অর্জুন, আমার এই দিব্য জন্ম ও কর্ম যিনি তত্ত্বতঃ জানেন, তিনি দেহত্যাগ করিয়া পুনর্বার আর জন্মপ্রাপ্ত হন না—তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন। ৯

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ১০

১০। বীতরাগভয়ক্রোধাঃ (বিষয়াসক্তি, ভয় ও ক্রোধ-বর্জিত) মন্ময়াঃ (মদেকচিত্ত), মাম্ উপাশ্রিতাঃ (আমাকে আশ্রয় করিয়া) জ্ঞানতপসা পূতাঃ (জ্ঞানরূপ তপস্যাদ্বারা পবিত্র হইয়া) বহবঃ (অনেকে) মদ্ভাবম্ (আমার ভাব) [ভাগবত প্রকৃতি, মোক্ষ] অথবা আমাতে ভাব [প্রেম] আগতাঃ (লাভ করিয়াছেন)।

বীতরাগভয়ক্রোধাঃ—যাহাদের রাগ, ভয় ও ক্রোধ দূর হইয়াছে। **রাগ**—বিষয়ানুরাগ। **ভয়**—বিষয় বিনাশের আশঙ্কা। **ক্রোধ**—বিষয়বিনাশে বিনাশকারীর প্রতি বিদ্বেষ। **মন্ময়া**—ব্রহ্মবিৎ, যিনি 'তৎ'রূপ ব্রহ্ম ও 'ত্বম্'রূপ জীবকে অভেদরূপে দেখেন (শঙ্কর, মধুসূদন), অথবা যিনি একমাত্র ভগবানেই চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন, মদেকচিত্ত (শ্রীধর); **জ্ঞানতপসা**—জ্ঞানরূপ তপস্যাদ্বারা, কিসের জ্ঞান?—শঙ্কর বলেন, পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞান। রামানুজ বলেন—আমার জন্মকর্মের তত্ত্বজ্ঞান। শ্রীধর বলেন,—জ্ঞান (আত্মজ্ঞান) এবং তপ (স্বধর্মপালনরূপ তপস্যা) এই উভয়। **মদ্ভাবং**—আমার ভাব, মোক্ষ (শঙ্কর), মৎসাযুজ্য (শ্রীধর), আমাতে রতি বা প্রেম (মধুসূদন), মৎসাক্ষাৎকার (বলদেব) ; দিব্যসত্তা, দিব্যজীবন, ভাগবত-জীবন—(শ্রীঅরবিন্দ)।

বিষয়ানুরাগ ভয় ও ক্রোধ বর্জন করিয়া, আমাতে একাগ্রচিত্ত ও আমার শরণাপন্ন হইয়া, আমার জন্মকর্মের তত্ত্বালোচনা রূপ জ্ঞানময় তপস্যাদ্বারা পবিত্র হইয়া অনেকে আমার পরমানন্দভাবে চিরস্থিতি লাভ করিয়াছেন। ১০

লীলা-তত্ত্বের অনুধ্যানই শ্রেষ্ঠ সাধনা

এই দুইটি শ্লোকে শ্রীভগবান বলিতেছেন—যিনি আমার দিব্য জন্ম ও কর্মের তত্ত্ব জানেন, তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন, তিনি মুক্ত হন। তাঁহার বিষয়ানুরাগ দূর হয়, আমার জন্মকর্মের জ্ঞানদ্বারা পবিত্র হইয়া তিনি আমার পরমানন্দভাবে স্থিতি লাভ করেন। কিন্তু তত্ত্বতঃ জানিতে হইবে এবং সেই তত্ত্ব জানিয়া, বুঝিয়া, নিজের জীবন তদনুসারে গঠন করিতে হইবে। লীলা-কথা পাঠ করিলেই বা শ্রবণ করিলেই লীলাতত্ত্ব অধিগত হয় না। শ্রীভগবান্ অজ অব্যয় অব্যক্ত হইয়াও কিরূপে আত্মমায়ার দ্বারা অবতীর্ণ হন,

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥ ১১

এই তত্ত্বই শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মতত্ত্ব ; তিনি নিষ্ক্রিয় অকর্তা হইয়াও নির্লিপ্তভাবে কিরূপে কর্ম করেন, এই তত্ত্বই দিব্য কর্মতত্ত্ব ; তিনি নির্গুণ হইয়াও সগুণ, অশেষকল্যাণগুণোপেত, অহেতুক কৃপাসিন্ধু ; 'লোকসংগ্রহার্থ', লোকশিক্ষার্থ বা ভক্তবাঞ্ছাপূরণার্থ তাঁহার এই লীলা—এই তত্ত্বই ভক্তি-তত্ত্ব। সুতরাং জন্মকর্মের তত্ত্ব বুঝিতে পারিলেই পরম জ্ঞান, দিব্য কর্ম ও পরা ভক্তির মর্ম অধিগত হয়, তখন জীব তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার নিষ্কাম কর্মের আদর্শ অনুসরণপূর্বক সিদ্ধি লাভ করিতে পারে, তাহার আর অন্য সাধনার আবশ্যক হয় না। উহাতেই তাহার ভাগবত জীবন লাভ হয় (মদ্ভাবমাগতাঃ)। (ভূমিকায় 'সচ্চিদানন্দ প্রতিষ্ঠা' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

অবতারের আগমনের নিগূঢ় ফল তাহারা লাভ করে, যাহারা ইহা হইতে দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্মের প্রকৃত মর্ম বুঝিতে পারে, যাহাদের চিত্ত তাঁহার চিন্তাতেই পূর্ণ হয়, যাহারা সর্বতোভাবে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করে (মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ), যাহারা জ্ঞানের দ্বারা শুদ্ধ হইয়া এবং নিম্ন প্রকৃতি হইতে মুক্ত হইয়া দিব্য সত্তা ও দিব্য প্রকৃতি লাভ করে(মদ্ভাবমাগতাঃ)—শ্রীঅরবিন্দের গীতা।

পাঠক লক্ষ করিবেন, পূর্বোক্ত টীকায় 'মদ্ভাব' শব্দের কিরূপ বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। সাধকের সাধন-প্রণালীর পার্থক্য হেতু এইরূপ মতভেদ হয়।

কিন্তু প্রভো, তোমার ত ভাবের অন্ত নাই, জ্ঞানী, ভক্ত, কর্মী, সকাম উপাসক, নিষ্কাম উপাসক, ইহারা কে কোন্ ভাবে তোমাকে প্রাপ্ত হইবে ?—(পরের শ্লোক)। ১০

১১। হে পার্থ, যে (যাহারা) যথা (যে-ভাবে) মাম্ প্রপদ্যন্তে (আমাকে উপাসনা করে), অহম্ তান্ তথা এব (আমি তাহাদিগকে সেই ভাবেই) ভজামি (অনুগ্রহ করি); মনুষ্যাঃ (মনুষ্যগণ) সর্বশঃ (সর্বপ্রকারে) মম বর্ত্ম অনুবর্তন্তে (আমার পথই অনুসরণ করে)।

যে যে-ভাবে ভজনা করে, সে সেইরূপ ফল লাভ করে ১১-১২

হে পার্থ, যে আমাকে যে-ভাবে উপাসনা করে, আমি তাহাকে সেই ভাবেই তুষ্ট করি। মনুষ্যগণ সর্বপ্রকারে আমার পথেরই অনুসরণ করে অর্থাৎ মনুষ্যগণ যে পথই অনুসরণ করুক না কেন, সকল পথেই আমাতে পৌঁছিতে পারে। ১১

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা ॥ ১২

মত-পথ—সনাতন ধর্মের উদারতা

শ্রীভগবান্ ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু, অহেতুক কৃপাসিন্ধু, ভাবগ্রাহী, অন্তর্যামী। যিনি তাঁহাকে যে-ভাবে উপাসনা করেন, তিনি সেই ভাবেই তাঁহাকে তুষ্ট করেন। ব্রহ্মবাদিগণ অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞানে তাঁহাতেই নির্বাণ প্রাপ্ত হন; যোগিগণ পরমাত্মরূপী তাঁহাতেই কৈবল্য প্রাপ্ত হন; কর্মিগণ কর্মপ্রবর্তক কর্মফলদাতা ঈশ্বররূপে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন; ঐশ্বর্যভক্তগণ বিধিমার্গে ঐশ্বর্যরূপী তাঁহারই সালোক্যাদি লাভ করেন; মাধুর্যভক্তগণ রাগমার্গে তাঁহারই নিত্যদাস্যাদি লাভ করিয়া কৃতার্থ হন।

যে যে-পথ অনুসরণ করুক, সকলই তাঁহাকে প্রাপ্তির পথ। বর্তমান যুগ ধর্ম-সমন্বয়ের যুগ—ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ সমন্বয়-ধর্মের প্রধান উপদেষ্টা ও পথ-প্রদর্শক। 'যত মত তত পথ' ইহা তাঁহারই উপদেশ। কেবল উপদেশও নয়, তিনি স্বীয় জীবনে বিভিন্ন সাধন-প্রণালী অবলম্বন করিয়া সিদ্ধি লাভ করতঃ প্রত্যক্ষভাবে এ-তত্ত্ব শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

পৃথিবীতে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীস্টান, কত রকম ধর্মমত প্রচলিত আছে। গীতার এই একটি শ্লোকের তাৎপর্য বুঝিলে প্রকৃতপক্ষে ধর্মগত পার্থক্য থাকে না, হিন্দুর হৃদয়ে ধর্মবিদ্বেষ থাকিতে পারে না। হিন্দুর নিকট কৃষ্ণ, খ্রীস্ট, বুদ্ধ সকলেই এক—সকলেই একেরই বিভিন্ন মূর্তি।

"ইহাই প্রকৃত হিন্দুধর্ম। হিন্দুধর্মের তুল্য উদার ধর্ম আর নাই—আর এই শ্লোকের তুল্য উদার মহাবাক্য আর নাই।"—বঙ্কিমচন্দ্র

১২। ইহ (ইহলোকে) কর্মণাং সিদ্ধিং কাঙ্ক্ষন্তঃ (কর্মের সিদ্ধি আকাঙ্ক্ষাকারী ব্যক্তিগণ) দেবতাঃ যজন্তে (দেবগণকে ভজনা করে); হি (যেহেতু) মানুষে লোকে (মনুষ্যলোকে) কর্মজা সিদ্ধিঃ (কর্মজনিত সিদ্ধিলাভ) ক্ষিপ্রং ভবতি (শীঘ্র হয়)।

ইহলোকে যাহারা কর্মসিদ্ধি কামনা করে তাহারা দেবতা পূজা করে, কেননা মনুষ্যলোকে কর্মজনিত ফললাভ শীঘ্রই পাওয়া যায়। ১২

ফলাকাঙ্ক্ষায় দেবতা-পূজা—তুমি সর্বদেবময় সর্বেশ্বর, তবে তোমাকে ভজনা না করিয়া লোকে অন্য দেবতার ভজনা করে কেন? কারণ, জীব ভোগবাসনায় আকুল, তাহারা ধনৈশ্বর্যাদি নানারূপ ফলকামনা করিয়া দেবতাদির পূজার্চনা করে। ইহলোকে সেই সকল কাম্যকর্মের ফল শীঘ্রই

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩

পাওয়া যায়। যাহা আপাত-সুখকর ও সহজপ্রাপ্য, লোকে তাহাই চায়। কিন্তু এ সকল ফল সামান্য, ক্ষণস্থায়ী। নিষ্কাম কর্মের ফল মহৎ—নিষ্কাম কর্মের ফলেই লোকে আমাকে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু উহা দুষ্প্রাপ্য, কেননা অনাদি ভোগবাসনা-নিয়ন্ত্রিত জীব সহজে কামনা ত্যাগ করিতে পারে না; সুতরাং আমাকেও প্রাপ্ত হয় না। ১২

১৩। ময়া (আমাকর্তৃক) গুণকর্মবিভাগশঃ (গুণ ও কর্মের বিভাগানুসারে) চাতুর্বর্ণ্যম্ (চারি বর্ণ) সৃষ্টম্ (সৃষ্ট হইয়াছে), তস্য কর্তারম্ অপি (তাহার কর্তা হইলেও) মাং অব্যয়ং অকর্তারং বিদ্ধি (আমাকে অবিকারী ও অকর্তা বলিয়া জানিও)।

অব্যয়—অবিকারী (নীলকণ্ঠ); তিনি নির্গুণ হইয়াও সগুণ, 'নির্গুণো গুণী'। নির্গুণ বিভাবে তিনি নির্বিশেষ নিষ্ক্রিয়, সগুণ বিভাবে তিনি সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কর্তা। তাই তিনি কর্তা হইয়াও অকর্তা, ক্রিয়াশীল হইয়াও অবিকারী। ('আত্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব' ৫।১৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা এবং 'পুরুষোত্তমতত্ত্ব' ১৫।১৮ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

চাতুর্বর্ণ্য-সৃষ্টি—ভগবানের নির্লিপ্ত কর্ম—পূর্ব মনীষিগণের নির্লিপ্ত কর্মের দৃষ্টান্ত ১৩-১৫

বর্ণচতুষ্টয় গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে আমি সৃষ্টি করিয়াছি বটে, কিন্তু আমি উহার সৃষ্টিকর্তা হইলেও আমাকে অকর্তা ও বিকাররহিত বলিয়াই জানিও। ১৩

কেহ সকামভাবে রাজসিক বা তামসিক পূজার্চনা করে, কেহ নিষ্কামভাবে উপাসনা করে। এরূপ কর্ম-বৈচিত্র্য কেন? তুমিই ত এসব ঘটাও?—না, প্রকৃতিভেদবশতঃ এইরূপ হয়। প্রকৃতিভেদ অনুসারে বর্ণভেদ বা কর্মভেদ আমি **করিয়াছি—কিন্তু আমি উহার কর্তা হইলেও উহাতে লিপ্ত হই না বলিয়া অকর্তা। জীবেরও এই তত্ত্ব** জানিয়া নিষ্কামভাবে স্বধর্ম পালন করা উচিত। মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ পূর্বে এই ভাবেই কর্ম করিয়াছেন। (৪।১৫ শ্লোক)।

চতুর্বর্ণের উৎপত্তি

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, গুণ ও কর্মের বিভাগানুসারে আমি বর্ণচতুষ্টয়ের সৃষ্টি করিয়াছি। টীকাকারগণ বলেন,—'গুণ' বলিতে এখানে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণ বুঝায়। সত্ত্বপ্রধান ব্রাহ্মণ—তাহাদের কর্ম অধ্যাপনাদি;

অল্পসত্ত্বগুণ-বিশিষ্ট রজঃপ্রধান ক্ষত্রিয়—তাহাদের কর্ম যুদ্ধাদি; অল্পতমোগুণ-বিশিষ্ট রজঃপ্রধান বৈশ্য—তাহাদের কর্ম কৃষি-বাণিজ্যাদি। তমঃপ্রধান শূদ্র—তাহাদের কর্ম অন্য তিন বর্ণের সেবা। এইরূপে গুণানুসারে কর্ম বিভাগ করিয়া চাতুর্বর্ণ্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন এই যে, এই সৃষ্টি হইল কখন? আগে জন্ম, পরে স্বভাব? না, আগে স্বভাব, পরে জন্ম? যে জন্মিবে তাহার জন্মিবার পূর্বেই কি সত্ত্বপ্রধানাদি স্বভাব সৃষ্ট হইয়াছে? ধর্মাধর্মরূপ কর্মজনিত যে সংস্কার তাহাই স্বভাব। জন্মের পূর্বে কর্মই বা হয় কিরূপে, আর কর্মজনিত সংস্কারই বা গঠিত হয় কিরূপে? জন্ম আগে না কর্ম আগে?

"যিনি বলিবেন যে, আগে জীবের জন্ম, তৎপর তাহার সত্ত্বপ্রধানাদি স্বভাব, তাহাকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, মনুষ্যের বংশানুসারে নহে, গুণানুসারে তাহার ব্রাহ্মণত্বাদি। ব্রাহ্মণের পুত্র হইলেই তাহাকে ব্রাহ্মণ হইতে হইবে, এমন নহে। সত্ত্বগুণ-প্রধান স্বভাব হইলে শূদ্রের পুত্র হইলেও ব্রাহ্মণ হইবে এবং ব্রাহ্মণের পুত্রের তমোগুণ-প্রধান স্বভাব হইলে সে শূদ্র হইবে। ভগবদ্বাক্য হইতে ইহাই সহজ উপলব্ধি।

আমি যে একটা নূতন মত নিজে গড়িয়া প্রচার করিতেছি, তাহা নহে। প্রাচীনকালে শঙ্কর শ্রীধরের অনেক পূর্বে, প্রাচীন ঋষিগণও এই মত প্রচার করিয়াছিলেন (বৃদ্ধ গৌতম সংহিতা ২১ অঃ, মহাভারত বনপর্ব ২১৫ ও ১৯০ অঃ ইত্যাদি)।"—বঙ্কিমচন্দ্র।

অবশ্য বর্ণভেদের এরূপ ব্যাখ্যা সকলে স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন—বীজ হইতে বৃক্ষ, আবার বৃক্ষ হইতে বীজ—এস্থলে বীজ আগে না বৃক্ষ আগে, এ প্রশ্নের কোন মীমাংসা হয় না, এই হেতু হিন্দু-দর্শন বলেন, সৃষ্টি অনাদি। (এই যুক্তিবাদকে বীজাঙ্কুরন্যায় বলে। এ ন্যায় তো একটি উপমা মাত্র। উপমা তো যুক্তি নয়, বস্তুতঃ প্রশ্নটি অমীমাংসিতই রহিয়াছে)। সৃষ্টি প্রলয় অনাদিকাল হইতে পুনঃ পুনঃ হইতেছে, উহার আদি নাই। "সৃষ্টি অনাদি বলিয়া ধর্মাধর্মরূপ কর্মসংস্কার প্রকৃতিতে বা শক্তিতে মহাপ্রলয়েও লীন থাকে।" প্রলয়ান্তে সৃষ্টিকালে সেই সেই সংস্কারবশতঃ সত্ত্বাদি গুণপ্রাধান্য লইয়া ব্রাহ্মণাদি জাতির সৃষ্টি হয়। সুতরাং এই মতে "সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে জাতিভেদ, অথবা জাতিভেদ লইয়াই সৃষ্টি।" এই মতের মূল ঋগ্বেদ-সংহিতার বিখ্যাত পুরুষসূক্তের দ্বাদশ ঋক্। তাহা এই—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যকঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত॥

—ব্রাহ্মণ সেই পুরুষের (সৃষ্টিকর্তার) মুখ হইলেন; ক্ষত্রিয় বাহু (কৃত) হইলেন; বৈশ্যই ইহার উরু; পদ হইতে শূদ্রের জন্ম হইল।

সৃষ্টিকালে বিধাতার মুখ হইতে ব্রাহ্মণের, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়ের জন্ম ইত্যাদি যে প্রচলিত মত তাহা এই বৈদিক সূত্রের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিক সমালোচকগণ এই মত স্বীকার করেন না। তাহারা বলেন—প্রাচীন বৈদিক যুগে বর্ণভেদ ছিল না। পরবর্তী বৈদিক যুগে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কর্মভেদের প্রয়োজন হওয়াতে উহার সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথমতঃ এই বর্ণভেদ বংশগত ছিল না, কর্মগত ছিল। এক পরিবারের কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য বা কেহ শূদ্রের কার্য করিতেন। পরে পৌরাণিক যুগে উহা বংশগত হইয়াছে। মূলতঃ জাতিভেদ বংশগত নহে, গুণ ও কর্মগত। এই মতবাদের অনুকূলে তাঁহারা যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করেন তাহা সংক্ষেপতঃ এই—

(১) প্রাচীন বৈদিক যুগের সামাজিক রীতি-নীতি, লোকের বৃত্তি-ব্যবসায় ধর্মকর্ম ইত্যাদি পর্যালোচনা করিয়া কোথাও জাতিভেদের অস্তিত্বের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। নিম্নে ঋগ্বেদের একটি সূক্তের অনুবাদ সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা হইল—

"হে সোম, সকল ব্যক্তির কার্য এক প্রকার নহে; আমাদের কার্যও নানাবিধ; দেখ,—তক্ষ (সূত্রধর) কাঠ তক্ষণ করে, বৈদ্য রোগের প্রার্থনা করে, স্তোতা যজ্ঞকর্তাকে চাহে। দেখ,—আমি স্তোত্রকার, পুত্র চিকিৎসক, কন্যা যবভর্জনকারিণী।" (ভাজা-পোড়া তৈরী করা যাহার বৃত্তি, বর্তমান শূদ্র বা বৈশ্য। মন্বাদি শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণপুত্র চিকিৎসক হইলে জাতি যাইত) (ঋক্, ৯ম, ১১২)। (অপিচ, ঐতরেয় ১।১৬, ২।১৭, ২।১৯; ছান্দোগ্য ৫।৪, শতপথব্রাহ্মণ ৩২।১ ইত্যাদি দ্রঃ)।)

সুবিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত মোক্ষমূলরের মত নিজ মত বা সংস্কারের অনুকূল হইলে অনেকেই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করেন, প্রতিকূল হইলে ম্লেচ্ছমত বলিয়া অগ্রাহ্য করেন। পাঠক যাহা ইচ্ছা হয় করিবেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার মত এই—

"If then with all the documents before us, we ask the question, does caste as we find it in Manu and at the present day, form part of the most ancient religious teaching of the Vedas? We can answer with a decided No."

—*Chips from a German Work-shop (Maxmuller)*

ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা ।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪

(২) পূর্বোক্ত ঋগ্বেদীয় সূক্ত সম্বন্ধে ইঁহারা বলেন যে, বেদের অনেক ঋক্‌ই রূপক বর্ণনা। মুখাদি হইতে ব্রাহ্মণাদির সৃষ্টি-বিবরণও রূপক মাত্র। যাহারা জ্ঞান ও ধর্ম শিক্ষা দেন তাহারা সমাজের মুখস্বরূপ, যাহারা শত্রু হইতে সমাজ রক্ষা করেন তাহারা বাহুস্বরূপ, যাহারা অন্নবস্ত্রাদির সংস্থান করেন তাহারা উদর বা ঊরুস্বরূপ, ("কৃৎস্নমূরূদরং বিশঃ" ইত্যাদি মহাভারতে আছে) এইরূপ ব্যাখ্যাই সুসঙ্গত। পূর্বোক্ত ঋকে 'ব্রাহ্মণ মুখ হইতে জন্মিলেন,' 'ক্ষত্রিয় বাহু হইতে জন্মিলেন', এরূপ কথা নাই। আছে 'ব্রাহ্মণোঽস্যমুখমাসীৎ'—ব্রাহ্মণ মুখ হইলেন ইত্যাদি। তবে শূদ্রের পক্ষে বলা হইয়াছে, 'অজায়ত' (জন্মিলেন)। আবার বেদের অন্যান্য স্থলে, যেমন শতপথ ব্রাহ্মণে (২।১০।১১) ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (৩।১২।৯।২) বর্ণসমূহের উৎপত্তি অন্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং তথায় শূদ্রের উল্লেখই নাই, কেবল তিন বর্ণেরই উল্লেখ আছে। ইহাতে অনুমান করা যায় যে, শূদ্রগণ সমাজে পরে গৃহীত হইয়াছেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, আর্যগণ বিজিত অনার্য-দিগকে হিন্দু-সমাজে গ্রহণ করিয়া পরিচর্যাত্মক কর্মে নিযুক্ত করিয়াছেন। ঋগ্বেদ প্রাচীনতম গ্রন্থ হইলেও ইহার সকল ঋক্ প্রাচীন নহে। বিভিন্ন সময়ের রচিত ঋক্‌সমূহ পরবর্তী কালে সংহিতাকারে সঙ্কলিত হইয়াছে। উক্ত সূক্তটিও জাতি-ভেদ প্রবর্তিত হইবার পরে রচিত হইয়াছে বলিয়াই অনেকে অনুমান করেন।

(৩) প্রাচীন কালে সকলেই এক বর্ণ ছিল, পরে গুণকর্মানুসারে বর্ণ-বিভাগ হইয়াছে—মহাভারতে এবং অন্যান্য শাস্ত্রেও এই মতের সমর্থক উক্তি পাওয়া যায়। যথা, মহাভারতে ভরদ্বাজ প্রতি ভৃগুবাক্য—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্বসৃষ্টং হি কর্মভির্বর্ণতাং গতম্ ॥

বর্ণসকলের বিশেষ নাই, পূর্বে সকলেই ব্রাহ্মণ ছিল, পরে কর্মানুসারে ক্ষত্রিয়াদি বিবিধ বর্ণ হইয়াছে। (শান্তি পর্ব ১৮৮ অঃ)। বায়ুপুরাণ, রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থেও এইরূপ উক্তি আছে।

এস্থলে চাতুর্বর্ণ্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সকল বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে, তাহাই আলোচনা করা হইল। বর্ণাশ্রমধর্ম সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় ৩।৩৫ ও ১৮।৪১-৪৮ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৪। কর্মাণি (কর্মসকল) মাং ন লিম্পন্তি (আমাকে লিপ্ত করে না); কর্মফলে মে স্পৃহা ন (আমার স্পৃহা নাই), ইতি (এইরূপ) যঃ মাম্

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্॥ ১৫
কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥ ১৬

অভিজানাতি (যিনি আমাকে জানেন) সঃ কর্মভিঃ ন বধ্যতে (তিনি কর্মদ্বারা বদ্ধ হন না)।

কর্মসকল আমাকে লিপ্ত করিতে পারে না, কর্মফলে আমার স্পৃহাও নাই, এইরূপে যিনি আমাকে জানেন, তিনি কর্মদ্বারা আবদ্ধ হন না। ১৪

শ্রীভগবান্ আদর্শ কর্মযোগী, তাঁহার নির্লিপ্ততা ও নিস্পৃহতা বুঝিতে পারিলে মনুষ্য নিষ্কাম কর্মের মর্ম বুঝিতে পারে, তাহার কর্মও নিষ্কাম হয়। সুতরাং কর্ম করিয়াও সে কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয় (২।৩৯ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। ১৪

১৫। এবং জ্ঞাত্বা (এইরূপ জানিয়া) পূর্বৈঃ মুমুক্ষুভিঃ অপি (প্রাচীন মুমুক্ষুগণ কর্তৃকও) কর্ম কৃতং (কর্ম কৃত হইয়াছে)। তস্মাৎ (সেই হেতু) ত্বম্ (তুমি) পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতং (পূর্ববর্তিগণ কর্তৃক পূর্ব পূর্ব কালে আচরিত) কর্ম এব কুরু (কর্মই কর)।

এবং জ্ঞাত্বা—নাহং কর্তা ন মে কর্মফলে স্পৃহেতি জ্ঞাত্বা (শঙ্কর)—আমি কর্তা নই, কর্মফলে আমার স্পৃহা নাই, এইরূপ জ্ঞানে।

এইরূপ জানিয়া (অর্থাৎ আত্মাকে অকর্তা, অভোক্তা মনে করিয়া) পূর্ববর্তী মোক্ষাভিলাষিগণ কর্ম করিয়াছেন; তুমিও পূর্ববর্তিগণের পূর্ব পূর্ব কালে আচরিত কর্মসকল কর। ১৫

পূর্ববর্তী জনকাদি রাজর্ষিগণ কর্তৃত্বাভিমান বর্জনপূর্বক নির্লিপ্তভাবে স্বীয় কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, তুমিও সেইরূপ নিষ্কামভাবে স্বীয় কর্তব্য পালন কর। ১৫

১৬। কিম্ কর্ম (কর্ম কি) কিম্ অকর্ম (কর্মশূন্যতাই বা কি) ইতি অত্র (এই বিষয়ে) কবয়ঃ অপি (জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণও) মোহিতাঃ (মোহপ্রাপ্ত হন, তত্ত্বনির্ণয়ে অক্ষম হন); তৎ (সেই হেতু) তে কর্ম [অকর্ম চ] প্রবক্ষ্যামি (তোমাকে কর্মাকর্ম উভয়ই বলিতেছি) যৎ জ্ঞাত্বা (যাহা জানিয়া) অশুভাৎ মোক্ষ্যসে (অশুভ হইতে মুক্ত হইবে)।

কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ॥ ১৭
কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ॥ ১৮

অকর্ম—'অকর্ম' পদে নঞ্ সমাস (ন কর্ম); ইহার দুই অর্থ—(১) অভাব ও (২) অপ্রাশস্ত্য। সুতরাং 'অকর্ম' পদের অর্থ কর্মের অকরণ, কর্মত্যাগ অথবা অপকর্ম, দুই-ই হইতে পারে। পরবর্তী শ্লোকে অপকর্ম বুঝাইতে 'বিকর্ম' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে এবং কর্মত্যাগ বুঝাইতে 'অকর্ম' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং এখানে এবং গীতায় সর্বত্রই অকর্ম বলিতে কর্মশূন্যতা বা কর্মত্যাগই বুঝায়। **তৎ**—তস্মাৎ (মধুসূদন)। **অশুভাৎ**—সংসারাৎ (শঙ্কর, শ্রীধর)।

কর্ম, অকর্ম ও বিকর্মে ভেদ—নিষ্কাম কর্ম অকর্ম স্বরূপ ১৬-২৩

কর্ম কি, কর্মশূন্যতাই বা কি, এ বিষয়ে পণ্ডিতেরাও মোহ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ইহার প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারেন না। অতএব কর্ম কি, (এবং অকর্ম কি) তাহা তোমাকে বলিতেছি, তাহা জানিলে অশুভ হইতে (সংসারবন্ধন হইতে) মুক্ত হইবে। ১৬

১৭। কর্মণঃ অপি (বিহিত কর্মেরও) বোদ্ধব্যং [তত্ত্বমস্তি] (বুঝিবার বিষয় আছে), বিকর্মণঃ চ (নিষিদ্ধ কর্মেরও) বোদ্ধব্যং [তত্ত্বমস্তি], অকর্মণশ্চ (কর্মশূন্যতার, কর্মত্যাগেরও) বোদ্ধব্যং [তত্ত্বমস্তি]; হি (যেহেতু) কর্মণঃ গতিঃ (কর্মের গতি) গহনা (দুর্জ্ঞেয়া)।

কর্ম—বিহিত কর্ম; **বিকর্ম**—অবিহিত কর্ম; **অকর্ম**—কর্মশূন্যতা; কর্মত্যাগ, কিছু না করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন।

বিহিত কর্মেরও বুঝিবার বিষয় আছে, বিকর্ম বা অবিহিত কর্মেরও বুঝিবার বিষয় আছে, অকর্ম বা কর্মত্যাগ সম্বন্ধেও বুঝিবার বিষয় আছে; কেননা কর্মের গতি (তত্ত্ব) দুর্জ্ঞেয় (পরের শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রঃ)। ১৭

পরবর্তী শ্লোকসমূহে এবং ১৮শ অধ্যায়ে ত্রিবিধ কর্ম ও কর্তার ভেদবর্ণনায় কর্মতত্ত্ব সম্যক্ আলোচনা করা হইয়াছে।

১৮। যঃ (যিনি) কর্মণি (কর্মে) অকর্ম, অকর্মণি চ (এবং অকর্মে) যঃ (যিনি) কর্ম পশ্যেৎ (দর্শন করেন), সঃ (তিনি) মনুষ্যেষু (মনুষ্যের মধ্যে) বুদ্ধিমান্; সঃ যুক্তঃ (তিনি যোগযুক্ত) [এবং] কৃৎস্নকর্মকৃৎ (সর্বকর্মকারী)।

যিনি কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম দেখেন, মনুষ্যের মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমান্, তিনি যোগী, তিনি সর্বকর্মকারী। ১৮

কর্মতত্ত্ব—কর্ম, অকর্ম, বিকর্ম

পূর্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে যে কর্ম, অকর্ম, বিকর্ম এ তিনটিতেই বুঝিবার বিষয় আছে। সে তত্ত্ব কি? কর্ম বন্ধনের কারণ; এই কারণে, অনেকে কর্মত্যাগ করিয়া 'আমি বন্ধনমুক্ত হইয়া কেমন সুখে আছি'—কর্মণো বন্ধহেতুত্বাৎ তূষ্ণীমেব ময়া সুখেন স্থাতব্যমিতি—এইরূপ মনে করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন। আমি কিন্তু তোমাকে কর্ম করিতে বলিতেছি এবং কর্ম করিয়াও কর্মে বদ্ধ হইবে না, একথা বলিতেছি। এ রহস্য বুঝিবার বিষয়। কর্ম সম্বন্ধে বুঝিবার বিষয় এই যে, কিরূপ ভাবে কর্ম করিলে উহা বন্ধনের কারণ হয় না। বিকর্ম অর্থাৎ অবিহিত কর্ম সম্বন্ধে বুঝিবার বিষয় এই যে, কিরূপ ভাবে কর্ম করিলে অবিহিত কর্মেরও ফলভাগিত্ব নষ্ট হয় অর্থাৎ উহা দুর্গতিজনক হয় না। অকর্ম অর্থাৎ কর্মত্যাগ সম্বন্ধে বুঝিবার বিষয় এই যে, কর্মত্যাগ করিয়া চুপ করিয়া থাকিলেই মুক্ত হওয়া যায় কিনা।

এই শ্লোকে এই সকল তত্ত্ব বলিতেছি। যিনি কর্মে অকর্ম দর্শন করেন অর্থাৎ যিনি কর্ম করিয়াও মনে করেন যে, দেহেন্দ্রিয়াদি কর্ম করিতেছে, আমি কিছুই করি না, তিনিই বুদ্ধিমান্, কেননা কর্ম করিয়াও তিনি কর্মের ফলভোগী হন না। অর্থাৎ যিনি কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া কর্ম করেন, তাঁহার কর্মও অকর্মস্বরূপ। ইহাই **কর্মতত্ত্ব।** ইহাতে বিকর্মতত্ত্বও বলা হইল, কারণ যাঁহার কর্তৃত্বাভিমান নাই, তিনি অবিহিত কর্ম করিয়াও তাহার ফলভোগী হন না (১৮।১৭), সুতরাং নির্লিপ্ত অনহঙ্কারী কর্মযোগীর পক্ষে বিকর্মও অকর্মস্বরূপ, ইহাই **বিকর্ম তত্ত্ব।**

আর যিনি অকর্মে কর্ম দর্শন করেন, তিনিই বুদ্ধিমান্। অনেকে আলস্যহেতু দুঃখবুদ্ধিতে কর্তব্যকর্ম ত্যাগ করেন, কিন্তু তাঁহারা জানেন না এ অবস্থায়ও প্রকৃতির ক্রিয়া চলিতে থাকে, কর্মবন্ধ হয় না (৩।৫, ১৮।১১)। এই যে কর্মত্যাগ বা অকর্ম ইহা প্রকৃতপক্ষে কর্ম, কেননা ইহা বন্ধনের কারণ। আবার ইঁহারা কর্ম ত্যাগ করিয়া মনে করেন, আমি কর্ম করি না, আমি বন্ধনমুক্ত। কিন্তু "আমি কর্ম করি" ইহা যেমন অভিমান, "আমি কর্ম করি না" ইহাও সেইরূপ অভিমান; সুতরাং বন্ধনের কারণ ইহারা বুঝেন না যে, কর্ম করে প্রকৃতি, 'আমি' নহে। বস্তুতঃ 'আমি' ত্যাগ না হইলে

যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥ ১৯
ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥ ২০

কেবল কর্মত্যাগে বন্ধনমুক্ত হওয়া যায় না। সুতরাং এইরূপ অকর্ম বা কর্মত্যাগও বন্ধনহেতু বলিয়া প্রকৃতপক্ষে কর্মই। ইহা **অকর্মতত্ত্ব।** যিনি কর্ম, অকর্ম ও বিকর্ম-তত্ত্ব এইরূপে বুঝিয়াছেন তিনি বুদ্ধিমান্, কেননা তিনিই প্রকৃতদর্শী; যিনি যোগযুক্ত, তিনি ভগবানের সহিত আত্মাকে যুক্ত রাখিয়াই কর্ম করেন, কেননা তিনি নিরহঙ্কার ও নির্লিপ্ত; তিনি সর্বকর্মকারী, কেননা কর্ম বন্ধনের কারণ হয় না বলিয়াই তাঁহার কর্মত্যাগ করার প্রয়োজন হয় না। ১৮

১৯। যস্য (যাহার) সর্বে সমারম্ভাঃ (সমস্ত চেষ্টা) কামসংকল্পবর্জিতাঃ (ফলকামনা ও কর্তৃত্বাভিমান-বর্জিত) বুধাঃ (জ্ঞানিগণ) জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তং (জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইয়াছে কর্ম যাঁহার তাঁহাকে) পণ্ডিতং আহুঃ (পণ্ডিত বলেন)।

কামসংকল্পবর্জিতাঃ—কামঃ ফলতৃষ্ণা, সংকল্পোঽহং করোমীতি কর্তৃত্বাভিমানস্তাভ্যাং বর্জিতাঃ (মধুসূদন)। কাম—ফলতৃষ্ণা, সংকল্প—"আমি করিতেছি" এইরূপ কর্তৃত্বাভিমান, এই উভয় বর্জিত। **জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণম্**—কর্মে অকর্ম দর্শনরূপ জ্ঞান দ্বারা যাহার শুভাশুভ কর্মফল দগ্ধ হইয়াছে, কর্মের ফলভাগিত্ব বিনষ্ট হইয়াছে।

যাঁহার সমস্ত কর্মচেষ্টাই ফলতৃষ্ণা ও কর্তৃত্বাভিমান-বর্জিত, সুতরাং যাঁহার কর্ম জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইয়াছে, সেইরূপ ব্যক্তিকে জ্ঞানিগণ পণ্ডিত বলিয়া থাকেন। ১৯

নিষ্কাম কর্ম, দিব্য কর্ম, ভাগবত কর্ম। পূর্ব শ্লোকে এবং পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে দিব্য কর্মীর লক্ষণসমূহ উক্ত হইতেছে। 'আমি করিতেছি' এইরূপ কর্তৃত্বাভিমান যাঁহার নাই, তিনি কর্ম করিয়াও তাহার ফলভোগী হন না। অহং-বুদ্ধি ত্যাগই প্রকৃত জ্ঞান। এই জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা তাঁহার কর্মের ফল দগ্ধ হইয়াছে, তাঁহার কর্মের ফলভাগিত্ব বিনষ্ট হইয়াছে। এইরূপ ব্যক্তিই কর্মে অকর্ম অর্থাৎ কর্মশূন্যতা দেখেন (৩।২৭, ৪।২৭, ১৮।১৬।১৭, ২।২০ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

২০। সঃ (তিনি) কর্মফলাসঙ্গং (কর্ম ও কর্মফলে আসক্তি) ত্যক্ত্বা

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ২১

(ত্যাগ করিয়া) নিত্যতৃপ্তঃ (সদা তুষ্ট) নিরাশ্রয়ঃ (নিরবলম্ব) [সন্ (হইয়া)] কর্মণি (কর্মে) অভিপ্রবৃত্তঃ অপি (সম্যক্ রূপে প্রবৃত্ত হইলেও, ডুবিয়া থাকিলেও) কিঞ্চিৎ অপি ন করোতি (কিছুই করেন না)।

নিত্যতৃপ্ত—নিত্য নিজানন্দে পরিতৃপ্ত; বিষয়ে নিরাকাঙ্ক্ষ (শঙ্কর)। **নিরাশ্রয়**—যিনি যোগক্ষেমার্থ অর্থাৎ অলব্ধ বস্তুর লাভ এবং লব্ধবস্তুর রক্ষার জন্য কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করেন না, কেননা যিনি নিত্যতৃপ্ত, তাঁহার কিছুতেই প্রয়োজন নাই। **কর্মফলাসঙ্গ**—কর্ম ও ফলে আসক্তি; 'আমি করিতেছি' এই যে অভিমান, ইহা কর্মাসক্তি; 'আমি এই ফল চাই' এই যে কামনা, ইহা ফলাসক্তি।

যিনি কর্মে ও কর্মফলে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন, যিনি সদা আপনাতেই পরিতৃপ্ত, যিনি কোন প্রয়োজনে কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করেন না, তিনি কর্মে প্রবৃত্ত হইলেও কিছুই করেন না (অর্থাৎ তাঁহার কর্ম অকর্মে পরিণত হয়)। ২০

২১। নিরাশীঃ (নিষ্কাম), যতচিত্তাত্মা (সংযতচিত্ত, সংযতেন্দ্রিয়), ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ (সর্বপ্রকার দান-উপহার আদি পরিত্যাগী ব্যক্তি) কেবলং শারীরং কর্ম কুর্বন্ (কেবলমাত্র শরীরদ্বারা কর্ম করিয়া) কিল্বিষম্ (পাপ, বন্ধন) ন আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন না)।

নিরাশীঃ—নির্গতা আশিষঃ কাম্যা যস্মাৎ সঃ নিষ্কামঃ (শ্রীধর)। **যতচিত্তাত্মা**—যাহার চিত্ত ও ইন্দ্রিয়াদি সংযত (মধুসূদন)। **ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ**—ত্যক্তাঃ সর্বে পরিগ্রহাঃ যেন সঃ (মধুসূদন)। যিনি কোন অবস্থায়ই নিজের ভোগের জন্য দান, উপহার আদি গ্রহণ করেন না।

যিনি কামনা ত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহার চিত্ত ও ইন্দ্রিয় সংযত, যিনি সর্বপ্রকার দান উপহারাদি গ্রহণ বর্জন করিয়াছেন, তাদৃশ ব্যক্তি কেবল শরীরদ্বারা কর্মানুষ্ঠান করিয়াও পাপভাগী হন না। (কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না)। ২১

কেবলং শারীরং কর্ম—শরীরমাত্রনির্বর্ত্যং কর্তৃত্বাভিনিবেশরহিতং কর্ম (শ্রীধর)—অর্থাৎ কেবল শরীরদ্বারা কর্মটি হইতেছে, কর্তার তাহাতে

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাঽপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২
গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩

কর্তৃত্বাভিমান নাই, তিনি যেন নিষ্ক্রিয়, উদাসীন। কেহ কেহ বলেন, 'শারীরং কর্ম' অর্থাৎ ভিক্ষাটনাদি শরীরযাত্রানির্বাহোপযোগী কর্ম। এরূপ অর্থ কেবল সন্ন্যাসীদিগের পক্ষেই প্রযোজ্য। কিন্তু জ্ঞানিগণের পক্ষেও লোকসংগ্রহার্থ কর্ম পুনঃ পুনঃ উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং এরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থ সঙ্গত বোধ হয় না।

২২। যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ (অযাচিত লাভে পরিতুষ্ট), দ্বন্দ্বাতীতঃ (শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু), বিমৎসরঃ (মাৎসর্য-বর্জিত), সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ চ সমঃ (সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমবুদ্ধিসম্পন্ন) [পুরুষ] কৃত্বা অপি (কর্ম করিয়াও) ন নিবধ্যতে (বন্ধন প্রাপ্ত হন না)।

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ—প্রার্থনা ও উদ্যম ব্যতীত যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতেই সন্তুষ্ট। **বিমৎসরঃ**—মাৎসর্যশূন্য, সুতরাং নির্বৈর (মাৎসর্য= পরশ্রীকাতরতা)। দ্বন্দ্বাতীত—(২।৪৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

যিনি প্রার্থনা ও বিশেষ চেষ্টা না করিয়া যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, যিনি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু, মাৎসর্যশূন্য সুতরাং বৈরবিহীন, যিনি সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করেন, তিনি কর্ম করিয়াও কর্মফলে আবদ্ধ হন না (২।৪৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। ২২

২৩। গতসঙ্গস্য (ফলাসক্তি-বর্জিত), মুক্তস্য (রাগদ্বেষাদি বন্ধন হইতে বিমুক্ত), জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ (জ্ঞানে-অবস্থিত চিত্ত) যজ্ঞায় কর্ম আচরতঃ (যজ্ঞার্থ কর্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তির) সমগ্রং কর্ম (সমস্ত কর্ম) প্রবিলীয়তে (বিনষ্ট হয়)।

মুক্তঃ—রাগাদি-বিমুক্তঃ (শ্রীধর), কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি-অভিমান-বিমুক্তঃ (মধুসূদন)। **জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ**—যাহার চিত্ত জ্ঞানে অবস্থান করিতেছে। জ্ঞান=আত্মবিষয়ক জ্ঞান।

যিনি ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত, রাগদ্বেষাদি-মুক্ত, যাঁহার চিত্ত আত্মবিষয়ক জ্ঞানে নিবিষ্ট বা জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থিত, যিনি যজ্ঞার্থ (অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রীত্যর্থ যজ্ঞস্বরূপ) কর্ম করেন, তাঁহার কর্মসকল ফলসহ বিনষ্ট

হইয়া যায়, ঐ কর্মের কোন সংস্কার থাকে না (অর্থাৎ তাহার কর্ম বন্ধনের কারণ হয় না)। ২৩

যজ্ঞায়—যজ্ঞার্থ। ঈশ্বর-প্রীত্যর্থ বা ঈশ্বর-আরাধনার্থ কর্মমাত্রই যজ্ঞ। নিষ্কামভাবে লোকরক্ষার্থে ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে যে কর্ম করা হয় তাহাও যজ্ঞ। বস্তুতঃ, কর্মযোগীর কর্মমাত্রই যজ্ঞস্বরূপ। এইরূপ কর্ম অকর্মস্বরূপ, উহা বন্ধনের কারণ নহে।

গীতায় যজ্ঞতত্ত্ব—যজ্ঞ শব্দের এবং যজ্ঞ-তত্ত্বের ইতিহাস হিন্দুধর্মের ক্রম-অভিব্যক্তির ইতিহাস। বৈদিক যজ্ঞাদি লইয়াই এই ধর্মের আরম্ভ। প্রাচীন বৈদিক আর্যগণ যজ্ঞদ্বারা দেবগণের আরাধনা করিয়া অভীষ্ট প্রার্থনা করিতেন। কালক্রমে এই সকল যজ্ঞবিধি অতি জটিল ও বিস্তৃত হইয়া পড়ে। বেদের ব্রাহ্মণভাগে বিবিধ যাগযজ্ঞাদির বিস্তৃত বিবরণ আছে। বৈদিক ক্রিয়াকর্মের এবং বৈদিক মন্ত্রের তুইটি অঙ্গ ছিল, তুইটি অর্থ ছিল—একটি বাহ্য, আনুষ্ঠানিক ; আর একটি আভ্যন্তরীণ, আধ্যাত্মিক। বাহ্য অনুষ্ঠানটি প্রকৃত-পক্ষে কোন আধ্যাত্মিক গূঢ়-তত্ত্বেরই রূপক বা প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হইত। যেমন, সোমরস ছিল অমৃত, অমরত্ব বা ভূমানন্দের প্রতীক। বস্তুতঃ, হিন্দুদিগের পূজার্চনা, আচার-অনুষ্ঠান সমস্তই রূপক বা প্রতীক-তান্ত্রিক (symbolic)। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরুন, আমাদের একটি সাধারণ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান—ধানদূর্বাদ্বারা আশীর্বাদ করা। প্রাচীন আর্য-সমাজে ধানই ছিল ধনের প্রতীক (এখনও ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান), আর দূর্বা হইতেছে দীর্ঘায়ুর প্রতীক। দূর্বার মৃত্যু নাই, রৌদ্রে পুড়িয়া, বর্ষায় পচিয়া গেলেও আবার গজাইয়া উঠে। উহার আর এক নাম 'অমর'। সুতরাং ধানদূর্বা মস্তকে দেওয়ার অর্থ এই—ধনেশ্বর হও, চিরায়ু লাভ কর। কিন্তু আশীর্বাদক যদি এই অনুষ্ঠানের অর্থ না বোঝেন এবং তাঁহার অন্তরের শুভেচ্ছা যদি উহার সহিত সংযুক্ত না হয়, তবে কেবল ধানদূর্বা দানে কোন কাজ হয় না। আমাদের ধর্ম-কর্মের অধিকাংশই এক্ষণে প্রাণহীন, অর্থহীন অনুষ্ঠানমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে, কেননা উহার গূঢ়ার্থ অনেক স্থলেই লোপ পাইয়াছে। বৈদিক বিবিধ যাগযজ্ঞাদিরও মূলে গূঢ় রহস্য ছিল, প্রকৃত বেদজ্ঞের অভাবে উহা কালে লোপ পাইয়াছে। সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, যজ্ঞমাত্রেরই মূল তাৎপর্য হইতেছে ত্যাগ এবং ত্যাগের ফলস্বরূপ ভোগ—দিব্যভোগ ('অমৃতমশ্নুতে')। নৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ প্রভৃতি স্মার্ত যজ্ঞগুলি সকলই ত্যাগমূলক (৩।১৩ ব্যাখ্যা দ্রঃ)। প্রাচীনকালে

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা। ২৪

যজ্ঞই ঈশ্বরের আরাধনার প্রধান অঙ্গ ছিল এবং উহা দ্বিজগণের নিত্য কর্তব্য ছিল। এইরূপে কালক্রমে যজ্ঞ শব্দের অর্থ আরও সম্প্রসারিত হইয়া পড়ে এবং চতুর্বর্ণের যথাবিহিত কর্মমাত্রই উহার অন্তর্ভুক্ত হয়। (মনু ১১।২৩৬, মভা. শা. ২৩৭, অনু ৪৮।৩—"আরম্ভযজ্ঞাঃ ক্ষত্রাশ্চ" ইত্যাদি। ক্রমে ব্রহ্মবিদ্যা ও জ্ঞানমার্গের প্রভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে বৈদিক যাগযজ্ঞাদি গৌণ বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল এবং ব্রহ্মচিন্তাই শ্রেষ্ঠ মোক্ষপথ বলিয়া নির্ধারিত হইল। তখন যজ্ঞের স্বরূপও পরিবর্তিত হইল; তখন শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ হইল ব্রহ্মচিন্তা—ইহাকে বলে অন্তর্যাগ, জ্ঞানযজ্ঞ বা ব্রহ্মযজ্ঞ। জ্ঞান এই যজ্ঞের অগ্নি, প্রাণ স্তোত্র, মন হোতা, সর্বস্বত্যাগ দক্ষিণা ইত্যাদি যজ্ঞাঙ্গের লাক্ষণিক বর্ণনা নানা গ্রন্থে আছে (অনুগীতা ২৪।২৫)। তৎপর ভাগবত ধর্ম ও ভক্তিমার্গের প্রচার হইলে পুরাণাদি শাস্ত্রে জপযজ্ঞ বা নামযজ্ঞেরই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। শ্রীগীতায়ও ভগবান্ দ্রব্যযজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞেরই শ্রেষ্ঠতা দিয়াছেন (৪।৩৩), আবার স্বীয় বিভূতি বর্ণনা-প্রসঙ্গে 'যজ্ঞের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ' একথাও বলিয়াছেন (১০।২৫)। বস্তুতঃ, ভারতীয় ধর্মচিন্তার ক্রমবিকাশ ও সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞ শব্দের অর্থ ও তাৎপর্যও সম্প্রসারিত হইয়াছে এবং গীতায় এই সম্প্রসারণের সকলগুলি স্তরই স্বীকার করা হইয়াছে এবং যজ্ঞের যে মূলতত্ত্ব ত্যাগ, ঈশ্বরার্পণ, নিষ্কামতা তাহা দ্বারা যুক্ত করিয়া সকলগুলিই মোক্ষপ্রদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রৌত স্মার্ত যজ্ঞাদির উল্লেখ করা হইয়াছে এবং উহাও অনাসক্ত ভাবে করিলে মোক্ষপ্রদ হয় এ কথা বলা হইয়াছে (৩।৯-১৬)। এই অধ্যায়ে 'যজ্ঞ' শব্দের লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ করিয়া তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞাদি বিবিধ সাধন-প্রণালী বর্ণনা করিয়া তন্মধ্যে জ্ঞানযজ্ঞের শ্রেষ্ঠতা বর্ণিত হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, অনাসক্তচিত্ত জ্ঞানী মুক্ত পুরুষ যজ্ঞস্বরূপে অর্থাৎ ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে যে কর্ম করেন তাহাতে বন্ধন হয় না (৪।২৩, ২৪-৩৩)। পূর্বোক্ত কথাগুলি হৃদয়ঙ্গম করিলেই যজ্ঞ শব্দ গীতায় কোথায় কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা বুঝা যাইবে (অপিচ, ৩।৯ শ্লোকের ব্যাখ্যা এবং ৩।১৪-১৬ শ্লোকের ব্যাখ্যায় 'গীতায় যজ্ঞবিধি' দ্রঃ)।

২৪। অর্পণং (স্রুবাদি যজ্ঞপাত্র) ব্রহ্ম, হবিঃ (ঘৃত) ব্রহ্ম, ব্রহ্মাগ্নৌ (ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে) ব্রহ্মণা (ব্রহ্মরূপ হোতা কর্তৃক) হুতং (হোম হইতেছে), [এইরূপ যিনি দেখেন] তেন ব্রহ্মকর্মসমাধিনা (ব্রহ্মরূপ কর্মে সমাহিতচিত্ত সেই ব্যক্তিকর্তৃক) ব্রহ্ম এব গন্তব্যম্ (ব্রহ্মই লব্ধ হন)।

অর্পণম্—অর্প্যতে অনেন ইতি অর্পণং স্রুবাদি—যাহাদ্বারা অর্পণ করা যায় এই অর্থে 'অর্পণ', অর্থ স্রুবাদি যজ্ঞপাত্র (শ্রীধর)। **ব্রহ্মকর্মসমাধিনা**—ব্রহ্ম এব কর্ম তস্মিন্ সমাধি চিত্তৈকাগ্র্যং যস্য তেন—ব্রহ্মরূপ কর্মে একাগ্রচিত্ত পুরুষ (শ্রীধর)।

ব্রহ্মকর্ম, বিবিধ লাক্ষণিক যজ্ঞের বর্ণনা—
জ্ঞানযজ্ঞের শ্রেষ্ঠতা ২৪-৩৩

অর্পণ (স্রুবাদি যজ্ঞপাত্র) ব্রহ্ম, ঘৃতাদি ব্রহ্ম, অগ্নি ব্রহ্ম, যিনি হোম করেন তিনিও ব্রহ্ম, এইরূপ জ্ঞানে ব্রহ্মরূপ কর্মে একাগ্রচিত্ত পুরুষ ব্রহ্মই প্রাপ্ত হন। ২৪

যিনি কর্মে ও কর্মের অঙ্গসকলে ব্রহ্মই দেখেন, তিনি ব্রহ্মত্বই প্রাপ্ত হন— 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি'। ২৪

জ্ঞানীর কর্ম ব্রহ্মকর্ম—যিনি যজ্ঞ করিতে বসিয়া স্রুবাদি কিছু দেখিতে পান না, সর্বত্রই ব্রহ্ম দর্শন করেন, ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু ভাবনা করিতে পারেন না, ব্রহ্মে একাগ্রচিত্ত সেই যোগী পুরুষ ব্রহ্মই প্রাপ্ত হন। এই স্থলে 'যজ্ঞ'-শব্দ রূপকার্থক, বস্তুতঃ জ্ঞানীর কর্মকেই এখানে যজ্ঞরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। ইহাই কর্মযোগের শেষ কথা, এই অবস্থায় কর্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়—'সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে (৪।৩৩)।' এই জন্যই বলা হইয়াছে, 'সাংখ্যগণ যে স্থান লাভ করেন, কর্মযোগীও তাহাই প্রাপ্ত হন (৫।৫)। যাঁহারা 'সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগকে পৃথক্ বলেন তাঁহারা অজ্ঞ (৫।৪)।' 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (এ সমস্তই ব্রহ্ম), 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (আমি ব্রহ্ম), ইত্যাদি বৈদিক বাক্য এই জ্ঞানই প্রচার করিয়াছেন। জীবের অহংবুদ্ধি যখন সম্পূর্ণ বিদূরিত হয়, তখনই এই পূর্ণ একত্বের জ্ঞান আবির্ভূত হয়। তখন জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, উপাস্য, উপাসক, কর্তা, কর্ম, করণ এই-সকল ভেদবুদ্ধি থাকে না; সর্বত্রই এক তত্ত্বই, এক শক্তিই আবির্ভূত হয়। এইরূপ জ্ঞানে যিনি কর্ম করিতে পারেন, জীবন যাপন করিতে পারেন, তাঁহার কর্ম-বন্ধন কি? তিনি তো মুক্ত পুরুষ। আবার যাঁহারা ভক্তিপথের সাধক, তাঁহারাও শেষে এই অবস্থায়ই উপনীত হন। তাই রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

'আহার করি, মনে করি, আহুতি দেই শ্যামা মাকে।'

তিনি একাধারে ভক্ত ও ব্রহ্মজ্ঞানী, তাঁহার 'শ্যামা মা' ব্রহ্মময়ী, তাঁহার কর্ম ব্রহ্মকর্ম, লৌকিক ধর্মকর্মাদি তাঁহার কিছু নাই—তিনি কখন 'ফাড়ে ফোড়ে', কখন স্পষ্টই বলিয়াছেন—

'আমি কালী ব্রহ্ম, জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।'

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫

সুতরাং কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি—তিন মার্গেরই শেষ ফল অদ্বয় তত্ত্বোপলব্ধি, পার্থক্য প্রারম্ভে ও সাধনাবস্থায়; কর্মীর আরম্ভ লোকরক্ষার্থ বা ঈশ্বরপ্রীত্যর্থ নিষ্কাম কর্মে, ভক্তের আরম্ভ নিষ্কাম উপাসনায়; প্রেমভক্তিরও পরিপক্কাবস্থায় সর্বত্রই উপাস্যের স্ফূর্তি হয়—'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ 'স্ফুরে'। শুনা যায়, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পূজাকালে পুষ্পাঞ্জলি কখনও মায়ের চরণে পড়িত, আবার কখনও নিজের চরণেও পড়িত। পুরাণে দেখি, রাগমার্গে ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণ চিন্তা করিতে করিতে কৃষ্ণময় হইয়া গেলেন ('তন্মনস্কাস্তদালাপাস্তদ্বিচেষ্টা-স্তদাত্মিকাঃ'—ভাগবত); 'আমি কৃষ্ণ' 'আমি কৃষ্ণ' বলিয়া কৃষ্ণের লীলানুসরণ করিতে লাগিলেন—'দুষ্ট কালিয়, তিষ্ঠাত্র কৃষ্ণোঽহমিতি চাপরা' (বিষ্ণুপুরাণ)। সেই কথাই বৈষ্ণব-কবিও লিখিয়াছেন—'অনুখণ মাধব মাধব স্মরয়ি সুন্দরী ভেল মাধাই'—বিদ্যাপতি।

কিন্তু জ্ঞানমার্গী সাধকগণ প্রারম্ভ হইতেই অদ্বৈতভাবে চিন্তা করেন। প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদের কোন উপাসনা নাই, কেননা সকলই যখন ব্রহ্ম, তখন কে কাহার উপাসনা করিবে? কেবল ব্রহ্মচিন্তাই তাঁহাদের উপাসনা, তাই এই উপাসনার নাম 'বিশিষ্ট চিন্তা'। ইহা ত্রিবিধ—(১) অঙ্গাববিদ্ধ উপাসনা (যজ্ঞের অঙ্গবিশেষকে ব্রহ্ম ভাবনা করা), (২) প্রতীক উপাসনা—যাহা ব্রহ্ম নয়, তাহাকে ব্রহ্ম ভাবনা, যেমন—'মনো ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত,' মনকে ব্রহ্ম ভাবিয়া উপাসনা করিবে)। (৩) অহংগ্রহ—আত্মা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন 'অহং ব্রহ্মাস্মি' 'আমিই ব্রহ্ম'—এইরূপ ভাব-সাধনই অহংগ্রহ উপাসনা। কেহ কেহ বলেন—এই শ্লোকে জ্ঞানমার্গী সাধকগণের অঙ্গাববিদ্ধ উপাসনার প্রতি লক্ষ করা হইয়াছে।

২৫। অপরে যোগিনঃ (অন্য যোগিগণ) দৈবম্ এব যজ্ঞং (দৈব যজ্ঞই) পর্য্যুপাসতে (অনুষ্ঠান করেন); অপরে (অন্য কেহ কেহ) ব্রহ্মাগ্নৌ (ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে) যজ্ঞেন এব (যজ্ঞদ্বারাই) যজ্ঞম্ উপজুহ্বতি (যজ্ঞের যজন করেন)।

অন্য কোন কোন যোগিগণ দৈবযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, অপর কেহ কেহ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে (পূর্বোক্ত ব্রহ্মার্পণরূপ) যজ্ঞদ্বারাই যজ্ঞার্পণ করেন (অর্থাৎ সর্বকর্ম ব্রহ্মে অর্পণ করেন)। ২৫

প্রথমোক্ত যোগিগণ ভগবানের বিভিন্ন শক্তির উপাসনা করিয়া বিভিন্ন ধর্ম-কর্মানুষ্ঠান দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিতে চান; অপর কেহ কেহ সমস্ত

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬
সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭

কর্মই ভগবানে অর্পণ করেন—এবং ভাগবত জ্ঞান ও শক্তি দ্বারাই আপনাদিগকে পরিচালিত করেন, ইহাই তাঁহাদের একমাত্র কর্ম।—শ্রীঅরবিন্দ

মূলে আছে, 'যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞকে ব্রহ্মাগ্নিতে আহুতি দেন।' (১) কেহ বলেন, ইহার অর্থ এই—পূর্ব শ্লোকোক্ত ব্রহ্মার্পণরূপ যজ্ঞদ্বারা কর্মসমূহ ব্রহ্মে অর্পণ করেন; (২) কেহ বলেন—ব্রহ্মার্পণরূপ যজ্ঞদ্বারা এইরূপ অগ্নিতে আত্মাকে আহুতি দেন অর্থাৎ জীবাত্মার পরমাত্মদর্শনরূপ হোম সম্পাদন করেন। ইহাই জ্ঞানযজ্ঞ।

এই শ্লোকে এবং পরবর্তী শ্লোকসমূহে নানাবিধ যজ্ঞের কথা বলা হইতেছে। 'যজ্ঞ' শব্দ রূপকার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, এই সকল স্থলে যজ্ঞের লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন সাধন-প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। এই শ্লোকে দুই প্রকার যজ্ঞের উল্লেখ আছে—(১) **দৈবযজ্ঞ** অর্থাৎ ইন্দ্রবরুণাদি দেবতার উদ্দেশ্যে যে সকল যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। (২) **ব্রহ্মার্পণ যজ্ঞ** বা **জ্ঞানযজ্ঞ**—ব্রহ্মাগ্নিতে জীবাত্মার আহুতি।

২৬। অন্যে (অপরে) শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়াণি (চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণকে) সংযমাগ্নিষু (সংযমরূপ অগ্নিতে) জুহ্বতি (আহুতি দেন); অন্যে ইন্দ্রিয়াগ্নিষু (ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে) শব্দাদীন্ বিষয়ান্ (শব্দাদি বিষয়সমূহকে) জুহ্বতি (আহুতি দেন)।

অন্যে সংযমরূপ অগ্নিতে চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে হোম করেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলিকে রূপরসাদি বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া সংযতেন্দ্রিয় হইয়া অবস্থান করেন, ইহার নাম (৩) **সংযমযজ্ঞ** বা ব্রহ্মচর্য। অন্যে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয়সমূহকে আহুতি দেন—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ শব্দাদি বিষয় গ্রহণ করিতেছে, কিন্তু তিনি রাগদ্বেষশূন্যচিত্তে অনাসক্তভাবে থাকেন। মুমুক্ষু নির্লিপ্ত সংসারীরা এই যজ্ঞ করেন; ইহাকে বলা যায় (৪) **ইন্দ্রিয়যজ্ঞ**। (২।৬৪)। ২৬

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥ ২৮

এই ইন্দ্রিয়-যজ্ঞে প্রকৃতপক্ষে বিষয় ভোগ করিতে বলা হইতেছে না, প্রারব্ধ কর্মবশে বা লোক-সংগ্রহার্থে বিষয় সেবা করিলেও বিষয়াসক্তি সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে হইবে, ইহাই অভিপ্রেত। এই আসক্তিত্যাগই বিষয়াহুতি।

২৭। অপরে (অন্য কেহ) সর্বাণি (সমস্ত) ইন্দ্রিয়কর্মাণি (ইন্দ্রিয়গণের কর্ম) প্রাণকর্মাণি চ (ও প্রাণাদি বায়ুর কর্মরাশিকে) জ্ঞানদীপিতে (জ্ঞানদ্বারা উদ্দীপিত) আত্মসংযমযোগাগ্নৌ (আত্মসংযমরূপ অগ্নিতে) জুহ্বতি (হোম করেন)।

ইন্দ্রিয়কর্ম—চক্ষুকর্ণাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের কর্ম দর্শন-শ্রবণাদি, বাক্-পাণি-আদি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের কর্ম বচনগ্রহণাদি—এই দশবিধ ইন্দ্রিয়কর্ম। **প্রাণকর্ম**—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান—মনুষ্য শরীরে এই পঞ্চপ্রাণ আছে। প্রাণবায়ুর কর্ম বহির্নয়ন, অপানের কর্ম অধোনয়ন, ব্যানের কর্ম আকুঞ্চন ও প্রসারণ, সমানের কর্ম ভুক্তপদার্থের পরিপাক করণ, উদানের কর্ম ঊর্ধ্বনয়ন; এই সমস্ত প্রাণকর্ম। **আত্মসংযমযোগাগ্নৌ**—আত্মনি সংযমঃ ধ্যানৈকাগ্র্যং স এব যোগঃ সমাধিরিত্যর্থঃ স এব অগ্নিঃ তস্মিন্—(শ্রীধর)। আত্মাতে চিত্তকে একাগ্র করার নাম আত্মসংযম যোগ। যোগশাস্ত্র বলেন—ধারণা, ধ্যান, সমাধি—এই তিনটি কার্য এক বস্তুর সম্বন্ধে অভ্যস্ত হইলেই সংযম হয়। ('ত্রয়মেকত্র সংযমঃ', যোগসূত্র ৩।৪)। যে যোগে ধারণা-ধ্যানাদি আত্মার সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় তাহা আত্মসংযম-যোগ। ইহাকে **জ্ঞানদীপিত** বলা হইয়াছে—কেননা ইহা আত্মজ্ঞানদ্বারা উজ্জ্বল ভাবাপন্ন।

অন্য কেহ (ধ্যানযোগিগণ) সমস্ত ইন্দ্রিয়-কর্ম ও সমস্ত প্রাণকর্মকে ব্রহ্মজ্ঞানে প্রদীপিত আত্মসংযম বা সমাধিরূপ যোগাগ্নিতে হোম করেন অর্থাৎ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চপ্রাণ ইহাদের সমস্ত কর্ম নিরোধ করিয়া আত্মানন্দসুখে মগ্ন থাকেন। ইহার নাম (৫) **আত্মসংযম** বা সমাধি-যজ্ঞ। ২৭

২৮। [কেহ কেহ] দ্রব্যযজ্ঞাঃ (দ্রব্যযজ্ঞপরায়ণ), [কেহ কেহ] তপোযজ্ঞাঃ (তপোযজ্ঞপরায়ণ), [কেহ কেহ] যোগযজ্ঞাঃ (যোগযজ্ঞপরায়ণ) তথা অপরে (আর কোন) যতয়ঃ (যত্নশীল) সংশিতব্রতাঃ (দৃঢ়ব্রত ব্যক্তিগণ) স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ (বেদাভ্যাস ও বেদজ্ঞানরূপ যজ্ঞপরায়ণ [হন]

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥ ২৯

দ্রব্যযজ্ঞাঃ—দ্রব্যদানমেব যজ্ঞো যেষাং তে দ্রব্যযজ্ঞাঃ, দ্রব্যদান যাঁহাদিগের যজ্ঞ তাঁহারা, দ্রব্যযজ্ঞপরায়ণ (ব্যক্তিগণ); **স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ**—বেদাভ্যাসো যজ্ঞো যেষাং তে স্বাধ্যায়যজ্ঞাঃ, শাস্ত্রার্থপরিজ্ঞানং যজ্ঞো যেষাং তে জ্ঞানযজ্ঞাঃ(শঙ্কর) —বেদাভ্যাসরূপ যজ্ঞ ও বেদার্থজ্ঞানরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা ; **সংশিতব্রতাঃ**— সম্যক্ শিতং তীক্ষ্ণীকৃতং ব্রতং যেষাং তে (শঙ্কর, শ্রীধর)—দৃঢ়ব্রত, দৃঢ়সঙ্কল্প।

কেহ কেহ দ্রব্যদানরূপ যজ্ঞ করেন, কেহ কেহ তপোরূপ যজ্ঞ করেন, কেহ কেহ যোগরূপ যজ্ঞ করেন, কোন কোন দৃঢ়ব্রত যতিগণ বেদাভ্যাসরূপ যজ্ঞ করেন, কেহ কেহ বেদার্থপরিজ্ঞানরূপ যজ্ঞ সম্পাদন করেন। ২৮

এই শ্লোকে পাঁচ প্রকার যজ্ঞের কথা বলা হইল।—

(১) **দ্রব্যযজ্ঞ**—দ্রব্যত্যাগ-রূপ যজ্ঞ। পূর্বে যে দ্রব্যযজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে (৪।২৫) তাহাও দ্রব্যযজ্ঞ। উহা শ্রৌত কর্ম, আর বাপীকূপাদি খনন, দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা, অন্নসত্র দান ইত্যাদি স্মার্ত কর্ম। এ সকল এবং পুষ্পপত্র নৈবেদ্যাদি দ্বারা পূজার্চনা সমস্তই দ্রব্যযজ্ঞ।

(২) **তপোযজ্ঞ**—কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি উপবাস ব্রত।

(৩) **যোগযজ্ঞ**—সাধারণতঃ যোগ শব্দে চিত্তবৃত্তিনিরোধ যোগ বুঝায়, ইহাই অষ্টাঙ্গ যোগ বা রাজযোগ। ইহার অষ্টাঙ্গ এই—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। (ইহার কোন কোন অঙ্গের বিষয় অন্যত্র বলা হইয়াছে, যেমন ৪।২৬, ৪।২৭ শ্লোকে প্রত্যাহার, ৪।২৭ শ্লোকে ধারণা, ধ্যান, সমাধি এবং ৪।২৯ শ্লোকে প্রাণায়ামের কথা বলা হইয়াছে ; এই সকলের বিস্তারিত ব্যাখ্যা পরে দ্রষ্টব্য ৬।২৪-২৬)।

(৪) **স্বাধ্যায়-যজ্ঞ**—ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া শ্রদ্ধাপূর্বক যথাবিধি বেদাভ্যাস।

(৫) **বেদজ্ঞান-যজ্ঞ**—যুক্তিদ্বারা বেদার্থ নিশ্চয় করার নাম বেদজ্ঞান-যজ্ঞ।

২৯। তথা অপরে (আবার অন্য যোগিগণ) অপানে প্রাণম্ (অপান বায়ুতে প্রাণবায়ু) প্রাণে অপানম্ (প্রাণবায়ুতে অপান বায়ু) জুহ্বতি (হোম করেন)। অপরে নিয়তাহারাঃ (মিতাহারী হইয়া) প্রাণাপানগতী (প্রাণ ও অপান বায়ুর গতি) রুদ্ধা (রোধ করিয়া) প্রাণায়ামপরায়ণাঃ (প্রাণায়াম-পরায়ণ হইয়া) প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি (ইন্দ্রিয়সকলকে প্রাণসমূহে আহুতি দেন)।

প্রাণ ও অপান—'উচ্ছ্বাসেন মুখনাসিকাভ্যাং বহির্নির্গচ্ছতি বায়ুঃ স প্রাণঃ। নিঃশ্বাসেনান্তঃ প্রবিশতি যঃ সোঽপানঃ'—যে বায়ু দেহাভ্যন্তর হইতে মুখনাসিকা-দ্বারা বহির্গত হয় তাহা প্রাণবায়ু, যাহা বাহির হইতে দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তাহা অপানবায়ু। সুতরাং প্রাণ=নিঃশ্বাসবায়ু; অপান=প্রশ্বাসবায়ু। **প্রাণান্**—ইন্দ্রিয়াণি (শ্রীধর), এস্থলে প্রাণ অর্থে ইন্দ্রিয়সকল। **নিয়তাহার—** মিতাহারী ; যোগশাস্ত্রের ব্যবস্থা এই—উদরের দুই ভাগ অন্নদ্বারা ও এক ভাগ জল দ্বারা পূর্ণ করিবে, চতুর্থ ভাগ বায়ু চলাচলের জন্য শূন্য রাখিবে।

আবার অন্য যোগিগণ অপান বায়ুতে প্রাণবায়ু আহুতি প্রদান করেন, [কেহ কেহ] প্রাণে অপানের আহুতি দেন, অপর কেহ পরিমিতাহারী হইয়া প্রাণ ও অপানের গতিরোধপূর্বক প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া ইন্দ্রিয়গণকে প্রাণে আহুতি দেন। ২৯

প্রাণায়াম—এই শ্লোকে প্রাণায়াম যজ্ঞের কথা বলা হইল।

'প্রাণায়াম' অর্থ প্রাণবায়ুর নিরোধ, প্রাণ=প্রাণবায়ু, আয়াম=নিরোধ। ইহা তিন প্রকার—পূরক, রেচক, কুম্ভক। এই তিন প্রকার প্রাণায়ামই এই শ্লোকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

(১) কেহ অপান বায়ুতে প্রাণবায়ু আহুতি দেন। পূর্বে বলা হইয়াছে, প্রাণবায়ু হৃদয় হইতে বাহিরে আসিতেছে, অপান বায়ু বাহির হইতে হৃদয়ে যাইতেছে। প্রশ্বাস দ্বারা বাহ্য বায়ুকে অর্থাৎ অপান বায়ুকে শরীর-ভিতরে প্রবেশ করাইলে প্রাণবায়ুর গতি রোধ হয়, ইহাই অপানে প্রাণের আহুতি; ইহাতে অন্তর বায়ুতে পূর্ণ হয় বলিয়া ইহার নাম **পূরক** প্রাণায়াম।

(২) কেহ প্রাণে অপানের আহুতি দেন—প্রাণবায়ুকে হৃদয় হইতে নিঃসারণ করিলে অপান বায়ুর অন্তঃপ্রবেশরূপ গতিরোধ হয় অর্থাৎ বাহিরের বায়ু ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না, ইহাতে অন্তর বায়ুশূন্য হয়, ইহার নাম **রেচক** প্রাণায়াম।

(৩) কেহ কেহ প্রাণ ও অপানের গতি রোধ করিয়া প্রাণায়ামপরায়ণ হন অর্থাৎ রেচন-পূরণ পরিত্যাগপূর্বক বায়ুকে শরীরের মধ্যে নিরুদ্ধ করিয়া অবস্থিতি করেন। ইহার নাম **কুম্ভক**। এইরূপ কুম্ভকে শরীর স্থির হইলে ইন্দ্রিয়গণ প্রাণবায়ুতে লয় হইয়া যায়, সেই হেতু বলা হইয়াছে, ইন্দ্রিয়গণকে প্রাণে আহুতি দেন।

এই সকল প্রক্রিয়া সদ্গুরূপদেশগম্য। কেবল পুস্তকাদি পাঠ করিয়া এ সকল অভ্যাস করা কর্তব্য নহে, তাহাতে নানা রোগোৎপত্তির সম্ভাবনা।

সর্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্॥ ৩০
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম॥ ৩১
এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে॥ ৩২

৩০-৩১। এতে সর্বে অপি (এই সকল) যজ্ঞবিদঃ (যজ্ঞবিদ্গণ) যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ (যজ্ঞদ্বারা নিষ্পাপ) [ভবন্তি=হন]; যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ (অমৃতস্বরূপ যজ্ঞাবশিষ্ট-ভোজনকারিগণ) সনাতনং ব্রহ্ম যান্তি (সনাতন ব্রহ্ম লাভ করেন)। হে কুরুসত্তম (কুরুশ্রেষ্ঠ), অযজ্ঞস্য (যজ্ঞানুষ্ঠানহীন ব্যক্তির) অয়ং লোকঃ (ইহলোকই) ন অস্তি (নাই), অন্যঃ কুতঃ (অন্য লোক কোথায়?)

যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ—যজ্ঞেন ক্ষয়িতঃ নাশিতঃ কল্মষো যেষাং তে—যাহাদিগের পাপরাশি যজ্ঞদ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে।

এই যজ্ঞবিদ্গণ সকলেই যজ্ঞদ্বারা নিষ্পাপ হইয়া থাকেন; যাঁহারা অমৃতস্বরূপ যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন, তাঁহারা সনাতন ব্রহ্মপদ লাভ করেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ, যে কোনরূপ যজ্ঞই করে না, তাহার ইহলোকই নাই, পরলোক ত দূরের কথা (অর্থাৎ ইহলোকেই তাহার কোন সুখ হয় না, পরলোকে আর কি হইবে?)। (৩।১৩-১৬ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। ৩০-৩১

একথার **তাৎপর্য** এই যে, যজ্ঞই সংসারের নিয়ম। প্রত্যেকের কর্তব্য সম্পাদন দ্বারা, পরস্পরের ত্যাগ স্বীকার দ্বারা, আদান-প্রদান দ্বারাই জগৎ চলিতেছে এবং উহাতেই প্রত্যেকের সুখ-স্বাতন্ত্র্য অব্যাহত আছে। যে এই বিশ্ব-যজ্ঞ ব্যাপারে যোগদান করে না, যজ্ঞস্বরূপে স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করে না, তাহার ইহকাল পরকাল উভয়ই বিনষ্ট হয়, তাহার জীবন ব্যর্থ হয় ('মোঘং পার্থ স জীবতি' ৩।১৬)।

যজ্ঞাবশিষ্ট দ্রব্যকে অমৃত বলে (৩।১৩)। এস্থলে ইহা রূপকার্থক। যজ্ঞশেষ অমৃতভোজনে ব্রহ্মপদ লাভ হয়, এ কথার তাৎপর্য এই যে, যজ্ঞস্বরূপ কৃত নিষ্কাম কর্মদ্বারাই মোক্ষ লাভ হয়। ৩০-৩১

৩২। ব্রহ্মণঃ মুখে (ব্রহ্মের মুখে) এবং বহুবিধাঃ (এই প্রকার বহুবিধ যজ্ঞ) বিততাঃ (বিস্তৃত আছে, বিহিত আছে); তান্ সর্বান্ (সেই সকল)

কর্মজান্ বিদ্ধি (কর্মোদ্ভূত জানিও), এবং জ্ঞাত্বা (এইরূপ জানিয়া) বিমোক্ষ্যসে (মুক্তিলাভ করিবে)।

এইরূপ বহুবিধ যজ্ঞ ব্রহ্মের মুখে বিস্তৃত (বিহিত) আছে, এ সকলই কর্মজ অর্থাৎ কায়িক, বাচিক বা মানসিক এই তিন প্রকার কর্ম হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া জানিও ; এইরূপ জানিলে মুক্তিলাভ করিবে। ৩২

তাৎপর্য—ব্রহ্মের মুখে বিস্তৃত বা বিহিত আছে (বিততা ব্রহ্মণো মুখে), একথার তাৎপর্য এই যে, জ্যোতিষ্টোমাদি শ্রৌত যজ্ঞ অগ্নিতে হবন করা হয় এবং শাস্ত্রে এই কল্পনা আছে যে, অগ্নি দেবতাদের মুখ। কিন্তু যোগযজ্ঞ, তপোযজ্ঞাদি লাক্ষণিক যজ্ঞ লৌকিক অগ্নিতে হয় না, দেবতার মুখেও হয় না, ইহা সাক্ষাৎ ব্রহ্মের মুখেই হয়, ব্রহ্মেই অর্পিত হয়। যজ্ঞমাত্রই ব্রহ্মের উদ্দেশেই কৃত হয়। কেহ কেহ বলেন—এস্থলে 'ব্রহ্ম' অর্থ বেদ এবং ব্রহ্মের মুখে বিস্তৃত হইয়াছে, একথার অর্থ এই, বেদে বিহিত হইয়াছে। সকল তত্ত্বই বেদে আছে, এ উক্তি গৌরব মাত্র। মহাভারতে কোন স্থলে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে, সকল ধর্ম বেদে নাই। বস্তুতঃ, দেবোদ্দেশে কৃত মীমাংসকদিগের শ্রৌত যজ্ঞের সম্প্রসারণ করিয়া ব্যাপক অর্থে ব্রহ্মার্পণ বুদ্ধিতে কৃত কর্মমাত্রকেই গীতায় 'যজ্ঞ' বলা হইয়াছে। সর্বব্যাপী ব্রহ্ম নিত্য সর্বযজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন (৩।১৫), বিশ্বময় বিরাট কর্মে নিজেকে অভিব্যক্ত করিতেছেন, সকল যজ্ঞই সেই বিশ্বকর্মের বিভিন্ন রূপ।

সকল যজ্ঞই কর্মজ, ইহা জানিলেই মুক্ত হইবে, কিরূপে? কর্মই ব্রহ্মশক্তি, —কর্ম ভিন্ন যজ্ঞ নাই এবং যজ্ঞ বা সাধনা ভিন্ন সিদ্ধি নাই, ইহা জানিয়া যথোক্ত প্রকারে ব্রহ্মার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম কর, সাধনা কর—তবেই মুক্ত হইবে। সকল যজ্ঞের মধ্যে জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তাহাও কর্মেরই ফল এবং কর্ম দ্বারাই লাভ হয়। (৪।৩৩।৩৪।৩৮ শ্লোক)।

এই সমস্ত যজ্ঞই কর্ম হইতে উৎপন্ন, ঈশ্বরের যে এক বিরাট্ শক্তি বিশ্বব্যাপী কর্মে আবির্ভূত—সকল যজ্ঞই তাহা হইতে উদ্ভূত—এইরূপে বিশ্বের সকল ক্রিয়াই পরমেশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞস্বরূপ হয় এবং মানুষের পক্ষে এই যজ্ঞের শেষ ফল হইতেছে আত্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মজ্ঞান ; ইহা বুঝিলে তুমি মুক্তি লাভ করিবে।—শ্রীঅরবিন্দ।

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩
তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪

৩৩। হে পরন্তপ, দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ (দ্রব্যময় যজ্ঞ হইতে) **জ্ঞানযজ্ঞঃ** (জ্ঞানরূপ যজ্ঞ) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ); হে পার্থ, অখিলং সর্বং **কর্ম** (নিরবশেষ সর্ব কর্ম) **জ্ঞা**নে পরিসমাপ্যতে (জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়)।

দ্রব্যময় যজ্ঞ—দ্রব্যসাধ্য আত্মব্যাপারহীন দৈবাদি যজ্ঞ। **অখিলং**—ফল-সহিতং (শ্রীধর), নিরবশেষং (মধুসূদন)।

হে পরন্তপ, দ্রব্যসাধ্য দৈবযজ্ঞাদি হইতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ; কেননা, ফল-সহিত সমস্ত কর্ম নিঃশেষে জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়। ৩৩

তাৎপর্য—দ্রব্যময় যজ্ঞ অর্থাৎ দ্রব্যসাধ্য যজ্ঞ, যেমন দৈবযজ্ঞ, নৃ-যজ্ঞ, দানযজ্ঞাদি। এই সকল যজ্ঞে স্বর্গাদি লাভ হইতে পারে। কিন্তু জ্ঞানযজ্ঞ ব্যতীত মোক্ষ লাভ হয় না, সুতরাং দ্রব্যযজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। বস্তুতঃ, মোক্ষমার্গে কর্মযোগের যোগ্যতা যে স্বীকার করা হয় তাহার কারণ এই যে, যজ্ঞরূপে কৃত নিষ্কাম কর্মদ্বারা বাসনা ও অহংবুদ্ধি ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে এবং সাম্যবুদ্ধি ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে থাকে এবং পরিশেষে আত্মা সম্পূর্ণ সমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। আত্মার এই উচ্চতম অবস্থার নামই জ্ঞান—তখন 'আমি' জ্ঞান থাকে না, সর্বভূতে এক আত্মারই দর্শন হয় (৪।৩৫)। কর্মযোগের সিদ্ধাবস্থায় এই আত্মজ্ঞান লাভ হয়, এই জন্য বলা হইতেছে, সমস্ত কর্মের পরিসমাপ্তি জ্ঞানে। এইরূপ আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত মুক্ত ব্যক্তির যে কর্ম তাহার আর কোন দাগ থাকে না, সংস্কার থাকে না (সমগ্রং প্রবিলীয়তে ৪।২৩), সুতরাং উহা বন্ধনেরও কারণ হয় না. জ্ঞানাগ্নিতে কর্মফল ভস্মীভূত হইয়া যায় (৪।৩৭)।

৩৪। প্রণিপাতেন (প্রণামদ্বারা), পরিপ্রশ্নেন (প্রশ্নদ্বারা), সেবয়া (সেবাদ্বারা), তৎ বিদ্ধি (সেই জ্ঞান লাভ কর); **জ্ঞানিনঃ** (শাস্ত্রজ্ঞ) **তত্ত্বদর্শিনঃ** (তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ) তে জ্ঞানং উপদেক্ষ্যন্তি (তোমাকে জ্ঞান উপদেশ করিবেন)।

জ্ঞান কি—জ্ঞান লাভের উপায়, ফল, অধিকারী ৩৪-৪০

গুরুচরণে দণ্ডবৎ প্রণামদ্বারা, নানা বিষয় প্রশ্নদ্বারা এবং গুরুসেবা দ্বারা সেই জ্ঞান লাভ কর, জ্ঞানী তত্ত্বদর্শী গুরু তোমাকে সেই জ্ঞান উপদেশ করিবেন। ৩৪

যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষাণি দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৩৫
অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬
যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭

পরিপ্রশ্নেন—আমি কে? আমার সংসারবন্ধন কেন? কিরূপে বন্ধনমুক্ত হইব? ইত্যাদি প্রশ্নদ্বারা। **জ্ঞানী**—শাস্ত্রজ্ঞ, গ্রন্থজ্ঞ; **তত্ত্বদর্শী**—অনুভব-কর্তা। কেবল শাস্ত্র পাঠ করিয়া যিনি জ্ঞানী এইরূপ গুরুর উপদেশে কোন ফল হয় না, যাঁহার আত্মসাক্ষাৎকার হইয়াছে এইরূপ গুরুর উপদেশই কার্যকরী হয়। শিষ্যেরও মুক্তিকামী তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও গুরুশুশ্রূষু হওয়া প্রয়োজন।

৩৫। হে পাণ্ডব, যৎ জ্ঞাত্বা (যাহা জানিয়া) পুনঃ এবং মোহং (পুনরায় এই প্রকার মোহ) ন যাস্যসি (প্রাপ্ত হইবে না), যেন (যদ্দ্বারা) অশেষাণি ভূতানি (চরাচর সর্বভূত) আত্মনি (আত্মাতে) অথো ময়ি (অনন্তর আমাতে) দ্রক্ষ্যসি (দেখিবে)।

হে পাণ্ডব, যাহা জানিলে পুনরায় এরূপ (শোকাদি-জনিত) মোহ প্রাপ্ত হইবে না, যে জ্ঞানদ্বারা সমস্ত ভূতগ্রাম স্বীয় আত্মাতে এবং অনন্তর আমাতে দেখিতে পাইবে। ৩৫

৩৬। চেৎ (যদি) সর্বেভ্যঃ অপি পাপেভ্যঃ (সকল পাপী হইতেও) পাপকৃত্তমঃ অসি (পাপিষ্ঠ হও), [তথাপি] সর্বং বৃজিনং (সকল পাপসমুদ্র) জ্ঞানপ্লবেন এব (জ্ঞানরূপ তরণী দ্বারাই) সন্তরিষ্যসি (উত্তীর্ণ হইবে)।

যদি তুমি সমুদয় পাপী হইতেও অধিক পাপাচারী হও, তথাপি জ্ঞানরূপ তরণীদ্বারা সমুদয় পাপসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। ৩৬

৩৭। হে অর্জুন, যথা (যেমন) সমিদ্ধঃ অগ্নিঃ (প্রজ্বলিত অগ্নি) এধাংসি (কাষ্ঠসকল) ভস্মসাৎ কুরুতে (ভস্মীভূত করে), তথা জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি (কর্মসমূহকে) ভস্মসাৎ কুরুতে।

হে অর্জুন, যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, তেমন জ্ঞানরূপ অগ্নি কর্মরাশিকে ভস্মসাৎ করে। ৩৭

'ইহা দ্বারা মোটেই বুঝায় না যে, যখন জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় তখন কর্ম বন্ধ

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮
শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯

হইয়া যায়' (শ্রীঅরবিন্দ)। একথার তাৎপর্য এই যে, জ্ঞানী পুরুষের কর্ম বন্ধনের কারণ হয় না (৪।২৩, ৪।৪২, ৫।৭ ইত্যাদি)।

জ্ঞান কি ?—যাহাদ্বারা সর্বভূত এবং স্বীয় আত্মা অভিন্ন বোধ হয় এবং তারপর বোধ হয় সেই আত্মা শ্রীভগবানেরই সত্তা,—আমি, সর্বভূত, যাহা কিছু সমস্তই তাঁহার সত্তায়ই সত্তাবান, তাঁহারই আত্ম-অভিব্যক্তি, তিনিই সকলের মূল (৪।৩৫)।

জ্ঞানের ফল কি ?—(১) এই জ্ঞান লাভ হইলে শোকাদি-জনিত মোহ দূর হয়, (৪।৩৫)—'তরতি শোকমাত্মবিৎ'। (২) জ্ঞান লাভ হইলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় ; পাপ অজ্ঞান-প্রসূত, জ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞানতা থাকিতে পারে না। (৩) জ্ঞান লাভ হইলে সমস্ত কর্মের ক্ষয় হয়—জ্ঞানীর কর্মবন্ধন নাই। (৪।৩৬-৩৭)।

৩৮। ইহ (এই লোকে) জ্ঞানেন সদৃশং (জ্ঞানের ন্যায়) পবিত্রং ন হি বিদ্যতে (পবিত্র আর কিছু নাই) ; তৎ (সেই জ্ঞান) যোগসংসিদ্ধঃ (কর্মযোগে সিদ্ধ পুরুষ) কালেন (কালক্রমে) আত্মনি স্বয়ং বিন্দতি (স্বয়ং অন্তঃকরণে লাভ করেন)।

ইহলোকে জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র আর কিছু নাই। কর্মযোগে সিদ্ধ পুরুষ সেই জ্ঞান কালসহকারে আপনিই অন্তরে লাভ করেন। ৩৮

যোগসংসিদ্ধঃ—যোগেন কর্মযোগেন সংসিদ্ধঃ যোগ্যতাং প্রাপ্তঃ (শ্রীধর, মধুসূদন), কর্মযোগেন সমাধিযোগেন চ সংসিদ্ধঃ যোগ্যতামাপন্নঃ (শঙ্কর) ; **কালেন**—ন তু সদ্যঃ ; **স্বয়ং** = ন তু সন্ন্যাসগ্রহণমাত্রেণেতি ভাবঃ (বিশ্বনাথ)।

পূর্বে বলা হইয়াছে, জ্ঞান গুরু-উপদেশগম্য। কিন্তু গুরু পথপ্রদর্শক মাত্র। তাঁহার উপদেশ প্রাপ্ত হইলেই জ্ঞান সদ্যোলাভ হয় না, উহা সাধনাসাপেক্ষ। সে সাধনা কি ?—যোগ। যোগ কি ?—নিষ্কাম কর্মযোগ, উহাকে ভক্তিযোগ বা সমাধিযোগও বলা যায় ; কেননা ঈশ্বরে চিত্ত সমাহিত না হইলে, বুদ্ধি নিবিষ্ট না হইলে, কর্মযোগে সিদ্ধিলাভ হয় না। (২।৫৩, ২।৭২ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

ইহলোকে জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র আর কিছু নাই। কর্মযোগে সিদ্ধিলাভ করিলে এই জ্ঞান স্বতঃই অন্তঃকরণে উদিত হয়।

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০

মানুষের বুদ্ধি যে জ্ঞান সঞ্চয় করে তাহা ইন্দ্রিয় ও বিচারশক্তির সাহায্যে বাহির হইতে সংগ্রহ করে। কিন্তু আত্মজ্ঞান স্বয়ংসিদ্ধ, স্বপ্রকাশ—উহা সাধক অন্তঃকরণে স্বয়ংই লাভ করেন। কর্মযোগী নিষ্কামতা, নিরভিমান ও ভগবদ্ভক্তিতে যত বাড়িতে থাকেন, জ্ঞানও তেমনি ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। কালক্রমে আত্মা সম্পূর্ণ কামনানির্মুক্ত হইলে আত্মজ্ঞান উদ্ভাসিত হয়। এই সাধনায় সহায়ক কি? শ্রদ্ধা, তৎপরতা ইত্যাদি (পরের শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

৩৯। শ্রদ্ধাবান্ (আস্তিক্যবুদ্ধিশালী), তৎপরঃ (অনলস, একনিষ্ঠ), সংযতেন্দ্রিয়ঃ (জিতেন্দ্রিয় পুরুষ) জ্ঞানং লভতে (জ্ঞান লাভ করেন) জ্ঞানম্ লব্ধ্বা (জ্ঞান লাভ করিয়া) অচিরেণ (শীঘ্র) পরাং শান্তিম্ (পরম শান্তি) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন)।

যিনি শ্রদ্ধাবান্, একনিষ্ঠ সাধন-তৎপর এবং জিতেন্দ্রিয় তিনিই জ্ঞান লাভ করেন। আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া অচিরাৎ পরম শান্তি লাভ করেন। ৩৯

তত্ত্বজ্ঞান লাভের অধিকারী কে?—যাঁহার ভক্তি বিশ্বাস আছে, যিনি পরম তত্ত্ববিষয়ে ও গুরু-বেদান্তবাক্যে **শ্রদ্ধাবান্**। কিন্তু কেবল শ্রদ্ধাবান্ হইলেই হইবে না, তন্ময়তা চাই, একনিষ্ঠ সাধনা চাই। তাই বলা হইল **তৎপর**। কিন্তু শ্রদ্ধা ও একনিষ্ঠা থাকিলেও আত্মসংযম ব্যতীত জ্ঞানলাভে অধিকার হয় না, তাই বলা হইল **সংযতেন্দ্রিয়**। পূর্বে ৪।৩৪ শ্লোকে জ্ঞানলাভের উপায় বলা হইয়াছে প্রণাম, প্রশ্ন ও সেবা;—এগুলি বহিরঙ্গ সাধন। এই শ্লোকে বলা হইল জ্ঞানলাভের উপায়—শ্রদ্ধা, একনিষ্ঠা ও আত্মসংযম—এগুলি অন্তরঙ্গ সাধন। ৩৯

৪০। অজ্ঞঃ (অজ্ঞ) অশ্রদ্দধানঃ (শ্রদ্ধাহীন), সংশয়াত্মা (সন্দেহাকুলচিত্ত ব্যক্তি) বিনশ্যতি (বিনাশ প্রাপ্ত হয়); সংশয়াত্মনঃ (সংশয়াত্মার) অয়ম্ লোকঃ (ইহলোক) ন অস্তি (নাই), ন পরঃ (পরলোকও নাই), ন সুখম্ (সুখও নাই)।

অজ্ঞ, শ্রদ্ধাহীন, সংশয়াকুল ব্যক্তি বিনষ্ট হয়। সংশয়াত্মার ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই, সুখও নাই। ৪০

যে **অজ্ঞ**, অর্থাৎ যাহার শাস্ত্রাদির জ্ঞান নাই এবং যে সদুপদেশ লাভ করে নাই এবং যে **শ্রদ্ধাহীন** অর্থাৎ সদুপদেশ পাইয়াও যে তাহা বিশ্বাস করে না, এবং তদনুসারে কার্য করে না, সুতরাং যে **সংশয়াত্মা**—অর্থাৎ যাহার সকল বিষয়েই সংশয়—এইটি কি ঠিক, না ঐটি ঠিক—এইরূপ চিন্তায় যে সন্দেহাকুল তাহার আত্মোন্নতির কোন উপায় নাই।

বিশ্বাস ও সংশয়—এস্থলে বলা হইল, শ্রদ্ধা দ্বারাই জয়লাভ হয়, ভক্তি-বিশ্বাসই জ্ঞানের ভিত্তি। এ কথা অতীন্দ্রিয় পারমার্থিক জ্ঞান সম্বন্ধে প্রযোজ্য। চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা, বুদ্ধিবিচার দ্বারা নানা বিষয়ে আমরা যে জ্ঞানলাভ করি, উহা লৌকিক জ্ঞান, প্রাকৃত জ্ঞান, তাহাতে শ্রদ্ধার প্রয়োজন করে না। বরং ইহাতে অবিশ্বাস বা সংশয়েরও সাময়িক প্রয়োজনীয়তা আছে। কারণ, এই সকল নিম্নস্তরের সত্যের সহিত মিথ্যা মিশ্রিত থাকে, সংশয়বুদ্ধিতে পরীক্ষা করিয়া বুদ্ধি-বিচার দ্বারা মিথ্যা হইতে সত্যকে পৃথক্ করিয়া লইতে হয়, ইহাকেই আধুনিকগণ বৈজ্ঞানিক প্রণালী বলেন (Scientific method)।

কিন্তু উচ্চতর সত্যের সহিত মিথ্যার সংশ্রব নাই, উহা বুদ্ধিবিচার বিতর্ক দ্বারাও অধিগত হয় না—উহা তর্কের বিষয় নহে—'অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাস্তান্ন তর্কেণ সাধয়েৎ'—মভা. ভী-প. ৫।১২, 'নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া'—(কঠ ১।২।৯)—যে তত্ত্ব অচিন্ত্য তাহা তর্কের বিষয়ীভূত করিও না, তর্কের দ্বারা উহা লাভ হয় না, বরং বুদ্ধি বিগড়াইয়া যায়, আস্তিক্য-বুদ্ধি বিনষ্ট হয়, সুতরাং পরতত্ত্ব সম্বন্ধে তর্কদ্বারা বুদ্ধিভ্রম জন্মাইও না, বিশ্বাস কর। এই পরম জ্ঞান বাহির হইতে আসে না, ভিতর হইতে প্রকাশিত হয়—একনিষ্ঠ সাধনা দ্বারা সংযম দ্বারা কামনাকলুষ বিদূরিত হইলে, চিত্ত নির্মল হইলে উহা স্বয়ং উদ্ভাসিত হয়। এখানে চাই আস্তিক্যবুদ্ধি, উচ্চতর সত্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অটল বিশ্বাস। এই বিশ্বাস দৃঢ় না হইলে, সংশয়দ্বারা বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হইলে এই সত্যলাভ করিবার উপায় নাই। তাই উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন, 'অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে', কঠ ২।৩।১২—যে 'অস্তি' (আছেন) বলিতে পারিল না সে কিরূপে তাঁহাকে উপলব্ধি করিবে? এই আস্তিক্যবুদ্ধিই শ্রদ্ধা। এই স্থূলপ্রপঞ্চের মূলে কোন অচিন্ত্য তত্ত্ব আছে, এই বিষয়ানন্দ হইতেও কোন উচ্চতর ভূমানন্দ আছে, ইহলোকের ইহজীবনের উপরেও কোন ঊর্ধ্বলোক, উচ্চতর জীবন আছে, এ সকল বিষয়ে যাহার শ্রদ্ধা নাই, দৃঢ়বিশ্বাস নাই, সে ঊর্ধ্বজীবন লাভের সম্যক্ চেষ্টাও করে না, লাভও করিতে পারে না।

কিন্তু সংশয়াত্মার ইহলোকে উন্নতিলাভে, ঐহিক সুখ-সাফল্য লাভে বাধা কি? তাহা কি হয় না? না, তাহাও হয় না। কারণ, কোন একটি

যোগসংন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১
তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২

আদর্শ, লক্ষ্য বা অবলম্বন দৃঢ়রূপে ধরিয়া না থাকিলে, উহাতে অটল বিশ্বাস না থাকিলে, ইহজীবনেও সাফল্য লাভ করা যায় না, কোন মহৎ কর্ম করা যায় না। যাহার চিত্ত নিয়ত সংশয়-দোলায় দুলিতে থাকে, তাহার জীবনের কোন স্থির লক্ষ্য থাকে না, তাহার আত্মশক্তিতে বিশ্বাস থাকে না, তাহার ইচ্ছাশক্তি বলবতী হয় না—সে জীবনে পদে পদে নিষ্ফলতা আহরণ করে এবং অশান্তিতে জীবন যাপন করে। মহাত্মা গান্ধী একবার বলিয়াছিলেন—'আমার ভিতরে যে বিশ্বাসের আগুন জ্বলিতেছে, আমি যদি তাহার কণিকামাত্র সমগ্র দেশবাসীর অন্তরে প্রবেশ করাইয়া দিতে পারিতাম, তবে এক বৎসরে কেন এক মাসেই স্বরাজলাভ হইত; বুঝিতেছি আমিই শক্তিহীন অযোগ্য।' বস্তুতঃ দেশবাসী সংশয়াত্মা, আদর্শ ও উপায়ে তাহাদেব জ্বলন্ত বিশ্বাস নাই, তাহারা কেবল বিচার-বিতর্ক করে, এটা ছাড়ে ওটা ধরে—কাজেই কোনটাতেই সাফল্য লাভ হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কি পরকালে, কি ইহকালে সংশয়াকুল ব্যক্তির কোথাও গতি নাই ('সংশয়াত্মা বিনশ্যতি')।

৪১। হে ধনঞ্জয়, যোগসংন্যস্তকর্মাণং (যিনি যোগদ্বারা কর্মসকল ঈশ্বরে অর্পণ করিয়াছেন), জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্ (আত্মজ্ঞান দ্বারা যাহার সংশয় ছিন্ন হইয়াছে), আত্মবন্তং (এরূপ আত্মবান্ [আত্মবিদ্] ব্যক্তিকে) কর্মাণি (কর্মসকল) ন নিবধ্নন্তি (আবদ্ধ করিতে পারে না)।

যোগসংন্যস্তকর্মাণম্—যোগেন ভগবদারাধনলক্ষণসমত্ববুদ্ধিরূপেণ সংন্যস্তানি ভগবতি সমর্পিতানি কর্মাণি যেন (শ্রীধর, মধুসূদন)—যিনি ভগবদারাধনলক্ষণ, সমত্ববুদ্ধিরূপ যোগের দ্বারা কর্মসকল ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়াছেন ঈদৃশ ব্যক্তিকে। এস্থলে 'যোগ' শব্দের অর্থ ফলাফলে সমত্ববুদ্ধি ও ঈশ্বরে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিযুক্ত কর্মযোগ বা বুদ্ধিযোগ (২।৪৮, ২।৪৯, ২।৫৩, ১৮।৫৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। **সংন্যস্তকর্মাণম্**—সংন্যস্ত=(১) সমর্পিত বা (২) ত্যক্ত। সুতরাং অর্থ এই—যিনি কর্মসকল ঈশ্বরে সমর্পণ করিযাছেন (৩।৩০, ১৮।৫৭ শ্লোকে ঠিক এই কথাই বলা হইয়াছে), অথবা যিনি কর্মফল ত্যাগ করিয়াছেন (গীতায় অনেক স্থলেই 'সন্ন্যাস' বলিতে ফল-সন্ন্যাস লক্ষ্য করা হইয়াছে, ৫।৩, ৬।১, ৬।২ ইত্যাদি

শ্লোক দ্রষ্টব্য)। কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে পারিলেই কর্মফল ত্যাগ হয়, সুতরাং একই কথা। **জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্**—জ্ঞানেন ছিন্নাঃ সংশয়াঃ যস্য সঃ (শঙ্কর)—আত্মেশ্বরৈকত্বজ্ঞানের দ্বারা যাহার সংশয় ছিন্ন হইয়াছে। সংশয় কি ?—আমি কে ?—দেহ, না আত্মা ? আত্মা কর্তা না অকর্তা ? এক না বহু ? ইত্যাদি সংশয়। **আত্মবন্তম্**—অপ্রমাদিনম্ (শঙ্কর), ব্রহ্মবিদম্ (শ্রীধর)।

জ্ঞান-কর্মের সমুচ্চয়—কর্মযোগের উপদেশ ৪১-৪২

নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা যাঁহার কর্ম ঈশ্বরে সমর্পিত হইয়াছে, আত্মদর্শনরূপ জ্ঞানের দ্বারা যাঁহার সকল সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, এইরূপ অপ্রমাদী আত্মবিদ্ পুরুষকে কর্মসকল আবদ্ধ করিতে পারে না অর্থাৎ তিনি কর্ম করিলেও কর্মফলে আবদ্ধ হন না (তিনি জীবন্মুক্তস্বরূপ)। ৪১

এই শ্লোকে বলা হইল যে, জ্ঞানী কর্ম করিয়াও কর্মে আবদ্ধ হন না, সুতরাং জ্ঞানীরও কর্ম আছে, একথা স্পষ্টই বলা হইল, তবে সে কর্ম অকর্মস্বরূপ (পরবর্তী শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

৪২। হে ভারত, তস্মাৎ (সেই হেতু) আত্মনঃ (নিজের) অজ্ঞানসম্ভূতং (অজ্ঞানজাত) হৃৎস্থম্ (হৃদয়স্থিত) এনং সংশয়ং (এই সংশয়কে) জ্ঞানাসিনা (আত্মজ্ঞানরূপ খড়্গদ্বারা) ছিত্ত্বা (ছেদন করিয়া) যোগং আতিষ্ঠ (কর্মযোগ অবলম্বন কর), উত্তিষ্ঠ (উঠ)।

অতএব হে ভারত, অজ্ঞানজাত হৃদয়স্থ এই তোমার সংশয়রাশিকে আত্মজ্ঞানরূপ খড়্গদ্বারা ছেদন করিয়া নিষ্কাম কর্মযোগ অবলম্বন কর ; উঠ, যুদ্ধ কর। ৪২

তুমি যুদ্ধে অনিচ্ছুক, কারণ তোমার হৃদয়ে নানারূপ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। গুরুজনাদি বধ করিয়া কি পাপভাগী হইবে ? আত্মীয় স্বজনাদির বিনাশে শোক-সন্তপ্ত হইয়া রাজ্যলাভেই বা কি সুখ হইবে ? এইরূপ শোক, মোহ ও সংশয়ে অভিভূত হইয়া তুমি স্বীয় কর্তব্য বিস্মৃত হইয়াছ। তোমার এই সংশয় অজ্ঞান-সম্ভূত। যাহার দেহাত্মবোধ বিদূরিত হইয়াছে, সর্বভূতে একাত্মবোধ জন্মিয়াছে, তাঁহার চিত্তে এ সকল সংশয় উদিত হয় না ; তিনি শোকদুঃখে অভিভূত হন না। ('তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ'—ঈশ) ইহাই প্রকৃত জ্ঞান, তাহা পূর্বে বলিয়াছি (৪।৩৫)। শ্রদ্ধা, আত্মসংযম ও একনিষ্ঠা—সেই জ্ঞান লাভের যে উপায় তাহাও বলিয়াছি (৪।৩৯)। আমার বাক্যে তোমার শ্রদ্ধা আছে, তোমার আত্মসংযম ও একনিষ্ঠা আছে, সুতরাং

তোমাকে আমি জ্ঞানোপদেশ দিতেছি। তুমি আত্মজ্ঞান লাভপূর্বক নিঃসন্দেহ হইয়া নিষ্কাম কর্মযোগ অবলম্বন কর, স্বীয় কর্তব্য পালন কর, যুদ্ধ কর।

জ্ঞান-কর্মের সমুচ্চয়—৪।৪১, ৪।৪২ এই দুইটি শ্লোকে কর্ম ও জ্ঞানের সংযোগ ও সামঞ্জস্য অতি স্পষ্ট। শ্রীভগবান্ বলিলেন, আত্মজ্ঞানদ্বারা যাঁহার সংশয় অর্থাৎ দেহাত্মবোধ ও কর্তৃত্বাভিমানাদি বিদূরিত হইয়াছে এবং নিষ্কাম কর্মযোগদ্বারা যাঁহার কর্ম ঈশ্বরে সংন্যস্ত হইয়াছে, তাঁহার কর্মে বন্ধন হয় না; সুতরাং তুমি জ্ঞানরূপ খড়্গদ্বারা হৃদয়স্থ সংশয়রাশি ছেদন করিয়া কর্মযোগ অনুষ্ঠান কর, যুদ্ধ কর, স্বধর্ম পালন কর।

"তবেই চাই, (১) কর্মের সংন্যাস বা ঈশ্বরার্পণ এবং (২) জ্ঞানের দ্বারা সংশয়ছেদন। এইরূপে জ্ঞানবাদ ও কর্মবাদের বিবাদ মিটিল, ধর্ম সম্পূর্ণ হইল। এইরূপে ধর্মপ্রণেতৃ-শ্রেষ্ঠ ভূতলে মহামহিমময় এই নূতন ধর্ম প্রচারিত করিলেন।"—বঙ্কিমচন্দ্র।

'নূতন ধর্ম' কেন বলা হইল তাহা ৫।৬ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বুঝা যাইবে। কিন্তু 'এই মহামহিমময় নূতন ধর্ম' মহামনস্বী শ্রীমৎশঙ্করাচার্য প্রমুখ সন্ন্যাস-বাদিগণ গ্রহণ করেন নাই। জ্ঞান-কর্মের বিবাদ মিটে নাই, এখনও আছে। শাঙ্কর-ভাষ্যে এই শ্লোকদ্বয়ের ব্যাখ্যা অন্যরূপ। যথা—

৪।৪১ শ্লোকের শাঙ্কর-ভাষ্যে 'যোগসংন্যস্তকর্মাণম্' এই পদের ব্যাখ্যা এইরূপ—'পরমার্থদর্শনরূপ যোগদ্বারা যিনি সর্বকর্ম ত্যাগ করিয়াছেন'; আর 'জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্' এই পদের ব্যাখ্যা এইরূপ—'আত্মেশ্বরৈকত্বদর্শনরূপ জ্ঞানদ্বারা যাঁহার সংশয় ছিন্ন হইয়াছে।' বলা বাহুল্য, 'পরমার্থদর্শন' ও 'আত্মেশ্বরৈকত্বদর্শন' এই দুইটি বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হইলেও, ফলতঃ এই দুই কথায় এক বস্তুই বুঝায়, সুতরাং এই মতে এই শ্লোকে 'যোগ' ও 'জ্ঞান' এই দুইটি শব্দ একার্থক হইয়া পড়ে। যাহা হউক, তাহা স্বীকার করিলেও দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, 'যিনি সর্বকর্মত্যাগ করিয়াছেন কর্মসকল তাঁহাকে বদ্ধ করে না', একথার অর্থ কি? তদুত্তরে ইঁহারা বলেন যে, কর্ম শব্দে এখানে দর্শন-শ্রবণাদি স্বাভাবিক কর্ম ও ভিক্ষাটনাদি শরীরযাত্রা-নির্বাহোপযোগী কর্ম বুঝিতে হইবে। কিন্তু সন্ন্যাসীদের স্বাভাবিক কর্ম বা ভিক্ষাটনাদি কর্ম বন্ধনের কারণ নয়, এ কথাটা বলার এস্থলে শ্রীভগবানের কি প্রয়োজন, বুঝা যায় না। বস্তুতঃ তাহাও বলিবার উপায় নাই, কেননা, পরবর্তী শ্লোকেই শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—অতএব ('তস্মাৎ' অর্থাৎ যেহেতু নিষ্কামকর্ম বন্ধনের কারণ নয়, সেই হেতু) তুমি 'যোগ' অবলম্বন কর, যুদ্ধার্থ উত্থান কর। এস্থলে

অবশ্য 'যোগ' অর্থ কর্মযোগ তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, 'উত্তিষ্ঠ' শব্দটিই আছে, তবে উহার ব্যাখ্যায় লেখা হইয়াছে,—'সম্যক্ দর্শনোপায়ং কর্মানুষ্ঠানং কুরু' অর্থাৎ জ্ঞানলাভের উপায়স্বরূপ কর্ম কর। তবেই বাক্যের অর্থ হইল—"তত্ত্বজ্ঞানরূপ অসিদ্বারা হৃদয়স্থ সংশয়কে বিচ্ছিন্ন করিয়া জ্ঞানলাভের উপায় অনুষ্ঠান কর"।—(মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ-কৃত ভাষ্যানুযায়ী বঙ্গানুবাদ)।

'তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা সংশয় ছেদন করিয়া' আবার 'জ্ঞানলাভের উপায়' অনুষ্ঠানের কি প্রয়োজন, সুধীগণ বিবেচনা করিবেন।

রহস্য—অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানে কর্মের স্থান কোথায় ?

প্রশ্ন। এ-সকল ব্যাখ্যা কষ্ট-কল্পিত, তাহা বরং মানিলাম। কিন্তু কর্ম ও জ্ঞানের সমুচ্চয়ে যে মূল আপত্তি, তাহার উত্তর কি ? পূর্ণকাম, পূর্ণানন্দ, পরিপূর্ণ চৈতন্যময়, নির্বিশেষ পরব্রহ্মই আমি, এই প্রকার ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান লাভ করিয়া যিনি সর্ববিক্ষেপবর্জিত, নির্বাতনিষ্কম্পপ্রদীপবৎ শান্ত সমাহিত, তাঁহার আবার কর্ম কি ? তিনি ত নিষ্ক্রিয় আত্মস্বরূপে অবস্থিত। নির্গুণ, মায়ামুক্ত অবস্থায় কর্মের স্থান কোথায় ? কর্ম তো মায়া বা অজ্ঞান-সম্ভূত। সুতরাং কর্মে ও জ্ঞানে সংযোগ কিরূপে সম্ভব ? গতি ও স্থিতি যেরূপ যুগপৎ সম্ভবে না, আলোক ও অন্ধকার যেমন একত্র থাকিতে পারে না, তদ্রূপ কর্ম ও জ্ঞানের সমুচ্চয় অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়।

উত্তর। হাঁ, সন্ন্যাসবাদিগণ এইরূপ যুক্তিবলেই জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয় অস্বীকার করেন। নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নির্বিশেষ ব্রহ্মও আছেন; আবার সগুণ সবিশেষ, ক্রিয়াশীল ব্রহ্মও আছেন—এই দুই বিভাব যাঁহার তিনিই পুরুষোত্তম (১৫।১৮), তিনি 'নির্গুণোগুণী'। নির্গুণ ব্রহ্মের সমতা লাভ করিয়াও যজ্ঞতপস্যার ভোক্তা, সর্বকর্মের নিয়ামক, সগুণ ব্রহ্মের কর্ম যজ্ঞরূপে করা যায়, গীতার ইহাই বিশিষ্ট মত। ব্রাহ্মীস্থিতির অবস্থা কি এবং কিরূপে লাভ হয়, তাহা ১৮।৪৯-৫৫ শ্লোকে শ্রীভগবান্ বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু উহার পরেই বলিয়াছেন যে, সর্বকর্ম করিয়াও যিনি আমার শরণাগত হন, তিনি আমার প্রসাদে সেই শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন; অতএব তুমি সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পণ কর, বুদ্ধিযোগদ্বারা 'আমিত্ব' বর্জন করিয়া 'মচ্চিত্ত' হও, যুদ্ধ কর ইত্যাদি (১৮।৫৬-৬৮ শ্লোক)। এই যে 'আমিত্ব' বর্জন করিয়াও 'আমি' রাখা, জ্ঞানলাভ করিয়াও কর্ম করা, কামনাকলুষিত

ইন্দ্রিয়-কর্মকে বিশুদ্ধ নিষ্কাম দিব্যকর্মে পরিণত করা—এটা কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। বস্তুতঃ ব্যুত্থিত যোগিগণ সর্বদাই আবশ্যক কর্ম করেন। রাজর্ষি জনকাদি, দেবর্ষি নারদাদি, ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠাদি, মহর্ষি বিশ্বামিত্রাদি, পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণাদি—সকলেই কর্ম করিয়াছেন। সর্বোপরি, সর্বতঃপূর্ণ, সর্বেশ্বর, সর্বজ্ঞ শ্রীভগবান্ স্বয়ং নিজ কর্মের আদর্শ দেখাইয়া, জ্ঞানিগণকে বিশ্বকর্মে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন, "কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্" (৩।২৫)—লোকরক্ষার্থ জ্ঞানিগণও অনাসক্তচিত্তে কর্ম করিবে। ইহার উপর আর টীকা-টিপ্পনী চলে না, দার্শনিক মতবাদ যাহাই হউক। বস্তুতঃ এই মত সম্পূর্ণ বেদান্তের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা কার্যকরী বেদান্ত (ভূমিকা ও ৩।২৭, ৫।২৯, ৬।৩০, ১৪।২৭, ১৫।১৮ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। অপিচ 'গীতোক্ত যোগী ও যোগধর্ম' পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য, বিবৃতি-সূচী দ্রঃ)।

চতুর্থ অধ্যায়—বিশ্লেষণ ও সার-সংক্ষেপ

১—৩ গীতোক্ত সনাতন যোগধর্মের প্রাচীন পরম্পরা ; ১—৮ অবতার-তত্ত্ব, অবতারের উদ্দেশ্য ও কর্ম ; ৯—১০ ভগবানের জন্মকর্মের তত্ত্বজ্ঞানে মোক্ষ ; ১১—১২ অন্যভাবে ভজনায়ও সিদ্ধিলাভ হয়,—মত-পথ ; ১৩—১৫ চাতুর্বর্ণ্য-সৃষ্টি, ভগবানের নির্লিপ্ত কর্ম, পূর্ব মনীষিগণের নির্লিপ্ত কর্মের দৃষ্টান্ত ; ১৬—২৩ কর্ম, অকর্ম, বিকর্মতত্ত্ব—নিষ্কাম কর্ম অকর্মস্বরূপ ; ২৪—৩৩ ব্রহ্মকর্ম, বিবিধ লাক্ষণিক যজ্ঞের বর্ণনা—জ্ঞানযজ্ঞের শ্রেষ্ঠতা ; ৩০—৪০ জ্ঞান কি, জ্ঞানলাভের উপায়, ফল, অধিকারী ; ৪১—৪২ জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয় ও যুদ্ধার্থ উপদেশ।

তৃতীয় অধ্যায়ে নিষ্কাম কর্মযোগের বর্ণনা করিয়া শ্রীভগবান্ বলিলেন, এই অব্যয় যোগ আমি আদি ক্ষত্রিয় রাজা বিবস্বান্‌কে (সূর্যকে) বলিয়াছিলাম। বিবস্বান্ স্বপুত্র মনুকে এবং মনু স্বপুত্র ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন। এইরূপে পুরুষপরম্পরায় প্রাপ্ত এই যোগ রাজর্ষিগণ বিদিত ছিলেন। এই যোগ কালে লুপ্ত হইয়াছিল, অদ্য সেই পুরাতন যোগ তোমাকে আমি বলিলাম। এই প্রসঙ্গে অর্জুনের প্রশ্নক্রমে শ্রীভগবান্ নিজ **অবতার-তত্ত্ব** ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন,—যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি দেহ ধারণ করি। সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতদিগের বিনাশ ও ধর্মসংস্থাপনার্থ আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। আমার **লীলাতত্ত্বের** সম্যক্ অবধারণ করিলে মানবের কর্মবন্ধন ছিন্ন হয়। জ্ঞানী, ভক্ত, কর্মী, সকাম-উপাসক, নিষ্কাম উপাসক—যে আমাকে যে ভাবে ভজনা করে, আমি তাহাকে সেই ভাবেই তুষ্ট করি। এই প্রকৃতিভেদ-বশতঃই সংসারে কর্মবৈচিত্র্য ও উপাসনা-পদ্ধতির বিভিন্নতা হয়।

এই প্রকৃতিভেদ অনুসারেই আমি **বর্ণভেদ** বা কর্মভেদ করিয়াছি—তাহাতেই চতুর্বর্ণের সৃষ্টি। আমি উহার কর্তা হইলেও উহাতে লিপ্ত হই না বলিয়া আমি অকর্তা। আমার এই নির্লিপ্ততা ও নিস্পৃহতা বুঝিতে পারিলে মানুষ নিষ্কাম কর্মের মর্ম বুঝিতে পারে, তাহার কর্মও নিষ্কাম হয়। পূর্ববর্তী জনকাদি রাজর্ষিগণ কর্তৃত্বাভিমান বর্জনপূর্বক নির্লিপ্তভাবে কর্তব্য-কর্ম সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, তুমিও নিষ্কাম ভাবে স্বীয় কর্তব্য পালন কর। **কর্মতত্ত্ব** বড় দুরূহ, পণ্ডিতগণও উহাতে মোহ প্রাপ্ত হন। যিনি কর্মে অকর্ম দর্শন করেন, অর্থাৎ যিনি কর্ম করিয়াও মনে করেন 'আমি' কিছুই করি না, তিনিই বুদ্ধিমান্, কেননা কর্তৃত্বাভিমান বর্জন-হেতু তাঁহার কর্মও অকর্মস্বরূপ হয়। আবার অনেকে আলস্য-বুদ্ধিতে বাহ্য-কর্মত্যাগ করেন, কিন্তু কামনা ত্যাগ করিতে পারেন না, তাঁহাদের অহংবুদ্ধিও ঘুচে না; এই যে কর্মত্যাগ বা অকর্ম ইহা প্রকৃতপক্ষে কর্ম, কেননা ইহা বন্ধনের কারণ। যিনি এইরূপ অকর্মে কর্ম দর্শন করেন তিনিই বুদ্ধিমান্। বস্তুতঃ যিনি ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত, রাগদ্বেষাদিমুক্ত, যাঁহার চিত্ত ব্রহ্মজ্ঞানে অবস্থিত, তিনি ঈশ্বরপ্রীত্যর্থ বা লোকসংগ্রহার্থ কর্ম করিলেও তাঁহার কর্মফলের সহিত নিঃশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, উহা বন্ধনের কারণ হয় না।

এই ত্যাগমূলক কর্মকেই **'যজ্ঞ'** বলে। দ্রব্যসাধ্য যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ তখন হয়, যখন যজ্ঞাঙ্গগুলিকে ব্রহ্মবোধ করা যায়। যিনি যজ্ঞ করিতে বসিয়া স্রুবাদি কিছুই দেখিতে পান না, সর্বত্রই ব্রহ্ম দর্শন করেন, ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই ভাবনা করিতে পারেন না, ব্রহ্মে একাগ্রচিত্ত সেই যতিপুরুষ ব্রহ্মই প্রাপ্ত হন; ইহাই কর্মযোগের শেষ কথা। এই অবস্থায় কর্ম ও জ্ঞান এক হইয়া যায়—'সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে' (৪।৩৩)। এই জ্ঞান লাভ হইলে সমস্ত কর্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সকল পাপ বিনষ্ট হয়। তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া গুরুপদে প্রণাম, আত্মবিষয়ক প্রশ্ন ও গুরুসেবাদি জ্ঞানলাভের **বহিরঙ্গ সাধন**। শ্রদ্ধা, একনিষ্ঠা ও আত্মসংযম—এইগুলি জ্ঞানলাভের **অন্তরঙ্গ সাধন**। চিত্তের সংশয়ই সকল অনর্থের মূল, গুরু-বেদান্তবাক্যাদিতে ঐকান্তিক শ্রদ্ধা না জন্মিলে জ্ঞান লাভ হয় না, সংশয়ও বিদূরিত হয় না। নিষ্কাম কর্মযোগ দ্বারা যাঁহার কর্ম ঈশ্বরে অর্পিত হইয়াছে, আত্মজ্ঞানের দ্বারা যাঁহার সংশয় বিদূরিত হইয়াছে, সেই জীবন্মুক্ত পুরুষ কর্ম করিলেও কর্মফলে আবদ্ধ হন না। সুতরাং অজ্ঞানসম্ভূত হৃদয়স্থ সংশয়রাশি জ্ঞানরূপ খড়্গদ্বারা ছেদন করিয়া নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান কর, স্বধর্ম পালন কর, যুদ্ধ কর। ইহাতে তোমার পাপ স্পর্শিবে না, জ্ঞানীর কর্মবন্ধন নাই।

এই অধ্যায়ে উল্লিখিত কয়েকটি বিশিষ্ট তত্ত্ব এই—

১। শ্রীগীতায় যে যোগধর্ম অর্জুনকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাহার প্রকৃত স্বরূপ কি? এই অধ্যায়ের প্রথম তিন শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, এই যোগ আমি পূর্বে সূর্যকে বলিয়াছিলাম। দীর্ঘকালবশে উহা লোপ পাইয়াছে, সেই পুরাতন যোগ আমি তোমাকে পুনরায় বলিলাম। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, **এই যোগ শ্রীগীতার সম্পূর্ণ নিজস্ব, উহা একটি বিশিষ্ট ধর্মমত**। তৎকালীন প্রচলিত জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ বা ধ্যানযোগ—এ সকল কিন্তু নয়, অথচ এই সকল মতের সারতত্ত্ব যাহা তাহা ইহার মধ্যে আছে। সেই সূত্র ধরিয়া প্রচলিত কোন মতবাদের সাহায্যে বা পরিপোষণার্থ ইহার ব্যাখ্যা করিলে তাহা শ্রীগীতার ব্যাখ্যা হয় না, ঐসকল শাস্ত্রেরই ব্যাখ্যা হইয়া উঠে। এই কারণেই শ্রীগীতার ব্যাখ্যায় নানারূপ মতভেদ ঘটিয়াছে। ভূমিকায় 'গীতোক্ত ধর্মের প্রাচীন স্বরূপ' এবং পরে 'গীতোক্ত যোগী ও যোগধর্ম' দ্রষ্টব্য।

২। এই অধ্যায়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় **অবতার-তত্ত্ব**। যুগাবতার কি, অবতারের উদ্দেশ্য ও কর্ম কি, এ সকল বিষয়ে নানারূপ মতভেদ আছে। শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত বাক্যে বিষয়টি সুস্পষ্ট হইয়াছে।

৩। এই অধ্যায়ে বর্ণিত আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়—**চতুর্বর্ণের উৎপত্তি**। আমরা হিন্দু-সমাজে যে বর্তমান জাতিভেদ-প্রথা দেখি ইহার কিরূপে উৎপত্তি হইল? ইহার মূল কোথায়? এ সম্বন্ধে নানা শাস্ত্রে নানা কথা আছে। সে সকলের মধ্যে শ্রীগীতার কথাই বিশেষ প্রামাণিক এবং উহা প্রকৃতির গুণগত সৃষ্টিতত্ত্বের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, বর্তমান বংশগত জাতিভেদ ও শ্রীভগবানের কথিত গুণগত বর্ণভেদ ঠিক এক কথা নহে। ইহার আলোচনা তত্তৎস্থলে দ্রষ্টব্য।

৪। এই অধ্যায়ের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় নিষ্কাম কর্ম-তত্ত্ব এবং **জ্ঞান-কর্মের সমুচ্চয়**—যে আলোচনা তৃতীয় অধ্যায়ে আরম্ভ হইয়াছে। অধ্যায়ের শেষ দুই শ্লোকে এ-কথাটি স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। অধ্যায়-শেষোক্ত ভণিতায় এই অধ্যায়ের নাম সাধারণতঃ জ্ঞানযোগ বলিয়া উল্লিখিত হয়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, জ্ঞান ও জ্ঞানযোগ এক কথা নহে। নিষ্কাম কর্ম জ্ঞানীর কর্ম। সেই হেতু নিষ্কাম কর্মযোগের উপদেশ প্রসঙ্গে জ্ঞানের স্বরূপ (৪।৩৬) এবং জ্ঞানের অবশ্য-প্রয়োজনীয়তা আটটি শ্লোকে (৪।৩৩-৪০) বর্ণিত হইয়াছে। কর্মযোগে সিদ্ধ পুরুষ এই জ্ঞান স্বয়ংই অন্তরে লাভ করেন, একথাও বলা হইয়াছে (৪।৩৮)। সুতরাং এই অধ্যায়কে 'জ্ঞানযোগ' নাম না দিয়া 'জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়-যোগ' নাম দিলেই সুসঙ্গত হয়। কেহ কেহ 'জ্ঞানকর্ম-সন্ন্যাসযোগ' নাম দিয়াছেন। এখানে কর্ম-সন্ন্যাস অর্থ—ঈশ্বরে কর্ম-সমর্পণ (৪।৫১)। এ নামও সুসঙ্গত।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে **জ্ঞানযোগো** নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চম অধ্যায়

সন্ন্যাসযোগ

অর্জুন উবাচ

সংন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্॥ ১

শ্রীভগবান্ উবাচ

সংন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্মসংন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে॥ ২

১। অর্জুনঃ উবাচ—হে কৃষ্ণ, কর্মণাং (কর্মসমূহের) সংন্যাসং (ত্যাগ) পুনঃ (আবার) যোগং চ (কর্মযোগও) শংসসি (বলিতেছ); এতয়োঃ (এই উভয়ের মধ্যে) যৎ শ্রেয়ঃ (যাহা শ্রেয়ঃ) তৎ একং (সেই একটি) মে সুনিশ্চিতং ব্রূহি (আমাকে নিশ্চয় করিয়া বল)।

কর্মযোগ ও সন্ন্যাস উভয়ই মোক্ষপ্রদ, কিন্তু কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ ১-২

অর্জুন বলিলেন—হে কৃষ্ণ, তুমি কর্মত্যাগ ও কর্মযোগ উভয়ই বলিতেছ, এই উভয়ের মধ্যে যাহা শ্রেয়স্কর সেই একটি আমাকে নিশ্চয় করিয়া বল। ১

এ পর্যন্ত শ্রীভগবান্ নিষ্কাম কর্মযোগের উপদেশ-প্রসঙ্গে অনেক বার জ্ঞানেরও প্রশংসা করিয়াছেন। জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র কিছু নাই, জ্ঞানেই সকল কর্মের পরিসমাপ্তি (৪।৩৩) ইত্যাদি কথাও বলিতেছেন। ইহাতে, সর্বকর্ম পরিত্যাগপূর্বক জ্ঞানযোগের অনুশীলন কর্তব্য, ইহাই বুঝা যায়। কিন্তু ৪।৪২ শ্লোকে স্পষ্টই কর্মানুষ্ঠানের উপদেশ দিলেন। সুতরাং অর্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, কর্মত্যাগ বা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া জ্ঞানযোগের অনুশীলন অথবা নিষ্কাম কর্মযোগের অনুশীলন, ইহার মধ্যে যেটি শ্রেয়স্কর হয় তাহাই আমাকে বল।

২। শ্রীভগবান্ উবাচ—সংন্যাসঃ কর্মযোগঃ চ উভৌ (উভয়) নিঃশ্রেয়সকরৌ (মুক্তির হেতু), তয়োঃ তু (কিন্তু এ উভয়ের মধ্যে) কর্মসংন্যাসাৎ (কর্মত্যাগ হইতে) কর্মযোগঃ বিশিষ্যতে (কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ)।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, সন্ন্যাস ও কর্মযোগ উভয়ই মোক্ষপ্রদ, কিন্তু উভয়ের মধ্যে কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ। ২

কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ কেন তাহা পরে বুঝাইতেছেন (৫।৬ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩
সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥ ৪
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫

৩। হে মহাবাহো, যঃ ন কাঙ্ক্ষতি (যিনি আকাঙ্ক্ষা করেন না), ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না), সঃ নিত্যসন্ন্যাসী জ্ঞেয়ঃ (তাহাকে নিত্যসন্ন্যাসী জানিবে) ; নির্দ্বন্দ্বঃ হি (সেই রাগ-দ্বেষাদি-দ্বন্দ্ব-রহিত পুরুষই) সুখং (অক্লেশে) বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে (বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন)।

নিত্যসন্ন্যাসী—'কর্মানুষ্ঠানকালেঽপি সন্ন্যাসী' = সংসারে থাকিয়া কর্মানুষ্ঠান-কালেও সন্ন্যাসী।

ফলত্যাগী কর্মযোগীই নিত্য-সন্ন্যাসী ৩-৬

হে মহাবাহো, যিনি কিছু আকাঙ্ক্ষা করেন না, রাগ-দ্বেষও করেন না, তাঁহাকে নিত্যসন্ন্যাসী জানিও ; তাদৃশ রাগ-দ্বেষাদি-দ্বন্দ্বশূন্য শুদ্ধচিত্ত পুরুষ অনায়াসে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন। ৩

তাৎপর্য—সংসার-আশ্রম ছাড়িয়া সর্বকর্ম ত্যাগ করিলেই সন্ন্যাসী হয় না। সংসারে থাকিয়া রাগদ্বেষ ত্যাগ করিয়া নিষ্কামভাবে যিনি কর্ম করিতে পারেন, তিনিই সন্ন্যাসী।

৪। বালাঃ (অজ্ঞ ব্যক্তিগণ) সাংখ্যযোগৌ (সন্ন্যাস ও কর্মযোগকে) পৃথক্ প্রবদন্তি (পৃথক্ বলেন), পণ্ডিতাঃ ন (পণ্ডিতগণ এরূপ বলেন না), একম্ অপি (এই উভয়ের একটিও) সম্যক্ আস্থিতঃ (সম্যক্ অনুষ্ঠান করিলে) উভয়োঃ ফলং বিন্দতে (উভয়ের ফল লাভ হইয়া থাকে)।

অজ্ঞ ব্যক্তিগণই সন্ন্যাস ও কর্মযোগকে পৃথক্ বলিয়া থাকেন, পণ্ডিতগণ এরূপ বলেন না। ইহার একটি সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইলে উভয়ের ফল (মোক্ষ) লাভ হয়। ৪

৫। সাংখ্যৈঃ (জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ কর্তৃক) যৎ স্থানং (যে স্থান অর্থাৎ মোক্ষ) প্রাপ্যতে (লব্ধ হয়) যোগৈঃ অপি (কর্মযোগিগণ কর্তৃকও) তৎ গম্যতে (সেই স্থান অর্থাৎ মোক্ষ লব্ধ হয়) ; যঃ (যিনি) সাংখ্যং চ যোগং চ একং (একরূপ) পশ্যতি (দেখেন) সঃ পশ্যতি (তিনিই যথার্থ রূপ দেখেন)।

সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬

সাংখ্যৈঃ—জ্ঞাননিষ্ঠৈঃ সন্ন্যাসিভিঃ (শঙ্কর)—জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ কর্তৃক।

সাংখ্যগণ যে স্থান লাভ করেন কর্মযোগিগণও সেই স্থান প্রাপ্ত হন। যিনি সন্ন্যাস ও কর্মযোগকে একরূপ দেখেন তিনিই যথার্থদর্শী। ৫

৬। হে মহাবাহো, অযোগতঃ (কর্মযোগ ব্যতীত) সংন্যাসঃ তু (কেবল কর্মত্যাগ) দুঃখম্ আপ্তুম্ (দুঃখের জন্যই হয়); যোগযুক্তঃ মুনিঃ (কর্মযোগী) ন চিরেণ (অচিরেই) ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি (ব্রহ্ম লাভ করেন)।

হে মহাবাহো, কর্মযোগ বিনা সন্ন্যাস কেবল দুঃখের কারণ হয়, কিন্তু কর্মযোগযুক্ত সাধক অচিরেই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করেন। ৬

কর্মযোগ ও সন্ন্যাসযোগ—শ্রীভগবান্ অর্জুনকে যে যোগ উপদেশ করিতেছেন তাহাকে কখনও কর্মযোগ, কখনও বুদ্ধিযোগ বলিয়াছেন। উহার সহিত তৎকালে বা অধুনা-প্রচলিত বিবিধ সাধন-প্রণালীর কোনটিরই ঠিক ঠিক মিল নাই। উহাতে সবগুলিরই সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের চেষ্টা। পূর্ব-মীমাংসার কর্মবাদ বা বেদবাদ (২।৪২ শ্লোক), সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেকবাদ, উপনিষদ্ বা বেদান্তের ব্রহ্মবাদ, এইগুলিই প্রচলিত মতবাদ। কর্ম বলিতে সেকালে বৈদিক যাগযজ্ঞাদি কাম্যকর্মই বুঝাইত। শ্রীভগবান্ কর্ম রাখিলেন বটে, যজ্ঞ রাখিলেন বটে, কিন্তু উহার অর্থের সম্প্রসারণ করিলেন, ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জিত করিয়া মীমাংসকের স্বর্গপ্রদ কাম্যকর্মকে মোক্ষপ্রদ বিশুদ্ধ নিষ্কাম কর্মে পরিণত করিলেন, উহাকে ঈশ্বর-অর্পিত করিয়া ভক্তিপূত করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃত্বাভিমান-বর্জনের ও সমত্ব-বুদ্ধির উপদেশ দিয়া কর্মকে জ্ঞানের সহিত সংযুক্ত করিয়া ব্রহ্মকর্ম বা বিশ্বকর্মে পরিণত করিলেন। সুতরাং কর্মোপদেশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মসংযম ও কামনাবর্জন হইতে ব্রাহ্মীস্থিতি পর্যন্ত উচ্চতর জ্ঞানোপদেশ দিতে লাগিলেন।

কিন্তু জ্ঞানবাদী দার্শনিকগণ কেহই কর্মকে মোক্ষপ্রদ বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে কর্মত্যাগ বা সন্ন্যাসই একমাত্র মোক্ষলাভের উপায়। 'এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি'—ব্রহ্মলোক-লাভেচ্ছুগণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন; 'ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ'—সন্ন্যাসদ্বারাই মহর্ষিগণ অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন; এই সকল শ্রুতিবাক্যের অনুসরণে জ্ঞানবাদিগণ

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭
নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥ ৮
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯

সন্ন্যাসবাদী। সন্ন্যাস ভিন্ন জ্ঞান নাই, মুক্তি নাই—ইহাই প্রচলিত মত। সুতরাং যুগপৎ কর্ম ও জ্ঞানের উপদেশ শুনিয়া অর্জুনের সংশয় ও প্রশ্ন—কর্ম-সন্ন্যাস বা কর্মযোগ, ইহার কোনটি শ্রেয়ঃ ?

উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন যে, সন্ন্যাস ও কর্মযোগ উভয়ই মোক্ষপ্রদ। তন্মধ্যে কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ, কেননা ফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্ম করিলেও সন্ন্যাসেরই ফল পাওয়া যায়; অধিকন্তু, উহাতে লোকরক্ষা বা বিশ্বকর্মও সম্পন্ন হয়। কর্ম, বন্ধনের কারণ নয়, ফলাসক্তিই বন্ধনের কারণ, ফলসন্ন্যাসই প্রকৃত সন্ন্যাস, আসক্তি ত্যাগেই মুক্তি। যিনি রাগদ্বেষত্যাগী, তিনি কর্মানুষ্ঠান করিয়াও সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসে আর বেশী কি আছে? কর্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাস কেবল দুঃখেরই কারণ। ফলাফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া কর্তৃত্বাভিমান বর্জন-পূর্বক নিষ্কামভাবে বিশ্বকর্ম সম্পন্ন করাই কর্মযোগ। যিনি এই যোগযুক্ত, তিনি অচিরে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। এই যে জ্ঞান-কর্ম-ভক্তিমিশ্র যোগধর্ম—ইহা সম্পূর্ণই **গীতার নিজস্ব**। প্রচলিত বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের সাহায্যে বা প্রতিপোষণার্থ ইহার ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করাতেই গীতার ব্যাখ্যায় নানা মুনির নানা মতের সৃষ্টি হইয়াছে। ৬

৭। যোগযুক্তঃ (নিষ্কামকর্মযোগী), বিশুদ্ধাত্মা (শুদ্ধচিত্ত), বিজিতাত্মা (স্ববশীকৃত দেহ), জিতেন্দ্রিয়ঃ (স্ববশীকৃত ইন্দ্রিয়), সর্বভূতাত্ম-ভূতাত্মা (যিনি সর্বভূতের আত্মায় আত্মভাবদর্শী) [তিনি] কুর্বন্ অপি (কর্ম করিয়াও) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হন না)।

যোগযুক্তঃ—কর্মযোগেন যুক্তঃ = নিষ্কামকর্মযোগী। **বিজিতাত্মা**—বিজিত আত্মা (শরীরং) যেন সঃ = সংযতদেহ (শঙ্কর)। **সর্বভূতাত্ম-ভূতাত্মা**—সর্বেষাং ভূতানাং আত্মভূতঃ আত্মা যস্য সঃ সম্যগ্‌দর্শী ইত্যর্থঃ (শ্রীধর) = যাঁহার আত্মা সর্বভূতের আত্মভূত হইয়াছে অর্থাৎ যিনি দেখিতেছেন যে, এক বস্তুই (আত্মাই) সর্বভূতে আছেন এবং তাঁহাতেও আছেন (৪।৩৫দ্রঃ), সর্বভূতে সমদর্শী।

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ১০

কর্মযোগী সর্বদাই অলিপ্ত, সুতরাং ইন্দ্রিয়দ্বারা কর্ম করিয়াও মুক্ত ৭-১৩

যিনি কর্মযোগে যুক্ত, বিশুদ্ধচিত্ত, সংযতদেহ, জিতেন্দ্রিয় এবং সর্বভূতের আত্মাই যাঁহার আত্মস্বরূপ, এরূপ সম্যগ্‌দর্শী পুরুষ কর্ম করিয়াও কর্মে আবদ্ধ হন না। ৭

৮-৯। যুক্তঃ (কর্মযোগে যুক্ত) তত্ত্ববিৎ (তত্ত্বদর্শী পুরুষ) পশ্যন্ (দর্শন), শৃণ্বন্ (শ্রবণ), স্পৃশন্ (স্পর্শ), জিঘ্রন্ (ঘ্রাণ), অশ্নন্ (ভোজন), গচ্ছন্ (গমন), স্বপন্ (নিদ্রা, স্বপ্ন), শ্বসন্ (নিঃশ্বাস গ্রহণ), প্রলপন্ (কথন), বিসৃজন্ (ত্যাগ), গৃহ্নন্ (গ্রহণ), উন্মিষন্ (উন্মেষ), নিমিষন্ (নিমেষ), অপি ([করিয়া]ও), ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহ) ইন্দ্রিয়ার্থেষু (ইন্দ্রিয়বিষয়ে) বর্তন্তে (প্রবর্তিত হইতেছে), ইতি ধারয়ন্ (ইহা ধারণ করিয়া) কিঞ্চিৎ অপি ন করোমি (আমি কিছু করি না), ইতি মন্যেত (এইরূপ মনে করেন)।

তত্ত্ববিৎ—প্রকৃতিই কর্ম করেন, আত্মা অকর্তা—এই তত্ত্ব যিনি জানেন (৩।২৭-২৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

কর্মযোগে যুক্ত তত্ত্বদর্শী পুরুষ দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, নিদ্রা, নিঃশ্বাস গ্রহণ, কথন, ত্যাগ, গ্রহণ, উন্মেষ ও নিমেষ প্রভৃতি কার্য করিয়াও মনে করেন,—ইন্দ্রিয়সকলই ইন্দ্রিয়বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে, আমি কিছুই করি না (ইন্দ্রিয়দ্বারা কর্ম করিলেও কর্তৃত্বাভিমান-বর্জনহেতু তাঁহার কর্মবন্ধন হয় না)। ৮-৯

দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ ও ভোজন—ইহা চক্ষুকর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কর্ম; গমন, গ্রহণ, কথন, বিসর্গ (মলমূত্রত্যাগ)—ইহা পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের কর্ম; শ্বাস, উন্মেষ, নিমেষ—ইহা প্রাণাদির কর্ম এবং স্বপ্ন অন্তঃকরণের কর্ম। সুতরাং এই ক্রিয়াগুলিদ্বারা সর্ববিধ কর্মই লক্ষ্য করা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি আদি প্রকৃতির পরিণাম। উহাদের কর্মে আত্মা লিপ্ত হন না। ৮-৯

১০। যঃ ব্রহ্মণি (ব্রহ্মে) আধায় (স্থাপন করিয়া), সঙ্গং ত্যক্ত্বা (ফলাসক্তি ও কর্তৃত্বাভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া), কর্মাণি করোতি (কর্মসকল করেন), সঃ অম্ভসা পদ্মপত্রম্ ইব (জলদ্বারা পদ্মপত্রের ন্যায়), পাপেন ন লিপ্যতে (পাপের দ্বারা লিপ্ত হন না)।

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১

যিনি ব্রহ্মে সমুদয় কর্ম স্থাপনপূর্বক ফলাসক্তি ও কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া কর্ম করেন, তিনি পাপে লিপ্ত হন না, যেমন পদ্মপত্র জলসংস্পৃষ্ট থাকিয়াও জলদ্বারা লিপ্ত হয় না। ১০

ব্রহ্মে কর্ম স্থাপন কিরূপ?—মূলে আছে, 'ব্রহ্মণি আধায়' অর্থাৎ ব্রহ্মে কর্ম স্থাপন বা নিক্ষেপ করিয়া। ব্রহ্ম বলিতে অক্ষর নিষ্ক্রিয় পুরুষ বুঝায়। তাঁহাতে কর্মস্থাপন কিরূপ? কর্ম করেন প্রকৃতি, বদ্ধ জীবে মনে করে কর্ম করি 'আমি'। এই 'অহং কর্তা' অভিমান থাকাতেই নানা সঙ্কল্প উঠিতেছে—উহাই পাপপুণ্য সুখদুঃখের মূল। যখন এই অহংটা সঙ্কল্প-বিকল্প ছাড়িয়া আত্মাতে লয় হইয়া যাইবে, তখন সকল দ্বন্দ্ব দূর হইবে, সমস্ত শান্ত হইয়া যাইবে। দেহ থাকিতে প্রকৃতির কর্ম চলিবেই, কিন্তু সেই কর্মে কোন বিক্ষেপ উপস্থিত হইবে না—কর্ম উঠিবে এবং লয় পাইবে, কিন্তু কোন সংস্কার রাখিবে না—ইহাই ব্রহ্মজ্ঞানে অবস্থিত মুক্ত পুরুষের কর্ম—মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে (৪।২৩)। অজ্ঞানীর কর্ম স্থাপিত হয় অহং-এর উপর, জ্ঞানীর অহং অভিমান না থাকাতে তাঁহার কর্ম স্থাপিত হয় ব্রহ্মের উপর—কেননা তিনি ব্রহ্মভূত, সুতরাং তাহার কর্ম ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত।

৩।৩০ শ্লোকে বলা হইয়াছে 'ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা'—'অধ্যাত্মচিত্তদ্বারা আমাতে সমস্ত কর্ম অর্পণ করিয়া যুদ্ধ কর' ইত্যাদি। এস্থলে 'ময়ি' অর্থাৎ 'আমাতে' বলিতে বুঝায় পুরুষোত্তমে, সর্বভূত-মহেশ্বরে। এই পুরুষোত্তম ও ব্রহ্ম ঠিক এক কথা নহে। পুরুষোত্তমে সগুণ-নির্গুণ দুই ভাবই আছে—অক্ষর ব্রহ্ম পুরুষোত্তমের নির্গুণ বিভাব। পুরুষোত্তমে কর্ম অর্পণই কর্মযোগের উদ্দেশ্য, তাহা করিতে হইলেই 'অধ্যাত্মচেতা' হইতে হয়, অর্থাৎ অহংটাকে আত্মাতে লয় করিতে হয়। এইরূপে অহংবুদ্ধি ত্যাগ করিলে যে কর্ম হয় সেই কর্মই ব্রহ্মে স্থাপিত কর্ম; সুতরাং ব্রহ্মে কর্ম স্থাপন, ঈশ্বরে কর্ম সমর্পণের সহায়ক অনুষঙ্গী অবস্থা, কিন্তু দুইটি ঠিক এক নহে। পরে পুরুষোত্তমতত্ত্ব নির্ণয়ে একথা আরও স্পষ্টীকৃত হইবে। (৫।২৯, ১৫।১৮)।

The reposing of the work in the Impersonal (ব্রহ্মণি) is a means of getting rid of the personal *egoism* (অহংবুদ্ধি) of the doer, but the end is to give up all our actions to that great Lord of all (সর্বভূত-মহেশ্বর)। —*Sree Aurobindo* (*Essays on the Gita*)

যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১২
সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ন কারয়ন্ ॥ ১৩

১১। যোগিনঃ (কর্মযোগিগণ) সঙ্গং ত্যক্ত্বা (ফলাসক্তি ও কর্তৃত্বাভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া) আত্মশুদ্ধয়ে (চিত্তশুদ্ধির জন্য) কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ অপি (কেবল কায়মনবুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা) কর্ম কুর্বন্তি (কর্ম করিয়া থাকেন)।

কেবলৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ—কর্তৃত্বাভিনিবেশরহিতৈঃ মমত্ববুদ্ধিশূন্যৈঃ (শ্রীধর, শঙ্কর)='কেবল ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা' একথা বলার অর্থ এই যে, 'কেবল-ইন্দ্রিয়াদিই কার্য করে, আমি কিছুই করি না', এইরূপে অহংবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া। 'কেবল' পদ দেহাদিরও বিশেষণরূপে প্রযোজ্য (শঙ্কর)।

কর্মযোগিগণ ফলকামনা ও কর্তৃত্বাভিনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত কেবল শরীর, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা কর্ম করিয়া থাকেন। ১১

১২। যুক্তঃ (নিষ্কাম কর্মযোগী) কর্মফলং ত্যক্ত্বা (কর্মফল ত্যাগ করিয়া) নৈষ্ঠিকীং শান্তিম্ (স্থিরা শান্তি, মোক্ষ) আপ্নোতি (লাভ করেন); অযুক্তঃ (সকাম, বহির্মুখ ব্যক্তি) কামকারেণ (কামনাবশতঃ) ফলে সক্তঃ (ফলে আসক্ত হইয়া) নিবধ্যতে (বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয়)।

নৈষ্ঠিকী শান্তি—ব্রহ্মনিষ্ঠা হইতে উৎপন্না স্থিরা শান্তি। **কামকারেণ**—কামতঃ প্রবৃত্ত্যা (শ্রীধর, মধুসূদন)=কর্মফলে কামনাবশতঃ।

নিষ্কাম কর্মযোগিগণ কর্মফল ত্যাগ করিয়া সর্বদুঃখ-নিবৃত্তিরূপ স্থিরা শান্তি লাভ করেন। সকাম বহির্মুখ ব্যক্তিগণ কামনাবশতঃ ফলে আসক্ত হইয়া বন্ধনদশা প্রাপ্ত হন। ১২

১৩। বশী দেহী (জিতেন্দ্রিয় পুরুষ), মনসা (মনদ্বারা), সর্বকর্মাণি সংন্যস্য (সর্বকর্ম পরিত্যাগপূর্বক) নবদ্বারে পুরে (নবদ্বারযুক্ত দেহে) ন এব কুর্বন্ (নিজে কিছু না করিয়া) ন এব কারয়ন্ (অন্যকে কিছু না করাইয়া), সুখম্ আস্তে (সুখে অবস্থান করেন)।

নবদ্বারে পুরে—দেহ নবদ্বারযুক্ত পুরী সদৃশ—দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসারন্ধ্র, মুখ, পায়ু ও উপস্থ—দেহের এই নবদ্বার। এই পুরে বা দেহে যিনি

ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে ॥ ১৪

বাস করেন, তিনি দেহী (আত্মা)। কর্মযোগীর দেহেন্দ্রিয়াদিসকল বশীভূত, এই জন্য এ-স্থলে 'বশী' বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে। **মনসা সংন্যস্য**—দেহাদিনা বহিস্তানি কুর্বন্নপি (বলদেব)—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দ্বারা বাহিরে কাজ চলিতেছে, কিন্তু তিনি উহাতে নির্লিপ্ত।

জিতেন্দ্রিয় পুরুষ (কর্মযোগী) মনে মনে সমস্ত কর্ম ত্যাগ করিয়া নবদ্বারযুক্ত দেহে সুখে বাস করেন, তিনি কিছু করেন না, অন্যকেও কিছু করান না। ১৩

মনে মনে ত্যাগ করিয়া—অর্থাৎ কার্যতঃ ত্যাগ নহে।

কর্মযোগীর কার্য কিরূপে হয় তাহাই এখানে বলা হইতেছে। তাঁহার দেহাদি কার্য করিতেছে; কিন্তু তিনি ত দেহ নন, তিনি দেহী অর্থাৎ আত্মা। আত্মা নির্লিপ্ত, তিনি কিছু করেন না, তাঁহার কর্মজনিত বিক্ষেপ নাই, তিনি সুখে দেহমধ্যে অবস্থিত আছেন।

১৪। প্রভুঃ (আত্মা), লোকস্য (লোকের), কর্তৃত্বং ন সৃজতি (**কর্তৃত্ব সৃষ্টি করেন না**), কর্মাণি ন (কর্মসমূহ সৃষ্টি করেন না), কর্মফলসংযোগং ন (**কর্মফলে সম্বন্ধও সৃষ্টি** করেন না), স্বভাবঃ তু প্রবর্ততে (প্রকৃতিই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে)।

স্বভাব—প্রকৃতি (৩।২৭, ৩।৩৩ শ্লোকদ্বয় দ্রষ্টব্য)।

কর্তৃত্ব ও কর্ম প্রকৃতির, আত্মার নহে—অজ্ঞানবশতঃ আত্মায় আরোপিত হয় ১৪-১৫

প্রভু (আত্মা) লোকের কর্তৃত্ব সৃষ্টি করেন না, কর্ম সৃষ্টি করেন না, সুখদুঃখরূপ কর্মফলসম্বন্ধও রচনা করেন না, কিন্তু প্রকৃতিই কর্মে প্রবৃত্ত হয়। ১৪

জীবের কর্তৃত্ব, কর্ম, কর্মফল—প্রকৃতির প্রবর্তনায়ই সকল কর্ম হয়, পুরুষ বা জীবচৈতন্য অকর্তা। প্রকৃতি কিন্তু জড়া। পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগবশতঃ পুরুষের ধর্ম প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতির ধর্ম পুরুষে উপচরিত হয়। এই হেতু অচেতন হইলেও প্রকৃতিকে চেতন বলিয়া মনে হয় এবং আত্মা অকর্তা হইলেও তাহাকে কর্তা বলিয়া বোধ হয়। পঙ্গু চলিতে পারে না,

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥ ১৫

অন্ধ দেখিতে পারে না; কিন্তু উভয়ে নিকটবর্তী হইলে পঙ্গু অন্ধের স্কন্ধে আরোহণ করে, তখন উভয়েরই সংযোগে গমন-কর্ম সম্পাদিত হয়। পুরুষ-প্রকৃতি সংযোগে সৃষ্টি-কর্মও এইভাবে চলে। 'পঙ্গ্বন্ধবৎ উভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ'—সাংখ্যকারিকা ২১। এই হইল সাংখ্যমত। অপিচ গীতা ৩।২৭, ১৩।১৯-২২ দ্রষ্টব্য।

পূর্বজন্মকৃত ধর্মাধর্মরূপ কর্মসংস্কার বর্তমান জন্মে স্বকার্যাভিমুখে অভিব্যক্ত হয়। ঐ সংস্কারই কর্মবীজ, উহাই স্বভাব, প্রকৃতিই স্বভাবরূপে প্রবর্তিত হয়। উহা ত্রৈগুণ্যময়ী; বিভিন্ন জীবের সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণের পার্থক্য হেতু জীবের কর্মপার্থক্য হয়।

এই শ্লোকে 'প্রভু' শব্দের অর্থ দেহেন্দ্রিয়াদির অধিপতি আত্মা। তিনি নিষ্ক্রিয়, সুতরাং জীবের কর্তৃত্বাদি তিনি সৃষ্টি করেন না, প্রকৃতির সংযোগবশতঃ তাহাতে কর্তৃত্বাদি আরোপিত হয়। তখন জীবকে 'মায়াধীন' বলা হয়। প্রকৃতির নামান্তর মায়া।

অনাদিকাল-প্রবর্তিত এই যে কর্মপ্রবাহ চলিতেছে, উহা প্রকৃতিরই লীলা, প্রলয়কালেও এই কর্মবীজ সংস্কাররূপে লুপ্ত থাকে। সৃষ্টিকালে উহাই স্বভাবরূপে প্রবর্তিত হয়, উহা কিছু নূতন সৃষ্ট হয় না।

১৫। বিভুঃ (সর্বব্যাপী আত্মা), কস্যচিৎ (কাহারও) পাপং সুকৃতং চ এব (পাপ ও পুণ্য) ন আদত্তে (গ্রহণ করেন না); অজ্ঞানেন জ্ঞানম্ আবৃতং (অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে), তেন জন্তবঃ মুহ্যন্তি (সেই হেতু জীবগণ মোহ প্রাপ্ত হয়)।

সর্বব্যাপী আত্মা কাহারও পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না: অজ্ঞানকর্তৃক জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে বলিয়া জীব মোহপ্রাপ্ত হয়। ১৫

পাপ-পুণ্য—'আত্মা কাহারও পাপপুণ্য গ্রহণ করেন না'—এ কথার তাৎপর্য এই যে, তাঁহার নিকট শুভাশুভ পাপপুণ্য কিছু নাই—তিনি দ্বন্দ্বাতীত, সম, শান্ত, নির্বিকার—'নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম'; তাঁহার সকলই শুভ; তিনি শিব। তিনিই আবার জীব—'মমৈবাংশো জীবভূতঃ', চৈতন্যাংশে একই। কিন্তু মায়াধীন জীব বুঝিতে পারে না যে, সে শিব। মায়াই অজ্ঞান, উহাই অহংকার। আত্মা অকর্তা, কিন্তু জীব মনে করে, আমিই কর্ম করি, পাপ করি, পুণ্য করি,

ইত্যাদি। এই 'অহংবুদ্ধি' তাহার বন্ধনের হেতু—পাপপুণ্যের জনক। সে মনে করুক, আমি কিছুই করি না, দেহেন্দ্রিয়াদিই কর্ম করে, আমি দেহ নই, আমি নির্লিপ্ত, তাহা হইলে ত্রিলোক হত্যা করিলেও সে পাপভাগী হইবে না—'হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে (১৮।১৬-১৭)।' এই 'আমি' 'আমার' জ্ঞানই অজ্ঞান, উহাতেই জীব মোহপ্রাপ্ত হয়, আত্মস্বরূপ বুঝিতে পারে না। এই অজ্ঞান বিদূরিত হইলেই পরমাত্মস্বরূপ প্রতিভাত হয় (পরের শ্লোক)।

রহস্য—আত্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব

প্রঃ। যিনি 'প্রভু', 'বিভু', 'আত্মা',—তিনিই তো পরমেশ্বর। তিনি যদি নিষ্ক্রিয়, নিঃসঙ্গ, উদাসীন হন, তিনি যদি কর্মের নিয়ামক, কর্মফলদাতা, পাপপুণ্যের ফলদাতা না হন, প্রকৃতিই যদি সৃষ্টিপ্রপঞ্চে সর্বময়ী কর্ত্রী হন, তবে ঈশ্বর আরাধনার অর্থ কি, আর লৌকিক পাপপুণ্য ধর্মাধর্মের মূল্য কি এবং বিধিনিষেধ শাস্ত্রাদিরই বা সার্থকতা কি ?

উঃ। আত্মা পরমেশ্বরই বটেন, কিন্তু পরমেশ্বর বলিতে কেবল নিষ্ক্রিয়, নিঃসঙ্গ, উদাসীন আত্মা বুঝায় না। এই অধ্যায়ের ১৩।১৪।১৫ শ্লোকে বর্ণিত তত্ত্বগুলি মূলতঃ সাংখ্যশাস্ত্রের এবং সাংখ্যশাস্ত্রের পরিভাষায়ই উহা ব্যক্ত হইয়াছে। সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বর; উহা মূলে দুই তত্ত্ব স্বীকার করেন—নিষ্ক্রিয় পুরুষ, আর ক্রিয়াশীল প্রকৃতি। বেদান্ত শাস্ত্রের পরিভাষায় সাংখ্যের নিষ্ক্রিয় পুরুষ বা আত্মাই নির্গুণ ব্রহ্ম, আর প্রকৃতি হইতেছেন মায়া। এই মায়াতত্ত্বের এরূপ ব্যাখ্যাও আছে যে, এই সৃষ্টি-প্রপঞ্চের মূলে কোন পারমার্থিক সত্তা নাই, এ সমস্তই মায়া বা অজ্ঞানের খেলা, এক ব্রহ্মই সত্য। আত্মা স্বরূপতঃ অকর্তা হইলেও দেহোপাধিবশতঃ কর্তা বলিয়া প্রতীয়মান হন এবং এই কর্তৃত্ব স্বীকার না করিলে, লৌকিক ধর্মাধর্ম, পাপপুণ্য ও বিধি-নিষেধ শাস্ত্রাদির কোন অর্থ ও সার্থকতা থাকে না, এই জন্য জীবের কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হয় ('কর্তা শাস্ত্রার্থবত্বাৎ'—বেদান্তসূত্র)। কিন্তু মায়া বা অজ্ঞান বিদূরিত হইলে এই কর্তৃত্ব থাকে না, উহাই মুক্তির অবস্থা। শ্রীগীতা কিন্তু মায়া-তত্ত্ব ঠিক এইরূপ ভাবে গ্রহণ করেন নাই। অহংজ্ঞানই অজ্ঞান, উহা হইতে কামনা-বাসনা এবং কামনা হইতে পাপপুণ্য, সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি। এই অহংজ্ঞান বিদূরিত হইলেই তত্ত্বজ্ঞান উদ্ভাসিত হয়। সুতরাং 'অজ্ঞান' অর্থ জ্ঞানের অভাব বা ভ্রান্ত জ্ঞান। উহা কোন পৃথক্ শক্তি নহে।

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্॥ ১৬

বেদান্তে ব্রহ্মের নির্গুণ-সগুণ দুই বিভাবেরই বর্ণনা আছে এবং গীতাও তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি আমারই পরা ও অপরা প্রকৃতি, শক্তি বা বিভাব (৭।৪-৫), আমিই পরতত্ত্ব, পরমাত্মা, পুরুষোত্তম (১৫।১৮)। তিনি নির্গুণ হইয়াও সগুণ, 'নির্গুণো-গুণী'। নির্গুণভাবে তিনি অক্ষর আত্মা, সম, শান্ত, নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার, তিনি জীবের পাপপুণ্য গ্রহণ করেন না। আবার সগুণভাবে তিনি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-কর্তা, কর্মফলদাতা, যজ্ঞতপস্যার ভোক্তা; জীবের 'গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ' অর্থাৎ ভক্তের ভগবান্। এই হেতুই গীতায় পরতত্ত্বের বর্ণনায় অনেক স্থলেই পরস্পরবিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ আছে; যেমন—'আমি কর্তা হইয়াও অকর্তা' (৪।১৩), 'নির্গুণ হইয়াও গুণপালক, ভূতধারক' ইত্যাদি (৯।৫-৬, ১৩।১২-১৬ ইত্যাদি)। এস্থলে আত্মতত্ত্বের বর্ণনা হইতেছে, ঈশ্বর-তত্ত্বের কথা হইতেছে না। আত্মা স্বরূপে সম, শান্ত নির্বিকার হইলেও প্রকৃতি-জড়িত হইয়া 'আমি কর্তা এইরূপ অভিমান করেন। এই অহংজ্ঞান বিদূরিত না হইলে, আত্মার সমতা ও জ্ঞানে দৃঢ়তা প্রতিষ্ঠিত না হইলে কর্মযোগে সিদ্ধিলাভ হয় না, এই অবস্থার নামই আত্মজ্ঞানে অবস্থিতি, ব্রাহ্মীস্থিতি বা ব্রহ্মনির্বাণ। ইহাই মুক্ত দিব্য কর্মীর শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। কিন্তু ইহাই গীতার শেষ কথা নহে। সর্বলোকমহেশ্বর শ্রীভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিয়া সর্বভূতহিতকল্পে নিষ্কামভাবে ভগবৎকর্ম দ্বারা তাঁহার অর্চনা করাই গীতার শেষ কথা। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত পরে আলোচনা করা হইয়াছে (৫।২৯, ১৪।২৭, ১৫।১৮ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

১৬। যেষাং তু (কিন্তু যাহাদিগের) তৎ অজ্ঞানং (সেই অজ্ঞান) আত্মনঃ জ্ঞানেন (আত্মবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা) নাশিতং (নষ্ট হইয়াছে) তেষাং তৎ জ্ঞানং (তাহাদের সেই আত্মজ্ঞান) আদিত্যবৎ (সূর্যের ন্যায়) পরং (পরম তত্ত্বকে) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করে)।

অজ্ঞানের নাশে পরমাত্মস্বরূপের অনুভূতি ১৬-১৭

কিন্তু যাহাদের আত্ম-বিষয়ক জ্ঞানদ্বারা সেই অজ্ঞান বিনষ্ট হয়, তাহাদিগের সেই আত্মজ্ঞান সূর্যবৎ পরম তত্ত্বকে প্রকাশ করিয়া দেয়, অর্থাৎ সূর্য যেরূপ তমোনাশ করিয়া সমস্ত বস্তু প্রকাশিত করেন,

তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ॥ ১৭
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮

সেইরূপ আত্মজ্ঞান জীবের সমস্ত মোহ দূর করিয়া পরম পুরুষকে প্রকাশ করিয়া দেয়। ১৬

১৭। তদ্‌বুদ্ধয়ঃ (যাঁহাদিগের বুদ্ধি তাঁহাতেই নিবিষ্ট), তদাত্মানঃ (তাঁহাতেই যাঁহাদের আত্মভাব), তন্নিষ্ঠাঃ (তাঁহাতেই যাঁহাদের নিষ্ঠা) তৎপরায়ণাঃ (তিনিই যাঁহাদের পরমগতি), জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ (জ্ঞানের দ্বারা যাঁহাদের পাপ নিবৃত্ত হইয়াছে) [তাদৃশ ব্যক্তিগণ] অপুনরাবৃত্তিং গচ্ছন্তি (পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না)।

জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ—আত্মজ্ঞানের দ্বারা যাহাদের সংসার-মোহ দূর হইয়াছে। **তদাত্মানঃ**—তদেব পরংব্রহ্ম আত্মা যেষাং তে (শঙ্কর); অর্থাৎ যাহাদের দেহাত্মবোধ বিদুরিত হইয়াছে, তাদাত্মবোধ জন্মিয়াছে।

যাঁহাদের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি সেই পরম পুরুষেই নিবিষ্ট হইয়াছে, তাঁহাতেই যাঁহাদের আত্মভাব, তাঁহাতেই যাঁহাদের নিষ্ঠা, তিনিই যাঁহাদের পরমগতি এবং অনুরক্তির বিষয়, তাঁহাদের আর পুনরায় দেহধারণ করিতে হয় না, কারণ জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাদের সংসার-কারণ অজ্ঞান দূরীভূত হইয়াছে। ১৭

'তৎ' শব্দে এস্থলে অক্ষর ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইতেছে এবং তত্ত্বজ্ঞান হইলে সাধকের যে উচ্চতর অবস্থা হয়, তাহা পরবর্তী শ্লোকসমূহে বলা হইয়াছে।

১৮। বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে (বিদ্যাবিনয়যুক্ত) ব্রাহ্মণে, শ্বপাকে (চণ্ডালে), গবি হস্তিনি শুনি চ এব (গো, হস্তী ও কুক্কুরে) পণ্ডিতাঃ (আত্মতত্ত্ববিৎ জ্ঞানিগণ) সমদর্শিনঃ (সমদর্শী)।

আত্মজ্ঞানের ফল সর্বভূতে সমদর্শন—ব্রাহ্মীস্থিতি ১৮-২৩

বিদ্যাবিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণে, চণ্ডালে, গো, হস্তী ও কুক্কুরে আত্মবিৎ পণ্ডিতগণ সমদর্শী। ১৮

আপাততঃ বিষয়বস্তুতে সমদর্শন হয় কখন? যখন আত্মস্বরূপ-বা ব্রহ্ম-স্বরূপ দর্শন হয়। আত্মজ্ঞানের ফলই সমত্ব। আত্মদর্শী পণ্ডিতগণ জগৎকে

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯
ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্‌বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ২০
বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ২১

ব্রহ্মদৃষ্টিতে দেখেন। এই ব্রহ্মই নারায়ণ পদবাচ্য। তাঁহাদের দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, পাপী, পুণ্যবান্, গাভী, হস্তী, কুক্কুর সকলই **নারায়ণ**।

১৯। যেষাং মনঃ (যাঁহাদিগের মন) সাম্যে স্থিতং (সমতায় অবস্থিত) ইহ এব (এই লোকেই) তৈঃ সর্গঃ জিতঃ (তাহাদিগকর্তৃক সংসার জিত হয়); হি (যেহেতু) ব্রহ্ম সমং নির্দোষং (সম ও নির্দোষ) তস্মাৎ (সেই হেতু) তে (সেই সমদর্শী পণ্ডিতগণ) ব্রহ্মণি স্থিতাঃ (ব্রহ্মেই অবস্থিতি করেন)।

যাঁহাদিগের মন সাম্যে অবস্থিত অর্থাৎ সর্ববিষয়ে বৈষম্য-রহিত, তাঁহারা ইহলোকে থাকিয়াই এই জনন-মরণরূপ সংসার অতিক্রম করেন; যেহেতু, ব্রহ্ম সম ও নির্দোষ, সুতরাং সেই সমদর্শী পুরুষগণ ব্রহ্মেই অবস্থিতি করেন অর্থাৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। ১৯

ইহৈব = এই জীবনেই (৫।২৩ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রঃ)।

২০। ব্রহ্মণি স্থিতঃ (ব্রহ্মে অবস্থিত), স্থিরবুদ্ধিঃ, অসংমূঢ়ঃ (মোহবর্জিত) ব্রহ্মবিদ্ (ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ) প্রিয়ং প্রাপ্য (প্রিয়বস্তু পাইয়া) ন প্রহৃষ্যেৎ (হৃষ্ট হন না), অপ্রিয়ং চ প্রাপ্য (অপ্রিয় বস্তু পাইয়াও) ন উদ্বিজেৎ (উদ্বিগ্ন হন না)।

ঈদৃশ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি স্থিরবুদ্ধি, সর্বপ্রকার মোহবর্জিত এবং এই ব্রহ্মেই অবস্থিত অর্থাৎ ব্রহ্মভাবে ভাবিত; সুতরাং তিনি প্রিয়বস্তু লাভেও হৃষ্ট হন না, অপ্রিয় সমাগমেও উদ্বিগ্ন হন না (তিনি শুভাশুভ, প্রিয়াপ্রিয় ইত্যাদি দ্বন্দ্ববর্জিত)। ২০

২১। বাহ্যস্পর্শেষু (বাহ্য বিষয়সমূহে) অসক্তাত্মা (অনাসক্তচিত্ত) ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা (ব্রহ্মে সমাহিতচিত্ত) সঃ (সেই যোগী) আত্মনি যৎ সুখং (আত্মায় যে সুখ আছে) [তৎ (সেই সুখ)] বিন্দতি (লাভ করেন) [সঃ] অক্ষয়ং সুখম্ (অক্ষয় সুখ) অশ্নুতে (প্রাপ্ত হন)।

বাহ্যস্পর্শেষু—বাহ্য বিষয়সমূহে; বাহ্যাশ্চ তে স্পর্শাশ্চ বাহ্যস্পর্শাঃ, ইন্দ্রিয়ৈঃ

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২
শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ২৩

স্পৃশন্তে ইতি স্পর্শাঃ শব্দাদয়োঃ বিষয়াঃ, তেষু (শঙ্কর)। **ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা**—ব্রহ্মণি যোগঃ সমাধিঃ তেন যুক্তঃ সমাহিতঃ আত্মা অন্তঃকরণং যস্য (শঙ্কর)। ব্রহ্মে সমাহিতচিত্ত।

বাহ্যবিষয়ে অনাসক্ত, ব্রহ্মে সমাহিতচিত্ত পুরুষ আত্মায় যে আনন্দ আছে তাহা লাভ করেন, তিনি অক্ষয় আনন্দ উপভোগ করেন। ২১

(২।১৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

২২। কৌন্তেয় (হে অর্জুন), সংস্পর্শজাঃ যে হি ভোগাঃ (ইন্দ্রিয়-বিষয় হইতে উৎপন্ন যে সুখ) তে দুঃখযোনয়ঃ এব (তাহারা দুঃখেরই কারণ) আদ্যন্তবন্তঃ চ (আদি ও অন্তযুক্ত), তেষু (তাহাদিগেতে) বুধঃ (বিবেকী ব্যক্তি) ন রমতে (প্রীতি লাভ করেন না)।

সংস্পর্শজাঃ ভোগাঃ—বিষয়জনিত সুখ।

হে অর্জুন, বিষয়ভোগজনিত যে সকল সুখ, সে সকল নিশ্চয়ই দুঃখের হেতু এবং আদি ও অন্তবিশিষ্ট (ক্ষণস্থায়ী, অনিত্য), বিবেকী ব্যক্তি উহাতে রত হন না। (২।১৭, ১৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। ২২

২৩। ইহ এব (এই সংসারেই, দেহেই) যঃ (যিনি) শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক্ (শরীরত্যাগের পূর্বে) কামক্রোধোদ্ভবং বেগং (কামক্রোধজাত বেগ) সোঢ়ুং শক্নোতি (সহ্য করিতে পারেন), সঃ যুক্তঃ (তিনিই যোগী), স নরঃ সুখী (তিনিই সুখী পুরুষ)।

কাম, ক্রোধ—৩।৩৭ দ্রষ্টব্য। সন্ন্যাসবাদী পূর্বাচার্যগণ বলেন, 'প্রাক শরীরবিমোক্ষণাৎ'—এ কথার অর্থ, মরণের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ যাবজ্জীবন; শ্লোকার্থ এই, যিনি আমরণ কামক্রোধের বেগ সহ্য করিতে পারেন তিনিই যোগী। ইহাই সন্ন্যাসবাদ। কিন্তু এই শ্লোকের মূলে 'পর্যন্ত' শব্দ নাই, উহা নূতন যোজনা করিতে হয়, আবার মূলে 'ইহৈব' (ইহলোকেই, এই সংসারে থাকিয়াই) শব্দ আছে, উহার কোন অর্থ হয় না। সংসারে থাকিয়া, বিষয়ের মধ্যে থাকিয়া, কামক্রোধের বেগ সংবরণ করা সুকঠিন; এবং ইহজীবনে মুক্তিও অসম্ভব, এই হেতুই সংসারত্যাগের ব্যবস্থা। কিন্তু শ্রীগীতার মত এই যে,

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥ ২৪
লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ॥ ২৫

ইহজীবনেই সংসারে বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও (ইহৈব) কামক্রোধাদি বশীভূত করিয়া নির্লিপ্তভাবে বিষয়ভোগও করা যায়। যিনি তাহা পারেন, তিনিই প্রকৃত যোগী, তিনিই সুখী, তিনি ইহজীবনেই **মুক্ত** (৫।১৯ দ্রঃ)। ২।৬৪ শ্লোকেও ঠিক এই কথাই বলা হইয়াছে।

যিনি দেহত্যাগ করিবার পূর্বে এই সংসারে থাকিয়াই কামক্রোধজাত বেগ প্রতিরোধ করিতে পারেন, তিনিই যোগী, তিনিই সুখী পুরুষ। ২৩

২৪। যঃ অন্তঃসুখঃ (আত্মাতেই যাঁহার সুখ), অন্তরারামঃ (আত্মাতেই যাঁহার ক্রীড়া), তথা যঃ অন্তর্জ্যোতিঃ এব (এবং অন্তরেই যাঁহার আলোক), সঃ যোগী (সেই সমাহিতচিত্ত পুরুষ) ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া) ব্রহ্মনির্বাণম্ অধিগচ্ছতি (ব্রহ্মেই নির্বাণ প্রাপ্ত হন)।

অন্তঃসুখঃ—অন্তঃ আত্মনি সুখং যস্য, আত্মানুভবেই যাহার সুখ, বাহ্য বিষয়ানুভবে নয়। **অন্তরারামঃ**—অন্তঃ আত্মনি এব আরামঃ আক্রীড়া যস্য সঃ; আত্মাতেই যাহার আরাম বা ক্রীড়া, স্ত্রীপুত্রাদিতে নয়। **অন্তর্জ্যোতিঃ**—অন্তরাত্মৈব জ্যোতিঃ প্রকাশো যস্য সঃ, অন্তরেই যাঁহার আলোক দেদীপ্যমান। **ব্রহ্মনির্বাণং**—ব্রহ্মে নিবৃত্তি বা লয়। কিসের লয়?—মায়াধীন জীবচৈতন্যের, উচ্চতর অন্তরাত্মাতে নীচের অহং এর বা 'আমি'র লয়—The extinction of the ego in the higher spiritual inner Self.—(*Sree Aurobindo*)

কর্মযোগী ব্রহ্মভূত, যোগনিষ্ঠ, স্থিরবুদ্ধি, সুতরাং মুক্ত ২৪-২৮

যাঁহার অন্তরে (আত্মাতেই) সুখ, যাঁহার অন্তরে (আত্মাতেই) আরাম ও শান্তি, যাঁহার অন্তরেই আলোক, সেই যোগী ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মেই নির্বাণ প্রাপ্ত হন। ২৪

২৫। ক্ষীণকল্মষাঃ (নিষ্পাপ) ছিন্নদ্বৈধাঃ (সংশয়শূন্য) যতাত্মানঃ (সমাহিতচিত্ত) সর্বভূতহিতে রতাঃ (সর্বজীবের হিতসাধনে রত) ঋষয়ঃ (সম্যগ্‌দর্শী ব্যক্তিগণ) ব্রহ্মনির্বাণং লভন্তে (ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন)।

কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্॥ ২৬

ঋষয়ঃ—সম্যগ্‌দর্শিনঃ (শ্রীধর)।

যাঁহারা নিষ্পাপ, সংশয়শূন্য, সংযতচিত্ত, সর্বভূতহিতে রত, সেইরূপ ঋষিগণ ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন। ২৫

২৬। কামক্রোধবিযুক্তানাং (কামক্রোধ-বিমুক্ত) যতচেতসাং (সংযতচিত্ত) বিদিতাত্মনাং যতীনাম্ (আত্মতত্ত্বজ্ঞ যতিগণের) অভিতঃ (নিকটেই, চারিদিকেই) ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে (মোক্ষ আছে)।

কামক্রোধবিমুক্ত, সংযতচিত্ত আত্মদর্শী যতিগণের ব্রহ্মনির্বাণ নিকটেই, চারিদিকেই বর্তমান, অর্থাৎ তাঁহারা ব্রহ্মনির্বাণের মধ্যেই বাস করেন। ২৬

অভিতঃ—এবম্ভূতানাম্ হস্তস্থং ব্রহ্মনির্বাণমিত্যর্থঃ—ব্রহ্মনির্বাণ ইঁহাদিগের হস্তস্থিত এই অর্থ। The Nirvana in the Brahman exists all about them (অভিতঃ বর্ততে), for it is the Brahman-consciousness in which they live. —*Sree Aurobindo*

এই ব্রহ্মনির্বাণের অবস্থা কি কোন গভীর সমাধির অবস্থা? কর্ম হইতে, সংসার-চৈতন্য হইতে সম্পূর্ণ বিরতির অবস্থা? না, এ অবস্থায়ও কর্ম থাকিতে পারে? গীতার পূর্বাপর কথা বিবেচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ইহাই মুক্ত কর্মযোগীর অবস্থা। এস্থলেও বলা হইতেছে যে, ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করিয়াও ঋষিগণ সর্বভূতহিত-সাধনে নিযুক্ত থাকেন। (৫।২৫)।

"এই অধ্যায়ের আরম্ভে কর্মযোগকে শ্রেষ্ঠ স্থির করিয়া আবার ২৫শ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানী পুরুষ সকল প্রাণীর হিতসাধনে প্রত্যক্ষভাবে মগ্ন থাকেন, ইহা হইতেই প্রকাশ পাইতেছে যে, এই সমস্ত বর্ণনা কর্মযোগী জীবন্মুক্তেরই, সন্ন্যাসীর নহে।" —লোকমান্য তিলক (গীতারহস্য)

"সংসার ও সংসারের কাজের সহিত নির্বাণের কোন বিরোধই নাই। কারণ, যে সকল ঋষি এই নির্বাণ লাভ করিয়াছেন তাঁহারা ক্ষরজগতের মধ্যে ভগবান্‌কে দেখিতে পান এবং **কর্মের দ্বারা তাঁহার সহিত নিবিড়ভাবে সংযুক্ত থাকেন, তাঁহারা সর্বভূতের হিতসাধনে নিযুক্ত থাকেন—**

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ॥ ২৭
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥ ২৮

'সর্বভূতহিতে রতাঃ'।...ক্ষর পুরুষের লীলাকে তাঁহারা পরিত্যাগ করেন নাই, দিব্যলীলায় পরিণত করিয়াছেন।" —শ্রীঅরবিন্দের গীতা

২৭-২৮। বাহ্যান্ স্পর্শান্ (বাহ্যবিষয়সমূহ) **বহিঃ কৃত্বা** (মন হইতে বিদূরিত করিয়া), **চক্ষুঃ চ** (চক্ষুকে) ভ্রুবোঃ **অন্তরে এব** [**কৃত্বা**] (ভ্রুযুগলের মধ্যে রাখিয়া), নাসাভ্যন্তরচারিণৌ প্রাণাপানৌ **সমৌ কৃত্বা** (প্রাণ ও অপান বায়ুকে নাসাভ্যন্তরে স্থির করিয়া) যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ (যাঁহার ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সংযত), বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ (যাঁহার ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ অপগত হইয়াছে), মোক্ষপরায়ণঃ (বিষয়বিরত) যঃ মুনিঃ (যে মননশীল পুরুষ), সঃ সদা মুক্তঃ এব (তিনি সর্বদা মুক্ত)।

স্পর্শান্ বহিঃ কৃত্বা—বাহ্যবিষয়সমূহ মন হইতে বাহির করিয়া অর্থাৎ বাহ্য বিষয় হইতে মনকে প্রত্যাহৃত করিয়া। যোগশাস্ত্রে ইহাকে 'প্রত্যাহার' বলে। **চক্ষুশ্চৈব ভ্রুবোঃ অন্তরে**—ভ্রূদ্বয়ের অন্তরে চক্ষু স্থাপন করিয়া; অত্যন্ত নিমীলনে নিদ্রার দ্বারা মনের লয়, অত্যন্ত উন্মীলনে বিষয়ে দৃষ্টি হয়—এই উভয় দোষ পরিহারার্থ চক্ষু ভ্রূমধ্যে রাখিতে হয়; যোগশাস্ত্রে ইহাকে খেচরীমুদ্রা বলে—'ভ্রুবোরন্তর্গতাদৃষ্টির্মুদ্রা ভবতি খেচরী'। **প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা**—প্রাণাপান বায়ুর ঊর্ধ্ব ও অধোগতি রোধ করিয়া; এই প্রক্রিয়ার নাম 'কুম্ভক'—৪।২৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য। **যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ**—যতানি সংযতানি ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিশ্চ যস্য। ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি যাহার সংযত।

বাহ্যবিষয়সমূহ মন হইতে বহিষ্কৃত করিয়া, চক্ষুর্দ্বয়কে ভ্রূমধ্যে স্থাপন করিয়া, প্রাণ ও অপান বায়ুর ঊর্ধ্ব ও অধোগতি সমান করিয়া, উহাদিগকে নাসামধ্যে রাখিয়া যিনি ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সংযত করিয়াছেন এবং যিনি মোক্ষপরায়ণ, ইচ্ছাভয়ক্রোধবর্জিত ও আত্মমননশীল—তিনি সর্বদাই মুক্ত। ২৭-২৮

শ্রীভগবান্ পরবর্তী অধ্যায়ে ধ্যানযোগের বিস্তারিত উপদেশ করিবেন, এস্থলে তাহাই সূত্রাকারে উল্লেখ করিলেন। এই দুই শ্লোকে যম, নিয়ম, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি যোগাঙ্গসমূহ সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ২৯

ইহাই রাজযোগ বা চিত্তনিরোধ-যোগ, এইরূপ সমাধির অবস্থায় কর্ম থাকিতে পারে না, উহাতে সমস্ত মানসিক ক্রিয়ার বিরাম হয়। বহির্মুখী মনকে সংযত করিয়া আত্মসংস্থ করিবার ইহা একটি বিশিষ্ট উপায়। কিন্তু ইহাই গীতোক্ত যোগের মূল উদ্দেশ্য নহে, গীতার শেষ কথাও নহে। পরবর্তী শ্লোকে তাহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে (উহার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

২৯। [মুক্ত যোগী] মাং (আমাকে) যজ্ঞতপসাং ভোক্তারম্ (যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা), সর্বলোকমহেশ্বরং (সর্বলোকের মহেশ্বর) সর্বভূতানাং সুহৃদং (সর্বভূতের সুহৃদ্) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) শান্তিম্ ঋচ্ছতি (শান্তি লাভ করেন)।

সর্বলোক-মহেশ্বর পুরুষোত্তমের স্বরূপজ্ঞানে শান্তি ২৯

মুক্ত যোগিপুরুষ আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যাসমূহের ভোক্তা সর্বলোকের মহেশ্বর এবং সর্বলোকের সুহৃদ্ জানিয়া পরম শান্তি লাভ করেন। ২৯

রহস্য—ব্রহ্ম ও পুরুষোত্তম

প্রঃ—পূর্ববর্তী কয়েকটি শ্লোকে বলা হইয়াছে, সংযতাত্মা, সমাহিতচিত্ত, আত্মবান্ যোগী পুরুষ ব্রহ্মনির্বাণ বা মুক্তি লাভ করেন। এই শ্লোকে বলা হইল, ঈদৃশ যোগী পুরুষ আমাকে যজ্ঞতপস্যাদির ভোক্তা, সর্বলোকমহেশ্বর, সবভূতের সুহৃদ্ জানিয়া শান্তি লাভ করেন। 'ব্রহ্মনির্বাণ' অর্থ অবশ্য ব্রহ্মে লয়। ইহাই ত মোক্ষ, ব্রহ্মানন্দই ত পরা শান্তি। উহাই ত চরম অবস্থা। ইহার পর আবার যজ্ঞতপস্যাদির ভোক্তৃস্বরূপ 'আমাকে' জানিয়া শান্তি লাভ করিতে হইবে কেন? আর, 'যজ্ঞতপস্যাদির ভোক্তা', 'সর্বভূতের সুহৃদ্' ইত্যাদি বলাতে ব্রহ্মের সগুণ বিভাবই বুঝাইতেছে। আনন্দস্বরূপ নির্বিশেষে ব্রহ্মে নির্বাণ লাভ করিয়া আবার সগুণ বিভাবের জ্ঞান-ধ্যান কিরূপ? ব্রহ্মনির্বাণ ব্যাপারটি তবে কি? মুক্তের অবস্থাই বা কি? পূর্বধারণা যেন সব ওলট্-পালট্ হইয়া যাইতেছে।

উঃ—ওলট্‌পালট্ হওয়াই প্রয়োজন। নির্বাণ কথাটি বৌদ্ধধর্ম প্রসঙ্গে বিশেষ পরিচিত। সে নির্বাণ-বাদকে অনেকে শূন্যবাদ বলিয়া অগ্রাহ্য করেন। কিন্তু বেদান্তের নির্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইতেও 'শূন্য' শব্দ বহু শাস্ত্রগ্রন্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—'স এব বা এষ শুদ্ধঃ পূতঃ শূন্যঃ শান্তঃ'—মৈত্রায়ণী উঃ; 'শূন্যকাপি নিরঞ্জনম্'—উত্তরগীতা; 'সর্বশূন্যস্বরূপোঽহম্'—তেজবিন্দু উঃ; 'ধ্যায়েচ্ছূন্যং অহর্নিশম্'—শিবসংহিতা ইত্যাদি।

নির্গুণ নির্বিশেষ পরতত্ত্ব মনে ধারণা করা যায় না, বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। তাহা কথায় ব্যক্ত করিতে হইলে 'শূন্য' কথাটিই উপযোগী হয় ; উহা অবস্তু বা অভাবাত্মক কিছু নয়। এই কারণেই বৌদ্ধ-দর্শনেও ধারণার অতীত অজ্ঞেয় পরতত্ত্বকে 'শূন্য' বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। ইহা প্রকৃতপক্ষে নাস্তিক্যবাদ নয়। বৌদ্ধের 'শূন্য', আর গুণশূন্য (নির্গুণ) ব্রহ্ম প্রায় এক কথাই। যাহা হউক, এস্থলে ব্রহ্মনির্বাণ শব্দই পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। কোন কোন মতে ব্রহ্মনির্বাণ বা ব্রাহ্মীস্থিতিই সাধনার চরম কথা, উহাই মোক্ষ। কিন্তু গীতায় ব্রাহ্মীস্থিতিও শেষ কথা নহে।

প্রঃ—সে কি! ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রুতিসিদ্ধ, ব্রহ্মই উপনিষৎ ও বেদান্ত দর্শনের একমাত্র প্রতিপাদ্য; তবে 'কোন কোন মতে' ব্রাহ্মীস্থিতিই চরম লক্ষ্য, একথা কেন? আর গীতাও ত উপনিষদেরই সার, গীতা স্বয়ং ব্রহ্মবিদ্যা, 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের প্রতিপাদক, একথা প্রাচীন আচার্যগণ সকলেই—

উঃ—থাম, থাম। ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রুতিসিদ্ধ তাহা ঠিক। কিন্তু ব্রহ্মের স্বরূপ, ব্রহ্মের সাধনা, ব্রহ্মপ্রাপ্তির ফল, এ সকল বিষয়ে শ্রুতিসিদ্ধান্ত যে কি, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। বিভিন্ন উপনিষৎসমূহের সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধানপূর্বক ব্রহ্মসূত্রে (বেদান্তদর্শনে) ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায় আচার্যগণমধ্যে মর্মান্তিক মতভেদ, অদ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী, সকলেই বেদান্তের অনুগামী হইয়াও বিভিন্ন-মতাবলম্বী। তন্মধ্যে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য-ব্যাখ্যাত মায়াবাদ সুপরিচিত। এই মায়াতত্ত্ব দুর্বোধ্য। কুশাগ্রধী মায়াবাদিগণও মায়ার স্বরূপ নিরূপণে অসমর্থ হইয়া, প্রসঙ্গান্তরে শ্রীমৎ জীব গোস্বামীর ন্যায়, সেই মহাভারতীয় শ্লোকার্ধেরই শরণ লইতে বাধ্য হইয়াছেন—'অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাস্তান্ন তর্কেণ সাধয়েৎ'—যে সকল তত্ত্ব অচিন্তনীয়, তাহা তর্কের উপযুক্ত নয় (পঞ্চদশী ৬।১৫০, মহা ভী-প ৫।১২, তত্ত্বসন্দর্ভ ১১)। এই মতে জীব, জগৎ, সকলই এই 'অচিন্তনীয়' মায়ার বিজৃম্ভণ।

"অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বে স্বপ্নোঽয়মখিলং জগৎ।
ঈশজীবাদিরূপেন চেতনাচেতনাত্মকম্॥ —পঞ্চদশী ৬।২১১

—অদ্বৈতব্রহ্মতত্ত্বে ঈশ্বর, জীব, দেহাদি চেতনাচেতনাত্মক জগৎ, সকলই মায়া-কল্পিত স্বপ্নস্বরূপ।

এই নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদে—কর্মের স্থান চিত্তশুদ্ধি পর্যন্ত, ভক্তির স্থান নাই বলিলেই হয়। জ্ঞানেই মুক্তি, উহাই ব্রহ্মনির্বাণ, ব্রহ্ম হওয়া—'ব্রহ্ম সন্ ব্রহ্ম অবৈতি'—ব্রহ্ম হইলে তবে ব্রহ্মকে জানা যায়।

কিন্তু গীতা কি বলেন? গীতা বলেন—জ্ঞানও মোক্ষপ্রদ, কর্মও মোক্ষপ্রদ, আবার সঙ্গে সঙ্গে জোরের সহিত একথাও বলেন—কেবল অনন্যা ভক্তি দ্বারাই আমাকে জানা যায়, দেখা যায়, আমাতে প্রবেশ করা যায়। যে আমার কর্ম করে ('মৎকর্মকৃৎ'), যে আমার ভক্ত, সে-ই আমাকে পায়। (১১।৫৪-৫৫, ১৮।৫৪-৫৫ ইত্যাদি)

প্রঃ—কিন্তু এই 'আমি' কে? ইনি কি ব্রহ্ম?

উঃ—ব্রহ্মই বটেন, কিন্তু ঠিক মায়াবাদিগণের ব্রহ্ম নন। আত্মপরিচয় শ্রীভগবান্ নিজেই দিয়াছেন—আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর (কূটস্থ) হইতেও উত্তম, তাই আমি পুরুষোত্তম (১৫।১৮)। আমি নির্গুণ হইয়াও সগুণ ('নির্গুণোগুণী'); আমি অজ অব্যয় আত্মা, আমিই আবার আত্মমায়ায় অবতীর্ণ পার্থসারথি (৪।৬); আমিই অব্যক্তমূর্তিতে জগৎ ব্যাপিয়া আছি (৯।৪); আমিই পরমাত্মরূপে সবভূতের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত ('হৃদি সর্বস্য ধিষ্ঠিতম্' (১৩।১৭, ১৫।১৫); আমি বিশ্বানুগ হইয়াও বিশ্বাতিগ (১০।৪২); আমি প্রকৃতির প্রভু, যজ্ঞতপস্যার ভোক্তা, ব্রহ্মরুদ্রাদিরও ঈশ্বর—সর্বলোকমহেশ্বর—সর্বভূতের সুহৃদ্; সমস্ত বেদে আমিই বেদ্য ('বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ'—১৫।১৫), অক্ষর ব্রহ্ম আমারই বিভাব—আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা ('ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহম্ ১৪।২৭); আমিই অদ্বিতীয় পরতত্ত্ব,—আমার পর আর তত্ত্ব নাই ('মত্তঃ পরতরং নান্যৎ'। এই 'পুরুষোত্তম-তত্ত্ব অতি গুহ্য' ('গুহ্যতমং শাস্ত্রং')। যিনি আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানেন তিনি সর্বজ্ঞ হন, তিনি সর্বপ্রকারে আমাকে ভজনা করেন (১৫।১৯-২০); অর্থাৎ এই পুরুষোত্তম-তত্ত্ব বুঝিলেই সগুণ-নির্গুণ, সাকার-নিরাকার, দ্বৈতাদ্বৈতাদি সর্বপ্রকার ভেদবুদ্ধি বিদূরিত হয়, একদেশ-দর্শিতা লোপ পায়, সর্বতঃপূর্ণ সর্বেশ্বরের যথার্থ স্বরূপ হৃদ্গত হয়, তাঁহাতে ভক্তি জন্মে।

এই পুরুষোত্তম-তত্ত্ব শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ। উপনিষৎসমুদ্র মন্থন করিয়াই এই তত্ত্বামৃত উদ্ভূত হইয়াছে, ইহাই বেদান্তের প্রকৃত ব্যাখ্যা। 'সন্তি উভয়লিঙ্গা শ্রুতয়ো ব্রহ্মবিষয়াঃ' (শঙ্কর)—ব্রহ্মবিষয়ে সবিশেষ-লিঙ্গ (সগুণ) ও নির্বিশেষ-লিঙ্গ (নির্গুণ), দুই প্রকারের শ্রুতিই দৃষ্ট হয়, ইহা শ্রীমদাচার্যদেবেরই কথা। এই পুরুষোত্তমেই সগুণ-নির্গুণ দুই বিভাবের সমন্বয়—ইনি 'নির্গুণো-গুণী'—

একাধারে নির্গুণভাবে ইনি অক্ষর পরব্রহ্ম, সগুণভাবে ইনি সর্বলোক-মহেশ্বর, লীলায় ইনি অবতার, সর্বভূতে ইনিই আত্মা।

এই পুরুষোত্তম-তত্ত্ব অবলম্বনেই গীতা আপাতবিরোধী জ্ঞান-কর্ম-যোগ-ভক্তির সুসঙ্গত সমন্বয় ও সামঞ্জস্য সাধনে সক্ষম হইয়াছেন। তাই গীতার উপদেশ—সর্বসঙ্কল্প সন্ন্যাস করিয়া মনকে বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া যোগযুক্ত কর—আত্মনিষ্ঠ হও, সেই আত্মদেব আমিই; সেই আত্মস্বরূপ উপলব্ধি হইলে তুমি দেখিবে আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্ত সর্বভূত আমাতেই অবস্থিত এবং আমা হইতেই সকলের বিস্তার—ব্রহ্মরূপে সর্বব্যাপী আমিই; তখন তোমার অহংজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানে লয় পাইবে—তুমি ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হইবে—ব্রহ্ম হইবে ('ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা' ১৩।৩০); তখন তোমার সর্বত্র সমদর্শন লাভ হইবে—আমার বিশ্বরূপ হৃদয়ে প্রতিভাত হইবে—আমার বিশ্বকর্মে তোমার অধিকার জন্মিবে—আমাতে পরা ভক্তির উদয় হইবে—ভক্তিযোগে সর্বকর্ম আমাতে অর্পণ করিয়া আমার সর্বতঃপূর্ণ সমগ্র স্বরূপ হৃদ্‌গত করিয়া আমাতেই স্থিতিলাভ করিবে।

তিনি কেবল নীরব, নিঃসঙ্গ, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম নহেন এবং নিস্তব্ধতা গীতোক্ত যোগেরও শিক্ষা নহে। তিনি যজ্ঞতপস্যার ভোক্তা, সর্বলোকমহেশ্বর, সর্বভূতের সুহৃৎ, সুতরাং সর্বলোকসংগ্রহার্থ যজ্ঞস্বরূপে কর্ম করিয়া সর্বভূতহিতসাধনে নিরত থাকাই গীতোক্ত যোগীর দিব্যজীবনের প্রধান লক্ষণ (৩।২৫, ৪।২৩)। সুতরাং ব্রাহ্মীস্থিতি গীতার মুখ্য কথা নহে, পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবানের স্বরূপ জ্ঞান এবং তাঁহাতে পরাভক্তিই গীতার শেষ কথা।

অষ্টাদশ অধ্যায়ে এই কথাটি অতি স্পষ্টরূপেই বলা হইয়াছে—

'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।—১৮।৫৪-৫৫

এই অবস্থা (উপরি-উদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ে যাহা বলা হইল) ব্রহ্মভূত হওয়ারও পরের অবস্থা। গীতায় স্থানে স্থানে ব্রাহ্মীস্থিতি, ব্রহ্মনির্বাণ প্রভৃতির যে উল্লেখ আছে, ইহা সাধনার খুব উচ্চ অবস্থা বটে, কিন্তু সাধকের চরম নহে। গীতা তাহারও পরের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। বেদান্তদর্শন জীবকে ব্রহ্মলোক অবধি লইয়া গিয়াছেন—গীতা কিন্তু জীবকে ঈশ্বরের সহিত মিলিত করিয়া দিয়াছেন।'—বেদান্তরত্ন ৺হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ('গীতায় ঈশ্বরবাদ')।

"But the Gitā is going to represent the Iswara, the Purushottama, as higher even than the still and immutable Brahma (সম, শান্ত, অক্ষর ব্রহ্ম) and the loss of the ego in the Impersonal (ব্রহ্মনির্বাণ) comes in the beginning only as a great and initial step towards union with Purushottama. This is the Supreme Divine, God, who possesses both the infinite and the finite and in whom the personal and the impersonal, the one self and the many existences...are united". —*Sree Aurobindo* (*Essays on the Gita*)

পূর্ণযোগের দ্বারা পুরুষোত্তমের সহিত জীবাত্মার মিলনই গীতার সম্পূর্ণ শিক্ষা নহে। এই জ্ঞানের পথে কেবল অক্ষর ব্রহ্মের সহিত মিলনের যে সঙ্কীর্ণতম মত, তাহা গীতার শিক্ষা নহে। এই জন্যই গীতা প্রথমে জ্ঞান ও কর্মের সামঞ্জস্য করিয়া পরে দেখাইতে পারিয়াছে যে, **জ্ঞান ও কর্ম উভয়ের সহিত সমন্বিত প্রেম ও ভক্তি উত্তম রহস্য পথে চরম অবস্থা।**—শ্রীঅরবিন্দের গীতা [অপিচ, ১৫।১৮, ১৪।২৭ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য এবং 'গীতোক্ত যোগী ও যোগধর্ম' পরিচ্ছেদ। বিবৃতি-সূচী দ্রঃ]

পঞ্চম অধ্যায়ের বিশ্লেষণ ও সার-সংক্ষেপ

১-২ কর্মযোগ ও সন্ন্যাস উভয়ই মোক্ষপ্রদ, কিন্তু কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ, ৩—৬ বস্তুতঃ উভয়ই এক, কারণ ফলত্যাগী কর্মযোগীই নিত্য-সন্ন্যাসী; ৭ – ১৩ কর্মযোগী সর্বদাই অলিপ্ত, সুতরাং ইন্দ্রিয়দ্বারা কর্ম করিয়াও মুক্ত; ১৪—১৫ কর্তৃত্ব ও কর্ম প্রকৃতির, আত্মার নহে, অজ্ঞানবশতঃ উহা আত্মায় আরোপিত হয়; ১৬—১৭ অজ্ঞানের নাশে পরমাত্মস্বরূপের অনুভূতি—পুনর্জন্ম-নিবৃত্তি; ১৮—২৩ আত্মজ্ঞানের ফল সর্বভূতে সমদর্শন—ব্রাহ্মীস্থিতি—অক্ষয় আনন্দ; ২৪—২৮ কর্মযোগী ব্রহ্মভূত, যোগনিষ্ঠ, স্থিরবুদ্ধি, সুতরাং মুক্ত; ২৯ সর্বলোক-মহেশ্বর পুরুষোত্তমের স্বরূপজ্ঞানই শান্তি।

এ পর্যন্ত শ্রীভগবান্ নিষ্কাম কর্মযোগের উপদেশপ্রসঙ্গে অনেক বার জ্ঞানেরও প্রশংসা করিয়াছেন। জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র আর কিছুই নাই, জ্ঞানেই সকল কর্মের পরিসমাপ্তি ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন। ইহাতে সর্বকর্ম সঁ.. গগ-পূর্বক জ্ঞানযোগের অনুশীলনই কর্তব্য, ইহাই বুঝা যায়। কিন্তু ৪।৪২ শ্লোকে স্পষ্টই কর্মানুষ্ঠানের উপদেশ দিলেন; সুতরাং অর্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, কর্মত্যাগ ও সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া জ্ঞানযোগের অনুশীলন অথবা নিষ্কাম কর্ম-যোগের অনুশীলন—ইহার মধ্যে যেটি শ্রেয়স্কর তাহাই আমাকে বল।

উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন যে, সন্ন্যাস ও কর্মযোগ উভয়ই মোক্ষপ্রদ। তন্মধ্যে কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ, কেননা ফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্ম করিলেও সন্ন্যাসেরই ফল পাওয়া যায়; অধিকন্তু, উহাতে লোকরক্ষা বা বিশ্বকর্মও সম্পন্ন হয়। কর্ম, বন্ধনের কারণ নয়, ফলাসক্তিই বন্ধনের কারণ, ফল-সন্ন্যাসই প্রকৃত সন্ন্যাস, আসক্তি-ত্যাগেই মুক্তি। যিনি রাগদ্বেষত্যাগী, তিনি কর্মানুষ্ঠান করিয়াও সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসে আর বেশী কি আছে? কর্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাস কেবল দুঃখেরই কারণ। ফলাফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া কর্তৃত্বাভিমান বর্জন-পূর্বক নিষ্কামভাবে বিশ্বকর্ম সম্পন্ন করাই কর্মযোগ। যিনি এই যোগযুক্ত, তিনি অচিরে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন।

ঈদৃশ যোগযুক্ত তত্ত্বদর্শী পুরুষ ইন্দ্রিয়দ্বারা কর্ম করিলেও কর্তৃত্বাভিমান বর্জনহেতু তাঁহার কর্মবন্ধন হয় না। তাঁহার দেহাদি কর্ম করে বটে, কিন্তু তিনি ত দেহ নন, তিনি দেহী অর্থাৎ আত্মা; আত্মা নির্লিপ্ত, তিনি কাহারও কর্তৃত্ব, কর্ম বা সুখ-দুঃখাদি কর্মফল সৃষ্টি করেন না, কাহারও পাপপুণ্যও গ্রহণ করেন না, কেননা তাঁহাতে শুভাশুভ পাপপুণ্যাদি দ্বন্দ্ব নাই। বদ্ধজীব কর্মের সহিত অহংবুদ্ধি ('আমি করি' এই ভাব) সংযোগ করে বলিয়াই পাপপুণ্যভোগী হয়, মোহপ্রাপ্ত হয়, আত্মস্বরূপ বুঝিতে পারে না; অহংবুদ্ধিই অজ্ঞান, উহা বিদূরিত হইলেই আত্মস্বরূপ প্রতিভাত হয়। ইহার ফলে সর্বত্র সমত্ববুদ্ধি জন্মে। ঈদৃশ আত্মদর্শী পণ্ডিতগণ জগৎকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে দেখেন—তাঁহারা ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন, ব্রাহ্মীস্থিতি বা ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন। যিনি ধ্যানযোগে মনকে বাহ্যবিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া আত্মসংস্থ করিতে পারেন—তিনি প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। আত্মার স্বাভাবিক নির্মল জ্ঞান ও আনন্দ তাঁহার হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত হয়, তখন তিনি শ্রীভগবানের প্রকৃত স্বরূপ হৃদ্গত করিয়া তাঁহাকে সর্বলোকের মহেশ্বর ও সর্বভূতের সুহৃদ্ জানিয়া পরমা শান্তি লাভ করেন।

এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ সন্ন্যাস ও কর্মযোগের তুলনা ও ফলাফল আলোচনা করা হইয়াছে, এই হেতু সাধারণতঃ ইহাকে **সন্ন্যাসযোগ** বলা হয়। কিন্তু সন্ন্যাস এখানে উপদিষ্ট হয় নাই।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে **সন্ন্যাসযোগো** নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অভ্যাসযোগ

শ্রীভগবান্ উবাচ
অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ॥ ১

১। শ্রীভগবান্ উবাচ—যঃ কর্মফলম্ অনাশ্রিতঃ (কর্মফলের অপেক্ষা না করিয়া) কার্যং কর্ম করোতি (কর্তব্য কর্ম করেন), সঃ সন্ন্যাসী চ যোগী চ (তিনি সন্ন্যাসীও যোগীও), ন নিরগ্নিঃ (অগ্নিহোত্রাদি শ্রৌত কর্মত্যাগী নয়), ন চাক্রিয়ঃ (সর্ববিধ শারীর-কর্মত্যাগীও নয়)।

নিরগ্নি—অগ্নিসাধ্য শ্রৌতকর্মত্যাগী। ধর্মশাস্ত্রে উক্ত আছে যে, সন্ন্যাসাশ্রমীর অগ্নি রক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। তিনি 'নিরগ্নি' হইয়া সর্বকর্ম ত্যাগ করিয়া ভিক্ষাদ্বারা শরীর রক্ষা করিবেন। **অক্রিয়**—শারীরকর্মত্যাগী অর্ধমুদিত নেত্র যোগী (বলদেব)।

কর্মফলত্যাগী কর্মযোগীই প্রকৃত সন্ন্যাসী ১-২

শ্রীভগবান্ বলিলেন -কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া যিনি কর্তব্য কর্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই যোগী। যিনি যজ্ঞাদি শ্রৌতকর্ম ত্যাগ করিয়াছেন অথবা সর্ববিধ শারীরকর্ম ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি নহেন। ১

তাৎপর্য—যজ্ঞাদি শ্রৌতকর্ম ত্যাগ করিয়া যতিবেশ ধারণ করিলেই সন্ন্যাসী হয় না, অথবা সর্ববিধ শারীরকর্ম ত্যাগ করিয়া অর্ধমুদিত নেত্রে অবস্থান করিলেই যোগী হয় না, ভিতরের ত্যাগই ত্যাগ, বাহিরের ত্যাগকে ত্যাগ বলে না। যিনি নিষ্কামকর্মী তিনিই সন্ন্যাসী ও যোগী, কেননা, সন্ন্যাস ও যোগের ফল যে সমচিত্ততা, ফলকামনাত্যাগ হেতু কর্মযোগী তাহা লাভ করেন।

পঞ্চম অধ্যায়ের ২৭।২৮ শ্লোকে সংক্ষেপে ধ্যানযোগের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে পরে সেই ধ্যানযোগের বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে, কিন্তু উহা কর্মযোগেরই অঙ্গরূপে উদ্দিষ্ট হইয়াছে। এই জন্যই এই কয়েকটি শ্লোকে কর্মযোগের যে মূল কথা—ফলসন্ন্যাস, কামনা ত্যাগ ও তজ্জনিত সমচিত্ততা, তাহাই প্রথমে বর্ণিত হইয়াছে এবং পরে উহা লাভের উপায়স্বরূপ ধ্যানযোগ বা সমাধিযোগের বর্ণনা করা হইয়াছে। ১

যং সংন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২
আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢস্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩

২। হে পাণ্ডব, [সুধীগণ] যং সন্ন্যাসম্ ইতি প্রাহুঃ (যাহাকে সন্ন্যাস বলেন) তং যোগং বিদ্ধি (তাহাকে যোগ বলিয়া জানিবে)। হি (কেননা) অসংন্যস্তসঙ্কল্পঃ (সঙ্কল্পত্যাগী না হইলে) কশ্চন যোগীঃ ন ভবতি (কেহই যোগী হইতে পারে না)।

হে পাণ্ডব, যাহাকে সন্ন্যাস বলে, তাহাই যোগ বলিয়া জানিও, কেননা, সঙ্কল্প ত্যাগ না করিলে কেহই যোগী হইতে পারে না। ২

সন্ন্যাস—কর্মযোগ – ধ্যানযোগ

গীতার মতে সন্ন্যাসের মূলকথা ফলসন্ন্যাস, কামনা-ত্যাগ—কেবল কর্মত্যাগ নহে। ধ্যানযোগ বা চিত্তনিরোধ-যোগেরও মূলকথা সঙ্কল্পত্যাগ, কামনাত্যাগ ; কারণ, সঙ্কল্পই চিত্তবিক্ষেপের হেতু। আবার কর্মযোগেরও মূলকথা—কামনা-ত্যাগ। সুতরাং সন্ন্যাস, ধ্যানযোগ, কর্মযোগ—এ তিনই এক, তিনেরই মূলকথা সঙ্কল্পত্যাগ, ইহারই সাধারণ নাম গীতোক্ত যোগ। সুতরাং এখানে যোগ বলিতে ধ্যানযোগ ও কর্মযোগ উভয়ই বুঝায়, বস্তুতঃ গীতার মতে ধ্যানযোগ কর্মযোগের অঙ্গীভূত।

৩। যোগং আরুরুক্ষোঃ (যোগে আরোহণেচ্ছু) মুনেঃ (মুনির পক্ষে) কর্ম কারণম্ উচ্যতে (কর্মই কারণ বলিয়া উক্ত হয়); যোগারূঢস্য তস্য (যোগারূঢ় হইলে তাহার পক্ষে) শমঃ এব কারণম্ উচ্যতে (শমই কারণ বলিয়া উক্ত হয়)।

শম—শান্তি (তিলক, অরবিন্দ), নিষ্কামকর্মীর আত্মসংযম-জনিত চিত্তপ্রসাদ—Calm of Self-mastery and Self-possession gained by works. —*Sree Aurobindo*

যোগের সাধনাবস্থা ও সিদ্ধাবস্থা ৩-৯

যোগে আরোহণেচ্ছু মুনির পক্ষে নিষ্কামকর্মই যোগ-সিদ্ধির কারণ, যোগারূঢ় হইলে চিত্তের সমতাই ব্রাহ্মীস্থিতিতে নিশ্চল থাকিবার কারণ। ৩

নিষ্কামকর্মই যোগসিদ্ধির কারণ কিরূপে ?—নিষ্কামকর্মে কামনা ও কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিতে হয়, এই অহংত্যাগই আত্মশুদ্ধি—উহাতেই

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্যতে।
সর্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪
উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৫

যোগসিদ্ধি—ব্রাহ্মীস্থিতি। আবার এই ব্রাহ্মীস্থিতিতে স্থির থাকিবার পক্ষে সংযতাত্মা নিষ্কাম কর্মীর আত্মসংযমজনিত চিত্তপ্রসাদ কারণস্বরূপ হয়।

"অর্থাৎ নিষ্কামকর্মের দ্বারা আত্মসংযম ও শান্তিলাভ করিয়া মুক্ত ব্যক্তি সেই প্রশান্ত ভাবের সহায়ে ব্রহ্মচৈতন্যে ও পূর্ণ সমতায় সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হন। মুক্ত মানব এই ভাব লইয়াই কর্ম করেন" (পরের শ্লোক)—শ্রীঅরবিন্দের গীতা। ৩

৪। যদা হি (যখন) সর্বসঙ্কল্প-সন্ন্যাসী (সর্ব-সঙ্কল্পত্যাগী ব্যক্তি) ইন্দ্রিয়ার্থেষু (রূপরসাদি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে) ন অনুষজ্যতে (আসক্ত হন না), কর্মসু চ ন (কর্মেও আসক্ত হন না), তদা (তখন) যোগারূঢ়ঃ উচ্যতে ([তিনি] যোগারূঢ় বলিয়া অভিহিত হন)।

যখন সাধক সর্বসঙ্কল্প ত্যাগ করায় রূপরসাদি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে এবং কর্মে আসক্ত হন না, তখন তিনি যোগারূঢ় বলিয়া উক্ত হন। ৪

যোগারূঢ়ের লক্ষণ—(১) সর্বসঙ্কল্প ত্যাগ এবং (২) বিষয়ে ও কর্মে অনাসক্তি। সঙ্কল্পত্যাগ ও আসক্তিত্যাগে কর্মত্যাগ বুঝায় না, একথা পূর্বে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে (২।৬৪, ৩।৪-৭, ৪।২০, ১৮।৪ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)। এস্থলে যোগীর যে লক্ষণ বলা হইল তাহা নিষ্কাম কর্মযোগীরই লক্ষণ, উহাতে চিত্তকে সমাহিত করিতে হয়, 'বিধেয়াত্মা' হইতে হয়। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ামাদি অষ্টাঙ্গ যোগ উহার সহায়ক। ধ্যানযোগে সমাধির অবস্থায় অবশ্য কর্মত্যাগ করিতে হয়, কিন্তু উহাতে সিদ্ধিলাভ করিলে সাধক ব্রহ্মভূত হন, জীবন্মুক্ত হন, তখন যে কর্ম হয় তাহাই প্রকৃত নিষ্কাম কর্ম—বিশ্বকর্ম, ব্রহ্মকর্ম (৪।২৩)।

৫। আত্মনা (আত্মাদ্বারা) আত্মানং (আত্মাকে) উদ্ধরেৎ (উদ্ধার করিবে), আত্মানং ন অবসাদয়েৎ (আত্মাকে অবসন্ন করিবে না, অবনত করিবে না); হি (কেননা) আত্মা এব আত্মনঃ বন্ধুঃ (আত্মাই আত্মার বন্ধু), আত্মা এব আত্মনঃ রিপুঃ (আত্মাই আত্মার শত্রু)।

উদ্ধরেৎ—উৎ সংসারাৎ ঊর্ধ্বং হরেৎ, যোগারূঢ়তামাপাদয়েৎ (**শঙ্কর**)—সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিবে, যোগারূঢ় করিবে। **নাবসাদয়েৎ**—নাধো

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬

গময়েৎ (শঙ্কর)—নিম্নদিকে যাইতে দিবে না। **অনাত্মনঃ**—অজিতাত্মনঃ (শঙ্কর, শ্রীধর)—অজিতাত্মার, অজিতেন্দ্রিয়ের।

আত্মার দ্বারাই আত্মাকে বিষয়কূপ হইতে উদ্ধার করিবে, আত্মাকে অবসন্ন করিবে না (নিম্নদিকে যাইতে দিবে না); কেননা, আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার শত্রু। ৫

৬। যেন আত্মনা এব (যে আত্মাদ্বারা) আত্মা জিতঃ (বশীভূত হইয়াছে) আত্মা তস্য আত্মনঃ বন্ধুঃ (আত্মা সেই আত্মার বন্ধু); অনাত্মনঃ তু আত্মা এব (অজিতাত্মার আত্মাই) শত্রুবৎ শত্রুত্বে বর্তেত (শত্রুর ন্যায় অপকার করণে প্রবৃত্ত হয়)।

যে আত্মাদ্বারা আত্মা বশীভূত হইয়াছে, সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু। অজিতাত্মার আত্মা শত্রুবৎ অপকারে প্রবৃত্ত হয়। ৬

এখানে রূপকভাবে বলা হইয়াছে যে, আত্মার দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করিবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আত্মা একটিই এবং সে নিজেই। সুতরাং এ কথার অর্থ এই যে, নিজেই নিজেকে প্রকৃতির বন্ধন হইতে উদ্ধার করিবে, নিজেকে অধোগামী করিবে না, জীব নিজেই নিজের শত্রু, নিজেই নিজের মিত্র। এ কথার তাৎপর্য কি, পরে ব্যাখ্যাত হইল।

যোগের উদ্দেশ্য আত্মার উদ্ধার—পূর্ব শ্লোকে বলা হইল, যোগের প্রধান লক্ষণ সঙ্কল্পত্যাগ ও বিষয়ে অনাসক্তি। এই কথাটিই স্পষ্টীকৃত করিতে যোগের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য কি তাহা এই দুইটি শ্লোকে বলা হইতেছে। সে **উদ্দেশ্যটি** হইতেছে আত্মার উদ্ধার। চিদাত্মা সম, শান্ত, সর্বসঙ্গশূন্য নির্বিকার। কিন্তু তিনি প্রকৃতি বা মায়া-উপহিত হওয়ায় 'আমি, আমার' ইত্যাদি অভিমান করিয়া সঙ্কল্পনিগড়ে আবদ্ধ হন। বিষয়াসক্ত মনই সঙ্কল্প-বিকল্পের ভিত্তিভূমি। মনকে যদি বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করা যায়, তবে উহা আত্মসংস্থ হয়, তখন আত্মা স্ব-রূপে প্রকাশিত হন—'তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপে অবস্থানম্' (যোগসূত্র ১।৩)। ইহাই আত্মার উদ্ধার। অবশ্য ইহা আত্মচেষ্টা ব্যতীত অপরের সাহায্যে হয় না। এই আত্মচেষ্টাই **অভ্যাসযোগ**—'তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ' (যোগসূত্র ১।১৩)। এই আত্মার মধ্যেই, 'আমি'র মধ্যেই শুভ-সঙ্কল্প, বিবেক-বৈরাগ্য, বিচার-বুদ্ধিও আছে, আবার বিষয়-বিমুগ্ধ

অহংবুদ্ধিও আছে। উহার একটি দ্বারা অপরটিকে উদ্ধার করিতে হইবে, বিষয়ে মগ্ন হইতে দিবে না। উহার একটি আমার মিত্র, অপরটি আমার শত্রু। যে 'আমি' অহংবুদ্ধি নাশ করিয়াছে, মনকে বিষয়-বিরক্ত করিয়াছে, সে 'আমি' আমার মিত্র; যে 'আমি'র অহংবুদ্ধি নাশ হয় নাই, মন বিষয় হইতে বিমুক্ত হয় নাই, সে 'আমি' আমার শত্রু। সে বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া শত্রুতাচরণ করিবেই। বস্তুতঃ বিষয়াসক্ত মনই জীবের বন্ধনের কারণ, এবং বিষয়বিমুক্ত মনই তাহার মোক্ষের কারণ—'মন এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধমোক্ষযোঃ।' সুতরাং—

তাবদেব নিরোদ্ধব্যং যাবদ্ধৃদ্‌গতং ক্ষয়ম্।

এতদ্‌জ্ঞানং চ ধ্যানং চ অতোঽন্যো গ্রন্থবিস্তরঃ ॥ —ব্রহ্মবিন্দু উঃ ১।৫

—যে পর্যন্ত মন কূটস্থ চৈতন্যে বিলীন না হয়, সে পর্যন্ত তাহাকে সংযত করিয়া রাখিবে, বিষয় হইতে দূরে রাখিবে, ইহাই জ্ঞান, ইহাই ধ্যানযোগ—ইহাই সারকথা। এতদ্‌ভিন্ন আর যাহা কিছু, সে কেবল গ্রন্থের বিস্তার মাত্র।

রহস্য—আত্মশক্তি ও কৃপাবাদ

প্রঃ। আমাদের শাস্ত্রে ও শাস্ত্রোপদেষ্টৃগণের নিকট দুই রকম ধর্মোপদেশ পাওয়া যায়। কোন শাস্ত্র বলেন, মায়ামুক্ত না হইলে, প্রকৃতির বন্ধন না গেলে, সংসার না ঘুচিলে, তাঁহাকে কিছুতেই পাওয়া যায় না। অন্য শাস্ত্র বলেন, একান্তভাবে তাঁহার শরণ না লইলে, তাঁহাকে না পাইলে, কিছুতেই মায়াবন্ধন ঘুচে না। অনেক সময় এক শাস্ত্রই বা এক উপদেষ্টাই উভয় রকম কথাই বলেন।

মনে করুন, এক পক্ষ বলেন, আগে টাকা না দিলে দলিল লিখিয়া দিব না; অপর পক্ষ বলেন, দলিল লিখিয়া না দিলে টাকা দিব না। উভয়েই যদি নিজের কথা বহাল রাখিতে চান, তবে টাকাও নেওয়া হয় না, দলিলও লেখা হয় না। মায়ামুক্ত না হইলে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না, আবার তাঁহাকে না পাইলে মায়াও ঘুচিবে না, এ উপদেশও পূর্বোক্ত কথার ন্যায়ই বোধ হয়। অজ্ঞ জীব কোন্ পথে যাইবে? ইহার কোন্ কথা সত্য, কোন্‌টি গ্রাহ্য, কোন্‌টি আগে হইবে?

উঃ। উভয় কথাই সত্য, উভয়ই গ্রাহ্য। ইহার আগে পরে নাই। মায়া-মুক্তি ও ঈশ্বর-প্রাপ্তি একই অবস্থা এবং ঠিক এক সময়েই হয়। এই দুই রকম উপদেশ প্রকৃতপক্ষে দুইটি বিভিন্ন মার্গ বা সাধন-পথের সঙ্কেত। যাঁহারা বলেন—মায়া বা অজ্ঞান দূর না হইলে সেই পরতত্ত্ব উপলব্ধ হয় না, তাঁহারা দেন জ্ঞানের

উপদেশ। আর যাঁহারা বলেন—সর্বতোভাবে তাঁহার শরণ না লইলে, তাঁহার কৃপা না হইলে, মায়া দূর হইবে না, তাঁহারা দেন ভক্তির উপদেশ। একটি হইল **জ্ঞানমার্গ, আত্মস্বাতন্ত্র্য ও আত্মশক্তির** কথা, অপরটি হইল **ভক্তিমার্গ, আত্মসমর্পণ ও কৃপাবাদের কথা**। তাই অধ্যাত্ম-শাস্ত্র বলেন—'আত্মানং বিদ্ধি'—আত্মাকে জান, আপনাকে চেন, সর্বদা আত্মস্বরূপ চিন্তা কর, ভাবনা কর, বল— 'সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্।'

অপর পক্ষে, ভক্তিশাস্ত্র বলেন—তুমি মায়ামুগ্ধ জীব, দীন, পাপতাপে ক্লিষ্ট, একমাত্র শ্রীহরিই দীনশরণ, পাপহরণ—একান্তভাবে তাঁহারই শরণ লও, কাতর প্রাণে তাঁহাকে ডাক, বল—

'পাপোঽহং পাপকর্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্বপাপহরো হরি॥'

এস্থলে আত্মার দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করার যে উপদেশ, তাহা জ্ঞানমার্গের উপদেশ। ইহার স্থূল মর্ম এই যে, জীব স্বরূপতঃ নিত্যমুক্ত, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মেরই অংশ, সে মূলতঃ প্রকৃতি-পরতন্ত্র নহে! তাহার স্বাধীনতা-লাভে স্বাতন্ত্র্য আছে। সাধনদ্বারা প্রকৃতির রজস্তমোগুণকে দমন করিয়া শুদ্ধ সত্ত্বগুণের উদ্রেক করিয়া সে প্রকৃতির অতীত হইতে পারে, নিজেকে নিজেই উদ্ধার করিতে পারে। এস্থলে তাহার উপায়স্বরূপ আত্মসংস্থ যোগের বর্ণনা প্রসঙ্গে সেই উপদেশই দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু অন্যত্র ভক্তিমার্গের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, ঈশ্বরই জীবকে যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায় মায়াদ্বারা চালাইতেছেন, জীব সর্বতোভাবে তাহার শরণ লইলে, অনন্যভক্তি-যোগে তাঁহার ভজনা করিলে ঈশ্বরই তাহাকে এমন বুদ্ধিযোগ দেন যাহাদ্বারা সে মায়ামুক্ত হইয়া ভগবান্‌কে পাইতে পারে (১০।১০-১১, ১৮।৬১ ইত্যাদি)। বস্তুতঃ, জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ, গীতায় উভয়ই স্বীকার্য, এবং গীতামতে উহারা পরস্পর-সাপেক্ষ। উভয় মার্গেরই মূল কথা হইতেছে আসক্তি-ত্যাগ, উহা সাধনা-সাপেক্ষ। সাধনা ব্যতীত চিত্ত নির্মল হয় না, চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত ভগবানে ঐকান্তিক নির্ভরতা জন্মে না, ভগবৎকৃপাও লাভ হয় না। শ্রীভগবান্ আমাদের আত্মশক্তির স্ফূরণ করিয়াই কৃপা করেন, কৃপাবাদ নিশ্চেষ্টতার পরিপোষক নহে। (৩।৪৩ ও ১৮।৬১-৬৩ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। ৫-৬

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮

৭। জিতাত্মনঃ (জিতাত্মা, জিতেন্দ্রিয়) প্রশান্তস্য (রাগদ্বেষশূন্য ব্যক্তির) পরমাত্মা, শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু (শীত-গ্রীষ্ম-সুখ-দুঃখে) তথা মানাপমানয়োঃ (এবং মান-অপমানে) সমাহিতঃ (অবিচলিত থাকে)।

জিতেন্দ্রিয়, প্রশান্ত অর্থাৎ রাগদ্বেষশূন্য ব্যক্তির পরমাত্মা শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ, অথবা মান-অপমান প্রাপ্ত হইলেও সমাহিত থাকে (অর্থাৎ অবিচলিতভাবে আপন সম-শান্ত-স্বরূপে অবস্থান করে)। ৭

এ শ্লোকে 'পরমাত্মা' শব্দ আত্মা অর্থেই প্রযুক্ত (তিলক)। আত্মা পরমাত্মারই সনাতন অংশ (১৫।৭), সুতরাং তত্ত্বতঃ একই। দেহে প্রকৃতির গুণের বশীভূত থাকা কালে ইহাকেই জীবাত্মা বলা হয়, কিন্তু জিতেন্দ্রিয়, প্রশান্ত-চিত্ত ব্যক্তি প্রকৃতির গুণ হইতে নির্মুক্ত, সুতরাং তাঁহার নিকট পরমাত্মস্বরূপ প্রতিভাত হন।

পূর্বে বলা হইয়াছে (৬।৫), জিতাত্মা ব্যক্তির আত্মাই বন্ধু, সেই কথাটিই এই শ্লোকে আরও স্পষ্টীকৃত হইল। ৭

৮। জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা (জ্ঞানবিজ্ঞানদ্বারা পরিতৃপ্তচিত্ত), কূটস্থঃ (নির্বিকার), বিজিতেন্দ্রিয়ঃ (জিতেন্দ্রিয়ঃ) সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ (মৃৎখণ্ড পাষাণ ও সুবর্ণে সমদৃষ্টিসম্পন্ন) যোগী যুক্তঃ ইতি উচ্যতে (ঈদৃশ যোগীকে যুক্ত বা যোগসিদ্ধ বলে)।

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা—জ্ঞানম্ ঔপদেশিকম্, বিজ্ঞানম্ অপরোক্ষানুভবঃ, তাভ্যাং তৃপ্তঃ আত্মা চিত্তং যস্য সঃ (শ্রীধর)—গুরুশাস্ত্রোপদেশদ্বারা মার্জিত নির্মল বুদ্ধির নাম জ্ঞান, তত্ত্বপদার্থের প্রত্যক্ষানুভূতির নাম বিজ্ঞান, এই উভয়দ্বারা পরিতৃপ্তচিত্ত। (অপিচ ৭।২ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

যাঁহার চিত্ত শাস্ত্রাদির উপদেশজাত জ্ঞান ও উপদিষ্ট তত্ত্বের প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা পরিতৃপ্ত, যিনি বিষয় সন্নিধানেও নির্বিকার ও জিতেন্দ্রিয়, মৃৎপিণ্ড, পাষাণ ও সুবর্ণখণ্ডে যাঁহার সমদৃষ্টি, ঈদৃশ যোগীকে যুক্ত (যোগসিদ্ধ) বলে। ৮

সুহৃন্মিত্রার্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ ৯
যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০

৯। সুহৃন্মিত্রার্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু (সুহৃৎ, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য ও বন্ধুতে), সাধুষু অপি (সাধুতেও) পাপেষু চ অপি (এবং অসাধুতে) সমবুদ্ধিঃ (সমবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি) বিশিষ্যতে (বিশিষ্ট অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হন)।

সুহৃৎ—প্রত্যুপকার না চাহিয়া যিনি স্বভাবতঃই উপকার করেন। **মিত্র**—স্নেহবশতঃ যিনি উপকার করেন। **বন্ধু**—সম্বন্ধবিশিষ্ট ব্যক্তি, জ্ঞাতিকুটুম্বাদি। **উদাসীন**—বিবদমান উভয়পক্ষের কোন পক্ষই যিনি অবলম্বন করেন না (neutral)। **মধ্যস্থ**—বিবদমান উভয় পক্ষের হিতৈষী। **দ্বেষ্য**—দ্বেষের পাত্র।

সুহৃৎ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, বন্ধু, সাধু ও অসাধু—সকলের প্রতি যাঁহার সমান বুদ্ধি তিনিই প্রশংসনীয়—অর্থাৎ যিনি সর্ববিষয়ে সকলের প্রতি রাগদ্বেষশূন্য, তিনিই শ্রেষ্ঠ। ৯

সর্ববিষয়ে সমচিত্ততাই যোগের শ্রেষ্ঠ ফল। ইহাই পূর্বোক্ত দুইটি শ্লোকে বলা হইল। এই সমচিত্ততা লাভ করা অবশ্য সহজ নহে (৬।৩৩-৩৬)। চঞ্চল মনকে স্থির করিয়া আত্মসংস্থ করার এক বিশিষ্ট উপায় ধ্যানযোগ বা অভ্যাস-যোগ। এই হেতু পরবর্তী শ্লোকসমূহে এই ধ্যানযোগেরই বর্ণনা করা হইয়াছে।

১০। যোগী রহসি স্থিতঃ (নির্জন স্থানে অবস্থান করিয়া) একাকী (সঙ্গশূন্য), যতচিত্তাত্মা (সংযতচিত্ত ও সংযতদেহ), নিরাশীঃ (আকাঙ্ক্ষাশূন্য), অপরিগ্রহঃ (পরিগ্রহশূন্য হইয়া) সততম্ (নিরন্তর) আত্মানং যুঞ্জীত (চিত্তকে সমাহিত করেন)।

যতচিত্তাত্মা—যতং সংযতং চিত্তম্ আত্মা দেহশ্চ যস্য (শঙ্কর, শ্রীধর)। **নিরাশী**—বিষয়ে বীতভৃষ্ণ, অতএব **অপরিগ্রহ**—যোগের প্রতিবন্ধক দ্রব্যাদি সংগ্রহে বিরত।

অষ্টাঙ্গযোগের বর্ণনা—সমাধি অভ্যাসের নিয়ম ১০-২৬

যোগী একাকী নির্জন স্থানে থাকিয়া সংযতদেহ, সংযতচিত্ত, আকাঙ্ক্ষাশূন্য ও পরিগ্রহশূন্য হইয়া চিত্তকে সতত সমাধি অভ্যাস করাইবেন। ১০

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্ ॥ ১১
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১৩
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ১৪

১১-১২। শুচৌ দেশে (পবিত্র স্থানে) স্থিরং (নিশ্চল) ন অত্যুচ্ছ্রিতং (অনতি-উচ্চ) ন অতিনীচং (অনতিনিম্ন) চৈলাজিন-কুশোত্তরম্ (কুশোপরি ব্যাঘ্রাদির চর্ম ও তদুপরি বস্ত্র দ্বারা রচিত) আত্মনঃ আসনং (নিজের আসন) প্রতিষ্ঠাপ্য (স্থাপনপূর্বক) তত্র আসনে উপবিশ্য (সেই আসনে বসিয়া) যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ (চিত্ত ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া সংযত করিয়া) মনঃ একাগ্রং কৃত্বা (মনকে একাগ্র করিয়া) আত্মবিশুদ্ধয়ে (আত্মশুদ্ধির জন্য) যোগং যুঞ্জ্যাৎ (যোগ অভ্যাস করিবে)।

যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ—যতা সংযতা চিত্তস্য ইন্দ্রিয়াণাং চ ক্রিয়া যস্য সঃ। **চৈলাজিনকুশোত্তরম্**—চৈল—বস্ত্র, অজিন—ব্যাঘ্রাদির চর্ম; কুশের উপরে ব্যাঘ্রাদির চর্ম এবং তাহার উপরে বস্ত্র স্থাপন করিয়া রচিত।

পবিত্র স্থানে নিজ আসন স্থাপন করিবে; আসন যেন অতি উচ্চ অথবা অতি নিম্ন না হয়। কুশের উপরে ব্যাঘ্রাদির চর্ম এবং তাহার উপর বস্ত্র পাতিয়া আসন প্রস্তুত করিতে হয়; সেই আসনে উপবেশন করিয়া চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযমপূর্বক মনকে একাগ্র করিয়া আত্মশুদ্ধির জন্য যোগ অভ্যাস করিবে। ১১-১২

এই দুইটি শ্লোকে আসনের নিয়মাদি কথিত হইল। ১১-১২

১৩-১৪। কায়শিরোগ্রীবং (শরীর, মস্তক ও গ্রীবাকে) সমং অচলং ধারয়ন্ (সরলভাবে নিশ্চলভাবে রাখিয়া) স্থিরঃ [সন্] (সুস্থির হইয়া) স্বং নাসিকাগ্রং সংপ্রেক্ষ্য (নিজ নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি রাখিয়া) দিশশ্চ অনবলোকয়ন্ (অন্য কোন দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া) প্রশান্তাত্মা (প্রশান্তচিত্ত) বিগতভীঃ (নির্ভয়) ব্রহ্মচারিব্রতেস্থিতঃ (ব্রহ্মচর্যব্রত অবলম্বন করিয়া) মনঃ

সংযম্য (মনঃসংযমপূর্বক) মচ্চিত্ত (মদ্গতচিত্ত) মৎপরঃ (মৎপরায়ণ [হইয়া]) যুক্তঃ আসীত (সমাধিস্থ হইবে)।

নাসিকাগ্রং সংপ্রেক্ষ্য—টীকাকারগণ বলেন, ঠিক নাসাগ্রই যে অবলোকন করিতে হইবে এরূপ অর্থ নহে, দৃষ্টি এদিক্ ওদিক্ না পড়ে, এই জন্যই নাসাগ্রবর্তী আকাশে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন, ইহার অর্থ ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি রাখিয়া; কেননা নিম্নদিক হইতে ধরিলে নাসাগ্র বলিতে ভ্রূমধ্য বুঝায়। **মৎপর, মচ্চিত্ত**—আমিই একমাত্র প্রিয়, বিষয়াদি নয়—এইরূপ ভাবনাদ্বারা আমাতেই চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া।

শরীর (মেরুদণ্ড), মস্তক ও গ্রীবা সরলভাবে ও নিশ্চলভাবে রাখিয়া সুস্থির হইয়া আপনার নাসাগ্রবর্তী আকাশে দৃষ্টি রাখিবে, এদিক্ ওদিক্ তাকাইবে না; (এইরূপে উপবেশন করিয়া) প্রশান্ত-চিত্ত, ভয়বর্জিত, ব্রহ্মচর্যশীল হইয়া মনঃসংযমপূর্বক মৎপরায়ণ মদ্গতচিত্ত হইয়া সমাধিস্থ হইবে। ১৩-১৪

টীকাকারগণ বলেন, এই শ্লোকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে। (পরে 'রাজযোগ' শীর্ষক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

বিবাহ ও ব্রহ্মচর্য

প্রঃ। এস্থলে যোগাভ্যাসকারীকে 'ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিত' বলা হইয়াছে। তাহা হইলে বিবাহিত জীবনে যোগাভ্যাস বিহিত কিনা?

উঃ। কামোপভোগই যে বিবাহিত জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য তাহা তো পশুজীবন, তাহাতে আর যোগাভ্যাস কিরূপে সম্ভবপর হইবে? কিন্তু মুনি-ঋষিদের মধ্যেও স্বনামখ্যাত অনেকে বিবাহিত ছিলেন এবং সন্তানের জনকও ছিলেন। শাস্ত্রে আছে, বেদ অধ্যাপনান্তে আচার্য শিষ্যকে এইরূপ উপদেশ দিতেছেন—'সত্যং বদ। ধর্মং চর। প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ'—সত্য বলিবে, ধর্মানুষ্ঠান করিবে, সন্তানধারা অবিচ্ছিন্ন রাখিবে—(তৈত্তিঃ উঃ ১।১১।১)। বংশরক্ষার জন্যই বিবাহ করার এইরূপ উপদেশ সমস্ত ধর্মশাস্ত্রেই আছে ('পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা'), এবং ঐ উদ্দেশ্য ব্যতীত কামোপভোগ সর্বশাস্ত্রেই কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। এক্ষণে বিবেচ্য এই, ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিবাহিত জীবনের কতটুকু সময় আবশ্যক?—অতি সামান্য। বাকী সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া সংযমের উপদেশ। এ অনুশাসন সন্ন্যাসধর্মের চেয়ে বড় কম কঠোর নয়, এবং বিষয়ের মধ্যে থাকিয়া এইরূপ

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি॥ ১৫
নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন॥ ১৬

সংযম সাধনে অধিকতর দৃঢ়তার প্রয়োজন, সন্দেহ নাই। এই হেতুই শাস্ত্রে এরূপ উল্লেখ আছে যে, গৃহস্থের পক্ষে অবিহিত কালে স্ত্রী-সম্ভোগে নিবৃত্ত থাকাই ব্রহ্মচর্য ('নান্যদাগচ্ছতে যস্তু ব্রহ্মচর্যন্তু তৎ স্মৃতম্'—মহাভাঃ অনু. ১৬২; মনু, ৩।৪৫, ৫০)। 'অবিহিত সময়ের' অর্থ হইতেছে পুত্রার্থে ভিন্ন অন্য সময়ে। এই হেতু হিন্দুশাস্ত্রে বিবাহের অপর নাম উপযম (সংযম)।

৫।২৪ শ্লোকে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, যোগাভ্যাসকারীর সর্বপ্রকার কামনা নিঃশেষে ত্যাগ করিতে হইবে। ঐটিই মুখ্য কথা, জীবন বিবাহিতই হউক আর অবিবাহিতই হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। উহা সহজ কথা নয়।

গীতোক্ত যোগশিক্ষার এরূপ উদ্দেশ্য নহে যে, নিরন্তর রাজযোগ অভ্যাস করিয়াই সমস্ত জীবন কাটাইয়া দিবে। কিন্তু যে সময়ে যোগাভ্যাস করিবে সে সময়ে সম্পূর্ণ ব্রহ্মচর্যব্রত অবলম্বন করাই কর্তব্য, তাহা বলাই বাহুল্য। তাহাও অতি দীর্ঘকাল হওয়া আবশ্যক, নচেৎ সাফল্য সম্ভবপর নহে। পরবর্তী ১৬-১৭ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৫। যোগী এবং (এই প্রকারে) সদা (নিরন্তর) আত্মানং যুঞ্জন্ (মনকে সমাহিত করিয়া) নিয়তমানসঃ [সন্] (নিশ্চলমনা [হইয়া]) মৎসংস্থাম্ (আমাতে অবস্থিত) নির্বাণপরমাং শান্তিম্ (নির্বাণরূপ পরম শান্তি) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন)।

মৎসংস্থাম্—মদধীনাং (শঙ্কর); ময্যেব সংস্থা একীভাবেনাবস্থানং সমাপ্তির্বা যস্যাস্তাং—আমাতেই যাহার অবস্থিতি বা সমাপ্তি (নীলকণ্ঠ)। মদ্রূপেণ অবস্থিতাং (শ্রীধর): that has its foundation in Me—(*Aurobindo*)। **নির্বাণপরমাং**—নির্বাণং মোক্ষরূপং নিরতিশয় সুখং যস্যাং তাম্।

পূর্বোক্ত প্রকারে নিরন্তর মনঃসমাধান করিতে করিতে মন একাগ্র হইয়া নিশ্চল হয়। এইরূপ স্থিরচিত্ত যোগী নির্বাণরূপ পরম শান্তি লাভ করেন। এই শান্তি আমাতেই স্থিতির ফল। ১৫

১৬। হে অর্জুন, তু (কিন্তু) অত্যশ্নতঃ (অতি ভোজনকারীর) যোগঃ ন অস্তি (যোগ হয় না); ন চ একান্তম্ অনশ্নতঃ (একান্ত অনাহারীরও হয়

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥ ১৭
যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা॥ ১৮

না); অতি স্বপ্নশীলস্য চ ন (অত্যন্ত নিদ্রালুরও হয় না), জাগ্রতঃ এব চ ন (অতি জাগরণশীলেরও হয় না)।

হে অর্জুন, কিন্তু যিনি অত্যধিক আহার করেন অথবা যিনি একান্ত অনাহারী, তাঁহার যোগ হয় না; অতিশয় নিদ্রালু বা অতি জাগরণশীলেরও যোগসমাধি হয় না। ১৬

১৭। যুক্তাহারবিহারস্য (পরিমিত আহার-বিহারকারী) কর্মসু যুক্তচেষ্টস্য (কর্মসমূহে পরিমিত চেষ্টাকারী) যুক্তস্বপ্নাববোধস্য (পরিমিত নিদ্রা ও জাগরণশীল ব্যক্তির) যোগঃ দুঃখহা ভবতি (যোগ দুঃখনিবর্তক হয়)।

যিনি পরিমিতরূপ আহার-বিহার করেন, পরিমিতরূপ কর্মচেষ্টা করেন, পরিমিতরূপে নিদ্রিত ও জাগ্রত থাকেন, তাঁহার যোগ দুঃখনিবর্তক হয়। ১৭

যোগীর আহার, বিহার, কর্ম, নিদ্রা, জাগরণ—সকলই পরিমিত হওয়া প্রয়োজন। এস্থলে কর্মত্যাগের কোন বিধান দেখা যায় না। কিন্তু সন্ন্যাসবাদী টীকাকারগণ কেহ কেহ বলেন—এস্থলে 'কর্ম' অর্থ প্রণবজপাদি বুঝিতে হইবে। কিন্তু 'বিহার' অর্থ কি? উহাতে তো ভ্রমণ, আমোদজনক ক্রীড়া, এই সব বুঝায়। যোগীর ইহাতে প্রয়োজন কি? বস্তুতঃ, আহার-বিহার, নিদ্রা ও কাজ-কর্ম, সকল বিষয়েই মিতাচারী হইতে হইবে। এবং সকল ব্যাপার নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করিয়াও কোন নির্দিষ্ট সময়ে নির্জনে মনঃসংযমের জন্য যোগাভ্যাস করিবে, ইহাই এই শ্লোকের মর্ম বলিয়া বোধ হয়। ১৭

১৮। যদা (যখন) বিনিয়তং চিত্তম্ (বিশেষভাবে সংযত চিত্ত) আত্মনি এব অবতিষ্ঠতে (আত্মাতেই অবস্থিতি করে) তদা (সেই অবস্থায়) সর্ব-কামেভ্যঃ নিঃস্পৃহঃ (সর্ব কামনা হইতে বিরত যোগী পুরুষ) যুক্তঃ ইতি উচ্যতে (যোগসিদ্ধ বলিয়া উক্ত হন)।

যখন চিত্ত বিশেষরূপে নিরুদ্ধ হইয়া আত্মাতেই অবস্থিতি করে, তখন যোগী সর্বকামনাশূন্য হন। ঈদৃশ যোগী পুরুষই যোগসিদ্ধ বলিয়া কথিত হন। ১৮

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯
যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্‌বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ২১

১৯। যথা (যেমন) নিবাতস্থঃ দীপঃ (নির্বাত স্থানে অবস্থিত দীপ) ন ইঙ্গতে (চঞ্চল হয় না), আত্মনঃ যোগং যুঞ্জতঃ (আত্মযোগ-অভ্যাসকারী) যতচিত্তস্য যোগিনঃ (সংযতচিত্ত যোগীর) সা উপমা স্মৃতা (তাহাই দৃষ্টান্ত জানিবে)।

নির্বাত প্রদেশে স্থিত দীপশিখা যেমন চঞ্চল হয় না, আত্মবিষয়ক যোগাভ্যাসকারী সংযতচিত্ত যোগীর অচঞ্চল চিত্তের উহাই দৃষ্টান্ত। ১৯

২০। যত্র (যে অবস্থায়) যোগসেবয়া নিরুদ্ধং চিত্তং (যোগাভ্যাস দ্বারা নিরুদ্ধ চিত্ত) উপরমতে (উপরত, নিষ্ক্রিয় হয়), যত্র চ (এবং যে অবস্থায়) আত্মনা এব (আত্মাদ্বারা) আত্মনি (আত্মাতে) আত্মানং পশ্যন্ (আত্মাকে দেখিয়া) তুষ্যতি (তুষ্টিলাভ করেন) [তাহাকেই যোগ বলিয়া জানিবে]।

যে অবস্থায় যোগাভ্যাসদ্বারা নিরুদ্ধ চিত্ত উপরত (সর্ববৃত্তিশূন্য, নিষ্ক্রিয়) হয় এবং যে অবস্থায় আত্মাদ্বারা আত্মাতেই আত্মাকে দেখিয়া পরিতোষ লাভ হয় (তাহাই যোগশব্দবাচ্য জানিও)। ২০

আত্মনা আত্মানম্ আত্মনি পশ্যন্—আত্মাদ্বারা আত্মাতে আত্মাকে দেখিয়া। 'আত্মদর্শন' বলিতে কি বুঝায়? এস্থলে দ্রষ্টা কে? যোগী পুরুষ। যোগী আর কে, দেহেন্দ্রিয়াদি নয়, সে ত আত্মাই। বস্তুতঃ আত্মাই দ্রষ্টা, আত্মাই দৃশ্য। সুতরাং আত্মা আপনাকেই আপনাতে দেখেন। (১৩।১৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। ২০

২১। যত্র (যে অবস্থায়) অয়ং (যোগী) বুদ্ধিগ্রাহ্যম্ (বুদ্ধিমাত্র দ্বারা গ্রহণীয়) অতীন্দ্রিয়ম্ (ইন্দ্রিয়ের অগোচর) আত্যন্তিকং (অত্যন্ত) যৎ সুখং (যে সুখ) তৎ বেত্তি (তাহা অনুভব করেন), যত্র এব চ স্থিতঃ [সন্] [যে অবস্থায় স্থিত হইলে) তত্ত্বতঃ (আত্মস্বরূপ হইতে) ন চলতি (বিচলিত হন না) [তাহাকেই যোগ বলিয়া জানিবে]।

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥ ২২
তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা॥ ২৩

ইন্দ্রিয়ের অগোচর, কেবল শুদ্ধ বুদ্ধিগ্রাহ্য যে নিরতিশয় সুখ (আত্মানন্দ), যোগী যে অবস্থায় তাহাই অনুভব করেন এবং যে অবস্থায় স্থিতি লাভ করিয়া আত্মস্বরূপ হইতে বিচলিত হন না, তাহাই যোগশব্দবাচ্য জানিবে। ২১

বিষয়সুখ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, আত্মদর্শনজনিত যে সুখ তাহা ইন্দ্রিয়াতীত, বুদ্ধিগ্রাহ্য। এই বুদ্ধি রজস্তমোমলরহিতা, শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা। এই শুদ্ধ সত্ত্বের প্রধান লক্ষণ—'স্বাত্মানুভূতি, পরমাত্মনিষ্ঠা যয়া সদানন্দরসং সমৃচ্ছতি'—(শঙ্করাচার্য, বিবেক-চূড়ামণি ১২১)। ২১

২২। যং লব্ধ্বা (যে অবস্থা লাভ করিয়া) চ [যোগী] অপরং লাভং (অন্য কোন লাভকে) ততঃ অধিকং ন মন্যতে (তাহা অপেক্ষা অধিক বলিয়া বোধ করেন না), যস্মিন্ স্থিতঃ (যাহাতে স্থিতি লাভ করিয়া) গুরুণা দুঃখেন অপি (মহাদুঃখ দ্বারাও) ন বিচাল্যতে (বিচালিত হন না) [তাহাই যোগশব্দবাচ্য জানিবে]।

যে অবস্থা লাভ করিলে যোগী অন্য কোন লাভ ইহা অপেক্ষা অধিক সুখকর বলিয়া বোধ করেন না এবং যে অবস্থায় স্থিতি লাভ করিলে মহাদুঃখেও বিচালিত হন না [তাহাই যোগশব্দবাচ্য জানিবে]। ২২

আত্মানন্দ পরম সুখকর, এমন কোন সুখ নাই যাহা ইহা অপেক্ষা অধিক সুখকর বলিয়া বোধ হইতে পারে, এবং এমন কোন দুঃখ নাই যাহাতে আত্মজ্ঞানীকে বিচালিত করিতে পারে—কেননা, তিনি আত্মারাম, বাহ্য সুখদুঃখের অতীত।

২৩। তং (এইরূপ অবস্থাকেই) দুঃখসংযোগবিয়োগং (দুঃখসংযোগের বিয়োগরূপ) যোগসংজ্ঞিতং (যোগ বলিয়া) বিদ্যাৎ (জানিবে); অনির্বিণ্ণচেতসা (নির্বেদশূন্য চিত্তদ্বারা) নিশ্চয়েন (অধ্যবসায় সহকারে) সঃ যোগঃ যোক্তব্যঃ (সেই যোগ অভ্যাস করা কর্তব্য)।

সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥ ২৪
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥ ২৫

দুঃখসংযোগবিয়োগং—দুঃখৈঃ সংযোগো দুঃখসংযোগঃ, তেন বিয়োগঃ তং (শঙ্কর)=যাহাতে দুঃখসংযোগের বিয়োগ বা ধ্বংস হয় তাহাই—**the putting away of the contact with pain, the divorce of the mind's marriage with grief (*Sri Aurobindo*)**। **নিশ্চয়েন**—অধ্যবসায়েন (শঙ্কর); চিত্তদার্ঢ্যেণ—চিত্তের দৃঢ়তা দ্বারা (শ্রীধর)। **অনির্বিণ্ণচেতসা**—এতাবতাপি কালেন যোগো ন সিদ্ধঃ কিমতঃপরং কষ্টমিত্যনুতাপো নির্বেদঃ, তদ্রহিতেন চেতসা (মধুসূদন)=এত কাল যোগাভ্যাস করিলাম, সিদ্ধিলাভ হইল না, আর কত কাল কষ্ট করিব,—এইরূপ হতাশভাবকে নির্বেদ বলে। এইরূপ নির্বেদশূন্য, শৈথিল্যরহিত চিত্তে যোগাভ্যাস কর্তব্য, নচেৎ সফলতা সম্ভবপর নহে।

এইরূপ অবস্থায় (চিত্তবৃত্তিনিরোধে) দুঃখসংযোগের বিয়োগ হয়, এই দুঃখবিয়োগই যোগশব্দবাচ্য। এই যোগ নির্বেদশূন্যচিত্তে অধ্যবসায় সহকারে অভ্যাস করা কর্তব্য। ২৩

২৪-২৫। সঙ্কল্পপ্রভবান্ (সঙ্কল্পজাত) সর্বান্ কামান্ (**সমস্ত কামনা**) **অশেষতঃ** ত্যক্ত্বা (নিঃশেষরূপে **ত্যাগ করিয়া**) **মনসা** এব (**মনদ্বারাই**) **ইন্দ্রিয়-গ্রামং** (ইন্দ্রিয়সমূহকে) সমন্ততঃ (সমস্ত বিষয় **হইতে**) বিনিয়ম্য (**নিবৃত্ত করিয়া**, প্রত্যাহৃত করিয়া), ধৃতিগৃহীতয়া বুদ্ধ্যা (ধৈর্যযুক্ত বুদ্ধিদ্বারা) **শনৈঃ শনৈঃ** (**ধীরে** ধীরে, সহসা নয়) **উপরমেৎ** (**বিষয় হইতে বিরতি অভ্যাস করিবে**), [এইরূপে] মনঃ **আত্মসংস্থং কৃত্বা** (মনকে আত্মাতে **স্থাপন করিয়া**) কিঞ্চিদপি ন চিন্তয়েৎ (**কিছু চিন্তা করিবে না**)।

সঙ্কল্প ও কামনা—মূলে আছে, 'সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামান্'—সঙ্কল্পজাত কামনা-সমূহকে। গীতায় কোথাও কামনা ত্যাগের কথা, কোথাও সঙ্কল্প ত্যাগের কথা, কোথাও কাম-সঙ্কল্প উভয়ই ত্যাগের কথা বলা হইয়াছে। কার্যতঃ ব্যাপার একই, কিন্তু স্বরূপতঃ **সঙ্কল্প ও কামনার** মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। শাস্ত্রে সঙ্কল্পকে বলা হয় শোভনাধ্যাস—'সঙ্কল্পঃ শোভনাধ্যাসঃ' (আনন্দগিরি, মধুসূদন)। যাহা শোভন বা সুন্দর নয় তাহাকে সুন্দর বলিয়া কল্পনা করার নাম সঙ্কল্প। সত্য,

শিব, সুন্দর এক বস্তুই আছেন, কিন্তু সেই রমণীয়-দর্শন আত্মদেবকে সুন্দর না ভাবিয়া অসুন্দর রমণী-রূপকে ভাবি—ইষ্টদেবের ধ্যান না করিয়া বিষয়-ধ্যান করি—এই যে অসুন্দরে সুন্দরের অধ্যাস বা আরোপ—**ইহাই** সঙ্কল্প, ইহাই অজ্ঞান। এই সঙ্কল্প হইতেই বিষয়ে অভিলাষ জন্মে ; এই বিষয়াভিলাষই কাম। সুতরাং কামনা সঙ্কল্পজাত।

ধৃতিগৃহীতয়া বুদ্ধ্যা—ধৃত্যা ধৈর্যেণ গৃহীতয়া, ধৈর্যেণ যুক্তয়া ইত্যর্থঃ (শঙ্কর)=ধৈর্যযুক্ত বুদ্ধিদ্বারা। **উপরমেৎ**—উপরতি অভ্যাস করিবেন, মনের নিরোধ করিবেন—'cease from mental action.'

সঙ্কল্পজাত কামনাসমূহকে বিশেষরূপে ত্যাগ করিয়া, মনের দ্বারা (চক্ষুরাদি) ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয় ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত করিয়া, ধৈর্যযুক্ত বুদ্ধিদ্বারা মন ধীরে ধীরে নিরুদ্ধ করিবে এবং এইরূপ নিরুদ্ধ মনকে আত্মাতে নিহিত করিয়া (আত্মাকারবিশিষ্ট করিয়া) কিছুই ভাবনা করিবে না। ২৪-২৫

সমাধি অভ্যাস কিরূপে করিতে হয়—তাহাই এস্থলে বলা হইতেছে।

প্রথমতঃ—সর্বপ্রকার কামনা নিঃশেষে ত্যাগ করিতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ—মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ করিতে হইবে। চক্ষুতে দর্শন করিতেছে, কিন্তু মন তাহাতে যোগ দিতেছে না, সুতরাং দেখিয়াও দেখা হইল না। ইহাই মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সংযম। চক্ষু নষ্ট করিলে বা মুদ্রিত করিয়া থাকিলেই ইন্দ্রিয়সংযম হয় না।

তৃতীয়তঃ—তৎপর, ধৃতিসংযুক্ত বুদ্ধিদ্বারা মনকেও অন্তর্মুখী করিয়া ক্রমে ক্রমে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে হইবে। বুদ্ধিই ভাল-মন্দ নিশ্চয় করে, নিত্যানিত্য বিচার করিয়া মনকে সৎপথে চালিত করে, ইহা সাত্ত্বিকী-বুদ্ধি (১৮।৩০)। ধৃতিশক্তি মনকে বহির্মুখী হইতে না দিয়া ভিতরে ধারণ করিয়া রাখে, ইহা সাত্ত্বিকী ধৃতি (১৮।৩৩)। এই ধৃতিসংযুক্ত বুদ্ধি দ্বারা চিত্তকে নিরুদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু 'শনৈঃ শনৈঃ' অর্থাৎ অল্পে অল্পে, ধীরে ধীরে, হঠাৎ নয়। সহসা চিত্তবৃত্তি নিরোধের চেষ্টা করিলে মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা। যোগে হঠকারিতা কর্তব্য নহে।

চতুর্থতঃ—এইরূপে মনকে নিরোধ করিয়া আত্মাতে বিলীন করিতে হইবে। এইরূপে মন নির্মল হইয়া যখন আত্মাকার প্রাপ্ত হইবে, তখনই আত্মস্বরূপ প্রতিভাত হইবে। এই অবস্থায় কোন চিন্তাই থাকিবে না, আত্মচিন্তাও নয়। কারণ চিন্তা থাকিতে মনের অতীত হওয়া যায় না,

এ অবস্থায় ধ্যাতা, ধ্যান, ধ্যেয়—জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়—সবাই এক হইয়া যায়। এক আত্মস্বরূপই থাকে, চিন্তা করিবে কে? কার? তাই ভগবান্ শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন,—'অচিন্ত্যৈব পরং ধ্যানম্'—চিন্তাশূন্যতাই শ্রেষ্ঠ ধ্যান। বস্তুতঃ, আত্মা বা ব্রহ্ম মনের অগোচর, অচিন্ত্য; উহা স্বপ্রকাশ, মন নির্বিষয় হইয়া নির্মল হইলেই উহার স্বরূপ প্রতিভাত হয়।

নৈব চিন্ত্যং ন বাহ্যচিন্ত্যমচিন্ত্যং চিন্ত্যমেব চ।
পক্ষপাতবিনির্মুক্তং ব্রহ্ম সংপদ্যতে তদা॥ —ব্রহ্মবিন্দু উঃ ২৬

—যাহা মনের অগোচর—যেমন নির্গুণ ব্রহ্ম, তাঁহার চিন্তা করা যায় না। আবার যাহা চিন্তা করা যায়, যেমন—বিষয়াদি, তাহাও অতত্ত্ব, অবস্তু বলিয়া চিন্তনীয় নয়, সুতরাং মন যখন আত্মচিন্তা এবং বিষয়চিন্তা, ইহার কোন পক্ষই অবলম্বন করে না, অর্থাৎ সম্পূর্ণ নিরবলম্ব হয়, তখন ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়।

রাজযোগ

যোগ শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। এস্থলে যে যোগের বিষয় বলা হইতেছে, ইহাকে সমাধিযোগ বা নিরোধযোগ বলে—'যোগশ্চিত্ত-বৃত্তিনিরোধঃ'। চিত্ত, অবস্থাভেদে পাঁচ রূপ ধারণ করে। যথা—**ক্ষিপ্ত**—এই অবস্থায় মন কামনাকুলিত হইয়া নানা বিষয়ে ধাবিত হয়; **মূঢ়**—এই অবস্থায় মন তমোগুণাক্রান্ত হইয়া মোহে অভিভূত হইয়া থাকে; **বিক্ষিপ্ত**—এই অবস্থায় মনের চঞ্চলতা থাকিলেও উহা সময় সময় অন্তর্মুখী হইতে চেষ্টা করে, ইহা সাধনার প্রথমাবস্থা। **একাগ্র**—এই অবস্থায় মন লক্ষ্য বিষয়ে সুস্থির হয়; **নিরুদ্ধ**—এই অবস্থায় চিত্ত বৃত্তিশূন্য হইয়া থাকার মত হয়, ইহাই চরম সমাধির অবস্থা। এই অবস্থায়ই আত্ম-স্বরূপ প্রতিভাত হয়। যে ক্রিয়াকৌশলে মনকে আত্মসংস্থ করিয়া আত্মস্বরূপ বিকশিত করা যায়, তাহারই নাম **যোগ**।

যথার্করশ্মিসংযোগাদর্ককান্তো হুতাশনম্।
আবিষ্করোতি নৈকঃ সন্ দৃষ্টান্তঃ স তু যোগিনাম্॥

—যেমন সূর্যকান্তমণিসংযোগে (আতস পাথর—magnifying glass) সূর্যরশ্মিসকল দাহ্যবস্তুতে কেন্দ্রীভূত হইলে উহাকে অগ্নিময় করিয়া তোলে, সেইরূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মন যোগদ্বারা আত্মসংস্থ হইলে উহার স্বস্বরূপ প্রকাশিত করে।

ইহাকে রাজযোগ বা অষ্টাঙ্গ যোগও বলে। উহার অষ্ট অঙ্গ এই—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি।

যম—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ—ইহাদের নাম যম। কায়, মন বা বাক্যদ্বারা কাহারও ক্লেশ উৎপাদন না করার নাম **অহিংসা**।

কর্মণা মনসা বাচা সর্বভূতেষু সর্বদা।
অক্লেশজননং প্রোক্তমহিংসাত্বেন যোগিভিঃ॥

সত্যের নানা মূর্তি—সর্বাবস্থায় সত্য কথা বলা, প্রাণান্তেও প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট না হওয়া, স্বার্থানুরোধে সত্য কথা গোপন না করা, অসত্য ও অধর্মের পক্ষাবলম্বন না করা, প্রাণপণ করিয়াও অধর্মের প্রতিরোধ করা ইত্যাদি নানা ভাবে সত্যানুষ্ঠান করিতে হয়। বস্তুতঃ, সত্যই ধর্ম, সত্যই তপস্যা, সত্যই সিদ্ধি, সত্যই মুক্তির পথ—'সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা ; সত্যমেব জয়তে নানৃতং।' —মুণ্ডক উপনিষদ

অস্তেয়—অর্থ অচৌর্য—'কর্মণা মনসা বাচা পরদ্রব্যেষু নিঃস্পৃহা'—পরদ্রব্য অপহরণ করিবে না, ওকথা মুখে আনিবে না, এরূপ চিন্তাও মনে স্থান দিবে না। কর্মদ্বারা, বাক্যদ্বারা ও মনের দ্বারা সর্বথা মৈথুনত্যাগের নাম **ব্রহ্মচর্য**। স্ত্রী-বিষয়ক সঙ্কল্প, স্মরণ, মনন, আলাপ বা অশ্লীল গ্রন্থপাঠ—এ সকলই মৈথুনাঙ্গ বলিয়া কথিত হয়। কোন অবস্থায়ও কাহারও নিকট হইতে দান, উপহার আদি গ্রহণ না করাকে **অপরিগ্রহ** বলে। দান ইত্যাদি গ্রহণে হৃদয় সঙ্কুচিত হয়, চিত্তের স্বাধীনতা বিনষ্ট হয়, মানুষ হীন হইয়া যায়। অপরিগ্রহের মূলে দুইটি গুণ বিদ্যমান আছে—একটি স্বাবলম্বন, অপরটি বৈরাগ্য। একটি সাংসারিক উন্নতির, অপরটি আধ্যাত্মিক জীবনের মূলভিত্তি।

নিয়ম—শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান—এই কয়েকটিকে নিয়ম বলে। **শৌচ** দ্বিবিধ—বাহ্যশৌচ ও অন্তঃশৌচ। জল-মৃত্তিকাদি দ্বারা যে শৌচ, তাহা বাহ্য শৌচ ; সচ্চিন্তাজনিত নির্মল চিত্তপ্রসাদই অন্তঃশৌচের লক্ষণ। জীবের সুখে মৈত্রী, দুঃখে করুণা, পুণ্যে আনন্দ, পাপে উপেক্ষা—সর্বদা এই ভাবগুলি চিত্তে ধারণা করিতে পারিলে চিত্ত প্রসন্ন থাকে—'মৈত্রীকরুণা-মুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যবিষয়ানাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্' (যোগসূত্র, সমাধি পাদ-১৩।

যথালাভে তৃপ্ত থাকাই **সন্তোষের লক্ষণ**। উপবাসাদি দ্বারা দেহসংযমের নাম **তপস্যা**। কিন্তু কঠোর তপস্যা দ্বারা দেহেন্দ্রিয়াদি শোষণ করা গীতার অনুমোদিত নহে (১৭।৬।১৯)। গীতায় তপঃ শব্দ অপেক্ষাকৃত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কায়িকাদি ভেদে উহা ত্রিবিধ (১৭।১৪-১৯)। মন্ত্রজপ,

বেদপাঠ বা ধর্মশাস্ত্রাদির অধ্যয়নকে **স্বাধ্যায়** বলে। মন্ত্রজপ ত্রিবিধ—বাচিক, উপাংশু ও মানস জপ। সকলেই শুনিতে পায় এরূপ উচ্চৈঃস্বরে যে জপ করা হয় তাহা বাচিক জপ; যে জপে কেবল ওষ্ঠস্পন্দন হয়, শব্দ শুনা যায় না, তাহাই উপাংশু জপ; যে জপে শব্দ উচ্চারিত হয় না, কেবল মনে মনে জপ করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রের অর্থ ও রহস্য চিন্তা করা হয়, তাহা মানস জপ। মন্ত্রার্থ অবগত না হইয়া জপ করিলে সম্যক্ ফল লাভ হয় না—'যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্যবত্তরং ভবতি' (ছান্দোগ্য)। **ঈশ্বর-প্রণিধান** বলিতে বুঝায় স্মরণ-মননাদি ঈশ্বরোপাসনা (স্বামী বিবেকানন্দ) অথবা ঈশ্বরে সর্বকর্ম সমর্পণ (ব্যাসভাষ্য)।

পূর্বোক্ত যমনিয়মের অভ্যাস নৈতিক চরিত্র গঠনের শ্রেষ্ঠ উপায় এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির ভিত্তিস্বরূপ। কেবল যোগসাধকের নয়, সকল শিক্ষার্থীর উহাতে প্রয়োজন। মহাত্মা গান্ধীর প্রতিষ্ঠিত সত্যাগ্রহাশ্রমে বিদ্যার্থীদের এগুলি অভ্যাস করিতে হইত। রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার প্রচারিত অহিংসা-নীতি (non-violence) ও সত্যাগ্রহাদি সুপরিচিত। প্রশ্ন হইতে পারে, স্বপক্ষের শক্তিসঞ্চয়, বিপক্ষের প্রতিরোধ ইত্যাদি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন পক্ষে অহিংসাদি যোগাঙ্গের ফলোপধায়কতা কি? উত্তর এই যে, সত্য-অহিংসাদির অভ্যাসে সম্যক্ সিদ্ধ হইলে যে ফললাভ হয়, তাহাদ্বারাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। উহাই যোগবল বা আত্মশক্তি। যেমন যোগশাস্ত্রে আছে, 'অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ'—যিনি অহিংসা সাধনে চরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহার সম্মুখে সকল প্রাণীই বৈরভাব ত্যাগ করে, যেমন তপোবনে ব্যাঘ্র হরিণ একত্র ক্রীড়া করে। অহিংসার প্রভাবে হিংস্র বন্যপশুও যখন হিংসা ত্যাগ করে, তখন অত্যাচারী নরপশু হইলেও অহিংসা ও ত্যাগের প্রভাবে তাঁহার ভাবান্তর (change of heart) অনিবার্য। আবার শাস্ত্রে আছে, "সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বং"—যখন সত্য-ব্রত সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন কর্ম না করিয়াও ফললাভ হইয়া থাকে। এইরূপ সত্যব্রত যোগী যদি কাহাকেও বলেন—'তুমি রোগমুক্ত হও', অমনি সে রোগমুক্ত হইবে। মহাত্মা গান্ধী এই সকল শাস্ত্রবাক্য অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতেন, তাই তিনি বলিতেন, এ আন্দোলনের মূল কথা আত্মত্যাগ ও আত্মশুদ্ধি (self-sacrifice and self-purification)।

আসন—যাহাতে অনেকক্ষণ স্থিরভাবে স্বচ্ছন্দে বসিয়া থাকা যায়, তাহার নাম আসন—'স্থিরসুখমাসনম্'—(যোগসূত্র, সাধন পাদ, ৪৬)। যোগশাস্ত্রে

বহুবিধ আসনের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে সিদ্ধাসন, পদ্মাসন, সিংহাসন ও ভদ্রাসন—এই চারিটি প্রধান। স্বস্তিক আসন সর্বাপেক্ষা সহজ।

'আসন সম্বন্ধে এইটুকু বুঝিলেই যথেষ্ট হইবে যে বক্ষঃস্থল, গ্রীবা ও মস্তক সমান রাখিয়া শরীরটিকে বেশ স্বচ্ছন্দভাবে রাখিতে হইবে।'—স্বামী বিবেকানন্দ।

প্রাণায়াম—প্রাণায়ামের তিনটি অঙ্গ—(১) রেচক (বাহিরে শ্বাস ত্যাগ), (২) পূরক (ভিতরে শ্বাস গ্রহণ), (৩) কুম্ভক (বায়ুকে শরীরের মধ্যে অথবা বাহিরে নিরুদ্ধ করিয়া রাখা)। এই সকল প্রক্রিয়া সদ্‌গুরু-উপদেশগম্য (৪।২৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

"বাহ্য ও অন্তর্জগতের সমুদয় শক্তি যখন তাহাদের মূলাবস্থায় থাকে তখন তাহাকেই প্রাণ বলে। এই প্রাণই জগতে নানাপ্রকার শক্তিরূপে পরিণত হইয়া থাকে। দেহমধ্যে যে শক্তি স্নায়ুমণ্ডলীর ভিতর দিয়া মাংসপেশীগুলির নিকট যাইতেছে এবং যাহা ফুস্‌ফুস্‌কে সঞ্চালন করিতেছে, তাহাই প্রাণ। প্রাণায়াম সাধনে আমাদিগকে উহাই বশে আনিতে হইবে।" —(স্বামী বিবেকানন্দ)

প্রত্যাহার—বিষয়ে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়সমূহের বলপূর্বক প্রত্যাকর্ষণের নাম প্রত্যাহার।

ধারণা—ধ্যান—সমাধি—হৃৎপদ্মে, ভ্রূমধ্যে, নাসাগ্রে বা কোন দিব্য মূর্তিতে চিত্ত আবদ্ধ রাখার নাম **ধারণা**। সাধারণতঃ যোগশাস্ত্রে ধারণার ছয়টি স্থান নির্দিষ্ট করা হয়। উহাদিগকে ষট্‌চক্র বলে। যে বিষয়ে চিত্তকে ধারণা করা যায় সেই বিষয়ে অবিচ্ছিন্ন তৈল-ধারার ন্যায় চিত্তের একতান-প্রবাহের নাম **ধ্যান**। ধ্যানের পরিপক্ক অবস্থা **সমাধি**। সমাধি দ্বিবিধ—সম্প্রজ্ঞাত বা সবীজ সমাধি এবং অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্বীজ সমাধি। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে ধ্যেয় বস্তুর সম্যক্ জ্ঞান থাকে। এ অবস্থায় চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় না, উহা দমিত হইয়া বীজরূপে লুপ্ত থাকে মাত্র। এই জন্য উহাকে সবীজ সমাধি বলে। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্তবৃত্তি একেবারে তিরোহিত হয়, সমুদয় মানসিক ক্রিয়ার বিরাম হয়, কেবল সংস্কারমাত্র অবশিষ্ট থাকে; ইহাই নিরোধ সমাধি।

অষ্টাঙ্গ যোগ ও গীতোক্ত যোগ—ধারণার পরিপক্ক অবস্থা ধ্যান, ধ্যানের পরিপক্ক অবস্থা সমাধি (ধারণা, ধ্যান, সমাধি—এই তিনটি ক্রমে এক বস্তু সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইলে উহাকে 'সংযম' বলে)—ত্রয়মেকত্র সংযমঃ—(যোগসূত্র)। এই তিনটিই যোগের অন্তরঙ্গ-সাধন, অপরগুলি বহিরঙ্গ-সাধন—'ত্রয়মন্তরঙ্গং পূর্বেভ্যঃ' (যোগসূত্র)। যম ও নিয়ম চিত্তশুদ্ধির উপায়; উহা সকল সাধনার

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬
প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ২৭

ভিত্তিস্বরূপ। আসন, প্রাণায়াম, মনঃ-সংযমের সহায়ক শারীরিক প্রক্রিয়া। এই সকল গীতাতে সাধারণভাবে স্থানে স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু যোগাধ্যায়ে প্রাণায়ামের উল্লেখ নাই—অন্যত্র আছে। 'যোগশাস্ত্রের পিতাস্বরূপ পতঞ্জলি এই প্রাণায়াম সম্বন্ধে কিছু বিশেষ বিধান দেন নাই। তাঁহার মতে, উহা চিত্তবৃত্তি নিরোধের বিবিধ উপায়সমূহের অন্যতম উপায় মাত্র। কিন্তু তিনি উহার উপর বিশেষ ঝোঁক দেন নাই। কিন্তু পরবর্তী কালে ইহা হইতেই প্রাণায়াম নামক বিশেষ বিদ্যার উৎপত্তি হইয়াছে'।—(স্বামী বিবেকানন্দ) কিন্তু যোগসিদ্ধ সদ্‌গুরুর অভাবে এই বিদ্যাও লুপ্তপ্রায় হইয়া প্রাণহীন আসন-মুদ্রাদির অনুষ্ঠানমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে। অনেকে মনে করেন, যোগ বলিতে ঐ সকল বুঝায় এবং উহাতেই সর্বার্থসিদ্ধি হয়।

প্রকৃতপক্ষে, ধ্যান ও সমাধিই যোগের মূল কথা—গীতায় উহাই বিশেষরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু কেবল এই সমাধিযোগেই গীতার পূর্ণাঙ্গ সাধনা হয় না, গীতোক্ত পূর্ণাঙ্গ যোগে কর্ম, ধ্যান. জ্ঞান, ভক্তি এই চারিটিরই সমন্বয়। (অধ্যায়ের পরে 'গীতোক্ত যোগী ও যোগধর্ম' শীর্ষক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য, বিবৃতি-সূচী দ্রঃ)।

২৬। চঞ্চলম্ অস্থিরং মনঃ (চঞ্চল, অস্থির মন) **যতঃ যতঃ নিশ্চরতি** (যে যে বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়), **ততঃ ততঃ, এতৎ নিয়ম্য** (সেই সেই বিষয় হইতে ইহাকে প্রত্যাহার করিয়া) **আত্মনি এব বশং নয়েৎ** (আত্মাতেই স্থির করিবে)।

চঞ্চলং অস্থিরং—স্বভাবতঃ চঞ্চল, অতএব ধাবমান হইলেও অস্থির (শ্রীধর)।

মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, অতএব অস্থির হইয়া উহা যে যে বিষয়ে ধাবিত হয়, সেই সেই বিষয় হইতে উহাকে প্রত্যাহার করিয়া আত্মাতেই স্থির করিয়া রাখিবে। ২৬

যোগশাস্ত্রে এই প্রক্রিয়াকে **প্রত্যাহার** বলে।

২৭। প্রশান্তমনসং (প্রশান্তচিত্ত), **শান্তরজসং** (রজোগুণজনিত-বিক্ষেপশূন্য) **অকল্মষং** (নিষ্পাপ, তমোগুণজনিত লয়শূন্য) **ব্রহ্মভূতম্** (ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত) **এনং যোগিনম্** (এই যোগীকে) **উত্তমং সুখম্ উপৈতি হি** (উত্তম সুখ আশ্রয় করে)।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥ ২৮
সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥ ২৯
যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥ ৩০

শান্তরজসং—শান্তং বিক্ষেপকং রজো যস্য তং—(মধুসূদন)—চিত্তবিক্ষেপের কারণ রজোগুণ যাহার শান্ত হইয়াছে। **অকল্মষম্**—ন বিদ্যতে লয়হেতুস্তমো যস্য তং (মধুসূদন)—তমোগুণ-জনিত অজ্ঞানতা, অথবা চিত্তলয়ের কারণ নিদ্রাদি যাহার অপগত হইয়াছে; অথবা ধর্মাধর্মবিবর্জিতম্ (শঙ্কর)—জ্ঞানী মুক্ত পুরুষ ধর্মাধর্মরূপ বিধিনিষেধের অতীত।

যোগসিদ্ধির ফলে ব্রাহ্মীস্থিতি—সমদর্শন, সর্বভূতে ভগবদ্ভাব ২৭-৩২

এইরূপ যোগসিদ্ধ পুরুষ চিত্তবিক্ষেপক রজোগুণবিহীন এবং চিত্তলয়ের কারণ তমোগুণ বর্জিত হইয়া ব্রহ্মভাব লাভ করেন, ঈদৃশ প্রশান্তচিত্ত যোগীকে নির্মল সমাধি-সুখ আশ্রয় করে। ২৭

যোগসিদ্ধির ফল নির্মল ব্রহ্মানন্দ ও সর্বত্র সমত্ববুদ্ধি। তাহাই এই শ্লোকে ও পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে বলা হইতেছে।

২৮। এবম্ (এইরূপে) আত্মানং (মনকে) সদা যুঞ্জন্ (সর্বদা সমাহিত করিয়া) বিগতকল্মষঃ যোগী (নিষ্পাপ যোগী) সুখেন (অনায়াসে) ব্রহ্মসংস্পর্শম্ অত্যন্তং সুখম্ (ব্রহ্মানুভবরূপ নিরতিশয় সুখ) অশ্নুতে (লাভ করেন)।

ব্রহ্মসংস্পর্শম্ সুখম্—ব্রহ্মণঃ সংস্পর্শঃ সাক্ষাৎকারঃ তদেব সুখম্—ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ নিত্য সুখ।

-এইরূপে সদা মনকে সমাহিত করিয়া নিষ্পাপ হওয়ায় যোগী ব্রহ্মানুভবরূপ নিরতিশয় সুখ লাভ করেন। ২৮

২৯। যোগযুক্তাত্মা (যোগে সমাহিত পুরুষ) সর্বত্র সমদর্শনঃ (সর্বত্র সমদর্শী হইয়া) আত্মানং (আত্মাকে) সর্বভূতস্থং (সর্বভূতস্থিত) সর্বভূতানি চ (এবং সর্বভূতকে) আত্মনি (আত্মাতে) ঈক্ষতে (দর্শন করেন)।

এইরূপ যোগযুক্ত পুরুষ সর্বত্র সমদর্শী হইয়া আত্মাকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে আত্মাতে দর্শন করিয়া থাকেন। ২৯

৩০। যঃ মাং সর্বত্র পশ্যতি (যিনি আমাকে সর্বত্র দেখেন) সর্বং চ ময়ি

পশ্যতি (এবং সকলই আমাতে দেখেন) অহং তস্য ন প্রণশ্যামি (আমি তাহার অদৃশ্য হই না), স চ মে ন প্রণশ্যতি (তিনিও আমার অদৃশ্য হন না)।

যিনি আমাকে সর্বভূতে অবস্থিত দেখেন এবং আমাতে সর্বভূত অবস্থিত দেখেন, আমি তাঁহার অদৃশ্য হই না, তিনিও আমার অদৃশ্য হন না ।৩০

রহস্য—যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে

প্রঃ। ২৯ শ্লোকে ও ৩০ শ্লোকে অর্থগত পার্থক্য কি ? ২৯শ শ্লোকে বলা হইয়াছে, 'যোগী আত্মাকে সর্বভূতে দেখেন এবং সর্বভূতকে আত্মাতে দেখেন'; ৩০শ শ্লোকে বলা হইল, 'যিনি আমাকে সর্বভূতে দেখেন এবং আমাতে সর্বভূত দেখেন, আমি তাঁহার অদৃশ্য হই না' ইত্যাদি। কথা একই, তবে পূর্ব শ্লোকের 'আত্মা'র স্থলে পরের শ্লোকে আছে 'আমি'—এই মাত্র পার্থক্য। এই 'আমি' ত আত্মা ? তবে পুনরুক্তি কেন ?

উঃ। কথাটা ঠিকই। বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য। তবে ব্রহ্ম ও পুরুষোত্তম তত্ত্ব সম্বন্ধে পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে তাঁহা হৃদয়ঙ্গম করিলে আর এ সংশয় বোধ হয় উপস্থিত হইত না, সে স্থলেও এইরূপ প্রশ্নই উপস্থিত হইয়াছিল (৫।২৯ ব্যাখ্যা দ্রঃ)। কথা এই—'আমি' আত্মা বটেন, কেননা, আত্মরূপে তিনিই সর্বভূতে অবস্থিত, কিন্তু কেবল আত্মাই আমি নহেন, কেননা, আত্মভাবে তিনি নামরূপবিবর্জিত অব্যক্তস্বরূপ—কিন্তু সগুণ-বিভাবে তাঁহার কত নাম,—কত রূপ !—তিনি বিশ্বরূপ, তাঁহার সহস্র নাম।—তিনি ভক্তজন-প্রাণধন সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ—লীলাবশে অর্চা, বিভব (অবতার), ব্যূহাদি সকলই তিনি। তিনি তো কেবল নিঃসঙ্গ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম নন, তিনি সর্বলোকমহেশ্বর, সর্বভূতের সুহৃৎ, ভক্তের ভগবান্। ভাগবত শাস্ত্রের মূল কথা এই যে, জীবের যখন সর্বভূতে আত্মদর্শন লাভ হয়, তখনই তাঁহার ভগবানের সমগ্র স্বরূপ অধিগত হয় এবং তাহাতে পরাভক্তি জন্মে ('মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্' ১৮।৫৪)। তখন ভক্তে ও ভগবানে এক অচ্ছেদ্য নিত্য মধুর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। অধ্যাত্মশাস্ত্রমতে আত্ম-দর্শনই মোক্ষ, উহাই পরম পুরুষার্থ—ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, এই চতুর্বর্গের বা চারিটি পুরুষার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। কিন্তু ভাগবত শাস্ত্রমতে মুক্তির উপরেও আর একটি পুরুষার্থ আছে যাহাকে বলে পঞ্চম পুরুষার্থ, তাহা হইতেছে প্রেমভক্তি ('আত্মারামশ্চ মুনয়ো…কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তি-মিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ'—ভাগবত ১।৭।১০)। এই যে মধুর সম্বন্ধ, এই যে আকর্ষণ, ইহা উভয়তঃ ভগবানের প্রতি ভক্তের যেরূপ আকর্ষণ, ভক্তের প্রতিও

ভগবানের সেইরূপ আকর্ষণ। ভক্তিশাস্ত্র বলেন, 'অহং ভক্তপরাধীনঃ'—কি মধুর কথা! তাই শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—আমার ভক্ত কখনও আমাকে হারান না, আমিও আমার ভক্তকে কখনও হারাই না। আমার ভক্ত সর্বত্র আমাকেই দেখেন এবং আমাতে সমস্ত দেখেন। তিনি জগতের দিকে তাকাইলে জগৎময় আমার মূর্তিই অনুভব করেন—তাঁহার 'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে' ('শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত')। আবার আমার দিকে তাকাইলে তিনি দেখেন আমিই সব, আমাতেই সব—

অব্ধি অপার স্বরূপ মম, লহরী বিষ্ণু মহেশ।
বিধি রবি চন্দা বরুণ যম, শক্তি, ধনেশ, গণেশ॥

—অপার সমুদ্রে যেমন তরঙ্গমালা, সেইরূপ বিধি, বিষ্ণু, শিব, শক্তি, রবি, চন্দ্র, বরুণ, যমাদি সকলই আমাতেই ভাসিতেছে। তখন তিনি আমার পরিচ্ছিন্ন মূর্তি সম্মুখে দেখিয়াও শরতল্পশায়ী ভীষ্মদেবের ন্যায় সর্বস্বরূপ রূপেই আমার স্তব-স্তুতি করেন—

যস্মিন্ সর্বং যতঃ সর্বং যঃ সর্বং সর্বতশ্চ যঃ।
যশ্চ সর্বময়ো নিত্যং তস্মৈ সর্বাত্মনে নমঃ॥

—ভীষ্মস্তবরাজ, শান্তিপর্ব ৪৭।৮৩

এখন দেখ, পূর্ব শ্লোকে ও এই শ্লোকে পার্থক্য কি। পূর্ববর্তী শ্লোকে যোগীর আত্মদর্শনের কথা বলা হইয়াছে, এই শ্লোকে যোগী ভক্তের ভগবদ্দর্শনের কথা বলা হইল। আত্মদর্শনই যদি গীতার শেষ কথা হইত, তবে ২৯শ শ্লোকেই এই যোগাধ্যায় শেষ হইত। ২৯শ শ্লোকে যে সর্বভূতে আত্মদর্শন-রূপ মোক্ষের কথা বলা হইয়াছে—ঠিক এইরূপ কথাই উপনিষদে, মহাভারতের মোক্ষপর্বাধ্যায়ে এবং ধর্মশাস্ত্রাদিতে পাওয়া যায় (কৈবল্য উঃ ১।১০; ঈশ ৬; মহা শাং ২৬৮।২৩, মনু ১২।৯৬ ইত্যাদি); কিন্তু এই পরম জ্ঞান ও পরা ভক্তি যে একই বস্তু, তাহা কেবল গীতা ভাগবত আদি ভাগবত শাস্ত্রের গ্রন্থেই দেখা যায়। অধ্যাত্মশাস্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যামতে, জ্ঞানলাভ হইলে ভক্তিপ্রবাহ রুদ্ধ হইয়া যায়, কর্ম বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু ভাগবত শাস্ত্রমতে তখন ভক্তি বিশুদ্ধা হইয়া নির্গুণত্ব প্রাপ্ত হয়, কর্ম নিষ্কাম হইয়া ভাগবত কর্মে পরিণত হয়। গীতোক্ত যোগী কেবল আত্মারাম নন, তিনি আবার ভক্তোত্তম, তিনি বিশ্বময় পুরুষোত্তমকে দেখেন—সর্বভূতে বিশ্বেশ্বরকে দেখিয়া বিশ্বপ্রেমে পুলকিত হইয়া বিশ্বকর্মেই জীবনক্ষেপ করেন। গীতোক্ত যোগের উহাই অমৃতময় ফল। পরবর্তী শ্লোকদ্বয় এবং এই অধ্যায়ের শেষ দুই শ্লোকে এই কথাটি আরও স্পষ্টীকৃত হইবে।

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥ ৩১

৩১। যঃ (যিনি) সর্বভূতস্থিতং মাম্ (সর্বভূতস্থিত আমাকে) একত্বম্ আস্থিতঃ (সাম্যে অবস্থিত থাকিয়া, সর্বভূতে ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া) ভজতি (ভজনা করেন, প্রীতি করেন), সর্বথা বর্তমানঃ অপি (যে কোন অবস্থায় বর্তমান থাকিয়াও) সঃ যোগী ময়ি বর্ততে (সেই যোগী আমাতেই অবস্থিত থাকেন)।

যে যোগী সমত্ববুদ্ধি অবলম্বনপূর্বক সর্বভূতে ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া সর্বভূতস্থিত আমাকে ভজনা করেন, তিনি যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন, আমাতেই অবস্থান করেন। ৩১

জীবে প্রেম, স্বার্থত্যাগ, ভক্তি ভগবানে—এই তিনই এক—আত্মজ্ঞান ব্যতীত স্বার্থত্যাগ নাই, কেননা, 'আমিত্ব' 'মমত্ব'-বোধ থাকিলে প্রকৃত স্বার্থত্যাগ হয় না, স্বার্থত্যাগ ব্যতীত জীবে প্রেম নাই, জীবে প্রীতি ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি নাই। তাই আত্মজ্ঞানের উপদেশ দিয়া শ্রীভগবান্ এখন লোক-প্রীতি ও ভগবদ্ভক্তির উপদেশ দিতেছেন। এই শ্লোকে নিম্নোক্ত কয়েকটি কথা লক্ষ করা প্রয়োজন—

(১) যঃ একত্বম্ আস্থিতঃ—যিনি একত্বে স্থিত হইয়া, অর্থাৎ সর্বভূতে একমাত্র আমিই আছি এইরূপ একত্ব বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া।

(২) সর্বভূতস্থিতং মাং ভজতে—সকলের মধ্যে যে আমি আছি সেই আমাকেই ভজনা করেন, অর্থাৎ সর্বভূতেই নারায়ণ আছেন এই জানিয়া নারায়ণজ্ঞানে সর্বভূতে প্রীতি করেন, সর্বভূতের সেবা করেন (who loves God in all)।

(৩) সর্বথা বর্তমানোঽপি—তিনি যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন অর্থাৎ তিনি নির্জনে গিরিকন্দরে ধ্যানস্তিমিতনেত্রে সমাধিস্থ হইয়াই থাকুন অথবা সংসারে সংসারী সাজিয়া সংসার-কর্মই করুন, তিনি শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ পালন করুন বা না-ই করুন, এমন কি লোকদৃষ্টিতে তিনি আমার পূজার্চনা করুন বা না-ই করুন, তথাপি—

(৪) স যোগী ময়ি বর্ততে—তিনি আমাতেই থাকেন অর্থাৎ তাঁহার চিত্ত আমাতেই নিত্যযুক্ত থাকে, তাঁহার ইচ্ছা আমারই ইচ্ছায়, তাঁহার কর্ম আমারই কর্মে পরিণত হয়। তিনি নিত্য সমাহিত, নিত্যমুক্ত, জ্ঞানে মদ্ভাবপ্রাপ্ত, কর্মে

মৎকর্মকৃৎ, ভক্তিতে মদ্গতচিত্ত। তত্ত্বজ্ঞান ও সমদর্শনই সমাধি, কেবল তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থানই সমাধি নহে।

"আমাকে ভজনা করা" এবং "সর্বভূতস্থ আমাকে ভজনা করা"—এই দুই কথার মধ্যে কি পার্থক্য তাহা প্রণিধানযোগ্য। এই কথাটি শ্রীমদ্‌ভাগবতে নির্গুণভক্তিতত্ত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে অতি স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে—

অহং সর্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্যঃ কুরুতেঽর্চাবিড়ম্বনম্॥
যো মাং সর্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥
অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে।
নৈব তুষ্যেঽর্চিতোঽর্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ॥
অথ মাং সর্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্।
অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাঽভিন্নেন চক্ষুষা।

(শ্রীমদ্ভাগবত, ৩য় স্কন্ধ, ২৯ অঃ ২১।২২।২৪।২৭)

—আমি সর্বভূতে ভূতাত্মস্বরূপে অবস্থিত আছি। অথচ সেই আমাকে (অর্থাৎ সর্বভূতকে) অবজ্ঞা করিয়া মনুষ্য প্রতিমাদিতে পূজারূপ বিড়ম্বনা করিয়া থাকে। সর্বভূতে অবস্থিত আত্মা ও ঈশ্বর আমাকে উপেক্ষা করিয়া যে প্রতিমাদি ভজনা করে সে ভস্মে ঘৃতাহুতি দেয়। যে প্রাণীগণের অবজ্ঞাকারী, সে বিবিধ দ্রব্যে ও বিবিধ ক্রিয়াদ্বারা আমার প্রতিমাতে আমার পূজা করিলেও আমি তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হই না। সুতরাং মনুষ্যের কর্তব্য যে, আমি সর্বভূতে আছি ইহা জানিয়া সকলের প্রতি সমদৃষ্টি, সকলের সহিত মিত্রতা ও দান-মানাদির দ্বারা সকলকে অর্চনা করে। নচেৎ—

"তবে মিছে সহকার শাখা তবে মিছে মঙ্গল কলস।"

তবেই হইল—সর্ব জীবের সেবাই ঈশ্বরের অর্চনা। বিশ্বপ্রেমই ঈশ্বরে ভক্তি। অবশ্য, ইষ্টবস্তুর উপাসনা আবশ্যক নয়, নিষিদ্ধও নয়। এই স্থলেই একথাও আছে—পুরুষ যে পর্যন্ত সর্বভূতস্থিত আমাকে আপনার হৃদয়ের মধ্যে জানিতে না পারে, সে পর্যন্ত প্রতিমা প্রভৃতিতে আমার অর্চনা করিবে (ভাঃ ৩।২৯।২৫); সুতরাং সর্বদা মনে রাখিতে হইবে প্রতিমাতে কাহার অর্চনা হইতেছে এবং সে অর্চনার উদ্দেশ্য কি। উহা বিস্মৃত হইয়া যদি প্রতীককেই ঈশ্বর করিয়া তুলি, তবে উহা জড়োপাসনায় পরিণত হয় এবং সর্বভূতস্থিত তিনি চিরকালই দূরে থাকেন।

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥ ৩২

পূর্বোক্ত কথাগুলি নির্গুণা ভক্তির সাধনাঙ্গ বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে। বিষ্ণু পুরাণে দেখি, ভক্তরাজ প্রহ্লাদও ঠিক এই কথাই বলিতেছেন—

বিস্তারঃ সর্বভূতস্য বিষ্ণোর্বিশ্বমিদং জগৎ।
দ্রষ্টব্যমাত্মবৎ তস্মাদভেদেন বিচক্ষণৈঃ॥
সর্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত্য সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য॥—বিষ্ণু পুঃ ১।১৭।৮৪।৯০

—হে দৈত্যগণ, এই বিশ্বজগৎ বিষ্ণুর বিস্তারমাত্র। তোমরা সকলকে আপনার সঙ্গে অভেদ দেখিও। এইরূপ সমত্বদর্শনই ঈশ্বর-আরাধনা।

ইহাই বেদান্তে ব্রহ্মজ্ঞান। ইহাই যোগীর সমদর্শন। ইহাই কর্মীর নিষ্কাম কর্ম, ইহাই ভক্তের নির্গুণা ভক্তি। এই শ্লোকটিতে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি যোগের অপূর্ব সমন্বয়। ইহাই গীতোক্ত পূর্ণাঙ্গযোগ। তাই শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছেন, এই শ্লোকটিকে সমগ্র গীতার চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

Whoever loves God in all and whose soul is founded upon the divine oneness, however he lives and acts, lives and acts in God—that may almost be said to sum up the whole final result of the Gitā's teaching. —*Sree Aurobindo*

ঈশ্বর সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা এই, তিনি জীব ও জগৎ হইতে স্বতন্ত্র। তিনি জগতের পালনকর্তা, শাসনকর্তা। তিনি প্রার্থনা মঞ্জুর করেন, দণ্ড পুরস্কার দেন, সকলকে রক্ষা করেন। সুতরাং সমাজরক্ষক পার্থিব রাজার প্রতি যেমন আমাদের একটি কর্তব্য আছে, সেইরূপ জগৎরক্ষক ঈশ্বরের প্রতিও আমাদের একটি কর্তব্য আছে। সেই কর্তব্য হইতেছে—তাঁহাকে ভক্তি করা, ধন্যবাদ দেওয়া ইত্যাদি। বস্তুতঃ, সকল ধর্মেই, সকল সমাজেই, ঈশ্বরের ধারণা কতকটা এইরূপ। "কিন্তু হিন্দুর ঈশ্বর সেরূপ নহেন। তিনি সর্বভূতময়, তিনি সর্বভূতের অন্তরাত্মা। কোন মনুষ্য তাঁহা ছাড়া নাই। মনুষ্যকে না ভালবাসিলে তাঁহাকে ভালবাসা হইল না। যতক্ষণ না বুঝিতে পারিব যে, সকল জগৎই আমি, সর্বলোকে আমাতে অভেদ, তত ক্ষণ আমার জ্ঞান হয় নাই, ভক্তি হয় নাই, প্রীতি হয় নাই। অতএব জাগতিক প্রীতি হিন্দুধর্মের মূলেই আছে। অচ্ছেদ্য, অভিন্ন, জাগতিক প্রীতি ভিন্ন হিন্দুত্ব নাই। মনুষ্য-প্রীতি ভিন্ন ঈশ্বরভক্তি নাই। ভক্তি ও প্রীতি হিন্দুধর্মে অভিন্ন।" —বঙ্কিমচন্দ্র

৩২। হে অর্জুন, আত্মৌপম্যেন (আপনার সহিত তুলনা দ্বারা) যঃ

(যিনি) সর্বত্র (সর্বজীবে) সুখং বা যদি বা দুঃখং (সুখ বা দুঃখকে) সমং পশ্যতি (তুল্যভাবে দেখেন) সঃ যোগী পরমঃ মতঃ (সেই যোগী সর্বশ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার মত)।

হে অর্জুন, সুখই হউক, আর দুঃখই হউক, যে ব্যক্তি আত্মসাদৃশ্যে সর্বত্র সমদর্শী, সেই যোগী সর্বশ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার অভিমত। ৩২

বেদান্ত ও বিশ্বপ্রেম—পূর্ব শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে, এই শ্লোকে তাহারই সম্প্রসারণ মাত্র। সর্বভূতে এক আত্মাই আছেন, এই জ্ঞান যাঁহার হইয়াছে অর্থাৎ যিনি 'সর্বভূতাত্মভূতাত্মা' (৫।৭) হইয়াছেন, তিনি অপরের সুখে সুখী, অপরের দুঃখে দুঃখী না হইয়া পারেন না, কেননা তাঁহার নিকট আপন-পর ভেদ নাই। বিশ্বপ্রেম বলিয়া যদি কোন বস্তু থাকে তবে তাহার মূলে এই আত্মদর্শন-জনিত সমত্ববুদ্ধি ; জগতে একমাত্র আর্য ঋষিগণই উহার অনুসন্ধান পাইয়াছিলেন ; জগতে সমুদয় ধর্মশাস্ত্র, সমুদয় নীতিশাস্ত্রই শিক্ষা দেয়—আপনাকে যেমন, পরকেও সেইরূপ ভালবাস। কিন্তু কেন আমি অপরকে নিজের ন্যায় ভালবাসিব ?—এ নীতির ভিত্তি কি ?

"আজকাল অনেকের মতে নীতির ভিত্তি হিতবাদ (Utility) অর্থাৎ যাহাতে অধিকাংশ লোকের অধিক পরিমাণে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হইতে পারে তাহাই নীতির ভিত্তি। ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আমরা এই ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া নীতি পালন করিব, তাহার হেতু কি ? যদি আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় তাহা হইলে কেননা আমি অধিকাংশ লোকের অত্যধিক অনিষ্ট সাধন করিব ? অবশ্য নিঃস্বার্থপরতা কবিত্বহিসাবে সুন্দর হইতে পারে, কিন্তু কবিত্ব ত যুক্তি নহে, আমাকে যুক্তি দেখাও, কেন আমি নিঃস্বার্থপর হইব। হিতবাদিগণ (Utilitarians) ইহার কি উত্তর দিবেন ? তাঁহারা তাহার কিছুই উত্তর দিতে পারেন না।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

বস্তুতঃ, ইহার উত্তর হিন্দু ভিন্ন, হিন্দুর বেদান্ত ভিন্ন আর কেহ দিতে পারে না। ইহার প্রকৃত উত্তর দিয়াছেন আর্য ঋষি—

'ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি।' —বৃহদারণ্যক উপনিষদ (৪।৫।৬)

—"লোকসমূহের প্রতি অনুরাগবশতঃ লোকসমূহ প্রিয় হয় না, আত্মার প্রতি (আপনার প্রতি) অনুরাগবশতঃই লোকসমূহ প্রিয় হয়। সর্বভূতের

প্রতি অনুরাগবশতঃ সর্বভূত প্রিয় হয় না, আত্মার প্রতি (আপনার প্রতি) অনুরাগবশতঃই সর্বভূত প্রিয় হয়।"

তুমি অপরকে, তোমার শত্রুকেও ভালবাসিবে কেন ? কারণ তুমি তোমার আত্মাকে অর্থাৎ আপনাকে ভালবাস বলিয়া। তুমিই সেই—'তত্ত্বমসি'। এই তত্ত্বই হিন্দু-ধর্মনীতির ভিত্তি। তাই হিন্দুধর্ম কেবল হিন্দুর ধর্ম নহে, উহা বিশ্বমানবের ধর্ম, সনাতন বিশ্বধর্ম।

"প্রহ্লাদকে যখন হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করিলেন, শত্রুর সঙ্গে রাজার কি রকম ব্যবহার করা কর্তব্য ? প্রহ্লাদ উত্তর করিলেন, শত্রু কে ? সকলই বিষ্ণু-(ঈশ্বর)ময়, শত্রু-মিত্র কি প্রকারে প্রভেদ করা যায় ? প্রীতিতত্ত্বের এইখানে একশেষ হইল ; এবং এই এক কথাতেই সকল ধর্মের উপর হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইল মনে করি।"—বঙ্কিমচন্দ্র।

বেদান্ত সম্বন্ধে নিরপেক্ষ, তত্ত্বজ্ঞ পাশ্চাত্ত্য মনীষিগণও ঠিক এই কথাই বলেন :—

"The highest and the purest morality is the immediate consequence of the Vedanta. The Gospels fix quite correctly as the highest law of morality—'Love your neighbour as yourself'. But why should I do so, since by the order of nature, I feel pain and pleasure only in myself and not in my neighbour ? The answer is not in the Bible, but it is in the Vedas—in the great formula—'*That thou art*' (তৎ-ত্বম্ অসি), which gives in three words metaphysics and morals together". —*Dr. Deussen.*

"The Vedanta gives profoundly-based reasons for charity and brotherliness". —*Sir John Woodroffe*

রহস্য—দয়া ও মায়া

প্রঃ—বুঝিলাম সব, কিন্তু গোড়ায় একটা গলদ রহিয়া গেল। আত্মজ্ঞ যোগী দ্বন্দ্ববর্জিত মুক্ত পুরুষ। তিনি সুখদুঃখের অতীত—'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ' (২।৫৬)। তিনি জীবের সুখদুঃখে অভিভূত হইবেন কিরূপে ? সে ত তাহার অধঃপতন, আধ্যাত্মিক অপমৃত্যু। আর জগতের দুঃখের পশরা নিজের মাথায় লইয়া তাঁহার স্বস্তি কোথায় ? সমদর্শনের কি এই ফল ? কেবল দুঃখের মাত্রা বৃদ্ধি ?

উঃ। কথাটা ধ'রেছ ভাল, কিন্তু তা হ'লে ঈশ্বরের মত দুঃখী বোধ হয় আর কেহ নাই। তাঁহাকে 'দয়াময়' বলা হয়, জীবের দুঃখে দুঃখিত না হইলে তিনি দয়াময় হন কিরূপে ? সংসারে দুঃখের সীমা নাই। তবে কি দীনবন্ধু

অর্জুন উবাচ

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥ ৩৩

দয়াময় দিবারাত্রি অশ্রুপাত করেন? তা অবশ্য নয়। বলিতে পার, ঐশ্বরিক ভাব অচিন্ত্য, তাহার সহিত জীবের তুলনা কি? তা ঠিক। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে, এস্থলে বদ্ধ জীবের কথা হইতেছে না, এ হইতেছে জীবন্মুক্ত যোগীর কথা। ভগবান্ স্বয়ংই বলিতেছেন, যে সমদর্শী যোগী নারায়ণ জ্ঞানে সর্বভূতের সেবা করেন, তিনি যে অবস্থায় থাকুন না কেন আমাতেই থাকেন (ময়ি বর্ততে), অর্থাৎ তিনি প্রকৃতির মধ্যে থাকিয়াও, সুখদুঃখের মধ্যে থাকিয়াও সেই পরম পুরুষেই অবস্থান করেন। তাঁহার আর পতনের সম্ভাবনা কোথায়? তিনি দ্বন্দ্বের মধ্যে থাকিয়াও নির্দ্বন্দ্ব, সুখদুঃখের মধ্যে থাকিয়াও 'সমদুঃখসুখঃ'। তাঁহার সংসারে থাকার একমাত্র উদ্দেশ্য জীবের যাহাতে দুঃখমোচন হয়, জীব যাহাতে সুখী হয়, তাহাই করা। তিনি নির্লিপ্তভাবে, নিষ্কামভাবে সেই কর্মই করেন—সময় সময় সুখদুঃখের অভিনয়ও করেন—কিন্তু সে অভিনয় মাত্র, তিনি অভিভূত হন না। তাঁহার দয়া আছে, তিনি জড়পিণ্ড নহেন, কিন্তু তাঁহার মায়া নাই, অর্থাৎ সুখদুঃখাদি যে প্রকৃতির ধর্ম, তাহাতে তিনি বদ্ধ হন না। অবতারগণ, মহাপুরুষগণ, জনকাদি রাজর্ষিগণ—ইঁহারা সকলেই এইরূপেই জীবের সঙ্গে হাসিয়া কাঁদিয়া লীলাখেলা করিয়াছেন, জীবের দুঃখমোচনের চেষ্টা করিয়াছেন। নরেন্দ্রাদি অন্তরঙ্গ ভক্তের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের এত ব্যাকুলতা কেন? সে দয়া, মায়া নহে। জীবের দুঃখে গৌতম গৃহত্যাগী, শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাসী। সেও দয়া, মায়া নহে। পরহিতব্রত মুক্ত যোগীর এই সকলই আদর্শ।

৩৩। অর্জুনঃ উবাচ—হে মধুসূদন, ত্বয়া (তোমাকর্তৃক) সাম্যেন অয়ং যঃ যোগঃ প্রোক্তঃ (সমতারূপ এই যোগতত্ত্ব উক্ত হইল) এতস্য (ইহার) স্থিরাং স্থিতিং (স্থায়ী বিদ্যমানতা) চঞ্চলত্বাৎ (চঞ্চলতাবশতঃ) অহং ন পশ্যামি (আমি দেখিতেছি না)।

মনঃসংযমের উপায়—অভ্যাস ও বৈরাগ্য ৩৩-৩৬

অর্জুন বলিলেন,—হে মধুসূদন, তুমি এই যে সমত্বরূপ যোগতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলে, মন যেরূপ চঞ্চল তাহাতে এই সমত্বভাব স্থায়ী হয় বলিয়া আমার বোধ হয় না। ৩৩

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥ ৩৪

শ্রীভগবান্ উবাচ

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥ ৩৫

সাম্যেন অর্থাৎ সমত্বরূপ যোগতত্ত্ব—বলা হইল কেন? কারণ সমতাই এই যোগের মূলকথা। এই যোগাভ্যাস-কালে চিত্তকে রাগদ্বেষাদি দ্বন্দ্ব হইতে নির্মুক্ত করিয়া লয়বিক্ষেপশূন্য করিয়া সম, শান্ত, কেবল আত্মাকারে আকারিত করিতে হয়—তদবস্থায় শীতোষ্ণ, সুখদুঃখ, সুন্দর-কুৎসিত, শত্রুমিত্র, আত্মপর—ভেদ থাকে না, সর্বত্র সমদর্শন লাভ হয়। সুতরাং সমতাই এই যোগের প্রাণ—এই হেতু ইহাকে সমদর্শন যোগ বলা হইয়াছে। আবার এই অবস্থাই নিষ্কাম কর্মযোগেরও ভিত্তি; কেননা ফলাফলে সমত্ববুদ্ধিই উহার মুখ্য কথা (২।৪৮ শ্লোক)—এই হেতু কেহ কেহ যোগ শব্দে এস্থলে 'কর্মযোগ' বুঝেন। বস্তুতঃ ধ্যানযোগ কর্মযোগেরই অঙ্গীভূত।

৩৪। হে কৃষ্ণ, হি (যেহেতু) মনঃ চঞ্চলং (স্বভাবতঃ চপল), প্রমাথি (ইন্দ্রিয়-ক্ষোভকর), বলবৎ, দৃঢ়ং (দৃঢ়), অহং তস্য নিগ্রহং (আমি তাহার নিরোধ) বায়োঃ ইব (বায়ুর ন্যায়) সুদুষ্করং মন্যে (সর্বথা দুঃসাধ্য বলিয়া মনে করি)।

হে কৃষ্ণ, মন স্বভাবতঃই চঞ্চল, ইন্দ্রিয়াদির বিক্ষেপজনক, মহাশক্তিশালী (বিচারবুদ্ধি বা কোনরূপ মন্ত্রৌষধিরও অজেয়), দৃঢ় (লৌহবৎ কঠিন, অনমনীয়), এই হেতু আমি মনে করি বায়ুকে আবদ্ধ করিয়া রাখা যেরূপ দুঃসাধ্য, মনকে নিরোধ করাও সেইরূপ দুষ্কর। ৩৪

৩৫। শ্রীভগবান্ উবাচ—হে মহাবাহো, মনঃ দুর্নিগ্রহং চলং (দুর্নিরোধ ও চঞ্চল) [এতৎ] অসংশয়ং ([ইহাতে] সংশয় নাই)। তু (কিন্তু) হে কৌন্তেয়, অভ্যাসেন বৈরাগ্যেণ চ (অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারা) [উহা] গৃহ্যতে (নিগৃহীত হয়)।

শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে মহাবাহো, মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, উহাকে নিরোধ করা দুষ্কর, তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু হে কৌন্তেয়, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা উহাকে বশীভূত করা যায়। ৩৫

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ॥ ৩৬

অভ্যাস ও বৈরাগ্য—অভ্যাসে দুঃসাধ্য কার্য সুসাধ্য হয়। স্বভাব অভ্যাসেরই ফল। শিশুর দুই পদ অগ্রসর হইতে তিন বার পদস্খলন হয়, কিন্তু পাঁচ বৎসর পরে দ্রুতধাবনই তাহার স্বভাবে পরিণত হয়। প্রথম শিক্ষার্থী 'ক' লিখিতে কলম ভাঙ্গে, 'কলরব' পড়িতে গলদ্ঘর্ম হয়; বৎসরেক পরে দ্রুতলিখন দ্রুতপঠনের জন্য তাহাকে তিরস্কার করিতে হয়। শারীরিক অভ্যাস অপেক্ষা মানসিক অভ্যাসের ফল আরও অদ্ভুত। আমাদের মনে যে কোন চিন্তা-প্রবাহ উদিত হয়, তাহাই একটি সংস্কার রাখিয়া যায়। এই সংস্কারগুলির সমষ্টিই আমাদের স্বভাব। আমাদের বর্তমান স্বভাব পূর্ববর্তী অভ্যাসের ফল। আমাদের পরবর্তী স্বভাব হইবে বর্তমান অভ্যাসের ফল। সুতরাং সৎস্বভাব গঠিত করিতে হইলে সর্বদা সৎচিন্তা ও সৎকর্মের অভ্যাস কর্তব্য। অসৎ চিন্তা, অসৎ অভ্যাস নিবারণের একমাত্র প্রতিকার তাহার বিপরীত ভাবনা, বিপরীত অভ্যাস—"বিতর্ক বাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্"—(সাধনপাদ ৩৩)। যোগ কতকগুলি সদ্ অভ্যাসের অনুশীলন মাত্র, এই জন্য ইহাকে অভ্যাসযোগ বলে। কিসের অভ্যাস? প্রধানতঃ বহির্মুখী চঞ্চল মনকে অন্তর্মুখী করিয়া আত্মসংস্থ করিবার অভ্যাস—'তত্রস্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ' (যোগসূত্র)।

চিত্তচাঞ্চল্য নিবারণের পক্ষে বৈরাগ্য বিশেষ সহায়ক। বৈরাগ্য অর্থ তৃষ্ণাক্ষয়, বিষয়ে অনাসক্তি। এক দিকে দৃষ্ট, শ্রুত, চিত্তমনোহর সমস্ত বিষয় চিত্ত হইতে দূরে রাখিবে, উহার আকাঙ্ক্ষা বর্জন করিবে; অপর দিকে মনকে সতত আত্মদেবে নিযুক্ত রাখিবে, তাঁহারই জপ, তাঁহারই ধারণা, তাঁহারই ধ্যান করিবে; এই দুইটি যুগপৎ অনুষ্ঠেয়, ইহাই অভ্যাস ও বৈরাগ্য।

৩৬। অসংযতাত্মনা (অসংযতচিত্ত ব্যক্তি কর্তৃক) যোগঃ দুষ্প্রাপঃ (যোগসিদ্ধি দুষ্প্রাপ্য) ইতি মে মতিঃ (ইহাই আমার মত), তু (কিন্তু) উপায়তঃ যততা (বিহিত উপায় দ্বারা সাধনে যত্নশীল) বশ্যাত্মনা (সংযতচিত্ত ব্যক্তি কর্তৃক) [যোগঃ] অবাপ্তুং শক্যঃ (যোগ লাভ হইতে পারে)।

অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা যাহার চিত্ত সংযত হয় নাই তাহার পক্ষে যোগ দুষ্প্রাপ্য, ইহাই আমার মত, কিন্তু বিহিত উপায় অবলম্বন করিয়া সতত যত্ন করিলে চিত্ত বশীভূত হয় এবং যোগ লাভ হইতে পারে। ৩৬

অর্জুন উবাচ

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি॥ ৩৭
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি॥ ৩৮
এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে॥ ৩৯

৩৭। অর্জুনঃ উবাচ—হে কৃষ্ণ, শ্রদ্ধয়া উপেতঃ (শ্রদ্ধাসহকারে যোগ সাধনে প্রবৃত্ত) অযতিঃ (যত্নহীন ব্যক্তি) যোগাৎ চলিতমানসঃ (যোগ হইতে ভ্রষ্টচিত্ত হইয়া) যোগসংসিদ্ধিম্ অপ্রাপ্য (যোগসিদ্ধি লাভ না করিয়া) কাং গতিং গচ্ছতি (কোন্ গতি প্রাপ্ত হয়)?

যোগভ্রষ্টেরও জন্মজন্মান্তরে পূর্ণসিদ্ধি ৩৭-৪৫

অর্জুন কহিলেন,—হে কৃষ্ণ, যিনি প্রথমে শ্রদ্ধাসহকারে যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু যত্নের শিথিলতাবশতঃ যোগ হইতে ভ্রষ্টচিত্ত হওয়ায় যোগসিদ্ধি লাভে অসমর্থ হয়, তিনি কি প্রকার গতি প্রাপ্ত হন? ৩৭

৩৮। হে মহাবাহো, ব্রহ্মণঃ পথি বিমূঢ়ঃ (ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ হইতে বিক্ষিপ্ত) অপ্রতিষ্ঠঃ (নিরাশ্রয়) উভয়বিভ্রষ্টঃ [সন্] (উভয় পথ হইতে ভ্রষ্ট [হইয়া]) [তিনি] ছিন্নাভ্রম্ ইব (ছিন্ন মেঘখণ্ডের ন্যায়) ন নশ্যতি কচ্চিৎ (কি নষ্ট হন না)?

ব্রহ্মণঃ পথি বিমূঢ়ঃ—ব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধনভূতে যোগমার্গে প্রচ্যুতঃ—ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধনভূত যোগমার্গ হইতে ভ্রষ্ট। **উভয়বিভ্রষ্ট**—কাম্যকর্মত্যাগহেতু স্বর্গাদি ভোগসুখে বঞ্চিত এবং যোগভ্রংশহেতু মোক্ষলাভেও বঞ্চিত।

হে মহাবাহো, তিনি ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়ভূত যোগমার্গে অকৃতকার্য হওয়াতে মোক্ষ হইতে বঞ্চিত হন, এবং কাম্যকর্মের ত্যাগহেতু স্বর্গাদি হইতেও বঞ্চিত হন, সুতরাং ভোগ ও মোক্ষরূপ পুরুষার্থদ্বয় হইতে ভ্রষ্ট হইয়া, ছিন্ন মেঘখণ্ডের ন্যায় (মেঘখণ্ড যেমন মূল মেঘরাশি হইতে ছিন্ন হইয়া অপর মেঘরাশি প্রাপ্ত না হইলে মধ্যস্থলে বিলীন হইয়া যায় সেইরূপ) নষ্ট হন না কি? ৩৮

৩৯। হে কৃষ্ণ, মে এতৎ সংশয়ং (আমার এই সন্দেহ) অশেষতঃ

শ্রীভগবান্ উবাচ

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥ ৪১

(নিঃশেষরূপে) ছেত্তুম্ অর্হসি (ছেদন করিতে তুমিই যোগ্য); হি (যেহেতু) ত্বদন্যঃ (তুমি ভিন্ন) অস্য সংশয়স্য ছেত্তা (এই সংশয়ের নিবর্তক) ন উপপদ্যতে (আর কেহ নাই)।

হে কৃষ্ণ, তুমি আমার এই সংশয় নিঃশেষরূপে ছেদন করিয়া দাও, কেননা, তুমি ভিন্ন আমার এই সংশয়ের অপনেতা আর কেহ নাই। ৩৯

৪০। শ্রীভগবান্ উবাচ—পার্থ, তস্য (তাহার) ইহ এব (ইহ লোকে) বিনাশঃ ন বিদ্যতে (বিনাশ নাই) অমুত্র ন (পরলোকেও নাই), হি (যেহেতু) হে তাত (হে বৎস), কল্যাণকৃৎ (শুভকর্মকারী) কশ্চিৎ (কেহই) দুর্গতিং ন গচ্ছতি (দুর্গতি প্রাপ্ত হন না)।

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে পার্থ, যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির ইহলোকে কি পরলোকে কোথাও বিনাশ নাই। কারণ, হে বৎস, কল্যাণকর্মকারী পুরুষ কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হন না। ৪০

যোগাভ্যাসের যে কোন রূপ চেষ্টামাত্রই শুভ কর্ম। সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ না হওয়াতে তাঁহার পুনর্জন্ম নিবারিত হয় না বটে, কিন্তু শুভকর্মজনিত অন্যরূপ শুভ ফল তিনি প্রাপ্ত হন, তাঁহার সদ্গতিই লাভ হয়। সে গতি কি ?—পরের শ্লোকদ্বয় দ্রষ্টব্য।

৪১। যোগভ্রষ্টঃ পুণ্যকৃতাং লোকান্ প্রাপ্য (পুণ্যাত্মাদিগের প্রাপ্য লোক লাভ করিয়া) শাশ্বতীঃ সমাঃ (বহু বৎসর) উষিত্বা ([তথায়] বাস করিয়া), শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে (সদাচারসম্পন্ন ধনবানের গৃহে) অভিজায়তে (জন্মলাভ করেন)।

পুণ্যকৃতাং লোকান্—পুণ্যকর্মকারিগণ যে লোকসকল প্রাপ্ত হন—স্বর্গলোক, পিতৃলোক ইত্যাদি (৮।২৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এ সকল লোক হইতেও পুনরাবৃত্তি হয়। (৮।১৬)

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্॥ ৪২
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥ ৪৩
পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে॥ ৪৪

যোগভ্রষ্ট পুরুষ পুণ্যকর্মকারীদিগের প্রাপ্য স্বর্গলোকাদি প্রাপ্ত হইয়া তথায় বহু বৎসর বাস করিয়া পরে সদাচারসম্পন্ন ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ৪১

যিনি বিষয়-ভোগে বিরত হইয়া যোগাভ্যাসে রত ছিলেন, তিনি পরজন্মে ধনীর গৃহে যান কেন ?—তাহার সম্পূর্ণ বিষয়বৈরাগ্য জন্মে নাই বলিয়া, মৃত্যুকালে ভোগবাসনা বলবতী ছিল বলিয়া (৮।৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। কিন্তু যাঁহার মৃত্যুকালে তীব্র বৈরাগ্য ও মোক্ষেচ্ছা বর্তমান থাকে, তাঁহার ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গতি হয়, তাহা পরের শ্লোকে বলিতেছেন।

৪২। অথবা (পক্ষান্তরে) ধীমতাম্ যোগিনাম্ এব কুলে (জ্ঞানবান্ যোগী-দিগের কুলেই) ভবতি (জন্মগ্রহণ করেন); ঈদৃশং যৎ জন্ম (এইরূপ যে জন্ম) লোকে (জগতে) এতৎ হি দুর্লভতরং (ইহা দুর্লভতর)।

পক্ষান্তরে যোগভ্রষ্ট পুরুষ জ্ঞানবান্ যোগীদিগের কুলে জন্মগ্রহণ করেন। জগতে ঈদৃশ জন্ম অতি দুর্লভ (যেমন ব্যাসতনয় শুকদেবের)। ৪২

৪৩। হে কুরুনন্দন, তত্র (সেই জন্মে) পৌর্বদেহিকং (পূর্বদেহজাত) তং বুদ্ধিসংযোগং (সেই মোক্ষবিষয়া বুদ্ধি) লভতে (লাভ করেন); ততঃ চ (তদনন্তর) ভূয়ঃ (পুনরায়) সংসিদ্ধৌ যততে (মুক্তির নিমিত্ত যত্ন করেন)।

পৌর্বদেহিকং বুদ্ধিসংযোগং—পূর্বদেহভবং ব্রহ্মবিষয়া বুদ্ধ্যা সংযোগং (শ্রীধর)।

হে কুরুনন্দন, যোগভ্রষ্ট পুরুষ সেই জন্মে পূর্বজন্মের অভ্যস্ত মোক্ষবিষয়ক বুদ্ধি লাভ করেন এবং মুক্তিলাভের জন্য পুনর্বার যত্ন করেন। ৪৩

৪৪। সঃ (তিনি] তেন এব পূর্বাভ্যাসেন (সেই পূর্বাভ্যাস-বশতঃ) অবশঃ অপি (অবশ হইয়াই যেন) হ্রিয়তে (যোগমার্গে আকৃষ্ট হন); যোগস্য

প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৪৫

জিজ্ঞাসুঃ অপি (যোগের **স্বরূপ-জিজ্ঞাসু** ব্যক্তিও) **শব্দব্রহ্ম** (বেদকে) অতিবর্ত্ততে (অতিক্রম **করেন**)।

শব্দব্রহ্ম অতিবর্ত্ততে—'শব্দব্রহ্ম' বলিতে বেদ বুঝায়। বেদ বলিতে এস্থলে বেদের কর্মকাণ্ড বুঝিতে হইবে। 'উহাকে অতিক্রম করেন' —এই কথার অর্থ এই যে, বেদোক্ত কর্মফল স্বর্গাদি অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ফল লাভ করেন।

শাস্ত্রে আছে,—

দ্বে ব্রহ্মণি বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরং চ যৎ।
শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি। —মহাভা, শাং ২৬৯।১

—দুই প্রকার ব্রহ্ম জানিবার আছে, এক শব্দব্রহ্ম (প্রণব, বেদ), আর পরব্রহ্ম। শব্দব্রহ্মে অর্থাৎ বেদোক্ত ক্রিয়াকাণ্ডে নিষ্ণাত হইয়া শুদ্ধচিত্ত হইলে পরব্রহ্ম লাভ হয়। এস্থলে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, যোগের স্বরূপ জানিবার অভিলাষ মাত্র করিয়া সিদ্ধিলাভের পূর্বে কেহ দেহত্যাগ করিলেও তিনি বেদোক্ত কর্মকাণ্ড অতিক্রম করিয়া জন্মান্তরে জ্ঞান লাভে অধিকারী হন।

অবশ হইয়াই যোগমার্গে আকৃষ্ট হন—এ কথার অর্থ এই যে, কোন অন্তরায়-বশতঃ অনিচ্ছা থাকিলেও তাহাকে ঐ পথে যাইতেই হয়। পূর্বজন্মজাত শুভ সংস্কার তাহাকে অবশ করিয়াই যেন যোগমার্গে প্রবৃত্ত করায় (১৮।৬০)

তিনি অবশ হইয়াই পূর্বজন্মের যোগাভ্যাসজনিত শুভ-সংস্কার-বশতঃ যোগমার্গে আকৃষ্ট হন। যিনি কেবল যোগের স্বরূপ-জিজ্ঞাসু, তিনিও বেদোক্ত কাম্যকর্মাদির ফল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ফল লাভ করেন (যিনি যোগের স্বরূপ জানিয়া যোগাভ্যাস-পরায়ণ তাঁহার আর কথা কি?)। ৪৪

৪৫। প্রযত্নাৎ তু যতমানঃ (পূর্বকৃত যত্ন হইতেও অধিকতর যত্ন করিয়া) সংশুদ্ধকিল্বিষঃ (নিষ্পাপ হইয়া) যোগী অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ (বহু জন্মে সিদ্ধিলাভ করিয়া) ততঃ পরাং গতিং যাতি (পরে পরম গতি লাভ করেন)।

প্রযত্নাৎ যতমানঃ—উত্তরোত্তরমধিকং যোগে যত্নং কুর্বন্ (শ্রীধর)।

সেই যোগী পূর্বাপেক্ষাও অধিকতর যত্ন করেন, ক্রমে যোগাভ্যাস-দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া বহু জন্মের চেষ্টায়, সিদ্ধিলাভ করিয়া পরম গতি লাভ করেন। ৪৫

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জুন ॥ ৪৬

৪৬। যোগী তপস্বিভ্যঃ (তপস্বিগণ অপেক্ষা) অধিকঃ (শ্রেষ্ঠ), জ্ঞানিভ্যঃ অপি অধিকঃ (জ্ঞানিগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ), কর্মিভ্যঃ চ অধিকঃ (কর্মিগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ), মতঃ (ইহাই আমার মত), হে অর্জুন, তস্মাৎ (সেই হেতু) যোগী ভব (তুমি যোগী হও)।

ভক্তিমান্ যোগী সর্বশ্রেষ্ঠ ৪৬-৪৭

যোগী তপস্বিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কর্মিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার মত ; অতএব হে অর্জুন, তুমি যোগী হও। ৪৬

তপস্বিভ্যঃ—কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিতপোনিষ্ঠেভ্যঃ। **কর্মিভ্যঃ**—ইষ্টপূর্তাদি কর্মকারিভ্যঃ (শ্রীধর)। **জ্ঞানিভ্যঃ**—জ্ঞানমত্র শাস্ত্রপাণ্ডিত্যং তদ্বদ্ভ্যোঽপি, পরোক্ষজ্ঞানবদ্ভ্যঃ (শঙ্কর)।

তপস্বী—'যাঁহারা কৃচ্ছ্রসাধ্য চান্দ্রায়ণাদি ব্রতনিষ্ঠ'। **কর্মী**—যাঁহারা স্বর্গাদি ফলকামনায় যাগযজ্ঞাদি কাম্য কর্ম করেন। তপস্বী ও কর্মী এই উভয় হইতেও যোগী শ্রেষ্ঠ—কেননা, ইঁহারা আত্মনিষ্ঠ নন, তত্ত্বজ্ঞানী নন, সর্বত্র সমদর্শী নন। কিন্তু যোগী, **জ্ঞানী** হইতেও শ্রেষ্ঠ কিরূপে ? টীকাকারগণ বলেন, **জ্ঞানী দ্বিবিধ—পরোক্ষ জ্ঞানী আর অপরোক্ষ জ্ঞানী**। যাঁহার কেবল শাস্ত্রজ্ঞান আছে, আত্মা, জীব, জগৎ এ-সব কি তাহা শাস্ত্রানুশীলনে বুঝিয়াছেন, কিন্তু আত্মানুভব হয় নাই, তিনি পরোক্ষ জ্ঞানী, যাঁহার প্রত্যক্ষ আত্মদর্শন হইয়াছে, তিনি অপরোক্ষ জ্ঞানী। এ-স্থলে জ্ঞানী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ বলায় শাস্ত্রজ্ঞানী বা পরোক্ষ জ্ঞানীকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

কিন্তু কেবল শব্দজ্ঞানী বা শাস্ত্রজ্ঞানী হইতে যোগী বড়, ইহা সকলেরই মত। এখানে বলা হইয়াছে, জ্ঞানী হইতেও (অপি) যোগী বড়, এই আমার মত। একথায় ইহাই বুঝায় যে, সর্বপ্রকার সাধকের মধ্যে আত্মজ্ঞানীকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়, কেননা, তিনি মুক্ত পুরুষ ; কিন্তু আমার মতে, যোগী আত্মজ্ঞানী অপেক্ষাও বড়, কারণ গীতোক্ত যোগী কেবল আত্মনিষ্ঠ, আত্মারাম নন, তিনি সর্বভূতানুকম্পী, সর্বভূতহিতে রত, নিষ্কাম কর্মী এবং ভগবানে যুক্ত (৬।১, ৬।১৪, ৬।৩০, ৬।৩১, ৬।৪৭)। সুতরাং শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—যোগী জ্ঞানিগণ অপেক্ষাও (অপি) শ্রেষ্ঠ, আমার এই মত। (অধ্যায়ের পরে "গীতোক্ত যোগী ও যোগধর্ম" শীর্ষক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য, ২৩৮ পৃঃ)।

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭

লোকমান্য তিলক বলেন—এস্থলে 'যোগী' বলিতে বুঝায় কর্মযোগী এবং 'জ্ঞানী' অর্থ সাংখ্যজ্ঞানী সন্ন্যাসী। পূর্বে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, জ্ঞান বা সন্ন্যাস-মার্গ অপেক্ষা কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ (৩।৮, ৫।২), এখানে সেই কথাই বলা হইতেছে। আবার পূর্বেও যেমন শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, 'তুমি যোগস্থ হইয়া কর্ম কর', 'যোগ অবলম্বন করিয়া দাঁড়াও' (২।৪৮।৫২, ৪।৪২), এখানেও সেইরূপ উপদেশ দিতেছেন, 'তুমি যোগী হও' অর্থাৎ কর্মযোগ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ কর। এস্থলে 'জ্ঞানী' অর্থ শাস্ত্রজ্ঞানী। সন্ন্যাসবাদী টীকাকারগণের যে ব্যাখ্যা, উহা 'নিছক সাম্প্রদায়িক আগ্রহমূলক'। —গীতারহস্য (সংক্ষিপ্ত)

৪৭। যঃ (যিনি) শ্রদ্ধাবান্ (শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) মদ্গতেন অন্তরাত্মনা (মদ্গত চিত্তদ্বারা) মাং ভজতে (আমাকে ভজনা করেন) সঃ (তিনি) সর্বেষাম্ অপি যোগিনাম্ (সকল যোগিগণের মধ্যে) যুক্ততমঃ (সর্বাপেক্ষা অধিক যুক্ত) মে মতঃ (ইহাই আমার অভিমত)।

যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া মদ্গতচিত্তে আমার ভজনা করেন, সকল যোগীর মধ্যে তিনিই আমার সহিত যোগে সর্বাপেক্ষা অধিক যুক্ত, ইহাই আমার অভিমত অর্থাৎ ভগবানে ঐকান্তিক ভক্তিপরায়ণ যোগীই শ্রেষ্ঠ সাধক। ৪৭

ইহাই গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ের শেষ কথা। ইহার মর্ম এই যে, গীতায় এই পর্যন্ত যে জ্ঞানযুক্ত নিষ্কাম কর্মযোগের বর্ণনা হইল, উহার সহিত ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তি নিবিড়ভাবে সম্বদ্ধ। গীতার পরবর্তী অধ্যায়সমূহে যে সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, ইহাই তাহার মূল তত্ত্ব, এবং এই তত্ত্বই অষ্টাদশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ ভক্তিমূলক উপসংহারে প্রকটিত হইয়াছে (১৮।৬১-৬৬)।

ষষ্ঠ অধ্যায়—বিশ্লেষণ ও সার-সংক্ষেপ

১—২ কর্মফলত্যাগী কর্মযোগীই প্রকৃত সন্ন্যাসী; ৩—৪ কর্মযোগের সাধনাবস্থা ও স্থিতাবস্থা—যোগারূঢ়ের লক্ষণ; ৫—৯ যোগসিদ্ধিবিষয়ে আত্ম-স্বাতন্ত্র্য, যোগের উদ্দেশ্য আত্মার উদ্ধার, উহার ফল সমতা; ১০—২৬ অষ্টাঙ্গ যোগের বর্ণনা, সমাধি অভ্যাসের নিয়ম; ২৭—৩২ অষ্টাঙ্গ যোগসিদ্ধির ফলে 'ব্রাহ্মীস্থিতি' আত্যন্তিক সুখ—উহার ফল সর্বত্র সমদর্শন, সর্বভূতে ভগবদ্ভাব,

জীবে দয়া, জীবের সুখদুঃখ আত্মৌপম্যদৃষ্টি ; ৩৩—৩৬ অভ্যাস ও বৈরাগ্য মনসংযমের উপায়। ৩৬—৪৫ যোগভ্রষ্টেরও জন্মজন্মান্তরে ক্রমোন্নতিক্রমে পূর্ণসিদ্ধি ; ৪৬—৪৭ গীতোক্ত যোগী, তপস্বী প্রভৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; ভক্তিমান্ কর্মযোগী সর্বশ্রেষ্ঠ।

পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে সংক্ষেপে ধ্যানযোগের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে এই ধ্যানযোগের প্রক্রিয়া ও ধ্যানযোগীর লক্ষণ বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে এবং উহা কর্মযোগের অঙ্গস্বরূপেই উপদিষ্ট হইয়াছে। এই কারণেই এই প্রসঙ্গে প্রথমেই শ্রীভগবান্ বলিলেন যে, কর্মত্যাগ করিলেই সন্ন্যাসী বা যোগী হয় না, কামনা ত্যাগই যোগের মূল কথা ; সুতরাং যিনি কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম করেন, তিনিও সন্ন্যাসী, তিনিও যোগী। যখন সাধক সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে ও কর্মে আসক্ত হন না, তখনই তিনি যোগারূঢ় বলিয়া উক্ত হন। ধ্যানযোগে আরোহণেচ্ছু মুনির পক্ষে নিষ্কাম কর্মই যোগসিদ্ধির কারণ। যোগারূঢ় হইলে চিত্তের সমতাই ব্রাহ্মীস্থিতিতে নিশ্চল থাকিবার কারণ ; জিতেন্দ্রিয় প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তির মন সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বের মধ্যেও আত্মনিষ্ঠ থাকে। যিনি বিষয়-সন্নিধানেও নির্বিকার ও জিতেন্দ্রিয় তাঁহাকেই যোগযুক্ত বলা যায়। সর্ববিষয়ে সমচিত্ততাই যোগের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ।

নির্জন পবিত্র স্থানে নিজ আসন স্থাপন করিয়া ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযমপূর্বক মনকে একাগ্র করিয়া আত্মশুদ্ধির জন্য যোগাভ্যাস করিবে। যোগাভ্যাসে প্রথমতঃ সর্বপ্রকার কামনা নিঃশেষে ত্যাগ করিয়া মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিবে। তৎপর ধৃতিসংযুক্ত বুদ্ধিদ্বারা মনকে অন্তর্মুখী করিয়া ক্রমে ক্রমে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবে, কোন বিষয়ই চিন্তা করিবে না। এইরূপ চিত্ত-নিরুদ্ধ হইয়া সর্ববৃত্তিশূন্য হইয়া আত্মসংস্থ হইবে। তখনই আত্মস্বরূপ প্রতিভাত হইবে। এইরূপ অবস্থা লাভ করিলে যোগী ব্রহ্মানন্দস্বরূপ পরম শান্তি অনুভব করেন, তিনি মহাদুঃখেও বিচলিত হন না। এই প্রকার যোগযুক্ত পুরুষ সর্বত্র সমদর্শন লাভ করিয়া আত্মাকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে আত্মাতে দর্শন করিয়া থাকেন ; কিন্তু এই আত্মদর্শনই যোগের চরম ফল নয়, গীতোক্ত যোগী কেবল আত্মারাম নন, তিনি ভক্তোত্তম। এইরূপে, যোগবলে অহংবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া চিত্ত নির্মল হইলে সেই ভক্তযোগী বিশ্বময় ভগবান্ পুরুষোত্তমকেই দর্শন করেন এবং সর্বভূতে বিশ্বেশ্বরকে দেখিয়া বিশ্বপ্রেমে পুলকিত হইয়া নারায়ণজ্ঞানে

সর্বভূতে প্রীতি করেন, সর্বভূতের সেবা করেন। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—যে যোগী সর্বভূতানুকম্পী হইয়া সতত সর্বভূতের হিত সাধনে রত থাকেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার অভিমত।

চঞ্চল মনকে নিরোধ করা একান্ত দুঃসাধ বটে, কিন্তু দৃঢ় অভ্যাস ও তীব্র বৈরাগ্যদ্বারা উহা সাধন করা যায়। যদি কেহ শ্রদ্ধাসহকারে যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইয়াও যত্নের শৈথিল্যবশতঃ যোগসিদ্ধি লাভে অসমর্থ হন, তথাপি তাঁহার সদ্গতিই হয়। শুভকর্মকারী কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হন না। এইরূপ যোগভ্রষ্ট পুরুষ সদাচারসম্পন্ন ধনীর গৃহে অথবা জ্ঞানবান্ যোগীদিগের কুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং পূর্বজন্মের যোগাভ্যাসজনিত শুভসংস্কারবশতঃ যোগমার্গে আকৃষ্ট হন। এইরূপে ক্রমে যোগাভ্যাস দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া বহু জন্মের চেষ্টায় সিদ্ধি লাভ করিয়া পরমগতি প্রাপ্ত হন।

কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি ব্রতপরায়ণ তপস্বী, যাগযজ্ঞাদি কাম্যকর্মপরায়ণ কর্মী সাংখ্যজ্ঞানী সন্ন্যাসী—ইঁহাদের অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ। যোগীদের মধ্যে যিনি ভগবদ্ভক্ত, তিনিই শ্রেষ্ঠতম। প্রকৃত পক্ষে, গীতোক্ত যোগী একাধারে আত্মজ্ঞানী, নিষ্কাম কর্মী ও পরম ভক্ত (পরে 'গীতোক্ত যোগী ও যোগধর্মে'র ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ ধ্যানযোগ বা সমাধি-যোগের প্রক্রিয়া ও ধ্যানযোগীর লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। এই হেতু ইহাকে **ধ্যানযোগ** বা **অভ্যাসযোগ** বলে।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে **অভ্যাসযোগো** নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ের সারমর্ম

গীতোক্ত যোগী ও যোগধর্ম

কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ও ভক্তিযোগ—এই চতুর্বিধ সাধনপথ সুপরিচিত। এখন প্রশ্ন এই, গীতোক্ত যোগী কোন্ শ্রেণীর। আমরা দেখিয়াছি, 'কর্ম কর', 'যুদ্ধ কর'—এই কথা লইয়াই গীতার আরম্ভ এবং আমরা দেখিব ঐ কথায়ই গীতা শেষ হইয়াছে। বিবিধ সারগর্ভ তত্ত্বালোচনার মধ্যেও বার বার ঐ একই কথা—'কর্ম কর', 'যুদ্ধ কর'। অথচ সঙ্গে সঙ্গে বলা হইতেছে—জ্ঞানী হও, ধ্যানী হও, ভক্ত হও। সুতরাং অর্জুনকে কর্মী, জ্ঞানী, ধ্যানী, ভক্ত সবই হইতে হইবে। তাহা হইলেই বুঝিতে

হয়—কর্ম, জ্ঞান, ধ্যান, ভক্তি পরস্পর-সাপেক্ষ ও সমন্বয়সাধ্য, নিরপেক্ষ ও বিরোধী নহে। কিন্তু 'যুদ্ধ কর' ও 'যোগী হওয়া'টা যুগপৎ অনুষ্ঠেয় হয় কিরূপে? যুদ্ধ-কোলাহলে ব্রাহ্মীস্থিতির সম্ভাবনা আছে কি? বা ভগবচ্চিন্তার অবসর কোথায়? অথচ বলা হইতেছে, 'মামনুস্মর যুধ্য চ' (৮।৭)—আমাকে স্মরণ কর আর যুদ্ধ কর, ইত্যাদি। এই সকল আপাত-বিরোধী উপদেশের সামঞ্জস্য গীতা এই ভাবে করিয়াছেন।—

কর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানবাদীদিগের প্রধান আপত্তি এই যে, সৎ-অসৎ সকল কর্মই বন্ধনের কারণ, 'কর্মণা বধ্যতে জন্তুঃ', সুতরাং উহা মুক্তিপ্রদ নহে। গীতা বলিতেছেন,— নিষ্কাম কর্ম বন্ধনের কারণ নহে। ফলাসক্তি ও কর্তৃত্বাভিমানই বন্ধনের কারণ; আসক্তি ও অহংবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া কর্ম করিলে বন্ধন হয় না, বরং উহাতে কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়। উহাই কর্মযোগ। কিন্তু আত্মজ্ঞান ব্যতীত অহং ত্যাগ হয় না, সুতরাং কর্মযোগে সিদ্ধিলাভার্থ জ্ঞান লাভের প্রয়োজন।

আত্মজ্ঞান লাভ হইলে আমাদের দেহাত্মবোধ বিদূরিত হয়; সেই অসীম অব্যক্ত অচল ব্রহ্মসত্তার মধ্যে আমাদের নিম্নতর ব্যক্তিত্ব, আমাদের অহংভাব লয় পায়, তখন আমরা রাগদ্বেষ-বিমুক্ত হইয়া কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া নিষ্কাম কর্ম করিবার অধিকারী হই, তখনই ভগবানে পরাভক্তি জন্মে ('মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্' ১৮।৫৪), তাঁহার সমগ্র স্বরূপ অধিগত হয়। এইরূপে কর্মের সহিত জ্ঞানের এবং জ্ঞানের সহিত ভক্তির সংযোগে সাধনার সম্পূর্ণতা লাভ হয়।

কিন্তু আপাততঃ এস্থলে এক প্রতিবন্ধক দেখা যায়। ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইলে কর্ম হয় কিরূপে? অক্ষর ব্রহ্ম সম, শান্ত, নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার—তিনি কর্মে লিপ্ত নন, কর্ম করে প্রকৃতি, উহাই মায়া বা অজ্ঞান; সুতরাং কর্ম অজ্ঞান-প্রসূত, উহার সহিত জ্ঞানের সমুচ্চয় হয় না এবং অচিন্ত্য, অব্যক্ত, নির্গুণ ব্রহ্মে ভক্তিও সম্ভবে না। সুতরাং জ্ঞানবাদিগণের এ আপত্তি সঙ্গতই বোধ হয় যে, নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানে কর্ম ও ভক্তির স্থান নাই।

গীতা পুরুষোত্তম-তত্ত্ব দ্বারা এই আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—প্রকৃতি কর্ম করে তা ঠিক, কিন্তু প্রকৃতি আমারই প্রকৃতি—আমারই শক্তি। ক্ষর ও অক্ষর দুইই আমার বিভাব—আমি পুরুষোত্তম (১৫।১৬-১৮ শ্লোক)

আমি কেবল নির্গুণ ব্রহ্ম নহি, আমি প্রকৃতিরও অধীশ্বর, বিশ্বপ্রকৃতির সকল গতির, সকল কর্মের নিয়ামক, আমা হইতেই জীবের প্রবৃত্তি ('যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী' ১৫।৪, 'যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং' ১৮।৪৬), কর্ম আমারই কর্ম, আমারই কর্ম আমিই করি, তুমি নিমিত্ত মাত্র ('নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্'—১১।৩৩)। যত ক্ষণ জীবের অহং জ্ঞান থাকে, 'আমার কর্ম',

'আমি করি', এই জ্ঞান থাকে, তত ক্ষণই সে বদ্ধ, পাপপুণ্যের ফলভোগী ; এই অহং ত্যাগ হইলেই সে বুঝিতে পারে কর্ম তাহার নয়, কর্ম আমার ; তখন সে কর্ম করিয়াও তাহাতে লিপ্ত হয় না, তার ফলভাগী হয় না ('কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে')—সে কর্ম লোকহত্যাই হউক, বা লোকসেবাই হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না (১৮।১৪)। ইহা বদ্ধ জীবের কর্ম নয়, ইহা জীবন্মুক্তের কর্ম, ইহার সহিত জ্ঞানের বিরোধ হইবে কিরূপে ? আর এ জ্ঞানের সহিত ভক্তিরও কোন বিরোধ নাই, কেননা, এ জ্ঞান কেবল অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অক্ষর ব্রহ্মের জ্ঞান নহে, ইহা অব্যক্ত-ব্যক্ত 'নির্গুণ-গুণী' 'সমগ্র' পুরুষোত্তমের জ্ঞান ('সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু' ৭।১)। তিনি 'সর্বলোকমহেশ্বর', 'সর্বভূতের সুহৃদ্', 'যজ্ঞ ও তপস্যাদির ভোক্তা' (৫।২৯), সুতরাং তাঁহাতে ভক্তি, সর্বভূতে প্রীতি এবং যজ্ঞরূপে সমস্ত কর্ম তাঁহাকে সমর্পণ, ইহাই এই জ্ঞানের লক্ষণ। তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, জ্ঞানীই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত, 'আমার আত্মস্বরূপ ('জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতং'—৭।১৭-১৮), আমাতে অব্যভিচারিণী ভক্তিই জ্ঞান ('ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী—এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্তম্'—১৩।১০-১১)।

এইরূপে গীতা কর্ম, জ্ঞান, ভক্তির সমন্বয়ে সুন্দর সম্পূর্ণ সাধনতত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। ইহাই গীতার পূর্ণাঙ্গযোগ। গীতোক্ত যোগী একাধারে জ্ঞানী, কর্মী ও ভক্ত।

বিষয়-ক্ষেত্রে, সংসারের কর্ম-কোলাহলে, এমন কি যুদ্ধক্ষেত্রেও এ যোগীর বিক্ষেপ-বিপত্তি নাই, এ সমাধিভঙ্গের সম্ভাবনা নাই। কেননা, এ সমাধি কেবল ধ্যানস্তিমিতনেত্রে তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান নহে—উহা সাধনপথের সাময়িক অবস্থামাত্র—এ সমাধির অর্থ ভগবৎ-সত্তায় আপন সত্তা মিলাইয়া দেওয়া, তাঁহারই প্রেমানন্দে সর্বকামনা ভুলিয়া তাঁহারই কর্ম বাহিরে দেহেন্দ্রিয়াদি-দ্বারা সম্পন্ন করা, আর অন্তরে সতত সর্বাবস্থায় তাঁহাতেই অবস্থান করা ('সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে'—৬।৩১)। এ যোগী নিত্যসমাহিত, নিত্যমুক্ত,—যুদ্ধ-কোলাহলে তাঁহার চিত্তবিক্ষেপের ভয় কি ? তাই শ্রীভগবান্ প্রিয় শিষ্যকে ভীষণ যুদ্ধকর্মে আহ্বান করিয়াও বলিতেছেন—'তস্মাৎ যোগী ভবার্জুন।'

চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ১৮।৫৭

এ প্রসঙ্গে এ কথাটি মনে রাখিতে হইবে, জ্ঞান ও জ্ঞানযোগ এক কথা নহে। গীতোক্ত যোগে জ্ঞানলাভের প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়াই যে,

বৈদান্তিক 'জ্ঞানযোগ' বলিয়া যাহা পরিচিত তাহাই অবলম্বন করিতে হইবে, এরূপ নহে। বৈদান্তিক জ্ঞানযোগের সহিত সন্ন্যাসবাদ ও কর্মত্যাগ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, গীতায় সর্বত্রই তাহার প্রতিবাদ। আবার সে জ্ঞানযোগে ভক্তির স্থান নাই, গীতা আদ্যোপান্ত ভক্তিবাদে সমুজ্জ্বল—সতত আমাকে স্মরণ কর, আমাতে মনোনিবেশ কর, আমার ভজনা কর, আমাতে সর্বকর্ম সমর্পণ কর, একমাত্র আমারই শরণ লও—জ্ঞানকর্মের সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্রই এইরূপ ভগবদ্ভক্তির উপদেশ (৮।৭, ৯।২৭, ৯।৩৪, ১১।৫৫, ১২।৮, ১৮।৫৭-৫৮, ১৮।৬৫-৬৬, ইত্যাদি দ্রঃ)। সুতরাং, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সাংখ্যজ্ঞানীদের আচরিত যে সাধন-প্রণালী, যাহা জ্ঞানযোগ বলিয়া পরিচিত, তাহা গীতোক্ত যোগীর অবলম্বনীয় নহে। তবে জ্ঞানলাভের পথ কি? শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, তত্ত্বজ্ঞানী গুরু তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দিবেন (৪।৩৪), কিন্তু পরোক্ষ উপদেশ পাইলেই জ্ঞান সম্যোলব্ধ হয় না—উহাই সাধনা-সাপেক্ষ—এই সাধনাই যোগ (৪।৩৮)। কর্মযোগ অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হইলে জ্ঞান স্বতঃই হৃদয়ে উদিত হয়। অথবা অনন্যভক্তিযোগে তাঁহার শরণ লইলে শ্রীভগবানই গুরুরূপে ভক্তের হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া জ্ঞানরূপ দীপদ্বারা তাঁহার অজ্ঞান-অন্ধকার নষ্ট করিয়া দেন। ('নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা' ১০।১০-১১)। আবার ধ্যানযোগেও জ্ঞানলাভ হয়—তাহা ষষ্ঠ অধ্যায়ে এবং অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে। (৬।২৯, ১৮।৫২)

কিন্তু এ প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, গীতায় ধ্যানযোগের উপদেশ ও উচ্চ প্রশংসা আছে বলিয়াই যে পাতঞ্জল রাজযোগ বলিয়া যাহা পরিচিত তাহাই সর্বাংশে গ্রহণ করিতে হইবে, এরূপ নহে। ধ্যানযোগ সকল সাধন-প্রণালীরই অন্তর্ভুক্ত, কেননা ইষ্টবস্তুর ধ্যান ধারণা ব্যতীত সাধন হয় না। কিন্তু সেই ইষ্ট সকলের এক নহে। পাতঞ্জল-যোগ সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং উহার উদ্দেশ্য কৈবল্যসিদ্ধি দ্বারা 'আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি' অর্থাৎ প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া কেবল হওয়া। 'নির্বীজ সমাধি' দ্বারা এই অবস্থা লাভ হয়, তখন চিত্তের বৃত্তিশক্তি নষ্ট হইয়া যায়, শরীরটা যে কয় দিন থাকে, দগ্ধ সূত্রের ন্যায় আভাস মাত্রে অবস্থান করে।

ইহাতে 'আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি' হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে সুখের সংস্পর্শ নাই, বস্তুতঃ ইহাতে রোগনাশের সঙ্গে সঙ্গে রোগীরও শেষ হয়, ইহাকেই মোক্ষ বলা হয়। কিন্তু গীতোক্ত ধ্যানযোগে আত্যন্তিক সুখলাভ হয়, সে সুখ

ব্রহ্মসংস্পর্শজ, আত্মদর্শনজনিত; সেই আত্মদেব আর কে?—শ্রীভগবানই। সুতরাং এই জ্ঞান লাভ হইলে সর্বত্র ভগবদ্দর্শন হয় (গীঃ ৬।২৮-৩০)। বস্তুতঃ গীতোক্ত ধ্যানযোগ ভক্তিযোগেরই অঙ্গ। এই কথাটি স্পষ্ট করিবার জন্য ৬।২৯-৩০ শ্লোকে এক তত্ত্বই দুই ভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে (৬।৩০ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

তাই শ্রীভগবান্ যোগাধ্যায় সমাপনান্তে শেষে বলিয়া দিলেন,—যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া সংযতচিত্তে আমাকে ভজনা করেন, তিনিই যোগে আমার সহিত সর্বাপেক্ষা অধিক যুক্ত ('যুক্ততমো মতঃ' ৬।৪৭)। আবার, পাতঞ্জল-রাজযোগের লক্ষ্য যে কৈবল্য-সিদ্ধি বা গুণাতীত হওয়া, সে তত্ত্ব গীতায়ও সবিস্তারে বর্ণিত আছে, কিন্তু সে স্থলেও শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—ঐকান্তিক ভক্তিযোগে আমার সেবা করিলেই গুণাতীত হইয়া ব্রহ্মভাব লাভ করা যায়, কেননা আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা (১৪।২২-২৭)—'আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে'।

গীতোক্ত কর্মযোগ সম্বন্ধেও এ কথাও মনে রাখা উচিত যে, উহা প্রাচীন বৈদিক কর্মযোগ নয়। সে কর্মযোগে কর্ম বলিতে বুঝাইত শ্রৌত স্মার্ত যাগযজ্ঞাদি কর্ম, সে সকল অধিকাংশই কাম্য কর্ম। গীতায় কাম্য কর্মের স্থান নাই এবং কর্ম ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত ('সর্বকর্মাণি')।

প্রকৃতপক্ষে গীতোক্ত যোগটি কি, এ সম্বন্ধে অস্পষ্টতা ও নানারূপ মতভেদের মূল কারণ হইতেছে এই—

গীতা প্রচারের সময় যাগযজ্ঞাদিমূলক বৈদিক কর্মযোগ, কর্মসন্ন্যাসমূলক বৈদান্তিক জ্ঞানযোগ, আত্যন্তিক-দুঃখনিবৃত্তিমূলক পাতঞ্জল ধ্যানযোগ—এই তিনটি মার্গ প্রচলিত ছিল। ইহার কোনটির সহিতই ভক্তির সম্পর্ক ছিল না। শ্রীগীতা মীমাংসকদের প্রাচীন কর্মযোগের কর্ম রাখিলেন, যজ্ঞ রাখিলেন, জ্ঞানবাদীদের ন্যায় উহা অগ্রাহ্য করিলেন না, কিন্তু কর্মের ও যজ্ঞের অর্থ সম্প্রসারণ করিলেন, কর্মকে নিষ্কাম করিয়া জ্ঞানপূত করিলেন এবং ঈশ্বরার্পিত করিয়া ভক্তিপূত করিলেন। জ্ঞানবাদীদের জ্ঞানযোগের জ্ঞান রাখিলেন, কিন্তু উহাকে সন্ন্যাসবাদের নিগড় হইতে মুক্ত করিয়া ত্যাগমূলক নিষ্কাম কর্মের সহিত যুক্ত করিয়া বিশ্বকর্মের সহায়ক করিলেন। পাতঞ্জল ধ্যানযোগীদের ধ্যান রাখিলেন, কিন্তু সেই ধ্যানকে ঈশ্বরমুখী করিয়া অনন্যভক্তিযোগের অঙ্গীভূত করিলেন। এইরূপে কর্ম, জ্ঞান, ধ্যান ও ভক্তির সমন্বয় করিয়া এই অপূর্ব যোগধর্মের প্রচার করিলেন। কর্ম, জ্ঞান, ধ্যান বা ভক্তি ইহার কোন একটি মার্গের উল্লেখ করিয়া ইহার নামকরণ করা যায় না। তবে

ইহাকে ভক্তিযোগ বলিলে অসঙ্গত হয় না, কেননা ইহাতে কর্ম, জ্ঞান, ও ধ্যান ভক্তিযোগের অঙ্গস্বরূপে গৃহীত হইয়াছে। পূর্ববর্তী মীমাংসকের কর্মযোগে, অদ্বৈত-বেদান্তীর জ্ঞানযোগে এবং পতঞ্জলির রাজযোগে ভক্তির সম্পর্ক নাই—ঈশ্বর-তত্ত্ব অতি গৌণ এবং প্রায় অস্বীকৃত। শ্রীগীতাই প্রথম ভক্তিবাদ প্রচার করেন এবং বেদ, বেদান্ত ও প্রাচীন যোগশাস্ত্রের যাহা সারতত্ত্ব তাহা সকলই উহাতে গ্রহণ করিয়া এই সর্বতঃপূর্ণ সার্বজনীন যোগধর্ম প্রচার করেন। কিন্তু গীতার পূর্ববর্তী ঐ সকল মতে আস্থাবান্ বা দীক্ষিত গীতাচার্যগণ সাম্প্রদায়িক আগ্রহ বা সংস্কারবশতঃ উহাদেরই কোন একটি গীতার প্রতিপাদ্য, ইহাই সপ্রমাণ করিতে সচেষ্ট। কিন্তু সম্প্রদায় হইতে সত্য বড়। সত্য পাইব কোথায় ? আমাদের মত অল্পজ্ঞ গীতাপাঠকের অবস্থা—'অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।'

এতৎপ্রসঙ্গে ভূমিকা এবং নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি ও উহাদের ব্যাখ্যাও দ্রষ্টব্য—২।৪৮, ২।৫৩, ৩।২৭, ৩।৩০, ৪।১৮, ৫।২৯ ইত্যাদি।

এস্থলে যে জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি-মিশ্র পূর্ণাঙ্গ যোগ ব্যাখ্যাত হইল, ইহা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে হইলে আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব, ভগবত্তত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব ইত্যাদির প্রকৃত স্বরূপ কি এবং উহাদের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ কি তাহা জানা আবশ্যক। এই সকল আবশ্যক তত্ত্ব পরবর্তী অধ্যায়সমূহে বর্ণিত হইয়াছে এবং সপ্তম অধ্যায়ের ২য় শ্লোকে সে কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ গীতার পরবর্তী অধ্যায়সমূহ সম্যক্ অধিগত না করিলে গীতোক্ত যোগতত্ত্ব স্পষ্ট বুঝা যায় না। কাজেই এই তত্ত্ব বুঝাইতে আমাদিগকে পরবর্তী অধ্যায়সমূহের অনেক কথাই নানাস্থানে সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে হইয়াছে।

গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে প্রধানতঃ কর্ম-তত্ত্ব বা কর্ম-মাহাত্ম্যই বর্ণিত হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিষ্কাম কর্মের সহিত জ্ঞান, ভক্তি ও যোগের কি সম্বন্ধ তাহা আলোচিত হইয়াছে। এই ছয় অধ্যায়কে (**প্রথম ষট্‌ক**) **কর্মকাণ্ড** বলে।

সপ্তম অধ্যায়

জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগ

শ্রীভগবান্ উবাচ

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ।

অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥ ১

১। শ্রীভগবান্ উবাচ—হে পার্থ, ময়ি (আমাতে) আসক্তমনাঃ (নিবিষ্টচিত্ত) মদাশ্রয়ঃ (আমার শরণাগত হইয়া) যোগং যুঞ্জন্ (যোগযুক্ত হইয়া) সমগ্রং মাং (সর্ববিভূতিসম্পন্ন আমাকে) যথা অসংশয়ং জ্ঞাস্যসি (যেরূপ ভাবে নিঃসংশয়রূপে জানিতে পারিবে) তৎ শৃণু (তাহা শ্রবণ কর)।

সমগ্রং—বিভূতিবলৈশ্বর্যাদিসহিতং (শ্রীধর), বিভূতি, বল ও ঐশ্বর্যাদির সহিত। আমার অব্যক্ত ও ব্যক্ত স্বরূপ, আমার নির্গুণ, সগুণ অবতার আদি সমস্ত বিভাবই জানিতে পারিবে, এই অভিপ্রায়ে 'সমগ্র' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে (৫।২৯ শ্লোকের ব্যাখ্যায় 'ব্রহ্ম ও পুরুষোত্তম-তত্ত্ব' দ্রষ্টব্য)।

ভগবৎ-স্বরূপ বর্ণন আরম্ভ ১-৩

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে পার্থ, তুমি আমাতে আসক্তচিত্ত এবং একমাত্র আমার শরণাপন্ন হইয়া যোগযুক্ত হইলে যেরূপে আমার সর্ববিভূতিসম্পন্ন সমগ্র স্বরূপ নিঃসংশয়ে জানিতে পারিবে তাহা শ্রবণ কর। ১

এস্থলে **'যোগ'** অর্থ—'সর্ব কর্ম ত্যাগ করিয়া ধ্যানস্তিমিতনেত্রে তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান' নহে; ইহার অর্থ—সর্বকামনা ত্যাগ করিয়া সর্বত্র সমত্ববুদ্ধি অবলম্বনপূর্বক সর্বকর্ম সহ ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ—এই অবস্থা লাভ করিয়াই নিষ্কাম কর্ম করিবার উপদেশ ('যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি' ইত্যাদি ২।৪৮); এই হেতু ইহাকে বুদ্ধিযোগ বা সমত্ব-বুদ্ধিযুক্ত নিষ্কাম কর্মযোগও বলা হয়। এই অর্থেই গীতায় 'যোগ' শব্দ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়াছে (২।৪৯, ২।৫০, ২।৫৩, ৪।৪১, ৪।৪২, ১২।১১, ১৮।৫৭ ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য)। ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত চিত্ত-নিরোধ যোগ এই অবস্থা লাভ করিবার উপায় স্বরূপে উল্লিখিত হইয়াছে।

পূর্ব অধ্যায়ের শেষে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, যোগিগণের মধ্যে যিনি মদ্গতচিত্তে আমাকে ভজনা করেন তিনিই যুক্ততম। কিন্তু এই আমি কে? তাঁহার সমগ্র স্বরূপ কি? কি ভাবে তাঁহাকে ভাবনা করিতে হয়, তাহা

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্‌ জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে॥ ২

এ পর্যন্ত কিছুই বলেন নাই। এই অধ্যায়ে এবং পরবর্তী অধ্যায়সমূহে সেই সকল গূঢ় রহস্য কথিত হইয়াছে।

২। অহং (আমি) তে (তোমাকে) সবিজ্ঞানম্‌ ইদং জ্ঞানম্‌ (বিজ্ঞানের সহিত এই জ্ঞান) অশেষতঃ বক্ষ্যামি (অশেষরূপে বলিব); যৎ জ্ঞাত্বা (যাহা জানিয়া) ইহ (শ্রেয়োমার্গে) ভূয়ঃ (পুনঃ আর কিছু) জ্ঞাতব্যম্‌ ন অবশিষ্যতে (জানিবার অবশিষ্ট থাকিবে না)।

সবিজ্ঞানম্‌—বিজ্ঞানসহিতং স্বানুভবসংযুক্তম্‌ (শঙ্কর)—অনুভবের সহিত। জ্ঞান বলিতে বুঝায় গুরু-শাস্ত্রোপদেশজনিত জ্ঞান। ঐ জ্ঞানের যখন অনুভব হয়, তখন উহাকে বলা যায় বিজ্ঞান-সংযুক্ত জ্ঞান। এস্থলে শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন যে, আমি তোমাকে আমার সমগ্র স্বরূপবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দিব এবং তৎসঙ্গে আমার প্রকৃত স্বরূপ অনুভবের যে উপায় তাহাও বলিব। তাহার এক উপায় হইতেছে ভক্তি-যোগ বা ভক্তিমিশ্র কর্মযোগ। এই অধ্যায়ে এবং পরবর্তী অধ্যায়সমূহে সর্বত্রই ঈশ্বরের বিবিধ বিভূতি বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে পাইবার উপায় যে অনন্যা ভক্তি তাহা স্পষ্টই বলা হইয়াছে। (৭ম।১৬-১৯।২৩।২৮-২৯ এবং ৮ম।১৪।২২, ৯ম।২৫।৩০।৩৩-৩৪, ১১শ।৫৪-৫৫, ১২শ ৬ ৮, ১৩শ।১৮, ১৪শ।২৬-২৭, ১৫শ।১৯, ১৮শ।৫৫।৬৪-৬৬ দ্রষ্টব্য।

লোকমান্য তিলক বলেন—এই নশ্বর সৃষ্টি-প্রপঞ্চের মধ্যে যে অবিনশ্বর পরতত্ত্ব অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছেন তাহা জানিবার নাম জ্ঞান, আর সেই একই নিত্য পরতত্ত্ব হইতে এই বিবিধ নশ্বর পদার্থের কিরূপে উৎপত্তি হয়, তাহা বুঝিবার নাম বিজ্ঞান। পরমেশ্বরী জ্ঞানেরই সমষ্টিরূপ (জ্ঞান) ও ব্যষ্টিরূপ (বিজ্ঞান) এই দুই ভেদ আছে। উহাই ক্ষরাক্ষর-বিচার, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিচার, পুরুষ-প্রকৃতি বিচার-ভেদে বিভিন্ন প্রকার। এই অধ্যায়ে ক্ষরাক্ষর-বিচার আরম্ভ হইয়াছে। পরে ১৩শ অধ্যায়ে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিচার ও ১৪শ অধ্যায়ে পুরুষ-প্রকৃতি-বিচার বর্ণিত হইয়াছে।

আমি তোমাকে বিজ্ঞানসহ মৎস্বরূপ-বিষয়ক জ্ঞান বিশেষরূপে বলিতেছি। উহা জানিলে শ্রেয়োমার্গে পুনরায় জানিবার আর কিছু অবশিষ্ট থাকিবে না। ২

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩
ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪

৩। মনুষ্যাণাং সহস্রেষু (সহস্র সহস্র মনুষ্য মধ্যে) কশ্চিৎ (এক জন হয়ত) সিদ্ধয়ে যততি (সিদ্ধিলাভের জন্য যত্ন করে); যততাং অপি সিদ্ধানাং (প্রযত্নকারী সিদ্ধপুরুষদিগের মধ্যেও) কশ্চিৎ ([সহস্রের মধ্যে] হয় ত এক জন) মাং তত্ত্বতঃ বেত্তি (আমাকে স্বরূপতঃ বিদিত হয়)।

সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে হয় ত এক জন মদ্বিষয়ক জ্ঞান লাভের জন্য যত্ন করে। আবার, যাঁহারা যত্ন করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন মনে করেন, তাঁহাদিগেরও সহস্রের মধ্যে হয়ত এক জন আমার প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারেন। (অর্থাৎ যাঁহাদিগকে তত্ত্বজ্ঞানী বা আত্মজ্ঞানী বলে তাঁহাদিগেরও সহস্র জনের মধ্যে হয়ত এক জন আমার প্রকৃত স্বরূপ জানেন। উহা অতি গুহ্য বিষয়)। ৩

৪। ভূমিঃ (পৃথিবী) আপঃ (জল) অনলঃ (তেজ) বায়ুঃ (বায়ু) খং (আকাশ) মনঃ বুদ্ধিঃ অহংকারঃ এব চ ইতি ইয়ং মে (এই আমার) অষ্টধা ভিন্না প্রকৃতিঃ (অষ্টভাগে বিভক্ত প্রকৃতি)।

ভগবানের পরা ও অপরা প্রকৃতি ৪-৭

ক্ষিতি, অপ্ (জল), তেজ, মরুৎ (বায়ু), ব্যোম (আকাশ), মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, এইরূপে আমার প্রকৃতি অষ্ট ভাগে ভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে। ৪

এই শ্লোকের অর্থ সম্যক্ অবধারণ করিতে হইলে সাংখ্য-দর্শনের অল্পবিস্তর আলোচনা আবশ্যক। উহা নিম্নে করা হইয়াছে।

সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্ব—প্রকৃতি ও পুরুষ

সাংখ্য দর্শন বলেন—সংসার দুঃখময়, জীব. ত্রিবিধ তাপে তাপিত। এই ত্রিবিধ দুঃখ নিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ। এই দুঃখ নিবৃত্তির একমাত্র উপায়—জ্ঞান ('জ্ঞানান্মুক্তিঃ', সাংখ্যসূত্র ৩২।৩)। কিসের জ্ঞান ?—পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বের জ্ঞান, প্রকৃতি ও পুরুষের পার্থক্য জ্ঞান, অর্থাৎ এই সৃষ্টিপ্রপঞ্চ কি এবং উহার সহিত আত্মার কি সম্বন্ধ—এই জ্ঞান। পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব কি ? ২৩ বিকার সহ মূল প্রকৃতি এবং পুরুষ, অথবা অষ্ট প্রকৃতি, ষোড়শ বিকার এবং পুরুষ।

সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ, প্রকৃতের্মহান্, মহতোঽহঙ্কারঃ, অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং, তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি, পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ —সাঃ সূঃ ১।৬১ ॥

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি, প্রকৃতির বিকার মহৎ তত্ত্ব, মহতের বিকার অহঙ্কার, অহঙ্কারের বিকার পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্রের বিকার পঞ্চ মহাভূত, এই ২৪ তত্ত্ব এবং পুরুষ—এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব।

প্রকৃতি—জগতের যাহা মূল উপাদান তাহার নাম প্রকৃতি ('প্রকৃতিরিহ মূলকারণস্য সংজ্ঞামাত্রম্')। ইহা অনাদি, অন্তহীন, নিত্য, অসীম, অতি সূক্ষ্ম, অলিঙ্গ ও নিরবয়ব বা নির্বিশেষ। প্রধান, অব্যক্ত, ত্রৈগুণ্য ইত্যাদি ইহার নামান্তর। এই অব্যক্তের পরিণামেই ব্যক্ত জগৎ ('অব্যক্তাদীনি ভূতানি', ইত্যাদি গীতার ২।২৮ শ্লোক)। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাই এই অব্যক্ত অবস্থা, এই হেতু ইহার নাম ত্রৈগুণ্য। এই তিন গুণের স্বভাব পরস্পর-বিরোধী। সত্ত্বের স্বভাব প্রকাশ বা জ্ঞান, তমের স্বভাব অপ্রকাশ বা মোহ, রজের স্বভাব প্রবৃত্তি বা কর্ম-প্রবণতা। জড়বিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, রজের স্বভাব গতি বা বল (energy, activity), তমের স্বভাব বাধা (resistance, inertia), সত্ত্ব হইতেছে উভয়ের সামঞ্জস্যকারক (harmony)। প্রলয়কালে এই তিন গুণ সাম্যাবস্থায় থাকে অর্থাৎ তুল্যবলে তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করে, ইহাই অব্যক্তাবস্থা। সৃষ্টিকালে গুণত্রয়ের সাম্যভঙ্গ হয় এবং বিসদৃশ পরিণামাত্মক সৃষ্টি আরম্ভ হয়। কোথাও সত্ত্ব প্রবল হইয়া প্রকাশ, জ্ঞান, সুখ, এই সকল উৎপন্ন করে, কোথাও রজঃ প্রবল হইয়া চঞ্চলতা, প্রবৃত্তি, দুঃখ, এই সকল আনয়ন করে, কোথাও তমঃ প্রবল হইয়া মোহ, অজ্ঞান বা জড়তা উৎপাদন করে। জগতের সকল পদার্থই এই তিন গুণের ন্যূনাধিক্যে সৃষ্ট, ত্রিগুণ ব্যতীত পদার্থ নাই (গীতা ১৮।৪০ শ্লোক)। নির্জীব পদার্থে তমোগুণদ্বারা সত্ত্ব সম্পূর্ণ আবৃত থাকে, সুতরাং উহারা অচেতন ও অচঞ্চল, কিন্তু উহাদের ভিতরে রজোগুণের ক্রিয়াও চলিতে থাকে। বৃক্ষলতাদিতে তমোগুণের প্রাধান্য, রজঃ ও সত্ত্ব স্বল্প পরিস্ফুট, উহাদেরও অনুভূতি ও চেতনা আছে। ইতর জন্তুতেও তিন গুণই পরিস্ফুট, কিন্তু তমঃ ও রজোগুণের আধিক্যে সত্ত্বগুণ অভিভূত থাকে। মনুষ্যে তিন গুণই স্পষ্টরূপে পরিস্ফুট হইলেও বুদ্ধি, বিবেক, বিচারশক্তি আদি সত্ত্বগুণের লক্ষণ সকলের সমান থাকে না। শাস্ত্রে গুণভেদ অনুসারেই কর্ম-ভেদ ও উপাসনা-

প্রণালীরও ভেদ নির্দিষ্ট হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, সকল সাধনারই উদ্দেশ্য হইতেছে তমঃ ও রজোগুণকে অর্থাৎ অজ্ঞান ও কাম-ক্রোধাদিকে দমন করিয়া সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ সাধন করা এবং পরিণামে সত্ত্বগুণকেও অতিক্রম করিয়া ত্রিগুণাতীত হওয়া বা প্রকৃতির হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া। সমগ্র হিন্দু দর্শন-শাস্ত্র, হিন্দু সমাজগঠন, বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম ও বিবিধ সাধন-প্রণালী এই ত্রিগুণতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। জীব, ক্রমবিকাশে মনুষ্যজন্ম লাভ করিলেই আত্মচেষ্টায় মোক্ষাধিকারী হয়, মনুষ্যত্বের পরবর্তী সোপানই ব্রহ্মত্ব, সুতরাং মনুষ্য-জন্ম দুর্লভ। শাস্ত্রে আছে, জীব কর্মফলে ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণের পর সুকৃতি থাকিলে মনুষ্য-জন্ম লাভ করে।

জগতের প্রাচীনতম দর্শনশাস্ত্র কাপিল-সাংখ্য এই প্রকৃতিবাদে সৃষ্টিতত্ত্বের যে নিগূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, আধুনিক পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানাচার্যগণ বহু গবেষণার ফলে তাহারই অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি করিতেছেন। পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকগণ বহুকাল যাবৎ বলিয়া আসিতেছেন, ৬০।৭০টি মূল ভূতের (elements) সংযোগে এই জড়জগৎ রচিত, কিন্তু অধুনা তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই সকল মূল ভূতও এক চরম মহাভূতের বিকার মাত্র। এই চরম মহাভূতের তাঁহারা নাম দিয়াছেন প্রোটাইল (Protyle)। এই প্রোটাইলকে সাংখ্যের প্রকৃতি স্থানীয় বলা যায়, কিন্তু উহা ঠিক প্রকৃতি নহে। পাশ্চাত্ত্য-বিজ্ঞান স্থূলজগতের অতীত কিছু স্বীকার করে না, কিন্তু হিন্দু-দর্শন ⁻ জগতের অতীত সূক্ষ্মজগৎ, এবং তাহারও অতীত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারণ-জগৎ কল্পনা করেন। প্রকৃতি এই কারণ-জগতেরই নির্বিশেষ অব্যক্ত চরম উপাদান।

আবার বিগত শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানাচার্যগণ জড় ও জীবজগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে ক্রম-বিকাশ বা উৎক্রান্তিবাদ (Evolution Theory) আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার মূলসূত্রও সাংখ্যের প্রকৃতি-পরিমাণবাদেই পাওয়া যায়। এই পাশ্চাত্ত্য উৎক্রান্তিবাদ ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ-বিষয়ক পৌরাণিক মতবাদই প্রকারান্তরে সমর্থন করে। পাশ্চাত্ত্য মতানুসারে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অ্যামিবা (Amœba) নামক এককোষবিশিষ্ট জীববিশেষ হইতে ক্রম-বিকাশে শ্রেষ্ঠ প্রাণী মনুষ্যের উদ্ভব হইয়াছে। জীবতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন, 'অ্যামিবা' হইতে মনুষ্যজাতি উদ্ভবের পূর্ব পর্যন্ত মধ্যবর্তী বিভিন্ন জাতির বা যোনির সংখ্যা ৫৩ লক্ষ ৭৫ হাজার অথবা অবস্থা বিশেষে ইহার অনেক বেশীও হইতে পারে। অবশ্য ক্ষুদ্র মৎস্যের পূর্ববর্তী সজীব জন্তু ধরিলে আরও বহু বংশ

বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং আমাদের পুরাণাদিতে উল্লিখিত স্থাবর, জলচর, কৃমি, পক্ষী, পশু ও মনুষ্য জাতি লইয়া মোট ৮৪ লক্ষ যোনির বর্ণনাকে একেবারে কল্পনামূলক বা ভিত্তিহীন বলা চলে না। অবশ্য, উহা আনুমানিক হইতে পারে, পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের হিসাবও অনেকটা আনুমানিক সন্দেহ নাই।

এক্ষণে, প্রকৃতি হইতে কিরূপ পরম্পরাক্রমে এই জগৎ-প্রপঞ্চ অভিব্যক্ত হয়, তাহাই দেখা যাক। সৃষ্টির আরম্ভে প্রকৃতির সাম্যভঙ্গ হইলে তাহার যে প্রথম পরিণাম হয়, উহার নাম **মহত্তত্ত্ব**। আধুনিক সাংখ্যকারগণ উহাকেই **বুদ্ধিতত্ত্ব** বলেন।

"কোন কাজ করিবার পূর্বে মনুষ্যের তাহা করিবার বুদ্ধি বা সঙ্কল্প প্রথমে হওয়া চাই। সেইরূপ, প্রকৃতিরও স্বকীয় বিস্তার করিবার বুদ্ধি হওয়া চাই। তাই প্রকৃতিতে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরূপ গুণ প্রথমে উৎপন্ন হয়, সাংখ্যেরা এইরূপ স্থির করিয়াছেন; মনুষ্য সচেতন হওয়া প্রযুক্ত তাহার ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি মনুষ্য বুঝে, প্রকৃতি অচেতন বা জড় হওয়া প্রযুক্ত নিজের বুদ্ধির তাহার কোন জ্ঞান থাকে না। মানবী ইচ্ছার অনুরূপ কিন্তু অস্বয়ংবেদ্য কোন শক্তি জড় পদার্থেও আছে, একথা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন।" —গীতা-রহস্য, লোকমান্য তিলক

"Without the assumption of an atomic soul the commonest and the most general phenomena of Chemistry are inexplicable.

—*Haeckel quoted by Lokmanya Tilak in Gitarahasya*

"Modern science itself has been driven to the same conclusion. Even in the mechanical action of the atom there is a power which can only be called an inconscient will and in all the works of nature the pervading will does inconsciently the works of intelligence What we call mental intelligence is precisely the same thing in essence"

—*Sree Aurobindo*

মহত্তত্ত্বের পরিণাম **অহঙ্কার**। প্রকৃতির পরিণামে মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব উৎপন্ন হইলেও উহা একবস্তুসারই থাকে। যে গুণের প্রভাবে একবস্তুপরতা ভাঙ্গিয়া বহুবস্তুপরতা উৎপন্ন হয়, তাহাই অহঙ্কার। 'অহঙ্কার' অর্থ 'আমি-আমি করা' অর্থাৎ আমি পৃথক্, তুমি পৃথক্, এই ভাব। অন্য হইতে পৃথক্ থাকিবার ভাব-প্রবণতা বা অভিমানকেই অহঙ্কার বলে।

মনুষ্যে প্রকটীভূত অহঙ্কার, এবং যে অহঙ্কার-প্রযুক্ত গাছ, পাথর, জল কিংবা ভিন্ন ভিন্ন মূল পরমাণু একবস্তুসার প্রকৃতি হইতে নির্মিত হয়, উহাদের জাতি

একই। প্রভেদ এই যে, পাথরের চৈতন্য না থাকায় তাহার অহংএর জ্ঞান হয় না, এবং মুখ না থাকায় 'আমি পৃথক্' 'তুমি পৃথক্' এইরূপ স্বাভিমান' সহকারে সে নিজের পার্থক্য অন্যকে বলিতে পারে না। অন্য হইতে পৃথক্ থাকিবার তত্ত্ব অর্থাৎ অভিমান বা অহঙ্কারের তত্ত্ব সকল স্থানেই এক।

—গীতারহস্য, লোকমান্য তিলক

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক গুণভেদে অহঙ্কারেরও প্রকার-ভেদ হইয়া থাকে। অহঙ্কার আপন শক্তি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন করিতে আরম্ভ করিলে উহার বৃদ্ধি দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া সেন্দ্রিয় ও নিরিন্দ্রিয় পদার্থের সৃষ্টি করে। এক দিকে সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ দ্বারা **পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়** (হস্ত, পদ, বাক্, পায়ু, উপস্থ); **পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়** (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্) এবং উভয়েন্দ্রিয় **মন**, এই একাদশ ইন্দ্রিয় সৃষ্টি হয়। অপর দিকে তমোগুণের উৎকর্ষ হইয়া **পঞ্চ তন্মাত্র** বা পঞ্চ সূক্ষ্মভূত উৎপন্ন হয়। পঞ্চতন্মাত্র এই—শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র। এই পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চীকরণে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, অপ্ (জল) ও পৃথিবী এই **পঞ্চ স্থূলভূত** সৃষ্টি হয়। এই স্থূলভূতের পরিণামে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ সৃষ্টি।

তন্মাত্র অর্থ 'কেবল তাহাই' অর্থাৎ স্থূলভূতের যাহা সার, যাহা সূক্ষ্ম অবস্থা তাহাই তন্মাত্র। আকাশকে সূক্ষ্ম অবস্থায় পরিণত করিলে থাকে শব্দ, সুতরাং শব্দ আকাশের তন্মাত্র ; এইরূপ গন্ধ ভূমির তন্মাত্র বা সূক্ষ্মাবস্থা। সত্ত্বগুণ প্রকাশাত্মক, এই হেতু সত্ত্বগুণের উৎকর্ষে ইন্দ্রিয়াদির সৃষ্টি ; তমোগুণ আবরণাত্মক, এই হেতু তমোগুণের উৎকর্ষে স্থূলভূতের সৃষ্টি ; 'ইন্দ্রিয়' বলিতে এস্থলে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়ের শক্তি বুঝিতে হইবে ; কেননা, হস্ত, পদ বা চক্ষুর্গোলকাদি বাহ্য যন্ত্র দেহের অংশ এবং স্থূলভূতের অন্তর্গত, উহা প্রকৃত ইন্দ্রিয় নহে।

এই হইল প্রকৃতি-পরিণাম বা সৃষ্টিক্রম। প্রকৃতি জড়া, সুতরাং তাহার পরিণাম বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই জড় পদার্থ। কিন্তু ইহাদিগকে চেতনাত্মক বোধ হয় কেন? প্রকৃতপক্ষে জগৎ কেবল জড়াত্মক নহে, সৃষ্টিতে জড় ও চেতন উভয়ই সংসৃষ্ট। সাংখ্যমতে পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতিতে চৈতন্যের আভাস হয়। কিন্তু সাংখ্যের পুরুষ চেতন হইলেও নির্বিকার, অকর্তা ; প্রকৃতির গুণেই কর্ম হয়, পুরুষ কেবল সাক্ষী, ভোক্তা ও অনুমন্তা। "সাংখ্যমতে সৃষ্টিকালে প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর সংযুক্ত থাকে। তাহার ফলে পুরুষের গুণ প্রকৃতিতে ও প্রকৃতির গুণ পুরুষে উপচরিত হয়। সেই জন্য বস্তুতঃ অচেতন হইলেও প্রকৃতিকে চেতন বলিয়া মনে হয় এবং বস্তুতঃ অকর্তা হইলেও পুরুষকে কর্তা বলিয়া মনে হয়"।—গীতায় ঈশ্বরবাদ (বেদান্তরত্ন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত)

এই স্থলেই পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান অপেক্ষা সাংখ্যের শ্রেষ্ঠত্ব। "পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে যে, সচেতন মন অচেতন জড়ের ক্রিয়ারই পরিণাম ফল, কিন্তু জড় অচেতন কেমন করিয়া চেতনের মত হয় পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান তাহা ব্যাখ্যা করিতে পারে নাই, সাংখ্য তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছে। পুরুষের ভিতর প্রকৃতি প্রতিবিম্বিত হওয়াতেই এইরূপ হইয়া থাকে, আত্মার চৈতন্য জড়প্রকৃতির ক্রিয়ার উপর আরোপিত হয়। এইরূপে সাক্ষি-স্বরূপ পুরুষ নিজকে ভুলিয়া যায়, প্রকৃতির চিন্তা, ইচ্ছা, ক্রিয়া নিজের বলিয়া ভ্রম করে। এই ভ্রম হইতে পরিত্রাণ লাভই পুরুষের মুক্তি।"—শ্রীঅরবিন্দের গীতা

কিন্তু নিরীশ্বর সাংখ্যে ও সেশ্বর বেদান্তাদি শাস্ত্রে একটি গুরুতর প্রভেদ আছে। সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষই মূলতত্ত্ব। এই মতে প্রকৃতির স্বভাবই পরিণাম, এই জন্য উহাকে 'প্রসবধর্মী' বলে। উহা স্বয়ংই জগৎ সৃষ্টি করে, সৃষ্টির কারণান্তর নাই। কিন্তু বেদান্তাদি শাস্ত্র বলেন, ঈশ্বরের অধিষ্ঠানই প্রকৃতির সৃষ্টিরূপে পরিণামের প্রকৃত কারণ ('ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ৯।১০)। বেদান্তে ইহাকেই 'ঈক্ষণ' বলে ('স ঐক্ষত', 'স ইক্ষাঞ্চক্রে' ইত্যাদি শ্রুতি)। গীতাতে ইহাকেই প্রকৃতিতে গর্ভাধান বলা হইয়াছে (১৪।৩ শ্লোক)। সুতরাং গীতা, সাংখ্যের পুরুষ, প্রকৃতি ও তাহার পরিণাম-ক্রম স্বীকার করেন বটে, কিন্তু পুরুষ ও প্রকৃতিই যে মূলতত্ত্ব তাহা স্বীকার করেন না। মূলতত্ত্ব সেই পরম পুরুষ, পুরুষোত্তম বা পরব্রহ্ম,—পুরুষ ও প্রকৃতি তাঁহারই বিভাব; তাঁহারই ইচ্ছায় বা অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি সৃষ্টি করে, প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য নাই। তাই গীতায় জড়া প্রকৃতিকে শ্রীভগবানের **অপরা প্রকৃতি** এবং চেতন পুরুষকে **পরা প্রকৃতি** বলা হইয়াছে (৭।৪-৫ শ্লোক)। নিম্নের বংশবৃক্ষে সৃষ্টিতত্ত্ব বিবরণ সংক্ষেপে লিখিত হইল।
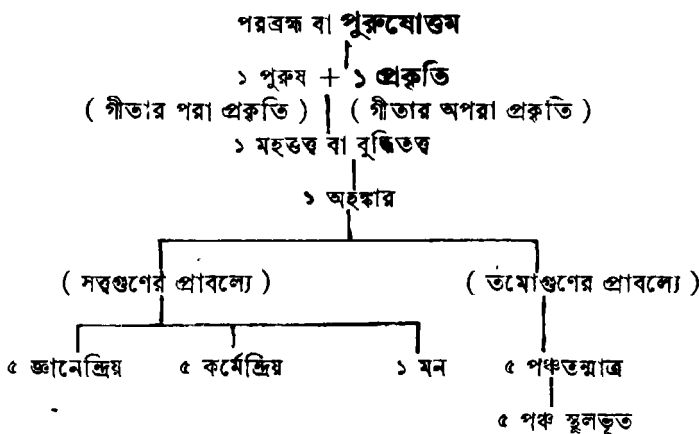
সাংখ্য দর্শন এই ২৫ তত্ত্বের এইরূপ বিভাগ করেন—

১ মূল-প্রকৃতি।

৭ প্রকৃতি-বিকৃতি— ১ মহত্তত্ত্ব, ১ অহঙ্কার, ৫ পঞ্চ তন্মাত্র।

ইহাদিগকে প্রকৃতি-বিকৃতি বলিবার কারণ এই যে, ইহাদের প্রত্যেকটি অন্য তত্ত্বের কারণ, সুতরাং উহারা প্রকৃতি; অথচ নিজে অন্য তত্ত্ব হইতে উদ্ভূত, সুতরাং উহারা বকৃতি। যেমন, মহত্তত্ত্ব মূল প্রকৃতির বিকৃতি অপিচ অহঙ্কারের প্রকৃতি, অহঙ্কার মহত্তত্ত্বের বিকৃতি, পঞ্চতন্মাত্রের প্রকৃতি ইত্যাদি।

১৬ বিকৃতি— ৫ জ্ঞানেন্দ্রিয়, ৫ কর্মেন্দ্রিয়, ১ মন, ৫ স্থূলভূত ;

এই ষোড়শটিকে কেবল বিকার বলা হয়, কারণ ইহা হইতে অন্য কোন তত্ত্ব উদ্ভূত হয় নাই।

১ অপ্রকৃতি-অবিকৃতি— ১ পুরুষ।

পুরুষ প্রকৃতিও নহেন, বিকৃতিও নহেন, স্বতন্ত্র, উদাসীন।

মোট ২৫ তত্ত্ব।

সুতরাং মূল-প্রকৃতি এবং প্রকৃতি-বিকৃতি লইয়া অষ্ট প্রকৃতি, ষোড়শ বিকার এবং পুরুষ, এই ২৫ তত্ত্ব।

গীতাতেও ৭।৪ শ্লোকে প্রকৃতিকে অষ্টধা বিভক্ত বলা হইয়াছে। কিন্তু ক্ষিতি আদি পঞ্চভূত এবং মন, যেগুলি সাংখ্যমতে বিকৃতি, তাহা প্রকৃতি মধ্যে ধরা হইয়াছে। এই হেতু টীকাকারগণ বলেন, এস্থলে পঞ্চ স্থূলভূতের স্থলে উহাদের কারণ পঞ্চ তন্মাত্র, মনের স্থলে উহার কারণ অহঙ্কার, অহঙ্কার বলিতে উহার কারণ অবিদ্যা বা প্রকৃতিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

ভূম্যাদি শব্দৈঃ শব্দগন্ধাদি তন্মাত্রাণ্যুচ্যন্তে। মনঃ শব্দেন তৎকারণ-ভূতোঽহঙ্কারঃ। বুদ্ধিশব্দেন তৎকারণং মহত্তত্ত্বম্ অহঙ্কারশব্দেন তৎকারণমবিদ্যা। ইত্যেবমষ্টধা ভিন্না (শ্রীধর)।

গীতায় অন্যত্রও সাংখ্যোক্ত ২৪ তত্ত্বই স্বীকৃত হইয়াছে (১৩।৫), সুতরাং এই ভাবে সাংখ্যোক্ত তত্ত্বের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করা প্রয়োজন।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥ ৫
এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬

৫। ইয়ং অপরা (ইহা অপর প্রকৃতি); ইতঃ পরাম্ (ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ) অন্যাং জীবভূতাং (অন্যরূপ জীবরূপা) মে প্রকৃতিং বিদ্ধি (আমার প্রকৃতি জানিও), হে মহাবাহো, যয়া (যাহা দ্বারা) ইদং জগৎ ধার্যতে (এই জগৎ ধৃত রহিয়াছে)।

জীবভূতাং—(জীবরূপাং), ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণাং, প্রাণধারণনিমিত্তভূতাং (শঙ্কর)।

এই পূর্বোক্ত অষ্টবিধা প্রকৃতি আমার অপরা প্রকৃতি। ইহা ভিন্ন জীবরূপা চেতনাত্মিকা আমার পরা প্রকৃতি আছে জানিও; হে মহাবাহো, সেই পরা প্রকৃতি দ্বারা জগৎ বিধৃত রহিয়াছে। ৫

পরা প্রকৃতি—পুরুষ। পূর্বোক্ত অপরা প্রকৃতি জড়া, পরা প্রকৃতি চেতন, জীবভূতা; ইহাই সাংখ্যের পুরুষ, ইহাই ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীবচৈতন্য। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে এ বিষয়ের বিস্তারিত বিচার করা হইয়াছে। তথায় ভগবান্ বলিয়াছেন, আমিই ক্ষেত্রজ্ঞরূপে সর্বক্ষেত্রে বিদ্যমান আছি, সকলকে ধরিয়া আছি। ("তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ"—ইহা শ্রুতিবাক্য)। প্রকৃতি-জড়িত খণ্ডচৈতন্যই এই পরা প্রকৃতি। আধার যেমন আধেয়কে ধরিয়া রাখে, সেইরূপ এই অধিষ্ঠানচৈতন্য দৃশ্যপ্রপঞ্চকে ধরিয়া আছেন। জীবদেহে যেমন যত দিন প্রাণ থাকে ততদিন দেহ থাকে, নচেৎ দেহ নষ্ট হইয়া যায়,—কারণ এই দেহধারণের হেতুই জীবচৈতন্য, জড়া প্রকৃতির সর্বত্রই সেইরূপ চেতন আত্মা বা পরা প্রকৃতি আছেন বলিয়াই উহার সত্তা আছে, নচেৎ উহার সত্তা থাকে না। "এই চৈতন্য কোথায়ও অভিব্যক্ত, কোথায়ও বা আপন আবরণে আপনি বিশেষরূপে বদ্ধ। এই বিশেষ আবৃতাবস্থাই জড়ত্ব।" এই হেতুই বলা হইয়াছে, এই চরাচর জগৎ আমার পরা প্রকৃতি দ্বারা বিধৃত।

৬। সর্বাণি ভূতানি (চেতনাচেতনাত্মক সর্বভূত) এতদ্‌যোনীনি (এই উভয় প্রকৃতি হইতে জাত) ইতি উপধারয় (ইহা জানিও); অহং (আমি) কৃৎস্নস্য জগতঃ (সমগ্র জগতের) প্রভবঃ (উৎপত্তির কারণ) তথা প্রলয়ঃ (এবং প্রলয়ের কারণ)।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭
রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাঽস্মি শশিসূর্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮

ভূতানি—সর্বভূত, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক নিখিল জগৎ। **এতদ্ যোনীনি**—এতে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপে দ্বিবিধে প্রকৃতী যোনী কারণভূতে যেষাং তানি—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞরূপ অপরা ও পরা প্রকৃতিদ্বয় যাহার কারণ (সেই জগৎ)।

সমস্ত ভূত এই দুই প্রকৃতি হইতে জাত, ইহা জানিও। সুতরাং আমিই নিখিল জগতের উৎপত্তি ও লয়ের কারণ। (সুতরাং আমি প্রকৃতপক্ষে জগতের কারণ)। ৬

অচেতনা অপরা প্রকৃতি দেহাদিরূপে (ক্ষেত্র) পরিণাম প্রাপ্ত হয়, চেতনা পরাপ্রকৃতি বা জীবচৈতন্য (ক্ষেত্রজ্ঞ) ভোক্তৃরূপে দেহে প্রবেশ করিয়া দেহাদি ধারণ করিয়া রাখে। এই দুই প্রকৃতি আমারই প্রকৃতি, আমা হইতেই উৎপন্ন বা আমারই বিভাব, সুতরাং আমিই প্রকৃতপক্ষে জগতের কারণ। ৬

৭। হে ধনঞ্জয়, মত্তঃ (আমা অপেক্ষা) পরতরম্ (শ্রেষ্ঠ) অন্যৎ কিঞ্চিৎ ন অস্তি (আর কিছুই নাই); সূত্রে মণিগণাঃ ইব (সূত্রে মণিসমূহের ন্যায়) ময়ি ইদং সর্বং (আমাতে এই সকল) প্রোতম্ (গ্রথিত, আশ্রিত আছে)।

হে ধনঞ্জয়, আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পরমার্থ-তত্ত্ব অন্য কিছু নাই; সূত্রে মণিসমূহের ন্যায় সর্বভূতের অধিষ্ঠানস্বরূপ আমাতে এই সমস্ত জগৎ রহিয়াছে। ৭

৮। হে কৌন্তেয়, অহং অপ্সু (জলমধ্যে) রসঃ, শশিসূর্যয়োঃ (চন্দ্র ও সূর্যে) প্রভা, সর্ববেদেষু (সকল বেদে) প্রণবঃ (ওঙ্কার), খে (আকাশে) শব্দঃ, নৃষু (মনুষ্য-মধ্যে) পৌরুষম্ অস্মি (হই)।

সমস্তই ভগবৎ সত্তায় সত্তাবান্। ৮-১২

হে কৌন্তেয়, জলে আমি রস, শশিসূর্যে আমি প্রভা, সর্ববেদে আমি ওঙ্কার, আকাশে আমি শব্দ, মনুষ্যমধ্যে আমি পৌরুষরূপে বিদ্যমান আছি। ৮

সকল পদার্থেরই যাহা সার, যাহা প্রাণ, তাহাতেই আমি অধিষ্ঠান করি। আমা ব্যতীত জল রসহীন, শশিসূর্য প্রভাহীন, আকাশ শব্দহীন, পুরুষ পৌরুষহীন হয়; অর্থাৎ আমার সত্তায়ই সকলের সত্তা। ৮

পুরুষকার—'পৌরুষং নৃষু'—'মনুষ্যে আমি পৌরুষ'—৮ম শ্লোকের এই কথাটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়, বিশেষতঃ অদৃষ্টবাদী আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসী, পর-প্রত্যাশী লোকের। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, মনুষ্যের যাহাতে মনুষ্যত্ব—সেই পৌরুষ আমিই। আমা হইতেই মনুষ্যের কর্মোদ্যম, কর্মশক্তি, পুরুষকার। এ-কথার ভিতরে দুইটি গূঢ়ভাব আছে: একটি এই—মনুষ্যের শক্তি ঈশ্বরেরই শক্তি, সুতরাং সেজন্য শক্তিমানের গৌরব করিবার কিছু নাই। এই ভাবটি গ্রহণ করিলে 'আমিত্বে'র প্রসার লোপ পায়।

একদা দেবগণ যখন বিজয়গর্বে আত্মগৌরব অনুভব করিতেছিলেন, তখন ব্রহ্ম তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া একগাছি তৃণ রাখিয়া বলিলেন, তোমাদের যত শক্তি থাকে প্রয়োগ কর। অগ্নি সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও তৃণটি দগ্ধ করিতে পারিলেন না ('সর্বজবেন তন্ন শশাক দগ্ধুম্'—কেন উপ, ৩।৬)। বায়ু সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও উহা উড়াইতে পারিলেন না ('সর্বজবেন তন্ন শশাকাদাতুম্')। উপনিষদের ঋষি এই দেবতা-বিষয়ক আখ্যানে পূর্বোক্ত তত্ত্বটিই পরিস্ফুট করিয়াছেন।

মহাভারতে দেখি, কুরুক্ষেত্র অন্তে শ্রীকৃষ্ণ যখন অন্তর্ধান করিলেন, তখন কুরুক্ষেত্র-বিজয়ী অর্জুন লগুড়ধারী কৃষকগণের হস্তে পরাস্ত হইলেন। এ আখ্যানেও এই তত্ত্বই পরিস্ফুট—শক্তি পার্থের নহে, পার্থ-সারথির, তাঁহার অভাবে পুরুষকারের প্রতিমূর্তি পার্থ পৌরুষহীন।

'পৌরুষং নৃষু'—এই কথার দ্বিতীয় ভাবটি হইতেছে এই যে, আমার মধ্যে তাঁহারই শক্তি, তিনিই পৌরুষরূপে আমার মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, তবে আমি শক্তিহীন কিসে? তবে আমি আত্মচেষ্টায় অনুদ্যোগী হইয়া বাহিরে তাঁহার সাহায্যই বা খুঁজি কেন? তিনি ত পৌরুষরূপে ভিতরেই আছেন, তাঁহাকে জাগ্রত করি না কেন? এই ভাবটি গ্রহণ করিলে আত্মশক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, অদৃষ্টবাদের ভ্রান্ত ধারণা বিদূরিত হয়। কর্মফল ও জন্মান্তর (জন্মান্তরবাদ দ্রঃ, ২৬ পৃঃ) হিন্দুধর্মের মজ্জাগত, সুতরাং অদৃষ্টবাদ উহার অঙ্গাঙ্গীভূত। কিন্তু অদৃষ্ট বা দৈব কি? উহা কর্ম বা পুরুষকারেরই ফল, আর কিছুই নহে। পূর্বজন্মের যাহা পুরুষকার তাহারই ফল ইহ-জন্মের অদৃষ্ট, ইহজন্মে যাহা পুরুষকার তাহারই ফল হইবে পরজন্মে অদৃষ্ট। সুতরাং পুরুষকার ব্যতীত অদৃষ্টের খণ্ডন হয় না। ব্যাস-বশিষ্ঠাদি শ্রেষ্ঠ ধর্মোপদেষ্টৃগণ সর্বত্রই জলন্ত ভাষায় পুরুষকারের জন্য প্রণোদনা করিয়াছেন।

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাং চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥ ৯
বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥ ১০

বশিষ্ঠদেব তারস্বরে বলিতেছেন—"ন গন্তব্যমনুদ্যোগৈঃ সাম্যং পুরুষগর্দভৈঃ।
উদ্যোগস্তু যথাশাস্ত্রং লোকদ্বিতয়সিদ্ধয়ে ॥"

—"পুরুষগর্দভের ন্যায় অনুদ্যোগী হইও না, শাস্ত্রানুযায়ী উদ্যোগ ইহলোক ও পরলোক উভয়লোকের উপকারী।"

অনেক সময় দেখা যায়, শত চেষ্টায়ও সিদ্ধিলাভ হয় না, নানা অনর্থ ঘটে। তখন বুঝিতে হইবে, তোমার প্রাক্তন অশুভ কর্মের ফল প্রবল। তখন আরও দৃঢ়ভাবে পুরুষার্থ প্রয়োগ করিতে হইবে।

"পরং পৌরুষমাশ্রিত্য দন্তৈর্দন্তান্ বিচূর্ণয়ন্।
শুভেনাশুভমুদ্যুক্তং প্রাক্তনং পৌরুষং জয়েৎ ॥"

—পৌরুষ আশ্রয় করিয়া দন্তে দন্ত বিচূর্ণ করিতে করিতে কর্মে লাগিয়া যাও, ঐহিক শুভকর্মদ্বারা প্রাক্তন অশুভ কর্মফল জয় কর। অন্য পন্থা নাই।

শুন, মহাবীর কর্ণকে সূতপুত্র বলিয়া বিদ্রূপ করাতে তিনি কি উত্তর দিয়াছিলেন,— "সূতো বা সূতপুত্রো বা যো বা কো বা ভবাম্যহং।
দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং হি পৌরুষম্ ॥"

—উচ্চবংশে বা নীচবংশে জন্ম দৈবায়ত্ত। কিন্তু পৌরুষ আমার আয়ত্ত। দেখিবে তোমরা আমার পৌরুষ।' এই সকলই দুর্বলের বলাধানের মন্ত্র। ৮

৯। [আমি] পৃথিব্যাং চ (পৃথিবীতে) পুণ্যঃ গন্ধঃ (পবিত্র গন্ধ), বিভাবসৌ চ (অগ্নিতে) তেজঃ অস্মি (তেজ হই); সর্বভূতেষু (সমস্ত ভূতে) জীবনং (প্রাণ), তপস্বিষু চ (তপস্বিগণে) তপঃ অস্মি (তপ হই)।

আমি পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধ, অগ্নিতে তেজ, সর্বভূতে জীবন, এবং তপস্বীদিগের তপঃস্বরূপ। ৯

১০। হে পার্থ, মাং (আমাকে) সর্বভূতানাং (সর্বভূতের) সনাতনং বীজং (নিত্য মূল কারণ) বিদ্ধি (জানিও); অহং (আমি) বুদ্ধিমতাং (বুদ্ধিমান্দিগের) বুদ্ধিঃ, তেজস্বিনাং চ (তেজস্বীদিগের) তেজঃ অস্মি (হই)।

হে পার্থ, আমাকে সর্বভূতের সনাতন বীজ বলিয়া জানিও। আমি বুদ্ধিমান্দিগের বুদ্ধি এবং তেজস্বিগণের তেজস্বরূপ। ১০

বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জিতম্।
ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥ ১১
যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ১২

১১। হে ভরতর্ষভ, অহং (আমি) বলবতাং (বলবান্‌দিগের) কামরাগবিবর্জিতং বলং (কামরাগশূন্য বল) অস্মি, ভূতেষু (প্রাণীদিগের মধ্যে) ধর্মাবিরুদ্ধ (ধর্মের অবিরোধী) কামঃ (অভিলাষ) অস্মি (হই)।

কামরাগবিবর্জিতম্—কামঃ অপ্রাপ্তেষু বস্তুষু অভিলাষঃ, রাগো রঞ্জনা প্রাপ্তেষু বিষয়েষু, তাভ্যাং বিবর্জিতম্ (শঙ্কর, শ্রীধর)=কাম—অপ্রাপ্ত বিষয়ে অভিলাষ, রাগ—প্রাপ্ত বিষয়ে আসক্তি; এই উভয়বর্জিত। **ধর্মাবিরুদ্ধঃ কামঃ**—ধর্মেণ শাস্ত্রার্থেন অবিরুদ্ধঃ কামঃ অভিলাষঃ অর্থাৎ ধর্মানুকূল শাস্ত্রানুগত জায়াপত্য ইত্যাদি বিষয়ে অভিলাষ। [ধর্ম+অবিরুদ্ধ]

হে ভরতর্ষভ, আমিই বলবান্‌দিগের কামরাগরহিত বল (অর্থাৎ স্বধর্মানুষ্ঠানসমর্থ সাত্ত্বিক বল) এবং প্রাণিগণের ধর্মের অবিরোধী কাম (অর্থাৎ দেহ-ধারণাদির উপযোগী শাস্ত্রানুমত বিষয়াভিলাষ)। ১১

আমি বলবান্‌দিগের বল, কিন্তু সে বল সাত্ত্বিক বল। তাহা বিষয়তৃষ্ণা ও বিষয়-আসক্তি রহিত। আবার আমিই প্রাণিগণের মধ্যে কামরূপে বিদ্যমান আছি। কিন্তু সেই কাম ধর্মের অবিরোধী, অর্থাৎ শাস্ত্রানুমত গার্হস্থ্য-ধর্মের অনুকূল দেহ-ধারণাদি বা স্ত্রী-পুত্রাদিতে অভিলাষ। ১১

১২। যে চ এব (যে সকল) সাত্ত্বিকাঃ (সত্ত্বগুণপ্রধান) রাজসাঃ (রজোগুণপ্রধান) তামসাঃ (তমোগুণপ্রধান) ভাবাঃ (ভাব) [আছে], তান্ (সেই সকলকে) মত্তঃ এব (আমা হইতে উৎপন্ন) ইতি বিদ্ধি (ইহা জানিও); তেষু (সেই সকলে) অহং ন তু (আমি নাই), তে ময়ি (তাহারা আমাতে রহিয়াছে)।

সাত্ত্বিক ভাব—শম, দম, জ্ঞান, বৈরাগ্যাদি। **রাজস ভাব**—হর্ষ, দর্প, লোভাদি। **তামস ভাব**—শোক, মোহ, নিদ্রালস্যাদি।

শমদমাদি সাত্ত্বিক ভাব, হর্ষদর্পলোভাদি রাজসিক ভাব, শোক-মোহাদি তামসিক ভাব, এই সকলই আমা হইতে জাত। কিন্তু আমি সে সকলে অবস্থিত নহি (অর্থাৎ জীবের ন্যায় সেই সকলের

অধীন নহি), কিন্তু সে সকল আমাতে আছে (অর্থাৎ তাহারা আমার অধীন)। ১২

'তাহারা আমাতে আছে, আমি সেই সমুদায়ে নাই', এ কথাটির গূঢ় মর্ম অনুধাবনযোগ্য। সকল বস্তু, সকল ভাবই আমা হইতে জাত, আমার সত্তায়ই তাহাদের সত্তা, 'স্নুতরাং তাহারা আমাতেই, আমাকে আশ্রয় করিয়াই আছে,' ইহা বলা যায়, কিন্তু আমি তাহাতে নই, কেননা আমি সম, শান্ত, নির্বিকার। প্রকৃতি আমা হইতে উদ্ভূত হইলেও আমি প্রকৃতির বিকারের অধীন নই। প্রীতি ও হিংসা উভয়ই আমা হইতে জাত, কিন্তু নির্গুণস্বরূপে আমি প্রীতিমান্‌ও নই, হিংস্রকও নই ('ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ'—৯।৪-৬।২৯ দ্রষ্টব্য)।

রহস্য—ঈশ্বর মঙ্গলময়, আনন্দময়, তাঁহার সৃষ্টিতে তবে অমঙ্গল কেন, দুঃখ কেন ?

প্রঃ—ঈশ্বর মঙ্গলময়, আনন্দময়, সত্যস্বরূপ, সর্বকল্যাণগুণোপেত—প্রেম-পবিত্রতার আধার, তবে তাঁহার সৃষ্ট জগতে দুঃখ কেন; অমঙ্গল কেন, অসত্য, হিংসা-দ্বেষ, পাপ, প্রলোভন—এ সকল কেন ? এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে উদিত হয়। সংসারে দুঃখকষ্ট কেন, ইহার উত্তরে অনেক সময় বলা হয়, জীবের শিক্ষার জন্য, সংশোধনের জন্য, সেই পরম পদলাভে যোগ্যতার পরীক্ষা-স্বরূপে এই সকল বিহিত হইয়াছে, যেমন অগ্নি-দাহনে স্বর্ণের বিশুদ্ধতা সম্পন্ন হয়। স্নুতরাং জীবের এই যে নিদারুণ দুঃখ-দাহন, ইহাও ভগবানের দয়া—'বারে বারে যত দুঃখ দিয়েছ, দিতেছ তারা, সে কেবলি দয়া তব জানিগো মা দুঃখহরা, সন্তান-মঙ্গল তরে, জননী তাড়না করে' ইত্যাদি—স্নুন্দর উপমা দ্বারা ভক্ত-কবি এই তত্ত্বটি ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু উপমা তো যুক্তি-প্রমাণ নহে। ইহার উত্তরে যুক্তিবাদিগণ বলেন, অবোধ শিশুকে বেত্রাঘাতের সাহায্যে শিক্ষা প্রদান করা এবং পরীক্ষায় অপারাগ হইলে পুনরায় অধিকতর নির্দয়রূপে প্রহার করা—এই যে শিক্ষার ব্যবস্থা, ইহা হৃদয়বান্ মানব-শিক্ষকেও করে না ; আর দয়াময়, প্রেমময়, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর ইহলোকে অশেষ দুঃখকষ্ট ও পরলোকে নিদারুণ নরক-যন্ত্রণার ব্যবস্থা ব্যতীত জীবশিক্ষার অন্য কোন উপায়ই পাইলেন না, ইহা কি যুক্তিসঙ্গত ? ঈশ্বর কি তবে মনুষ্য অপেক্ষাও হৃদয়হীন, অবিজ্ঞ ও অনিপুণ ? এ-কথার উত্তর কি ?

অন্য এক উত্তরে শুনা যায় যে, দুঃখভোগ জীবের ইহজন্মের বা পূর্ব-জন্মের কর্মফল, পাপের ফল, ন্যায়বান্ ঈশ্বরের উহা ন্যায্য ব্যবস্থা, উহাতে পক্ষপাতিত্ব বা নির্মমত্ব প্রকাশ পায় না। তাহাতেও এই সকল মূল প্রশ্ন

অমীমাংসিতই থাকিয়া যায় যে, কর্মের আদি প্রবর্তক কে, পাপের প্রবর্তক কে, পাপ তো অজ্ঞানের ফল, অজ্ঞান অপরাধীর কঠোর শাস্তিবিধান সমাজরক্ষক পার্থিব রাজার পক্ষে আবশ্যক হইলেও হইতে পারে, কিন্তু সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের পক্ষে অজ্ঞানীর প্রতি ঐরূপ নিদারুণ ব্যবস্থা ন্যায়সঙ্গত হয় কিরূপে? আর কর্মফল যদি অকাট্য, অখণ্ডনীয় হয়, কর্ম যদি ঈশ্বর অপেক্ষাও বড় হন, তবে জীব কাতরপ্রাণে ঈশ্বরকে ডাকে কেন, তবে 'কর্মেভ্যো নমঃ' বলিয়া পূর্বমীমাংসা মতানুসারে ও বৌদ্ধ মতানুসারে ঈশ্বর-টীশ্বর বাদ দিয়া আত্মসাধনা দ্বারা কর্মবীজ নাশের উপায় অবলম্বন করাই কি শ্রেয়ঃপথ নহে?

উঃ। সে এক পথ আছে, কিন্তু শ্রেয়ঃপথ বলা যায় না, কেননা উহাতে রোগনাশের সঙ্গে সঙ্গে রোগীরও শেষ হয়। সাংখ্যের কৈবল্য বা বৌদ্ধের নির্বাণে সব ফুরাইয়া যায়, উহাতে দুঃখের নাশ হয়, সুখের লেশ নাই। কিন্তু প্রাণ তো চায় আনন্দ ও অমরত্ব। যাক্ সে কথা। সংসারে দুঃখ কেন, পাপ কেন, মানবের অন্তরে এই যে ধর্মাধর্মের নিত্যবিবাদ, ইহার কারণ কি, সকল দেশের সকল ধর্মশাস্ত্রেই ইহার মীমাংসার চেষ্টা হইয়াছে। প্রাচীন জোরোয়াস্ট্রীয়ান ধর্মের আহুরমাজদা ও অহিমাণের (অঙ্গমন্যু) সংগ্রাম, খৃষ্টীয়াদি ধর্মশাস্ত্রে বর্ণিত ঈশ্বর এবং শয়তান বা ইবলিসের সংগ্রাম, মানবাত্মাকে অধিকারের জন্য ধর্মাধর্মের নিত্য দ্বন্দ্বই রূপকের ভাষায় প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু পাপের প্রবর্তক বা অধিনায়ক-স্বরূপ ঈশ্বরের একজন প্রতিদ্বন্দ্বী সৃষ্টি করিয়া এ প্রশ্নের মীমাংসা হয় না, বরং ঈশ্বরত্বেরই হানি হয়। তাই পাশ্চাত্ত্য দেশে অজ্ঞেয়তাবাদী, যুক্তিবাদী (Rationalists) ইত্যাদি নানা সম্প্রদায় আবির্ভূত হইয়া খ্রীষ্টীয় ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রেও দেবাসুর-সংগ্রামের উল্লেখ আছে। উহাও ধর্ম ও অধর্মের দ্বন্দ্ব বলিয়া কল্পনা করা যায়। তবে হিন্দুশাস্ত্রে স্পষ্টই উল্লিখিত আছে যে, দেবগণ (ধর্মশক্তি) ও অসুরগণ (অধর্মশক্তি), উভয়ই সেই পরম-পুরুষ হইতেই জাত ('অহং ভবো যূয়মথোঽসুরাদয়ো…যস্যাবতারাংশকলাবিসর্জিতা' ভাঃ ৮।৫।২১)। সেই পরম পুরুষের স্তন হইতে ধর্ম এবং পৃষ্ঠদেশ হইতে অধর্ম—এরূপ উল্লেখ আছে ('ধর্মঃ স্তনাদিতরঃ পৃষ্ঠতোঽভূৎ' ভাঃ ৮।৫।৪০)। বস্তুতঃ, শুভ-অশুভ, জ্ঞান-অজ্ঞান, ধর্মাধর্ম, পাপপুণ্য, প্রীতি-হিংসা, সকলই তাঁহা হইতে—কিন্তু তিনি আবার এ সকল দ্বন্দ্বের অতীত। তিনি সম, শান্ত, নির্বিকার; তাঁহার নির্গুণ স্বরূপের বর্ণনায় তাঁহাকে অরূপ, অব্যক্ত,

অচিন্ত্য, মনোবুদ্ধির অগোচর বলিয়াই উল্লেখ করিতে হয়। কিন্তু সগুণ বিভাবে বিশ্বরূপ বলিয়া যখন তাঁহার ধারণা করা হয়, তখন তাঁহাকে কেবল 'জ্ঞানস্বরূপ' 'সত্যস্বরূপ' বলিলেও চলে না—তাঁহাকে 'মোহস্বরূপ', 'অসত্যস্বরূপ'ও বলিতে হয়। জগতে একমাত্র হিন্দুধর্মই তারস্বরে এ সত্যটি ঘোষণা করিতে সাহস করিয়াছে। তাই দেখি, স্তবরাজে ভীষ্মদেব একবার বলিতেছেন, "তস্মৈ ধর্মাত্মনে নমঃ", আবার সঙ্গে সঙ্গে বলিতেছেন, "তস্মৈ ঘোরাত্মনে নমঃ", "তস্মৈ মোহাত্মনে নমঃ", "তস্মৈ ক্রৌর্যাত্মনে নমঃ" ইত্যাদি আবার দেখি ভক্তরাজ প্রহ্লাদ বিষ্ণুর স্তবে বলিতেছেন—

'বিদ্যাবিদ্যে ভবান্ সত্যম্ অসত্যং ত্বং বিষামৃতে'—তুমি বিদ্যা, তুমিই অবিদ্যা, তুমিই সত্য, তুমিই অসত্য, তুমিই বিষ, তুমিই অমৃত।

৭।১২ শ্লোকে এবং গীতার অন্যত্রও এই তত্ত্বটিই উল্লিখিত হইয়াছে (১০।৪-৫।৩৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

কিন্তু ইহাতে তো মূল প্রশ্নের উত্তর হইল না, বরং বিষয়টি আরও জটিল হইয়া উঠিল। কথা হইতেছে,—ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ—সত্যস্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, আনন্দস্বরূপ—'সত্যং শিবং সুন্দরম্' এবং সচ্চিদানন্দই জীব-জগতে অভিব্যক্ত হইয়াছেন, অথচ সৃষ্টিতে আমরা দেখি অসত্য, অমঙ্গল, দুঃখ; এ-সকল আসিল কোথা হইতে? শাস্ত্র-প্রমাণে উত্তর হইল, তিনি কেবল সত্যস্বরূপ নন, অসত্যস্বরূপও তিনি; তিনি সর্বস্বরূপ। তবে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপটি কি? জগতে তাঁহার অভিব্যক্তি কোথায়? জগতে তো দেখি কেবল দুঃখ, দুঃখ, দুঃখ। দর্শনে, পুরাণে, আখ্যানে, ব্যাখ্যানে, কেবল শুনি দুঃখেরই কাহিনী—জীবের যত রকমে দুঃখ জন্মিতে পারে, শাস্ত্রকারগণ তাহা খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন এবং উহাদের নাম দিয়াছেন, ত্রিতাপ—আধিভৌতিক (সর্পব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু হইতে দুঃখ), আধ্যাত্মিক (আধি-ব্যাধি-জনিত দুঃখ), আধিদৈবিক (দৈবদুর্যোগ, গ্রহবৈগুণ্যাদি-জনিত দুঃখ), এই ত্রিতাপ—"ত্রিবিধ তাপেতে তারা, নিশিদিন হতেছি হারা"—এই তো অবস্থা। সংসারটা দুঃখের আগার, কারাগার; তাই হিন্দু-সাধকের কাতর ক্রন্দন—"তারা, কোন্ অপরাধে এ দীর্ঘ মেয়াদে, সংসার গারদে আছি বল?" সর্বত্রই এই একই সুর।

উঃ। ঐটিই সব সত্য নয়। ওটি এক দিক্; ওকে বলে দুঃখবাদ, সন্ন্যাসবাদ। অন্য দিক্ও আছে, অন্য সুরও আছে—

'এ সংসার মজার কুটি,
আমি খাই দাই আর মজা লুটি'। —আজু গোঁসাই

'জগতে আনন্দ-যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ,
ধন্য হলো ধন্য হলো মানব-জীবন।'
'তোমার যজ্ঞে দিয়েছ ভার
বাজাই আমি বাঁশি।' —রবীন্দ্রনাথ

তাই তো 'গীতাঞ্জলি', যে গীতে জগৎ মুগ্ধ।

জগৎ-সৃষ্টি, জগৎ-লীলা, আনন্দময়ের আনন্দ-লীলা। জীব সেই লীলার সাথী — আমার মাঝে তোমার লীলা হবে
তাই তো আমি এসেছি এ-ভবে। —রবীন্দ্রনাথ

এই লীলাবাদকে বলে সুখবাদ, জীবনবাদ। এই লীলাটি কিরূপে আরম্ভ হইয়াছে এবং কিরূপে চলিতেছে এবং কি কারণে ইহার মধ্যে অশুভ, অজ্ঞান, দুঃখের উদ্ভব হইয়াছে তাহাই আলোচ্য। পূর্বে ভূমাবাদ অর্থাৎ ঈশ্বরের সর্বময় অস্তিত্ব বা বিশ্বানুগতা সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে ইহা প্রতীত হইবে যে, ঈশ্বর স্বর্গে আছেন (ওঁরা যেমন বলেন, God is in Heaven) এবং জীবজগৎ হইতে নিঃসঙ্গ হইয়া নিষ্করুণভাবে জীবের দুঃখকষ্ট দেখিতেছেন, এ-কথা আর বলা চলে না। জীব যে দুঃখ ভোগ করে সে দুঃখ তিনিও ভোগ করেন, কেননা জীবের মধ্যে তো তিনিই আছেন। এই গীতাগ্রন্থেই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, অবিবেকী ব্যক্তিগণ শাস্ত্রবিধিবিরুদ্ধ অত্যুগ্র তপস্যাদি করিয়া শরীর ক্লিষ্ট করে এবং অন্তর্যামিরূপে দেহে অবস্থিত আমাকেও কষ্ট দেয় (গী ১৭।৬)। জীবের দুঃখে তাহারও দুঃখ হয়।—'মহামায়ার ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ি কাঁদে'।

এ কথাটির মধ্যে সৃষ্টির আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নিহিত আছে। যাহাকে মহামায়া বা মায়া বলা হয়, শাস্ত্রান্তরে তাহাকেই প্রকৃতি বলে। প্রকৃতি ত্রৈগুণ্যময়ী। জীব ব্রহ্মকণা—ব্রহ্মের অংশ। ব্রহ্মই জীবরূপে প্রকৃতির ত্রিগুণের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সুখদুঃখ ভোগ করেন। 'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ'—(গী ১৫।৭)। 'প্রকৃতিজাত সত্ত্ব রজঃ তমোগুণ অব্যয় আত্মাকে দেহে বন্ধন করিয়া রাখে' (গী ১৪।৫)। যিনি গুণাধীশ, তিনি দেহ ধারণ করিয়া গুণাধীন হন। ইহাই মহাফাঁদ। ইহাতেই জীবের সংসার-বন্ধন।

কিন্তু, মায়া বা প্রকৃতি অব্যয় আত্মাকে বদ্ধ করে, এই যে কথা ইহা রূপকের ভাষা। সৃষ্টি কিরূপে হয় তাহা বুঝাইবার জন্য এইরূপ ভাষা ব্যবহৃত হয়। সৃষ্টিকর্তা তো তিনিই। মায়া তাঁহারই মায়া ('মম মায়া দুরত্যয়া' গী ৭।১৪)। প্রকৃতি তাঁহারই প্রকৃতি—(গী ৭।৪-৫)। তিনিই মায়া বা

প্রকৃতি দ্বারা এই জগৎলীলা বা সৃষ্টিলীলা করেন। অদ্বিতীয় এক তিনি আপনিই আপনাকে বহুরূপে সৃষ্টি করেন। এ সম্বন্ধে সানুবাদ কয়েকটি শ্রুতি-বাক্য মূল উপনিষৎ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

সৃষ্টির মূল আদি ব্রহ্ম-সঙ্কল্প। তিনি কামনা করিলেন, আমি এক আছি, বহু হইব, আমি সৃষ্টি করিব ('সোঽকাময়ত একোঽহং বহু স্যাম্ প্রজায়েয়েতি')। তখন তিনি আপনিই আপনাকে এইরূপ করিলেন। এই হেতু তাঁহাকে সুকৃত বা স্বয়ং কর্তা বলা হয় ('তদাত্মানং স্বয়মকুরুত, তস্মাত্তৎ সুকৃতমুচ্যত ইতি'—তৈত্তি উপ. ২।৭)। এই যে স্বয়ংকর্তা ব্রহ্ম যিনি জগদ্রূপে পরিণত হইলেন, তাঁহার স্বরূপ কি? পরে উপনিষৎ বলিতেছেন—যিনি স্বয়ংকর্তা ব্রহ্ম তিনি রসস্বরূপ, সেই রস লাভ করিয়াই জীব আনন্দিত হয়, ইনিই আনন্দিত করিয়া থাকেন। ('যদ্বৈতৎ সুকৃতম্ রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি। এষ হ্যেবানন্দয়তি।' তৈত্তি উপ. ২।৭);

শ্রুতি বলিতেছেন, আনন্দস্বরূপই জীবজগতে অনুপ্রবিষ্ট আছেন, সুতরাং জগতে সকলই আনন্দময়। আমরা কিন্তু সে আনন্দ উপভোগ করিতে পারি না, আমাদের কাছে জগতে সকলই দুঃখময়। এইটিই রহস্য। এ রহস্য বুঝিতে হইলে সৃষ্টি ব্যাপারটা কিরূপে হইয়াছে, শ্রুতিমূলে সে বিষয়ে আরো কিছু বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক। এ সম্বন্ধে প্রথম কথা এই—এই যে সৃষ্টি হইল, ইহাতে নূতন কিছু উৎপন্ন হইল। বাইবেল আদি ধর্মগ্রন্থে যেরূপ সৃষ্টি-বিবরণ আছে (something out of nothing), ইহা তাহা নহে। প্রাচ্যদর্শনের একটি মুখ্য কথা এই—যাহা নাই তাহা হয় না; যাহা আছে তাহারও বিনাশ হয় না; পরিবর্তন হয় মাত্র ('নাসৎ উৎপদ্যতে, ন সৎ বিনশ্যতি'—সাঃ সূঃ); একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, তিনিই বহুরূপে আপনাকে বিকাশ করিলেন। দ্বিতীয় কথা এই যে—এই বিকাশ এক বারেই হয় নাই, এক বারেই এই বহু-বিচিত্র জীবজগতের উদ্ভব হয় নাই, ইহা ক্রমে ক্রমে হইয়াছে। আমাদের শাস্ত্রমতে সৃষ্টির অর্থ নূতন কিছুর উৎপত্তি (Creation) নহে, যাহা আছে তাহারই বহুরূপে ক্রমবিকাশ (Evolution)।

এই বিকাশের ক্রম কিরূপ?—প্রথমে জড়-সৃষ্টি, পরে জড়ে প্রাণক্রিয়ার উদ্ভব অর্থাৎ ইতর প্রাণীর উদ্ভব হইল; ক্রমে মনের উদ্ভব অর্থাৎ মননশীল জীব মানবের উদ্ভব ইত্যাদি। এ সম্বন্ধে একটি শ্রুতিবাক্য এই—

তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে।
অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্মসু চামৃতম্ ॥—মুঃ ১।১।৮

—ব্রহ্ম তপঃশক্তি (সৃজনোন্মুখী স্বীয় জ্ঞানশক্তি) দ্বারা আপনাকে স্ফীত করিলেন, জড়ীভূত করিলেন, তাহাতে অন্নের উদ্ভব হইল; অন্ন হইতে প্রাণের উদ্ভব হইল, প্রাণ হইতে মনের উদ্ভব হইল (মানবসৃষ্টি) এবং ক্রমে লোকসমূহের উদ্ভব হইল। শ্রীঅরবিন্দ এই শ্রুতিবাক্যের এইরূপ মর্মানুবাদ করিয়াছেন—

"By energism of consciousness, Brahman is massed; from that Matter is born and from Matter Life and Mind and the Worlds."

এই যে **সৃষ্টির ক্রমবিকাশতত্ত্ব,** ইহা আমাদের সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণাদি শাস্ত্রে নানাভাবে এবং অনেক স্থলে রূপকের ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানও এই মতের পরিপোষক।

প্রকৃতি হইতে ক্রমবিকাশে কিরূপে জগতের উদ্ভব হইয়াছে, এ সম্বন্ধে সাংখ্যসিদ্ধান্ত পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে (২৪৬ পৃষ্ঠা)। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশবাদের (Evolution Theory) মূলমন্ত্রও এই প্রকৃতি-পরিণামবাদেই পাওয়া যায় এবং আমাদের পুরাণোক্ত জীবের ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণের কথাও এই তত্ত্বই সমর্থন করে. এসকল কথা অন্যত্র বলা হইয়াছে (২৮৩-২৮৪ পৃঃ)। জীবের কোন্ জন্মে কত যোনি অতীত হয় তাহাও আমাদের শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। যথা—

স্থাবরং বিংশতের্লক্ষং জলজং নবলক্ষকম্।
কূর্মাশ্চ নবলক্ষং চ দশলক্ষং চ পক্ষিণঃ।
ত্রিংশলক্ষং পশূনাঞ্চ চতুর্লক্ষং চ বানরাঃ।
ততো মনুষ্যতাং প্রাপ্য ততঃ কর্মাণি সাধয়েৎ॥ —বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণ

—স্থাবর জন্মে ২০ লক্ষ যোনি, জলচর ৯ লক্ষ, কূর্ম ৯ লক্ষ, পক্ষী ১০ লক্ষ, পশু ৩০ লক্ষ, বানর ৪ লক্ষ, তৎপরে মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া জীব কর্মসাধন দ্বারা দেবজীবন লাভ করিবার যোগ্য হয়।

জীবাত্মার ক্রমবিকাশ-তত্ত্ব

প্রাচ্যমতে ও পাশ্চাত্ত্যমতে উদ্বর্তনের (Evolution) ক্রম প্রায় একই—প্রথমে স্থাবর জন্ম, তৎপর জলজ প্রাণী এবং তাহা হইতে ক্রম-বিকাশে বানরজন্ম; বানরই মানুষের নিকটতম পূর্বপুরুষ। কিন্তু একটি বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও প্রাচ্য প্রজ্ঞানে মর্মান্তিক প্রভেদ আছে। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের আলোচনা আধিভৌতিক বা দেহগত, প্রাচ্য দর্শনের আলোচনা আধ্যাত্মিক বা জীবগত। জড়বিজ্ঞান কেবল দেহের ক্রম-বিকাশেরই আলোচনা করেন, ঋষিপ্রজ্ঞান দেখেন এখানে দুইটি তত্ত্ব—দেহ দেহী,

শরীর ও আত্মা। ইহাই বেদান্ত ও গীতার ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, অপরা ও পরা প্রকৃতি (গীঃ ৭।৪, ১৩।২), সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষ (৭।৪ ব্যাখ্যা দ্রঃ)। স্থাবর জঙ্গম যত কিছু পদার্থ আছে সকলই এই দুইএর সংযোগ হইতে হইয়া থাকে (১৩।২৬)। জীব ব্রহ্মেরই অংশ বা ব্রহ্মই (১৫।২, ১৫।১৭), জীবের মধ্যে যে শক্তি নিহিত আছে তাহা ব্রহ্মশক্তি; সেই শক্তির বিকাশই ক্রমবিকাশ (Evolution)। এই বিকাশের ক্রমানুসারেই জন্মে জন্মে জীবের নূতন নূতন দেহ প্রাপ্তি হয়। জঙ্গমের পূর্বে স্থাবর সৃষ্টি, কাজেই জীব প্রথমে স্থাবর রূপেই জন্মগ্রহণ করে। এই জন্মে চিৎশক্তি প্রায় নিরুদ্ধ থাকে। পরে জীব জঙ্গম রাজ্যে উপনীত হয়। পশ্বাদি যোনিতে প্রাণশক্তির পূর্ণ বিকাশ হইলেও মনঃশক্তি বা মনন-শক্তির বিকাশ হয় না। পরে ক্রম-বিবর্তনের ফলে জীব মানবদেহ ধারণ করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের পূর্ণ অধিকারী হয়।

পূর্বোক্ত আলোচনায় বুঝা গেল, মানব-জন্ম এক দিনে হয় নাই। বহু যোনি ভ্রমণের পর, বহু দেহ ধারণের পর জীবাত্মার নরদেহ ধারণ। প্রথমে জীবাত্মা জড়রূপে জন্মগ্রহণ করেন। 'অন্ন' শব্দটি উপনিষদাদি শাস্ত্রে জড়ের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়। সেই হেতু আমাদের এই জড়দেহটাকে বলা হয় আত্মার **অন্নময় কোষ** এবং এই স্তরে আত্মাকে বলা হয় **অন্নময় পুরুষ** (Physical Self); ক্রমে অন্ন হইতে প্রাণের উদ্ভব হয় অর্থাৎ ইতর প্রাণীবর্গের জন্ম হয়, তখন আত্মা ধারণ করেন প্রাণময় কোষ এবং আত্মাকে বলা হয় **প্রাণময় পুরুষ** (Vital Self or Self of Life)। ক্রমে প্রাণীর মধ্যে মনের উদ্ভব হয় এবং মননশীল জীব অর্থাৎ মানুষের সৃষ্টি হয়। তখন আত্মা ধারণ করেন **মনোময় কোষ** এবং আত্মাকে বলা হয় **মনোময় পুরুষ** (Mental Self or Self of Mind)। মানুষে ও পশুতে এই স্থলেই পার্থক্য। ইতর প্রাণী এবং উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে, কিন্তু মননশক্তি বা মনঃশক্তি নাই। এই মনঃশক্তি বিকাশের ফলেই মানুষ আধিভৌতিক শিক্ষাসভ্যতার উচ্চস্তরে উঠিয়াছে এবং স্বকীয় চেষ্টায় আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতির পথও তাহার নিকট উন্মুক্ত হইয়াছে। এই স্থলেই মানব-জীবনের মূল্য, পশু-পক্ষীর জীবনের কোন মূল্য নাই। তাই যোগবাশিষ্ঠ বলেন—

তরবোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনোযস্য মননেন হি জীবতি ॥

—বৃক্ষলতাও জীবন ধারণ করে, পশু-পক্ষীও জীবন ধারণ করে। কিন্তু মননের দ্বারা যে জীবন ধারণ করে, সেই প্রকৃত জীবন ধারণ করে।

কিন্তু এই মনোময় কোষেই আত্মার ঊর্ধ্বগতি শেষ হয় নাই। ইহার পরে **বিজ্ঞানময় কোষ** এবং **আনন্দময় কোষ**। বিজ্ঞান অর্থ সত্য জ্ঞান ('সত্যং ঋতং'), ইহা লাভ হইলে আত্মাকে বলা হয় **বিজ্ঞানময় পুরুষ** (Self of Truth-knowledge); এই বিজ্ঞানময় পুরুষই **আনন্দময়ে** (Self of Bliss) পূর্ণতা লাভ করেন; যিনি সত্যস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ তিনিই আনন্দস্বরূপ। এই অবস্থায় জীব ভাগবত জীবন লাভ করেন, ভগবানের মধ্যেই অবস্থিতি করেন ('স যোগী ময়ি বর্ততে'—৬।৩১), আনন্দস্বরূপের অনুভব-জনিত অদ্বয় আনন্দে আপ্লুত থাকেন ('কেবলানু-ভবানন্দস্বরূপঃ পরমেশ্বরঃ')। বলা বাহুল্য, এই পঞ্চ কোষ বা পঞ্চ পুরুষ এক ব্রহ্মেরই বিভিন্ন বিভাব, জীবের ক্রমবিকাশ প্রদর্শনার্থ এইরূপে বর্ণিত হইল। (তৈত্তিঃ উপ. ৩।১-৬)।

এইরূপে জীব নিরেট জড়তা বা অজ্ঞানতা (inconscience) হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রম-বিকাশে প্রাণ, মন ও বিজ্ঞানের অধিকারী হইয়া সচ্চিদানন্দের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই উৎক্রমণপথে প্রথম অবস্থায় দেহ, প্রাণ ও মনের স্তরে তাহার মধ্যে অজ্ঞানতা ও অপূর্ণতা যথেষ্টই থাকে এবং এই **অজ্ঞানতাই সর্ববিধ দুঃখ-দুর্গতি ও পাপতাপের কারণ**। পশু হইতে ক্রমবিকাশে মানুষের উদ্ভব, সুতরাং পশুর যে সকল প্রাকৃত বা স্বাভাবিক বৃত্তি, তাহা অনেকটা মানুষেও আছে! পশুর মধ্যে যে ব্রহ্ম তিনি প্রাণময় পুরুষ, প্রাণিক চেষ্টাই পশুর স্বভাবজ এবং সর্বস্ব। প্রাণরক্ষার জন্য আহার-নিদ্রাদি, প্রাণের ভয় এবং শত্রু হইতে প্রাণরক্ষার জন্য ক্রোধ হিংসাদি প্রাণসূত্র অচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য প্রজনন-প্রবৃত্তি—এই সকল লইয়াই তাহার জীবন। এই সকল বৃত্তি ও প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যেও আছে, কেননা নিম্ন-প্রকৃতিতে মানুষও পশুই, তবে আরো কিছু বেশী, এই মাত্র ('আহার-নিদ্রা-ভয়মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতং পশুভির্নরাণাম্')। মুখ্যতঃ কাম, ক্রোধ, লোভ—এই তিনটি লইয়াই পশুর জীবন। মানুষ পশু হইতে উচ্চতর স্তরে উঠিয়া বুঝিয়াছে এগুলি সর্ববিধ পাপের মূল এবং দুঃখের মূল, তাই এইগুলিকে নরকের দ্বার বলা হয় (গী ১৬।২১)। সকল ধর্মশাস্ত্রেই বলে এগুলি সর্বথা ত্যাজ্য। কিন্তু বলিলে কি হয়, প্রকৃতির অধীন থাকিয়া প্রকৃতির গুণ ত্যাগ করা যায় না। কামক্রোধাদি প্রকৃতির রজোগুণসম্ভূত, এবং অজ্ঞানতা, জড়তা, ভয়, ভ্রম, প্রমাদ ইত্যাদি তমোগুণসম্ভূত। এই জন্য সকল সাধনারই উদ্দেশ্য রজস্তমোগুণ জয় করিয়া সত্ত্বগুণের উদ্রেক করা এবং পরিশেষে সত্ত্বগুণও

অতিক্রম করিয়া নিস্ত্রৈগুণ্য বা ভাগবত ভাব লাভ করা ('নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন' ; 'পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ' ২।৪৫, ৪।১০)।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—প্রকৃতি তাঁহারই সৃজনীশক্তি বা মায়াশক্তি ; তিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, সর্বকল্যাণগুণোপেত, অথচ প্রকৃতির মধ্যে তিনি এই সকল পাপের বীজ, দুঃখের বীজ, অশুভের বীজ নিহিত করিয়া দিলেন কেন ? উত্তর এই—আমরা আমাদের অপূর্ণ সীমাবদ্ধ দ্বৈতজ্ঞান, 'আমি' জ্ঞান, নানাত্ববুদ্ধিদ্বারা ঐহিক পাপপুণ্য, সুখদুঃখ, শুভাশুভের ধারণা করি, আমাদের মাপকাঠিদ্বারা ঈশ্বরের কার্যাকার্যের বিচার করি, কাজেই এ রহস্য বুঝিতে পারি না। একটি দৃষ্টান্ত ধরুন। মৃত্যু জীবের একটি অপার দুঃখের কারণ। আমরা আমাদের 'আমি'টাকে এই দেহের সহিত যোগ করিয়া দেই এবং দেহটা গেলেই আমি গেলাম, এই চিন্তায় অস্থির হই। কিন্তু প্রকৃতির নিকট জন্ম-মৃত্যু এক বস্তরই দুই দিক। জন্ম হইলেই মৃত্যু হইবে, কেননা মৃত্যু ব্যতীত আবার জন্ম হইতে পারে না, নূতন তো কিছু জন্মে না, এক বস্তুই জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হয়। মৃত্যু অর্থ পুনর্জন্ম, দেহান্তরপ্রাপ্তি। যিনি জন্মদাত্রী, তিনিই মৃত্যুরও বিধাত্রী। যিনি জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী, তিনিই আবার মহাকালবক্ষে নৃত্যপরা নৃমুণ্ডমালিনী করালী কালী—'কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ'। (গী ১১।৩২)।

এইরূপ, একটু অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, এই যে প্রকৃতির খেলা যাহার ফলে কামক্রোধাদির উদ্ভব, এ সকল না থাকিলে সৃষ্টি সম্ভবপর হইত না, সৃষ্টিরক্ষাও সম্ভবপর হইত না। আমি পৃথক্, তুমি পৃথক্, এই যে পৃথক্ বুদ্ধি, দার্শনিক পরিভাষায় ইহাকেই অহঙ্কার বলে। এক যখন বহু হইলেন, প্রকৃতির সাম্যভঙ্গ হইয়া যখন সৃষ্টি আরম্ভ হইল, তখন প্রথমেই এই অহঙ্কারের সৃষ্টি হইল (গী ২৮৪ পৃঃ), মহৎ বা 'আমি'র সৃষ্টি হইল এবং এই 'আমি'কে রক্ষা করার জন্য, আমিত্বের প্রসারের জন্য নানারূপ কামনা-বাসনার উদ্ভব হইল। এইগুলিই সমস্ত পাপের মূল এবং দুঃখের মূল (গী ৩।৩৬-৩৭ শ্লোক দ্রঃ)। আমাদের দৈনিক কামনাসমূহের মধ্যে এইটি বড় প্রবল, সঙ্কীর্ণ অর্থে ইহাকে কাম বলা হয়। বলা বাহুল্য, সৃষ্টিরক্ষার জন্য উহা অপরিহার্য, অথচ ইহাকে পাপ বলা হয়। আর একটি পাপ লোভ—লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু—কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, জীবের জীবনরক্ষার জন্য উহার একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে, তাই জীব-প্রকৃতিতে উহার সৃষ্টি হইয়াছে। ভোজনপাত্রে মৎস্য দেখিয়া বিড়ালটি থাবা

বাড়াইতেছে, পুনঃ পুনঃ তাড়না করিতেছি, তবু আবার আসিতেছে, সে ফিরিবে না, ফিরিলে তাহার জীবন থাকে না। বিড়াল তপস্বী হইলেও লোভবশতঃই হয়। মানুষের মধ্যেও 'বিড়াল-তপস্বী' আছে। **ক্রোধ** আর একটি পাপ, কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য অনেক সময় ক্রোধ প্রকাশের প্রয়োজন হয়, নচেৎ জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়। গল্প আছে, এক সাধুপুরুষ একটি সর্পকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন—"ওহে সর্প, তোমার ক্রূর বুদ্ধি ত্যাগ কর, তোমার জীবনরক্ষার জন্য কাহাকেও দংশন করার প্রয়োজন নাই, তথাপি তুমি লোকের জীবন নাশ কর কেন? তুমি আর কাহাকেও দংশন করিও না।" কতক দিন পরে সেই স্থান দিয়া ফিরিবার কালে সাধুপুরুষ দেখেন সর্পটি পথিপার্শ্বে অর্ধমৃতবৎ পড়িয়া আছে। সাধুকে দেখিয়া সর্প বলিল—'ঠাকুর, আপনার উপদেশে আমার দুর্মতি ফিরিয়াছে, আমি আর কাহাকেও দংশন করি না, এখন আমাকে দেখিয়া কেহ ভয় পায় না, বালকেরা পর্যন্ত আমাকে যষ্টিদ্বারা প্রহার করে, দেখুন আমার কি দশা ঘটিয়াছে'।' সাধু বলিলেন—'আমি তোমাকে দংশন করিতে নিষেধ করিয়াছি, ফোঁস করিতে তো নিষেধ করি নাই। কেহ নিকটে আসিলে ফোঁস করিও, তবেই নির্বিঘ্নে থাকিতে পারিবে।"

অবশ্য, ফোঁস করা ও দংশন করার মধ্যে এত ঘনিষ্ঠ সংযোগ যে মানুষের পক্ষেই উহার সীমা ঠিক রাখা কষ্টকর, ইতর জীবের পক্ষে তো অসম্ভবই। তবে মানুষ উচ্চতর জীব বলিয়া এই প্রাণিক-বৃত্তিসকল স্ববশে রাখিয়া প্রয়োজন মত ব্যবহার করিতে পারে, উহার নাম সংযম। এই স্থলেই মানুষ ও পশুতে পার্থক্য। (গী ২।৬৪ দ্রঃ)।

যাহা হউক, আমরা দেখিলাম যে, কামক্রোধাদি যে সকল বৃত্তি পাপের মূল এবং দুঃখেরও মূল, তাহাই আবার সৃষ্টিরও মূল। ঐগুলি ব্যতীত সৃষ্টি হয় না, সৃষ্টিরক্ষাও হয় না। তাই প্রকৃতি ঐগুলি জীবের মধ্যে দিয়াছেন, ইহা প্রকৃতির খেলা, ত্রিগুণের খেলা। এই কারণেই সংসারে জন্মই দুঃখের কারণ, সংসার দুঃখের আকর, সংসারত্যাগ বা সন্ন্যাসই একমাত্র শ্রেয়ঃপথ—এই সকল কথা বলা হয়। কিন্তু সংসার ত্যাগ করিলেই প্রকৃতির অতীত হওয়া যায় না। আর সৃষ্টিকর্তা যে সংসার ত্যাগ করিবার জন্যই জীবকে সংসারে পাঠাইয়াছেন, একথাও বড় যুক্তিসহ নহে।

আবার কেহ কেহ বলেন—এই যে সৃষ্টি, জগৎ সংসার, ইহা মিথ্যা, মায়ার বিজৃম্ভণ। এক ব্রহ্মই আছেন, ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা, ভ্রমবশতঃ ব্রহ্মেই জগতের অধ্যাস হয়, যেমন মরীচিকায় জলভ্রম হয়, শুক্তিতে মুক্তাভ্রম হয়।

ইহাকে বলে মায়াবাদ। মায়াবাদীরাও সন্ন্যাসবাদী। বেদান্তের ব্যাখ্যাচ্ছলে এই সকল দুঃখবাদাত্মক দার্শনিক মতবাদ প্রচারের ফলে হিন্দুধর্ম সাধারণতঃ দুঃখবাদাত্মক বলিয়াই মনে হয়।

কিন্তু যাঁহারা আনন্দস্বরূপ সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরে বিশ্বাসবান্, তাঁহারা বলেন, সৃষ্টি ঈশ্বরের লীলা—সুখদুঃখের মধ্য দিয়া জীবকে লইয়া তিনিই এই খেলা করিতেছেন। ইহাই আনন্দলীলা। ইহাই লীলাবাদ, সুখবাদ বা জীবনবাদ, পূর্বেই বলিয়াছি (২৬১ পৃঃ)।

বস্তুতঃ, সনাতন ধর্ম মূলতঃ দুঃখবাদাত্মক নহে, ইহা ঐহিক জীবনটাকেও অগ্রাহ্য করে না। নানারূপ অপব্যাখ্যা ও অবান্তর শাস্ত্রের চাপে পড়িলেও বেদের রসব্রহ্ম, আনন্দব্রহ্ম, মধুব্রহ্ম, নীরস, নিরানন্দ ও মধুহীন হয় নাই। রসরাজের রাসলীলা নিত্যলীলা বন্ধ হয় নাই, নিরন্তর রসসিঞ্চনে উহা জগৎকে 'পোষণ' করিতেছে। এই কথাই একটু বিস্তার করা আবশ্যক।

সংসার দুঃখময়, জীবন দুঃখময়, এই সকল কথা পূর্ণ সত্য নহে, অর্ধ সত্য মাত্র। জীবন সুখদুঃখময় ('সুখং দুঃখং ইহোভয়ম্'—মহা)। সংসারে নানারূপ দুঃখ আছে, আবার ততোধিক সুখও আছে। প্রকৃতিতে সৌন্দর্য আছে, সরসতা আছে। মানুষের হাসি আছে, গান আছে, স্নেহপ্রীতি, ভালবাসা আছে, সমপ্রাণতা, সমবেদনা আছে—দুঃখের মধ্যেও সংসারে এ সকল সুখের উপাদান আছে। সর্বোপরি, বাঁচিয়া থাকারই একটা আত্যন্তিক সুখ আছে। মরিতে কে চায়? নিদারুণ দুঃখকষ্টে পড়িলেও লোকে বলে, মরিলেই বাঁচি। মরিয়াও বাঁচিতে চায়। এই যে বাঁচিবার আনন্দ, এই যে অমর হইবার ঝোঁক, দুঃখার্ত মর্ত্য জীব ইহা পাইল কোথা হইতে?—যিনি আনন্দস্বরূপ, অমৃতস্বরূপ, তাঁহা হইতে। জীব সেই আনন্দস্বরূপ হইতেই আসিয়াছে, আনন্দের দ্বারাই বাঁচিয়া আছে, সেই আনন্দস্বরূপেই আবার প্রবেশ করিবে।

আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি (-তৈত্তিঃ ৩।৬)।

ইহাই জীবের সংসার-লীলা। আনন্দরূপের জগৎলীলা, আনন্দলীলা। এই লীলার একটি সূক্ষ্ম তাৎপর্য এই যে, সৃষ্টিরক্ষার জন্য, জীবের জীবনরক্ষার জন্য, আমাদের বাঁচিয়া থাকার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, সে সকলের মধ্যেই ভগবান্ সুখের সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। আমাদের ক্ষুধা লাগে কেন? আহারে সুখ পাই কেন? আহারে অরুচি হইলে জীব কয় দিন বাঁচিতে পারে?

স্বাভাবিক বলিয়া অভ্যস্ত বলিয়া আমরা এই সুখের অস্তিত্ব সর্বদা অনুভব করিতে পারি না, কিন্তু উহা না থাকিলে আমরা আহার গ্রহণ করিতাম না, বাঁচিতে পারিতাম না। তাই উপনিষৎ বলেন—যদি সৃষ্টিতে আনন্দ না থাকিত তবে কে-ই বা আহার গ্রহণ করিত, আর কে-ই বা বাঁচিয়া থাকিত? তিনিই সকলকেই আনন্দিত করেন—

'কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়তি'—তৈত্তিঃ উপ, ২।৭।

এই তো সব শাস্ত্রবাক্য, শ্রুতিবাক্য। প্রত্যক্ষও দেখা যায়, জীবনে দুঃখের মধ্যেও সুখ আছে। এই যে সাংসারিক সুখ যাহাকে বিষয়ানন্দ বলে, তাহাও সেই পরমানন্দেরই এক কণা, রসসিন্ধুর একবিন্দু ("অথাত্র বিষয়ানন্দো ব্রহ্মানন্দাংশরূপভাক্"—পঞ্চদশী ১৫।১।১২)। কিন্তু উহা আসল কথা নহে, উহা অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী, দুঃখমিশ্রিত, দ্বন্দ্ব-ঘটিত। সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি দ্বন্দ্ব লইয়াই সৃষ্টি, উহাই মোহের কারণ (গীঃ ৭।২৭)। উহার ঊর্ধ্বে আছে আত্মার অদ্বয় আনন্দ, ভাগবত প্রেমের বা নির্গুণা ভক্তির অমল আনন্দ, আনন্দস্বরূপের অনুভব-জনিত অমিশ্র অফুরন্ত নিত্যানন্দ। সেই আনন্দস্বরূপই জীব-জগতে অভিব্যক্ত আছেন, অথচ সে আনন্দ তো আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না—কেন? শ্রীভাগবত নিম্নোক্ত শ্লোকে এই কথাটি উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহার উত্তরও দিয়াছেন।

কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ পরমেশ্বরঃ।
মায়য়াস্তর্হিতৈশ্বর্য ঈয়তে গুণসর্গয়া ॥ —ভাঃ ৭।৬।২৩

—শুদ্ধ আনন্দানুভবরূপেই পরমেশ্বর প্রকটীভূত হন, অর্থাৎ ঈশ্বরের অনুভব আনন্দেরই অনুভব, কেননা তিনি আনন্দস্বরূপ। কিন্তু তিনি জীবজগতে অনুপ্রবিষ্ট আছেন, অপ্রকট কেন? সর্বত্র সেই আনন্দ উপলব্ধ হয় না কেন? তাহার কারণ, তিনি সৃষ্টিকারিণী ত্রিগুণাত্মিকা মায়াদ্বারা আপনার স্বরূপ অন্তর্হিত করিয়া রাখেন।

"ত্রিগুণের দ্বারা সমস্ত জগৎ মোহিত আছে, আমার আনন্দস্বরূপ জানিতে পারে না, আমার এই গুণময়ী মায়া বড় দুস্তরা, জীব সৃষ্টির দ্বন্দ্ব-মোহে মোহপ্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি (৭।১৩-১৪।২৫।২৭) কথা শ্রীগীতায়ও পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। ৫

প্রঃ। এ-সকল আলোচনার ফলে এই দাঁড়াইল যে, তিনি আপনিই আপনাকে বহুরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বা মায়া দ্বারা এই সৃষ্টি করিয়াছেন, অথচ সেই মায়াদ্বারাই, ত্রিগুণের দ্বারাই

আপনার আনন্দস্বরূপটি ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। সৃষ্টি করিয়া আবার সৃষ্টির মধ্যেই আপনাকে লুকায়িত রাখার প্রয়োজন কি? তিনি তো আপ্তকাম, তাঁহার তো কিছু প্রয়োজন নাই, তিনি এই লীলা করেন কেন?

উঃ। তাঁহার ইচ্ছা। মনে রাখা উচিত, 'লীলা' শব্দের অর্থ খেলা। এটি তাঁহার খেলা। একথা ছাড়া মানুষ এ 'কেন'র আর কোন উত্তর দিতে পারে না। তাই ব্রহ্মসূত্রকার বাদরায়ণ এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া উত্তর দিয়াছেন—'লোকবৎ তু লীলা-কৈবল্যম্'—লোকে যেমন বিনা প্রয়োজনেও কেবল আনন্দের জন্যই খেলা করে, এও তাই, খেলা মাত্র। সৃষ্টির আনন্দ বহু হইবার আনন্দ, আবার সেই বহু হইতে আপনাকে লুকাইয়া রাখিয়া লুকোচুরি খেলার আনন্দ—তাই ইহাকে বলা হয় আনন্দ-লীলা। রাসলীলায় রাসমণ্ডল হইতে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান কেন? নচেৎ খেলার আনন্দ পূর্ণরূপে উপভোগ করা যায় না। এই ব্যাপারটি না থাকিলে গোপীপ্রেম ভগবৎপ্রেম যে কী বস্তু তাহা ভাগবতকার এরূপে বুঝাইতে পারিতেন না। তিনি লুকাইয়া আছেন, চিরকাল লুকাইয়া থাকিবার জন্য নহে, দেখা দিবার জন্য। তিনি তো দেখা দিবার জন্যই ব্যাকুল, তিনি কেবল চান, জীব তাঁহাকে অন্বেষন করিয়া বাহির করুক, নচেৎ খেলা হয় না। মায়ামুগ্ধ জীব কি ভাবে তাঁহাকে অন্বেষণ করিবে? 'কৃষ্ণান্বেষণকাতরাঃ' 'কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ' 'তন্মনস্কাঃ; 'তদালাপাঃ', 'তদাত্মিকাঃ' গোপাঙ্গনাগণের ভাবটি গ্রহণ করুক, যদি পারে। মায়া-মোহ কোথায়? শ্রীভগবান্ ভক্ত উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন—দেখ, আসক্তিহেতু আমাতে চিত্ত বদ্ধ থাকায় গোপীগণ পতিপুত্রাদি প্রিয়জন, এমন কি নিজের দেহজ্ঞান পর্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছিল। মুনিগণ যেমন সমাধিকালে পরম পুরুষে প্রবেশ করেন, নদীসকল যেমন নামরূপ ত্যাগ করিয়া সমুদ্রসলিলে মিশিয়া যায়, তাহারাও তদ্রূপ আমাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল—'যথা সমাধৌ মুনয়োঽব্ধিতোয়ে নদ্যঃ প্রবিষ্টা ইব নামরূপে' (ভাঃ ১১।১২।১২)।

ইহা শব্দশঃ শ্রুতিরই কথা—'যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়' ইত্যাদি (মুণ্ডক ৩।২৮ দ্রঃ) ভাগবতের ব্যাখ্যানে ইহারই ব্যাখ্যা। তাই ভাগবতকে বলা হয় ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য ('ভাষ্যোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণা')। তাই ভাগবতশাস্ত্রে গোপীগণ মূর্তিমতী শ্রুতি।

শ্রুতি কি? শ্রুতিতে যে পরতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে তাহা বুদ্ধি-বিচার দ্বারা হয় নাই। উহা কোন দার্শনিক মত নয়। উহা স্বানুভবলব্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞান। ঋষিগণ তন্মনাঃ হইয়া যাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছেন, তাহাই

শ্রুতিতে প্রকাশ। আমরা সেই পরমবস্তু জানিয়াছি, দেখিয়াছি, দেখিতেছি, এই রকম সুস্পষ্ট ভাষা অনেক শ্রুতিমন্ত্রেই আছে—

"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্।"

—উন্মুক্ত আকাশে সর্বদিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিলে যেমন সমস্ত পদার্থ সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয়, জ্ঞানিগণ সেইরূপ সতত সর্বত্রই সেই পরম পুরুষকে দর্শন করেন, যিনি বিষ্ণু—যিনি সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন (বিষ্—বিস্তারে) অথবা যিনি সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট আছেন (বিশ্—প্রবেশে)। 'ঋষি দেখেন আকাশে, অন্তরীক্ষে, জ্যোতিষ্কে, জলে-স্থলে, জীবে-অজীবে সর্বত্রই এক চৈতন্যময়, আনন্দময়, মহাসত্তার (সচ্চিদানন্দ) লীলা-বিলাস। যাহা দেখেন, যাহা কিছু প্রকাশমান, সকলই আনন্দস্বরূপ, অমৃতরূপ—'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি'।

ঋষি দেখেন, জগতে সর্বত্রই মধুর সিঞ্চন—সমীরণ মধু বহন করে, নদীসকল মধু ক্ষরণ করে, ভূলোক দ্যুলোক সকলই মধুময়—

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
···মধুমৎ পার্থিবং রজঃ ইত্যাদি —ঋক্ ১।৯।৬-৯

প্রাচীন ভারতের ঋষিগণ তাঁহাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন কয়েকটি বেদবাণী উদ্ধৃত করিয়া তাহা বলিলাম। আবার দেখুন, আধুনিক ভারতের ঋষি-কবি জগন্ময় আনন্দস্বরূপের বিকাশ দেখিয়া কি অনুপম ভাষায় অনুরূপ সুখানুভূতির বর্ণনা করিয়াছেন—

প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোক ভূলোকে
তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া।
দিকে দিকে আজ টুটিয়া সকল বন্ধ,
মূরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ;
জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া।

'মূরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ'—ইহাই আনন্দস্বরূপের স্পর্শ। তাই আবার গাহিলেন—

এই লভিনু সঙ্গ তব
সুন্দর হে সুন্দর!
পুণ্য হলো অঙ্গ মম
ধন্য হলো অন্তর!
সুন্দর হে সুন্দর!

সুন্দর হে সুন্দর! ইনিই বেদের আনন্দব্রহ্ম, রসব্রহ্ম। ভাগবতের 'কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ পরমেশ্বরঃ', 'সমস্তসৌন্দর্যসারসন্নিবেশঃ'। ভক্তিশাস্ত্রের 'অখিলরসামৃতমূর্তি'—'মধুরং, মধুরং, মধুরং, মধুরম্'।

প্রশ্ন হইয়াছিল, সেই আনন্দস্বরূপই জীবজগতে অনুপ্রবিষ্ট আছেন, তবে জীব সে আনন্দ পায় না কেন, তাহার দুঃখ কেন? উত্তর—জীব সে আনন্দস্বরূপকে চায় না কেন? তিনি লীলাচ্ছলে প্রকৃতির আবরণে—জীবের কামনা-বাসনার অন্তরালে লুকাইয়া আছেন, ধরা দিবার জন্যই। জীব তন্মনা হইয়া কৃষ্ণবিরহবিধুরা গোপাঙ্গনাগণের ন্যায় তাঁহার অন্বেষণ করুক, তিনি হাসিমুখে দেখা দিবেন—'স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।' দুঃখ কোথায়? দুঃখ নাই।

স্বামী বিবেকানন্দকে আমেরিকায় কোন সভায় এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল—'সংসারে দুঃখ কেন?' তিনি বলিলেন—'দুঃখ আছে আগে প্রমাণ করুন, পরে উত্তর দিব।' তিনি সেই আনন্দের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাই তারস্বরে তিনি বেদান্তের সেই অমৃত বাণী, আনন্দবার্তাই ঘোষণা করিয়াছেন। যাঁহারা সে আনন্দের কণামাত্র আস্বাদ করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার সাক্ষী। সেকালের মুনি-ঋষিদের কথা, শুক-সনক-নারদ-প্রহ্লাদের কথা ও না-ই বা তুলিলাম। এই তো এ কালেও দেখিলাম প্রভু শ্রীবাস আচার্য গৃহাঙ্গনে মৃত পুত্র রাখিয়া কীর্তনানন্দে মত্ত হইলেন, ঠাকুর হরিদাস বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত খাইয়াও আনন্দে হরিনাম করিতে লাগিলেন, রাজরাণী মীরাবাঈ অপার আনন্দে বিভোর হইয়া 'হরিসে লাগি রহরে ভাই' গাহিতে গাহিতে বৃন্দাবনে ছুটিলেন। ইঁহারা তো সাংসারিক শুভাশুভ, সুখ-দুঃখের ধার ধারিলেন না, ইঁহারা যে আনন্দে বিভোর, প্রত্যেক জীবই তো সে আনন্দের অধিকারী; তবে কিরূপে বলিব যে, জগতে দুঃখই আছে আনন্দ নাই? কথাটা ঠিক বিপরীত, আনন্দই আছে, ছিল, থাকিবে,—নিত্যানন্দ, প্রেমানন্দ, ভূমানন্দ, উহাই বস্তু। সুখদুঃখ অনিত্য, আজ আছে, কাল নাই, উহার ত্রৈকালিক অস্তিত্ব নাই, সুতরাং উহা অবস্তু। সুতরাং সৃষ্টিতে অমঙ্গল কেন, এ প্রশ্নই তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে ঠিক নয়,—ঈশ্বর মঙ্গলময়, রসময়, আনন্দস্বরূপ; সৃষ্টিও আনন্দস্বরূপ, তিনি জগৎ আনন্দপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, সেই রসলাভ করিয়া সকলেই আনন্দিত হয় (এষ হ্যেবানন্দয়তি, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি—তৈত্তিঃ উপ.)। তবে সকলে আনন্দ পায় না কেন? উত্তর পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। (অপিচ, পরের তিন শ্লোক এবং ভাঃ ৭।৬।২৩ দ্রঃ)। ১২

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥ ১৩
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ ১৪

১৩। এভিঃ ত্রিভিঃ (এই তিন) গুণময়ৈঃ ভাবৈঃ (গুণময় ভাবের দ্বারা) মোহিতম্ (মোহিত) ইদং সর্বং জগৎ (এই সমস্ত জগৎ) এভ্যঃ পরম্ (এই সকল ভাব হইতে শ্রেষ্ঠ, ইহার অতিরিক্ত) অব্যয়ং মাং (নির্বিকার আমাকে) ন অভিজানাতি (জানিতে পারে না)।

ত্রিগুণাত্মিকা মায়ায় জগৎ মোহিত—তাঁহার শরণে মায়া নাশ ১৩-১৫

এই ত্রিবিধ গুণময় ভাবের দ্বারা (সত্ত্বরজস্তমোগুণ দ্বারা) সমস্ত জগৎ মোহিত হইয়া রহিয়াছে, এ-সকলের অতীত অক্ষয় আনন্দস্বরূপ আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে পারে না। ১৩

১৪। এষা (এই) গুণময়ী (ত্রিগুণাত্মিকা) দৈবী (অলৌকিক) মম মায়া হি দুরত্যয়া (নিশ্চিতই দুস্তরা); যে (যাহারা) মাম্ এব (আমাকেই) প্রপদ্যন্তে (ভজনা করে, আশ্রয় করে), তে (তাহারা) এতাং মায়াং তরন্তি (এই মায়া উত্তীর্ণ হইয়া থাকে)

গুণময়ী—সত্ত্বাদি গুণত্রয়াত্মিকা। **দৈবী**—মহেশ্বরস্য বিষ্ণোঃ স্বভাবভূতা (শঙ্কর); দেবেন ক্রিয়াপ্রবৃত্তেন মায়া এব নির্মিতা—লীলা-প্রবৃত্ত ভগবান্ ক্রীড়ার জন্য যে মায়া প্রস্তুত করিয়াছেন (রামানুজ); অলৌকিকী (শ্রীধর)।

এই ত্রিগুণাত্মিকা অলৌকিকী আমার মায়া নিতান্ত দুস্তরা। যাঁহারা একমাত্র আমারই শরণাগত হইয়া ভজনা করেন, তাঁহারাই কেবল এই সুদুস্তরা মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন। ১৪

মায়া-তত্ত্ব

পূর্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে, প্রকৃতির ত্রিবিধ ভাবের দ্বারা সমস্ত জগৎ মোহিত; ১৪শ শ্লোকে বলা হইল, 'আমার এই গুণময়ী মায়া সুদুস্তরা', অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকেই মায়া বলা হইতেছে। বস্তুতঃ সাংখ্যে যাহাকে প্রকৃতি বলে, উহাকে বেদান্তে মায়া, অবিদ্যা বা অজ্ঞান বলা হয় এবং উহাই শাস্ত্রান্তরে মহামায়া, আদ্যাশক্তি, দুর্গা, কালী ইত্যাদি নামে অভিহিত। এই বিভিন্ন শব্দগুলি এক বস্তু সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইলেও সেই বস্তুতত্ত্বটি সকলে ঠিক

একভাবে গ্রহণ করেন না, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। বস্তুতঃ ব্রহ্মস্বরূপ সম্বন্ধে যেমন নানারূপ মতভেদ আছে এবং তদনুরূপ উপাস্য-উপাসনা-প্রণালীরও পার্থক্য হয়, সেইরূপ প্রকৃতি বা মায়ার স্বরূপ সম্বন্ধেও মতভেদ অবশ্যম্ভাবী। বস্তুতঃ ইনি যেমন 'দুস্তরা' তেমনি দুর্বোধ্যা। সাংখ্যের প্রকৃতিতত্ত্ব কি, তাহা পূর্বে কথঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে। (৭।৪ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রঃ)। এক্ষণে এই প্রকৃতি-তত্ত্ব বেদান্তে, ভক্তিশাস্ত্রে ও তন্ত্রশাস্ত্রে কি ভাবে গৃহীত হইয়াছে তাহাই দেখিতে হইবে।

নির্বিশেষ **অদ্বৈতবাদে** একমাত্র ব্রহ্মই সৎ বস্তু, প্রকৃতির পরিণাম এই যে দৃশ্যপ্রপঞ্চ উহা অসৎ, অবস্তু, উহার পারমার্থিক সত্তা নাই। অব্যক্ত নির্গুণ পরব্রহ্মই দৃশ্য জগৎরূপে বিবর্তিত বা প্রতীয়মান হয়। রজ্জুর উপরে ঈষৎ অন্ধকার পড়িলে যেমন উহা সর্প বলিয়া প্রতীয়মান হয়, পরব্রহ্মের উপরেও একটা আবরণ পড়াতে উহাকে দৃশ্যপ্রপঞ্চ বলিয়া ভ্রম হয়। অন্ধকার অপসারণ করিলে যেমন সর্পভ্রম দূর হয়, তখন জ্ঞান হয় যে ওটি রজ্জু, এই পরব্রহ্মের উপরের আবরণ অপসৃত হইলেও জগৎ-ভ্রম দূর হয়, তখন জ্ঞান হয় যে সমস্তই ব্রহ্ম—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। পরব্রহ্মের এই যে আবরণ, আচ্ছাদন বা উপাধি (=উপরে স্থিত যাহা) ইহাকেই মায়া বা অজ্ঞান বলে। সুতরাং এই জগৎপ্রপঞ্চ মায়ার বিজৃম্ভণ—'ব্রহ্মসত্যে অধ্যস্ত ভ্রমমাত্র'; সুতরাং এই প্রপঞ্চের মূলীভূত সাংখ্যের যে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি তাহা এই মতে হইলেন গুণময়ী মায়া বা অজ্ঞান। এই মায়ার স্বরূপ কি? তাহা প্রকৃতপক্ষে অচিন্ত্য ও অনির্বাচ্য। বেদান্তসার ইহার এইরূপ লক্ষণ বর্ণনা করেন—

'সদসদ্ভ্যামনির্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধিভাবরূপং যৎকিঞ্চিৎ।'

—ইহা সৎ নহে, অসৎ নহে, ইহা অনির্বচনীয়, ত্রিগুণাত্মক, জ্ঞানবিরোধী, ভাবরূপ কোন কিছু।

ইহার ত্রৈকালিক অস্তিত্ব নাই, জ্ঞান হইলে অজ্ঞান থাকে না। তখন ইহা মিথ্যা বলিয়াই প্রতীত হয়, সুতরাং ইহাকে সৎ বলা যায় না। আবার শশশৃঙ্গ বা অশ্বডিম্বের ন্যায় আত্যন্তিক অবস্তুও বলা যায় না, কেননা ব্যবহারিক ভাবে জগৎটা মিথ্যা নহে, একটা কিছু আছে বলিয়া সকলেই অনুভব করে; আবার মায়াকে অনেক স্থলে ব্রহ্মেরই শক্তি বলা হইয়াছে; তখন ইহা অসৎ, অবস্তু কিরূপে? ইহা সৎ নয়, অসৎও নয়, বস্তুও নয়, অবস্তুও নয়, অনির্বাচ্য কোন-কিছু। ইহা ত্রিগুণাত্মিকা, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রৈগুণ্যই মায়া। জ্ঞানবিরোধী—কেননা, অজ্ঞান বা মায়া দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে।

('অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানম্'; 'যোগমায়াসমাবৃতঃ' ইত্যাদি ৫।১৪, ৭।২৫ গীতা)। 'ভাবরূপং' বলার তাৎপর্য এই যে, মায়া বা অজ্ঞান অভাবপদার্থ বা শূন্যবাচক নহে, কিন্তু ভাবপদার্থ হইলেও ব্রহ্মপদার্থের ন্যায় পারমার্থিক সত্য নহে, তাই বলা হইল—'যৎকিঞ্চিৎ'।

যাহা হউক, মায়া অনির্বাচ্য হইলেও উহা ব্রহ্মেরই শক্তি বলিয়াই বর্ণিত হয়। উহার শক্তি দ্বিবিধ—আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তি। মায়ার আবরণ-শক্তির ফলে জীব আপনাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন মনে করে এবং বিক্ষেপ শক্তির ফলে আমি কর্তা, আমি ভোক্তা ইত্যাদি কল্পনা সৃষ্টি করিয়া সংসার-মোহে জড়িত হয়।

অদ্বৈতবাদে ব্রহ্মের দ্বিবিধ লক্ষণ বর্ণিত হয়—স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ। স্বরূপ লক্ষণে ব্রহ্ম নির্বিকল্প, নির্গুণ, সমস্ত বিশেষ বর্জিত—অজ্ঞেয়, অমেয়, অচিন্ত্য ইত্যাদি। তটস্থ লক্ষণে তিনি সগুণ, সবিশেষ—সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি, সর্বকর্মা, সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কর্তা। এই মতে সগুণ ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্তা নাই। ইহা 'নির্গুণ ব্রহ্মের মায়া-উপহিত বিবর্ত, সঙ্কল্পমাত্র সিদ্ধ অবস্তু'। ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ নির্বিশেষ, নির্গুণ।

'তটস্থ' অর্থ পরিচায়ক মাত্র, অর্থাৎ কোন বস্তুর পরিচয় দেওয়ার জন্য একটা নামমাত্র। কিন্তু ঐ নামে বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করে না। যেমন, 'ফরাসগঞ্জ' বলিয়া একটি স্থানের পরিচয় দেওয়া যায় বটে, কিন্তু ঐ স্থানে যে ফরাসীরা বাস করে তাহা নয়। সেইরূপ সগুণ সৃষ্টিকর্তা ইত্যাদি বলিয়া ব্রহ্মের পরিচয় দেওয়া যায় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই গুণ, সৃষ্টি বা প্রকৃতি ব্রহ্মে নাই, উহা অবিদ্যা বা মায়ার আবরণ মাত্র। এই জন্য ইহাকে মায়া-উপহিত বলা হয়। অবিদ্যা ও মায়া একার্থক, কিন্তু উত্তরকালীন বেদান্ত গ্রন্থাদিতে এই দুইটির মধ্যে কিছু পার্থক্য করা হইয়াছে। পঞ্চদশী বলেন—পরব্রহ্মের প্রতিবিম্ব-স্বরূপা প্রকৃতি দ্বিবিধা—মায়া ও অবিদ্যা; প্রকৃতির শুদ্ধ সত্ত্বগুণের প্রাবল্যে মায়া এবং মলিনসত্ত্বের (রজস্তমোমিশ্র) প্রাবল্যে অবিদ্যা। মায়া-উপহিত ব্রহ্মচৈতন্য ঈশ্বর, অবিদ্যা-উপহিত ব্রহ্মচৈতন্য জীব পদবাচ্য। মায়া ঈশ্বরের বশীভূত, তাই তিনি মায়াধীশ, জীব কিন্তু অবিদ্যার বশীভূত, তাই জীব মায়াধীন; এই ঈশ্বর ও জীব উভয়ই উপাধি-কল্পিত অবস্তু। ('ঈশ্বরত্বঞ্চ জীবত্বম্ উপাধিদ্বয়-কল্পিতম্'—পঞ্চদশী); উপাধি পরিত্যাগ করিলে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই থাকেন।—

মায়াবিদ্যে বিহায়ৈবং উপাধি পরজীবয়োঃ।
অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং পরং ব্রহ্মৈব লক্ষ্যতে। —পঞ্চদশী ১।৪৮

সুতরাং এই মতে ঈশ্বর, জীব, জগৎ—নির্গুণ ব্রহ্মবস্তুর মায়াজন্য বিবর্ত মাত্র, ইহাকেই **বিবর্তবাদ** বা মায়াবাদ বলে। কিন্তু **বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ** ব্রহ্মের এই স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণ স্বীকার করেন না। এই মতে সবিশেষ ব্রহ্মই প্রমাণসিদ্ধ। এই জগৎ ব্রহ্মেরই শরীর, ব্রহ্মই জগৎরূপে পরিণত হন। ইহাকেই **পরিণামবাদ** বলে।

সতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদাহৃতঃ।
অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত ইত্যুদীরিতঃ॥

—এক বস্তু অন্য প্রকারে পরিণত হইলে তাহা বিকার বা পরিণাম (যেমন দুধ হইতে দধি); এক বস্তু অন্যরূপে প্রতীয়মান হইলে তাহা বিবর্ত (যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম)।

এই পরিণামবাদ অনুসারে পুরুষ, প্রকৃতি, পরমেশ্বর—ব্রহ্মেরই এই তিন ভাব; ব্রহ্ম সর্বদাই মায়াবিশিষ্ট, আর এই মায়া 'অনির্বাচ্য, অবস্তু' কোন কিছুই নয়, ইহা বিচিত্র জগৎ-সৃষ্টিকর্ত্রী গুণাত্মিক। প্রকৃতি—'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ, মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।'

'অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যায় অনেকে বলেন—"দৃশ্য-জগৎ মিথ্যা", ইহার অর্থ জগৎ নাই, চক্ষে দেখা যায় না, এরূপ ধরিবে না। একই দ্রব্যের নামরূপের ভেদে উৎপন্ন জগতের অনেক দেশ-কালকৃত দৃশ্য নশ্বর, অতএব মিথ্যা এবং এই সকল নাম ও রূপের দ্বারা আচ্ছাদিত ও নামরূপের মূলে সতত সমানভাবে অবস্থিত অবিনাশী ও অপরিবর্তনীয় বস্তুতত্ত্বই সত্য, ইহাই এ কথার প্রকৃত অর্থ। পোদ্দারের নিকট গোট, তাবিজ, বাজুবন্দ প্রভৃতি গহনা মিথ্যা, সেই সব গহনার সোনাই সত্য।' —গীতারহস্য, লোকমান্য তিলক

এরূপ ব্যাখ্যা অনেকটা পূর্বোক্ত পরিণামবাদই সমর্থন করে। তাই বেদান্তরত্ন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন—"যেমন কুণ্ডল, বলয় প্রভৃতি স্বর্ণালঙ্কারসকলের মধ্যে আকারের ও সংজ্ঞার প্রভেদ থাকিলেও রাসায়নিকের দৃষ্টিতে উহারা স্বর্ণ বই আর কিছু নহে, তাহাদের মধ্যে নামরূপের প্রভেদ মাত্র, সেইরূপ জগৎ ত্রিবিধ বৈচিত্র্যময় হইলেও ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু নহে—জগৎ ব্রহ্মের প্রকৃতি—ব্রহ্মের প্রকার বা বিধা (aspect), ইহা স্বীকার করিলেই এ-কথার যথেষ্ট সমর্থন হয়, তজ্জন্য জগৎকে অলীক বলার প্রয়োজন হয় না।

"জগতের সত্য-মিথ্যা সম্বন্ধে গীতা প্রধানতঃ বিশিষ্টাদ্বৈত মতের অনুযায়ী পরিণামবাদেরই অনুমোদন করিয়াছেন। অদ্বৈতমতানুযায়ী বিবর্তবাদের সমাদর করেন নাই।" —গীতায় ঈশ্বরবাদ (হীরেন্দ্রনাথ দত্ত)

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তেও পরিণাম-বাদই স্বীকৃত। যথা—

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুবাক্য—

"পরিণামবাদ ব্যাসসূত্রের সম্মত।
অচিন্ত্য শক্ত্যে ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত॥
মণি যৈছে অবিকৃত প্রসবে হেমভার।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর তবু অবিকার॥
ব্যাস ভ্রান্ত বলি সেই সূত্রে দোষ দিঞা।
বিবর্তবাদ স্থাপিয়াছে কল্পনা করিঞা॥
জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি সেই মিথ্যা হয়।
জগৎ যে মিথ্যা নহে নশ্বর মাত্র কয়॥" —চৈঃ চঃ, মধ্যখণ্ড ৬

এস্থলে ব্রহ্মসূত্রের "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ" (১।৪।২৬), 'পটবচ্চ' প্রভৃতি সূত্রের প্রতি লক্ষ করা হইয়াছে। (২।১।৮)

ভক্তিশাস্ত্র বলেন, ভগবান্ বা ঈশ্বর বলিতে নির্গুণ, নির্বিশেষ কিছু বুঝায় না, অনন্ত শক্তিবিশিষ্ট বস্তুতত্ত্বই ভগবান্। তাঁহার শক্তির ত্রিবিধ প্রকাশ—অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি, তটস্থা জীবশক্তি ও বহিরঙ্গা মায়াশক্তি। চিচ্ছক্তিই স্বরূপশক্তি; তিনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, সুতরাং তাঁহার স্বরূপশক্তি তিন অংশে ত্রিবিধ—'আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী, চিদংশে সংবিৎ, যাঁরে জ্ঞান করি মানি'। তাঁহার তটস্থা-শক্তি জীবরূপে প্রকাশিত (গীতার পরা প্রকৃতি); উহা ভেদ ও অভেদরূপে প্রকাশ পায়, যেমন অগ্নি ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ; স্ফুলিঙ্গ অগ্নি বটে, কিন্তু ঠিক অগ্নিও নয়, অগ্নিকণা মাত্র। পূর্ণশক্তি ঈশ্বর ও অণুশক্তি জীবে এইরূপ ভেদাভেদ সম্বন্ধ। ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের **'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ'**। এতদ্ব্যতীত তাঁহার বহিরঙ্গা মায়াশক্তি জগৎ-সৃষ্টিকর্ত্রী। ইহাই গীতার অপরা প্রকৃতি, কিন্তু ঈশ্বরের অধিষ্ঠান বা ইচ্ছা ব্যতীত প্রকৃতির সৃষ্টিসামর্থ্য নাই। সুতরাং সাংখ্যের জড়া প্রকৃতি ও মায়ার পার্থক্য দেখানো প্রয়োজন। তাই বৈষ্ণব শাস্ত্র বলেন—

'মায়ার যে দুই বৃত্তি মায়া আর প্রধান।
মায়া নিমিত্ত হেতু বিশ্বের প্রকৃতি উপাদান॥" —চৈঃ চঃ মধ্য ২০

প্রকৃতি উপাদান কারণ, মায়া নিমিত্ত কারণ। 'মায়া নিমিত্ত কারণ' ইহার অর্থ এই—ঈশ্বরের শক্তি, 'ঈক্ষণ' বা ইচ্ছাই অর্থাৎ ঈশ্বরই মূল কারণ। তাহাই আবার স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—

"মায়া অংশে কহি তারে নিমিত্ত কারণ।
সেহো নহে যাতে কর্তা হেতু নারায়ণ।
কৃষ্ণ কর্তা মায়া তাঁর করেন সহায়।
ঘটের কারণ চক্রদণ্ডাদি উপায়॥ —চৈঃ চঃ, আদি। ৫

অর্থাৎ কৃষ্ণই কর্তা, মায়া যন্ত্রস্বরূপ, ('ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া' ইত্যাদি—গীতা ১৮।৬১)। মায়ার স্বরূপ সম্বন্ধে এ সকল মত গীতারই অনুরূপ।

বস্তুতঃ নিরীশ্বর সাংখ্য ব্যতীত সকল শাস্ত্রেই বলেন যে, প্রকৃতি বা মায়া ঈশ্বরেরই শক্তি। **তন্ত্রশাস্ত্রে** এই শক্তিরই প্রাধান্য, শক্তিই ঈশ্বরী। সাংখ্যের পুরুষই শিব—শয়ান, নিষ্ক্রিয়, উদাসীন, দ্রষ্টা, সাক্ষী ও অনুমন্তা (২৫০ পৃঃ) আর তাঁহার সম্মুখে বিশ্বলীলায় নৃত্যপরা ক্রীড়াশীলা প্রকৃতিই কালী। বেদান্তের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, এই শক্তি পরব্রহ্মের স্পন্দনশক্তি। মণিতে যেরূপ স্বাভাবিক ঝলক উঠে, পরম শান্ত চিন্ময় ব্রহ্মেও সেইরূপ স্বাভাবিক স্পন্দন উঠে। এই স্পন্দনই মায়া। "চিন্ময় ব্রহ্মই শিব, আর তাঁহার মনোময়ী স্পন্দনশক্তিই কালী।" তাই শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য আনন্দলহরীতে ইঁহাকে 'পরব্রহ্ম-মহিষী' বলিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রপঞ্চাতীত অবস্থায় যিনি 'শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্', সৃষ্টিপ্রপঞ্চে তিনিই শিব-শক্তি। শক্তিমান্ ও শক্তি এক, কেবল তাহাই নহে, শক্তি ব্যতীত শক্তিমানের কার্যক্ষমতাই নাই—সুতরাং শক্তিই উপাস্যা।

'শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং
ন চেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।'

—শিব যদি শক্তিযুক্ত হন, তাহা হইলেই তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার করিতে পারেন, অন্যথা দেব স্পন্দন করিতেও সমর্থ নহেন। —আনন্দ-লহরী

ব্রহ্মশক্তি প্রধানতঃ ত্রিবিধ—জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি। 'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে—স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।' জ্ঞানশক্তিকে বলে সাত্ত্বিকী মায়া, ইনি বৈষ্ণবী শক্তি। ইচ্ছাশক্তি রাজসী মায়া, ইনি ব্রাহ্মী-শক্তি; ক্রিয়াশক্তি তামসী মায়া—ইনি রৌদ্রীশক্তি। এই ত্রিবিধ শক্তিদ্বারাই মহামায়া জগন্ময়ী জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার কার্য করিতেছেন; তিনিই ত্রৈগুণ্যময়ী প্রকৃতি।

'প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ সর্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী।' —মার্কণ্ডেয় চণ্ডী ১।৭৮
'বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে॥ —মার্কণ্ডেয় চণ্ডী ১।৭৬

সৃষ্টিতে শক্তির অনন্ত বিকাশ। সুতরাং আদ্যাশক্তিরও নানা মূর্তি, নানা বিভাব। ইনি ভোগে ভবানী, সমরে সিংহবাহিনী দশপ্রহরণধারিণী দুর্গা, জগৎ-রক্ষায় জগদ্ধাত্রী, প্রলয়ে আবার ইনিই করালী কালী।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াঽপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥ ১৫
চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥ ১৬
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥ ১৭

১৫। দুষ্কৃতিনঃ (পাপকর্মা) মূঢ়াঃ (বিবেকশূন্য) নরাধমাঃ (নরাধমেরা) মায়য়া অপহৃতজ্ঞানাঃ (মায়াদ্বারা হৃতজ্ঞান হইয়া) আসুরং ভাবম্ আশ্রিতাঃ (আসুর স্বভাব প্রাপ্ত হওয়ায়) মাং ন প্রপদ্যন্তে (আমাকে ভজনা করে না)।

আসুর ভাব—দম্ভ, দর্প, অভিমানাদি আসুরিক স্বভাব। (১৬।৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য)

পাপকর্মপরায়ণ বিবেকশূন্য নরাধমগণ মায়াদ্বারা হৃতজ্ঞান হইয়া আসুর স্বভাব প্রাপ্ত হওয়ায় আমাকে ভজনা করে না। ১৫

১৬। হে ভরতর্ষভ, হে অর্জুন, আর্তঃ (রোগাদিক্লিষ্ট, বিপন্ন), জিজ্ঞাসুঃ (তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু), অর্থার্থী (ইহ-পরলোকে ভোগসুখার্থী), জ্ঞানী চ, [এই] চতুর্বিধাঃ সুকৃতিনঃ জনাঃ (পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ) মাং ভজন্তে (আমাকে ভজনা করেন)।

চতুর্বিধ ভক্ত—জ্ঞানী ভক্ত শ্রেষ্ঠ ১৬-১৯

হে ভরতর্ষভ, হে অর্জুন, যে সকল সুকৃতিশালী ব্যক্তি আমাকে ভজনা করেন, তাঁহারা চতুর্বিধ—আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী। ১৬

চতুর্বিধ ভক্ত—পূর্ব শ্লোকে যাহারা ভগবদ্‌বহির্মুখ, পাষণ্ডী, তাহাদিগের কথা বলা হইয়াছে। এই শ্লোকে যে সুকৃতিশালী ব্যক্তিগণ ভগবানে ভক্তিমান্, তাঁহাদিগের কথা বলা হইল। তাঁহারা চতুর্বিধ—(১) **আর্ত**—রোগাদিতে ক্লিষ্ট অথবা অন্যরূপে বিপন্ন; যেমন—কুরুসভায় দ্রৌপদী। (২) **জিজ্ঞাসু**—অর্থাৎ আত্মজ্ঞান-লাভেচ্ছু, যেমন—মুকুন্দ, রাজর্ষি জনক ইত্যাদি। (৩) **অর্থার্থী**—ইহকালে ও পরলোকে ভোগ-সুখ লাভার্থ যাঁহারা ভজনা করেন, যেমন—সুগ্রীব, বিভীষণ, উপমন্যু, ধ্রুব ইত্যাদি। (৪) **জ্ঞানী**—তত্ত্বদর্শী, শ্রীভগবান্‌কে তত্ত্বতঃ যাঁহারা জানিয়াছেন, যেমন—প্রহ্লাদ, শুক, সনক ইত্যাদি। ইঁহাদিগের মধ্যে প্রথম তিন প্রকার ভক্ত সকাম। ব্রজগোপিকাদি নিষ্কাম প্রেমিক ভক্ত।

১৭। তেষাং (তাঁহাদিগের মধ্যে) নিত্যযুক্তঃ (সতত আমাতে সমাহিত-চিত্ত) একভক্তিঃ (একমাত্র আমাতে ভক্তিমান্) জ্ঞানী বিশিষ্যতে (শ্রেষ্ঠ হন);

উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥ ১৮
বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ ১৯

অহং হি জ্ঞানিনঃ (আমি জ্ঞানীর) অত্যর্থং প্রিয়ঃ (অত্যন্ত প্রিয়) স চ মম প্রিয়ঃ (তিনিও আমার প্রিয়)।

ইঁহাদিগের মধ্যে জ্ঞানী ভক্তই শ্রেষ্ঠ। তিনি সতত আমাতেই যুক্তচিত্ত এবং একমাত্র আমাতেই ভক্তিমান্। আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয় এবং তিনিও আমার অত্যন্ত প্রিয়। ১৭

সকাম ভক্তগণ নিত্যযুক্ত হইতে পারেন না। তাঁহারা কখনও ঈশ্বর ভজনা করেন, কখনও সংসার ভজনা করেন। আবার তাঁহারা ইহ-পরকালের সুখার্থী বলিয়া একভক্তি অর্থাৎ একমাত্র ভগবানে ভক্তিমান্ হইতে পারেন না। তাঁহারা ধনাদি লাভার্থ অন্যান্য দেবতাও ভজনা করেন। এই হেতু জ্ঞানী ভক্তই শ্রেষ্ঠ। তবে কি সকাম ভক্তগণ সদ্গতি লাভ করেন না? তাঁহারা তোমার প্রিয় নন? না, তা নয়, তাঁহারাও উদার ইত্যাদি (পরের শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

১৮। এতে সর্বে এব (ইঁহারা সকলেই) উদারাঃ (উৎকৃষ্ট, মহান্), তু (কিন্তু) জ্ঞানী মে আত্মা এব (জ্ঞানী আমার আত্মস্বরূপ) মতং (ইহাই আমার মত); হি (যেহেতু) যুক্তাত্মা সঃ (মদ্গতচিত্ত সেই জ্ঞানী) অনুত্তমাং গতিং মাম্ এব (সর্বোৎকৃষ্ট গতিস্বরূপ আমাকেই) আস্থিতঃ (আশ্রয় করিয়াছেন)।

ইঁহারা সকলেই মহান্। কিন্তু জ্ঞানী আমার আত্মস্বরূপ, ইহাই আমার মত; যেহেতু, মদেকচিত্ত সেই জ্ঞানী সর্বোৎকৃষ্ট গতি যে আমি, সেই আমাকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন। ১৮

সকাম ভক্তগণ কাম্য বস্তুর লাভার্থেই আমার ভজনা করিয়া থাকেন। কাম্য বস্তুও তাঁহাদের প্রিয়, আমিও তাঁহাদের প্রিয়। কিন্তু মদ্ব্যতিরিক্ত জ্ঞানীর অন্য কাম্যবস্তু নাই। আমিই তাঁহার একমাত্র গতি, সুহৃদ্ ও আশ্রয়। (মহাভা. শান্তি, ৩৪১, ৩৩-৩৫)। আমি তাঁহার আত্মস্বরূপ। সুতরাং তিনিও আমার আত্মস্বরূপ, কেননা, যে ভক্ত আমাকে যেরূপ প্রীতি করে, আমিও তাহাকে সেইরূপ প্রীতি করিয়া থাকি।

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥ ২০

১৯। বহূনাং জন্মনাম্ অন্তে (বহু জন্মের পরে) বাসুদেবঃ সর্বম্ ইতি জ্ঞানবান্ (বাসুদেবই সমস্ত এই জ্ঞান লাভ করিয়া) [তিনি] মাং প্রপদ্যতে (আমাকে প্রাপ্ত হন); সঃ মহাত্মা সুদুর্লভঃ (অতি দুর্লভ)।

বাসুদেব—যিনি সর্ববিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন এবং যিনি সর্বভূতে বাস করেন তিনিই বাসুদেব; পরমাত্মা, পরমেশ্বর, পুরুষোত্তম।

ছাদয়ামি জগদ্বিশ্বং ভূত্বা সূর্য ইবাংশুভিঃ।
সর্বভূতাধিবাসশ্চ বাসুদেবস্ততোঽহম্॥ —মহাভাঃ, শান্তি. ৩৪১

বস্—(১) আচ্ছাদন করা (ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্—ঈশ উপ-১)। (২) বাস করা।
ইনিই অব্যক্ত মূর্তিতে জগৎ ব্যাপিয়া আছেন। ইনিই লীলাবশে ব্যক্তস্বরূপে বসুদেবপুত্র শ্রীকৃষ্ণ।

জ্ঞানী ভক্ত অনেক জন্মের পর 'বাসুদেবই সমস্ত' এইরূপ জ্ঞান লাভ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হন; এইরূপ মহাত্মা অতি দুর্লভ। ১৯

বহু জন্মের সাধনাফলে জ্ঞানী ভক্ত সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়া সর্বত্রই আমাকে দর্শন করিয়া থাকেন। তাদৃশ জ্ঞানী ভক্ত অতি দুর্লভ। ১৯

২০। তৈঃ তৈঃ কামৈঃ (সেই সেই অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্র ধনমানাদি বিবিধ কামনাদ্বারা) হৃতজ্ঞানাঃ (অপহৃতজ্ঞান ব্যক্তিরা) তং তং নিয়মম্ (সেই সেই বিহিত নিয়ম) আস্থায় (অবলম্বনপূর্বক) স্বয়া প্রকৃত্যা নিয়তাঃ (স্বীয় স্বীয় স্বভাবের বশীভূত হইয়া) অন্য দেবতাঃ প্রপদ্যন্তে (অন্য দেবতা ভজনা করিয়া থাকে)।

সকাম সাধনায় ঈশ্বর লাভ হয় না, স্বর্গাদি লাভ হয় ২০-২৩

(স্ত্রী-পুত্র ধনমানাদি বিবিধ) কামনাদ্বারা যাহাদের বিবেক অপহৃত হইয়াছে, তাহারা নিজ নিজ কামনা-কলুষিত স্বভাবের বশীভূত হইয়া ক্ষুদ্র দেবতাদের আরাধনায় ব্রতোপবাসাদি যে সকল নিয়ম আছে, তাহা পালন করিয়া অন্য দেবতার ভজনা করিয়া থাকে। (আমার ভজনা করে না)। ২০

পূর্বে সকাম ও নিষ্কাম এই দুই প্রকার ভক্তের কথা বলা হইয়াছে। এই শ্লোকে সকাম দেবোপাসকগণের কথা বলা হইল। ইঁহাদিগের এবং সকাম ভক্তগণের মধ্যে পার্থক্য এই যে, সকাম ভক্তগণ চিত্তশুদ্ধি দ্বারা ক্রমে নিষ্কাম ভাব লাভ করিয়া

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥ ২১
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥ ২২
অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥ ২৩

ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন। ক্ষুদ্র দেবোপাসকগণ কাম্য বস্তু লাভ করেন বটে, কিন্তু কখনই ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন না। এই কথাই পরের তিনটি শ্লোকে বলা হইয়াছে।

২১। যঃ যঃ ভক্তঃ (যে যে ভক্ত) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) যাং যাং তনুম্ (যে যে দেবমূর্তি) অর্চিতুম্ ইচ্ছতি (অর্চনা করিতে ইচ্ছা করে) তস্য (সেই সেই ভক্তের) তাম্ এব (সেই দেবমূর্তি বিষয়ক) অচলাং শ্রদ্ধাম্ (অচল শ্রদ্ধা) অহং বিদধামি (আমি বিধান করি)।

যে যে সকাম ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে যে যে দেবমূর্তি অর্চনা করিতে ইচ্ছা করে, আমি (অন্তর্যামিরূপে) সে সকল ভক্তের সেই সেই দেবমূর্তিতে ভক্তি অচলা করিয়া দেই। ২১

২২। সঃ (সেই সকাম দেবোপাসক) তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ (সেই শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) তস্যাঃ (সেই দেবতার) আরাধনম্ ঈহতে (আরাধনা করিয়া থাকে)। ততঃ (তাহা হইতে, সেই দেবতা হইতে) ময়া এব বিহিতান্ (আমাকর্তৃকই বিহিত) তান্ কামান্ (সেই কাম্যবস্তুসমূহ) হি লভতে (নিশ্চয়ই লাভ করিয়া থাকে)।

সেই দেবোপাসক মৎবিহিত শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সেই দেবমূর্তির অর্চনা করিয়া থাকে এবং সেই দেবতার নিকট হইতে নিজ কাম্যবস্তু লাভ করিয়া থাকে, সেই সকল আমাকর্তৃকই বিহিত (কেননা সেই সকল দেবতা আমারই অঙ্গস্বরূপ)। ২২

২৩। তু (কিন্তু) অল্পমেধসাং তেষাং (অল্পবুদ্ধি সেই ব্যক্তিগণের) তৎ ফলম্ (সেই ফল) অন্তবৎ ভবতি (বিনাশী, নশ্বর হয়); হি (যেহেতু) দেবযজঃ (দেবোপাসকগণ) দেবান্ যান্তি (দেবতাগণকে প্রাপ্ত হন); মদ্ভক্তাঃ (আমার ভক্তগণ) মাম্ অপি যান্তি (আমাকেই প্রাপ্ত হন)।

কিন্তু অল্পবুদ্ধি সেই দেবোপাসকগণের আরাধনালব্ধ ফল বিনাশশীল; দেবোপাসকগণ দেবলোক প্রাপ্ত হন, আর আমার ভক্তগণ আমাকেই লাভ করিয়া থাকেন। ২৩

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥ ২৪

২৪। অবুদ্ধয়ঃ (অল্পবুদ্ধি, অবিবেকিগণ) মম (আমার) অব্যয়ম্ (নিত্য, অক্ষয়) অনুত্তমং (সর্বোৎকৃষ্ট) পরং ভাবম্ (পরম স্বরূপ) অজানন্তঃ (না জানিয়া) অব্যক্তং মাং (প্রপঞ্চাতীত আমাকে) ব্যক্তিম্ আপন্নং (প্রাকৃত মনুষ্যাদি ভাবপ্রাপ্ত) মন্যন্তে (মনে করে)।

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নম্—অব্যক্তং প্রপঞ্চাতীতং মাং ব্যক্তিং মনুষ্য-মৎস্যকূর্মাদি ভাবং প্রাপ্তং (শ্রীধর)—মায়াতীত আমাকে ব্যক্তিভাবাপন্ন অর্থাৎ মনুষ্য মৎস্যকূর্মাদি ভাব প্রাপ্ত বলিয়া মনে করে। কিন্তু লীলাবশে আমি মনুষ্যাদি ভাব গ্রহণ করিলেও আমার অব্যয় স্বরূপের ব্যত্যয় হয় না, ইহা বুঝিতে পারে না।

ভগবৎস্বরূপ দুর্জ্ঞেয়, ভগবানের ভজনা দ্বারাই
ব্রহ্মতত্ত্বাদির জ্ঞান হয় ২৪-৩০

অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ আমার নিত্য সর্বোৎকৃষ্ট পরম স্বরূপ না জানায় অব্যক্ত আমাকে প্রাকৃত মনুষ্যবৎ ব্যক্তিভাবাপন্ন মনে করে। ২৪

অবতার ও অবতারী

যিনি অব্যক্ত, নির্বিশেষ, নির্বিকার, লীলাবশে তিনিই ব্যক্ত হইয়া সবিশেষ সাকার রূপ ধারণ করেন, ইহাই অবতার। অব্যক্ত স্বরূপে যিনি অবতারী, ব্যক্ত স্বরূপে তিনিই অবতার, সুতরাং ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার, সগুণ কি নির্গুণ, এই সকল কথা লইয়া বাদ-বিসম্বাদ নিরর্থক, কেননা তিনি নির্গুণ হইয়াও সগুণ, নিরাকার হইয়াও সাকার, ইহাই তাঁহার অলৌকিক মায়া বা যোগ ('পশ্য মে যোগমৈশ্বরং' ইত্যাদি—গীতা ৭।২৫, ৯।৫, ১০।৭, ১১।৮)। সুতরাং ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয় স্বরূপেই তিনি পূর্ণ, ব্যক্ত হইলেও তাঁহার পূর্ণতার হানি হয় না ('পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে' ঈশ. উপ.)। শ্রীভাগবতে অবতার-স্বরূপ এই ভাবেই বর্ণনা করা হইয়াছে; যথা, শ্রীশুকদেব-বাক্য—

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ॥ —ভাগবত ১০।১৪।৫৫

—শ্রীশুকদেব কহিলেন, হে রাজন্, এই কৃষ্ণকে অখিল আত্মার আত্মা বলিয়া জানিবেন, তিনি জগতের হিতের নিমিত্ত মায়াদ্বারা এই পৃথিবীতে দেহীর ন্যায় প্রকাশ পাইয়া থাকেন।

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥ ২৫

শ্রীভাগবত শ্রীকৃষ্ণকে অন্যান্য অবতারের সঙ্গে উল্লেখ করিয়াও পরে বলিয়াছেন—'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং'—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ অবতার হইলেও 'সর্ব অবতারী' স্বয়ং ঈশ্বর।

কিন্তু কোন অবতারের যখন আবির্ভাব হয় তখন সকলে তাঁহাকে চিনে না, ঈশ্বর বলিয়াও গ্রহণ করে না। ভক্ত, অভক্ত সকল কালেই আছে, শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-কালেও ছিল। সেকালের জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ ভীষ্মদেব শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন, তিনি তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়াই জানিতেন। পক্ষান্তরে শিশুপালাদি তাঁহাকে সামান্য মনুষ্য বলিয়াই মনে করিতেন। রাজসূয় যজ্ঞোপলক্ষ্যে ভীষ্মদেব শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্যদানের প্রস্তাব করিলে শিশুপাল ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার তীব্র প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন—

বালা যূয়ং ন জানীধ্বং ধর্মঃ সূক্ষ্মোহি পাণ্ডবাঃ।
অয়ঞ্চ স্মৃত্যতিক্রান্তো হ্যাপগেয়োঽল্পদর্শিনঃ ॥ —মহাভা. সভা. ৩৮

—ওহে পাণ্ডবগণ, তোমরা বালক, কিছুই জান না, ধর্ম অতি সূক্ষ্ম পদার্থ; এই অল্পবুদ্ধি নদীপুত্রেরও (ভীষ্মের) স্মৃতিভ্রম উপস্থিত হইয়াছে, দেখিতেছি।

এইরূপে শিশুপাল, পাণ্ডবগণ ও ভীষ্মদেব হইতে আরম্ভ করিয়া পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণকেও যথেষ্ট গালাগালি দিলেন। তদুত্তরে ভীষ্মদেব যে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন তাহাতে তিনি বলিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ কুলেশীলে বিদ্যা-বুদ্ধিতে, শৌর্যেবীর্যে আদর্শ মনুষ্য; কেবল তাহাই নহে, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর।

কৃষ্ণ এব হি লোকানামুৎপত্তিরপি চাব্যয়ঃ।
কৃষ্ণস্য হি কৃতে বিশ্বমিদং ভূতং চরাচরম্ ॥
অয়ন্তু পুরুষোঃ বালঃ শিশুপালো ন বুধ্যতে।
সর্বত্র সর্বদা কৃষ্ণং তস্মাদেব প্রভাষতে ॥ —মহাভা. সভা. ৩৮

এস্থলে ভীষ্মদেব 'অব্যয়' 'ঈশ্বর' বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় দিলেন এবং বলিলেন যে, অল্পবুদ্ধি শিশুপাল তাঁহাকে চিনিতে পারে না বলিয়াই সর্বত্র সর্বদা এইরূপ কথা বলে। উপরি-উক্ত শ্লোকে শ্রীভগবান্‌ও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন।

২৫। অহং যোগমায়াসমাবৃতঃ (যোগমায়ায় সমাচ্ছন্ন থাকায়) **সর্বস্য** (সকলের নিকট) **প্রকাশঃ ন** (প্রকাশিত হই না); [অতএব] **মূঢ়ঃ অয়ং**

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬

লোকঃ (এই সকল মূঢ় লোক) মাম্ (আমাকে) অজম্ (জন্মরহিত) অব্যয়ম্ (ক্ষয়শূন্য, অক্ষয়) [বলিয়া] ন অভিজানাতি (জানিতে পারে না)।

আমি যোগমায়ায় সমাচ্ছন্ন থাকায় সকলের নিকট প্রকাশিত হই না। অতএব মূঢ় এই সকল লোক জন্মমরণরহিত আমাকে পরমেশ্বর বলিয়া জানিতে পারে না। ২৫

যোগ, যোগমায়া, যোগেশ্বর—'যোগ' শব্দের নানা অর্থ আছে—'যোগঃ সংহনন-উপায়-ধ্যান-সঙ্গতি-যুক্তিষু' (অমরকোষ); উহার একটি অর্থ হইতেছে উপায়, কৌশল বা সাধন। মহাভারতের নানাস্থানে এই অর্থে 'যোগ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন, দ্রোণাচার্য বধের উপায় সম্বন্ধে বলা হইতেছে—'একোহি যোগোঽস্য ভবেদ্ বধায়'—'উঁহার বধের একটি মাত্র উপায় বা কৌশল আছে'। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ইত্যাদি শব্দেও 'যোগ' শব্দের অর্থ ঈশ্বরপ্রাপ্তির 'উপায়' বা মার্গ। গীতায় অনেক স্থলেই 'যোগ' শব্দ কর্মযোগ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। বাক্যের উদ্দেশ্য বুঝিয়া উহার অর্থসঙ্গতি করিতে হয়। ২।৫০ শ্লোকে স্পষ্টই বলা হইয়াছে, 'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্।' আবার এই অর্থই একটু বিশেষভাবে গ্রহণ করিয়া ভগবানের সৃষ্টিকৌশল বুঝাইতেও 'যোগ' শব্দ কয়েক স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে; যথা—'পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্' ইত্যাদি (৯।৫, ১০।৭, ১১।৮)। যোগ শব্দের এই অর্থ ধরিয়াই ভগবান্‌কে যোগী (১০।৭), যোগেশ্বর, মহাযোগেশ্বর ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয় (১১।৪, ১১।৯, ১৮।৭৫, ১৮।৭৮ ইত্যাদি)। এই যে ঐশ্বরিক যোগ, সৃষ্টিকৌশল বা অঘটন-ঘটন-সামর্থ্য, বেদান্তে ইহাকে 'মায়া' বলা হয়। সুতরাং 'যোগরূপ যে মায়া' এই অর্থে যোগমায়া শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। বস্তুতঃ, এই অর্থে যোগ শব্দ মায়া শব্দের সহিত একার্থক।

—লোকমান্য তিলক, গীতা-রহস্য মর্মানুবাদ।

প্রাচীন টীকাকারগণ যোগ শব্দের এই অর্থ গ্রহণ না করিয়া নানারূপ বিভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন; যথা—যোগো গুণানাং যুক্তির্ঘটনং; সৈব মায়া যোগমায়া (শঙ্কর)। অথবা, ভাগবতো যঃ সঙ্কল্পঃ স এব যোগঃ তদ্বশবর্তিনী যা মায়া যোগমায়া (মধুসূদন)। যোগ বলিতে বুঝায় ত্রিগুণের যোগ; সেই যোগরূপ যে মায়া, তাহাই যোগমায়া। অথবা যোগ বলিতে বুঝায় ভগবানের সঙ্কল্প; তাহার বশবর্তিনী যে মায়া তাহাই যোগমায়া।

২৬। হে অর্জুন, অহং সমতীতানি (অতীত, ভূত) বর্তমানানি (বর্তমান)

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ॥ ২৭
যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥ ২৮
জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্॥ ২৯

ভবিষ্যাণি চ (এবং ভবিষ্যৎ) ভূতানি (সমস্ত পদার্থ) বেদ (জানি), তু (কিন্তু) কশ্চন (কেহই) মাং ন বেদ (আমাকে জানে না)।

হে অর্জুন, আমি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান পদার্থকে জানি। কিন্তু আমাকে কেহই জানে না। ২৬

আমি সর্বজ্ঞ, কেননা আমি মায়ার অধীন নহি, আমি মায়াধীশ। কিন্তু জীব মায়াধীন, সুতরাং অজ্ঞ। কেবল আমার অনুগৃহীত ভক্তগণই আমার মায়া উত্তীর্ণ হইয়া আমাকে জানিতে পারে।

২৭। হে ভারত, হে পরন্তপ, সর্গে (সৃষ্টিকালে অর্থাৎ স্থূলদেহের উৎপত্তি হইলে) ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন (ইচ্ছাদ্বেষ-জনিত) দ্বন্দ্বমোহেন (শীতোষ্ণ-সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বজনিত মোহদ্বারা) সর্বভূতানি (প্রাণিগণ) সম্মোহং যান্তি (অভিভূত হয়)।

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন—অনুকূল বিষয়ে ইচ্ছা ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ, তজ্জনিত।

হে ভারত, হে পরন্তপ, সৃষ্টিকালে অর্থাৎ স্থূলদেহ উৎপন্ন হইলেই প্রাণিগণ রাগদ্বেষজনিত শীতোষ্ণ সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বকর্তৃক মোহ প্রাপ্ত হইয়া হতজ্ঞান হয়। (সুতরাং আমাকে জানিতে পারে না)। ২৭

২৮। যেষাং তু (কিন্তু যে সকল) পুণ্যকর্মণাং জনানাং (পুণ্যশীল ব্যক্তিগণের) পাপম্ অন্তগতং (পাপক্ষয় হইয়াছে), দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তাঃ (দ্বন্দ্বমোহশূন্য) তে দৃঢ়ব্রতাঃ (সেই ধীরব্রত ব্যক্তিগণ) মাং ভজন্তে (আমাকে ভজনা করেন)।

কিন্তু পুণ্যকর্ম দ্বারা যাঁহাদের পাপ বিনষ্ট হইয়াছে, সেই সকল দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্ত ধীরব্রত ব্যক্তি আমাকে ভজনা করিয়া থাকেন। ২৮

২৯। যে (যাহারা) জরামরণমোক্ষায় (জরামরণ হইতে মুক্তি লাভের জন্য) মাম্ আশ্রিত্য (আমাকে আশ্রয় করিয়া) যতন্তি (যত্ন করেন), তে

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥ ৩০

(তাঁহারা) তৎ ব্রহ্ম (সেই সনাতন ব্রহ্মকে), কৃৎস্নম্ অধ্যাত্মম্ (সমস্ত অধ্যাত্ম বিষয়), অখিলং কর্ম চ (এবং সমস্ত কর্ম) বিদুঃ (জানেন)।

যাঁহারা আমাতে চিত্ত সমাহিত করিয়া জরামরণ হইতে মুক্তি লাভের জন্য যত্ন করেন, তাঁহারা সেই সনাতন ব্রহ্ম, সমগ্র অধ্যাত্মবিষয় এবং সমস্ত কর্মতত্ত্ব অবগত হন। ২৯

জরামরণ হইতে মুক্তিলাভের জন্যই ভগবান্‌কে ভজনা করা প্রয়োজন, তুচ্ছ কাম্য বস্তুর জন্য নহে। যাঁহারা এই উদ্দেশ্যে ভগবান্‌কে আশ্রয় করিয়া একান্ত মনে তাঁহার ভজনা করেন, তাঁহারা অনায়াসে জরামরণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন; এইরূপে পুরুষোত্তম বাসুদেবকে ভজনা করিলেই ব্রহ্মতত্ত্ব, অধ্যাত্মতত্ত্ব এবং কর্মতত্ত্ব অবগত হইতে পারেন। তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অধ্যাত্ম; কর্ম—তাঁহারই কর্ম। ভক্তিদ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞানও লাভ হয়। ইহাই এই জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগাধ্যায়ের শেষ কথা।

কৃষ্ণভক্তেরযত্নেন ব্রহ্মজ্ঞানমবাপ্যতে।
ইতি বিজ্ঞানযোগাখ্যে সপ্তমে সংপ্রকাশিতম্ ॥ —শ্রীধরস্বামী

৩০। যে চ (আর যাহারা) সাধিভূতাধিদৈবং (অধিভূত ও অধিদৈবের সহিত) সাধিযজ্ঞংচ (এবং অধিযজ্ঞের সহিত) মাং বিদুঃ (আমাকে জানেন) তে যুক্তচেতসঃ (সেই সমাহিতচিত্ত ব্যক্তিগণ) প্রয়াণকালেঽপি মাং বিদুঃ (মৃত্যুকালেও আমাকে জানিতে পারেন)।

অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞ—এই সকলের অর্থ ৮।৪ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য।

যাঁহারা অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞের সহিত আমাকে (অর্থাৎ আমার এই সকল বিভিন্ন বিভাবসহ সমগ্র আমাকে) জানেন, সেই সকল ব্যক্তি আমাতে আসক্তচিত্ত হওয়ায় মৃত্যুকালেও আমাকে জানিতে পারেন; মরণকালে মূর্ছিত হইয়াও আমাকে বিস্মৃত হন না। সুতরাং মদ্ভক্তগণের মুক্তিলাভের কোন বিঘ্ন নাই। ৩০

সপ্তম অধ্যায়—বিশ্লেষণ ও সার-সংক্ষেপ

১—৩ জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্থাৎ ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ বর্ণন আরম্ভ—তত্ত্ববেত্তা সুদুর্লভ ; ৪—৭ ঈশ্বরের পরা ও অপরা প্রকৃতি—উহা হইতে জগতের উদ্ভব—তিনিই মূলকারণ ; ৮—১২ সমস্তই ভগবৎ-সত্তায় সত্তাবান্ ; ১৩—১৫ জগৎ ত্রিগুণময়—উহা ভগবানের সুদুস্তরা মায়া—তাঁহার শরণ লইলে মায়া অতিক্রম করা যায় ; ১৬—১৯ চতুর্বিধ ভক্ত—জ্ঞানীভক্ত শ্রেষ্ঠ ; ২০—২৩ ফলাকাঙ্ক্ষায় দেবতাদি পূজায় ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয় না ; স্বর্গাদি লাভ হয়, উহা বিনাশশীল ; ২৪—২৮ ভগবানের অব্যয় স্বরূপ দুর্জ্ঞেয়, দ্বন্দ্বমোহনাশে স্বরূপের জ্ঞান ; ২৯—৩০ ভগবানের ভজনা দ্বারাই ব্রহ্মতত্ত্বাদির জ্ঞান হয়, সকলই তিনি।

পূর্ব অধ্যায়ের শেষে বলা হইয়াছে, যোগিগণের মধ্যে যিনি মদ্গতচিত্তে আমাকে ভজনা করেন, তিনিই যুক্ততম। এই আমি কে ? তাঁহার সমগ্র স্বরূপ কি ? কি ভাবে তাঁহাকে ভাবনা করিতে হয়, ভজনা করিতে হয়, সেই সকল গূঢ় রহস্য এই অধ্যায়ে এবং পরবর্তী অধ্যায়সমূহে বলা হইয়াছে।

পরমেশ্বরের স্বরূপতত্ত্ব বর্ণন আরম্ভ করিয়া শ্রীভগবান্ বলিলেন, আমার দুই প্রকৃতি— **অপরা প্রকৃতি ও পরা প্রকৃতি**। আমার অপরা প্রকৃতি বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই অষ্ট ভাগে বিভক্ত। আমার পরা প্রকৃতি জীবভূতা। উহাই সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া আছে। (এই অপরা প্রকৃতি, সাংখ্য দর্শনের মূল প্রকৃতি এবং পরা প্রকৃতি সাংখ্য দর্শনের পুরুষ। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। অপরা প্রকৃতি জড়া, পরা প্রকৃতি জীবচৈতন্যস্বরূপ)। এই দুই প্রকৃতির সংযোগেই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের সৃষ্টি। আমি এই জগতের মূল কারণ এবং প্রলয়ে উহা আমাতেই লয় পায়। সকল বস্তুই, সকল ভাবই আমা হইতে জাত। আমার সত্তায়ই তাহাদের সত্তা। তাহারা আমাতে আছে, কিন্তু সে সমুদয়ে আমি নাই। কেননা, আমি সম শান্ত নির্বিকার। প্রকৃতি আমা হইতে উদ্ভূত হইলেও আমি প্রকৃতির অধীন নহি। প্রকৃতির ত্রিবিধ গুণময় ভাবের দ্বারা সমস্ত জগৎ মোহিত হইয়া আছে, প্রকৃতির অতীত নির্বিকার আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে পারে না। এই প্রকৃতিই আমার গুণময়ী মায়া, ইহা একান্ত দুস্তরা। যাহারা আমার শরণাপন্ন হইয়া আমাকে ভজনা করে, তাহারাই কেবল এই সুদুস্তরা মায়া অতিক্রম করিতে পারে। **চতুর্বিধ** সুকৃতিশালী ব্যক্তি আমাকে ভজনা করেন—**আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী**।

ইঁহাদিগের মধ্যে আমার জ্ঞানী ভক্তই শ্রেষ্ঠ। মূঢ় অবিবেকী নরাধমগণ মায়া দ্বারা মোহিত হইয়া আমার শরণাগত হয় না। আবার অনেকে স্ত্রী-পুত্র, ধন, মানাদি কামনা করিয়া ক্ষুদ্র দেবতার আরাধনা করিয়া থাকে। সেই দেবতাগণ আমারই অঙ্গস্বরূপ। সেই দেবতাগণের নিকট হইতে তাহারা যে কাম্যবস্তু লাভ করিয়া থাকে, তাহা আমিই দিয়া থাকি। কিন্তু তাহাদের সেই আরাধনালব্ধ ফল বিনাশশীল। দেবোপাসকগণ দেবলোক প্রাপ্ত হয়, আমাকে প্রাপ্ত হয় না; আমার ভক্তগণ কিন্তু আমাকেই লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ আমার পরম অব্যক্ত স্বরূপ না জানায় আমাকে প্রাকৃত মনুষ্যবৎ মনে করে। কিন্তু পুণ্যকর্ম দ্বারা যাঁহাদের পাপ বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা মায়ামুক্ত হইয়া আমাকে ভজনা করিয়া থাকেন। যাঁহারা মদ্গতচিত্ত হইয়া জরামরণ হইতে মুক্তি লাভের জন্য যত্ন করেন, তাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্ব, কর্মতত্ত্ব, অধ্যাত্মতত্ত্ব এবং অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞস্বরূপ আমার বিভিন্ন স্বরূপ জানিতে পারেন এবং মৃত্যুকালেও আমাকে স্মরণ করিয়া সদ্গতি লাভ করেন।

এই অধ্যায়ে পরমেশ্বরের স্বরূপ (জ্ঞান) এবং উহা অনুভবের উপায় (বিজ্ঞান) এই দুই বিষয় প্রধানতঃ আলোচনা করা হইয়াছে। এই জন্য ইহাকে জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগ বলে।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে **জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগো** নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টম অধ্যায়

অক্ষরব্রহ্ম-যোগ

অর্জুন উবাচ

কিং তদ্‌ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১
অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ॥ ২

শ্রীভগবান্ উবাচ

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩

১-২। অর্জুনঃ উবাচ—হে পুরুষোত্তম, তৎ ব্রহ্ম কিম্ (কি)? অধ্যাত্ম কিম্? কর্ম কিম্? অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তম্ (কাহাকে বলে)? কিং চ অধিদৈবম্ (এবং অধিদৈব কাহাকে) উচ্যতে (বলে)? হে মধুসূদন, অত্র (এই দেহে) অধিযজ্ঞঃ কঃ (কি)? অস্মিন্ দেহে (এই দেহে) কথম্ (কি প্রকারে অবস্থিত)? প্রয়াণকালে চ (এবং মৃত্যুকালে) নিয়তাত্মভিঃ (সংযতচিত্ত ব্যক্তিগণ কর্তৃক) কথং (কিরূপে) জ্ঞেয়ঃ অসি (তুমি জ্ঞেয় হও)?

ব্রহ্মতত্ত্বাদির ব্যাখ্যা—সকলই একেরই বিভাব ১-৪

অর্জুন কহিলেন,—হে পুরুষোত্তম, সেই ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি? কর্ম কি? অধিভূত কাহাকে বলে আর অধিদৈবই বা কাহাকে বলে? অধিযজ্ঞ কি? এ দেহে তিনি কি প্রকারে চিন্তনীয়? হে মধুসূদন, অন্তকালে সংযতচিত্ত ব্যক্তিগণ কিরূপে তোমাকে জানিতে পারেন? ১-২

পূর্বাধ্যায়ের শেষে ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম প্রভৃতি যে সকল তত্ত্ব উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সকলের প্রকৃত মর্ম কি তাহা এই দুইটি শ্লোকে অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন। ভগবান্ পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে সংক্ষেপে উহার উত্তর দিয়াছেন এবং পরে অক্ষর ব্রহ্মস্বরূপের বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। ২৯১-৯২ পৃষ্ঠায় এই তত্ত্বগুলির ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩। শ্রীভগবানুবাচ—পরমম্ অক্ষরং (পরম যাহা অক্ষর পদার্থ) [তৎ] ব্রহ্ম (তাহাই ব্রহ্ম), স্বভাবঃ অধ্যাত্মম্ উচ্যতে (অধ্যাত্ম বলিয়া উক্ত হয়)। ভূতভাবোদ্ভবকরঃ (ভূতগণের উৎপত্তিকর) বিসর্গঃ (দ্রব্যত্যাগ, অথবা সৃষ্টি) কর্মসংজ্ঞিতঃ (কর্মশব্দ-বাচ্য)।

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর ॥ ৪

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—পরম অক্ষর যে বস্তু, তাহাই ব্রহ্ম; স্বভাবই অধ্যাত্ম বলিয়া উক্ত হয়। আর ভূতগণের উৎপত্তিকারক যে দ্রব্যত্যাগ-রূপ যজ্ঞ (অথবা, মতান্তরে সৃষ্টি ব্যাপার) তাহাই কর্মশব্দবাচ্য। ৩

৪। [হে] দেহভৃতাং বর (প্রাণিশ্রেষ্ঠ, নরশ্রেষ্ঠ), ক্ষরঃ (নশ্বর) ভাবঃ (পদার্থই) অধিভূতং. পুরুষঃ (পুরুষই) অধিদৈবতং চ (অধিদৈব), অহম্ এব (আমিই) অত্র দেহে (এই দেহে) অধিযজ্ঞঃ [রূপে আছি]।

ভূতভাবোদ্ভবকরঃ—ভূতানাং ভাবঃ বস্তুভাবঃ তস্য উদ্ভবঃ তৎকরোতি ইতি—ভূতবস্তূৎপত্তিকর ইত্যর্থঃ (শঙ্কর)—ভূত অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতি যে ভাব বা বস্তু তাহাই ভূতভাব, সেই ভূতভাবের উদ্ভব বা উৎপত্তি যে করে তাহা ভূতভাবোদ্ভবকর। **বিসর্গঃ**—দেবতোদ্দেশেন দ্রব্যত্যাগরূপো যজ্ঞঃ সর্বকর্মণামুপ-লক্ষণমেতৎ—দেবোদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগ-রূপ যজ্ঞ (শ্রীধর, শঙ্কর), অথবা বিসৃষ্টি বা বিশ্বসৃষ্টি ব্যাপার (তিলক, অরবিন্দ)। **স্বভাবঃ**—স্বস্যৈব ব্রহ্মণ এব অংশতয়া জীবরূপেণ ভবনং স্বভাবঃ, স এব আত্মানং দেহম্ অধিকৃত্য ভোক্তৃত্বেন বর্তমানোঽধ্যাত্মশব্দেনোচ্যতে ইত্যর্থঃ (শ্রীধর, শঙ্কর)—ব্রহ্মই অংশক্রমে জীবরূপে উৎপন্ন হইয়া দেহাবলম্বনে সুখ-দুঃখাদির ভাগী হন, এই জন্য তাঁহাকে অধ্যাত্ম বা জীবচৈতন্য বলে। কিন্তু লোকমান্য তিলক ও শ্রীঅরবিন্দ অন্যরূপ ব্যাখ্যা করেন (২৯১-২৯৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

হে নরশ্রেষ্ঠ, বিনাশশীল দেহাদি বস্তুই অধিভূত; পুরুষই অধিদৈবত। এই দেহে আমিই অধিযজ্ঞ। ৪

ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম, অধিভূত, অধিদৈবত, অধিযজ্ঞ—এই কথাগুলির ব্যাখ্যায় নানারূপ মতভেদ আছে। শ্রীঅরবিন্দ ও লোকমান্য তিলক ব্যতীত অন্যান্য প্রায় সকলেই শাঙ্কর-ভাষ্যের অনুবর্তন করিয়াছেন। উহার মর্ম এই :—

যাঁহার ক্ষয় নাই, বিকার নাই, সেই অব্যক্ত অক্ষর বস্তুতত্ত্বই **ব্রহ্ম**। সেই পরব্রহ্মের প্রত্যগাত্মভাবে প্রতি দেহে অবস্থিতিকেই **স্ব-ভাব** বলা যায় এবং উহাই অধ্যাত্ম। আত্মা অর্থাৎ দেহ অধিকৃত করিয়া থাকেন বলিয়া উহাকে **অধ্যাত্ম** বলে; ব্রহ্ম পরমাত্মা, অধ্যাত্ম জীবাত্মা। ভূতসমূহের উৎপত্তিকর যে বিসর্গ অর্থাৎ ইন্দ্রাদি দেবগণের উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগরূপ **যজ্ঞ**, উহাই কর্ম (৩।১৪-১৬ শ্লোক)। ক্ষর স্বভাব দেহাদি যাহা কিছু প্রাণিমাত্রকেই

অধিকার করিয়া উৎপন্ন হয়, তাহাই **অধিভূত**। উহারা ক্ষর ভাব অর্থাৎ নিত্য পরিবর্তনশীল। সমস্ত দেবতা যাঁহার অঙ্গীভূত, যিনি সমস্ত প্রাণী ও ইন্দ্রিয়াদির নিয়ন্তা, সেই **আদি পুরুষই অধিদৈবত**; ইনিই হিরণ্যগর্ভ বা ভূতস্রষ্টা ব্রহ্মা। যিনি সমস্ত যজ্ঞের প্রবর্তক ও ফলদাতা, যিনি অন্তর্যামিরূপে দেহমধ্যে বাস করেন, সেই **বিষ্ণুই অধিযজ্ঞ**। আমি বাসুদেবই সেই বিষ্ণু।

লোকমান্য তিলকের ব্যাখ্যা এইরূপ—পরম, অক্ষর বস্তুতত্ত্বই ব্রহ্ম, (এ বিষয়ে মতভেদ নাই)। মহাভারতে উল্লেখ আছে যে, তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ ইন্দ্রিয়াদি বস্তুবিচার অধ্যাত্ম, অধিভূত, অধিদৈবত—এই তিন ভাবে করেন (মহাভা. শান্তি ৩১৩)। প্রত্যেক বস্তুর যে সূক্ষ্ম শক্তি, আত্মা বা মূলভাব বা স্ব-ভাব, তাহাই অধ্যাত্ম; যেমন, চক্ষুরূপ সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়। আর সকল বস্তুরই নামরূপাত্মক যে ক্ষর ভাব বা নশ্বর ভাব, তাহাই অধিভূত; যেমন—রূপ; এবং ঐ বস্তুর পুরুষ বা সচেতন যে অধিষ্ঠাতা কল্পনা করা হয় তাহাই অধিদৈবত; যেমন—চক্ষুর দেবতা সূর্য।

'চক্ষুরধ্যাত্মমিত্যাহুর্যথাশ্রুতিনিদর্শিনঃ।
রূপমত্রাধিভূতং তু সূর্যশ্চাপ্যধিদৈবতম্॥ —মহাভা. শান্তি, ৩১৩।৬

ভূতসমূহের উৎপত্তিকারক বিসর্গ অর্থাৎ সৃষ্টি ব্যাপারই কর্ম। (বিসর্গ শব্দ সৃষ্টি অর্থে বহু-প্রচলিত, নাসদীয় সূক্তে 'বিসৃষ্টি' শব্দ কয়েক বার ব্যবহৃত হইয়াছে)। আর, যাঁহাকে অধিযজ্ঞ অর্থাৎ সকল যজ্ঞের অধিপতি বলা হয় তিনিই আমি।

'অতএব সমগ্র অর্থ এইরূপ হইতেছে যে, অনেক প্রকার যজ্ঞ, অনেক পদার্থের অনেক দেবতা, বিনশ্বর পঞ্চ মহাভূত, পদার্থ মাত্রের সূক্ষ্মভাব অথবা বিভিন্ন আত্মা, ব্রহ্ম, কর্ম অথবা ভিন্ন ভিন্ন মানুষের দেহ, এই সকলেতে 'আমিই' আছি, অর্থাৎ সকলেতে একই পরমেশ্বর-তত্ত্ব আছেন।' —গীতারহস্য

বস্তুতঃ, এ সকলগুলিই যে এক পরম তত্ত্বেরই বিভিন্ন প্রকাশ বা বিভাব তাহাই এস্থলে বলা উদ্দেশ্য। **শ্রীঅরবিন্দ** এই বিভিন্ন তত্ত্বসমূহের পরস্পর সম্বন্ধ যেমন ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার মর্ম এই—

আমার পরম অক্ষর অব্যয় ভাবই **ব্রহ্ম-তত্ত্ব**; প্রত্যেক বস্তুরই যাহা মূল বা আত্মস্বরূপ তাহাকেই **স্ব-ভাব** বা **অধ্যাত্ম** বলে। সুতরাং সেই নির্গুণ পরব্রহ্মকেই যখন সগুণ বিভাবে সৃষ্টি-প্রপঞ্চের মূল কারণ বা বীজস্বরূপ নানা বিভূতি-সম্পন্ন বলিয়া কল্পনা করা হয় তখনই উহাকে অধ্যাত্ম বলা হয় (১১।১)। এই অধ্যাত্ম-তত্ত্বই স্ব-ভাব, অর্থাৎ স্বয়ং ব্রহ্মেরই

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥ ৫

একটি বিভাব। ব্রহ্মের এই স্ব-ভাব বা সগুণ বিভাব হইতেই বিসর্গ অর্থাৎ জগৎসৃষ্টি ব্যাপার, বিশ্বশক্তির সমস্ত কর্মের উৎপত্তি, সুতরাং উহাই **কর্মতত্ত্ব**। এই কর্মের যে ফল, অর্থাৎ নশ্বর জগৎ-প্রপঞ্চ, উহাই **ক্ষরভাব**, বা **অধিভূত**। স্ব-ভাব হইতেই ক্ষর ভাবের উৎপত্তি এবং এই ভূতসমূহে অধিষ্ঠান-চৈতন্যরূপে যাহা অবস্থিত, তাহাই **অধিদৈবত**। সৃষ্টিব্যাপারই আদি কর্ম এবং সেই সৃষ্টি রক্ষার্থ জীবের যে নিষ্কাম কর্ম, তাহাই **যজ্ঞ** এবং সেই সকল কর্মের নিয়ন্তা, সর্বযজ্ঞের ভোক্তা আমিই **অধিযজ্ঞ**; অন্তর্যামিরূপে আমি সর্ব দেহে বাস করি।

মূল কথা, সকলই আমি, সকলই আমার বিভাব। সৃষ্টি রক্ষার্থ বা লোকসংগ্রহার্থ জীবের যে কর্ম, উহাও আমারই কর্ম। সুতরাং জীব আমাকে জানিলেই ব্রহ্মতত্ত্ব, অধ্যাত্মতত্ত্ব, কর্মতত্ত্ব সবই বুঝিতে পারে, এবং অধিভূত, অধিদৈবতাদি আমার বিভিন্ন বিভাবসহ সমগ্র আমাকে জানিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে।

এই শেষোক্ত ব্যাখ্যায় ৭।২৯-৩০ শ্লোকের মর্ম স্পষ্ট বুঝা যায় এবং ১১।১ শ্লোকের 'অধ্যাত্ম' শব্দের অর্থও স্পষ্টীকৃত হয়। এই ব্যাখ্যাই সমীচীন বোধ হয়।

৫। অন্তকালে চ (মৃত্যুকালে) মাম্ এব স্মরন্ (আমাকে স্মরণ করিয়া) কলেবরম্ মুক্ত্বা (দেহত্যাগ করিয়া) যঃ প্রয়াতি (যিনি প্রয়াণ করেন) সঃ (তিনি) মদ্ভাবং যাতি (আমার ভাব প্রাপ্ত হন), অত্র সংশয়ঃ নাস্তি (নাই)।

মদ্ভাবং—বৈষ্ণবং তত্ত্বং (শঙ্কর); মদ্রূপতাং নির্গুণব্রহ্মভাবং (মধুসূদন) (৪।১০ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

অন্তকালে ভগবৎস্মরণে মুক্তি—সুতরাং সতত ঈশ্বরচিন্তা কর্তব্য ৫-৮

যিনি অন্তকালেও আমাকেই স্মরণ করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করেন, তিনি আমারই ভাব প্রাপ্ত হন, ইহাতে সংশয় নাই। ৫

৮।২ শ্লোকোক্ত অর্জুনের শেষ প্রশ্নের উত্তর-স্বরূপ এই শ্লোকে এবং পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে অন্তকালে ভগবান্‌কে কি ভাবে স্মরণ করিতে হয় এবং তাহাতে কি সদ্‌গতি হয় তাহাই বলা হইতেছে।

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥ ৬
তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
মর্য্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্॥ ৭

৬। হে কৌন্তেয়, অন্তে (মৃত্যুকালে) যং যং বা অপি ভাবং (যে যে ভাব) স্মরন্ (স্মরণ করিয়া) কলেবরং ত্যজতি (দেহ ত্যাগ করে) সদা তদ্ভাবভাবিতঃ (সর্বদা সেই ভাবে তন্ময়চিত্ত পুরুষ) তং তম্ এব (সেই সেই ভাবই) এতি (প্রাপ্ত হয়)।

যিনি যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে অন্তকালে দেহত্যাগ করেন, হে কৌন্তেয়, তিনি সর্বদা সেই ভাবে তন্ময়চিত্ত থাকায় সেই ভাবই প্রাপ্ত হন। ৬

মৃত্যুকালে যে যেই ভাব স্মরণ করিয়া দেহ ত্যাগ করে, সে সেই ভাব প্রাপ্ত হয়, ইহাই সাধারণ নিয়ম। সুতরাং মৃত্যুকালে ভগবান্‌কে স্মরণ করিলে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাতে বোধ হইতে পারে যে, সমস্ত জীবন বিষয়-চিন্তা করিয়াও মৃত্যুকালে ঈশ্বরচিন্তা করিলে তাহাতে সদ্গতি হয়। এই জন্যই এই শ্লোকে বলা হইল 'সদা তদ্ভাবভাবিতঃ' অর্থাৎ চিরজীবন সেই ভাবে তন্ময় থাকিলেই মৃত্যুকালে তাঁহার স্মরণ হইতে পারে, নচেৎ মৃত্যুকালে ঈশ্বরচিন্তা মনে উদিত হয় না। তাই বলিতেছেন, 'সর্বকালেই আমাকে চিন্তা কর' (পরবর্তী শ্লোক)।

৭। তস্মাৎ (অতএব) সর্বেষু কালেষু (সকল সময়) মাম্ অনুস্মর (আমাকে চিন্তা কর), যুধ্য চ (এবং যুদ্ধ কর), ময়ি অর্পিত মনোবুদ্ধিঃ (আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ করিয়া) অসংশয়ম্ (নিশ্চয়ই) মাম্ এব এষ্যসি (আমাকেই প্রাপ্ত হইবে)।

অতএব সর্বদা আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর (স্বধর্ম পালন কর), আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ করিলে তুমি নিশ্চিতই আমাকে প্রাপ্ত হইবে। ৭

"যাঁহারা ভগবদ্গীতাতে, এই বিষয় প্রতিপাদিত বলেন যে, সংসারকে ছাড়িয়া দাও এবং কেবল ভক্তিকেই অবলম্বন কর, তাঁহাদের সপ্তম শ্লোকের সিদ্ধান্তের প্রতি অবশ্য দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। মোক্ষ তো পরমেশ্বরের প্রতি জ্ঞানযুক্ত ভক্তিদ্বারা লাভ হয় এবং ইহা নির্বিবাদ যে, মরণ সময়েও ঐ

অভ্যাসযোগ-যুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮
কবিং পুরাণমনুশাসিতারম্
অণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯
প্রয়াণকালে মনসাচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০

ভক্তিকেই স্থির রাখিবার জন্য জন্মভর উহাই অভ্যাস করা চাই। গীতার ইহা অভিপ্রায় নহে যে, এই জন্য কর্মকে ছাড়িয়া দেওয়া আবশ্যক। ইহার বিরুদ্ধে গীতাশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, স্বধর্ম অনুসারে যে কর্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়, ভগবদ্ভক্তের সেই সমস্ত নিষ্কাম বুদ্ধিতে করিতে থাকা আবশ্যক এবং এই সিদ্ধান্তই এই শব্দসমূহের দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, "আমাকে সর্বদা চিন্তা কর এবং যুদ্ধ কর।" —গীতারহস্য, লোকমান্য তিলক

৮। হে পার্থ, [সাধক] অভ্যাসযোগযুক্তেন (অভ্যাসরূপ যোগযুক্ত) নান্যগামিনা (অনন্যগামী) চেতসা (চিত্তদ্বারা) অনুচিন্তয়ন্ (চিন্তা করিয়া) দিব্যং পরমং পুরুষং (দিব্য পরমপুরুষকে) যাতি (প্রাপ্ত হন)।

হে পার্থ, চিত্তকে অন্য বিষয়ে যাইতে না দিয়া পুনঃ পুনঃ অভ্যাস দ্বারা উহাকে স্থির করিয়া সেই দিব্য পরমপুরুষের ধ্যান করিতে থাকিলে সাধক সেই পুরুষকেই প্রাপ্ত হন। ৮

৯-১০। কবিং (সর্বজ্ঞ) পুরাণম্ (অনাদি) অনুশাসিতারম্ (সর্ব-নিয়ন্তা) অণোঃ অণীয়াংসং (সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম) সর্বস্য ধাতারম্ (সকলের বিধাতা) অচিন্ত্যরূপম্ (অচিন্ত্যস্বরূপ, মনোবুদ্ধির অগোচর) আদিত্যবর্ণং (আদিত্যবৎ স্ব-প্রকাশ) তমসঃ পরস্তাৎ [স্থিতং পুরুষং] (প্রকৃতির পর বর্তমান, প্রপঞ্চাতীত পুরুষকে) প্রয়াণকালে (মৃত্যুকালে) অচলেন মনসা (একাগ্রমনে) ভক্ত্যা যুক্তঃ (ভক্তিযুক্ত হইয়া) যোগবলেন চ (এবং যোগবল দ্বারা) ভ্রুবোঃ মধ্যে (ভ্রুযুগলের মধ্যে) প্রাণং সম্যক্ আবেশ্য (প্রাণকে সম্যক্-

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্‌যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি
তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১
সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২

রূপে ধারণ করিয়া) যঃ অনুস্মরেৎ (যিনি স্মরণ করেন) সঃ (তিনি) তং দিব্যং পরং পুরুষম্ (সেই দিব্য পরমপুরুষকে) উপৈতি (প্রাপ্ত হন)।

আদিত্যবর্ণং—আদিত্যবৎ স্বপরপ্রকাশাত্মকো বর্ণঃ স্বরূপং যস্য তম্—(শ্রীধর) আদিত্যবৎ স্বপরপ্রকাশ। **তমসঃ পরস্তাৎ**—তমসঃ প্রকৃতেঃ পরস্তাৎ বর্তমানং মায়াতীতমিত্যর্থঃ (শ্রীধর, বলরাম)—প্রকৃতির অতীত, মায়াতীত। **দিব্যং**—দ্যোতনাত্মকম্ (শ্রীধর), দ্যুতিমান্।

যোগধারণপূর্বক দেহত্যাগের উপদেশ ৯-১৩

সেই পরমপুরুষ, সর্বজ্ঞ, অনাদি, সর্বনিয়ন্তা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, সকলের বিধাতা, অচিন্ত্যস্বরূপ, আদিত্যবৎ স্বপর-প্রকাশক, প্রকৃতির অতীত, যিনি মৃত্যুকালে মনকে একাগ্র করিয়া ভক্তিযুক্ত হইয়া যোগবলের দ্বারা প্রাণকে ভ্রূযুগলের মধ্যে ধারণ করিয়া তাঁহাকে স্মরণ করেন, তিনি সেই দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন। ৯-১০

এই দুই শ্লোকে পরমপুরুষের যে বর্ণনা আছে তাহা অংশতঃ উপনিষদ্ হইতে শব্দশঃ গৃহীত। শ্বেতাশ্বতর ৩।৮।৯ এবং ২।১৫ দ্রষ্টব্য।

১১। বেদবিদঃ (বেদজ্ঞগণ) যৎ অক্ষরং বদন্তি (যাঁহাকে অক্ষর পুরুষ বলেন), বীতরাগাঃ (অনাসক্ত) যতয়ঃ (যতিগণ) যৎ বিশন্তি (যাঁহাতে প্রবেশ করেন), যৎ ইচ্ছন্তঃ (যাঁহাকে পাইবার জন্য) ব্রহ্মচর্যং চরন্তি (ব্রহ্মচর্য অনুষ্ঠান করেন), তৎপদং (সেই পরমপদ) তে (তোমাকে) সংগ্রহেণ (সংক্ষেপে) প্রবক্ষ্যে (বলিতেছি)।

অক্ষরং—ন ক্ষরতি ইতি অক্ষরম্ অবিনাশী পরব্রহ্ম।

বেদবিদ্‌গণ যাঁহাকে অক্ষর বলেন, অনাসক্ত যোগিগণ যাঁহাতে প্রবেশ করেন, যাঁহাকে পাইবার জন্য ব্রহ্মচারিগণ ব্রহ্মচর্য অনুষ্ঠান করেন, সেই পরম পদ প্রাপ্তির উপায় সংক্ষেপে তোমাকে বলিতেছি।১১

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥ ১৩
অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ ১৪
মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥ ১৫

১২-১৩। সর্বদ্বারাণি (সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার) সংযম্য (সংযত করিয়া) মনঃ হৃদি নিরুধ্য (মনকে হৃদয়ে নিবদ্ধ করিয়া) মূর্দ্ধ্নি (ভ্রুযুগলের মধ্যে) প্রাণম্ আধায় (প্রাণকে ধারণা করিয়া) আত্মনঃ যোগধারণাম্ আস্থিতঃ (আত্মসমাধিরূপ যোগ আশ্রয় করিয়া) ওম্ ইতি একাক্ষরং ব্রহ্ম (ওঁ—এই ব্রহ্মরূপ একাক্ষর) ব্যাহরন্ (উচ্চারণ করিতে করিতে) মাম্ অনুস্মরন্ (আমাকে স্মরণ করিয়া) দেহং ত্যজন্ (দেহত্যাগ করিয়া) যঃ প্রয়াতি (যিনি প্রস্থান করেন) সঃ পরমাং গতিং যাতি (তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন)।

সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার সংযত করিয়া (ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া), মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিয়া, প্রাণকে ভ্রুযুগলের মধ্যে ধারণ করিয়া, আত্মসমাধিরূপ যোগে অবস্থিত হইয়া, ওঁ—এই ব্রহ্মাত্মক একাক্ষর উচ্চারণপূর্বক আমাকে স্মরণ করিতে করিতে যিনি দেহ ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করেন, তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন। ১২-১৩

১৪। হে পার্থ, অনন্যচেতাঃ সন্ (অনন্যচিত্ত হইয়া) যঃ (যিনি) মাং (আমাকে) নিত্যশঃ (চিরদিন) সততং (সর্বদা) স্মরতি (স্মরণ করেন) তস্য নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ (সেই নিত্যসমাহিত যোগীর নিকট) অহং সুলভঃ।

অনন্যচিত্ত ভক্তের সহজে ঈশ্বর লাভ ১৪-১৯

যিনি অনন্যচিত্ত হইয়া চিরদিন নিরন্তর আমাকে স্মরণ করেন, সেই নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষে আমি সুখলভ্য। ১৪

পূর্ব শ্লোকে যে যোগ ধারণা করিয়া দেহত্যাগের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা সকলের সাধ্য হয় না। তাই বলিতেছেন যে, আমার যে ভক্ত যাবজ্জীবন অনুক্ষণ আমাকেই স্মরণ করা অভ্যাস করেন, আমি তাঁহার অনায়াসলভ্য হই। সুতরাং তুমি সতত আমাতেই চিত্ত সমাহিত করিতে অভ্যাস কর। সর্বদা সকল অবস্থায়, সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, কর্মে বিশ্রামে, শয়নে গমনে সর্বদাই আমাতেই চিত্ত সমাহিত রাখিতে চেষ্টা কর।

১৫। মহাত্মানঃ (মহাত্মগণ) মাম্ উপেত্য (আমাকে প্রাপ্ত হইয়া) দুঃখালয়ম্ (দুঃখের আলয়স্বরূপ) অশাশ্বতং চ (এবং অনিত্য) পুনর্জন্ম ন

আব্রহ্মভুবনাল্লোকা পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ১৬
সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ॥ ১৭

আপ্নুবন্তি (প্রাপ্ত হন না), [যেহেতু তাঁহারা] পরমাং সংসিদ্ধিং গতাঃ (পরমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন)।

পূর্বোক্ত মদ্‌ভক্তগণ আমাকে পাইয়া আর দুঃখের আলয়স্বরূপ অনিত্য পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না। যেহেতু তাঁহারা (মৎপ্রাপ্তিস্বরূপ) পরমা সিদ্ধি লাভ করেন। ১৫

১৬। হে অর্জুন, আব্রহ্মভুবনাৎ (ব্রহ্মলোকাদি সমস্ত লোক হইতে) লোকাঃ (জীবসকল) পুনঃ আবর্তিনঃ (পুনরাবর্তনশীল, পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয়); তু (কিন্তু) হে কৌন্তেয়, মাম্ উপেত্য (আমাকে প্রাপ্ত হইলে) পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে (থাকে না)।

আব্রহ্মভুবনাৎ—ব্রহ্মণো ভুবনং বাসস্থানং ব্রহ্মভুবনং ব্রহ্মলোক ইত্যর্থঃ; ব্রহ্মলোকেন সহ ব্রহ্মলোকপর্যন্তাং ইতি যাবৎ (শঙ্কর)—ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত লোক হইতেই জীবগণ পুনরাবর্তনশীল। শাস্ত্রে সপ্ত লোকের উল্লেখ আছে; যথা—ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ এবং সত্যলোক বা ব্রহ্মলোক।

লোকগণ পুণ্যবলে এই সমস্ত লোক প্রাপ্ত হইলেও পুণ্যক্ষয়ে তথা হইতে ফিরিয়া আবার তাহাদের জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এস্থলে পুনরাবর্তন অর্থ ভূলোকে পুনরায় জন্মগ্রহণ।

এই সমস্ত লোকের কোন লোকই চিরস্থায়ী নহে। একমাত্র সেই পরম পুরুষই চিরস্থায়ী এবং অবিনশ্বর। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেই পুনর্জন্ম নিবারিত হয়, নচেৎ নহে।

হে অর্জুন, ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত লোক হইতেই লোকসকল ফিরিয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু হে কৌন্তেয়, আমাকে পাইলে আর পুনর্জন্ম হয় না। ১৬

১৭। সহস্রযুগপর্যন্তং (সহস্র চতুর্যুগে) ব্রহ্মণঃ যৎ অহঃ (ব্রহ্মার যে দিন) [তথা] যুগসহস্রান্তাং রাত্রিং (সহস্র যুগ পরিমিত রাত্রি) [যাঁহারা] বিদুঃ (জানেন) তে জনাঃ (তাঁহারাই) অহোরাত্রবিদঃ (দিবারাত্রির বেত্তা)।

সহস্রযুগপর্যন্তম্—সহস্রং যুগানি চতুর্যুগানি পর্যন্তঃ অবসানং যস্য তৎ "চতুর্যুগ-সহস্রং তু ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে" ইতি বচনাৎ যুগশব্দেনাত্র

চতুর্যুগমভিপ্রেতং।—মনুষ্যের সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার এক দিন এবং ঐরূপ সহস্র চতুর্যুগে এক রাত্রি। সুতরাং এস্থলে যুগ শব্দে চতুর্যুগ বুঝিতে হইবে।

মনুষ্যের গণনায় চতুর্যুগ সহস্র পর্যন্ত ব্রহ্মার যে একটি দিন এবং ঐরূপ চতুর্যুগসহস্র পর্যন্ত ব্রহ্মার যে একটি রাত্রি, ইহা যাঁহারা জানেন তাঁহারাই প্রকৃত অহোরাত্রবেত্তা অর্থাৎ দিবারাত্রির প্রকৃত তত্ত্ব জানেন। ১৭

মনুষ্যের কত বৎসরে ব্রহ্মার দিবারাত্রি হয় ইত্যাদির বিবরণ নিম্নে দ্রষ্টব্য।

সৃষ্টি ও প্রলয় তত্ত্বে কাল-গণনা

মনুষ্যের ও দেবতাদিগের কাল-গণনা একরূপ নহে। মনুষ্যের উত্তরায়ণ ছয় মাস দেবগণের দিন এবং মনুষ্যের দক্ষিণায়ণ ছয় মাস দেবগণের রাত্রি (কারণ, দেবতাগণ মেরু পর্বতের উপর উত্তর ধ্রুবস্থানে থাকেন—সূর্যসিদ্ধান্ত, ১।১৩, ১২।৩৫।৬৭), সুতরাং আমাদের ১ বৎসরে দেবতাদিগের ১ দিবারাত্রি। আমাদিগের ৩৬০ বৎসরে দেবতাদিগের ১ বৎসর। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই চতুর্যুগের মোট পরিমাণ দেবপরিমিত ১২০০০ বৎসর, সুতরাং মনুষ্য পরিমাণ—১২০০০ × ৩৬০ = ৪৩২০০০০ বৎসর। বিভিন্ন যুগের পরিমাণ এইরূপ—

সত্যযুগ ১৭২৮০০০ + ত্রেতা ১২৯৬০০০ + দ্বাপর ৮৬৪০০০ + কলি ৪৩২০০০ = মোট ৪৩২০০০০ বৎসর। চারি যুগে এক মহাযুগ বা চতুর্যুগ। এইরূপ সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার এক দিন অর্থাৎ ৪৩২০০০০ × ১০০০ = ৪৩২০০০০০০০ বৎসরে ব্রহ্মার ১ দিন, ঐরূপ ৪৩২০০০০০০০ বৎসরে ব্রহ্মার ১ রাত্রি। অর্থাৎ ৮৬৪০০০০০০০ বৎসরে ব্রহ্মার দিবারাত্রি। এইরূপ ৩৬০ দিবারাত্রিতে ব্রহ্মার এক বৎসর, এইরূপ ১০০ বৎসর ব্রহ্মার পরমায়ু (অর্থাৎ ৮৬৪০০০০০০০ × ৩৬০ × ১০০ বৎসর ব্রহ্মার পরমায়ু)। ইহার পর ব্রহ্মলোকও লয় পায় এবং ব্রহ্মা পরব্রহ্মে লীন হন।

ব্রহ্মার এক দিনে এক কল্প। এক কল্পে অর্থাৎ ১০০০ চতুর্যুগে ১৪ মন্বন্তর, সুতরাং এক মন্বন্তরে ১০০০ ÷ ১৪ = ৭১৪/৭ চতুর্যুগ, অর্থাৎ প্রত্যেক মন্বন্তরে ৭১ বার সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারি যুগ ঘুরিয়া আসে। এইরূপে ১৪ মন্বন্তর শেষ হইলে কল্পক্ষয় হয়, তখন প্রলয়। এখন শ্বেতবরাহ কল্পের ৭ম মন্বন্তর চলিতেছে, এই ৭ম মনুর নাম বৈবস্বত মনু। এই মন্বন্তরের ২৭ম মহাযুগ চলিয়া গিয়াছে, এখন ২৮ম মহাযুগের কলিযুগ চলিতেছে। কলির পরিমাণ ৪৩২০০০, বর্তমান সনে (১৩৭৫) উহার ৫০৬৫ বৎসর হইয়াছে, সুতরাং কলি শেষ হইতেই ঢের বাকী, কল্পক্ষয় ত বহু দূরে।

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯

১৮। অহঃ-আগমে (ব্রহ্মার দিবা সমাগমে) অব্যক্তাৎ (অব্যক্ত হইতে) সর্বাঃ ব্যক্তয়ঃ (সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ) প্রভবন্তি (উৎপন্ন হয়); রাত্র্যাগমে (ব্রহ্মার রাত্রি সমাগমে) তত্র এব অব্যক্তসংজ্ঞকে (সেই অব্যক্তসংজ্ঞক মূল কারণে) প্রলীয়ন্তে (লয় পায়)।

অব্যক্ত—পূর্বে বলা হইয়াছে, সাংখ্যের মূল প্রকৃতিকেই অব্যক্ত বলে (২৫৭ পৃষ্ঠা)। এই প্রকৃতির প্রথম পরিণাম মহত্তত্ত্ব। ইহাকেই শাস্ত্রান্তরে জীবঘন, হিরণ্যগর্ভ, সূক্ষ্ম জীবসমষ্টি—ইত্যাদি বলা হয়। যাঁহারা সাংখ্যের পরিভাষা গ্রহণ করেন না, তাঁহাদের মতে 'অব্যক্ত' অর্থ এস্থলে আদি পুরুষ হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার নিদ্রাবস্থা।

ব্রহ্মার দিবসের আগমে অব্যক্ত (প্রকৃতি) হইতে সকল ব্যক্ত পদার্থ উদ্ভূত হয়। আবার রাত্রিসমাগমে সেই অব্যক্ত কারণেই লয়প্রাপ্ত হয়। ১৮

ব্রহ্মার এক দিনে এক কল্প। এই কল্পারম্ভেই সৃষ্টি এবং এই কল্পক্ষয়ে প্রলয়। এইরূপ পুনঃ পুনঃ হইতেছে। সুতরাং মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত জীবগণকে কল্পে কল্পেই জন্ম-মরণ-দুঃখ ভোগ করিতে হয়। (পরের শ্লোক)

১৯। হে পার্থ, সঃ এব অয়ং ভূতগ্রামঃ (সেই এই প্রাণিগণ) ভূত্বা ভূত্বা (পুনঃ পুনঃ জন্মিয়া) রাত্র্যাগমে (রাত্রি সমাগমে) প্রলীয়তে (লয় পায়), অহরাগমে (দিবা সমাগমে) অবশঃ (অবশ হইয়া, কর্মবশে) প্রভবতি (প্রাদুর্ভূত হয়)।

হে পার্থ, এই সেই ভূতগণই পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রহ্মার রাত্রি সমাগমে লয়প্রাপ্ত হয়, দিবাসমাগমে আবার অবশ ভাবে (অর্থাৎ স্ব স্ব কর্মের বশীভূত হইয়া) প্রভবতি (প্রাদুর্ভূত হয়)। ১৯

'এই সেই ভূতগণ' এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, পূর্বকালে যাহারা ছিল, তাহারাই কল্পক্ষয়ে কারণাবস্থায় থাকে এবং কল্পারম্ভে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে।

একই জীব পুনঃ পুনঃ জন্মিতেছে, কর্মভোগ শেষ না হইলে পুনর্জন্ম নিবারিত হয় না, 'নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটীশতৈরপি', তবে জন্মমৃত্যু অতিক্রম করিবার উপায় কি?—(পরের তিন শ্লোক)

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০
অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্ ॥ ২২

২০। তু (কিন্তু) তস্মাৎ অব্যক্তাৎ (সেই অব্যক্ত হইতে) পরঃ (শ্রেষ্ঠ) অন্যঃ সনাতনঃ (নিত্য) অব্যক্তঃ যঃ ভাবঃ (অব্যক্ত যে পদার্থ) সঃ (তাহা) সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু (সর্বভূত বিনষ্ট হইলেও) ন বিনশ্যতি (নষ্ট হন না)।

প্রকৃতির অতীত অক্ষর পুরুষ ভক্তিদ্বারা লভ্য ২০-২২

কিন্তু সেই অব্যক্তেরও (প্রকৃতির) অতীত যে নিত্য অব্যক্ত পদার্থ আছেন, তিনি সকল ভূতের বিনাশ হইলেও বিনষ্ট হন না। ২০

পূর্বে প্রকৃতি বা হিরণ্যগর্ভকেই অব্যক্ত শব্দে লক্ষ্য করা হইয়াছে (১৮শ শ্লোক)। কিন্তু সেই অব্যক্ত হইতেও যে অব্যক্ত বস্তুতত্ত্ব, পরমাত্মা বা পরমেশ্বর, তাঁহার কিছুতেই বিনাশ নাই।

২১। [যঃ] অব্যক্তঃ অক্ষরঃ ইতি উক্তঃ (এইরূপ কথিত হন) তৎ (তাঁহাকে) পরমাং গতিম্ (শ্রেষ্ঠ গতি) আহুঃ (বলে), যং প্রাপ্য (যাহা প্রাপ্ত হইয়া) ন নিবর্তন্তে (জীবগণ প্রত্যাবৃত্ত হয় না) তৎ মম (তাহা আমার) পরমং ধাম (পরম স্থান, পরম স্বরূপ)।

যাহা অব্যক্ত অক্ষর নামে কথিত হয়, তাহাকে শ্রেষ্ঠ গতি বলে, যাহা পাইলে পুনরায় ফিরিতে হয় না, তাহাই আমার পরম স্থান বা স্বরূপ; (অর্থাৎ আমিই পরম গতি, তদ্ভিন্ন জন্ম অতিক্রম করিবার উপায় নাই)। ২১

২২। হে পার্থ, ভূতানি (সমস্ত ভূত) যস্য অন্তঃস্থানি (যাঁহার মধ্যে অবস্থিত), যেন (যাঁহা দ্বারা) ইদং সর্বং (এই সমস্ত জগৎ) ততম্ (ব্যাপ্ত হইয়া আছে), সঃ পরঃ পুরুষঃ (সেই পরম পুরুষ) তু অনন্যয়া ভক্ত্যা (কেবল অনন্যা ভক্তিদ্বারা) লভ্যঃ (প্রাপ্য)।

হে পার্থ, সকল ভূতই যাঁহাতে অবস্থিতি করিতেছে, যাঁহাদ্বারা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া আছে, সেই পরম পুরুষকে একমাত্র অনন্যা ভক্তিদ্বারাই লাভ করা যায়, আর কিছুতে নহে। ২২

রহস্য—ব্রহ্ম ও ভগবান্

প্রঃ। এস্থলে অব্যয় অক্ষর ব্রহ্মতত্ত্বের কথা হইতেছে। উহা বোধ হয় জ্ঞানমার্গে আত্মতত্ত্ববিচার দ্বারাই অধিগম্য? কিন্তু এ স্থলে বলা হইতেছে, তাঁহাকে একমাত্র অনন্যা ভক্তিদ্বারাই লাভ করা যায়। ভক্তি ত সগুণ ব্যক্ত স্বরূপে বা পরিচ্ছিন্ন মূর্তি বিষয়েই প্রযোজ্য হয়। ভগবদ্ভক্তি বুঝি, ব্রহ্মচিন্তা ও ব্রহ্মজ্ঞান বুঝি, কিন্তু ব্রহ্মভক্তি কিরূপ?

উঃ। আধুনিক ব্রাহ্মগণ তো ব্রহ্মভক্ত, তাঁহারা ব্রহ্মকেই দয়াময়, প্রেমময়, ভগবান্ বলিয়া জানেন, কিন্তু সাকার বিগ্রহাদির প্রয়োজন বোধ করেন না, মানেনও না। তাঁহারা কি ঈশ্বরভক্ত নন? আবার বৈষ্ণব ভক্ত পরিচ্ছিন্ন শ্রীকৃষ্ণমূর্তি দেখাইয়া বলেন—"ঐ সম্মুখে দাঁড়ায়ে আছেন পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন", তাহাতে কি নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মতত্ত্ব অস্বীকার করা হয়? বস্তুতঃ মায়াবাদী ব্রহ্মচিন্তকের নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্ম, ব্রাহ্ম-ভক্তের নিরাকার সগুণ ব্রহ্ম, বৈষ্ণব-ভক্তের সাকার সগুণ ব্রহ্ম, এ সকলই এক। সাকার-নিরাকার-বাদ লইয়া বিবাদ নিরর্থক। গীতায় অবতাররূপে ও পুরুষোত্তমরূপে শ্রীভগবান্ নিজ স্বরূপের পরিচয় দিয়া এ বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিয়া বলিতেছেন—আমি নির্গুণ হইয়াও সগুণ (১৩।১৪-১৫), নিরাকার হইয়াও সাকার (৪।৬), আমিই অক্ষর অব্যয় ব্রহ্মতত্ত্ব; আমি আবার জীবের 'গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ' (৯।১৮); আমাকে ভক্তি করিলেই ব্রহ্মজ্ঞান হয় (৮।২২), আবার ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই আমাতে ভক্তি হয় (১৮।৫৪); জ্ঞানীই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত (৭।১৭), আমাতে অব্যভিচারিণী ভক্তিই জ্ঞান (১৩।১০)। সুতরাং গীতামতে ব্রহ্মজ্ঞানে ও ভগবদ্ভক্তিতে কোন বিরোধ নাই।

যাঁহারা নিছক জ্ঞানমার্গের পক্ষপাতী, তাঁহারা অবশ্য একথা স্বীকার করেন না। সুতরাং তাঁহারা এসকল স্থানে ভক্তি শব্দেরই অন্য ব্যাখ্যা করেন। তাঁহারা বলেন, 'স্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে', অর্থাৎ আত্মানুসন্ধানই ভক্তি। আত্মানুসন্ধান অর্থ তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের শ্রবণমননাদি অর্থাৎ জ্ঞানমার্গ। তাই এই শ্লোকের শাঙ্করভাষ্যের ব্যাখ্যায় আছে, 'ভক্ত্যা জ্ঞানলক্ষণয়া, অনন্যয়া আত্মবিষয়য়া' অর্থাৎ ভক্তি শব্দের অর্থ জ্ঞানালোচনা বা আত্মচিন্তা এবং 'অনন্যা' অর্থ কেবল আত্মবিষয়ক। ভক্তির এরূপ ব্যাখ্যা অবশ্য সকলে গ্রহণ করেন না, ভগবদ্ভক্তির এরূপ অভিপ্রায়ও বোধ হয় না।

নিরাকার ও সাকার উপাসনা সম্বন্ধে আলোচনা ৯।২৬ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য।

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩
অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ২৪

২৩। হে ভরতর্ষভ, যত্র কালে (যে কালে) প্রয়াতা (প্রয়াণ করিলে, মৃত হইলে) যোগিনঃ (যোগিগণ) অনাবৃত্তিম্ আবৃত্তিং চ এব (অপুনরাবৃত্তি এবং পুনরাবৃত্তি) যান্তি (প্রাপ্ত হন) তৎ কালং (সেই সেই কালের বিষয়) বক্ষ্যামি (বলিতেছি)।

দেবযান মার্গ ও পিতৃযান মার্গ ২৩-২৮

হে ভরতর্ষভ, যে কালে (মার্গে) গমন করিলে যোগিগণ পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না এবং যে কালে (মার্গে) গমন করিলে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন, তাহা বলিতেছি। ২৩

এস্থলে 'কাল' শব্দে দিবারাত্রি ইত্যাদি কালের অভিমানিনী দেবতা বা তাঁহাদিগের প্রদর্শিত মার্গ এইরূপ বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ কোন্ কালে মৃত্যু হইলে মোক্ষ লাভ হয় বা হয় না, তাহা এই স্থলে বলা উদ্দেশ্য নয়। কোন্ কর্মফলে কোন্ পথে গমন করিলে মোক্ষ বা পরমপদ প্রাপ্তি হয় এবং কোন্ পথে গমন করিলে উহা হয় না, তাহাই পরবর্তী তিন শ্লোকে বলা হইয়াছে। এস্থলে যোগী শব্দ সাধারণভাবে 'সাধক' এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। উহাতে ব্রহ্মোপাসক ও কর্মকাণ্ডী সাধক উভয়ই বুঝিতে হইবে। (৩০৪-৩০৭ পৃষ্ঠার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

২৪। অগ্নির্জ্যোতিঃ (জ্যোতির্ময় অগ্নি), অহঃ (দিন), শুক্লঃ (শুক্ল-পক্ষ) উত্তরায়ণং ষণ্মাসাঃ (উত্তরায়ণ ছয় মাস), তত্র প্রয়াতাঃ (সেই মার্গে প্রয়াণ করিয়া) ব্রহ্মবিদঃ জনাঃ (ব্রহ্মোপাসকগণ) ব্রহ্ম গচ্ছন্তি (ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন)।

অগ্নির্জ্যোতিঃ—শ্রুত্যুক্ত অর্চির অভিমানিনী দেবতা, তেজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। **অহঃ**—দিনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। **তত্র**—সেই স্থানে অর্থাৎ সেই সকল দেবতাগণের লক্ষিত পথে। **উত্তরায়ণং**—উত্তরায়ণের অভিমানিনী দেবতা। **শুক্লঃ**—শুক্লপক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

অগ্নির্জ্যোতি, দিন, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ ছয় মাস—এই সময় (এই দেবতাগণের লক্ষিত পথে গমন করিয়া) ব্রহ্মোপাসকগণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। (৩০৪ পৃষ্ঠার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। ২৪

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥ ২৫
শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ততে পুনঃ ॥ ২৬

২৫। ধূমঃ রাত্রিঃ কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণপক্ষ) তথা ষণ্মাসাঃ দক্ষিণায়নং (দক্ষিণায়ন ছয় মাস) তত্র (সেই পথে) যোগী (কর্মী পুরুষ) চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ (চন্দ্র-সম্বন্ধীয় জ্যোতিঃ অর্থাৎ চন্দ্রলোক বা স্বর্গলোক) প্রাপ্য (প্রাপ্ত হইয়া) নিবর্ততে (পুনরাবৃত্ত হন)।

ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন ছয় মাস—এই সময়ে অর্থাৎ এই সকল দেবতাগণের লক্ষিত পথে গমন করিয়া কর্মী পুরুষ স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া তথায় কর্মফল ভোগ করতঃ পুনরায় সংসারে পুনরাবৃত্ত হন। (৩০৫ পৃষ্ঠার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। ২৫

ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন—পূর্ব শ্লোকের ন্যায় এই শ্লোকেও এই শব্দগুলির দ্বারা তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বা উহাদের উপলক্ষিত মার্গ এই অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে।

২৬। জগতঃ (জগতের) শুক্লকৃষ্ণে (শুক্ল ও কৃষ্ণ, প্রকাশময় ও অন্ধকারময়) এতে গতী (এই দুই পথ) শাশ্বতে হি মতে (অনাদি বলিয়া কথিত); [উপাসক] একয়া (একটি দ্বারা) অনাবৃত্তিং যাতি (মোক্ষ প্রাপ্ত হন), অন্যয়া (অন্যটির দ্বারা) পুনঃ আবর্ততে (পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন)।

জগতের শুক্ল (প্রকাশময়) ও কৃষ্ণ (অন্ধকারময়) এই দুইটি পথ অনাদি বলিয়া প্রসিদ্ধ। একটি দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়, অপরটি দ্বারা পুনর্জন্ম লাভ করিতে হয়। ২৬

দেবযান ও পিতৃযান মার্গ—মৃত্যুর পর জীবের উৎক্রান্তি সম্বন্ধে অর্থাৎ কোন্ সাধকের কিরূপ গতি হয় তৎসম্বন্ধে ঋষিশাস্ত্রে দুইটি মার্গের উল্লেখ আছে—দেবযান মার্গ ও পিতৃযান মার্গ (ঋক্ ১০।৮৮।১৫, যাস্ক নিরুক্ত ১৪।৯, বৃহদারণ্যক ৫।১০, ৬।২।১৫, ছান্দোগ্য ৫।১০, কৌষী ১।৩, বেদান্তসূত্র ৪।৩।১-৬, মহাভা শান্তি, ১৭।১৫-১৬, ১৯।১৩-১৪)। ছান্দোগ্য উপনিষদে এই মার্গদ্বয়ের বর্ণনা এইরূপ—

"যে চেমে অরণ্যে শ্রদ্ধাতপ ইত্যুপাসতে তে অর্চিষমভিসংভবন্তি, অর্চিষোঽহঃ, অহ্ন আপূর্যমাণপক্ষম্ আপূর্যমাণপক্ষাৎ যান্ ষড়ুদঙ্ঙেতি মাসাংস্তান্, মাসেভ্যঃ

সংবৎসরম্,সংবৎসরাদাদিত্যম্, আদিত্যাচ্চন্দ্রমসম্,চন্দ্রমসো বিদ্যুতম্, তৎপুরুষো অমানবঃ স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি ; এষ দেবযানঃ পন্থা ইতি।"—ছান্দোগ্য ৫।১০।১০২

যাঁহারা অরণ্যে শ্রদ্ধাতপ উপাসনা করেন, তাঁহারা অর্চিঃ অর্থাৎ জ্যোতিঃকে প্রাপ্ত হন, অর্চিঃ হইতে দিবা, দিবা হইতে শুক্লপক্ষ, শুক্লপক্ষ হইতে উত্তরায়ণ ছয় মাস, মাস হইতে সংবৎসর, বৎসর হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে চন্দ্রমা, চন্দ্রমা হইতে বিদ্যুৎ প্রাপ্ত হন, পরে এক অমানব পুরুষ ইঁহাদিগকে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত করান, ইহাই দেবযান পন্থা।

মার্গদ্বয়ের বর্ণনা এইরূপ—

এই মার্গকে **দেবযান মার্গ, অর্চিরাদি মার্গ, শুক্ল** (প্রকাশময়) **মার্গ বা উত্তরায়ণ মার্গ**ও বলে। যাঁহারা ব্রহ্মোপাসনা করেন, যাঁহারা নিবৃত্তি মার্গাবলম্বী তাঁহারা এই মার্গে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। ৮।২৪ শ্লোকে এই মার্গেরই বর্ণনা, তবে উত্তরায়ণের পরবর্তী শেষোক্ত পর্বগুলি এখানে উল্লিখিত হয় নাই। এই মার্গ প্রকাশময়, যাঁহাদের জ্ঞানলাভ হইয়াছে তাঁহারা এই মার্গে গমন করেন। যাঁহাদের জ্ঞানলাভ হয় নাই, তাঁহারা অন্ধকারময় ধূম্রাদি মার্গে গমন করেন ; তাহার বর্ণনা এইরূপ—

"অথ যে ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্তে দত্তমিত্যুপাসতে তে ধূমমভিসংভবন্তি, ধূমাদ্রাত্রিম্, রাত্রেরপরপক্ষম্, অপরপক্ষাৎ যান্ ষড়দক্ষিণৈতি মাসাংস্তান্, নৈতে সংবৎসরমভিপ্রাপ্নুবন্তি, মাসেভ্যঃ পিতৃলোকম্, পিতৃলোকাদাকাশম্, আকাশাচ্চন্দ্রমসম্।' —ছান্দোগ্য ৫।১০।৩-৬

—আর যাহারা গ্রামে গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া ইষ্টাপূর্ত (যাগাদি ও জলাশয় খননাদি পুণ্যকর্ম) এবং দানাদি কর্ম করেন, তাঁহারা ধূমকে প্রাপ্ত হন ; ধূম হইতে রাত্রি, রাত্রি হইতে কৃষ্ণপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ হইতে ছয় মাস দক্ষিণায়ন ; ইঁহারা বৎসরকে প্রাপ্ত হন না, মাস হইতে পিতৃলোক, তথা হইতে আকাশ ও আকাশ হইতে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন।

ইহার নাম **পিতৃযান মার্গ, ধূম্রাদি মার্গ, কৃষ্ণ** (অন্ধকারময়) **মার্গ** বা **দক্ষিণ মার্গ**। যাগযজ্ঞাদি পুণ্যফলে এই পথে যাঁহারা চন্দ্রলোকাদিতে গমন করেন, তাঁহাদিগকে পুণ্যক্ষয়ে আবার সংসারে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। ৮।২৫ শ্লোকে এই মার্গের কথাই বলা হইয়াছে, কিন্তু শেষোক্ত পর্বগুলির উল্লেখ করা হয় নাই। কর্মকাণ্ডীদিগের এইরূপ যাতায়াতের কথা গীতায় অন্যত্রও উল্লিখিত আছে (৯।২০-২১)। দেবযান পথে যাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন

করেন তাঁহাদিগকে আর ফিরিতে হয় না। কিন্তু গীতায় অন্যত্র আছে, 'ব্রহ্মলোক হইতেও জীবের পতন হয়, কেবল আমাকে পাইলেই পুনর্জন্ম হয় না' (৮।১৫-১৬)। ইহার মীমাংসা শ্রীধর স্বামী এইরূপে করিয়াছেন—

ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত সাধকগণ ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল পর্যন্ত ব্রহ্মলোকে বাস করেন, ব্রহ্মলোক যখন বিনষ্ট হয় তখন তাঁহাদের পুনর্জন্ম অবশ্যম্ভাবী ; কিন্তু ব্রহ্মলোকে অবস্থানকালে যদি তাঁহাদের সম্যক্ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তবে তাঁহারা পরব্রহ্মেই লীন হন অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেন। ইহাকে বলে **ক্রমমুক্তি**। দেহ-ত্যাগের পর ব্রহ্মলোকে গিয়া মুক্তি হয় বলিয়া ইহাকে **বিদেহমুক্তিও** বলে। শুদ্ধ অদ্বৈতবাদিগণ বলেন, সগুণ ব্রহ্মোপাসকগণই এই ক্রমমুক্তি লাভ করেন ; কিন্তু যাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মোপাসক এবং যাঁহাদের আত্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে, তাঁহাদিগের আর উৎক্রান্তি হয় না, তাঁহাদের ব্রহ্মলোকে যাইতে হয় না, তাঁহারা ব্রহ্মই হন। 'ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি' ; 'অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে' (বৃহদারণ্যক উপ ৪।৪।৬, কঠ উপ. ৬।১৪)। ইহাকেই বলে সদ্যোমুক্তি বা **জীবন্মুক্তি**। গীতাতে জ্ঞানিগণের এই জীবন্মুক্তির কথাই সর্বত্র বলা হইয়াছে—'অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্ (৫।২৬), 'ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো' (৫।১৯), 'ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা' (১৩।৩০) ইত্যাদি। গীতার মতে এইরূপ অবস্থা লাভ করিলেই ভগবানে পরাভক্তি জন্মে এবং ভক্তিবলেই তাঁহাকে লাভ করা যায়, এই অবস্থায় নিষ্কাম কর্মও থাকিতে পারে (১৮।৫৪-৫৬, অপিচ ২৩৯-২৪০ পৃষ্ঠা)।

উপরে জ্ঞানী ও কাম্যকর্মীদিগের বিভিন্ন গতি কথিত হইল। কিন্তু যাহারা জ্ঞানালোচনা বা পুণ্যকর্ম কিছুই করে না, কেবল যাবজ্জীবন পাপাচরণ করে, তাহারা পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদি তির্যক্ যোনিতে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে ; ইহাকে 'তৃতীয় মার্গ' বলে (ছান্দো, ৫।১০।৮, কঠ ২।৬।৭)। গীতাতেও আসুরী পুরুষদিগের নিরয়গতি হয়, এইরূপ উল্লেখ আছে (১৬।১৯-২১)।

পূর্বোক্ত মার্গদ্বয় বর্ণনায় দিবারাত্রি ইত্যাদি কালবাচক শব্দের সহিত চন্দ্রলোক, সূর্যলোক ইত্যাদি স্থানবাচক শব্দের উল্লেখ আছে। বাদরায়ণ বলেন, দিবারাত্রি ইত্যাদি তত্তৎ কালবাচক দেবতা পথ-প্রদর্শক দিব্য পুরুষ। ইহারা সাধককে বিভিন্ন পর্ব পার করিয়া দেন, ইহাদিগকে আতিবাহিকী পুরুষ বলে। কিন্তু ৮।২৩ শ্লোকে 'যে কালে মরিলে', ইত্যাদি বাক্যে কালের কথাই স্পষ্ট উল্লেখ আছে। আবার ভীষ্মদেব শরশয্যায় উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা করিতে-ছিলেন, এরূপ কথাও আছে (মহাভা. ভীষ্ম, ১২০, অনু. ১৬৭)। ইহাতে

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জুন॥ ২৭

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্॥ ২৮

বোধ হয়, দিন, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণকাল কোন সময় মরণের প্রশস্ত কাল বলিয়া গণ্য হইত। লোকমান্য তিলক বলেন—"আমি স্থির করিয়াছি, উত্তর গোলার্দ্ধের যে স্থানে সূর্য ক্ষিতিজের উপরে বরাবর ছয় মাস দৃশ্য হইয়া থাকে, সেই স্থানে অর্থাৎ ধ্রুবের নিকট অথবা মেরুস্থানে বৈদিক ঋষিগণের যখন বসতি ছিল, তখন হইতেই ছয় মাস উত্তরায়ণের প্রকাশ-কালকেই মৃত্যুর প্রশস্ত কাল বলিয়া মানিবার প্রথা প্রচলিত হইয়া থাকিবে।"

২৭। হে পার্থ, এতে সৃতী (এই মার্গদ্বয়) জানন্ (জ্ঞাত হইয়া) কশ্চন যোগী (কোনও সাধক) ন মুহ্যতি (মোহগ্রস্ত হন না); তস্মাৎ (অতএব) হে অর্জুন, সর্বেষু কালেষু (সর্বদা) যোগযুক্তঃ ভব (হও)।

হে অর্জুন, (মোক্ষ ও সংসার-প্রাপক) এই মার্গদ্বয় অবগত হইয়া যোগী পুরুষ মোহগ্রস্ত হন না (সংসার-প্রাপক কাম্য কর্মে লিপ্ত হন না, মোক্ষ-প্রাপক মার্গ অবলম্বন করেন)। অতএব হে অর্জুন, তুমি সর্বদা যোগযুক্ত হও (ঈশ্বরে চিত্ত সমাহিত কর)। ২৭

যোগী এবং **যোগযুক্ত** শব্দে এস্থলে কোন্ যোগ বুঝাইতেছে? জ্ঞানযোগ, নিষ্কাম কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, না অষ্টাঙ্গযোগ?—যিনি যে পথের পক্ষপাতী তিনি তাহাই বলিবেন, যেমন—'যোগী মদ্ভক্তিমান্' (বলরাম); 'কর্মযোগী,' 'কর্মযোগ-যুক্ত' (লোকমান্য তিলক); 'সগুণব্রহ্মধ্যানপরায়ণ' (কৃষ্ণানন্দস্বামী)। বস্তুতঃ গীতোক্ত যোগ জ্ঞানকর্মভক্তিমিশ্র বিশিষ্ট যোগ, এবং উহাই এস্থলে অভিপ্রেত (২৩৮ পৃষ্ঠায় 'গীতোক্ত যোগী' দ্রষ্টব্য)।

২৮। বেদেষু (বেদে) যজ্ঞেষু (যজ্ঞে) তপঃসু চ (তপস্যায়) দানেষু এব (দানসমূহে) যৎ পুণ্যফলং (যে পুণ্যফল) প্রদিষ্টম্ (শাস্ত্রে নিরূপিত আছে), ইদং বিদিত্বা (এই তত্ত্ব জানিয়া) যোগী তৎসর্বম্ (এই সমস্ত পুণ্যফল) অত্যেতি (অতিক্রম করেন), পরম্ আদ্যং স্থানং চ (এবং উৎকৃষ্ট আদ্য স্থান) উপৈতি (লাভ করেন)।

বেদাভ্যাসে, যজ্ঞে, তপস্যায় এবং দানাদিতে যে সকল পুণ্যফল নির্দিষ্ট আছে, এই তত্ত্ব জানিয়া যোগী পুরুষ সে সকল অতিক্রম করেন এবং উৎকৃষ্ট আদ্যস্থান (মোক্ষ) প্রাপ্ত হন। ২৮

'এই তত্ত্ব জানিয়া', অর্থাৎ কাম্যকর্মাদি দ্বারা স্বর্গলাভ হইলেও পুনরায় সংসার-প্রাপ্তি অনিবার্য, ইহা জানিয়া স্বর্গাদি ফলভোগ তুচ্ছ করিয়া থাকেন এবং যোগযুক্ত হইয়া সেই পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন।

অষ্টম অধ্যায়—বিশ্লেষণ ও সার-সংক্ষেপ

১—৪ অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, অধিদৈব প্রভৃতির ব্যাখ্যা, সকলই একেরই বিভাব ; ৫—৮ অন্তকালে ভগবৎ-শরণে মুক্তি, সুতরাং সতত ঈশ্বরচিন্তা ও স্বধর্ম পালনের উপদেশ ; ৯—১৩ যোগ ধারণাপূর্বক দেহত্যাগের উপদেশ ; ১৪—১৬ অনন্যচিত্ত নিত্যস্মরণশীল ভক্তের সহজে ঈশ্বরলাভ—তাহাতে পুনর্জন্মনিবৃত্তি ; ১৭—১৯ ব্রহ্ম-লোকাদিও ক্ষয়শীল—প্রলয়ে প্রকৃতির লয়, ২০—২২ প্রকৃতির অতীত অব্যক্ত অক্ষর পুরুষ ভক্তিদ্বারা লভ্য ; ২৩—২৮ দেবযান ও পিতৃযান মার্গ—একের ফল মোক্ষ, অপরের ফল পুনর্জন্ম—এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া যোগযুক্ত হওয়ার উপদেশ—উহাতেই পরা গতি।

সপ্তম অধ্যায়ের শেষে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, আমার আশ্রিত ভক্তগণের ব্রহ্মতত্ত্ব, অধ্যাত্মতত্ত্ব, কর্মতত্ত্বও অধিগত হয় এবং অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ সহ আমাকে জানিলে, মৃত্যুকালেও আমার বিস্মরণ হয় না। এক্ষণ অর্জুন এই তত্ত্বগুলি কি তাহাই জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে শ্রীভগবান্ যাহা বলিলেন তাহার মর্ম এই—আমার নির্গুণ অক্ষর ভাবই **ব্রহ্মতত্ত্ব**, নানা বিভূতিসম্পন্ন বিশ্বস্রষ্টারূপে আমার যে সগুণ-স্বভাব বা বিভাব তাহাই **অধ্যাত্মতত্ত্ব**, বিশ্বসৃষ্টিই আদি **কর্মতত্ত্ব**, আমার সৃষ্ট ভূতপ্রপঞ্চই **অধিভূত**, ভূতসমূহে অধিষ্ঠানচৈতন্যরূপে বর্তমান পুরুষই **অধিদৈবত**, উহাও আমিই। সৃষ্টিরক্ষার্থ জীবের যে কর্ম তাহাই **যজ্ঞ** এবং আমিই **অধিযজ্ঞ**রূপে উহার নিয়ন্তা ও ফলভোক্তা (৩-৪)। বস্তুতঃ এ সকলই আমি, জীবের কর্মও আমারই কর্ম, আমাকে জানিলে এ সকলই জানা যায়, এইরূপে সমগ্র আমাকে জানিলেই মুক্তি হয়।

এই প্রসঙ্গে অর্জুন আরও জিজ্ঞাসা করিলেন যে, মৃত্যুকালে ভগবানকে কিরূপে স্মরণ করিয়া সদ্গতি লাভ করা যায়। তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন

যে,—মৃত্যুকালে যে যে-ভাব স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করে, সে সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়; সুতরাং আমাকে স্মরণ করিয়া প্রস্থান করিলে আমাকেই পাইবে। কিন্তু চিরজীবন আমার স্মরণ-মনন অভ্যস্ত না হইলে মৃত্যুকালে আমার স্মরণ হয় না, সুতরাং **সর্বদাই আমাকে চিন্তা করিবে এবং যুদ্ধাদি স্বধর্মানুষ্ঠানও করিবে**। তাহা হইলে সদ্গতি লাভ সম্বন্ধে কোন আশঙ্কা নাই।

যিনি মৃত্যুকালে মনকে একাগ্র করিয়া যোগবলের দ্বারা প্রাণকে ভ্রূযুগলের মধ্যে ধারণপূর্বক ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া এবং মনকে নিরুদ্ধ করিয়া সেই অক্ষর পরম পুরুষকে চিন্তা করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন, তিনিই সদ্গতি লাভ করেন। এইরূপ যোগধারণা করিয়া ব্রহ্মচিন্তা করিতে করিতে দেহত্যাগ করা সকলের সাধ্যায়ত্ত না হইতে পারে, কিন্তু আমার যে ভক্ত অনন্যচিত্তে সতত আমাকে স্মরণ করেন, আমি তাঁহার পক্ষে সুখলভ্য হই। ব্রহ্মলোক হইতেও লোকের পুনর্জন্ম হয়, **কিন্তু আমাকে পাইলে আর পুনর্জন্ম হয় না**। কল্পে কল্পে জীবগণ লয় পায়, কল্পারম্ভে আবার জন্মগ্রহণ করে; আমাকে না পাইলে এই যাতায়াতের নিবৃত্তি নাই।

যাহারা যাগযজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম করেন, তাঁহাদেরও পুণ্যক্ষয়ে তথা হইতে পুনরায় সংসারে ফিরিতে হয়। কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্মোপাসনা করেন তাঁহারা ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন। এই তত্ত্ব জানিয়া বুদ্ধিমান্ সাধক সংসার-প্রাপক কাম্যকর্মাদিতে লিপ্ত হন না, ব্রহ্ম-প্রাপক জ্ঞানযোগ, নিষ্কাম কর্মযোগ বা ভক্তিযোগ অবলম্বন করিয়া থাকেন। **জ্ঞান-কর্ম-ভক্তিমিশ্র যোগের** কথা তোমাকে পূর্বে বলিয়াছি, তুমি তদ্রূপ যোগযুক্ত হও।

এই অধ্যায়ে পরমেশ্বরের স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্রহ্মতত্ত্ব, ব্রহ্মোপাসনা ও মৃত্যুকালেও ব্রহ্মচিন্তার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে, এই জন্য ইহাকে **অক্ষরব্রহ্ম যোগ** বলে।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে **অক্ষরব্রহ্ম-যোগো** নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

নবম অধ্যায়

রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য-যোগ

শ্রীভগবান্ উবাচ

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১
রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্ ॥ ২

১। শ্রীভগবানুবাচ—ইদং তু গুহ্যতমং (এই অতি গূঢ়) বিজ্ঞানসহিতং জ্ঞানম্ (বিজ্ঞানের সহিত জ্ঞান) অনসূয়বে (দোষদৃষ্টিবিহীন, অসূয়াশূন্য) তে (তোমাকে) প্রবক্ষ্যামি (বলিব), যৎ জ্ঞাত্বা (যাহা জানিয়া) [তুমি] অশুভাৎ (সংসার-বন্ধন হইতে) মোক্ষ্যসে (মুক্ত হইবে)।

বিজ্ঞানসহিতং—বিশেষেণ জ্ঞায়তে অনেনেতি—বিজ্ঞানম্ উপাসনম্ অপরোক্ষ-জ্ঞানং বা, তৎসহিতম্ (শ্রীধর)।—'বিজ্ঞান' অর্থ এ-স্থলে উপাসনা অথবা অপরোক্ষ জ্ঞান বা ঈশ্বরানুভব। (৭।২ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

জ্ঞানযুক্ত ভক্তিমার্গ সুখসাধ্য—ইহাই রাজবিদ্যা ১-৩

শ্রীভগবান্ কহিলেন—তুমি অসূয়াশূন্য, দোষদর্শী নও। তোমাকে এই অতি গুহ্য বিজ্ঞানসহিত ঈশ্বর-বিষয়ক জ্ঞান বলিতেছি, ইহা জ্ঞাত হইলে তুমি সংসারদুঃখ হইতে মুক্ত হইবে। ১

শিষ্য শ্রদ্ধাহীন এবং দোষদর্শী হইলে গুরু তাহাকে গুহ্য বিষয়ে উপদেশ দেন না। কিন্তু অর্জুন সেরূপ নহেন। তিনি গুহ্য বিষয় শ্রবণের অধিকারী, 'অসূয়াশূন্য' শব্দে তাহাই প্রকাশ পাইতেছে।

২। ইদং রাজগুহ্যং (অতিগুহ্য), রাজবিদ্যা (বিদ্যার রাজা, সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা), উত্তমং পবিত্রম্, প্রত্যক্ষাবগমং (প্রত্যক্ষ বোধগম্য, প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ), ধর্ম্ম্যং (ধর্মসঙ্গত), কর্ত্তুং সুসুখং (সুখসাধ্য), অব্যয়ম্ [চ] (এবং অক্ষয় ফলপ্রদ)।

রাজবিদ্যা—বিদ্যানাং রাজা; **রাজগুহ্যং**—গুহ্যানাং রাজা; বিদ্যাসু গোপ্যেষু চ অতি শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ (শ্রীধর) অর্থাৎ বিদ্যা ও গুহ্য বস্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এই অর্থ।
প্রত্যক্ষাবগমং—প্রত্যক্ষঃ অবগমঃ বোধঃ যস্য তৎ দৃষ্টফলমিত্যর্থঃ (শ্রীধর)—

স্পষ্ট অনুভবযোগ্য, যাহার ফল প্রত্যক্ষ দেখা যায়। **ধর্ম্যং**—ধর্ম-সম্মত অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত সমুদয় ধর্মের ফলপ্রদ।

ইহা রাজবিদ্যা, রাজগুহ্য অর্থাৎ সকল বিদ্যা ও গুহ্য বিষয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; ইহা সর্বোৎকৃষ্ট, পবিত্র, সর্বধর্মের ফলস্বরূপ, প্রত্যক্ষ বোধগম্য, সুখসাধ্য এবং অক্ষয় ফলপ্রদ। ২

এই রাজগুহ্য রাজবিদ্যা কি ?

প্রথম শ্লোকে 'জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতম্' অর্থাৎ 'বিজ্ঞানের সহিত জ্ঞান উপদেশ করিতেছি'—এই কথানুসারে ইহা ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মবিদ্যা—এইরূপ কেহ কেহ মনে করেন। কিন্তু বিদ্যা অর্থে যেমন ব্রহ্মজ্ঞান বুঝায়, তেমনই সাধন-প্রণালীও বুঝায়, যেমন—শাণ্ডিল্যবিদ্যা, প্রাণবিদ্যা, হার্দবিদ্যা ইত্যাদি। এ স্থলেও প্রথমতঃ 'জ্ঞান' শব্দ ব্যবহৃত হইলেও পরে ইহাকে 'ধর্ম' বলা হইয়াছে এবং 'সুসুখং কর্তুং' অর্থাৎ সুখসাধ্যও বলা হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, রাজবিদ্যা শব্দে এ স্থলে শ্রেষ্ঠ সাধন-প্রণালীই বিবক্ষিত। সেই সাধন-প্রণালী কি ? লোকমান্য তিলক বলেন—"ইহা সুস্পষ্ট যে, অক্ষর, অব্যক্ত ব্রহ্মের জ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়া এই বর্ণনা করা হয় নাই। কিন্তু রাজবিদ্যা শব্দে এস্থলে **ভক্তিমার্গই** বিবক্ষিত হইয়াছে।" নিম্নের কথা কয়েকটি বিবেচনা করিলে এই সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত বোধ হয়।—

(১) এই অধ্যায়ে প্রথম কয়েকটি শ্লোকে পরমেশ্বরের যোগৈশ্বর্যের উল্লেখ করিয়া তৎপর 'গতির্ভর্তা প্রভুঃ' ইত্যাদি রূপে অর্থাৎ ভক্তের ভগবান্ রূপে তাঁহার বর্ণনা করা হইয়াছে। অবশিষ্ট প্রায় সমস্ত শ্লোকেই ভক্তিযোগেরই কথা। ১৫শ শ্লোকে অবান্তর ভাবে 'অন্যে জ্ঞানযোগেও উপাসনা করেন' এইরূপ উল্লেখ থাকাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মুখ্যভাবে এই অধ্যায়ে ভক্তিযোগের বর্ণনাই বিবক্ষিত।

(২) ইহাকে 'প্রত্যক্ষাবগম্য' ও 'সুখসাধ্য' ('সুসুখং কর্তুম্') বলা হইয়াছে। ভক্তিমার্গেই প্রত্যক্ষ ও ব্যক্ত ঈশ্বরের উপাসনা হয়। জ্ঞানমার্গে অব্যক্তের উপাসনা বা ব্রহ্মচিন্তাকে 'প্রত্যক্ষাবগম্য' বলা যায় না। উহা যে অধিকতর ক্লেশজনক এবং ভক্তিমার্গই যে সুখসাধ্য ১২।৫ শ্লোকে তাহা স্পষ্টই বলা হইয়াছে। সুতরাং 'সুসুখং কর্তুং' ইত্যাদি কথায় ভক্তিমার্গই এস্থলে বিবক্ষিত, ব্রহ্মবিদ্যা নহে, উহা সুস্পষ্ট।

(৩) বিদ্যামাত্রই সেকালে গুহ্য থাকিত। কেননা, অধিকারী শিষ্যগণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও উহা উপদেশ করা হইত না। এই সকল গুহ্য বিদ্যার

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥ ৩
ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥ ৪

মধ্যে গীতোক্ত ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠ, তাই উহাকে রাজগুহ্য বলা হইয়াছে। ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে এই অধ্যায়ে এমন কিছু বলা হয় নাই, যাহ' পূর্বে কথিত হয় নাই এবং যাহাকে গুহ্যতম বলা যাইতে পারে।

বস্তুতঃ, অক্ষর ব্রহ্মের স্বরূপ ৮ম অধ্যায়ে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এবং অনন্যা ভক্তিদ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায়, ইহাও বলা হইয়াছে। কিন্তু অক্ষর ব্রহ্মে মনঃসংযোগ সুকঠিন এবং সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। এই জন্যই অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য ('সুসুখং') যে ভক্তিমার্গ তাহাই এক্ষণে বলা হইতেছে। পরবর্তী কয়েক অধ্যায়ে বিশেষভাবে পরমেশ্বরের ব্যক্ত স্বরূপের বর্ণনা এবং ভক্তিমার্গের প্রাধান্যই কীর্তিত হইয়াছে।

৩। হে পরন্তপ, অস্য ধর্মস্য অশ্রদ্দধানাঃ (এই ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাহীন) পুরুষাঃ (ব্যক্তিগণ) মাম্ অপ্রাপ্য (আমাকে না পাইয়া) মৃত্যুসংসার-বর্ত্মনি (মৃত্যুময় সংসারপথে) নিবর্তন্তে (পরিভ্রমণ করে)।

হে পরন্তপ, এই ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিগণ আমাকে পায় না। তাহারা মৃত্যুময় সংসার-পথে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। ৩

৪। অব্যক্তমূর্তিনা ময়া (অব্যক্তস্বরূপ আমাকর্তৃক) ইদং সর্বং জগৎ ততং (এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত), সর্বভূতানি (সমস্ত ভূতই) মৎস্থানি (আমাতে স্থিত); অহংচ (আমি কিন্তু) তেষু (তৎসমুদয়ে) ন অবস্থিতঃ (অবস্থিত নহি)।

ভগবান্ জগৎস্রষ্টা হইয়াও নির্লিপ্ত ৪-১৪

আমি অব্যক্তস্বরূপে এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছি। সমস্ত ভূত আমাতে অবস্থিত, আমি কিন্তু তৎসমুদয়ে অবস্থিত নহি। ৪

আমি জগৎ ব্যাপিয়া আছি, ভূতসমূহ আমাতে স্থিত, কিন্তু আমি ভূতসমূহে স্থিত নই। এ কথার তাৎপর্য এই যে, আমার ব্যাপ্তি কেবল জগতেই সীমাবদ্ধ নহে। উহা জগতেরও অতীত। আমি বিশ্বানুগ হইয়াও বিশ্বাতিগ। আমি ব্যাপক, জগৎ ব্যাপ্য। ব্যাপক ব্যাপ্যের মধ্যে থাকিবে কিরূপে। সমুদ্রে তরঙ্গ থাকে, কিন্তু তরঙ্গে সমুদ্র আছে, এ কথা বলা যায় না—"সামুদ্রো হি

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫
যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্।
তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬

তরঙ্গঃ; কচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ।' দ্বিতীয়তঃ, আমি নিঃসঙ্গ, নির্বিকার, প্রকৃতি আমা হইতে উদ্ভূত হইলেও আমি প্রকৃতির অতীত। (৭।১২ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

৫। মে (আমার) ঐশ্বরং (ঐশ্বরিক) যোগং (অঘটনঘটন-চাতুর্যং) পশ্য (দেখ); ভূতানি চ (ভূতসকলও আবার) মৎস্থানি ন (আমাতে অবস্থিত নহে); মম আত্মা (আমার আত্মা) ভূতভৃৎ (ভূতধারক) ভূতভাবনঃ চ (ও ভূতপালক), ভূতস্থঃ ন (ভূতমধ্যে অবস্থিত নহে)।

তুমি আমার ঐশ্বরিক যোগ দর্শন কর। এই ভূতসকলও আমাতে স্থিতি করিতেছে না; আমি ভূতধারক ও ভূতপালক, কিন্তু ভূতগণে অবস্থিত নহি। ৫

তাৎপর্য—পূর্বে বলিয়াছি, ভূতসকল আমাতেই স্থিতি করিতেছে। কারণ আমার সত্তায়ই জগৎ-সত্তা, আমি না থাকিলে কিছুই থাকে না। আমার সত্তাযই তাহারা সত্তাবান্; সুতরাং বলা যায় তাহারা আমাতেই। কিন্তু নির্গুণ বিভাবে আমি নিঃসঙ্গ, নিরবয়ব, নির্বিশেষ। বস্তুতঃ আমাতে কিছুই সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারে না। অথচ বোধ হয় যেন ইহারা আমাতেই ভাসিতেছে। ইহাই আমার যোগ বা অঘটনঘটন-চাতুর্য এবং এই যোগপ্রভাবেই আমি ভূতধারক হইয়াও ভূতগণের মধ্যে নই, কেননা আমি নিঃসঙ্গ।

ঐশ্বরিক যোগ—সৃষ্টি-কৌশল, অঘটনঘটন-সামর্থ্য (৭।২৫ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। পরমেশ্বর স্বরূপের এইরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ বর্ণনার তাৎপর্য এই যে, 'সগুণ' ও 'নির্গুণ' এই দুইটি বিভাব পরস্পর-বিরুদ্ধ; তিনি নির্গুণ হইয়াও সগুণ; সুতরাং তাঁহাতে পরস্পর-বিরুদ্ধ গুণের সমন্বয়। (১৩।১২-১৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

৬। যথা সর্বত্রগঃ (সর্বত্র গমনশীল) মহান্ বায়ুঃ নিত্যম্ (সদা) আকাশস্থিতঃ, তথা সর্বাণি ভূতানি (সমস্ত ভূত) মৎস্থানি (আমাতে স্থিত) ইতি অবধারয় (জান)।

যেমন সর্বত্র গমনশীল মহান্ বায়ু আকাশে অবস্থিত, সেইরূপ সমস্ত ভূত আমাতে অবস্থিত, ইহা জানিও। ৬

সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥ ৭
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৮

তাৎপর্য—যেমন বায়ু আকাশে থাকিলেও আকাশের সহিত উহা সংস্পৃষ্ট হয় না, সেইরূপ সর্বভূত আমাতে থাকিলেও আমার সহিত উহাদের কোন সংশ্লেষ হয় না ; কেননা, আমি অসঙ্গ, বস্তুতঃ আমাতে কিছুই নাই। অথচ যেন বোধ হয়, ভূতসকল আমাতেই আছে। এই জন্যই একবার বলা হইতেছে, ভূতসকল আমাতে আছে, আর একবার বলা হইতেছে, ভূতসকল আমাতে নাই ; আবার বলা হইতেছে ভূতসকল ধারণ করিয়াও আমি ভূতসকলে নাই। মর্মার্থ এই, নির্গুণ বিভাবে আমি অসংস্পৃষ্ট, সগুণ বিভাবে আমি ভূতধারক (১৩।১২-১৬) দ্রষ্টব্য।

৭। হে কৌন্তেয়, কল্পক্ষয়ে (প্রলয়কালে) সর্বাণি ভূতানি (সমস্ত ভূত) মামিকাং প্রকৃতিং যান্তি (আমার প্রকৃতিতে বিলীন হয়), **পুনঃ** কল্পাদৌ (কল্পারম্ভে, সৃষ্টিকালে) অহং (আমি) তানি বিসৃজামি (সেই সকল সৃষ্টি করিয়া থাকি)।

হে কৌন্তেয়, কল্পের শেষে (প্রলয়ে) সকল ভূত আমার ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে আসিয়া বিলীন হয় এবং কল্পের আরম্ভে ঐ সকল পুনরায় আমি সৃষ্টি করি। (৮।১৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। ৭

৮। স্বাং প্রকৃতিম্ (নিজ প্রকৃতিকে) অবষ্টভ্য (বশীভূত করিয়া) প্রকৃতেঃ বশাৎ অবশম্ (প্রাক্তন কর্ম নিমিত্ত স্বভাববশে অবিদ্যাপরবশ) ইমং কৃৎস্নং (এই সমস্ত) ভূতগ্রামং (ভূতগণকে) **পুনঃ পুনঃ** বিসৃজামি (সৃষ্টি করি)।

প্রকৃতের্বশাৎ—'প্রাচীনকর্ম-নিমিত্ত তত্তৎ স্বভাব-বশাৎ'—প্রাচীন কর্মফল সংস্কাররূপে প্রলয়কালেও লুপ্ত থাকে। উহাই সৃষ্টিতে স্বভাবরূপে অভিব্যক্ত হয়। এই স্বভাববশেই জীবগণ বিভিন্ন যোনি প্রাপ্ত হয়। এই জন্য বলা হইল, নিজ নিজ স্বভাববশে ভূতগণের সৃষ্টি হয়। (৫।১৪, ১৪।৩-৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

অবষ্টভ্য—বশীকৃত্য (শঙ্কর) ; প্রকৃতিকে আত্মবশে রাখিয়া অর্থাৎ সৃষ্টির ব্যাপারে আমি প্রকৃতির অধীন হই না।

আমি স্বীয় প্রকৃতিকে আত্মবশে রাখিয়া স্বীয় স্বীয় প্রাক্তন-কর্মনিমিত্ত স্বভাববশে জন্মমৃত্যু-পরবশ ভূতগণকে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করি। (৮।১৮-১৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। ৮

ন চ মাং তানি কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মসু ॥ ৯
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্‌বিপরিবর্ততে ॥ ১০
অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১
মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ১২

৯। হে ধনঞ্জয়, তেষু কর্মসু (সেই সকল কর্মে) অসক্তম্ (অনাসক্ত) উদাসীনবৎ আসীনম্ (উদাসীনের ন্যায় অবস্থিত) মাং (আমাকে) তানি কর্মাণি (সেই সমস্ত কর্ম) ন চ নিবধ্নন্তি (বন্ধন করিতে পারে না)।

হে ধনঞ্জয়, আমাকে কিন্তু সেই সকল কর্ম আবদ্ধ করিতে পারে না। কারণ, আমি সেই সকল কর্মে অনাসক্ত, উদাসীনবৎ অবস্থিত। ৯

কর্ম করিয়াও আমার কর্ম-বন্ধন নাই, কেননা আমি কর্তা হইয়াও অকর্তা, অনাসক্ত, উদাসীনবৎ।

১০। অধ্যক্ষেণ ময়া (অধিষ্ঠাতা আমাকর্তৃক) প্রকৃতিঃ সচরাচরং (স্থাবর জঙ্গমাত্মক) [জগৎ] সূয়তে (প্রসব করে); হে কৌন্তেয়, অনেন হেতুনা (এই কারণ), জগৎ বিপরিবর্ততে (বারংবার উৎপন্ন হয়)।

হে কৌন্তেয়, আমার অধিষ্ঠানবশতঃই প্রকৃতি এই চরাচর জগৎ প্রসব করে, এই হেতুই জগৎ (নানারূপে) বারংবার উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১০

১১। মূঢ়াঃ (অবিবেকী ব্যক্তিগণ) ভূতমহেশ্বরং (সর্বভূতের মহেশ্বর স্বরূপ) মম পরং ভাবম্ (আমার পরম তত্ত্ব) অজানন্তঃ (না জানিয়া) মানুষীং তনুম্ আশ্রিতং (মনুষ্য-দেহধারী) মাম্ (আমাকে) অবজানন্তি (অবজ্ঞা করে)।

ভগবানের অবজ্ঞাকারী জীব পাষণ্ডী ১১-১২

অবিবেকী ব্যক্তিগণ সর্বভূত-মহেশ্বর স্বরূপ আমার পরম ভাব না জানিয়া মনুষ্য-দেহধারী বলিয়া আমার অবজ্ঞা করিয়া থাকে (৭।২৪ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। ১১

১২। মোঘাশাঃ (নিষ্ফলকাম), মোঘকর্মাণঃ (বিফলকর্মা), মোঘজ্ঞানাঃ (বিফলজ্ঞানী, বৃথাজ্ঞানী), বিচেতসঃ (বিক্ষিপ্তচিত্ত) মোহিনীং (মোহজনক,

বুদ্ধিভ্রংশকরী) রাক্ষসীম্ (হিংসাপ্রবল, তামসী) **আসুরীং চ** (এবং কামদর্পাদি প্রবল, রাজসী) প্রকৃতিং শ্রিতাঃ (প্রকৃতি প্রাপ্ত) [এই সকল ব্যক্তি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে]।

মোঘাশাঃ—মত্তোঽন্যদ্দেবতান্তরং ক্ষিপ্রং ফলং দাস্যতীত্যেবংভূতা মোঘা নিষ্ফলৈবাশা যেষাং তে (শ্রীধর)—আমা অপেক্ষা অন্য দেবতারা শীঘ্র কামনা পূর্ণ করিবে, যাহারা এইরূপ নিষ্ফল আশা করে। **মোঘকর্মা**—ঈশ্বর-বিমুখ বলিয়া যাহাদের যাগযজ্ঞাদি কর্ম নিষ্ফল হয়। **মোঘজ্ঞানাঃ**—ভগবদ্-ভক্তিহীন বলিয়া যাহাদের শাস্ত্রপাণ্ডিত্যাদি সমস্তই নিষ্ফল হয়।

এই সকল বিবেকহীন ব্যক্তি বুদ্ধিভ্রংশকরী তামসী ও রাজসী প্রকৃতির বশে আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে ; উহাদের আশা ব্যর্থ, কর্ম নিষ্ফল, জ্ঞান নিরর্থক এবং চিত্ত বিক্ষিপ্ত। ১২

ভক্ত ও পাষণ্ডী—এই অধ্যায়ের ১১-১২ শ্লোকে ভগবদ্-বিমুখ তামসী ও রাজসী প্রকৃতির লোকদিগের কথা বলা হইয়াছে এবং পরবর্তী ১৩-১৪ শ্লোকে ভগবদ্-ভক্ত সাত্ত্বিক প্রকৃতির মহাত্মগণের কথা বর্ণিত হইয়াছে। এই ভগবদ্বিমুখ লোকদিগকেই শাস্ত্রে অসুর বলা হয়। ষোড়শ অধ্যায়ে এই উভয় প্রকৃতির ব্যক্তিবর্গের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। শ্রীকৃষ্ণ অবতারে দেখা যায়, কংস, শিশুপাল প্রভৃতি পূর্বোক্ত শ্রেণীর লোক এবং ভীষ্মদেব, যুধিষ্ঠিরাদি দ্বিতীয় শ্রেণীর। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব কালেও এইরূপ দুই শ্রেণীর লোকের বর্ণনা বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রে এই ভগবদ্বিমুখ লোকদিগকে 'পাষণ্ডী' বলা হইয়াছে। এস্থলে যে 'মোঘকর্মা' 'মোঘজ্ঞানাঃ' ইত্যাদি বর্ণনা আছে, উহার প্রকৃত মর্ম কি, পাষণ্ডী সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবতের নিম্নোক্ত বর্ণনায় তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।—

"ধর্মকর্ম লোক সবে এই মাত্র জানে। মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥ বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে। মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে॥" —(**মোঘকর্মা**)। "যেবা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী মিশ্র সব। তাহারাও না জানয়ে গ্রন্থ অনুভব॥ গীতা ভাগবত যে জনেতে পড়ায়। ভক্তির ব্যাখ্যান নাই তাহার জিহ্বায়॥ শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম করে। শ্রোতার সহিত যম-পাশে ডুবে মরে॥—(**মোঘজ্ঞান**)। দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন। পাতুলি করয়ে কেহ দিয়া মহাধন।—(**মোঘাশা**)।"

এই গেল পাষণ্ডীগণের কথা। আবার সাত্ত্বিক-প্রকৃতি ভক্তগণের সম্বন্ধে

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ১৩
সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪

যেমন এস্থলে 'সততং কীর্তয়ন্তো মাং' ইত্যাদি বর্ণনা আছে (৯।১৪ , সেইরূপ ভক্তও অল্পসংখ্যক তখন ছিলেন। তাঁহাদের বর্ণনা এইরূপ :--

"স্বকার্য করেন সব ভাগবতগণ। কৃষ্ণপূজা গঙ্গাস্নান কৃষ্ণের কথন ॥ তুলসীর মঞ্জরী সহিত গঙ্গাজলে। নিরবধি সেবে কৃষ্ণ মহাকুতূহলে ॥ চারি ভাই শ্রীবাস মিলিয়া নিজ ঘরে। নিশা হইলে হরিনাম গায় উচ্চৈঃস্বরে ॥ শুনিয়া পাষণ্ডী বলে হইল প্রমাদ। এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উচ্ছাদ ॥" ইত্যাদি।

১৩। হে পার্থ, দৈবীং প্রকৃতিম্ আশ্রিতাঃ (সাত্ত্বিক প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া) মহাত্মানঃ তু (মহাত্মগণ) অনন্যমনসঃ (অনন্যমনা হইয়া) মাং (আমাকে) ভূতাদিম্ (জগৎকারণ) অব্যয়ং (নিত্য) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) ভজন্তি (ভজনা করেন)।

ভগবদ্-ভক্তের দৈবী বা সাত্ত্বিক প্রকৃতি ১৩-১৫

কিন্তু হে পার্থ, সাত্ত্বিকী প্রকৃতি-প্রাপ্ত মহাত্মগণ অনন্যচিত্ত হইয়া আমাকে সর্বভূতের কারণ এবং অব্যয়স্বরূপ জানিয়া ভজনা করেন। ১৩

পূর্ব শ্লোকে ভগবদ্-বিমুখ ব্যক্তিগণের বর্ণনা করিয়া এই শ্লোকে ভক্তগণের কথা বলা হইল এবং পরের দুই শ্লোকে ইঁহাদের ভজন-প্রণালী সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে।

১৪। [তাঁহারা] সততং মাং কীর্তয়ন্তঃ (সর্বদা আমার নাম কীর্তন করিয়া) যতন্তঃ (যত্নশীল হইয়া) দৃঢ়ব্রতাঃ চ (দৃঢ়ব্রত হইয়া) ভক্ত্যা চ নমস্যন্তঃ (এবং ভক্তিপূর্বক আমাকে নমস্কার করিয়া) নিত্যযুক্তাঃ (নিত্য সমাহিত হইয়া) উপাসতে (আমাকে ভজনা করেন)।

দৃঢ়ব্রত—শমদমাদি সাধন-সম্পন্ন (মধুসূদন); দৃঢ় নিয়মস্থ (শ্রীধর); একাদশী, জন্মাষ্টমী-আদি ব্রতপরায়ণ (বলরাম)।

তাঁহারা যত্নশীল ও দৃঢ়ব্রত হইয়া ভক্তিপূর্বক সর্বদা আমার কীর্তন এবং বন্দনা করিয়া নিত্য সমাহিত চিত্তে আমার উপাসনা করেন। ১৪

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫
অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ॥ ১৬

১৫। অন্যে অপি চ (অন্যে কেহ কেহ) জ্ঞানযজ্ঞেন যজন্তঃ (জ্ঞানরূপ যজ্ঞ দ্বারা যজন করিয়া) মাম্ উপাসতে (আমাকে আরাধনা করে); [কেহ] একত্বেন (অভেদ ভাবে) [কেহ] পৃথক্ত্বেন (পৃথক্ ভাবে, দাস্যাদি ভাবে) [কেহ কেহ] বিশ্বতোমুখং (সর্বাত্মক আমাকে) বহুধা (নানা প্রকারে, ব্রহ্মা রুদ্রাদি নানা রূপে) উপাসতে (উপাসনা করেন)।

জ্ঞানযজ্ঞ—জ্ঞানরূপ যজ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞানযোগ ; শ্রীধর স্বামী বলেন,—বাসুদেবঃ সর্বমিত্যেবং সর্বাত্মদর্শনং জ্ঞানং তদেব যজ্ঞঃ তেন।—বাসুদেবই সমস্ত, এইরূপ সম্যক্ দর্শনই জ্ঞান, তদ্রূপ যজ্ঞদ্বারা। পূর্বে বলা হইয়াছে, এইরূপ জ্ঞানী ভক্তই শ্রেষ্ঠ। (৭।১৭-১৯)। **বিশ্বতোমুখং**—সর্বাত্মকং বিশ্বরূপম্ (শঙ্কর)।

কেহ কেহ জ্ঞানরূপ যজ্ঞদ্বারা আমার আরাধনা করেন। কেহ কেহ অভেদ ভাবে (অর্থাৎ উপাস্য-উপাসকের অভেদ চিন্তাদ্বারা), কেহ কেহ পৃথক্ ভাবে অর্থাৎ (দাস্যাদি ভাবে), কেহ কেহ সর্বময় সর্বাত্মা আমাকে নানাভাবে (অর্থাৎ ব্রহ্মা রুদ্রাদি নানা দেবতারূপে) উপাসনা করেন। ১৫

মত-পথ—গীতায় প্রধানতঃ ভক্তি-জ্ঞানমিশ্র কর্মযোগের প্রাধান্য থাকিলেও প্রচলিত বিবিধ উপাসনা-প্রণালী সম্বন্ধে গীতার সার্বভৌম উদার মত, উহাতে সাম্প্রদায়িকতা নাই (১৩।২৪-২৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এই শ্লোকের তাৎপর্য এই যে, পরমেশ্বর বিশ্বতোমুখ, এই হেতুই তাঁহার উপাসনা-প্রণালীও বিভিন্ন হয়। জ্ঞান-যজ্ঞের অর্থ পরমেশ্বরের স্বরূপ জ্ঞানের দ্বারাই বিচার করিয়া উহার দ্বারা সিদ্ধিলাভ করা (৪।৩৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। কিন্তু পরমেশ্বরের এই জ্ঞানও দ্বৈত-অদ্বৈত প্রভৃতি ভেদে অনেক প্রকারের হইতে পারে। এই কারণে জ্ঞান-যজ্ঞও বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। " 'একত্ব', 'পৃথকত্ব' প্রভৃতি পদের দ্বারা বুঝা যায় যে, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি সম্প্রদায় যদিও আধুনিক, তথাপি কল্পনাসকল প্রাচীন।" —গীতারহস্য, লোকমান্য তিলক।

১৬। অহং (আমি) ক্রতুঃ (শ্রৌত যজ্ঞ), অহং যজ্ঞঃ (স্মার্তযজ্ঞ), অহং স্বধা (পিতৃযজ্ঞ, শ্রাদ্ধাদি) অহম্ ঔষধম্ (ওষধিজাত অন্ন বা ভেষজ), অহং মন্ত্রঃ, অহম্ এব আজ্যম্ (হোমের ঘৃত), অহম্ অগ্নিঃ, অহং হুতম্ (হোম)।

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥ ১৭
গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ১৮

ক্রতু, যজ্ঞ—এই দুইটি শব্দ সদৃশার্থক হইলেও ঠিক একার্থক নহে। 'যজ্ঞ' শব্দ 'ক্রতু' শব্দ অপেক্ষা অধিক ব্যাপক। শ্রৌত যজ্ঞকেই ক্রতু বলে। এস্থলে দুইটি শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া ক্রতু অর্থে অগ্নিষ্টোমাদি শ্রৌত যজ্ঞ এবং যজ্ঞ অর্থে স্মার্ত যজ্ঞাদি বুঝিতে হইবে।

ভগবানের বিশ্বানুগতা—তিনিই সব ১৬-১৯

আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ, আমি স্বধা, আমি ঔষধ, আমি মন্ত্র, আমি হোমাদি-সাধন ঘৃত, আমি অগ্নি, আমিই হোম। ১৬

পূর্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে, আমি বিশ্বতোমুখ সর্বময়। এই কয়েকটি শ্লোকে ভগবানের সর্বাত্মতারই বর্ণনা হইতেছে। এইরূপ সর্বাত্ম স্বরূপের বর্ণনা পূর্বে সপ্তম অধ্যায়ে করা হইয়াছে (৭।৮-১২ শ্লোক), এবং পরবর্তী দুই অধ্যায়ও এইরূপ বর্ণনাতেই পরিপূর্ণ।

১৭। **অহম্ অস্য** জগতঃ (এই জগতের) পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহঃ, বেদ্যং (একমাত্র জ্ঞেয় বস্তু), পবিত্রম্, ওঙ্কারঃ, ঋক্ (ঋগ্‌বেদ), সাম (সামবেদ), **যজুঃ** এব **চ** (এবং যজুর্বেদ)।

আমিই এই জগতের পিতা, মাতা, বিধাতা, পিতামহ; যাহা কিছু জ্ঞেয় এবং পবিত্র বস্তু তাহা আমি। আমি ব্রহ্মবাচক ওঙ্কার, আমিই ঋক্, সাম ও যজুর্বেদ স্বরূপ। ১৭

ভগবান্‌ই জগতের পিতা অর্থাৎ কর্তৃকারণ এবং মাতা অর্থাৎ উপাদান কারণ (অপরা প্রকৃতি), তিনি পিতামহ অর্থাৎ অব্যক্ত প্রকৃতিরও কারণ।

১৮। [আমি] গতিঃ, ভর্তা (পোষণকর্তা), প্রভুঃ (নিয়ন্তা), সাক্ষী (শুভাশুভ দ্রষ্টা), নিবাসঃ (স্থিতিস্থান), শরণং (রক্ষক), সুহৃৎ (উপকার-কর্তা), প্রভবঃ (সৃষ্টিকর্তা), প্রলয়ঃ (সংহর্তা), স্থানং (আধার), নিধানম্ (লয়স্থান), অব্যয়ং বীজম্ (অবিনাশী কারণ)।

আমি গতি, আমি ভর্তা, আমি প্রভু, আমি শুভাশুভ-দ্রষ্টা, আমি স্থিতি-স্থান, আমি রক্ষক, আমি সুহৃৎ, আমি স্রষ্টা, আমি সংহর্তা, আমি আধার, আমি লয়স্থান এবং আমিই অবিনাশী বীজস্বরূপ। ১৮

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন ॥ ১৯

বিবিধ কর্ম বা সাধনায় যে গতি বা ফল পাওয়া যায় তাহা তিনিই। যে যাহা করুক, তাহার শেষ গতি তিনিই। শুভাশুভ যে কোন কর্ম লোকে করে তিনি সবই দেখেন, এই জন্য তিনিই সাক্ষী। সর্বভূত তাঁহাতেই বাস করে, তাই তিনি নিবাস। তিনি প্রভব, প্রলয় ও স্থান অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি, লয় কর্তা। প্রলয়েও জীবসমূহ বীজ অবস্থায় তাঁহাতেই অবস্থান করে, এই জন্য তিনি নিধান। প্রত্যুপকারের আশা না করিয়া সকলের উপকার করেন, তাই তিনি সুহৃৎ। তিনি আর্তের আর্তিহর, তাই তিনি শরণ। ১৮

১৯। হে অর্জুন, অহং (আমি) তপামি (উত্তাপ দান করি), অহং বর্ষং নিগৃহ্ণামি (জল আকর্ষণ করি), উৎসৃজামি চ (পুনর্বার বর্ষণও করি), [আমি] অমৃতং মৃত্যুঃ চ (জীবন ও মৃত্যু স্বরূপ), সৎ (নিত্য অক্ষর আত্মা), অসৎ (অনিত্য ক্ষর জগৎ)।

হে অর্জুন, আমি (আদিত্যরূপে) উত্তাপ দান করি, আমি ভূমি হইতে জল আকর্ষণ করি, আমি পুনর্বার জল বর্ষণ করি; আমি জীবের জীবন, আমিই জীবের মৃত্যু; আমি সৎ (অবিনাশী অব্যক্ত আত্মা), আমিই অসৎ (নশ্বর ব্যক্ত জগৎ)।১৯

সৎ ও অসৎ—'সৎ' ও 'অসৎ' শব্দদ্বয় গীতায় এবং বেদান্তাদি শাস্ত্রে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(১) সাধারণতঃ 'সৎ' বলিতে বুঝায় অক্ষর অবিনাশী অব্যক্ত ব্রহ্মবস্তু, এবং 'অসৎ' বলিতে বুঝায় নশ্বর ব্যক্ত জগৎ। যথা—

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ (গীতা ২।১৬); সদসচ্চাহমর্জুন (গীতা ৯।১৯); কথমসতঃ সজ্জায়েত (ছান্দো ৯।২।১।২); একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি (ঋক্ ১।১৬৪।৪৬)।

(২) কখনও 'সৎ' শব্দ অব্যক্ত প্রকৃতি এবং 'অসৎ' শব্দ ব্যক্ত জগৎ বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। যথা—

ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎপরং যৎ (গীতা ১১।৩৭)।

(৩) কখনও 'ন সৎ ন অসৎ' (সৎও নহে, অসৎও নহে') এইরূপ ভাবে ব্রহ্মতত্ত্বের বর্ণনা করা হয়। যথা—

ন সৎ নাসদুচ্যতে (গীতা ১৩।১২); ন সৎ নাসৎ শিব এব কেবলঃ (শ্বেত ৪।১৮); 'নাসদাসীন্নো সদাসীৎ তদানীম্' (ঋক্, নাসদীয় সূক্ত)। এ কথার

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥ ২০

তাৎপর্য এই যে, যে বস্তুর সৃষ্টি হয় এবং যাহার নাশ হইয়া থাকে সেই বস্তুই সৎ (অস্তি, আছে) বা অসৎ (নাস্তি, নাই) এইরূপ দ্বন্দ্ব জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়; যাহা সৃষ্টির পূর্বেও ছিল এবং পরেও থাকিবে, তৎসম্বন্ধে 'আছে' বা 'নাই' এরূপ কিছুই বলা যায় না। কেননা, সেই অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মবস্তু সৎ-অসৎ, আলোক-অন্ধকার, জ্ঞান-অজ্ঞান ইত্যাদি পরস্পর সত্তত-সাপেক্ষ দ্বৈত-বুদ্ধির অতীত অর্থাৎ সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়।

(৪) প্রাচীন উপনিষদাদিতে অনেক স্থলে 'সৎ' শব্দ যাহা দেখা যাইতেছে অর্থাৎ দৃশ্য ব্যক্ত জগৎ এবং 'তৎ' বা 'অসৎ' শব্দ এই দৃশ্য জগতের অতীত যে অব্যক্ত ব্রহ্মবস্তু তাহা বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'সৎ' ও 'অসৎ'-এর এই অর্থ পূর্বোক্ত (১) দফার ঠিক বিপরীত। যথা—

দেবানাং পূর্ব্যে যুগেঽসতঃ সদজায়ত (ঋক্ ১০।৭২।৭); অসৎ বা ইদমগ্র আসীৎ (এই সমগ্র জগৎ প্রথমে অসৎ [ব্রহ্ম] ছিল); সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ ('সৎ অর্থাৎ যাহা চক্ষুর গোচর, 'তৎ' অর্থাৎ চক্ষুর অতীত); এইরূপ এক বস্তুই দ্বিধা হইয়াছে (তৈত্তি ২।৬।৭)।১৯

২০। ত্রৈবিদ্যাঃ (ত্রিবেদী যাজ্ঞিকেরা) যজ্ঞৈঃ মাং ইষ্ট্বা (যজ্ঞদ্বারা আমাকে পূজা করিয়া) সোমপাঃ (সোমরস পান করিয়া), পূতপাপাঃ (নিষ্পাপ হইয়া) স্বর্গতিং (স্বর্গলোক-প্রাপ্তি) প্রার্থয়ন্তে (কামনা করেন); তে (তাঁহারা) পুণ্যং (পবিত্র) সুরেন্দ্রলোকম্ (স্বর্গলোক) আসাদ্য (প্রাপ্ত হইয়া) দিবি (স্বর্গে) দিব্যান্ দেবভোগান্ (উত্তম দেবভোগসকল) অশ্নন্তি (ভোগ করেন)।

ত্রৈবিদ্যাঃ—ঋক্, যজুঃ, সাম, এই বেদত্রয়োক্ত যাগ-যজ্ঞাদি কর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ।

যাগ-যজ্ঞাদির ফল অনিত্য ২০-২২

ত্রিবেদোক্ত যজ্ঞাদি-কর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ যজ্ঞাদি দ্বারা আমার পূজা করিয়া যজ্ঞশেষে সোমরস পানে নিষ্পাপ হন এবং স্বর্গলাভ কামনা করেন, তাঁহারা পবিত্র স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া দিব্য দেবভোগ-সমূহ ভোগ করিয়া থাকেন। ২০

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ২১
অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ২২

২১। তে (তাঁহারা) তং বিশালং স্বর্গ-লোকম্ (সেই বিপুল স্বর্গসুখ) ভুক্ত্বা (ভোগ করিয়া) পুণ্যে ক্ষীণে [সতি] (পুণ্যক্ষয় হইলে) মর্ত্যলোকং বিশন্তি (মর্ত্যলোকে প্রবেশ করেন); এবং (এইরূপ) ত্রয়ীধর্মম্ (বেদত্রয়বিহিত ধর্ম) অনুপ্রপন্নাঃ (অনুষ্ঠানকারী) কামকামাঃ (ভোগকামী ব্যক্তিগণ) গতাগতং লভন্তে (যাতায়াত করিয়া থাকেন)।

তাঁহারা তাঁহাদের প্রার্থিত বিপুল স্বর্গসুখ উপভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্যলোকে প্রবেশ করেন। এইরূপে কামনা-ভোগ-পরবশ এই ব্যক্তিগণ যাগযজ্ঞাদি বেদোক্ত ধর্ম অনুষ্ঠান করিয়া পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করিয়া থাকেন। ২১

বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানকারী সকাম ব্যক্তিগণ পুণ্যফল-স্বরূপ স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন বটে, কিন্তু মোক্ষ প্রাপ্ত হন না। একথা পূর্বে আরও কয়েক বার বলা হইয়াছে (২।৪২-৪৫, ৭।২৩, ৮।১৬।২৫ ইত্যাদি)। ২০-২৫ এই কয়েকটি শ্লোকে ফলাশায় দেবোপাসনা ও নিষ্কাম ঈশ্বরোপাসনায় পার্থক্য দেখান হইতেছে।

২২। অনন্যাঃ মাং চিন্তয়ন্তঃ (অনন্যচিত্ত হইয়া আমাকে চিন্তা করিতে করিতে) যে জনাঃ (যে ব্যক্তিগণ) পর্যুপাসতে (উপাসনা করেন), নিত্যাভি-যুক্তানাং তেষাং (আমাতে নিত্যযুক্ত সেই ব্যক্তিগণের) যোগক্ষেমম্ (যোগ ও ক্ষেম) অহং বহামি (আমি বহন করি)।

অনন্যাঃ—নাস্তি মদ্ব্যতিরেকেণান্যৎ কামং যেষাং তে; আমা ব্যতীত যাহাদিগের অন্য উপাস্য বা কামনা নাই। **যোগক্ষেমং**—যোগঃ অপ্রাপ্তস্য প্রাপণং, ক্ষেমং লব্ধস্য পরিরক্ষণং—অলব্ধ বস্তুর সংস্থানকে **যোগ** এবং লব্ধ বস্তুর রক্ষণকে বলে **ক্ষেম**। **নিত্যাভিযুক্ত**—যে আমাতে নিত্যযুক্ত অর্থাৎ আমার ধ্যানপূজায় সতত নিরত।

অনন্যচিত্ত হইয়া আমার চিন্তা করিতে করিতে যে ভক্তগণ আমার উপাসনা করেন, আমাতে নিত্যযুক্ত সেই সমস্ত ভক্তের যোগ

ও ক্ষেম আমি বহন করিয়া থাকি (অর্থাৎ তাহাদের প্রয়োজনীয় অলব্ধ বস্তুর সংস্থান এবং লব্ধ বস্তুর রক্ষণ করিয়া থাকি)। ২২

ভক্তের ভগবান্—ঈশ্বর-চিন্তা ও বিষয়-চিন্তা—সংসারী জীব সংসার-চিন্তায়, গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তায়, সুখসমৃদ্ধির চিন্তায় সতত ব্যস্ত, বিবিধ যাগ-যজ্ঞাদি এবং নানা দেবদেবীর পূজার্চনাও প্রধানতঃ ঐহিক ফলকামনা করিয়াই করা হয়। তাহার প্রার্থনা, উপাসনা, স্তবস্তুতি যাহা কিছু, সর্বত্রই 'দেহি' 'দেহি'; কিন্তু শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—ফলকামনায় যাগযজ্ঞাদি বা অন্য দেবতাদির আরাধনা করিও না। আমাতে নিত্যযুক্ত হও, আমার ভক্ত হও, সতত আমার কর্ম কর, আমাকেই পাইবে। এখন, ভগবানের কর্ম দ্বিবিধ—এক, ভগবানের স্মরণ, কীর্তন, পূজার্চনা ইত্যাদি (৯।৩৪, ১১।৫৫, ১২।১০ ইত্যাদি)। ইহা গৌণী ভক্তিযোগ। দ্বিতীয়, সর্বভূতে শ্রীভগবান্ আছেন জানিয়া সাম্যবুদ্ধি সহকারে আত্মৌপম্য-দৃষ্টিতে সর্বভূতের হিতসাধন; ইহা নির্গুণা বা পরা ভক্তি, ইহাই গীতার নিষ্কাম কর্মযোগ। (গীতা ৬।৩১-৩২, ভাগবত ১১।২।৪৫, ৩।২৪।৪৫।৪৬, ৩।২৯।১৭-২০)। কিন্তু দিবারাত্রি ঈশ্বরচিন্তা করিব বা সর্বভূতের হিতসাধনে দেশের কাজে, দশের কাজে ব্যস্ত থাকিব, তবে সংসার-চিন্তা, দেহের চিন্তা করিব কখন? দেহরক্ষা না পাইলে ঈশ্বরচিন্তাও হয় না, দশের কাজও হয় না—এই হইল সংসারীর সংশয় ও প্রশ্ন। এ সম্বন্ধে নজীরস্বরূপ অনেক মহাজনবাক্যও সে উপস্থিত করিতে পারে; যেমন—'জীবন্ ধর্মমবাপ্নুয়াৎ'—নিজে বাঁচিলে তবে ধর্ম (বিশ্বামিত্র); 'আত্মানং সততং রক্ষেৎ' (মনু); 'আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ' (বিদুর), 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্' (কালিদাস) ইত্যাদি। ইহার উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, যাহারা নিত্যযুক্ত হইয়া সতত আমারই চিন্তায়, আমারই কর্মে মগ্ন থাকে, তাহাদের যোগক্ষেম আমিই বহন করি অর্থাৎ দেহাদিরক্ষণের ভার আমিই গ্রহণ করি।

তবে কি অন্যের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা ঈশ্বর করেন না? না, সে ব্যবস্থাও তিনি করেন; তিনিই ভূতধারক, ভূতপালক, সর্বভূতের সুহৃদ্। তবে তাহাদিগের চেষ্টা করিতে হয়, নিত্যযুক্ত ভগবদ্ভক্তের চেষ্টা করিতে হয় না, এই পার্থক্য। প্রকৃতপক্ষে, সুকৃতিবলে যাঁহাদের ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তি বা সর্বত্র সাম্যবুদ্ধি উৎপন্ন হয়, তাঁহারা পাটোয়ারী বুদ্ধি সহকারে

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্॥ ২৩

অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাঽতশ্চ্যবন্তি তে॥ ২৪

হিসাব-নিকাশ করিয়া ভগবৎকর্মে নিযুক্ত হন না; তাঁহারা স্বভাববশে অবশভাবেই উহাতে লাগিয়া থাকেন, অন্য কথায়, অন্য চিন্তায় তাঁহাদের মন যায় না, তাঁহাদের নিজ দেহরক্ষা বা পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনাদির ব্যবস্থাও ঠেকিয়া থাকে না। তবে এরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল, তাহার কারণ, এরূপ অনন্যচিত্ততাও অতি বিরল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, শ্রীভক্তমাল গ্রন্থে 'চরিত্র শ্রীঅর্জুন মিশ্র' দ্রষ্টব্য। ২২

২৩। হে কৌন্তেয়, শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ (শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) যে অপি (যে ব্যক্তিগণ) অন্যদেবতাভক্তাঃ (অন্য দেবতার প্রতি ভক্তিমান্ হইয়া) যজন্তে (পূজা করে), তে অপি (তাহারাও) মাম্ এব যজন্তি (আমাকেই পূজা করে), [কিন্তু] অবিধিপূর্বকম্ (মোক্ষপ্রাপক বিধি ব্যতিরেকে)।

অন্য দেবতা-পূজাও পরোক্ষে ঈশ্বরের পূজা, কিন্তু দেবতা ভাবনা করিলে ঈশ্বর লাভ হয় না। ২৩-২৬

হে কৌন্তেয়, যাহারা অন্য দেবতায় ভক্তিমান্ হইয়া শ্রদ্ধাযুক্তচিত্তে তাঁহাদের পূজা করে, তাহারাও আমাকেই পূজা করে, কিন্তু অবিধি-পূর্বক (অর্থাৎ যাহাতে সংসার-নিবর্তক মোক্ষ বা ঈশ্বরপ্রাপ্তি ঘটে তাহা না করিয়া)। ২৩

২৪। হি (যেহেতু) অহম্ এব (আমিই) সর্বযজ্ঞানাং (সকল যজ্ঞের) ভোক্তা প্রভুঃ চ (ভোক্তা এবং ফলদাতা), তে তু মাং (তাহারা কিন্তু আমাকে) তত্ত্বেন (স্বরূপতঃ, যথাবৎ) ন অভিজানন্তি (জানে না); অতঃ (এই হেতু) চ্যবন্তি (সংসারে পতিত হয়)।

আমিই সর্ব যজ্ঞের ভোক্তা ও ফলদাতা। কিন্তু তাহারা আমাকে যথার্থরূপে জানে না বলিয়া সংসারে পতিত হয়। ২৪

অন্য দেবতার পূজাও তোমারই পূজা। তবে তাহাদিগের পূজা করিলে সদ্গতিলাভ হইবে না কেন?—কারণ, অন্যদেবতা-ভক্তেরা আমার প্রকৃত স্বরূপ জানে না; তাহারা মনে করে সেই সেই দেবতাই ঈশ্বর। এই

অজ্ঞানতাবশতঃই তাহাদের সদ্গতি হয় না। তাহারা সংসারে পতিত হয়। কেননা, অন্য দেবতারা মোক্ষ দিতে পারেন না।

একেশ্বরবাদ—বহুদেবোপাসনা—মূর্তিপূজা

খ্রীষ্টীয়াদি একেশ্বরবাদী ধর্মপ্রচারকগণ হিন্দুদিগকে বহুদেবোপাসক ও পৌত্তলিক বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন। কিন্তু হিন্দু বহুদেবোপাসক হইলেও বহু-ঈশ্বরবাদী নহেন, প্রতিমা-পূজক হইলেও পৌত্তলিক (Idolator) নহেন। বেদে কতিপয় দেবতার উল্লেখ আছে, কিন্তু সে সকলই এক, বহুত্ব কল্পনামাত্র। প্রাচীনতম ঋক্‌বেদ বলিতেছেন,—'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ' (ঋক্ ১।৬৪।৪৬); 'একং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি' (ঋক্ ১।১১৪।৫)। 'দেবানাং পূর্বে যুগেঽসতঃ সদজায়ত' (ঋক্ ১০।৭২।৭)—দেবতাদিগেরও পূর্বে সেই অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে।

সুতরাং দেবতাগণ ঈশ্বর নহেন, ঈশ্বরের শক্তিবিশেষের বিভিন্ন প্রকাশ বা বিভূতি। শক্তিমান্ মনুষ্যে যেমন ঐশ্বরিক শক্তির সাময়িক প্রকাশ, দেবগণেও সেই ঐশী শক্তিরই ততোধিক প্রকাশ, এই মাত্র পার্থক্য। ভয়ে, বিস্ময়ে, ভক্তিতে বা স্বার্থবুদ্ধিতে শক্তিমানের পূজা, বীর-পূজা, সকলেই করে, দেবগণের পূজাও তদ্রূপ, উহাতে অন্যবিধ ইষ্টলাভ হইতে পারে, ঈশ্বরলাভ হয় না। কিন্তু যাঁহারা শ্রদ্ধাসহকারে অন্য দেবতা ভজনা করেন, তাঁহারা অবিধিপূর্বক হইলেও ঈশ্বরেরই ভজনা করেন, কেননা ঈশ্বর হইতে পৃথক্ কোন দ্বিতীয় শক্তি নাই। কিন্তু তাঁহারা এই তত্ত্ব জানেন না বলিয়াই ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হন না, পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন ('অতশ্চ্যবন্তি তে' ৯।২৪)।

মূর্তিপূজা সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা হইয়াছে (৯।২৬ ও ভূমিকা)। হিন্দুরা যে দেবদেবীর মূর্তি পূজা করেন, তাহাকে প্রতিমা বলে, পুত্তলিকা বলে না। প্রতিমা অর্থ সাদৃশ্য, বাংলায় 'প্রাণ-প্রতিম', 'সহোদর-প্রতিম' ইত্যাদি শব্দে এই অর্থ পাওয়া যায়। পুত্তলিকা অর্থ মৃত্তিকাদির মূর্তি (Idol)। নামরূপ ব্যতীত মনুষ্যমন সেই অনন্তশক্তিমৎ অব্যক্ত বস্তুর ধারণা করিতে পারে না; তাই ঈশ্বরের শক্তি-বিশেষের সাদৃশ্য কল্পনা করিয়া চিন্তার অবলম্বন-স্বরূপ একটা প্রতীক গ্রহণ করা হয় মাত্র। মূর্তির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা, স্তব-স্তুতি, ধ্যান-প্রণাম ইত্যাদি মন্ত্রাদির প্রতি লক্ষ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, সাধক প্রতীক অবলম্বনে ঈশ্বরেরই পূজা করিতেছেন, পুতুল পূজা করিতেছেন না। এই জন্যই বলিয়াছি যে, প্রতিমা-পূজক ও পৌত্তলিক

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥ ২৫
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ ২৬

এক কথা নহে। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃতির অতীত হইযা অতীন্দ্রিয় তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতিমারও প্রয়োজন হয় না, বস্তুতঃ তাঁহার প্রতিমা (তুলনা) নাই, তাই সিদ্ধ, বুদ্ধ, সম্যগ্‌দর্শী আর্য ঋষিগণ তারস্বরে বলিযাছিলেন—'ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ'। ২৪

২৫। দেবব্রতাঃ (দেবপূজকগণ) দেবান্ যান্তি (দেবগণকে প্রাপ্ত হন), পিতৃব্রতাঃ (পিতৃপূজকগণ) পিতৄন্ যান্তি (পিতৃগণকে প্রাপ্ত হন), ভূতেজ্যাঃ (ভূতপূজকগণ) ভূতানি যান্তি (ভূতগণকে প্রাপ্ত হন), মদ্‌যাজিনঃ অপি (আমার পূজকগণও) মাম্ যান্তি (আমাকে প্রাপ্ত হন)।

ভূতেজ্যাঃ—যাঁহারা ভূতগণের, অর্থাৎ যক্ষ, রক্ষ, বিনায়ক, মাতৃকাদির পূজা করেন।

ইন্দ্রাদি দেবগণের পূজকেরা দেবলোক প্রাপ্ত হন, শ্রাদ্ধাদি দ্বারা যাঁহারা পিতৃগণের পূজা করেন তাঁহারা পিতৃলোক প্রাপ্ত হন, যাঁহারা যক্ষরক্ষাদি ভূতগণের পূজা করেন তাঁহারা ভূতলোক প্রাপ্ত হন এবং যাঁহারা আমাকে পূজা করেন তাঁহারা আমাকেই প্রাপ্ত হন। ২৫

২৬। যঃ (যিনি) মে (আমাকে) ভক্ত্যা (ভক্তিপূর্বক) পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং (পত্র, পুষ্প, ফল, জল) প্রযচ্ছতি (দান করেন) অহং (আমি) প্রযতাত্মনঃ (শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির) ভক্ত্যুপহৃতম্ (ভক্তিপ্রদত্ত) তৎ (সেই উপহার) অশ্নামি (প্রীতিপূর্বক গ্রহণ করি)।

যিনি আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল, জল যাহা কিছু ভক্তিপূর্বক দান করেন, আমি সেই শুদ্ধচিত্ত ভক্তের ভক্তিপূর্বক প্রদত্ত উপহার গ্রহণ করিয়া থাকি। ২৬

আমার পূজা অনায়াস-সাধ্য। ইহাতে বহুব্যয়সাধ্য উপকরণের প্রয়োজন নাই। ভক্তিসহ যাহা কিছু আমার ভক্ত আমাকে দান করেন, দরিদ্র ব্রাহ্মণ শ্রীদামের চিপিটকের ন্যায় (ভাঃ ১০।৮১।৪), তাহাই আমি আগ্রহের সহিত গ্রহণ করি। আমি দ্রব্যের কাঙ্গাল নহি, ভক্তির কাঙ্গাল। এই কথাটি বুঝাইবার জন্য 'ভক্তিপূর্বক' শব্দটি দুই বার ব্যবহৃত হইয়াছে।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ ২৭

সাকারোপাসনা

প্রঃ—এস্থলে ফল-পুষ্পাদি দ্বারা সাকার মূর্তির উপাসনাই বিহিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

উঃ—"ফল-পুষ্পাদি প্রদান করিতে হইলে তাহা যে প্রতিমায় অর্পণ করিতে হইবে এমন কথা নাই। ঈশ্বর সর্বত্র আছেন, যেখানে দিবে সেখানেই তিনি পাইবেন।" —বঙ্কিমচন্দ্র

একথা ঠিক। কিন্তু গীতায় শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন যে, আমি অজ, অব্যয় হইয়াও আত্মমায়ায় দেহ ধারণ করি (৪।৬); সুতরাং অবতারবাদ ও সাকারোপাসনা গীতায় অনুমোদিত, একথা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু জগতে নিরাকারবাদী বহু ধর্মসম্প্রদায় আছে, যাঁহারা অবতারবাদ মানেন না এবং উপাসনার জন্য কোনরূপ সাকার বিগ্রহাদি বা প্রতীকের প্রয়োজন বোধ করেন না। অনেকে আবার নিরাকারবাদ গ্রহণ করিয়াও অবস্থাবিশেষে প্রতীকের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, নিছক নিরাকারবাদিগণ ঈশ্বরের বাহ্য মূর্তি স্বীকার করেননা বটে, কিন্তু উঁহারাও মনে মনে কোন না কোন মূর্তিই কল্পনা করিয়া থাকেন। মানববুদ্ধি নামরূপের অতীত কোন অতীন্দ্রিয় বস্তুর ধারণা করিতে পারে না, সুতরাং যে পর্যন্ত না সাধক প্রকৃতির অতীত হইয়া অতীন্দ্রিয় তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন, সে পর্যন্ত তাঁহাকে সাকারের মধ্য দিয়াই, স্থূলের মধ্য দিয়াই সূক্ষ্মে যাইতে হইবে, অন্য গতি নাই।

"আপনারা মনকে স্থির করিবার অথবা কোনরূপ চিন্তা করিবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন—আপনারা মনে মনে মূর্তি গঠন না করিয়া থাকিতে পারিতেছেন না। দুই প্রকার ব্যক্তির মূর্তি-পূজার প্রয়োজন হয় না। এক নরপশু, যে ধর্মের কোন ধার ধারে না, আর সিদ্ধপুরুষ—যিনি এই সকল সোপান-পরম্পরা অতিক্রম করিয়াছেন। আমরা যতদিন এই দুই অবস্থার মধ্যে অবস্থিত, ততদিন আমাদের ভিতরে বাহিরে কোন না কোন রূপ আদর্শ বা মূর্তির প্রয়োজন হইয়া থাকে।"—স্বামী বিবেকানন্দ, ভক্তি-রহস্য (অপিচ, ৩২৫ পৃষ্ঠা ও ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

২৭। হে কৌন্তেয়, যৎ করোষি (যাহা কিছু কর), যৎ অশ্নাসি (যাহা ভোজন কর), যৎ জুহোষি (যাহা হোম কর), যৎ দদাসি (যাহা দান কর),

যৎ তপস্যসি (যাহা তপস্যা কর), তৎ (তাহা) মদর্পণম্ (আমাতে অর্পণ) কুরুষ (করিবে)।

ঈশ্বরে সর্বকর্মার্পণ—উহাতেই কর্মবন্ধন মোচন ২৭-২৮

হে কৌন্তেয়, তুমি যাহা কিছু কর, যাহা কিছু ভোজন কর, যাহা কিছু হোম কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, তৎ সমস্তই আমাকে অর্পণ করিও। ২৭

ঈশ্বরে কর্মার্পণ-তত্ত্ব

এস্থলে বলা হইতেছে যে, সর্বেন্দ্রিয় দ্বারা যে কিছু কর্ম কর, সকলই আমাতে অর্পণ কর। শ্রীমদ্‌ভাগবতেও ঠিক এই কথাই আছে—

'কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বাহনুসৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যদ্যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ ॥

"কায়, মন, বাক্য, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, আত্মা দ্বারা বা স্বভাববশতঃ যে কোন কর্ম করা হয়, তাহা সমস্তই পরাৎপর নারায়ণে সমর্পণ করিবে।"—ভাগবত ১১।২।৩৬

এস্থলে কেবল পূজার্চনা, দান, তপস্যাদির কথা বলা হয় নাই, আহার-বিহারাদি সমস্ত লৌকিক কর্মও ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে করিতে হইবে, ইহাই বলা হইতেছে। এই ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধি কিরূপ ?—ঈশ্বরের সঙ্গে সাধক যে ভাব স্থাপন করেন তদনুসারেই তাঁহার কর্মার্পণ-বুদ্ধিও নিয়মিত হয়।

ভক্তিমার্গের প্রথম সোপানই হইতেছে দাস্যভাব। তুমি প্রভু, আমি দাস ; তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র ; তুমি কর্তা, আমি নিমিত্তমাত্র। এই ভাবটি গ্রহণ করিয়া সমস্ত কর্ম করিতে পারিলেই কর্ম ঈশ্বরে অর্পিত হয়। আমি আহার-পানাদি করি, সংসারকর্ম করি, যাহা কিছু করি, তুমিই করাও, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, তোমার কর্ম সার্থক হউক, আমি আর কিছু জানি না, চাহি না—"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" এই অবস্থায় 'আমি তোমার' এই দাস্যভাবটি নিত্য বিদ্যমান থাকে। ভক্তিমার্গের আর একটি উচ্চতর অবস্থা হইতেছে, 'তুমি আমার' এই ভাব ; সুতরাং আমার যাহা কিছু কর্ম তোমার প্রীতি-সম্পাদনার্থ ; এই অবস্থায় সাধকের অন্য কর্ম থাকে না। শ্রবণ-স্মরণ-কীর্তন, পূজার্চনা ইত্যাদি ভগবৎ-সেবা-বিষয়ক কর্মই তাঁহার কর্ম হইয়া উঠে। অধিকতর উচ্চাবস্থায় ভগবান্ জগন্ময়, সর্বভূতে অধিষ্ঠিত, সুতরাং ভূত-সেবাই তাঁহার সেবা, এই জ্ঞান জন্মিলে নিষ্কামভাবে সাধক লোক-সেবায়ই নিযুক্ত হন।

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ ২৮

"এই কর্মার্পণের মূলে কর্মফলের আশা ত্যাগ করিয়া কর্ম করিবার তত্ত্ব আছে। জীবনের সমস্ত কর্ম, এমন কি জীবনধারণ পর্যন্ত এইরূপ কৃষ্ণার্পণ বুদ্ধিতে অথবা ফলাশা ত্যাগ করিয়া করিতে পারিলে, পাপবাসনা কোথায় থাকিবে এবং কু-কর্মই বা কিরূপে ঘটিবে? কিংবা, "লোকোপযোগার্থ কর্ম কর", "লোকহিতার্থ আত্মসমর্পণ কর", এরূপ উপদেশেরও আর দরকার কেন হইবে? তখন তো 'আমি' ও 'লোক' এই দুইয়েরই সমাবেশ পরমেশ্বরে। এই দুইয়েই পরমেশ্বরের সমাবেশ হওয়ায় স্বার্থ ও পরার্থ এই দুই-ই কৃষ্ণার্পণরূপ পরমার্থের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যায়। কৃষ্ণার্পণ বুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম করিলে নিজের যোগক্ষেমেও বাধা পড়ে না, স্বয়ং ভগবান্‌ই এ আশ্বাস দিয়াছেন।" (৯।২২)
—গীতারহস্য, লোকমান্য তিলক

ভক্তিশাস্ত্র যাহাকে শ্রীকৃষ্ণার্পণ-পূর্বক কর্ম বলেন, অধ্যাত্মতত্ত্বে জ্ঞানমার্গে উহাই ব্রহ্মার্পণপূর্বক কর্ম (৪।২৪, ৫।১০ দ্রষ্টব্য)। ভক্তিমার্গে দ্বৈতভাব থাকে, 'আমি' জ্ঞান থাকে, যদিও উহা 'পাকা' আমি (১১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য); কিন্তু জ্ঞানমার্গে 'সমস্তই ব্রহ্ম'—এই ভাব বলবান্ থাকে, সাধক ব্রহ্মভূত হন, তাঁহার সমস্ত কর্ম ব্রহ্মকর্ম হয়।

২৮। এবং (এইরূপ) শুভাশুভফলৈঃ কর্মবন্ধনৈঃ (কর্মের শুভাশুভ ফলরূপ বন্ধন হইতে) মোক্ষ্যসে (মুক্ত হইবে), সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা (আমাতে কর্মসমর্পণ-রূপ যোগযুক্ত হইয়া) বিমুক্তঃ [সন্] (কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া) মাম্ উপৈষ্যসি (আমাকে প্রাপ্ত হইবে)।

সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা—সন্ন্যাসঃ কর্মণাং মদর্পণম্ স এব যোগঃ কর্মবন্ধঃ মোক্ষোপায়ঃ তেন যুক্তঃ আত্মা চিত্তং যস্য সঃ (শ্রীধর)—সন্ন্যাস অর্থাৎ ঈশ্বরে কর্মসমর্পণরূপ যে যোগ অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় তাহাতে যুক্তচিত্ত যাহার।

এইরূপ সর্বকর্ম আমাতে সমর্পণ করিলে শুভাশুভ কর্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। আমাতে সর্বকর্ম সমর্পণ-রূপ যোগে যুক্ত হইয়া কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। ২৮

মনে রাখিতে হইবে, এখানে সন্ন্যাস অর্থ কর্মত্যাগ নহে, ঈশ্বরে কর্ম-সমর্পণ। সুতরাং এই ভক্তি-যোগের বর্ণনায়ও কর্মত্যাগের কোন প্রসঙ্গ নাই। বস্তুতঃ, ভক্তি-যোগ ও কর্মযোগ অঙ্গাঙ্গীভূত। এই সম্পর্কে ৪।৪১ শ্লোকের 'যোগসংন্যস্তকর্মাণং' পদের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য, (অপিচ ৩।৩০ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। ২৮

সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥ ২৯

২৯। অহং সর্বেষু ভূতেষু সমঃ (সমান), মে (আমার) দ্বেষ্যঃ (অপ্রিয়) প্রিয়ঃ চ ন অস্তি (নাই); যে তু মাং ভক্ত্যা (ভক্তিপূর্বক) ভজন্তি (ভজনা করে) তে ময়ি (আমাতে) [থাকেন], অহমপি (আমিও) তেষু (তাহাদের মধ্যে) [থাকি]।

অনন্যা ভক্তিবলে সকলেই তাঁহাকে পাইতে পারে—
ভগবানের শরণ লও ২৯-৩৪

আমি সর্বভূতের পক্ষেই সমান। আমার দ্বেষ্যও নাই, প্রিয়ও নাই। কিন্তু যাঁহারা ভক্তিপূর্বক আমার ভজনা করেন তাঁহারা আমাতে অবস্থান করেন এবং আমিও সে সকল ভক্তেই অবস্থান করি। ২৯

রহস্য—ঈশ্বরে সমতা ও বৈষম্য

প্রঃ। শ্রীভগবান্ পূর্বে অনেক বার বলিয়াছেন, 'আমার ভক্ত আমার প্রিয়', 'আমার জ্ঞানী ভক্ত আমার অতীব প্রিয়' (৭।১৭, ১২।১৩-২০); 'আমাকে যাহারা দ্বেষ করে সেই নরাধমদিগকে অসুর-যোনিতে নিক্ষেপ করি' ইত্যাদি কথাও অন্যত্র আছে (১৬।১৮-১৯)। ইহাতে এই বুঝায় যে, তিনি ভক্তবৎসল, অসুর-বিদ্বেষী। এস্থলে কিন্তু বলা হইতেছে, 'আমি সর্বভূতে সমদর্শী ; আমার প্রিয়ও নাই, দেষ্যও নাই।' ইহা কি পরস্পর-বিরুদ্ধ কথা নহে ?

উঃ। একটি কথা মনে রাখা উচিত যে, ঈশ্বরের যদি কোনরূপ সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব হয়, তবে তাহা এই যে, যাঁহাতে পরস্পর-বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ হয়। তিনি নির্গুণ হইয়াও সগুণ হন কিরূপে ? অকর্তা হইয়াও জগৎকর্তা হন কিরূপে ? পরমেশ্বর সম, শান্ত, নির্বিকার—ইহাই অধ্যাত্ম-তত্ত্ব ; কিন্তু তিনিই আবার ভূতস্রষ্টা, ভূতধারক, ভূত-পালক, জীবের প্রভু, সখা, শরণ ও সুহৃৎ। তিনি নিঃসঙ্গ হইলেও জীব তাঁহার সহিত যখন দাস্য, সখ্যাদি ভাব স্থাপন করে, তখন তিনিও ঐ সকল ভাবে সংসৃষ্ট হন, সুতরাং স্বরূপতঃ সমদর্শী হইয়াও তত্তৎস্থলে ভক্তবৎসল ভাবেই প্রকাশিত হন। বস্তুতঃ এই যে ভক্ত-বাৎসল্য বা অসুর-বিদ্বেষ, ইহা তাঁহাতে নাই, কারণ তিনি দ্বন্দ্বাতীত। জীব তাঁহার সহিত যেরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করে, যেরূপ অন্তঃকরণ লইয়া, যেরূপ ভাব লইয়া তাঁহার নিকট আসে, সে সেইরূপ ভাবই প্রাপ্ত হয়—'যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ' (১৭।৩)। নির্মল স্ফটিকের নিকটে রক্তজবা রাখিলে স্ফটিক রক্তাভ দেখায়, নীলপদ্ম রাখিলে উহা নীলাভ হয়, কিন্তু স্বরূপতঃ স্ফটিক রক্তও নহে,

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥ ৩০

নীলও নহে। দুগ্ধপোষ্য শিশুর প্রতি স্নেহ-প্রীতি দেখাইলে সে তোমাকে দেখিয়া হাসিবে, ঘৃণা-বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করিলে সে তোমাকে দেখিয়া মুখ ফিরাইবে। শিশুর শুদ্ধ নির্মল অন্তঃকরণে রাগও নাই, দ্বেষও নাই। উহা তোমারই প্রীতি বা বিদ্বেষের প্রতিক্রিয়া। ভগবানের প্রীতি-বিদ্বেষও সেইরূপ জীবেরই প্রীতি বা বিদ্বেষের প্রতিক্রিয়া মাত্র। প্রহ্লাদ বুকভরা প্রীতি লইয়া তাঁহার শরণ লইলেন। হিরণ্যকশিপু বুকচেরা বিদ্বেষ লইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। পুত্রের প্রীতি ও পিতার বিদ্বেষ মূর্তিমান্ হইয়া নরসিংহ-রূপ ধারণ করিল; বিদ্বেষ-সিংহ অভক্তকে বিনাশ করিল, ভক্তবৎসল নরদেব ভক্তকে ক্রোড়ে লইলেন। এই নর ও সিংহ,—ভক্ত-রক্ষক ও অভক্ত-নাশক,—ভক্তের প্রীতি ও অভক্তের বিদ্বেষ-ভাবেরই প্রতিমূর্তি—উহা ভগবানের বৈষম্য প্রসূত নহে। মেঘ সর্বত্রই সমভাবে বারিবর্ষণ করে, কিন্তু কোন ক্ষেত্রে শস্য জন্মে, কোথাও জন্মে কণ্টকবৃক্ষ। উহার কারণ মেঘের পক্ষপাতিত্ব নহে, ক্ষেত্রের স্বভাব। বিদ্বেষের ফল বিদ্বেষ, প্রেমের প্রতিদান প্রেম, ইহা স্বভাবেরই নিয়ম। তাই অধ্যাত্ম-তত্ত্বে যদিও বলা হয়, 'নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম', তথাপি ভক্তিতত্ত্বে বলা হয়, 'অহং ভক্তপরাধীনো·· ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ'—ভাঃ ৯।৪।৬৩। উহার একটি অধ্যাত্মতত্ত্বের কথা, অন্যটি ভক্তিতত্ত্বের কথা। উভয়ই সত্য।

৩০। চেৎ (যদি) সুদুরাচারঃ অপি (অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তিও) অনন্যভাক্ (অনন্যচিত্ত হইয়া) মাং ভজতে (আমাকে ভজনা করে) সঃ সাধুঃ এব মন্তব্যঃ (তাহাকে সাধু বলিয়াই মনে করা উচিত), হি (যেহেতু) সঃ সম্যক্ ব্যবসিতঃ (উত্তম নিশ্চয়বুদ্ধি-সম্পন্ন)।

অনন্যভাক্—অনন্যভক্তিঃ (শঙ্কর)। অন্যং ন ভজতি ইতি অনন্যভাক। অপৃথক্ত্বেন পৃথগ্ দেবতাপি বাসুদেব এব ইতি বুদ্ধ্যা দেবতান্তরং ভক্তিমকুর্বন্ (শ্রীধর)—'বাসুদেবই সর্বদেবময়' এই জ্ঞানে একমাত্র আমাতেই ভক্তিমান্, অনন্যভজনশীল। **সম্যক্ব্যবসিতঃ**—শোভনং অধ্যবসায়ং কৃতবান্ (শ্রীধর), শ্রেষ্ঠ নিশ্চয়বান্ (মধুসূদন)।

অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্যচিত্ত (অনন্য-ভজনশীল) হইয়া আমার ভজনা করে, তাহাকে সাধু বলিয়া মনে করিবে। যেহেতু তাহার অধ্যবসায় উত্তম। ৩০

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥ ৩১

৩১। [সে ব্যক্তি] ক্ষিপ্রং (শীঘ্র) ধর্মাত্মা ভবতি (হয়), শশ্বৎ (নিত্য) শান্তিং নিগচ্ছতি (লাভ করে); হে কৌন্তেয়, মে ভক্তঃ ন প্রণশ্যতি (বিনষ্ট হয় না) [ইহা] প্রতিজানীহি (প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পার)।

প্রতিজানীহি—বাহুমুৎক্ষিপ্য নিঃশঙ্কং প্রতিজ্ঞাং কুরু (শ্রীধর)—কুতার্কিক লোক যদি এ-কথা না মানে তবে শপথ করিয়া বলিতে পার, 'একথা সত্য, সত্য' —এই ভাব।

ঈদৃশ দুরাচার ব্যক্তি শীঘ্র ধর্মাত্মা হয় এবং নিত্য শান্তি লাভ করে; হে কৌন্তেয়, তুমি সর্বসমক্ষে নিশ্চিত প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পার যে, আমার ভক্ত কখনই বিনষ্ট হয় না। ৩১

ভক্তি-স্পর্শমণি

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, অতি দুর্বৃত্তও যদি আমার ভজনা করে, তবে তাহাকে সাধু বলিয়া মনে করিবে। ইহার এরূপ অর্থ নয় যে, ভগবদ্ভক্ত দুরাচারী হইলেও সে ভগবানের প্রিয়ই থাকে। একথার তাৎপর্য এই যে, যাঁহার অন্তরে একবার ভক্তির উদয় হয়, তাঁহার অন্তঃকরণ নির্মল হইয়া যায়, তাঁহার দ্বারা আর পাপ-কর্ম সম্ভবপর হয় না। ভক্তিস্পর্শে অতি পাপীও সাধু হইয়া উঠে—"ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বৎ শান্তিং নিগচ্ছতি।"

"অতি পাপপ্রসক্তোঽপি ধ্যায়ন্নিমিষমচ্যুতম্।
ভূয়স্তপস্বী ভবতি পঙ্‌ক্তিপাবনপাবনঃ॥"

—"অতি পাপাসক্ত ব্যক্তিও যদি নিমেষমাত্র অচ্যুতের ধ্যান করেন, তবে তিনি তপস্বী বলিয়া পরিগণিত হন; তিনি যাঁহাদিগের মধ্যে উপবেশন করেন তাঁহারাও পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হন।"

নিমেষমাত্রে অসাধু সাধু হইয়া উঠে, একথা অবিশ্বাসীর বিশ্বাস হইবে না। কিন্তু ইহা অত্যুক্তি নহে। অন্ধকার গৃহে দীপ জ্বালিলে নিমেষমাত্রেই গৃহ আলোকিত হয়, মেঘাবরণ অপসৃত হইলে নিমেষমাত্রেই সূর্যরশ্মিতে জগৎ উদ্ভাসিত হয়, স্পর্শমণির সংস্পর্শে নিমেষমাত্রেই লোহখণ্ড সুবর্ণ হয়, ভক্তিস্পর্শেও মানুষ নিমেষমাত্রেই পবিত্র হইয়া যায়। ভক্তির এই পতিতপাবনী শক্তি আছে। কৃষ্ণসেবা, সাধুসঙ্গ, গুরুকৃপায় উহা লাভ হয়। মহাপুরুষগণ এই শক্তি সঞ্চারিত করিতে পারেন।

"তাঁহারা স্পর্শ দ্বারা, এমন কি, শুধু ইচ্ছামাত্র দ্বারা অপরের ভিতর ধর্মশক্তি সঞ্চারিত করিতে পারেন। তাঁহাদের শক্তিতে অতি হীনতম অধর্মচরিত্র ব্যক্তিগণ পর্যন্ত মুহূর্তের মধ্যে সাধুরূপে পরিণত হয়।" —স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীচৈতন্যকৃপায় কত পাপী-তাপী মুহূর্তমধ্যে নবজীবন প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা সকলে জ্ঞাত আছেন। তখন নামের সহিত শক্তি সঞ্চারিত হইত, তাহাতে লোক পাগল হইত। 'গৌর নিতাই প্রেম বিলায়' একথার অর্থ ইহাই। শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ ভক্তগণেরও অনেকের এ শক্তি ছিল।

ঠাকুর হরিদাস নির্জন কুটিরে হরিনাম জপ করিতেছেন। দুষ্টের প্ররোচনায় রূপসী বেশ্যা তাঁহার জপযজ্ঞ ভঙ্গ কামনায় তাঁহার কুটীরে উপস্থিত হইল। ঠাকুর বলিলেন, অপেক্ষা কর,—"সংখ্যা নাম সমাপ্তি যাবৎ না হয় আমার।" তারপর সাধুসঙ্গ ও নামের প্রভাবে যাহা হইবার তাহাই হইল, তাহার আর ফিরিতে হইল না।

"মাথা মুণ্ডি এক বস্ত্রে রহিলা সেই ঘরে। রাত্রি দিনে নাম গ্রহণ তিন লক্ষ করে॥ তুলসী সেবন করে চর্বণ উপবাস॥ ইন্দ্রিয় দমন হৈল প্রেম পরকাশ॥ প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈল পরম মহান্তী। বড় বড় বৈষ্ণব তাঁর দরশনে যান্তি॥"

নবদ্বীপের আতঙ্ক দুই ভাই—জগাই আর মাধাই।

"ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য, গোমাংস ভক্ষণ।
ডাকা চুরি পরগৃহ দহে সর্বক্ষণ॥
তারা নাহি করে হেন পাপ নাহি আর॥"

কিন্তু শেষে অকস্মাৎ একদিন কি হইল! তাহারা সোনা হইয়া গেল।

"পরম কঠোর তপ করয়ে মাধাই। ব্রহ্মচারী হেন খ্যাতি হইল তথাই।
নিশাকালে গঙ্গাস্নান করিয়া নির্জনে। দুই লক্ষ কৃষ্ণনাম লয় প্রতিদিনে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে নয়নে পড়ে জল।" ইত্যাদি।

ইহা কিরূপে হইল? এই স্পর্শমণির গুণে। তাই দেখি, সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ ধনলোভে বৃন্দাবনে দৌড়িলেন, সনাতন গোস্বামীর নিকট পার্থিব স্পর্শমণি পাইলেন; কিন্তু উহা লইয়া আর গৃহে ফিরিতে পারিলেন না। গোস্বামীর পাদমূলে লুণ্ঠিত হইয়া সেই অপার্থিব স্পর্শমণি যাচ্ঞা করিলেন—

"যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মান না মণি
তাহারি খানিক
মাগি আমি নত শিরে"— এত বলি নদীনীরে
ফেলিল মাণিক!

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥ ৩২

শাস্ত্রে পাপ-ক্ষালনের জন্য প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। জীবের পাপের সীমা নাই। শাস্ত্রেও বিধি-নিষেধের অন্ত নাই। সুতরাং প্রায়শ্চিত্তেরও নানা বিধান। গ্রহ-বিপ্রকে স্বর্ণদান হইতে তুষানলে জীবনদান পর্যন্ত কৃচ্ছ্র, অতিকৃচ্ছ্র, মহাকৃচ্ছ্র ইত্যাদি রূপ প্রায়শ্চিত্তের অসংখ্য বিধি-ব্যবস্থা। কৃচ্ছ্র-সাধনে চিত্তশুদ্ধি হয় সন্দেহ নাই; কিন্তু আন্তরিক অনুশোচনা ও ভগবদ্ভক্তির সহিত সংযুক্ত না হইলে উহা প্রাণহীন আনুষ্ঠানিক কসরৎ মাত্রে পর্যবসিত হয়। বরং দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে সুব্যবস্থিত না হইলে সামাজিক অত্যাচার বলিয়াই গণ্য হয়। সুবুদ্ধি রায় বাঙ্গালার রাজা ছিলেন—ভাগ্যদোষে রাজ্য গেল। মুসলমান মুলুকপতি মুখে জল ঢালিয়া দিয়া তাঁহার জাতি নষ্ট করিয়া দিলেন। তিনি প্রথমে এ দেশে, পরে কাশীতে যাইয়া

'প্রায়শ্চিত্ত পুঁছিলেন পণ্ডিতের স্থানে।
তারা কহে তপ্ত ঘৃত খাঙা ছাড় প্রাণে।'

কি বিপদ্! রাজা বিনা অপরাধে জাতি নাশ করিলেন, তবু দয়া করিয়া প্রাণটা রাখিয়াছিলেন। পণ্ডিত-সমাজ প্রাণনাশেরও ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

বেচারা আকুল হইয়া মহাপ্রভুর শরণ লইয়া উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। প্রভু কি ব্যবস্থা করিলেন?—

'প্রভু কহে ইঁহা হইতে যাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্তন॥
এক নামাভাসে তোমার পাপদোষ যাবে।
আর নাম হইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে॥'

তাহাই হইল। সুবুদ্ধি রায় নবজীবন পাইলেন।

৩২। হে পার্থ, যে অপি পাপযোনয়ঃ (পাপযোনিসম্ভূত, পাপিষ্ঠজন্মা) স্যুঃ (হয়) [যে অপি] স্ত্রিয়ঃ (স্ত্রীগণ), বৈশ্যাঃ, শূদ্রাঃ, তে অপি (তাহারাও) মাং ব্যপাশ্রিত্য (আমার আশ্রয় লইলে) হি (নিশ্চিত) পরাং গতিং (পরমগতি) যান্তি (প্রাপ্ত হয়)।

পাপযোনয়ঃ—পাপযোনি-সম্ভূত, নীচকুলজাত। এই শব্দটি স্ত্রী-শূদ্রাদির বিশেষণ নয়। অনেক অন্ত্যজ জাতি আছে যাহারা সাধারণতঃ পাপকর্মা বলিয়া পরিচিত। এই জন্য আধুনিক রাজবিধিতেও ইহাদিগকে criminal tribes

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥ ৩৩
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥ ৩৪

বলা হয়। এই সমস্ত লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়াই এই শব্দটি ব্যবহৃত। নিম্নোক্ত শুকদেব-বাক্যেও এইরূপ অর্থ-ই সমর্থিত হয়। "কিরাত-হূণান্ধ্র-পুলিন্দপুক্কসা আভীরকঙ্কা যবনাঃ খশাদয়ঃ। যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুদ্ধন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ।" (ভাঃ)

হে পার্থ, স্ত্রীলোক, বৈশ্য ও শূদ্র অথবা যাঁহারা পাপযোনিসম্ভূত অন্ত্যজ জাতি, তাঁহারাও আমার আশ্রয় লইলে নিশ্চয়ই পরমগতি প্রাপ্ত হন। ৩২

শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য স্ত্রী-শূদ্রাদির পক্ষে জ্ঞানযোগের সাহায্যে মুক্তি লাভ সম্ভবপর নহে। কিন্তু ভক্তিযোগ জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলের পক্ষেই সুখসাধ্য; ভাগবত ধর্মের ইহাই বিশেষত্ব। ইহাতে জাতিভেদ-জনিত অধিকারভেদ নাই।

৩৩। পুণ্যাঃ ব্রাহ্মণাঃ (পবিত্র ব্রাহ্মণগণ) তথা ভক্তাঃ রাজর্ষয়ঃ (ভক্ত রাজর্ষিগণ) [পরমগতি লাভ করিবেন] কিং পুনঃ (তাঁহার আর কথা কি), অনিত্যম্ (অধ্রুব) অসুখম্ (সুখশূন্য) ইমং লোকম্ (এই মর্ত্যলোককে) প্রাপ্য (পাইয়া) মাং ভজস্ব (আমার ভজনা কর)।

পুণ্যশীল ব্রাহ্মণ ও রাজর্ষিগণ যে পরম গতি লাভ করিবেন তাহাতে আর কথা কি আছে? অতএব তুমি (এই রাজর্ষি-দেহ লাভ করিয়া) আমার আরাধনা কর। কারণ এই মর্ত্যলোক অনিত্য এবং সুখশূন্য। ৩৩

৩৪। মন্মনাঃ (মদ্‌গতচিত্ত), মদ্ভক্তঃ (মৎসেবক), মদ্‌যাজী (আমার পূজাপরায়ণ) ভব (হও), মাং নমস্কুরু (আমাকে নমস্কার কর); [এইরূপ] মৎপরায়ণঃ (মদেকশরণ হইয়া) আত্মানং (অন্তঃকরণকে, মনকে) যুক্ত্বা (আমাতে সমাহিত করিয়া) মাম্ এব এষ্যসি (আমাকেই প্রাপ্ত হইবে)।

তুমি সর্বদা মনকে আমার চিন্তায় নিযুক্ত কর, আমাতে ভক্তিমান্ হও, আমার পূজা কর, আমাকেই নমস্কার কর। এইরূপে মৎপরায়ণ হইয়া আমাতে মন সমাহিত করিতে পারিলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। ৩৪

ভগবৎ-শরণাগতি—ঐকান্তিক ধর্ম

এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে যে রাজগুহ্য-রাজবিদ্যার কথা বলা হইয়াছে, এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ তাহাই বর্ণনা করা হইয়াছে এবং এই শেষ শ্লোকে তাহারই সারমর্ম কথিত হইল। ইহার স্থূল তাৎপর্য এই—একান্ত ভাবে ভগবানের শরণ লইয়া নিত্যযুক্ত হইয়া তাঁহার ভজনা করা এবং স্বধর্মরূপে ভৃত্যবৎ তাঁহার কর্ম সম্পাদন করা। ইহাই ঐকান্তিক ধর্ম বা ভাগবত ভক্তিযোগ। ১১শ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে এই কথারই পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে এবং তথায় 'মৎকর্মকৃৎ' এই কথা যোজনা করিয়া ঐকান্তিক ভক্তির সহিত নিষ্কাম কর্মযোগের সমন্বয় করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১২শ অধ্যায়ের ৬।৭।৮ শ্লোকে অর্জুনের প্রশ্নোত্তরে পুনরায় এই ভক্তি-যোগেরই স্পষ্ট উপদেশ দিয়া পরে উহার সাধনার উপায় এবং শ্রেষ্ঠ ভক্তের লক্ষণ বর্ণনা করা হইয়াছে। শেষ অধ্যায়ের ৬৩ শ্লোকে 'গুহ্যাৎ গুহ্যতর' বলিয়া প্রকারান্তরে এই উপদেশই দেওয়া হইয়াছে এবং পরিশেষে 'সর্বগুহ্যতম' বলিয়া ৬৪।৬৫।৬৬ শ্লোকে এই কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়া শ্রীভগবান্ উপসংহারে বলিয়াছেন, "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" ইহাই গীতার শেষ কথা ও সার কথা।

নবম অধ্যায়—বিশ্লেষণ ও সার-সংক্ষেপ

১—৩ জ্ঞানযুক্ত ভক্তিমার্গ প্রত্যক্ষ বোধগম্য ও সুখসাধ্য, অতএব রাজবিদ্যা ; ৪—৬ ঐশ্বরিক যোগ-সামর্থ্য ; ৭—১০ জগতের সৃষ্টি ও সংহার—শ্রীভগবান্ জগৎস্রষ্টা হইয়াও নির্লিপ্ত ; ১১—১২ ভগবানের অবজ্ঞাকারী ব্যক্তি পাষণ্ডী বা আসুরী ; ১৩—১৫ ভগবানের ভক্তের দৈবী প্রকৃতি ; ১৬—১৯ ঈশ্বরের বিশ্বানুগতা—তিনিই সব ; ২০—২১ যাগযজ্ঞাদির ফল অনিত্য ; ২২ যোগক্ষেমার্থও উহা প্রয়োজনীয় নহে, যোগক্ষেম ভক্তিদ্বারাও লভ্য ; ২৩—২৬ অন্য দেবতার পূজাও ঈশ্বরের পূজা, দেবতা ভাবনা করিলে ঈশ্বর লাভ হয় না—ভগবান্ ভক্তির কাঙ্গাল—দ্রব্যের নহে ; ২৭—২৮ ঈশ্বরে সর্বকর্মার্পণ, উহাতেই কর্মবন্ধ মোচন ; ২৯—৩৪ ঈশ্বর সকলের পক্ষেই সমান—ভক্তি স্পর্শমণি, অনন্যভাবে ভগবানের শরণ লওয়ার উপদেশ।

৭ম অধ্যায়ে যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা অর্থাৎ পরমেশ্বরের সমগ্র স্বরূপ এবং তাঁহাকে পাইবার উপায়স্বরূপ ভক্তিযোগতত্ত্ব বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে, তাহাই ৮ম অধ্যায়ে এবং এই অধ্যায়েও চলিয়াছে। ৮ম অধ্যায়ে আবার পরমেশ্বরের

নির্গুণ অক্ষর স্বরূপের বর্ণনা আছে এবং ভক্তিদ্বারাই সেই পরমপুরুষকে লাভ করা যায় ইহাও বলা হইয়াছে (৮।২২ শ্লোক)। কিন্তু অক্ষর ব্রহ্ম কিরূপে ভক্তির বিষয় হইতে পারে তাহা স্পষ্টীকৃত করা হয় নাই। এই অধ্যায়ে সেই ভক্তিযোগই বিস্তারিত উপদেশ করিবেন বলিয়া প্রথমেই শ্রীভগবান্ বলিলেন যে, ইহা সুখসাধ্য এবং প্রত্যক্ষাবগম্য, ইহাই সর্ববিদ্যার শ্রেষ্ঠ, সর্বগুহ্যতম বিদ্যা।

এই ভক্তিতত্ত্বের অবতারণার পূর্বে শ্রীভগবান্ আপনার নির্গুণ-সগুণ স্বরূপ বিস্তারিত বর্ণনা করিয়া বলিলেন,—আমি অব্যক্ত মূর্তিতে জগৎ ব্যাপিয়া আছি, আমি নির্গুণ নিঃসঙ্গ বলিয়া কিছুতেই লিপ্ত নহি অথচ আমি প্রকৃতি দ্বারাই জগৎ সৃষ্টি করি, আমিই সর্বভূতমহেশ্বর, আমি জীবের "গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।" কিন্তু অবিবেকী অসুরস্বভাব ব্যক্তিগণ আমার পরম ভাব না জানিয়াই আমাকে প্রাকৃত মনুষ্যবৎ মনে করে। ইহাদের ধর্মকর্ম নিষ্ফল, জ্ঞান নিরর্থক হয়। কিন্তু সাত্ত্বিক প্রকৃতির মহাত্মগণ আমাকে সর্বভূত-মহেশ্বর জানিয়াই অনন্যভাবে আমার ভজনা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ জ্ঞানযোগেও আমার উপাসনা করিয়া থাকেন। দ্বৈত-অদ্বৈত নানা ভাবেই আমার উপাসনা হয়। কেননা, আমি সর্বতোমুখ, সর্বাত্মা, সর্বস্বরূপ। কেহ কেহ স্বর্গাদি ফলকামনায় বৈদিক যাগযজ্ঞাদি-দ্বারাও আমার অর্চনা করিয়া থাকেন। এইরূপ যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানকারী সকাম ব্যক্তিগণ পুণ্যফলস্বরূপ স্বর্গাদি প্রাপ্ত হন বটে, কিন্তু মোক্ষ প্রাপ্ত হন না। কিন্তু আমার যে সকল ভক্ত অনন্যমনে নিত্যযুক্ত হইয়া আমার ভজনা করেন, তাঁহাদের যোগক্ষেম অর্থাৎ দেহাদি রক্ষার্থ প্রয়োজনীয় যাহা কিছু আমিই নির্বাহ করিয়া থাকি, তজ্জন্য যাগযজ্ঞাদি বা দেবতাদির আরাধনার প্রয়োজন হয় না।

আমার পূজার্চনায় বহুব্যয়সাধ্য উপকরণের প্রয়োজন নাই। আমি ভাবের ভিখারী, ভক্তির কাঙ্গাল, দ্রব্যের কাঙ্গাল নহি। আমার ভক্ত ভক্তিসহ আমাকে যাহা অর্পণ করেন আমি তাহাই গ্রহণ করি। আমার ভক্ত যাহা কিছু করেন সমস্তই আমাতে অর্পণ করেন। এইরূপ ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম করিলে তাহাতে কর্মবন্ধন হয় না। আমার নিকট পাপী ও পুণ্যবানে পার্থক্য নাই। অত্যন্ত দুরাচারীও যদি ভক্তিপূর্বক অনন্যভাবে আমাকে ভজনা করে, তবে সে-ও অচিরাৎ ধর্মাত্মা হইয়া যায় এবং পরম শান্তি লাভ করে। ভক্তি স্পর্শমণি। উহা যাহাকে স্পর্শ করে তাহাই সুবর্ণ হয়।

অতএব তুমি আমাতে ভক্তিমান্ হও, আমার পূজা কর, আমাকে নমস্কার কর—এইরূপে মৎপরায়ণ হইয়া যোগযুক্ত হইলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।

এই অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য যে বিষয়-বস্তু তাহাকে 'রাজগুহ্য-রাজবিদ্যা' বলা হইয়াছে (৯।২)। ইহা প্রকৃতপক্ষে ভক্তিযোগ। কেননা, ভক্তি-যোগের যে সকল বিশিষ্ট লক্ষণ, তাহা প্রায় সমস্তই এই অধ্যায়ের বিভিন্ন শ্লোকে উল্লিখিত আছে। কয়েকটি শ্লোকে পরমেশ্বরের নির্গুণ-সগুণ উভয়বিধ স্বরূপের বর্ণনা আছে এবং অন্যান্য শ্লোকেও সগুণ স্বরূপের উপাসনার কথাই উল্লিখিত হইয়াছে। স্মরণ, মনন, কীর্তন, ভজন, অনন্যশরণ, ঈশ্বরে সর্ব-কর্মার্পণ প্রভৃতি ভক্তিমার্গের যে সকল বিশিষ্ট সাধন, তাহা সকলই এ অধ্যায়ে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

ভক্তিমার্গের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ উহার উদারতা ও সার্বজনীনতা। ইহাতে ব্রাহ্মণ-শূদ্রাদি-ভেদে অধিকার-ভেদ নাই। ইহাতে স্ত্রী-পুরুষ ও জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সকলেরই সমান অধিকার। এই অধ্যায়ের ৩০-৩২ শ্লোকে ভক্তিমার্গের এই বিশেষত্বটি সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। জ্ঞানমার্গাদি সাধন-প্রণালীতে দেখা যায়, কথায় কথায় নানারূপ অধিকার-বিচার। ভক্তি-মার্গে সকলের সমান অধিকার ; ইহাতে একমাত্র অনধিকারী শ্রদ্ধাহীন, অভক্ত, ভগবদ্‌বিদ্বেষী ব্যক্তিগণ ; তাহাদিগকে ইহা উপদেশ দেওয়া কর্তব্য নহে (১৮।৬৭)। এই হেতু ইহাকে পরম গুহ্যশাস্ত্র বলা হইয়াছে।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে **রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য**-যোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

দশম অধ্যায়

বিভূতি-যোগ

শ্রীভগবান্ উবাচ

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১
ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্বশঃ ॥ ২

১। শ্রীভগবান্ উবাচ—[হে] মহাবাহো, ভূয়ঃ এব (পুনরায়) মে পরমং বচঃ (আমার উৎকৃষ্ট বাক্য) শৃণু (শ্রবণ কর), যৎ প্রীয়মাণায় তে (যাহা প্রীতিমান্ তোমাকে) অহং (আমি) হিতকাম্যয়া (হিতার্থ) বক্ষ্যামি (বলিব)।

পরমেশ্বরের অনাদি স্বরূপজ্ঞানে মুক্তি ১-৩

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে মহাবাহো, তুমি আমার বাক্য শ্রবণে প্রীতি লাভ করিয়াছ, আমি তোমার হিতার্থ পুনবায় উৎকৃষ্ট কথা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। ১

সপ্তম, অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে পরমেশ্বরেব স্বরূপ বর্ণনপ্রসঙ্গে তাঁহার নানা ব্যক্তরূপ বা বিভূতির কথা সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। উহাই এই অধ্যায়ে সবিস্তারে বলিলেন।

২। সুরগণাঃ (দেবতাগণ) মে প্রভবং (আমাব প্রভাব বা উৎপত্তি) ন বিদুঃ (জানেন না). মহর্ষয়ঃ চ ন (মহর্ষিরাও জানেন না); হি (কেননা) অহং দেবতানাং মহর্ষীণাং চ (দেবতাদিগের এবং মহর্ষিদিগেরও) সর্বশঃ (সর্বপ্রকাবে) আদিঃ (আদি কারণ)।

প্রভবং—প্রভবং প্রভুশক্ত্যাতিশয়ং উৎপত্তিং বা (শঙ্কর)—ইহার দুই অর্থ হইতে পারে—(১) প্রভাব, (২) উৎপত্তি। সর্বশঃ—সর্বপ্রকারৈঃ উৎপাদকত্বেন বুদ্ধ্যাদি প্রবর্তকত্বেন চ। অর্থাৎ আমিই উৎপাদক, আমিই বুদ্ধ্যাদির প্রবর্তক, এইরূপ সকল বিষয়েই মূলকারণ আমি ; সুতরাং আমার অনুগ্রহ বিনা কেহই আমার প্রভাব বা উৎপত্তি-তত্ত্ব জানিতে পারে না।

কি দেবগণ, মহর্ষিগণ, কেহই আমার প্রভাব বা উৎপত্তির বিষয় জ্ঞাত নহেন। কেননা আমি দেব ও মহর্ষিগণের সর্বপ্রকারেই আদিকারণ। ২

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩
বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥ ৪
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্‌বিধাঃ ॥ ৫

ঋগ্‌বেদীয় নাসদীয় সূক্তের ঋষি আদি কারণ সম্বন্ধে ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন—'অর্বাগ্ দেবা অস্য বিসর্জনেনাথ কো বেদ যত আবভূব' (ঋক্ ১০।১।৯৬),—দেবতারা এই বিসর্গের (সৃষ্টির) পরে হইল। আবার উহা যেখান হইতে নিঃসৃত হইল তাহা কে জানিবে ?

৩। যঃ (যিনি) মাম্ (আমাকে) অনাদিম অজম্ (জন্মরহিত) লোকমহেশ্বরং চ (ও সর্বলোকের মহেশ্বর) বেত্তি (জানেন) সঃ মর্ত্ত্যেষু (মনুষ্যমধ্যে) অসংমূঢ়ঃ (মোহশূন্য হইয়া) সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে (সর্বপাপ হইতে মুক্ত হন)।

যিনি জানেন যে আমার আদি নাই, জন্ম নাই, আমি সর্বলোকের মহেশ্বর, মনুষ্যমধ্যে তিনি মোহশূন্য হইয়া সর্বপাপ হইতে মুক্ত হন। ৩

৪।৫। বুদ্ধিঃ, জ্ঞানম্, অসংমোহঃ (অব্যাকুলতা), ক্ষমা, সত্যং, দমঃ (বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম), শমঃ (চিত্ত-সংযম), সুখং, দুঃখং, ভবঃ (উৎপত্তি), অভাবঃ (বিনাশ) ভয়ম্, অভয়ংচ, অহিংসা, সমতা, তুষ্টিঃ, তপঃ, দানং, যশঃ, অযশঃ, ভূতানাং (প্রাণিগণের) পৃথগ্‌বিধাঃ (বিভিন্ন, ভিন্ন ভিন্ন) ভাবাঃ (ভাবসমূহ) মত্তঃ এব (আমা হইতে) ভবন্তি (উৎপন্ন হয়)।

বুদ্ধি—অন্তঃকরণের সূক্ষ্মার্থ বিবেচনা-সামর্থ্য (শঙ্কর)। **জ্ঞান**—বুদ্ধিদ্বারা আত্মা ও অনাত্মাদি পদার্থের বোধ। **অসংমোহ**—কর্তব্যাদি বিষয়ে ব্যাকুলতার অভাব (মধুসূদন)। **সমতা**—মিত্রামিত্র, রাগদ্বেষাদিতে সমচিত্ততা।

ভগবানের বিভূতি ও যোগৈশ্বর্য—উহা জানিয়া ভজনা করিলে তাঁহার কৃপায় জ্ঞানলাভ হয় ৪-১১

বুদ্ধি, জ্ঞান, কর্তব্য বিষয়ে অব্যাকুলতা, ক্ষমা, সত্য, দম, শম, সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, ভয়, অভয়, অহিংসা, রাগদ্বেষাদি বিষয়ে সমচিত্ততা, সন্তোষ, তপঃ, দান এবং যশ ও অযশ—প্রাণিগণের এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাব (অবস্থা) আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ৪।৫

তিনিই সকল অবস্থা, সকল ভাব, সকল বৃত্তির মূল কারণ। তাহাই এই দুইটি শ্লোকে বলা হইয়াছে।

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্‌ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ॥ ৬
এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৭

৬। সপ্ত মহর্ষয়ঃ (সপ্ত মহর্ষি), পূর্বে চত্বারঃ (পূর্ববর্তী চারিজন), তথা মনবঃ (ও মনুগণ) মদ্ভাবাঃ (আমার প্রভাবসম্পন্ন), মানসাঃ জাতাঃ (আমার সঙ্কল্প হইতে উদ্ভূত) লোকে (এই জগতে) ইমাঃ (এই সকল) যেষাং প্রজাঃ (যাহাদের সন্তান-সন্ততি)।

সপ্ত মহর্ষি—মরীচি, অঙ্গিরস, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ (মহাভাঃ, শান্তি ৩৩৫।২৮-২৯, ৩৪০।৪৫ ; মতান্তরে ভৃগু, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু। **পূর্বে চত্বারঃ**—পূর্ববর্তী চারি জন। টীকাকারগণের অনেকেই বলেন, ইঁহারা সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার, এই চারি মহর্ষি ; কিন্তু ইঁহারা সকলেই চিরকুমার ছিলেন, প্রজার সৃষ্টি করেন নাই। সুতরাং ইঁহাদিগের পক্ষে—"যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ" একথা খাটে না। লোকমান্য তিলক বলিলেন,—ইঁহারা বাসুদেব (আত্মা), সঙ্কর্ষণ (জীব), প্রদ্যুম্ন (মন) ও অনিরুদ্ধ (অহঙ্কার), এই চারি মূর্তি বা 'চতুর্ব্যূহ'। মহাভারতে নারায়ণীয় বা ভাগবত ধর্ম-বর্ণনায় এই চতুর্ব্যূহের উল্লেখ আছে এবং গীতায়ও এই ভাগবত-ধর্মই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এখানে বলা হইতেছে যে, এই চারি ব্যূহ এক সর্বতঃপূর্ণ বাসুদেবেরই বিভাব। **মনবঃ**—চতুর্দশ মনু, যথা—স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি এবং ইন্দ্রসাবর্ণি। **মদ্ভাবাঃ**—মচ্চিন্তনপরাঃ, তৎ-প্রভাবেনোপলব্ধমজ্‌জ্ঞানৈশ্বর্যশক্তয় ইত্যর্থঃ (বলরাম); আমার চিন্তাপরায়ণ এবং তৎপ্রভাবে আমার জ্ঞানৈশ্বর্যশক্তি-সম্পন্ন।

ভৃগু প্রভৃতি সপ্তমহর্ষি, তাঁহাদের পূর্ববর্তী চারি জন মহর্ষি (অথবা সঙ্কর্ষণাদি চতুর্ব্যূহ) এবং স্বায়ম্ভুবাদি মনুগণ,—ইঁহারা সকলেই আমার মানসজাত এবং আমার জ্ঞানৈশ্বর্যশক্তিসম্পন্ন ; জগতের সকল প্রজা তাঁহাদিগ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ৬

৭। যঃ মম এতাং বিভূতিং যোগংচ (যোগৈশ্বর্য) তত্ত্বতঃ (যথার্থরূপে) বেত্তি (জানেন) সঃ অবিকম্পেন যোগেন (নিশ্চল যোগদ্বারা) যুজ্যতে (যুক্ত হন) অত্র ন সংশয়ঃ (ইহাতে সন্দেহ নাই)।

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ ৮
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ৯

যিনি আমার এই বিভূতি (ভৃগু-মন্বাদি) এবং যোগৈশ্বর্য যথার্থ-রূপে জানেন, তিনি মৎভক্তিলক্ষণ স্থির যোগ লাভ করেন এবং আমাতেই সমাহিতচিত্ত হন, তাহাতে সংশয় নাই। ৭

যোগেন—সম্যগ্ দর্শনেন, যুজ্যতে যুক্তো ভবতি (শ্রীধর); বাসুদেবই সমস্ত, এইরূপ সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়া আমাতেই সমাহিতচিত্ত হন।

যোগঞ্চ—সৃষ্টি-কৌশল, সামর্থ্য, যোগৈশ্বর্য (২৮৫পৃঃ ৭।২৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। (এই শ্লোকে যোগ শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে)।

৮। অহং সর্বস্য **প্রভবঃ** (সমস্ত জগতের উৎপত্তি হেতু); **মত্তঃ** (আমা হইতে) সর্বং প্রবর্ততে (সমস্ত প্রবর্তিত হয়) ইতি **মত্বা** (ইহা জানিয়া) বুধাঃ (জ্ঞানিগণ) ভাবসমন্বিতাঃ (প্রেমাবিষ্ট হইয়া) মাং **ভজন্তে** (আমাকে ভজনা করেন)।

আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তির কারণ। আমা হইতে সমস্ত প্রবর্তিত হয়; বুদ্ধিমান্‌গণ ইহা জানিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া আমার ভজনা করেন। ৮

ভাবসমন্বিতাঃ—ভাবেন প্রেম্ণা সমন্বিতাঃ (বলরাম)।

৯। মচ্চিত্তাঃ (মদ্গতচিত্ত), মদ্গতপ্রাণাঃ (মদ্গতজীবন) মাং পরস্পরম্ বোধয়ন্তঃ (আমার কথা পরস্পরকে বুঝাইয়া), নিত্যং কথয়ন্তঃ চ (এবং সর্বদা আমার কথা কীর্তন করিয়া) তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ (সন্তোষ ও সুখ লাভ করিয়া থাকেন)।

মদ্গতপ্রাণাঃ—মাং বিনা প্রাণান্ ধর্তুমসমর্থাঃ (বিশ্বনাথ)।

যাঁহাদিগের চিত্ত আমাতেই অর্পিত, যাঁহাদের প্রাণ মদ্গত (আমাকে ভিন্ন যাঁহারা প্রাণধারণে অসমর্থ), এইরূপ ভক্তগণ পরস্পরকে আমার কথা বুঝাইয়া এবং সর্বদা আমার কীর্তন করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করেন। তাঁহাদের আর কোন অভাব থাকে না, সুতরাং তাঁহারা পরম প্রেমানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। ৯

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ ১০

কথামৃত

ভক্তগণ ভগবানের স্বরূপ চিন্তা ও লীলারসাস্বাদনে সতত লুব্ধচিত্ত। তাঁহারা পরস্পর তদ্বিষয় আলাপ করিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন, ক্রমে বিষয় তাঁহাদের নিকট বিষময় হইয়া উঠে, শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের নিকট মধুময় হন।

"তৎকথামৃতপাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ।
কুর্বন্তি কৃতিনোঽকৃচ্ছ্রং চতুর্বর্গং তৃণোপমম্॥"

—যে কৃতী ব্যক্তিগণ মহানন্দে কৃষ্ণকথাসাগরে বিহার করেন, তাঁহারা কৃচ্ছ্রলব্ধ চতুর্বর্গকে অনায়াসে তৃণবং তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারেন।

ভগবান্ শ্রীচৈতন্য যখন ভগবদ্ভাব লুকাইয়া ভক্তভাবে 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া করুণ স্বরে রোদন করিতেন, তখন বোধ হইত যেন শ্রীকৃষ্ণকে না পাইলে তদ্দণ্ডেই তাঁহার শরীর বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। তাঁহারই লীলাপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে,—"আপনি আচরি ধর্ম লোকেরে শিখায়।" বস্তুতঃ, কৃষ্ণকথায় কি মাধুর্য, 'মচ্চিত্ত' ও 'মদ্গতপ্রাণ' হওয়া কাহাকে বলে, তাহা ভক্তভাবে একমাত্র তিনিই জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। রথাগ্রে নৃত্যকালে রাজা প্রতাপরুদ্রের দেহ স্পর্শ হওয়াতে তিনি 'বিষয়ি-স্পর্শ' হইল বলিয়া আপনাকে বার বার ধিক্কার দিয়াছিলেন, সেই রাজাই যখন সার্বভৌমের উপদেশে প্রভুর পাদ-সম্বাহন করিতে করিতে শ্রীভাগবত হইতে লীলাকথার আবৃত্তি করিতে লাগিলেন, তখন—

"শুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার। বোল বোল বলি উচ্চে বলে বার বার॥ 'তব কথামৃতং' শ্লোক রাজা যে পড়িল। উঠি প্রেমাবেশে প্রভু আলিঙ্গন দিল। প্রভু কহে কে তুমি করিলে মোর হিত। আচম্বিতে আসি পিয়াও কৃষ্ণলীলামৃত।" শ্লোকটি এই—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন,—তপ্ত জীবের জীবনস্বরূপ, কবিগণ কর্তৃক স্তুত, পাপনাশন, শ্রবণ-মঙ্গল, শান্ত মধুর অমৃত মদিরাস্বরূপ তোমার লীলাকথা পৃথিবীতলে যাঁহারা আবৃত্তি করেন তাঁহারা ভূরিদ (বহুদাতা, আমাদিগের জীবনদাতা অথবা সুকৃতী)। —ভাগবত ১০।৩১।৯

১০। সততযুক্তানাং (আমাতে সতত আসক্তচিত্ত) প্রীতিপূর্বকং ভজতাং (প্রীতিপূর্বক আমার ভজনাকারী) তেষাং (তাহাদিগের) তং বুদ্ধি-যোগং

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১১

(সেইরূপ বুদ্ধিযোগ) দদামি (প্রদান করি), যেন (যাহা দ্বারা) তে (তাঁহারা) মাম্ (আমাকে) উপযান্তি (প্রাপ্ত হইয়া থাকেন)।

বুদ্ধিযোগং—বুদ্ধিঃ মৎতত্ত্ববিষয়ং সম্যগ্ দর্শনং তেন যোগো বুদ্ধিযোগস্তং (মধুসূদন)—মৎতত্ত্ববিষয়ক সম্যক্ জ্ঞান। অথবা "বুদ্ধিরূপ যোগ বা উপায়"(শ্রীধর)।

যাঁহারা সতত আমাতে চিত্তার্পণ করিয়া প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করেন, সেই সকল ভক্তকে আমি ঈদৃশ বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যদ্দ্বারা তাঁহারা আমাকে লাভ করিয়া থাকেন। ১০

১১। তেষাম্ অনুকম্পার্থম্ এব (তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহবশতঃই) অহম্ (আমি) আত্মভাবস্থঃ (তাহাদিগের অন্তঃকরণে অবস্থিত হইয়া) ভাস্বতা জ্ঞানদীপেন (উজ্জ্বল জ্ঞানরূপ দীপদ্বারা) অজ্ঞানজং তমঃ (অজ্ঞান-জনিত অন্ধকার) নাশয়ামি (নাশ করি)।

আমার সেই ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহার্থ তাঁহাদের অন্তঃকরণে অবস্থিত হইয়া উজ্জ্বল জ্ঞানরূপ দীপদ্বারা তাহাদের অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট করি। ১১

পরা ভক্তি ও পরা বিদ্যা এক

শ্রীভগবান্ পূর্বে বলিয়াছেন, যাহারা আমাকে আশ্রয় করে তাহারাই আমার সুদুস্তরা মায়া অতিক্রম করিতে পারে (৭।১৪ শ্লোক)। এস্থলে সেই কথাই বলা হইল যে, যাঁহারা অনন্যভক্তি যোগে তাঁহার ভজনা করেন, তাঁহারা সেই ভক্তিবলেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মায়ামোহনির্মুক্ত হইয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হন। যাঁহারা পূর্বে নিরক্ষর অজ্ঞ বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাঁহারাও ঐকান্তিক ভক্তিসাধনায় পরমতত্ত্বজ্ঞানী বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

"বস্তুতঃ পরা ভক্তি ও পরা বিদ্যা এক। যখন মানুষের হৃদয়ে এই পরানুরাগের উদয় হয়, তখন সে নিজ মনে ভগবান ব্যতীত অন্য কোন চিন্তাকে স্থান দিবে না। তখন তাহার আত্মা অভেদ্য পবিত্রাবরণে আবৃত থাকিবে এবং মানসিক ও ভৌতিক সর্বপ্রকার বন্ধনকে অতিক্রম করিয়া শান্ত ও মুক্ত ভাব ধারণ করিবে।" —স্বামী বিবেকানন্দ

অর্জুন উবাচ

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥ ১২
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে॥ ১৩
সর্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ॥ ১৪
স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে॥ ১৫

১২-১৩। অর্জুনঃ উবাচ—ভবান্ (আপনি) পরং ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম) পরং ধাম (আশ্রয়) পরমং পবিত্রং ; সর্বে ঋষয়ঃ (সকল ঋষিরা) দেবর্ষি নারদঃ তথা অসিতঃ দেবলঃ ব্যাসঃ চ, ত্বাং (তোমাকে) শাশ্বতং (নিত্য) পুরুষং, দিব্যম্ (স্বপ্রকাশ) আদিদেবম্ (দেবগণের আদি), অজং (জন্মরহিত), বিভুম্ (সর্বব্যাপী) আহুঃ (বলিয়া থাকেন), স্বয়ং চ এব (তুমি নিজেও) মে ব্রবীষি (আমাকে বলিতেছ)।

ভগবানের বিভূতি শ্রবণার্থ অর্জুনের প্রার্থনা ১২-১৮

অর্জুন বলিলেন—(আপনি) তুমি পরব্রহ্ম, পরম ধাম, পরম পবিত্র। ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ ও অসিত, দেবল এবং ব্যাস প্রভৃতি আপনাকে নিত্য-পুরুষ, স্বয়ংপ্রকাশ, আদিদেব, জন্মরহিত ও সর্বব্যাপী বিভু বলেন। তুমি স্বয়ংও আমাকে তাহাই বলিতেছ। ১২-১৩

১৪। হে কেশব, মাং যৎ বদসি (বলিতেছ) এতৎ সর্বম্ ঋতং (সত্য) মন্যে (স্বীকার করিতেছি), [যেহেতু] হে ভগবন্, তে (তোমার) ব্যক্তিং (প্রভাব বা আবির্ভাব) দেবাঃ দানবাঃ চ ন বিদুঃ (জানেন না)।

ব্যক্তিং—প্রভবং (শঙ্করঃ), প্রভাবং (মধুসূদন)। অস্মদনুগ্রহার্থম্ ইয়ম্ অভিব্যক্তিরিতি (শ্রীধর)—"আমাদিগের অনুগ্রহার্থ তোমার এই যে আবির্ভাব উহার তত্ত্ব।"

হে কেশব, তুমি যাহা আমাকে বলিতেছ সে সকল সত্য বলিয়া মানি ; কারণ, হে ভগবন্, কি দেব, কি দানব, কেহই তোমার প্রভাব (বা আবির্ভাবতত্ত্ব) জানেন না (আমি ক্ষুদ্র মনুষ্য উহা কি বুঝিব?)। ১৪

১৫। হে পুরুষোত্তম, হে ভূতভাবন (ভূতসমূহের নিয়ন্তা), হে ভূতেশ, হে দেবদেব (দেবতাদিগেরও আরাধ্য দেবতা), জগৎপতে (বিশ্বপালক), ত্বং স্বয়ম্ এব আত্মনা (আপনাদ্বারা) আত্মানং (আপনাকে) বেত্থ (জান)।

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যাহ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬
কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া ॥ ১৭

হে পুরুষোত্তম, হে ভূতভাবন, হে ভূতেশ, হে দেবদেব, হে জগৎপতে, তুমি আপনি আপন জ্ঞানে আপন স্বরূপ জান। (তোমার স্বরূপ আর কেহ জানে না)। ১৫

১৬। ত্বং (তুমি) যাভিঃ বিভূতিভিঃ (যে যে বিভূতিদ্বারা) ইমান্ লোকান্ (এই লোকসমূহ) ব্যাপ্য তিষ্ঠসি (ব্যাপিয়া রহিয়াছ), [সেই] দিব্যাঃ আত্মবিভূতয়ঃ (দিব্য নিজ বিভূতিসকল) অশেষেণ হি (বিস্তৃতরূপে) বক্তুম্ অর্হসি (বলিতে যোগ্য হও)।

তুমি যে যে বিভূতিদ্বারা সর্বলোক ব্যাপিয়া রহিয়াছ তাহা তুমিই বলিতে সমর্থ। সে সকল বিস্তৃতরূপে আমাকে কৃপাপূর্বক বল। ১৬

১৭। হে যোগিন্, অহং (আমি) কথং (কি প্রকারে) ত্বাং (তোমাকে) সদা পরিচিন্তয়ন্ (সর্বদা চিন্তা করিয়া) বিদ্যাম্ (জানিতে পারি)? হে ভগবন্, কেষু কেষু ভাবেষু চ (এবং কোন্ কোন্ পদার্থে) ময়া (আমাকর্তৃক) চিন্ত্যঃ অসি (চিন্তনীয় হও)?

যোগিন্—যোগেশ্বর—অলৌকিক সৃষ্টি-কৌশল ও ঐশ্বর্যাদি গুণসম্পন্ন। (৭।২৪ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য, ২৮৩ পৃষ্ঠা)।

হে যোগিন্, কি প্রকারে সতত চিন্তা করিলে আমি তোমাকে জানিতে পারি? হে ভগবন্, আমি তোমাকে কোন্ কোন্ পদার্থে কি ভাবে চিন্তা করিব, তাহা বল। ১৭

অবতার, আবেশ, বিভূতি—এই ত্রিবিধ ভাবেই ঐশী শক্তির অভিব্যক্তি হয়; ভক্তিশাস্ত্রে নানাবিধ অবতারের উল্লেখ আছে; যেমন, পুরুষ অবতার, (সঙ্কর্ষণাদি), লীলাবতার (মৎস্য-কূর্মাদি); যুগাবতার ইত্যাদি (চৈঃ চঃ মধ্য ২০)। যখন কোন মহাপুরুষে ঈশ্বরের শক্তিবিশেষের বিশেষ অভিব্যক্তি হয়, তখন তাঁহাকে **আবেশ** বলে; যেমন—সনকাদিতে জ্ঞানশক্তি, নারদে ভক্তিশক্তি, অনন্তে ভূধারণশক্তি ইত্যাদি। ইঁহাদিগকে শক্ত্যাবেশ অবতারও বলা হয়।

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্॥ ১৮

'জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দনঃ।
ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ'॥ —লঘু ভাগবতামৃত

—যে সকল মহাপুরুষে জ্ঞানশক্তি আদি কলাদ্বারা জনার্দন আবিষ্ট হন, সেই মহাত্মগণকে আবেশ বলা হয়।

এতদ্ব্যতীত আধারবিশেষে ঐশী শক্তির সাময়িক আবেশও হয়। শ্রীচৈতন্যাবতারে এই সাময়িক আবেশ বা প্রকাশ বিশেষভাবে প্রকটিত দেখা যায়।

বিশ্বে সর্বত্রই ঐশী শক্তিরই প্রকাশ, কিন্তু যাহা কিছু অতিশয় ঐশ্বর্যযুক্ত, শ্রীসম্পন্ন বা শক্তিসম্পন্ন তাহাতেই তাঁহার শক্তির বিশেষ অভিব্যক্তি কল্পনা করা হয়। ইহাকেই বিভূতি বলে। বলা বাহুল্য, বিভূতি ঈশ্বর নহেন; সর্বশক্তিমান্ সর্বব্যাপী ঈশ্বরের শক্তির বিকাশ নানা বস্তুতে দেখিয়া তাঁহাকে চিন্তা করিবার, মনে রাখিবার জন্যই ১৭শ শ্লোকে অর্জুনের এই বিভূতি-বিষয়ক প্রশ্ন। সর্বত্র ঈশ্বর আছেন ইহা জানা এক কথা, এবং বিভূতিকেই ঈশ্বর জ্ঞান করা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা (৭।২০-২৫, ৯।২২-২৫ দ্রষ্টব্য)।

'একটি বিড়ালের মধ্যে ঈশ্বর দর্শন—সে ত খুব ভাল কথা—তাহাতে কোন বিপদাশঙ্কা নাই, বিড়ালের বিড়ালত্ব ভুলিতে পারিলেই আর কোন গোল নাই, কারণ তিনিই সব। কিন্তু বিড়ালরূপী ঈশ্বর প্রতীক মাত্র।'—স্বামী বিবেকানন্দ

১৮। হে জনার্দন, আত্মনঃ (স্বীয়) যোগং বিভূতিং চ বিস্তরেণ (বিস্তার-পূর্বক) ভূয়ঃ কথয় (আবার বল); হি (কেননা) অমৃতম্ (তোমার অমৃতোপম বচন) শৃণ্বতঃ (শ্রবণ করিয়া) মে তৃপ্তিঃ ন অস্তি (আমার তৃপ্তি হইতেছে না).

যোগং—৭।২৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। ভূয়ঃ—পুনরায়। পূর্বে সংক্ষেপে বিভূতিসকল একবার বলা হইয়াছে (৭।৮-১২)। এই হেতু এস্থলে 'পুনরায়' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

হে জনার্দন, তুমি পুনরায় তোমার যোগৈশ্বর্য ও বিভূতি-সকল আমাকে বিস্তৃতরূপে বল। যেহেতু তোমার অমৃতোপম বচন শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না। ১৮

শ্রীভগবান্ উবাচ

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥ ১৯
অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ২০
আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১

১৯। শ্রীভগবান্ উবাচ,—হন্ত (আচ্ছা), হে কুরুশ্রেষ্ঠ, দিব্যাঃ আত্ম-বিভূতয়ঃ (দিব্য নিজ বিভূতিসকল) প্রাধান্যতঃ (প্রধান প্রধান ভাবে) তে (তোমাকে) কথয়িষ্যামি (বলিব); হি (যেহেতু) মে বিস্তরস্য (আমার বিভূতিবাহুল্যের) অন্তঃ নাস্তি (অন্ত নাই)।

হন্ত—এই পদটি আশ্বাস, অনুমোদন বা অনুকম্পাসূচক।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, আচ্ছা, আমার প্রধান প্রধান দিব্য বিভূতিসকল তোমাকে বলিতেছি। কারণ, আমাব বিভূতি-বাহুল্যের অন্ত নাই। (সুতরাং সংক্ষেপে বলিতেছি)। ১৯

সংক্ষেপে বিভূতি-বর্ণন ১৯-৪২

শ্রীগীতার এই অধ্যায়ের বিভূতি বর্ণনার অনুসরণেই শ্রীভাগবতের ১১শ স্কন্ধে বিভূতি বর্ণনা করা হইয়াছে। (ভাঃ ১১।১৬ অঃ)

২০। হে গুড়াকেশ (অর্জুন), সর্বভূতাশয়স্থিতঃ (সর্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত) আত্মা অহম্ (আমি), অহম্ এব (আমিই) ভূতানাম (সর্বভূতের) আদিঃ (উৎপত্তি) মধ্যম্ (স্থিতি) অন্তঃ চ (ও সংহারস্বরূপ)।

গুড়াকেশ—অর্জুন (১।২৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

হে অর্জুন, সর্বভূতের হৃদয়স্থিত আত্মা (প্রত্যক্ চৈতন্য) আমিই। আমিই সর্বভূতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারস্বরূপ (অর্থাৎ সৃষ্টি স্থিতি ও লয়কর্তা)। ২০

২১। অহম্ আদিত্যানাং (আদিত্যগণের মধ্যে) বিষ্ণুঃ, জ্যোতিষাম্ (জ্যোতিষ্মান্দিগের মধ্যে) অংশুমান্ (রশ্মিমান্) রবিঃ, মরুতাং (বায়ুগণের মধ্যে) মরীচিঃ, নক্ষত্রাণাম্ (নক্ষত্রগণের মধ্যে) অহং শশী।

আদিত্যানাং—দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে। দ্বাদশ আদিত্য এই—ধাতা, মিত্র, অর্যমা, রুদ্র, বরুণ, সূর্য, ভগ, বিবস্বান্, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা, বিষ্ণু।

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২
রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥ ২৩

মরুতাম্—উনপঞ্চাশ বায়ুর মধ্যে। ইন্দ্র তাঁহার বিমাতা দিতির গর্ভস্থ সন্তানকে বিনষ্ট করিয়া ৪৯ ভাগ করেন। উহারাই ৪৯ বায়ু।

দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে আমি বিষ্ণু নামক আদিত্য। জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে আমি কিরণমালী সূর্য। মরুৎগণের মধ্যে আমি মরীচি এবং নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র। ২১

২২। (আমি) বেদানাং (বেদসমূহের মধ্যে) সামবেদঃ অস্মি (হই), দেবানাং (দেবগণ মধ্যে) বাসবঃ (ইন্দ্র) অস্মি (হই), ইন্দ্রিয়ানাং (ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে) মনঃ চ অস্মি, ভূতানাং (ভূতগণের) চেতনা অস্মি।

বেদসমূহের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবগণের মধ্যে আমি ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে আমি মন এবং ভূতগণের আমি চেতনা (জ্ঞানশক্তি)। ২২

সাধারণতঃ বেদসমূহের মধ্যে ঋগ্বেদকেই প্রধান বলা হয় এবং ৯।১৭ শ্লোকে 'ঋক্সামযজুরেব চ' এই কথায় উহাকেই অগ্রে স্থান দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সামবেদ গান-প্রধান বলিয়া উহার আকর্ষণশক্তি অধিক এবং ভক্তিমার্গে পরমেশ্বরের স্তবস্তুতিমূলক সঙ্গীতের প্রাধান্য দেওয়া হয়।—'মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।' এই হেতু যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকর্মাত্মক বেদ অপেক্ষা গান-প্রধান সামবেদেরই শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইয়াছে।

২৩। রুদ্রাণাং (রুদ্রগণের মধ্যে) শঙ্করঃ অস্মি, যক্ষরক্ষসাম্ চ (যক্ষ ও রক্ষোগণের মধ্যে) বিত্তেশঃ (কুবের), অহং বসূনাম্ (বসুগণের মধ্যে) পাবকঃ (অগ্নি) অস্মি, শিখরিণাং চ (এবং পর্বতগণের মধ্যে) মেরুঃ [অস্মি]।

একাদশ রুদ্র—অজ, একপাদ, অহির্ব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বিবস্বান্, হর—এই একাদশ রুদ্র। **অষ্ট বসু**—আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রত্যূষ, প্রভাস।

একাদশ রুদ্রের মধ্যে আমি শঙ্কর, যক্ষরক্ষোগণের মধ্যে আমি কুবের, অষ্ট বসুর মধ্যে আমি অগ্নি এবং পর্বতগণের মধ্যে আমি সুমেরু। ২৩

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ২৪
মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫

২৪। হে পার্থ, মাং পুরোধসাং চ (পুরোহিতগণের) মুখ্যং (প্রধান) বৃহস্পতিং বিদ্ধি (জানিও); অহং (আমি) সেনানীনাং (সেনাপতিগণের মধ্যে) স্কন্দঃ (কার্তিকেয়), সরসাং (জলাশয়সমূহের মধ্যে) সাগরঃ অস্মি (হই)।

হে পার্থ, আমাকে পুরোহিতগণের প্রধান বৃহস্পতি জানিও। আমি সেনানায়কগণের মধ্যে দেবসেনাপতি কার্তিকেয় এবং জলাশয়-সমূহের মধ্যে আমি সাগর। ২৪

২৫। অহং মহর্ষীণাং (মহর্ষিদিগের মধ্যে) ভৃগুঃ অস্মি, গিরাম্ (বাক্যের মধ্যে) একম্ অক্ষরম্ (একাক্ষর প্রণব) [অস্মি], যজ্ঞানাং (যজ্ঞসমূহের মধ্যে) জপযজ্ঞঃ, স্থাবরাণাং (অচল পদার্থের মধ্যে) হিমালয়ঃ (অস্মি)।

মহর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু, শব্দসকলের মধ্যে একাক্ষর ওঁকার, যজ্ঞসকলের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ এবং স্থাবর পদার্থের মধ্যে আমি হিমালয়। ২৫

ঋষিগণের মধ্যে ভৃগু অত্যন্ত তেজস্বী ছিলেন। তাঁহাতে ঐশী শক্তির সমধিক প্রকাশবশতঃ তিনি বিভূতি বলিয়া গণ্য। শব্দ-সমূহের মধ্যে পরব্রহ্মবাচক ওঙ্কার শব্দ শ্রেষ্ঠ। সুতরাং তাহাই ভগবানের বিভূতি। জপযজ্ঞে বা নামযজ্ঞে হিংসাদি দোষ নাই, সুতরাং উহা সর্বশ্রেষ্ঠ। অচল পদার্থের মধ্যে হিমালয়ই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই হেতু ইহা ভগবানের বিভূতি। কিন্তু ১০।২৩ শ্লোকে 'শিখরিণাং' অর্থাৎ শৃঙ্গবিশিষ্ট বস্তুর মধ্যে সুমেরুকে প্রধান বলা হইয়াছে। ইহাতে এই বুঝায় যে, মেরুশৃঙ্গ হিমালয়ের শৃঙ্গ অপেক্ষা বৃহৎ।

জপযজ্ঞ—নাম-মাহাত্ম্য

চতুর্থ অধ্যায়ে নানাবিধ যজ্ঞের উল্লেখ আছে। যেমন—দ্রব্যযজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ ইত্যাদি। এস্থলে বলা হইয়াছে, সর্ববিধ যজ্ঞের মধ্যে জপযজ্ঞ বা নামযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। সুতরাং উহাই আমার বিভূতি। যজ্ঞ শব্দের অর্থের এইরূপ ব্যাপকতা বা সম্প্রসারণ বৈদিকধর্মের ক্রমবিকাশের পরিচায়ক। বৈদিক যুগে প্রথমতঃ পশুযজ্ঞের বা দ্রব্যযজ্ঞেরই প্রাধান্য ছিল। পরে ঔপনিষদিক যুগে কর্মকাণ্ডাত্মক শ্রৌতযজ্ঞাদি গৌণ বলিয়া বিবেচিত হইত এবং দ্রব্যযজ্ঞ অপেক্ষা

জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্তিত হইত। গীতাতেও দ্রব্যযজ্ঞাপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞকেই শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। (১৫৪-৫৫ পৃঃ দ্রঃ)

তৎপর ভাগবতধর্মের অভ্যুদয়ে ভক্তিতত্ত্ব বিচারে নামকীর্তন বা জপযজ্ঞকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হয়। কেননা ভক্তিমার্গে নামরূপেরই সাধনা। সমস্ত ভক্তিশাস্ত্রই সমস্বরে নাম-মাহাত্ম্য কীর্তন করেন। কলিতে নাম-সংকীর্তনই শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া পরিগণিত। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—কলি অশেষ দোষের আকর হইলেও উহার একটি মহৎ গুণ এই যে, কলিতে কৃষ্ণনাম কীর্তন হইতেই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমগতি প্রাপ্ত হওয়া যায়।—

কলের্দোষনিধেঃ রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ॥

আধুনিক কালে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই নাম-মাহাত্ম্য বিশেষভাবে জাগ্রত করেন। তাঁহার পার্ষদ ভক্তরাজ হরিদাস নামযজ্ঞের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। কৃষ্ণনাম কি বস্তু, জপযজ্ঞের কি মহিমা এবং হরিনামের কি মাহাত্ম্য, তাহা মহাপ্রভুর নিম্নোক্ত বাক্যে স্পষ্ট বুঝা যায়। ঠাকুর হরিদাস প্রত্যহ তিন লক্ষাধিক নাম জপ করিতেন। সেই কথা লক্ষ্য করিয়া প্রভু বলিতেছেন—

"প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে। তোমার পবিত্র ধর্ম নাহিক আমাতে। ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্বতীর্থে স্নান। ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপোদান। নিরন্তর কর চারি বেদ অধ্যয়ন। দ্বিজ ন্যাসী হতে তুমি পরম পাবন॥"

এই কথা বলিতে বলিতে প্রভু হরিদাসকে হৃদয়ে লইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নোক্ত শ্লোকটি পাঠ করিলেন :—

"অহোবত শ্বপচো হতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥"

—যাহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্তমান সে চণ্ডাল হইলেও গরীয়ান্। যাঁহারা তোমার নাম গ্রহণ করেন তাঁহারাই তপস্যা করেন, তাঁহারাই হোম করেন, তাঁহারাই তীর্থস্নান করেন, তাঁহারাই সদাচারী এবং তাঁহারাই বেদাধ্যায়ী।

নামের দার্শনিক তত্ত্ব—নাম ও নামী অভেদ। সমগ্র জগৎ নামরূপাত্মক। আমাদের মন হইতে যে কোন ভাবের সৃষ্টি হয় তাহা নামরূপ ব্যতীত হইতে পারে না। সুতরাং সৃষ্টি বা বিকাশের ব্যাপারটাই অনন্তকাল ধরিয়া নামরূপের সহিত জড়িত। মানুষের যত প্রকার ভাব আছে বা থাকিতে পারে তাহার

অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ॥ ২৬
উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্॥ ২৭

প্রতিরূপ নাম বা শব্দ অবশ্য থাকিবেই। ভাব, নাম ও রূপ—এই তিনটি কিন্তু একই বস্তু। একই তিন, তিনই এক। এক বস্তুরই বিভিন্ন রূপ—সূক্ষ্মতর, কিঞ্চিৎ ঘনীভূত ও সম্পূর্ণ ঘনীভূত। একটি থাকিলেই অপরগুলি থাকিবেই। এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরালে নাম রহিয়াছে, আর সেই নাম হইতেই এক বহির্জগৎ সৃষ্ট বা বহির্গত হইয়াছে।

সকল ধর্মেই এই নামকে শব্দব্রহ্ম বলিয়া থাকে। হিন্দুদের মতে এই নাম বা শব্দ ওঁ; এই ওঁকার জগতের সমষ্টিভাব বা ঈশ্বরের নাম। ব্যষ্টিভাবে তাঁহার অনন্ত নাম। বস্তুতঃ এইরূপ নাম বা পবিত্র শব্দ অনেক আছে। ভক্ত যোগীরা সেই বিভিন্ন নামের সাধন উপদেশ দিয়া থাকেন। সদ্‌গুরু-পরম্পরা-ক্রমে আসিলেই নাম শক্তিসম্পন্ন থাকে এবং পুনঃ পুনঃ জপে তাহা অনন্তশক্তিসম্পন্ন হয়। ঐ মন্ত্রের বার বার উচ্চারণে ভক্তির উচ্চতম অবস্থা আসে।—স্বামী বিবেকানন্দ। (এ বিষয়ে বিস্তারিত দার্শনিক তত্ত্ব স্বামীজীর 'ভক্তিরহস্য' নামক উপাদেয় গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।)

২৬। [আমি] সর্ববৃক্ষাণাম্ (সর্ববৃক্ষমধ্যে) অশ্বত্থঃ, দেবর্ষীণাং চ (এবং দেবর্ষিগণের মধ্যে) নারদঃ, গন্ধর্বাণাং (গন্ধর্বগণের মধ্যে) চিত্ররথঃ, সিদ্ধানাং (সিদ্ধপুরুষগণের মধ্যে) কপিলঃ মুনিঃ (কপিল মুনি)।

দেবর্ষি—দেবতা হইয়াও যিনি মন্ত্রদ্রষ্টা বলিয়া ঋষিত্ব লাভ করিয়াছেন। দেবর্ষি নারদ পরম ভগবদ্ভক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। **গন্ধর্বগণ**—দেবগায়ক। **কপিলমুনি**—সাংখ্যদর্শনের প্রণেতা। ইনি জন্মাবধি পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

আমি বৃক্ষসকলের মধ্যে অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্ব-গণের মধ্যে চিত্ররথ এবং সিদ্ধপুরুষগণের মধ্যে কপিলমুনি। ২৬

২৭। অশ্বানাং (অশ্বগণের মধ্যে) মাম্ (আমাকে) অমৃতোদ্ভবম্ (অমৃত মন্থনকালে উদ্ভূত) উচ্চৈঃশ্রবসং (উচ্চৈঃশ্রবাঃ) বিদ্ধি (জানিও); গজেন্দ্রাণাং (গজেন্দ্রগণের মধ্যে) ঐরাবতং, নরাণাং চ (ও মনুষ্যগণের মধ্যে) নরাধিপম্ (রাজা) [বলিয়া জানিও]।

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্ ॥
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥ ২৮
অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৃণামর্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্ ॥ ২৯

অশ্বগণের মধ্যে অমৃতার্থ সমুদ্রমন্থনকালে উদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবাঃ বলিয়া আমাকে জানিও; এবং হস্তিগণের মধ্যে ঐরাবত এবং মনুষ্যগণের মধ্যে রাজা বলিয়া আমাকে জানিও। ২৭

২৮। **আয়ুধানাম্** (অস্ত্রসমূহের মধ্যে) **অহং বজ্রং**, ধেনূনাং (ধেনুগণের মধ্যে) **কামধুক্** (কামধেনু) অস্মি (হই), [অহং] **প্রজনঃ** (সন্তান-উৎপাদক) **কন্দর্পঃ** (কাম) অস্মি (হই); সর্পাণাং চ (এবং সর্পগণের মধ্যে) **বাসুকিঃ** [অস্মি]।

আমি অস্ত্রসমূহের মধ্যে বজ্র, ধেনুগণের মধ্যে কামধেনু, আমি প্রাণিগণের উৎপত্তি-হেতু কন্দর্প; এবং আমি সর্পগণের মধ্যে বাসুকি। ২৮

প্রজনঃ—প্রাণিগণের উৎপত্তি-হেতু কাম, এই কথাতে সম্ভোগমাত্র যে কামের পরিণাম তাহা নিকৃষ্ট ও নিষিদ্ধ, ইহাই সূচিত হইয়াছে।

২৯। নাগানাম্ (নাগগণের মধ্যে) **অনন্তঃ** অস্মি, যাদসাং চ (ও জলচরগণের মধ্যে) অহং বরুণঃ, পিতৃণাম্ (পিতৃগণের মধ্যে) **অর্যমা** অস্মি, সংযমতাম্ (নিয়ন্তৃগণের মধ্যে) অহং যমঃ।

অর্যমা—পিতৃগণের অধিপতি। পিতৃগণের নাম এই—অগ্নিষ্বাত্ত, সৌম্য, হবিষ্মান্, উষ্মপ, সুকাল, বর্হিষদ্ এবং আজ্যপ। বেদে অর্যমার নাম দৃষ্ট হয়।

সংযমতাম্—ধর্মাধর্ম ফলদানপ্রদানেনানুগ্রহং নিগ্রহঞ্চ কুর্বতাং (মধুসূদন); দুষ্টনিগ্রহং কুর্বতাং (শ্রীধর); ধর্মাধর্ম ফলদানের নিয়ন্তৃগণের মধ্যে যম প্রধান।

নাগ ও সর্প—ইহারা এস্থলে দুই বিভিন্ন জাতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সর্পগণের রাজা বাসুকি এবং নাগগণের রাজা অনন্ত বা শেষ নাগ। অনন্ত অগ্নি-বর্ণের এবং বাসুকি হরিদ্রাবর্ণের, কোন কোন স্থানে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

নাগগণের মধ্যে আমি অনন্ত, জলচরগণের মধ্যে আমি জলদেবতা বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে আমি অর্যমা এবং ধর্মাধর্ম ফলদানের নিয়ন্তৃগণ মধ্যে আমি যম। ২৯

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্॥ ৩০
পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী॥ ৩১
সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্॥ ৩২

৩০। অহং দৈত্যানাং (দৈত্যগণের মধ্যে) প্রহ্লাদঃ অস্মি, কলয়তাং চ (গ্রাসকারীদিগের মধ্যে) কালঃ অস্মি অহং মৃগাণাং চ (পশুদিগের মধ্যে) মৃগেন্দ্রঃ (সিংহ) পক্ষিণাং চ (পক্ষিগণের মধ্যে) বৈনতেয়ঃ (গরুড়)।

কলয়তাং—বশীকুর্বতাং গণয়তাং বা মধ্যে (শ্রীধর)—সকলকেই বশীভূত করেন বা সকলেরই দিন গণনা করেন কাল, অথবা ঘটনাসমূহের নির্দেশকারিগণের মধ্যে কালই শ্রেষ্ঠ। কিংবা, কলয়ৎ শব্দের অর্থ গ্রাসকারীও হয় (তিলক)। এস্থলে এই অর্থ ই উপযোগী বোধ হয়।

দৈত্যগণের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, গ্রাসকারীদিগের মধ্যে আমি কাল, পশুগণের মধ্যে আমি সিংহ, পক্ষিগণের মধ্যে আমি গরুড়। ৩০

৩১। পবতাং (বেগবান্‌দিগের মধ্যে) পবনঃ অস্মি, শস্ত্রভৃতাম্ (শস্ত্রধারিগণের মধ্যে) অহং রামঃ (দাশরথি), ঝষাণাং (মৎস্যগণের মধ্যে) মকরঃ অস্মি, স্রোতসাং চ (এবং নদীসকলের মধ্যে) জাহ্নবী অস্মি।

বেগবান্‌দিগের মধ্যে আমি বায়ু, শস্ত্রধারিগণের মধ্যে আমি দাশরথি রাম, মৎস্যগণের মধ্যে আমি মকর এবং নদীসমূহের মধ্যে আমি গঙ্গা। ৩১

৩২। হে অর্জুন, সর্গাণাম্ (সৃষ্ট পদার্থসমূহের) আদিঃ (সৃষ্টিকর্তা) অন্তঃ (সংহর্তা) মধ্যং চ (ও স্থিতিহেতু) অহম্ এব (আমিই); অহং (আমি) বিদ্যানাম্ (বিদ্যাসমূহের মধ্যে) অধ্যাত্মবিদ্যা (আত্মবিদ্যা); প্রবদতাং (তার্কিকগণের) বাদঃ (বাদ্ নামক তর্ক)।

বাদ—তর্কশাস্ত্রে তিন প্রকার তর্ক আছে। জিগীষাপরতন্ত্র হইয়া যে প্রকারেই হউক আত্মমত স্থাপন সম্বন্ধীয় যে তর্ক তাহার নাম **জল্প** এবং পরপক্ষদূষণ সম্বন্ধীয় যে তর্ক তাহার নাম **বিতণ্ডা**। জিগীষু না হইয়া কেবল সত্য নির্ণয়ের জন্য উভয় পক্ষে যে বিচার তাহার নাম **বাদ**।

অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩
মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥ ৩৪

হে অর্জুন, সৃষ্ট পদার্থ মাত্রেরই আদি, মধ্য ও অন্ত (উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশকর্তা) আমি, বিদ্যাসমূহের মধ্যে আমি আত্মবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা; তার্কিকগণের বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা নামক তর্কসমূহের মধ্যে আমি বাদ (তত্ত্বনির্ণয়ার্থ বিচার)। ৩২

পূর্বে ২০ শ্লোকে 'আমি ভূতসকলের আদি, অন্ত ও মধ্য' এরূপ বলা হইয়াছে। উহা সচেতন সৃষ্টি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে এবং এই শ্লোকে চরাচর সমগ্র সৃষ্টি সম্বন্ধেই এই কথা বলা হইল, ইহাই প্রভেদ।

৩৩। অক্ষরাণাম্ (অক্ষরসকলের মধ্যে) অকারঃ অস্মি, সামাসিকস্য চ (এবং সমাসসমূহের মধ্যে) দ্বন্দ্বঃ, অহম্ এব অক্ষয়ঃ কালঃ, অহং বিশ্বতোমুখঃ (সর্বতোমুখ) ধাতা (কর্মফল-বিধাতা)।

বিশ্বতোমুখঃ—সর্বতোমুখ অর্থাৎ চতুর্দিকে মুখবিশিষ্ট; **ধাতা**—ব্রহ্মা অথবা সর্বতোমুখ ধাতা অর্থাৎ সর্বকর্মফলবিধাতা ঈশ্বর।

অক্ষরসমূহের মধ্যে আমি অকার, সমাসসমূহের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব, আমিই অক্ষয় কালস্বরূপ, এবং আমিই সমুদয় কর্মফলের বিধানকর্তা। ৩৩

অকার আদি বর্ণ এবং সকল বর্ণের উচ্চারণে উহাই প্রকাশিত হয়; এই হেতু উহার শ্রেষ্ঠত্ব। দ্বন্দ্ব সমাসে উভয় পদেরই প্রাধান্য থাকে, এই হেতু উহা শ্রেষ্ঠ। এখানে কাল বলিতে অবিচ্ছিন্ন প্রবাহস্বরূপ অক্ষয় কাল (everlasting time), কিন্তু পূর্বে ১০।৩০ শ্লোকে গ্রাসকারী, ক্ষয়কারী বা গণনাকারিগণের প্রধান বলিয়া উহা উক্ত হইয়াছে। সুতরাং উভয় কথায় পার্থক্য আছে।

৩৪। অহং সর্বহরঃ (সর্বসংহারকারী) মৃত্যুঃ, ভবিষ্যতাম্ (ভাবিকালের প্রাণিগণের) উদ্ভবঃ চ (অভ্যুদয়), নারীণাং (নারীগণের মধ্যে) কীর্তিঃ, শ্রীঃ, বাক্ (বাণী, সরস্বতী), স্মৃতিঃ, মেধা, ধৃতিঃ, ক্ষমা চ।

সংহর্তাদিগের মধ্যে আমি সর্বসংহারক মৃত্যু, ভবিষ্য প্রাণিগণেরও আমি উদ্ভবস্বরূপ; নারীগণের মধ্যে আমি কীর্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি,

বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ ॥ ৩৫
দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥ ৩৬

মেধা, ধৃতি, ক্ষমা—এই সকল দেবতাস্বরূপ, অর্থাৎ ঐ সকল আমারই বিভূতি। ৩৪

কীর্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, মেধা, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, মতি—দক্ষের এই দশ কন্যার ধর্মের সহিত বিবাহ হয়। এই জন্য ইঁহাদিগকে ধর্মপত্নী বলে। উহার তিনটি এখানে উল্লিখিত হইয়াছে।

৩৫। অহং সাম্নাং (সামবেদোক্ত মন্ত্রসকলের মধ্যে) বৃহৎ সাম, ছন্দসাং (ছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্রসমূহের মধ্যে) গায়ত্রী, তথা মাসানাম্ (মাসসমূহের মধ্যে) অহং মার্গশীর্ষঃ (অগ্রহায়ণ মাস), ঋতূনাং (ঋতুসমূহের মধ্যে) কুসুমাকরঃ (বসন্তকাল)।

আমি সামবেদোক্ত মন্ত্রসকলের মধ্যে বৃহৎ সাম, ছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্রের মধ্যে গায়ত্রী; আমি বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ মাস এবং ঋতুসকলের মধ্যে বসন্ত ঋতু। ৩৫

বৃহৎসাম—এই মন্ত্রদ্বারা ইন্দ্র (ব্রহ্ম) সর্বেশ্বররূপে স্তুত হন। এই হেতু মোক্ষ-প্রতিপাদক বলিয়া উহার শ্রেষ্ঠত্ব। মার্গশীর্ষ বা অগ্রহায়ণ মাসকে প্রধান স্থান দেওয়ার কারণ এই যে, সে সময়ে অগ্রহায়ণ মাস হইতেই বৎসর গণনা হইত। (মভাঃ অনুঃ ১০৬ ও ১০৯; বাল্মীকি রামায়ণ ৩।১৬, ভাগবত ১১।১৬।২৭)। মার্গশীর্ষ নক্ষত্রকে অগ্রহায়ণী অর্থাৎ বর্ষারম্ভের নক্ষত্র বলা হইত—গীতারহস্য, ওরায়ণ (লোকমান্য তিলক)।

৩৬। অহং ছলয়তাং (ছলনাকারিগণের) দ্যূতম্ (অক্ষ, দেবনাদি দ্যূতক্রীড়া), তেজস্বিনাং (তেজস্বী ব্যক্তিগণের) তেজঃ অস্মি,[অহং]জয়ঃ অস্মি, ব্যবসায়ঃ (অধ্যবসায়) অস্মি, অহং সত্ত্ববতাং (সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের) সত্ত্বম্ (সত্ত্বগুণ) [অস্মি]।

আমি বঞ্চনাকারিগণের দ্যূতক্রীড়া (gambling), আমি তেজস্বিগণের তেজঃ, বিজয়ী পুরুষের জয়, উদ্যোগী পুরুষের উদ্যম এবং সাত্ত্বিক পুরুষের সত্ত্বগুণ। ৩৬

বৃষ্ণীণাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ॥ ৩৭
দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্॥ ৩৮

ভালমন্দ সকলই তাঁহা হইতেই জাত, সুতরাং বঞ্চনা করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় যে দ্যূতক্রীড়া তাহাও তাঁহারই বিভূতি (৭।১২ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

৩৭। অহং বৃষ্ণীণাং (বৃষ্ণি বংশীয়গণের মধ্যে) বাসুদেবঃ পাণ্ডবানাং (পাণ্ডবগণের মধ্যে) ধনঞ্জয়ঃ, মুনীনাং অপি (মুনিগণের মধ্যে) ব্যাসঃ, কবীনাং (কবিগণের মধ্যে) উশনাঃ কবিঃ (শুক্রাচার্য কবি) অস্মি।

মুনি—বেদার্থমননশীল। **কবি**—সূক্ষ্মার্থদর্শী। **শুক্রাচার্য**—অসুরদিগের গুরু ছিলেন।

আমি বৃষ্ণিবংশীয়দিগের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ, পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয়, মুনিগণের মধ্যে ব্যাস, কবিগণের মধ্যে কবি শুক্রাচার্য। ৩৭

যে শ্রেণীর যাহা প্রধান তাহাতেই ঐশ্বরিক শক্তির সমধিক বিকাশ এবং তাহাই বিভূতি বলিয়া গণ্য। এই হেতু বৃষ্ণিগণের প্রধান শ্রীকৃষ্ণ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি। ব্যাসদেব মুনিগণের প্রধান। ইনি বেদ বিভাগ করেন এবং মহাভারত, ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণসকল রচনা করেন। আবার, ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত দর্শনের রচয়িতা বলিয়াও ইনি প্রসিদ্ধ। অথচ এই সকল গ্রন্থের রচনাকাল শত শত বৎসর ব্যবধান। এই হেতু অনেকে বলেন—২৮ জন ভিন্ন ভিন্ন ব্যাস ছিলেন। এ সম্বন্ধে প্রাচীন সিদ্ধান্ত এই যে, এক ব্যাসই বহু বার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যোগিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেব লিখিয়াছেন যে, এক ব্যাসকেই বহু বার জন্মগ্রহণ করিতে দেখিয়াছেন।—"ইমং ব্যাসমুনিং তত্র দ্বাত্রিংশৎ সংস্মরাম্যহম্"।

৩৮। অহং দময়তাং (শাসনকর্তৃগণের) দণ্ডঃ অস্মি, জিগীষতাং (জয়েচ্ছুগণের) নীতিঃ অস্মি, গুহ্যানাং (গোপনীয় বিষয়ের মধ্যে) মৌনম্ এব, জ্ঞানবতাং চ (ও জ্ঞানিগণের) জ্ঞানম্ অস্মি।

নীতি—শত্রুজয় বা রাজ্য রক্ষার উপায়। সাম, দান, ভেদ, দণ্ড—এই সকল রাজনীতি (State-crafts)।

আমি শাসনকর্তৃগণের দণ্ড, জয়েচ্ছু ব্যক্তিগণের সামাদি নীতি, গুহ্য বিষয়ের মধ্যে মৌন এবং জ্ঞানিগণের জ্ঞান॥ ৩৮

যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্॥ ৩৯
নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া॥ ৪০
যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥ ৪১

দণ্ড, রাজ্যশাসন বা সমাজশাসনের মুখ্য উপায়, এই হেতু উহা বিভূতি। মৌনাবলম্বন করিলে মনোভাব কিছুতেই ব্যক্ত হয় না; সুতরাং উহাই শ্রেষ্ঠ গোপনহেতু।

৩৯। হে অর্জুন, যৎ চ অপি (যাহা কিছু) সর্বভূতানাং (সর্বভূতের) বীজং (উৎপত্তিকারণ) তৎ অহম্ এব (তাহা আমিই); ময়া বিনা (আমা ব্যতীত) যৎ স্যাৎ (যাহা হইতে পারে) তৎ চরাচরং ভূতং (সেইরূপ চর বা অচর পদার্থ) ন অস্তি (নাই)।

হে অর্জুন, সর্বভূতের যাহা বীজস্বরূপ তাহাই আমি, আমা ব্যতীত উদ্ভূত হইতে পারে চরাচরে এমন পদার্থ নাই। ৩৯

৪০। হে পরন্তপ, মম দিব্যানাং বিভূতীনাম্ (আমার দিব্য বিভূতিসমূহের) অন্তঃ ন অস্তি (নাই), এষঃ তু বিভূতেঃ বিস্তরঃ (এই বিভূতি বিস্তার) ময়া (আমাকর্তৃক) উদ্দেশতঃ (সংক্ষেপে, দিগ্‌দর্শনস্বরূপে) প্রোক্তঃ (কথিত হইল)।

হে পরন্তপ, আমার দিব্য বিভূতিসমূহের অন্ত নাই। আমি এই যাহা কিছু বিভূতি বিস্তার বলিলাম, তাহা আমার বিভূতিসকলের সংক্ষেপ বা দিগ্‌দর্শন মাত্র। ৪০

৪১। বিভূতিমৎ (ঐশ্বর্যযুক্ত), শ্রীমৎ (লক্ষ্মীযুক্ত), ঊর্জিতম্ এব বা (কিংবা অতিশয় প্রভাবসম্পন্ন) যৎ যৎ (যাহা যাহা বস্তু) তৎ তৎ এব (তাহা তাহাই) মম তেজোঽংশসম্ভবম্ (আমার শক্তির অংশ হইতে উদ্ভূত) অবগচ্ছ (জানিও)।

যাহা যাহা কিছু ঐশ্বর্যযুক্ত, শ্রীসম্পন্ন অথবা অতিশয় শক্তিসম্পন্ন, তাহাই আমার শক্তির অংশসম্ভূত বলিয়া জানিবে। ৪১

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৪২

৪২। অথবা, হে অর্জুন, এতেন বহুনা জ্ঞাতেন কিম্ (এত বহুবিস্তার জানিয়া কি প্রয়োজন); অহম্ ইদং কৃৎস্নং জগৎ (আমি এই সমগ্র জগৎ) একাংশেন (একাংশে মাত্র) বিষ্টভ্য (ধারণ করিয়া) স্থিতঃ (রহিয়াছি)।

অথবা হে অর্জুন, তোমার এত বহু বিভূতিবিস্তার জানিয়া প্রয়োজন কি? (এক কথায় বলিতেছি) আমি এই সমস্ত জগৎ আমার একাংশ মাত্র দ্বারা ধারণ করিয়া অবস্থিত আছি। ৪২

বিশ্বানুগ—বিশ্বাতিগ

এস্থলে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—'আমি একাংশে এই চরাচর বিশ্ব ব্যাপিয়া আছি, আমি বিশ্বরূপ।' তবে অপরাংশ কিরূপ, কোথায়? তাহা কে বলিবে? মানব-বুদ্ধি বিশ্বরূপের ধারণাতেই বিহ্বল হইয়া যায়, বিশ্বের অতীত, নামরূপের অতীত যে বস্তু, তাহা সে ধারণাই করিতে পারে না। তাহা অনন্ত, অব্যক্ত, অজ্ঞেয়। তিনি মায়া স্বীকার করিয়া সোপাধিক হইলেও সসীম হন না। তিনি বিশ্বানুগ (Immanent) হইয়াও বিশ্বাতিগ (Transcendent), প্রপঞ্চাভিমানী হইয়াও প্রপঞ্চাতীত। তাঁহার এই প্রপঞ্চাতীত বিশ্বাতিগ নির্গুণ স্বরূপ ধারণার অতীত। এই অব্যক্ত ভাব উপনিষদের ঋষি বিরোধাভাসে কৌশলে বর্ণনা করিয়াছেন,—'অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতম্ অবিজানতাম্' —যাঁহারা বলেন, পরব্রহ্মকে জানি, তাঁহারা তাঁহাকে জানেন না (কেননা, তাহা অজ্ঞেয়) এবং যাঁহারা বলেন, পরব্রহ্মকে জানি না, তাঁহারাই তাঁহাকে জানেন (কেননা, তাঁহারা তাঁহার প্রকৃত অজ্ঞেয় স্বরূপ বুঝিয়াছেন)—কেন উপ. ২।৩। ঋগ্বেদ এবং ছান্দোগ্যাদি উপনিষদেও বিরাট পুরুষের এইরূপ সগুণ-নির্গুণ উভয়বিধ বর্ণনাই একত্র আছে। যথা—

"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥"
"পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।"—ঋক্, ১০।৯০।১।৩

সেই বিরাট পুরুষের সহস্র শির, সহস্র নয়ন, সহস্র চরণ, তিনি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন এবং তদতিরিক্ত দশ আঙ্গুল অতিক্রম করিয়া অবস্থিত আছেন। তাঁহার এক পাদে জগৎ, আর অমৃতস্বরূপ ত্রিপাদ জগতের ঊর্ধ্বে। (এস্থলে

দশ আঙ্গুল উপলক্ষণ মাত্র ; দশ আঙ্গুল দ্বারা পরিমাণ করা হয়, তিনি পরিমাণের অতীত অর্থাৎ তিনি জগতে ও জগতের বাহিরে আছেন, ইহাই তাৎপর্য)।

দশম অধ্যায়—বিশ্লেষণ ও সার-সংক্ষেপ

১-৩ পরমেশ্বরের অনাদি স্বরূপজ্ঞানে মুক্তি। ৪-৭ ভগবানের বিভূতি ও যোগ ; ৮-১১ উহা জানিয়া তাঁহাকে ভজনা করিলে জ্ঞান লাভ হয়, সে জ্ঞান ভগবান্‌ই দেন—পরাভক্তি ও পরাবিদ্যা এক ; ১২-১৮ ভগবদ্বিভূতি শ্রবণার্থ অর্জুনের প্রার্থনা ; ১৯-৪০ সংক্ষেপতঃ বিভূতি বর্ণন ; ৪১-৪২ সমস্ত জগৎ ভগবানের একাংশে মাত্র স্থিত—তিনি বিশ্বানুগ হইয়াও বিশ্বাতিগ।

পূর্ব অধ্যায়ে যে রাজগুহ্য রাজবিদ্যার কথা বলা হইতেছিল তাহাই এই অধ্যায়েও চলিয়াছে, এবং অর্জুনের প্রশ্নক্রমে পরে এই অধ্যায়ে পরমেশ্বরের ব্যক্ত রূপ বিশেষভাবে সবিস্তার বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রথমেই শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—আমার আদি তত্ত্ব দেবতারাও জানেন না। কেননা, আমি দেবতাগণের আদি কারণ। যিনি আমাকে অনাদি, অজ, সর্বলোকের মহেশ্বর বলিয়া জানেন, তিনি মোহশূন্য হইয়া সর্বপাপ হইতে মুক্ত হন। আমিই বুদ্ধিজ্ঞান, সুখদুঃখ, জন্মমৃত্যু, রাগ-দ্বেষাদি সকল বৃত্তি, সকল ভাব, সকল অবস্থার মূল কারণ। সমস্ত মহর্ষি, চতুর্দশ মনু প্রভৃতি আমা হইতেই সৃষ্ট হইয়াছেন এবং তাহাদিগ হইতেই সকল প্রজা উৎপন্ন হইয়াছে। যিনি আমার এই সকল বিভূতি ও যোগৈশ্বর্য জানেন, তিনি মদ্‌ভক্তি-লক্ষণ যোগ লাভ করেন, সন্দেহ নাই। মচ্চিত্ত মদ্গতপ্রাণ ভক্তগণ সর্বদা পরস্পর আমার কথা আলাপ করিয়া এবং আমার কীর্তন করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করেন। এইরূপে যাঁহারা আমাতে চিত্তার্পণ করিয়া প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করেন, তাঁহাদিগকে আমি ঈদৃশ বুদ্ধি-যোগ প্রদান করি, যাহা দ্বারা তাঁহারা আমাকে লাভ করিয়া থাকেন।

এইরূপে শ্রীভগবান্ ভক্তিতত্ত্ব বলা শেষ করিলে অর্জুন বলিলেন, ভগবন্, তোমার তত্ত্ব কেহই বিদিত নহে। তোমার তত্ত্ব কেবল তুমিই জান। তোমার বিভূতিসমূহ আমাকে বিস্তারিত বল। কোন্ কোন্ পদার্থে কি ভাবে চিন্তা করিলে তোমাকে কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিব, তাহা আমি জানিতে চাই। উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন,—আমি প্রধান প্রধান বিভূতিসমূহ সংক্ষেপে বলিতেছি। আমার বিভূতি-বিস্তারের অন্ত নাই। আমি সর্বভূতে আদি,

অন্ত ও মধ্য। আদিত্যগণে আমি বিষ্ণু, জ্যোতিষ্কগণ মধ্যে আমি সূর্য, নক্ষত্রগণে আমি চন্দ্র, দেবগণে আমি ইন্দ্র, রুদ্রগণে আমি শঙ্কর, বায়ুগণে আমি মরীচি। এইরূপে বহুবিধ বিভূতি বর্ণনা করিয়া পরিশেষে শ্রীভগবান্ বলিলেন,—সর্বভূতের যাহা বীজস্বরূপ তাহাই আমি। যাহা কিছু ঐশ্বর্যযুক্ত এবং শ্রীসম্পন্ন বা অতিশয় শক্তিসম্পন্ন, তাহাতেই আমার শক্তির সামান্য প্রকাশ জানিবে। আর এত বিস্তার জানিয়াই তোমার প্রয়োজন কি? সংক্ষেপে এই জানিয়া রাখ যে, আমি একাংশে এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত আছি। আমার পূর্ণ মহিমা, সমগ্র স্বরূপ, জীবের অচিন্ত্য, অজ্ঞেয়।

এই অধ্যায়ে পরমেশ্বরের বিভূতিসমূহই বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে। এই জন্য ইহাকে **বিভূতি-যোগ** বলে।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে **বিভূতি-যোগো** নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।

একাদশ অধ্যায়

বিশ্বরূপ-দর্শন-যোগ

অর্জুন উবাচ

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্‌ ।
যৎ ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥ ১
ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া ।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্‌ ॥ ২

১। **অর্জুনঃ** উবাচ—মদনুগ্রহায় (আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থ) পরমং গুহ্যম্‌ (অতি গুহ্য) অধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্‌ (অধ্যাত্মসংজ্ঞক) যৎ বচঃ (যে বাক্য) ত্বয়া উক্তং (তোমা কর্তৃক কথিত হইল) তেন (তদ্দ্বারা) মম অয়ং মোহঃ (আমার এই মোহ) বিগতঃ (দূর হইল)।

অধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্‌—অধ্যাত্মম্‌ আত্মনি পরমাত্মনি ত্বয়ি বা বিভূতিলক্ষণা সংজ্ঞা সা জাতা যস্য তদ্বচঃ (বলরাম)—পরমাত্মস্বরূপ তোমার বিভূতি-লক্ষণাদি বর্ণনাত্মক বাক্য। (২৮৩-৮৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

বিশ্বরূপদর্শনার্থ অর্জুনের প্রার্থনা ১-৮

"সপ্তম অধ্যায়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান আরম্ভ করিয়া সপ্তম ও অষ্টমে পরমেশ্বরের অক্ষর অথবা অব্যক্ত রূপের এবং নবম ও দশমে অনেক ব্যক্ত রূপের যে জ্ঞান বলিয়াছেন, তাহাকেই অর্জুন প্রথম শ্লোকে 'অধ্যাত্ম' বলিয়াছেন।"

—গীতারহস্য, লোকমান্য তিলক

অর্জুন বলিলেন,—তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া যে পরম গুহ্য অধ্যাত্ম-তত্ত্ব বর্ণনা করিলে তাহাতে আমার এই মোহ বিদূরিত হইল। ১

আমার এই মোহ বিনষ্ট হইল অর্থাৎ তোমার প্রকৃত তত্ত্ব জানিয়া, তুমিই সর্বভূতের নিয়ন্তা, সর্ব কর্মের নিয়ামক, ইহা বুঝিতে পারিয়া 'আমি কর্তা', 'আমার কর্ম' ইত্যাদি রূপ যে আমার মোহ তাহা অপগত হইল, আমি বুঝিতেছি, তুমিই কর্তা, তুমিই যন্ত্রী, আমি যন্ত্রমাত্র।

২। হে কমলপত্রাক্ষ (পদ্মলোচন), ত্বত্তঃ (তোমার নিকট হইতে) ভূতানাং (ভূতসকলের) ভবাপ্যয়ৌ (উৎপত্তি ও লয়) ময়া (মৎ-কর্তৃক)

এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩
মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪

শ্রীভগবান্ উবাচ

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫

বিস্তরশঃ (বিস্তারিত রূপে) শ্রুতৌ (শ্রুত হইল); (তোমার) অব্যয়ম্ মাহাত্ম্যম্ অপি চ (তোমার অক্ষয় মাহাত্ম্যও) [শ্রুত হইল])।

হে কমললোচন, ভূতগণের উৎপত্তি ও লয় এবং তোমার অক্ষয় মাহাত্ম্য—এ সকলই তোমার নিকট হইতে সবিস্তারে আমি শুনিলাম। ২

৩। হে পরমেশ্বর, যথা ত্বম্ আত্মানম্ (আপনার বিষয়) আত্থ (বলিয়াছ), এতৎ এবং (উহা ঐরূপই বটে), হে পুরুষোত্তম, তব ঐশ্বরং (ঐশ্বরিক) রূপং দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি (রূপ দেখিতে ইচ্ছা করি)।

হে পরমেশ্বর, তুমি আপনার বিষয় যাহা বলিলে তাহা এইরূপই বটে; হে পুরুষোত্তম, আমি তোমার (সেই) ঐশ্বরিক রূপ দেখিতে ইচ্ছা করি। ৩

তুমি পরমেশ্বর, 'আমি একাংশে জগৎ ধারণ করিয়া আছি' ইত্যাদি যাহা তুমি বলিলে তাহা সত্য। আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে, আমি তোমার সেই বিশ্বরূপ দর্শন করি।

৪। হে প্রভো, তৎ যদি (সেই রূপ যদি) ময়া দ্রষ্টুং শক্যং (আমা কর্তৃক দেখিবার যোগ্য) ইতি মন্যসে (ইহা মনে কর) ততঃ (তাহা হইলে) হে যোগেশ্বর, ত্বং মে (তুমি আমাকে) অব্যয়ম্ আত্মানং (অক্ষয় আত্মরূপ) দর্শয় (দেখাও)।

হে প্রভো, যদি তুমি মনে কর যে আমি সেই রূপ দর্শনের যোগ্য, তাহা হইলে হে যোগেশ্বর, আমাকে তোমার সেই অক্ষয় আত্মরূপ প্রদর্শন করাও। ৪

যোগেশ্বর—৭।২৫ শ্লোক ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৫। শ্রীভগবান্ উবাচ—হে পার্থ, মে (আমার) দিব্যানি (অলৌকিক) নানাবিধানি (নানাপ্রকার) নানাবর্ণাকৃতীনি (নানাবর্ণ ও আকৃতিবিশিষ্ট) শতশঃ (শত শত) অথ সহস্রশঃ (ও সহস্র সহস্র) রূপাণি পশ্য (রূপসকল দেখ)।

নানাবর্ণাকৃতীনি—নানাবর্ণাঃ তথা আকৃতয়শ্চ যেষাং তানি।

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্বাণি পশ্যাশ্চর্যাণি ভারত ॥ ৬
ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৭
ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ৮

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে পার্থ, নানা বর্ণ ও নানা আকৃতিবিশিষ্ট শত শত, সহস্র সহস্র বিভিন্ন অবয়ববিশিষ্ট আমার এই অদ্ভুত রূপ দর্শন কর। ৫

৬। হে ভারত (অর্জুন), আদিত্যান্ (দ্বাদশ আদিত্য) বসূন্ (অষ্ট বসু) রুদ্রান্ (রুদ্রগণ) অশ্বিনৌ (অশ্বিনীকুমারদ্বয়) তথা মরুতঃ (বায়ুগণ) পশ্য (দেখ), বহূনি (অনেক) অদৃষ্টপূর্বাণি (অদৃষ্টপূর্ব) আশ্চর্যাণি (আশ্চর্য বস্তুসকল) পশ্য (দেখ)।

হে ভারত (অর্জুন), এই আমার দেহে দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং উনপঞ্চাশৎ মরুদ্গণ দর্শন কর; পূর্বে যাহা কখনও দেখ নাই, তেমন বহুবিধ আশ্চর্য বস্তু দর্শন কর ॥ ৬

৭। হে গুড়াকেশ (জিতনিদ্র অর্জুন), ইহ মম দেহে (এই আমার দেহে) একস্থং (একত্র সংস্থিত) কৃৎস্নং (সমগ্র) সচরাচরম্ (স্থাবর জঙ্গম সহিত) জগৎ, অন্যৎ যৎ চ (আর যাহা কিছু) দ্রষ্টুমিচ্ছসি (দেখিতে ইচ্ছা কর) [তাহা] অদ্য পশ্য (এখন দেখিয়া লও)।

হে নিদ্রাজয়ী অর্জুন, আমার এই দেহে একত্র অবস্থিত চরাচর সমগ্র জগৎ তুমি দর্শন কর এবং অপর যাহা কিছু তুমি দেখিতে ইচ্ছা কর তাহাও এখন দেখিয়া লও। ৭

'অপর যাহা কিছু' একথার তাৎপর্য এই যে, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান ত্রিকালের যত কিছু ঘটনা সকলই আমার এই দেহে বিদ্যমান। এই যুদ্ধের জয়-পরাজয়াদি ভবিষ্যৎ ঘটনা যাহা দেখিতে ইচ্ছা কর, তাহাও এই দেহে দেখিতে পাইবে (১১।২৬-৩৩ ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

গুড়াকা+ঈশ=নিদ্রা-বিজয়ী, ধনুর্বিদ্যাপারগ।

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্॥ ৯

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্॥ ১০

দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্বাশ্চর্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্॥ ১১

৮। অনেন স্বচক্ষুষা এব তু (এই তোমার নিজ চক্ষু দ্বারা) মাং দ্রষ্টুং (আমাকে দেখিতে) ন শক্যসে (সমর্থ হইবে না); তে দিব্যং চক্ষুঃ দদামি (দিতেছি), মে ঐশ্বরং যোগং (অঘটনঘটন সামর্থ্য) পশ্য (দর্শন কর)।

ঐশ্বরিক যোগ—ঐশ্বরিক শক্তি বা সৃষ্টি-কৌশল। অঘটনঘটন-সামর্থ্য—শ্রীধর।

(হে অর্জুন), তুমি তোমার এই চর্মচক্ষুদ্বারা আমার এই রূপ দর্শনে সমর্থ হইবে না। এজন্য তোমাকে দিব্যচক্ষু দিতেছি, তদ্দ্বারা আমার এই ঐশ্বরিক যোগসামর্থ্য দেখ। ৮

৯। সঞ্জয়ঃ উবাচ—হে রাজন্ (ধৃতরাষ্ট্র), মহাযোগেশ্বরঃ হরিঃ এবম্ উক্ত্বা (এইরূপ কহিয়া) ততঃ পার্থায় পরমম্ ঐশ্বরং রূপং দর্শয়ামাস (দেখাইলেন)।

মহাযোগেশ্বর—(৭।২৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

সঞ্জয়কৃত বিশ্বরূপ বর্ণনা ৯-১৪

সঞ্জয় কহিলেন—হে রাজন্, মহাযোগেশ্বর হরি এইরূপ বলিয়া তৎপর পার্থকে পরম ঐশ্বরিক রূপ দেখাইলেন। ৯

১০। [সেই বিশ্বরূপ] অনেকবক্ত্রনয়নম্ (অনেক মুখ ও চক্ষুবিশিষ্ট), অনেকাদ্ভুতদর্শনম্ (অনেক অদ্ভুত দর্শনীয় বস্তুবিশিষ্ট) অনেকদিব্যাভরণম্ (অনেক দিব্য আভরণ-বিশিষ্ট), দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ (অনেক উদ্যত দিব্য অস্ত্র-বিশিষ্ট) [ছিল]।

দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্—দিব্যানি অনেকানি উদ্যতানি আয়ুধানি অস্ত্রাণি যস্মিন্ তৎ।

সেই ঐশ্বরিক রূপে অসংখ্য মুখ, অসংখ্য নেত্র, অসংখ্য অদ্ভুত অদ্ভুত দর্শনীয় বস্তু, অসংখ্য দিব্য আভরণ এবং অসংখ্য উদ্যত দিব্যাস্ত্র-সকল বিদ্যমান (ছিল)। ১০

১১। [সেই রূপ] দিব্যমাল্যাম্বরধরম্ (দিব্য মাল্য ও বস্ত্রধারী)

দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্‌যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥ ১২
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা॥ ১৩
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত॥ ১৪

দিব্যগন্ধানুলেপনম্ (দিব্য গন্ধদ্বারা অনুলেপিত), সর্বাশ্চর্যময়ং (অত্যন্ত আশ্চর্যময়), দেবম্ (দ্যুতিমান্), অনন্তং (অপরিচ্ছিন্ন), বিশ্বতোমুখং (সর্বত্র মুখবিশিষ্ট)।

সেই বিশ্বরূপ দিব্য মাল্য ও বস্ত্রে সুশোভিত, দিব্য গন্ধদ্রব্যে অনুলিপ্ত, সর্বাশ্চর্যময় দ্যুতিমান্, অনন্ত ও সর্বতোমুখ (সর্বত্র মুখবিশিষ্ট ছিল)। ১১

১২। দিবি (আকাশে) যদি সূর্যসহস্রস্য (সহস্র সূর্যের) ভাঃ (প্রভা) যুগপৎ উত্থিতা ভবেৎ (হয়) [তবে] সা [সেই প্রভা] তস্য মহাত্মনঃ (সেই মহাত্মার) ভাসঃ (প্রভার) সদৃশী স্যাৎ (তুল্য হইতে পারে)।

আকাশে যদি যুগপৎ সহস্র সূর্যের প্রভা উত্থিত হয়, তাহা হইলে সেই সহস্র সূর্যের প্রভা মহাত্মা বিশ্বরূপের প্রভার তুল্য হইতে পারে। ১২

এই শ্লোকে অপূর্ব শব্দবিন্যাসকৌশলে শব্দের ধ্বনি দ্বারাই কিরূপে অর্থ দ্যোতনা হইতেছে তাহা লক্ষ করিবার বিষয়।

১৩। তদা পাণ্ডবঃ তত্র দেবদেবস্য শরীরে (সেই দেবদেবের দেহে) অনেকধা প্রবিভক্তং (নানা ভাগে বিভক্ত) কৃৎস্নং জগৎ (সমস্ত জগৎ) একস্থম্ (একত্র-স্থিত) অপশ্যৎ (দেখিয়াছিলেন)।

তখন অর্জুন সেই দেবদেবের দেহে নানা ভাগে বিভক্ত তদীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-স্বরূপ একত্রস্থিত সমস্ত জগৎ দেখিয়াছিলেন। ১৩

১৪। ততঃ বিস্ময়াবিষ্টঃ (বিস্ময়ান্বিত) হৃষ্টরোমা (রোমাঞ্চিত-গাত্র হইয়া) সঃ ধনঞ্জয়ঃ দেবং শিরসা প্রণম্য (মস্তকদ্বারা প্রণাম করিয়া) কৃতাঞ্জলিঃ (করজোড়ে) অভাষত (বলিতে লাগিলেন)।

অর্জুন উবাচ

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থম্ ঋষীংশ্চ সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥ ১৫
অনেক-বাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥ ১৬
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্ দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্॥ ১৭

সেই বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া ধনঞ্জয় বিস্ময়ে আপ্লুত হইলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি অবনতমস্তকে সেই দেবদেবকে প্রণাম করিয়া করজোড়ে বলিতে লাগিলেন। ১৪

১৫। অর্জুনঃ উবাচ (বলিলেন)—হে দেব, তব দেহে সর্বান্ দেবান্ (সমস্ত দেবগণকে) তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্ (স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতসমূহকে) দিব্যান্ ঋষীন্ (দিব্য ঋষিগণকে) সর্বান্ উরগান্ চ (সর্পসমূহকে) ঈশং (সৃষ্টিকর্তা) কমলাসনস্থং ব্রহ্মাণং (পদ্মাসনস্থিত ব্রহ্মাকে) পশ্যামি (দেখিতেছি)।

ভূতবিশেষসঙ্ঘান্—ভূতবিশেষাণাং স্থাবরজঙ্গমানাং নানাসংস্থানাং ভূতানাং সঙ্ঘান্ সমূহান্—স্থাবর বৃক্ষাদি ও জঙ্গম জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ ইত্যাদি বিভিন্ন জাতীয় প্রাণিসমূহ।

অর্জুনকৃত বিশ্বরূপ বর্ণনা ১৫-৩১

অর্জুন বলিলেন—হে দেব, তোমার দেহে আমি সমস্ত দেবগণ, স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিবিধ সৃষ্ট-পদার্থ, সৃষ্টিকর্তা কমলাসনস্থ ব্রহ্মা, নারদ-সনকাদি দিব্য ঋষিগণ এবং অনন্ত-তক্ষকাদি সর্পগণকে দেখিতেছি। ১৫

১৬। হে বিশ্বেশ্বর, হে বিশ্বরূপ,—অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রম্ (বহু বাহু, উদর, বদন ও নেত্রবিশিষ্ট), অনন্তরূপং (অনন্তরূপধারী) ত্বাং সর্বতঃ পশ্যামি (তোমাকে সর্বত্র দেখিতেছি), পুনঃ (এবং) তব ন অন্তং ন মধ্যং ন আদিং পশ্যামি (তোমার আদি, অন্ত, মধ্য দেখিতেছি না)।

অসংখ্য বাহু, উদর, বদন ও নেত্রবিশিষ্ট অনন্তরূপ তোমাকে সকল দিকেই আমি দেখিতেছি। কিন্তু হে বিশ্বেশ্বর, হে বিশ্বরূপ, আমি তোমার আদি, অন্ত, মধ্য কোথাও কিছু দেখিতেছি না। ১৬

১৭। কিরীটিনং (কিরীটধারী) গদিনং (গদাহস্ত) চক্রিণং (চক্রধারী

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥ ১৮
অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্যম্ অনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥ ১৯

সর্বতঃ দীপ্তিমন্তং (সর্বত্র দীপ্তিশালী) তেজোরাশিং (তেজঃপুঞ্জস্বরূপ) দুর্নিরীক্ষ্যং (চর্মচক্ষুর দর্শন-অযোগ্য) দীপ্তানলার্কদ্যুতিম্ (প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন) অপ্রমেয়ং চ (অপরিমেয়, অপরিচ্ছিন্ন) ত্বাং (তোমাকে) সমন্তাৎ (সর্বদিকে) পশ্যামি (দেখিতেছি)।

কিরীট, গদা ও চক্রধারী, সর্বত্র দীপ্তিশালী, তেজঃপুঞ্জস্বরূপ, প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, দুর্নিরীক্ষ্য, অপরিমেয় তোমার অদ্ভুত মূর্তি সর্বদিকে সর্বস্থানে আমি দেখিতেছি। ১৭

দুর্নিরীক্ষ্য—অর্থাৎ চর্মচক্ষুর দর্শনের অযোগ্য হইলেও দিব্য চক্ষু লাভ হইয়াছে বলিয়াই অর্জুন দেখিতেছেন, সুতরাং কোন বিরোধ হইতেছে না।

১৮। ত্বম্ অক্ষরং পরমং (পরব্রহ্ম) বেদিতব্যং (জ্ঞাতব্য), ত্বম্ অস্য বিশ্বস্য (এই জগতের) পরং নিধানং (পরম আশ্রয়), ত্বম্ অব্যয়ঃ (নিত্য) শাশ্বতধর্মগোপ্তা (সনাতন ধর্মের রক্ষক); ত্বং সনাতনঃ (চিরন্তন) পুরুষঃ, মে মতঃ (ইহা আমার অভিমত)।

তুমি অক্ষর পরব্রহ্ম, তুমিই একমাত্র জ্ঞাতব্য তত্ত্ব, তুমিই এই বিশ্বের পরম আশ্রয়, তুমিই সনাতন ধর্মের প্রতিপালক, তুমি অব্যয় সনাতন পুরুষ, ইহাতে আমার সংশয় নাই। ১৮

১৯। অনাদিমধ্যান্তম্ (আদি-অন্ত-মধ্যহীন) অনন্ত-বীর্যম্ (অনন্তশক্তি-সম্পন্ন) অনন্তবাহুং (অসংখ্যবাহুবিশিষ্ট) শশিসূর্যনেত্রং (চন্দ্র-সূর্যরূপ নেত্রবিশিষ্ট) দীপ্ত-হুতাশবক্ত্রং (প্রজ্জলিত অগ্নিতুল্য বদন-বিশিষ্ট) স্বতেজসা ইদং বিশ্বং তপন্তং (স্বীয় তেজের দ্বারা এই জগতের সন্তাপকারী) ত্বাং পশ্যামি (তোমাকে দেখিতেছি)।

আমি দেখিতেছি, তোমার আদি নাই, মধ্য নাই, অন্ত নাই, তোমার বলৈশ্বর্যের অবধি নাই; অসংখ্য তোমার বাহু, চন্দ্র-সূর্য তোমার নেত্রস্বরূপ, তোমার মুখমণ্ডলে প্রদীপ্ত হুতাশন জ্বলিতেছে; তুমি স্বীয় তেজে নিখিল বিশ্বকে সন্তাপিত করিতেছ। ১৯

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্॥ ২০
অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ॥ ২১

'অনন্ত বাহু', 'আদি অন্ত মধ্যহীন' ইত্যাদি বর্ণনা পূর্বে করা হইয়াছে। কিন্তু হর্ষ-বিস্ময়াদি রসের বর্ণনায় পুনরুক্তি দোষজনক হয় না—"প্রমাদে বিস্ময়ে হর্ষে দ্বিস্ত্রিরুক্তং ন দুষ্যতি।"

২০। হে মহাত্মন্, দ্যাবাপৃথিব্যোঃ ইদম্ অন্তরম্ (স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যস্থল অর্থাৎ আকাশ, অন্তরীক্ষ) একেন ত্বয়া হি (একমাত্র তোমাদ্বারাই) ব্যাপ্তং (ব্যাপ্ত রহিয়াছে); সর্বাঃ দিশঃ চ (দিকসকলও ব্যাপ্ত রহিয়াছে); তব অদ্ভুতম্ ইদম্ (এই) উগ্রং রূপং দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) লোকত্রয়ম্ (ত্রিলোক) প্রব্যথিতং (ব্যথিত হইতেছে)।

হে মহাত্মন্, একমাত্র তুমিই স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যস্থল এই অন্তরীক্ষ এবং দিক্‌সকলও ব্যাপিয়া রহিয়াছ। তোমার এই অদ্ভুত উগ্রমূর্তি দর্শন করিয়া ত্রিলোক ব্যথিত হইতেছে। ২০

অর্জুন বিশ্বরূপ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতেছেন না এবং তিনি এই রূপ দেখিয়া স্বয়ং অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন। 'ত্রিলোক ভীত হইয়াছে' যে বলিতেছেন, উহা তাঁহারই মনের ভাব মাত্র। বস্তুতঃ অর্জুন ব্যতীত আর কেহ বিশ্বরূপ দেখিতে পারে না, দেখেও নাই।

২১। অমী সুরসঙ্ঘাঃ (ঐ দেবতাগণ) ত্বাং হি (তোমাতেই) বিশন্তি (প্রবেশ করিতেছেন); কেচিৎ (কেহ কেহ) ভীতাঃ (ভীত হইয়া) প্রাঞ্জলয়ঃ (কৃতাঞ্জলিপুটে) গৃণন্তি (রক্ষা প্রার্থনা করিতেছেন); মহর্ষিসিদ্ধ-সঙ্ঘাঃ (মহর্ষি ও সিদ্ধপুরুষগণ) স্বস্তি ইতি উক্ত্বা (স্বস্তি স্বস্তি বলিয়া) পুষ্কলাভিঃ স্তুতিভিঃ (উত্তম, পূর্ণ, সারগর্ভ স্তুতিবাক্যে) ত্বাং স্তুবন্তি (তোমাকে স্তব করিতেছেন)।

ঐ দেবতাগণ তোমাতেই প্রবেশ করিতেছেন। কেহ কেহ ভীত হইয়া (জয় জয়, রক্ষ রক্ষ ইত্যাদি বাক্যে) কৃতাঞ্জলিপুটে রক্ষা প্রার্থনা করিতেছেন। মহর্ষি ও সিদ্ধগণ স্বস্তি স্বস্তি বলিয়া উত্তম সারগর্ভ স্তোত্রসমূহদ্বারা তোমার স্তব করিতেছেন। ২১

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে॥ ২২
রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্॥ ২৩

২২। রুদ্রাদিত্যাঃ (রুদ্র ও আদিত্যগণ), বসবঃ (বসুগণ), যে চ সাধ্যাঃ (যাহারা সাধ্য নামক দেবতা), বিশ্বে (বিশ্বদেবগণ), অশ্বিনৌ (অশ্বিনীকুমারদ্বয়) মরুতঃ চ (এবং মরুদ্গণ) উষ্মপাঃ (উষ্মপায়ী পিতৃগণ), গন্ধর্ব-যক্ষাসুরসিদ্ধ-সঙ্ঘাঃ চ (এবং গন্ধর্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধগণ) সর্বে এব (সকলেই) বিস্মিতাঃ ত্বাং বীক্ষন্তে (তোমাকে দেখিতেছেন)।

আদিত্য, বসু প্রভৃতি বৈদিক দেবতা। বৃহদারণ্যকে দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র এবং ইন্দ্র ও প্রজাপতি এই মোট তেত্রিশ দেবতার উল্লেখ আছে। (অপিচ মহাভাঃ আদিঃ ৬৫।৬৬, শান্তি ২০৮ দ্রষ্টব্য)।

উষ্মপাঃ—উষ্মানং পিবন্তি ইতি পিতরঃ—শ্রাদ্ধে পিতৃগণকে যে অন্নাদি দেওয়া হয় তাহা উষ্ণ থাকিলেই তাঁহারা গ্রহণ করেন, নচেৎ নয়। এই জন্য পিতৃগণকে উষ্মপা বলে। বস্তুতঃ উহার উষ্মভাগ অর্থাৎ তৎতৎ পদার্থে নিহিত প্রকৃত তেজঃশক্তি তাঁহারা গ্রহণ করেন। এই হেতু তাঁহাদের নাম উষ্মপা। শাস্ত্রে সাত প্রকার পিতৃগণের উল্লেখ আছে। (১০।২৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, সাধ্য নামক দেবগণ, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, উনপঞ্চাশ মরুৎ, উষ্মপা (পিতৃগণ), গন্ধর্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধগণ সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তোমাকে দর্শন করিতেছেন। ২২

২৩। হে মহাবাহো, তে (তোমার) বহুবক্ত্রনেত্রং (অসংখ্য বদনও নেত্রবিশিষ্ট), বহুবাহূরুপাদং (বহু বাহু, উরু ও চরণবিশিষ্ট), বহূদরং (বহু উদর-বিশিষ্ট) বহুদংষ্ট্রাকরালং (বহু দন্তদ্বারা ভীষণ), মহৎ রূপং দৃষ্ট্বা (রূপ দেখিয়া) লোকাঃ (লোকসকল) প্রব্যথিতাঃ (ভীত হইয়াছে); তথা অহম্ (আমিও) [ভীত হইয়াছি]।

হে মহাবাহো, বহু বহু মুখ, নেত্র, বাহু, উরু, পদ ও উদরবিশিষ্ট এবং বহু বৃহদাকার দন্তদ্বারা ভয়ঙ্করদর্শন তোমার এই সুবিশাল মূর্তি দেখিয়া লোকসকল ভীত হইয়াছে এবং আমিও ভীত হইয়াছি। ২৩

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো ॥ ২৪
দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৫
অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ সর্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্ বিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥ ২৭

২৪। হে বিষ্ণো, নভঃস্পৃশং (আকাশস্পর্শকারী) দীপ্তম্ (তেজোময়) অনেকবর্ণং (নানাবর্ণবিশিষ্ট) ব্যাত্তাননং (বিস্ফারিত-মুখবিশিষ্ট) দীপ্তবিশাল-নেত্রং (অত্যুজ্জ্বল বিশাল নেত্রবিশিষ্ট) ত্বাং দৃষ্ট্বা (তোমাকে দেখিয়া) প্রব্যথিতান্তরাত্মা (ব্যথিতচিত্ত) [আমি] ধৃতিং শমং চ ন বিন্দামি (ধৈর্য ও শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না)।

হে বিষ্ণো, নভস্পর্শী, তেজোময়, বিচিত্রবর্ণ, বিস্ফারিতবদন, অত্যুজ্জ্বল বিশাল নেত্রবিশিষ্ট তোমার রূপ দেখিয়া আমার অন্তরাত্মা ব্যথিত হইতেছে, আমার দেহেন্দ্রিয় বিকল হইতেছে, আমি মনকে শান্ত করিতে পারিতেছি না। ২৪

২৫। দংষ্ট্রাকরালানি (দন্তদ্বারা ভীষণ) কালানলসন্নিভানি (প্রলয়াগ্নিতুল্য) তে মুখানি দৃষ্ট্বা এব (তোমার মুখসকল দর্শন করিয়াই) দিশঃ ন জানে (দিক্‌সকল জানিতে পারিতেছি না, দিশেহারা হইয়াছি), শর্ম চ (সুখও) ন লভে (পাইতেছি না); হে দেবেশ (দেবাদিদেব), হে জগন্নিবাস (জগদাধার), প্রসীদ (প্রসন্ন হও)।

বৃহৎ দন্তসমূহের দ্বারা ভয়ানকদর্শন, প্রলয়াগ্নিসদৃশ তোমার মুখসকল দর্শন করিয়া আমার দৃষ্টিভ্রম ঘটিতেছে (আমি দিশেহারা হইয়াছি), আমি স্বস্তি পাইতেছি না। হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, প্রসন্ন হও (আমার ভয় দূর কর)। ২৫

২৬-২৭। অবনিপালসঙ্ঘৈঃ সহ (নৃপতিগণের সহিত) অমী চ ধৃতরাষ্ট্রস্য সর্বে এব পুত্রাঃ (ঐ ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রেরা সকলেই) তথা ভীষ্মঃ, দ্রোণঃ, অসৌ সূতপুত্রঃ চ (এবং ঐ কর্ণ), অস্মদীয়ৈঃ (আমাদের পক্ষীয়) যোধমুখ্যৈঃ সহ

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরাঃ বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি ॥ ২৮
যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯

(প্রধান প্রধান যোদ্ধগণসহ) ত্বরমাণাঃ (দ্রুতবেগে ধাবমান হইয়া) তে (তোমার) দংষ্ট্রাকরালানি (দন্তদ্বারা বিকৃত) ভয়ানকানি বক্ত্রাণি (ভয়ঙ্কর মুখগহ্বরে) বিশন্তি (প্রবেশ করিতেছে), কেচিৎ (কেহ কেহ) চূর্ণিতৈঃ উত্তমাঙ্গৈঃ (চূর্ণিত মস্তকে) দশনান্তরেষু (দন্তসন্ধিতে) বিলগ্নাঃ সংদৃশ্যন্তে (সংলগ্ন দৃষ্ট হইতেছে)।

[জয়দ্রথাদি] রাজন্যবর্গসহ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ সকলে এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও আমাদের প্রধান প্রধান যোদ্ধৃগণ তোমার দংষ্ট্রাকরাল ভয়ঙ্করদর্শন মুখগহ্বরে ধাবিত হইয়া প্রবেশ করিতেছে। কাহারও কাহারও মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং উহা তোমার দন্তসন্ধিতে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে দেখা যাইতেছে। ২৬-২৭

যুদ্ধ ব্যাপারে যাহা ঘটিবে ভগবান্ তাঁহার বিরাট দেহে সেই দৃশ্যটি দেখাইতেছেন। ভগবানের ভূত ভবিষ্যৎ নাই, তাঁহার সকলই বর্তমান। তাঁহার দেহে ত্রৈকালিক ঘটনার একত্র সমাবেশ। সুতরাং ইহা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার নয়। এই হেতুই পূর্বে ১১।৭ শ্লোকে অর্জুনকে বলিয়াছিলেন, আরও যাহা কিছু দেখিতে চাও, তাহাও দেখিতে পাইবে।

২৮। যথা নদীনাং (নদীসমূহের) বহবঃ অম্বুবেগাঃ (বহু জলপ্রবাহ) সমুদ্রম্ অভিমুখাঃ (সমুদ্রাভিমুখ হইয়া) এব দ্রবন্তি (প্রবেশ করে), তথা অমী নরলোকবীরাঃ (এই ভূমণ্ডলস্থ বীরগণ) অভিবিজ্বলন্তি (চতুর্দিকে প্রজ্বলিত) তব বক্ত্রাণি (তোমার মুখমণ্ডলসমূহে) বিশন্তি (প্রবেশ করিতেছে)।

অভিবিজ্বলন্তি—অভিতো বিজ্বলন্তি সর্বতঃ প্রদীপ্যমানানি—চতুর্দিকে জ্বলিতেছে এরূপ। "অভিতো বিজ্বলন্তি" এইরূপ পাঠান্তরও আছে।

যেমন নদীসমূহের বহু জলপ্রবাহ সমুদ্রাভিমুখ হইয়া সমুদ্রে গিয়া প্রবেশ করে, সেইরূপ এই মনুষ্যলোকের বীরগণ তোমার সর্বতোব্যাপ্ত জ্বলন্ত মুখগহ্বরে প্রবেশ করিতেছে। ২৮

২৯। যথা পতঙ্গাঃ সমৃদ্ধবেগাঃ (অতি বেগে ধাবমান হইয়া) নাশায় (মরণের জন্য) প্রদীপ্তং জ্বলনং (জ্বলন্ত অগ্নিতে) বিশন্তি (প্রবেশ করে), তথা

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥ ৩০
আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥ ৩১

লোকাঃ অপি (লোকগণও) সমৃদ্ধবেগাঃ (অতি বেগবান্) [হইয়া] নাশায় এব (মরণের জন্যই) তব বক্ত্রাণি (মুখসমূহে) বিশন্তি (প্রবেশ করিতেছে)।

যেমন পতঙ্গগণ অতি বেগে ধাবমান হইয়া মরণের জন্য জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে, সেইরূপ এই লোকসকল মরণের নিমিত্তই অতি বেগে ধাবমান হইয়া তোমার মুখগহ্বরে প্রবেশ করিতেছে। ২৯

৩০। জ্বলদ্ভিঃ বদনৈঃ (জ্বলন্ত মুখসমূহের দ্বারা) সমগ্রান্ লোকান্ গ্রসমানঃ (লোকসমূহকে গ্রাস করিয়া) সমন্তাৎ (চারিদিকে, সর্বত্র) লেলিহ্যসে (বারংবার স্বাদ গ্রহণ করিতেছ, লেহন করিতেছ); হে বিষ্ণো, সমগ্রং জগৎ তেজোভিঃ আপূর্য (তেজের দ্বারা পূর্ণ করিয়া) তব উগ্রাঃ ভাসঃ (তোমার তীব্র প্রভা-সমূহ) প্রতপন্তি (দগ্ধ করিতেছে)।

তুমি জ্বলন্ত মুখসমূহের দ্বারা লোকসমূহকে গ্রাস করিয়া বারংবার স্বাদ গ্রহণ করিতেছ। হে বিষ্ণো, সমগ্র জগৎ তোমার তীব্র তেজোরাশি-ব্যাপ্ত হইয়া প্রতপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। ৩০

৩১। উগ্ররূপঃ (উগ্রমূর্তি) ভবান্ কঃ (আপনি কে), মে আখ্যাহি (আমাকে বলুন); তে নমঃ অস্তু (আপনাকে প্রণাম করি), হে দেববর, প্রসীদ (প্রসন্ন হউন); আদ্যং ভবন্তং (আদি পুরুষ আপনাকে) বিজ্ঞাতুম্ ইচ্ছামি (জানিতে ইচ্ছা করি); হি (যেহেতু) তব প্রবৃত্তিং (কার্য) ন প্রজানামি (জানি না)।

উগ্রমূর্তি আপনি কে, আমাকে বলুন। হে দেববর, আপনাকে প্রণাম করি, প্রসন্ন হউন। আদি পুরুষ আপনাকে আমি জানিতে ইচ্ছা করি। আপনি কে, কি কার্যে প্রবৃত্ত, বুঝিতেছি না। ৩১

আমি আপনার বিশ্বরূপ ও বিভূতিসমূহ দেখিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু আপনার এই সংহারমূর্তি দেখিয়া আমি বুঝিতেছি না, আপনি কে ও কি কার্যে

শ্রীভগবান্ উবাচ

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥ ৩২
তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্॥ ৩৩

৩২। শ্রীভগবান্ উবাচ—(আমি) লোকক্ষয়কৃৎ (লোকক্ষয়কারী) প্রবৃদ্ধঃ (অত্যুৎকট) কালঃ অস্মি (হই), লোকান্ (লোকসকলকে) সমাহর্তুম্ (সংহার করিতে) ইহ (এক্ষণ) প্রবৃত্তঃ; ত্বাম্ ঋতে অপি (তোমা ব্যতীতও, তুমি সংহার না করিলেও) প্রত্যনীকেষু (বিপক্ষ সৈন্যদলে) যে যোধাঃ অবস্থিতাঃ (যে যোদ্ধৃগণ অবস্থিত) [আছে], সর্বে অপি (তাহারা সকলেই) ন ভবিষ্যন্তি (থাকিবে না)।

প্রবৃদ্ধঃ—অত্যুৎকটঃ (শ্রীধর), বৃদ্ধিং গতঃ (শঙ্কর)

প্রত্যনীকেষু—অনীকানি অনীকানি প্রতি প্রত্যনীকেষু ভীষ্মদ্রোণাদীনাং সর্বাসু সেনাসু (শ্রীধর)। **ইহ**—অস্মিন্ কালে (শঙ্কর)।

ভগবানের কালস্বরূপের বর্ণন, নিমিত্ত-মাত্র হইয়া যুদ্ধার্থ উপদেশ ৩২-৩৪

শ্রীভগবান্ কহিলেন—আমি লোকক্ষয়কারী অতি ভীষণ কাল; এক্ষণ এই লোকদিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি; তুমি যুদ্ধ না করিলেও প্রতিপক্ষ সৈন্যদলে যে সকল যোদ্ধা অবস্থান করিতেছে তাহারা কেহই থাকিবে না। ৩২

৩৩। তস্মাৎ (অতএব) ত্বম্ (তুমি) উত্তিষ্ঠ (উত্থিত হও), যশঃ লভস্ব (লাভ কর), শত্রূন্ জিত্বা (শত্রুদিগকে জয় করিয়া) সমৃদ্ধং রাজ্যং (নিষ্কণ্টক রাজ্য) ভুঙ্‌ক্ষ্ব (ভোগ কর); ময়া (আমাকর্তৃক) এতে (ইহারা) পূর্বম্ এব (পূর্বেই) নিহতাঃ; হে সব্যসাচিন্ (অর্জুন), নিমিত্তমাত্রং (উপলক্ষ্য মাত্র) ভব (হও)।

সব্যসাচী— সব্যেন বামেন হস্তেন সচিতুং শরান্ সন্ধাতুং শীলং যস্যেতি— যিনি বাম হস্তে শর-সন্ধান করিতে অভ্যস্ত; অর্জুন।

অতএব, তুমি যুদ্ধার্থ উত্থিত হও; শত্রু জয় করিয়া যশঃ লাভ কর, নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ কর। হে অর্জুন, আমি ইহাদিগকে পূর্বেই নিহত করিয়াছি। তুমি এখন নিমিত্তমাত্র হও। ৩৩

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্॥ ৩৪

সঞ্জয় উবাচ

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য॥ ৩৫

অর্জুন উবাচ

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ॥ ৩৬

দুর্যোধন যখন সন্ধির সকল প্রস্তাবই অগ্রাহ্য করিলেন, তখন ভীষ্মদেব শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—"কালপক্কমিদং মন্যে সর্বং ক্ষত্রং জনার্দন"—বুঝিতেছি, এই ক্ষত্রিয়েরা কালপক্ক হইয়া উঠিয়াছে (মহাভাঃ উদ্যোঃ ১২৭।৩২)। এই কাল কি এবং কালপক্ক কাহাকে বলে, তাহাই শ্রীভগবান্ বিশ্বরূপে অর্জুনকে প্রত্যক্ষ দেখাইলেন।

৩৪। ময়া (আমাকর্তৃক) হতান্ (হত) দ্রোণঞ্চ, ভীষ্মঞ্চ, জয়দ্রথঞ্চ, কর্ণঞ্চ, তথা অন্যান্ (এবং অন্যান্য) যোধবীরান্ অপি (যুদ্ধবীরগণকেও) ত্বং জহি (তুমি নিহত কর), মা ব্যথিষ্ঠাঃ (ভয় করিও না, ব্যথিত হইও না), রণে সপত্নান্ (শত্রুদিগকে) জেতাসি (জয় করিতে পারিবে), [অতএব], যুধ্যস্ব (যুদ্ধ কর)।

দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং অন্যান্য যুদ্ধবীরগণকে আমি পূর্বেই নিহত করিয়া রাখিয়াছি, তুমি সেই হতগণকে নিহত কর; ভয় করিও না; রণে শত্রুগণকে নিশ্চয় জয় করিতে পারিবে, যুদ্ধ কর। ৩৪

৩৫। সঞ্জয়ঃ উবাচ—কেশবস্য (কেশবের) এতৎ (এই) বচনং শ্রুত্বা (শুনিয়া) বেপমানঃ (কম্পমান) কিরীটী (অর্জুন) কৃতাঞ্জলিঃ (বদ্ধাঞ্জলি হইয়া) কৃষ্ণং নমস্কৃত্বা (কৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া) ভীতভীতঃ প্রণম্য (অত্যন্ত ভীত হইয়া প্রণামপূর্বক) ভূয়ঃ এব (পুনরায়) সগদ্গদং (গদগদস্বরে) আহ (কহিলেন)।

অর্জুনকৃত বিশ্বরূপের স্তব ৩৫-৪৬

সঞ্জয় বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জুন কম্পিত কলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে কৃষ্ণকে নমস্কার করিলেন; আবার অত্যন্ত ভীত হইয়া প্রণামপূর্বক গদ্গদ স্বরে বলিতে লাগিলেন। ৩৫

৩৬। অর্জুনঃ উবাচ—হে হৃষীকেশ, তব প্রকীর্ত্যা (তোমার মাহাত্ম্য কীর্তনে) জগৎ প্রহৃষ্যতি (অতিশয় হৃষ্ট হয়), অনুরজ্যতে চ (ও অনুরক্ত হয়);

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্ গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ ॥ ৩৭
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮

রক্ষাংসি (রক্ষোগণ) ভীতানি (ভীত হইয়া) দিশঃ (দিগ্‌দিগন্তে) দ্রবন্তি (পলায়ন করে); সর্বে সিদ্ধসঙ্ঘাঃ চ (সমস্ত সিদ্ধপুরুষগণও) নমস্যন্তি (নমস্কার করেন), [এই সকলই] স্থানে (যুক্তিযুক্ত)।

অর্জুন কহিলেন—হে হৃষীকেশ, তোমার মাহাত্ম্য কীর্তনে সমস্ত জগৎ যে হৃষ্ট হয় এবং তোমার প্রতি অনুরক্ত হয়, ইহা যুক্তিযুক্ত; রাক্ষসেরা যে তোমার ভয়ে ভীত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করে এবং সিদ্ধগণ যে তোমাকে নমস্কার করেন, তাহাও আশ্চর্য নহে। ৩৬

৩৭। হে মহাত্মন্, হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, ব্রহ্মণঃ অপি গরীয়সে (ব্রহ্মারও গুরু) আদিকর্ত্রে চ (ও আদিকর্তা) তে (তোমাকে) কস্মাৎ ন নমেরন্ (কেন নমস্কার না করিবেন); সৎ (ব্যক্ত) অসৎ (অব্যক্ত), পরং (উহার অতীত) যৎ অক্ষরং (যে অক্ষর পরব্রহ্ম) তৎ চ (তাহাও) ত্বম্ (তুমি)।

সৎ ও **অসৎ**—৩২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হে মহাত্মন্, হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, তুমি ব্রহ্মারও গুরু এবং আদিকর্তা; অতএব সমস্ত জগৎ কেন তোমাকে নমস্কার না করিবে? তুমি সৎ (ব্যক্ত জগৎ), তুমি অসৎ (অব্যক্তা প্রকৃতি) এবং সদসতের অতীত যে অক্ষর ব্রহ্ম তাহাও তুমি ॥ ৩৭

৩৮। হে অনন্তরূপ, ত্বম্ আদিদেবঃ (দেবগণের আদি, জগতের সৃষ্টিকর্তা,) পুরাণঃ (অনাদি) পুরুষঃ, ত্বম্ অস্য বিশ্বস্য (এই বিশ্বের) পরং নিধানং (শেষ লয়স্থান); [তুমি] বেত্তা (জ্ঞাতা) বেদ্যং চ (এবং জ্ঞেয়) পরং চ ধাম (পরমপদ) অসি (হও); ত্বয়া (তোমাদ্বারা) বিশ্বং ততম্ (ব্যাপ্ত রহিয়াছে)।

হে অনন্তরূপ, তুমি আদিদেব, তুমি অনাদি পুরুষ, তুমি এই বিশ্বের একমাত্র লয়স্থান, তুমি জ্ঞাতা, তুমিই জ্ঞাতব্য, তুমিই পরমধাম! তুমি এই বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছ। ৩৮

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব।
অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ ॥ ৪০
সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১

৩৯। ত্বং (তুমি) বায়ুঃ, যমঃ, অগ্নিঃ, বরুণঃ, শশাঙ্কঃ (চন্দ্র), প্রজাপতিঃ (পিতামহ ব্রহ্মা), প্রপিতামহঃ চ (এবং ব্রহ্মারও জনক); তে (তোমাকে) সহস্রকৃত্বঃ (সহস্র বার) নমঃ অস্তু (নমস্কার), পুনশ্চ (পুনর্বারও) নমঃ, ভূয়ঃ অপি (আবারও) তে (তোমাকে) নমঃ নমঃ।

প্রজাপতি, প্রপিতামহ—ব্রহ্মা হইতে মরীচি আদি মানসপুত্রের উৎপত্তি। মরীচি হইতে কশ্যপ এবং কশ্যপ হইতে সমস্ত প্রজার উৎপত্তি। ব্রহ্মা, মরীচি-আদির পিতা, এই জন্য তাঁহাকে পিতামহ বলা হয় এবং ব্রহ্মারও যে পিতা অর্থাৎ যিনি পরমেশ্বর তিনি প্রপিতামহ। কশ্যপাদিকেও প্রজাপতি বলে। কিন্তু এখানে প্রজাপতি শব্দ একবচনান্ত থাকাতে উহার অর্থ ব্রহ্মা বলিয়াই গ্রহণ করা সঙ্গত।

বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, তুমিই ; পিতামহ ব্রহ্মাও তুমি এবং ব্রহ্মার জনকও (প্রপিতামহ) তুমি। তোমাকে সহস্র বার নমস্কার করি, আবার পুনঃ পুনঃ তোমাকে নমস্কার করি। ৩৯

৪০। তে (তোমাকে) পুরস্তাৎ (অগ্রভাগে) অথ পৃষ্ঠতঃ (এবং পশ্চাদ্ভাগে) নমঃ, হে সর্ব, তে সর্বতঃ এব (সকল দিকেই) নমঃ অস্তু ; হে অনন্তবীর্য, অমিতবিক্রমঃ ত্বং (তুমি) সর্বং (সমস্ত বিশ্ব) সমাপ্নোষি (ব্যাপিয়া আছ) ; ততঃ (সেই হেতু) [তুমি] সর্বঃ (সর্বস্বরূপ) অসি (হও)।

অনন্তবীর্য, অমিতবিক্রম—বীর্য শব্দে শারীরিক বল এবং বিক্রম শব্দে শস্ত্রপ্রয়োগ-কৌশলাদি বুঝায় (মধুসূদন)।

তোমাকে সম্মুখে নমস্কার করি, তোমাকে পশ্চাতে নমস্কার করি ; হে সর্বস্বরূপ, সর্বত্রই তুমি, তোমাকে সকল দিকেই নমস্কার করি ; অনন্ত তোমার বলবীর্য, অসীম তোমার পরাক্রম ; তুমি সমস্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছ, সুতরাং তুমিই সমস্ত। ৪০

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্॥ ৪২
পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব॥৪৩
তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্॥ ৪৪

৪১-৪২। তব মহিমানম্ (তোমার মহিমা) ইদং চ (এবং এই বিশ্বরূপ) অজানতা (না জানিয়া) ময়া (আমাকর্তৃক) প্রমাদাৎ (অজ্ঞানতাবশতঃ) প্রণয়েন বা অপি (বা প্রণয়বশতঃ) সখা ইতি মত্বা (সখা, এই ভাবিয়া) হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে ইতি (এইরূপ) [সখে+ইতি=সখেতি, এই সন্ধি আর্ষ] প্রসভং (হঠাৎ, অবিনয়ে) যৎ উক্তং (যাহা কিছু বলা হইয়াছে), হে অচ্যুত, বিহারশয্যাসনভোজনেষু (আমোদ, ক্রীড়া, শয়ন, আসন ও ভোজনকালে) একঃ (একাকী) অথবা তৎসমক্ষম্ অপি (বন্ধুজনসমক্ষেও) অবহাসার্থং (পরিহাসচ্ছলে) যৎ অসৎকৃতঃ (যেরূপ অবজ্ঞাত, অপমানিত) অসি (হইয়াছ), অহং (আমি) অপ্রমেয়ং ত্বাং (অচিন্ত্যপ্রভাব তোমার নিকট) তৎ (তাহা) ক্ষাময়ে (ক্ষমা চাহিতেছি)

তোমার এই বিশ্বরূপ এবং ঐশ্বর্যমহিমা না জানিয়া তোমাকে সখা ভাবিয়া অজ্ঞানবশতঃ বা প্রণয়বশতঃ "হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা", এইরূপ তোমায় বলিয়াছি; হে অচ্যুত, আহার, বিহার, শয়ন ও উপবেশনকালে একা অথবা বন্ধুজনসমক্ষে পরিহাসচ্ছলে তোমার কত অমর্যাদা করিয়াছি; অচিন্ত্যপ্রভাব তুমি, তোমার নিকট তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। ৪১-৪২

৪৩। হে অপ্রতিমপ্রভাব (অতুলপ্রভাব), ত্বম্ অস্য চরাচরস্য লোকস্য (তুমি এই চরাচর সমস্ত লোকের) পিতা, পূজ্যঃ, গুরুঃ, গরীয়ান্ (এবং গুরুতর) অসি (হও); লোকত্রয়ে অপি (ত্রিজগতেও) ত্বৎসমঃ (তোমার তুল্য) ন অস্তি, অভ্যধিকঃ (তোমা অপেক্ষা অধিক) অন্যঃ কুতঃ (অন্য কোথায় থাকিবে)।

হে অমিতপ্রভাব, তুমি এই চরাচর সমস্ত লোকের পিতা, তুমি পূজ্য, গুরু ও গুরু হইতে গুরুতর; ত্রিজগতে তোমার তুল্য কেহই নাই, তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ থাকিবে কি প্রকারে? ৪৩

৪৪। হে দেব, তস্মাৎ (সেই হেতু) অহং কায়ং প্রণিধায় (শরীরকে দণ্ডবৎ অবনত করিয়া) প্রণম্য (প্রণামপূর্বক) ঈড্যম্ (বন্দনীয়) ঈশম্

অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫
কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে ॥ ৪৬

(ঈশ্বর) ত্বাং প্রসাদয়ে (তোমার প্রসাদ প্রার্থনা করিতেছি); পুত্রস্য (পুত্রের) [অপরাধ] পিতা ইব (পিতা যেমন), সখ্যুঃ (সখার) সখা ইব (সখা যেমন), প্রিয়ায়াঃ (প্রিয়ার) প্রিয়ঃ ইব (প্রিয় পতি যেমন), [সেইরূপ তুমি আমার অপরাধ] সোঢ়ুম্ অর্হসি (ক্ষমা করিতে যোগ্য হও)।

প্রিয়ায়ার্হসি—প্রিয়ায়াঃ অর্হসি। কিন্তু এইরূপ সন্ধি ঠিক হয় না। এই হেতু প্রিয়ায়াঃ স্থলে **প্রিয়ায়** পাঠ কেহ কেহ করেন। তাহা হইলে অর্থ হয়,—প্রেমময় তুমি, তোমার প্রিয় আমি ; সুতরাং আমার অপরাধ ক্ষন্তব্য।

হে দেব, পূর্বোক্তরূপে আমি অপরাধী, সেই হেতু দণ্ডবৎ প্রণামপূর্বক তোমার প্রসাদ প্রার্থনা করিতেছি। সকলের বন্দনীয় ঈশ্বর তুমি ; পিতা যেমন পুত্রের, সখা যেমন সখার, প্রিয় যেমন প্রিয়ার অপরাধ ক্ষমা করেন, তুমিও তদ্রূপ আমার অপরাধ ক্ষমা কর। ৪৪

৪৫। হে দেব, অদৃষ্টপূর্বং (পূর্বে যাহা দেখা হয় নাই এরূপ) [তোমার রূপ] দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) হৃষিতঃ অস্মি (হর্ষান্বিত হইয়াছি) ভয়েনচ (আবার ভয়ে) মে মনঃ প্রব্যথিতং (ব্যাকুল হইয়াছে)। [অতএব] তৎ এব রূপং (সেই তোমার পূর্বরূপই) মে দর্শয় (আমাকে দেখাও)। হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, প্রসীদ (প্রসন্ন হও)]

হে দেব, পূর্বে যাহা কখনও দেখি নাই, সেই রূপ দেখিয়া আমার হর্ষ হইয়াছে বটে, কিন্তু ভয়ে মন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে ; অতএব, তোমার সেই (চিরপরিচিত) পূর্ব রূপটি আমাকে দেখাও ; হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, আমার প্রতি প্রসন্ন হও। ৪৫

৪৬। অহং ত্বাং (আমি তোমাকে) তথা এব (পূর্ব রূপেই) কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তং (কিরীটধারী, গদাধারী, চক্রধারীরূপে) দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি (দেখিতে ইচ্ছা করি); হে সহস্রবাহো, বিশ্বমূর্তে, তেন চতুর্ভুজেন রূপেণ এব (সেই চতুর্ভুজ মূর্তিতেই) ভব (আবির্ভূত হও)।

কিরীটধারী এবং গদা ও চক্রহস্ত তোমার সেই পূর্বরূপই আমি দেখিতে ইচ্ছা করি। হে সহস্রবাহো,হে বিশ্বমূর্তে, তুমি চতুর্ভুজ মূর্তি ধারণ কর। ৪৬

ঐশ্বর্য ও মাধুর্য—অর্জুন ভগবানের বিভূতি-বিস্তার কথঞ্চিৎ শ্রবণ করিয়া তাঁহার ঐশ্বরিক রূপ দেখিতে চাহিলেন, কিন্তু এখন সেই বিশ্বরূপ দেখিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। করজোড়ে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—আমি এ ভয়ঙ্কর রূপ দেখিতে পারি না, তুমি আমাকে তোমার পূর্ব সৌম্যমূর্তি দর্শন করাও। বস্তুতঃ ঈশ্বরের অনন্ত বিভূতি, অপার ঐশ্বর্য, বিশ্বতোমুখ বিশ্বব্যাপী বিশ্বরূপ দর্শন কেন—চিন্তা করাও মনুষ্যের অসাধ্য। এই পৃথিবীটি কত বড়, তাহা আমরা কি ধারণা করিতে পারি? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় এই পৃথিবীটাই বা কতটুকু? এইরূপ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার লোমকূপে ঘুরিতেছে—সেই অচিন্তনীয় বিশ্বমূর্তি কি মানববুদ্ধি ধারণা করিতে পারে? আবার তাহাতে যুদ্ধের ভবিষ্যঘটনা চাক্ষুষ পরিদৃশ্যমান—লোকক্ষয়কারী মহাকালরূপী সেই ভয়ঙ্কর উগ্রমূর্তি—আর কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে ভারতের বীরকুল সেই মহাকাল-কবলে সবেগে ধাবিত হইতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া কে ভীতি-বিহ্বল না হইয়া পারে?

বস্তুতঃ, একাদশ অধ্যায়ে এই যে বিশ্বরূপের বর্ণনা, ইহা অদ্ভুতরসের বর্ণনা—ইহাতে ভয়, বিস্ময়, বিহ্বলতা আনয়ন করে—ইহাতে মাধুর্য, শান্তি ও প্রীতির ভাব নাই। তাই সৌন্দর্য-রস-লোলুপ ভক্তগণ সেই অনন্ত-স্বরূপের অনন্ত ঐশ্বর্যের চিন্তা করেন না—তাঁহার সান্ত সৌম্য লীলা-বিগ্রহই ধ্যান করেন—উহার অপার সৌন্দর্য উপভোগ করেন। ঐশ্বর্যে ও মাধুর্যে এই প্রভেদ। কথাটি রসতত্ত্ব-বিচারে পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণও বেশ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন—

"The beautiful (মাধুর্য, সৌন্দর্য) calms and pacifies us (cf. ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ—১১।৫১); the sublime (ঐশ্বর্য, অদ্ভুতরস) brings disorders into our faculties (cf. 'প্রব্যথিতান্তরাত্মা', 'ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো'—১১।২৪।২৫।৪৫).

—*Weber's History of Philosophy*

The sublime is incompatible with charms; and as the mind is not merely attracted by the object but continually in turn repelled, satisfaction in the sublime does not so much contain positive pleasure (cf. 'ন লভে চ শর্ম' ১১।২৫) as admiration and respect. (cf. 'ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ', 'প্রণম্য শিরসা দেবং'—১১।১৪). —*Kant*

"The beautiful is the *infinite* represented in the *finite* form". —*Schelling.*

শ্রীভগবান্ উবাচ

ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্ ॥ ৪৭

এ সকল কথার মর্ম এই যে—"সান্ত ধারণাযোগ্য পদার্থের সহিত সৌন্দর্যের সম্বন্ধ; বৃহৎ লোকাতিগম পদার্থের সহিত অদ্ভুত রসের সম্বন্ধ। প্রকৃত সৌন্দর্য আমাদিগের হৃদয়ে অমৃতধারা সিঞ্চন করে—তাহার সমস্তই মধুময়। অদ্ভুতরস ঐশ্বর্য-মিশ্রিত; তথায় আনন্দ আছে বটে, কিন্তু ঐ আনন্দ ভীতি-বিমিশ্রিত। পণ্ডিতগণ সৌন্দর্য ও অদ্ভুত রসের পার্থক্য স্বীকার করিয়াছেন।" (অভয়কুমার গুহ এম এ., বি. এল.-প্রণীত 'সৌন্দর্য-তত্ত্ব' নামক উপাদেয় দার্শনিক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত)।

শ্রীকৃষ্ণের রূপ—এস্থলে অর্জুন ভগবানের চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি দেখিতে চাহিতেছেন। কৃষ্ণলীলায় কিন্তু ভগবান্ দ্বিভুজ; কিন্তু বসুদেবগৃহে তিনি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ রূপেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পরে কংসভয়ে ভীত বসুদেবের প্রার্থনায় দুই বাহু সংবরণ করেন। কিন্তু সময় সময় চতুর্ভুজ মূর্তিও ধারণ করিয়াছেন (শ্রীভাগবত ১০।৮৩।২৮)।

"অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দ্বিভুজ দেখিলেও তাঁহাকে চতুর্ভুজ বিষ্ণু বলিয়াই জানিতেন, ইহাই তাঁহার ইষ্টমূর্তি। ভগবানের যে কোন মূর্তিই সাধক দর্শন করুন না কেন, তাহাতে তাঁহার ইষ্টমূর্তিই দৃষ্ট হইয়া থাকে।"—কৃষ্ণানন্দস্বামী

৪৭। শ্রীভগবান্ উবাচ—হে অর্জুন, প্রসন্নেন (প্রসন্ন হইয়া) ময়া (আমাকর্তৃক) আত্মযোগাৎ (স্বীয় যোগপ্রভাবে) তব ইদং (তোমার এই) তেজোময়ম্ অনন্তম্ আদ্যং (আদিভূত), পরং বিশ্বং রূপং (উত্তম বিশ্বাত্মক রূপ) দর্শিতম্ (প্রদর্শিত হইল); যৎ মে (আমার যে রূপ) ত্বদন্যেন (তুমি ভিন্ন অন্য কর্তৃক) ন দৃষ্টপূর্বম্ (পূর্বে দৃষ্ট হয় নাই)।

আত্মযোগাৎ—আত্মযোগবলে; এস্থলে যোগ শব্দের অর্থ অলৌকিক সৃষ্টিসামর্থ্য (২৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

পূর্বরূপ ধারণ, বিশ্বরূপ দর্শনের দুর্লভতা বর্ণন ৪৭-৫৩

শ্রীভগবান্ বলিলেন, আমি প্রসন্ন হইয়া স্বকীয় যোগপ্রভাবেই এই তেজোময়, অনন্ত, আদ্য, বিশ্বাত্মক পরমরূপ তোমাকে দেখাইলাম; আমার এই রূপ তুমি ভিন্ন পূর্বে কেহ দেখে নাই। ৪৭

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮
মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্‌মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যর্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ॥ ৫০

৪৮। হে কুরুপ্রবীর, ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ (না বেদাধ্যয়ন দ্বারা, না যজ্ঞবিদ্যা অধ্যয়ন দ্বারা), ন দানৈঃ (না দানের দ্বারা), ন চ ক্রিয়াভিঃ (না অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া দ্বারা), ন উগ্রৈঃ তপোভিঃ (না উগ্র তপস্যাদ্বারা) এবংরূপঃ অহং (ঈদৃশ রূপ আমি) নৃলোকে (মনুষ্যলোকে) ত্বদন্যেন (তুমি ভিন্ন অন্য কর্তৃক) দ্রষ্টুং শক্যঃ (দর্শনযোগ্য) [হই]।

বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ—বেদানাং যজ্ঞবিদ্যানাঞ্চ অধ্যয়নৈঃ ইত্যর্থঃ। যজ্ঞশব্দেন যজ্ঞবিদ্যাঃ কল্পসূত্রাদ্যা লক্ষ্যন্তে (শ্রীধর)—যজ্ঞ শব্দের দ্বারা কল্পসূত্রাদি যজ্ঞবিদ্যা বুঝিতে হইবে।

হে কুরুপ্রবীর, না বেদাধ্যয়ন দ্বারা, না যজ্ঞবিদ্যার অনুশীলন দ্বারা, না দানাদি ক্রিয়াদ্বারা, না উগ্র তপস্যা দ্বারা মনুষ্যলোকে তুমি ভিন্ন আর কেহ আমার ঈদৃশ রূপ দেখিতে সক্ষম হয়। ৪৮

৪৯। ঈদৃক্ (এই প্রকার) ইদং মম ঘোরং রূপং (এই আমার ভয়ঙ্কর রূপ) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) তে ব্যথা (তোমার ভয়) মা (না হউক), বিমূঢ়ভাবঃ চ মা (ব্যাকুল ভাব না হউক); ব্যপেতভীঃ (অপগতভয়), প্রীতমনাঃ (প্রসন্নচিত্ত হইয়া) পুনঃ ত্বং (তুমি) মে ইদং তৎ রূপং (আমার এই সেই পূর্ব রূপ) প্রপশ্য (দর্শন কর)।

তুমি আমার এই ঘোর রূপ দেখিয়া ব্যথিত হইও না, বিমূঢ় হইও না; ভয় ত্যাগ করিয়া প্রীতমনে পুনরায় তুমি আমার পূর্বরূপ দর্শন কর। ৪৯

৫০। সঞ্জয়ঃ উবাচ,—বাসুদেবঃ অর্জুনং [প্রতি] ইতি উক্ত্বা (এইরূপ কহিয়া) ভূয়ঃ তথা স্বকং রূপং (সেই প্রকার স্বকীয় রূপ) দর্শয়ামাস (দেখাইলেন); মহাত্মা পুনঃ সৌম্যবপুঃ (প্রসন্ন মূর্তি) ভূত্বা (ধারণ করিয়া) ভীতম্ এনম্ অর্জুনম্ আশ্বাসয়ামাস (আশ্বস্ত করিলেন)।

অর্জুন উবাচ
দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১

শ্রীভগবান্ উবাচ
সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫২
নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩

সঞ্জয় বলিলেন—বাসুদেব অর্জুনকে এই বলিয়া পুনরায় সেই স্বীয় মূর্তি দেখাইলেন; মহাত্মা পুনরায় প্রসন্ন মূর্তি ধারণ করিয়া ভীত অর্জুনকে আশ্বস্ত করিলেন। ৫০

৫১। অর্জুনঃ উবাচ,—হে জনার্দন, তব ইদং সৌম্যং মানুষং রূপং দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) ইদানীং (এখন) সচেতাঃ (প্রসন্নচিত্ত) সংবৃত্তঃ (সঞ্জাত) অস্মি (হইলাম); প্রকৃতিং গতঃ (প্রকৃতিস্থ,সুস্থ) [হইলাম]।

অর্জুন বলিলেন—হে জনার্দন, তোমার এই সৌম্য মানুষ রূপ দর্শন করিয়া আমি এখন প্রসন্নচিত্ত ও প্রকৃতিস্থ [সুস্থ] হইলাম। ৫১

এই মানুষমূর্তি দ্বিভুজ না চতুর্ভুজ?—অর্জুন চতুর্ভুজ মূর্তি দেখিতে চাহিয়াছিলেন। কেহ বলেন, সেই চতুর্ভুজ মূর্তিকেই মানুষ মূর্তি বলা হইয়াছে। কেহ বলেন, শ্রীভগবান্ প্রথমে চতুর্ভুজ মূর্তি ধারণ করিয়া পরে দ্বিভুজ হইয়াছিলেন। কেননা, পার্থসারথিরূপেও তিনি দ্বিভুজ, ব্রজলীলায়ও দ্বিভুজ মুরলীধর।

৫২। শ্রীভগবান্ উবাচ—মম ইদং সুদুর্দর্শং (দুর্নিরীক্ষ্য) যৎ রূপং দৃষ্টবান্ অসি (দেখিলে) দেবাঃ অপি অস্য রূপস্য (এই রূপের) নিত্যং দর্শন-কাঙ্ক্ষিণঃ (নিত্য দর্শনের অভিলাষী)।

শ্রীভগবান্ বলিলেন—তুমি আমার যে রূপ দেখিলে, উহার দর্শন লাভ একান্ত কঠিন; দেবগণও সর্বদা এই রূপের দর্শনাকাঙ্ক্ষী। ৫২

৫৩। মাং যথা দৃষ্টবান্ অসি (আমাকে যেরূপ দেখিলে) এবংবিধঃ অহং ন বেদৈঃ, ন তপসা, ন দানেন, ন চ ইজ্যয়া (না যজ্ঞের দ্বারা) দ্রষ্টুং শক্যঃ (দৃষ্ট হইতে পারি)।

আমাকে যে রূপে দেখিলে এই রূপ বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান, যজ্ঞ, কোন কিছু দ্বারাই দর্শন করা যায় না। ৫৩

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥ ৫৪
মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ৫৫

৫৪। হে পরন্তপ, হে অর্জুন, অনন্যয়া ভক্ত্যা তু (কিন্তু অনন্যা ভক্তিদ্বারাই) এবংবিধঃ অহং (ঈদৃশ আমি) তত্ত্বেন (স্বরূপতঃ) জ্ঞাতুং (জানিতে) দ্রষ্টুং চ (দেখিতে) প্রবেষ্টুং চ (ও প্রবেশ করিতে) শক্যঃ (সমর্থ হয়)।

ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠতা ও গীতার্থ-সারতত্ত্ব উপদেশ ৫৪-৫৫

হে পরন্তপ, হে অর্জুন, কেবল অনন্যা ভক্তিদ্বারাই ঈদৃশ আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে পারা যায়, সাক্ষাৎ দেখিতে পারা যায় এবং আমাতে প্রবেশ করিতে পারা যায়। ৫৪

একমাত্র অনন্যা ভক্তি দ্বারাই পরমেশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান হয়, তাঁহার সাক্ষাৎকার হয় এবং পরিশেষে উহার সহিত তাদাত্ম্য লাভ হয়। এই শেষ অবস্থাকে ভক্তিশাস্ত্রে অধিরূঢ় ভাব বলে (১৮।৫৪ দ্রষ্টব্য)।

৫৫। [হে] পাণ্ডব, যঃ (যে ব্যক্তি) মৎকর্মকৃৎ (আমার কর্মানুষ্ঠানকারী), মৎপরমঃ (মৎপরায়ণঃ), মদ্ভক্তঃ (আমার ভজনশীল), সঙ্গবর্জিতঃ (স্পৃহাশূন্য), সর্বভূতেষু নির্বৈরঃ (সর্বভূতে বৈরভাবশূন্য), সঃ মাম্ এতি (তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন)।

হে পাণ্ডব, যে ব্যক্তি আমারই কর্মবোধে সমুদয় কর্ম করেন, আমিই যাঁহার একমাত্র গতি, যিনি সর্বপ্রকারে আমাকে ভজনা করেন, যিনি সমস্ত বিষয়ে আসক্তিশূন্য, যাঁহার কাহারও উপর শত্রু-ভাব নাই, তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হন। ৫৫

গীতার্থসার

শাঙ্কর-ভাষ্যে ও শ্রীধরস্বামিকৃত টীকায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, এই শ্লোকটিতে সমস্ত গীতাশাস্ত্রের সারাংশ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। জীবের যাহা একমাত্র নিঃশ্রেয়স, সেই মোক্ষ, বা ভগবৎপ্রাপ্তি কিরূপে সাধকের ঘটে; এই শ্লোকে তাহাই সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। কথা কয়েকটি সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে।—

১। প্রথম কথা হইতেছে **মৎকর্মকৃৎ,** অর্থাৎ যিনি ভগবানের কর্ম করেন বা তাঁহার প্রীত্যর্থ কর্ম করেন। মায়ামুগ্ধ জীব 'আমার সংসার

আমার কর্ম, আমি কর্তা' এই ভাবেই প্রমত্ত। সে জানে না যে, সমস্ত কর্মই পরমেশ্বরের, কর্তা ও কারয়িতা একমাত্র তিনিই—সে নিমিত্তমাত্র। যিনি বৈদিক লৌকিক সমস্ত কর্ম তাঁহাকে অর্পণ করিয়া তাঁহারই ভৃত্য বোধে তাঁহারই কর্ম তাঁহারই প্রীত্যর্থ সম্পন্ন করেন, তিনিই 'মৎকর্মকৃৎ'। মর্মার্থ এই যে, অহঙ্কার ও কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া যথাপ্রাপ্ত কর্তব্য কর্ম লোকসংগ্রহার্থ তাঁহারই কর্মবোধে সম্পন্ন করিতে হইবে, কর্মত্যাগ করিতে হইবে না।

কেহ কেহ বলেন—মন্মন্দির নির্মাণ-তদ্বিমার্জন-মৎপুষ্পবাটী-তুলসী-কাননাদি-সংস্কার-তৎসেচনাদি ভগবৎপূজার্চনা সম্বন্ধীয় কর্মই 'মৎকর্ম' (বলদেব)। অবশ্য এ সকল সাধন-ভক্তির অঙ্গ এবং অবস্থাবিশেষে একমাত্র কর্তব্যও হইতে পারে; ১২।১০ শ্লোকে 'মৎকর্মপরম' শব্দে সম্ভবতঃ এই সকল লক্ষ করা হইয়াছে। কিন্তু পরেই 'মৎযোগ আশ্রয়' অর্থাৎ ফলত্যাগ করিয়া সর্বকর্ম করাই শ্রেষ্ঠ পথ, এই কথা বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ, সংসার শ্রীকৃষ্ণের, যথাপ্রাপ্ত সাংসারিক কর্মও তাঁহারই কর্ম এবং তাহাই নিষ্কামভাবে করিতে হইবে, ইহাই শ্রীকৃষ্ণোক্ত ধর্মের স্থূল মর্ম, ইহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না।

২। দ্বিতীয় কথা হইতেছে, তাহাকে **সঙ্গবর্জিত** হইতে হইবে, অর্থাৎ সর্বপ্রকার আসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে। বিষয়াসক্ত হইয়া জীব নিরন্তর শুভাশুভ কর্মকাণ্ডে ব্যাপৃত আছে, ফলাসক্ত হইয়া সে যজ্ঞদান-তপস্যাদিও করে, তাহাতে ফললাভও হয়, কিন্তু মোক্ষলাভ হয় না—তাহাতে ভগবানের পরম পদ লাভেরও সম্ভাবনা নাই।

৩। তাহা লাভ করিতে হইলে তাহাকে **মৎপরম** ও **মদ্ভক্ত** হইতে হইবে, অর্থাৎ একমাত্র ভগবান্‌ই পরমগতি, ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের একমাত্র আশ্রয়, এইরূপ স্থির করিয়া ঐকান্তিক দৃঢ়তার সহিত সর্বপ্রকারে তাঁহারই ভজনা করিতে হইবে।

৪। সঙ্গে সঙ্গে **সর্বভূতে নির্বৈর** হইতে হইবে। কেননা, সর্বভূতেও তিনিই আছেন, সুতরাং জীবের প্রতি অবজ্ঞা, ঘৃণা বা বৈরভাব পোষণ করিলে ঈশ্বর-প্রীতি হয় না। লোক-প্রীতি ও ঈশ্বর-ভক্তি বস্তুতঃ অভিন্ন (৬।৩১ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। এই তত্ত্ব অন্যত্র 'সর্বভূতাত্ম-ভূতাত্মা' 'সর্বত্র সমদর্শনঃ' 'যো মাং পশ্যতি সর্বত্র' ইত্যাদি নানা কথায় ব্যক্ত করা হইয়াছে।

সুতরাং এই শ্লোকে সর্বভূতে সমত্ববুদ্ধি-লক্ষণ সম্যক্ **জ্ঞান,** ভগবানে ঐকান্তিক **ভক্তি** এবং তাঁহার কর্মবোধে লোকসংগ্রহার্থ যথাপ্রাপ্ত নিয়ত **কর্ম** সম্পাদন, এই তিনটি যুগপৎ উপদিষ্ট হইল ; ইহাই গীতাশাস্ত্রের সারার্থ।

রহস্য—অহিংস-নীতি ও ধর্ম্যযুদ্ধ

প্রঃ। গীতার সারার্থ বুঝিলাম, কিন্তু 'নির্বৈর' কথাটার মর্ম বুঝিলাম না। গীতায় সর্বত্রই ভগবান্ প্রিয় শিষ্যকে যুদ্ধকার্যে প্রণোদিত করিতেছেন, অর্জুনও ভগবদ্-বাক্যে প্রবুদ্ধ হইয়া পরিশেষে যুদ্ধই করিলেন। এ স্থলে কিন্তু 'নির্বৈর' হইতে বলা হইতেছে। ইহাই যদি গীতার সারকথা হয়, তবে 'যুদ্ধ কর' 'যুদ্ধ কর' এ সব কথা কি কথার কথা মাত্র? 'নির্বৈর' হইলে আবার যুদ্ধ হয় কিরূপে? এই শ্লোকে এবং ১২।১৩ প্রভৃতি শ্লোকে 'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাম্' 'সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী' ইত্যাদি রূপেই জ্ঞানী ভগবদ্ভক্তের বর্ণনা আছে এবং উহাকেই ১২।২০ শ্লোকে 'ধর্মামৃত' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এ সকল ত অহিংসা ও ক্ষমাধর্মের চরম আদর্শ। মহাভারতের অন্যান্য বহু স্থলেই এইরূপ অহিংসা, অক্রোধ ও ক্ষমাধর্মেরই উপদেশ আছে। যেমন—

'ন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাৎ সাধুরেব সদা ভবেৎ' (—মহাভাঃ বনপর্ব); 'ন চাপি বৈরং বৈরেণ কেশব ব্যুপশাম্যতি' (—উদ্যোঃ ৭২।৬৩); 'অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধং অসাধুং সাধুনা জয়েৎ' (—বিদুর-বাক্য); 'ধর্মেণ নিধনং শ্রেয়ঃ ন জয়ঃ পাপকর্মণা' (—ভীষ্ম-বাক্য, শাং ৯৫।১৬)।

এ সকল কথার মর্ম এই যে, শত্রুকে প্রীতি দ্বারা, অসাধুকে সাধুতা দ্বারাই জয় করিবে। শত্রুর সহিত শত্রুতাচরণ করিবে, এ উপদেশ কোথায়?

উঃ। তাহাও আছে, বহু স্থলে। শান্তিপর্বে ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে ধর্মতত্ত্ব এইরূপ বলিতেছেন—'যস্মিন্ যথা বর্ততে যো মনুষ্যস্তস্মিংস্তথা বর্তিতব্যং স ধর্মঃ'—তোমার সহিত যে যেরূপ ব্যবহার করে তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করাই ধর্মনীতি (শান্তিপর্ব ১০৯।৩০, অপিচ উদ্যোগপর্ব ১৭৯।৩০) অর্থাৎ যে হিংসুক—যেমন দুর্যোধনাদি, তাহার প্রতি হিংসানীতিই অবলম্বনীয় এবং উহাই সে স্থলে ধর্ম, নচেৎ লোকরক্ষা হয় না ; কারণ, 'যঃ স্যাদ্ধারণসংযুক্তঃ স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ'—যাহাদ্বারা লোকরক্ষা হয় তাহাই ধর্ম (শান্তি ১০৯।১১)। এই হেতু ভক্তরাজ প্রহ্লাদও পৌত্র বলিকে উপদেশ দিয়াছেন—'ন শ্রেয়ঃ সততং তেজো ন নিত্যং শ্রেয়সী ক্ষমা'। 'তস্মান্নিত্যং ক্ষমা তাত পণ্ডিতৈরপবাদিতা'—সর্বদাই তেজ বা ক্ষমা প্রকাশ শ্রেয়স্কর নহে, অবস্থানুসারে ব্যবস্থা ; সকল অবস্থায়ই ক্ষমা

করাটা পণ্ডিতেরা মন্দ বলিয়া থাকেন (মহাভাঃ বন, ২৮।৬।৮)। বীরনারী বিদুলাও শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত অথচ প্রতিকারে পরাঙ্মুখ নিরুদ্যম পুত্রকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়াছিলেন—'উত্তিষ্ঠ হে কাপুরুষ, মা স্বাপ্সীঃ শত্রুনির্জিতঃ', 'ক্ষমাবান্নিরমর্ষশ্চ নৈব স্ত্রী ন পুনঃ পুমান্'—হে কাপুরুষ, শত্রুনির্জিত হইয়া আর শয়নে থাকিও না, উঠ ; যে নিয়ত ক্ষমাশীল, নির্জিত হইয়াও যে ক্রুদ্ধ হয় না, প্রতিকার করে না, সে স্ত্রীও নহে, পুরুষও নহে—অর্থাৎ ক্লীব (—মহাভাঃ উদ্যো, ১৩৪।১২।৩৩)। এ সকল স্থলে অবস্থাবিশেষে যুদ্ধাদি হিংসাত্মক কর্মের অনুমোদন এবং ক্ষমাধর্মের অপবাদই করা হইয়াছে। বস্তুতঃ, ব্যবহারিক ধর্মতত্ত্ব বড় সূক্ষ্ম ও জটিল। অহিংসনীতি ও অত্যাচারী সংহার, সত্যকথন ও দস্যুতাড়িত পলায়নপর আশ্রিতের রক্ষা, ইত্যাদি স্থলে যখন পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন কোন্‌টি ধর্ম, কোন্‌টি অধর্ম তাহা নির্ণয় করা বড় সহজ নহে, এই হেতু মহাভারতে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে, 'সূক্ষ্মা গতির্হি ধর্মস্য।' ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরও বিভিন্ন শ্রুতি, স্মৃতি ও নানা মুনির নানা মত দেখিয়া, 'ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্', অর্থাৎ ধর্মতত্ত্ব একরূপ অজ্ঞেয় এইরূপই বলিয়াছেন এবং 'মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ' এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতেও পথ সুস্পষ্ট দেখা যায় না, কেননা মুনিগণও মহাজনের মধ্যেই এবং অন্য মহাজনগণের মধ্যেও মতভেদ হইতে পারে। তবে স্বনামখ্যাত টীকাকার শ্রীমন্নীলকণ্ঠ এস্থলে 'মহাজন' শব্দের অর্থ করেন 'বহুজন' অর্থাৎ তাঁহার মতে অধিক লোক যে পথ অবলম্বন করে সংশয়স্থলে তাহাই অনুসরণ-যোগ্য, এই অর্থ। ইহারই নামান্তর লোকাচার। এই ব্যাখ্যাই সমীচীন বোধ হয়, কিন্তু ইহাতেও প্রকৃত তত্ত্বের কোন মীমাংসা হয় না। মহাভারতে এ সকল প্রসঙ্গে অনেক সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচার-বিতর্ক আছে। তাহার আলোচনা করার স্থানাভাব, এস্থলে প্রয়োজনও নাই। কেননা গীতায় ভগবান্ ধর্মাধর্ম নির্ণয়ের এ সকল লৌকিক নীতিশাস্ত্রের পন্থা অবলম্বন করেন নাই। যে সার্বভৌম মূলতত্ত্বের উপর সমগ্র ধর্মশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত এবং যাহা অধিগত হইলে জীবের পরম নিঃশ্রেয়স লাভ হয় এবং জগৎব্যাপারও অব্যাহত থাকে, সেই সনাতন অধ্যাত্মতত্ত্বের ভিত্তিতেই ভগবান্ অর্জুনকে কর্মযোগের উপদেশ দিয়াছেন। উহার স্থূল কথা হইতেছে এই,—আত্মজ্ঞান লাভ কর, কামনা ত্যাগ কর, স্থিত-প্রজ্ঞ হও, সর্বভূতে সমদর্শী হও, অহংজ্ঞান ও মমত্ব-বুদ্ধি দূর কর,—আমাতে আত্মসমর্পণ ও সর্বকর্ম সমর্পণ কর, আমারই ভৃত্যবোধে আপনাকে নিমিত্তমাত্র জ্ঞান করিয়া নিষ্কামভাবে যথাপ্রাপ্ত কর্ম করিয়া

যাও, তাহাতে কর্মের শুভাশুভ-ফলভাগী হইবে না। এস্থলে 'নির্বৈর' শব্দের অর্থ এই যে, কাহারও প্রতি বৈরভাব রাখিবে না। আসক্তি যাহার ত্যাগ হইয়াছে, অহংজ্ঞান যাহার নাই, সর্বভূতে যাহার সমত্ববুদ্ধি জন্মিয়াছে—যাহার আত্মপরে, শত্রুমিত্রে ভেদবুদ্ধি নাই, তাহার মনে বৈরভাব আসিবে কিরূপে? এইরূপ সমত্ববুদ্ধি-সম্পন্ন শুদ্ধ অন্তঃকরণে নির্বৈর হইয়াও যুদ্ধ করা চলে এবং তাহাই শ্রীভগবানের উপদেশ। লোকরক্ষা বা লোকহত্যা ইত্যাদি ধর্মাধর্ম বিচার এস্থলে উপস্থিত হয় না, কেননা ধর্মাধর্ম, পাপপুণ্য কর্মে নাই—উহা বুদ্ধিতে, বাসনায়। বুদ্ধি যদি সমত্ব প্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধ হয়, অহংজ্ঞান ও আসক্তি যদি ত্যাগ হয়, তবে কর্ম যাহাই হউক উহাতে কোন বন্ধন হয় না (১৮।১৬ ১৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

"সমত্ববুদ্ধিতে কৃত ঘোর যুদ্ধও ধর্ম্য ও শ্রেয়স্কর"—ইহাই গীতার সমস্ত উপদেশের সার, দুষ্টের সহিত দুষ্ট ব্যবহার করিবে না, ক্রুদ্ধ হইবে না, ইত্যাদি ধর্মতত্ত্ব স্থিতপ্রজ্ঞ যোগীর মান্য নহে, এরূপ নহে, কিন্তু 'নির্বৈর' শব্দের অর্থ নিষ্ক্রিয় কিংবা প্রতিকারশূন্য, নিছক সন্ন্যাসমার্গের এই মত তাঁহার মান্য নহে। বৈর অর্থাৎ মনের দুষ্টবুদ্ধি ত্যাগ করিবে, কর্মযোগী নির্বৈর পদের এই অর্থই বুঝেন, এবং কেহই যখন কর্ম হইতে মুক্ত হইবে না (৩।৫ শ্লোক) তখন লোক-সংগ্রহ কিংবা প্রতিকারার্থে যাহা আবশ্যক ও সম্ভব সেইটুকু কর্ম মনে দুষ্ট বুদ্ধি না রাখিয়া কেবল কর্তব্য বলিয়া বৈরাগ্য ও নিঃসঙ্গ বুদ্ধিতে করিতে থাকিবে, এইরূপ কর্মযোগের উক্তি (৩।১৯)। তাই এই শ্লোকে (১১।৫৫) শুধু 'নির্বৈর' পদ প্রয়োগ না করিয়া তৎপূর্বেই 'মৎকর্মকৃৎ', অর্থাৎ 'আমার' অর্থাৎ 'পরমেশ্বরের প্রীত্যর্থ পরমেশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে যে কর্ম করে' এই আর একটি গুরুতর রকম বিশেষণ দিয়া শ্রীভগবান্ গীতায় নির্বৈর ও কর্মের ভক্তিদৃষ্টিতে জোড়ানৌকা ভাসাইয়াছেন। এই জন্যই এই শ্লোকে সমগ্র গীতাশাস্ত্রের সারভূত তাৎপর্য আসিয়াছে। —গীতা-রহস্য, লোকমান্য তিলক

একাদশ অধ্যায়—বিশ্লেষণ ও সার সংক্ষেপ

বিশ্বরূপ দর্শন

১—৮ বিশ্বরূপ দর্শনার্থ অর্জুনের প্রার্থনা, তদর্থে দিব্যচক্ষুদান; ৯—১৪ সঞ্জয়কৃত বিশ্বরূপ বর্ণনা; ১৫—৩১ অর্জুনকৃত বিশ্বরূপ বর্ণনা: বিশ্বরূপে যুদ্ধের ভবিষ্য ঘটনা দর্শনে ভীতি-বিহ্বল অর্জুনের প্রশ্ন—আপনি কে? ৩২—৩৪ ভগবানের কালস্বরূপের বর্ণন, নিমিত্তমাত্র হইয়া যুদ্ধার্থ উপদেশ;

৩৫—৪৬ অর্জুনকৃত বিশ্বরূপের স্তব এবং পূর্ব সৌম্যরূপ দর্শনার্থ প্রার্থনা; ৪৭—৫৩ ভগবানের পূর্বরূপ ধারণ ও বিশ্বরূপ দর্শনের দুর্লভতা বর্ণন; ৫৪—৫৫ ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠতা ও গীতার্থ-সারতত্ত্ব উপদেশ।

পূর্ব অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ স্বীয় নানা বিভূতির বর্ণনা করিয়া পরিশেষে বলিলেন—আমার বিভূতি-বিস্তারের অন্ত নাই, সংক্ষেপে এই জানিয়া রাখ যে, আমি সমগ্র জগৎ একাংশে ধারণ করিয়া আছি; আমার পূর্ণ মহিমা, সমগ্র স্বরূপ জীবের অচিন্ত্য। তখন অর্জুন বলিলেন—তুমি পরমেশ্বর, ব্যক্তস্বরূপে বিশ্বই তোমার রূপ, তুমি বিশ্বরূপ। আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে তোমার সেই ঐশ্বরিক রূপ দর্শন করি। যদি আমি তাহা দেখিবার যোগ্য হই, তবে আমাকে তোমার সেই বিশ্বরূপ দেখাও। ভক্তবৎসল ভগবান্ তখন অর্জুনকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিয়া স্বীয় বিশ্বরূপ দেখাইলেন। এই অধ্যায়ে সেই বিশ্বরূপেরই বর্ণনা। সে বর্ণনা অতুলনীয়, ভাষান্তরে তাহার ওজস্বিতা, গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্য রক্ষা করা কঠিন।

অনির্বচনীয়, অদৃষ্টপূর্ব, অত্যদ্ভুত সেই বিশ্বরূপ, তাহাতে একত্র সমবস্থিত, চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিদৃশ্যমান। সেই বিশ্বমূর্তির অসংখ্য উদর, বদন ও নয়ন, অসংখ্য অদ্ভুত অদ্ভুত বস্তু তাহাতে বিদ্যমান। তাহা সর্বতঃপূর্ণ, সর্বব্যাপী—তাহার আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই। সহস্র সূর্যের প্রভায় তাহা উদ্ভাসিত। সেই অপূর্ব বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া ধনঞ্জয় বিস্ময়ে আপ্লুত হইলেন, তাঁহার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, তিনি অবনত মস্তকে সেই দেবদেবকে প্রণাম করিয়া স্তুতি আরম্ভ করিলেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ-ব্যাপারে যাহা ঘটিবে শ্রীভগবান্ বিশ্বরূপে সেই ভবিষ্য দৃশ্যটিও দেখাইতেছেন। সে কি ভীষণ দৃশ্য! অর্জুন দেখিতেছেন—ভীষ্মদ্রোণাদি সেনানায়কগণ যাবতীয় যোদ্ধৃবর্গসহ অগ্নিতে পতঙ্গকুলের ন্যায় দ্রুতবেগে ধাবমান হইয়া সেই বিরাট বিশ্বমূর্তির করাল কবলে প্রবেশ করিতেছেন। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দর্শন করিয়া অর্জুন ভীতকম্পিতস্বরে বলিতে লাগিলেন—হে দেববর, উগ্রমূর্তি আপনি কে,আমাকে বলুন, আমি ভয়ে বিহ্বল হইয়াছি, আপনাকে প্রণাম করি, প্রসন্ন হউন। আপনার এই সংহারমূর্তি দেখিয়া আমি বুঝিতেছি না আপনি কে, কি কার্যে প্রবৃত্ত। তখন শ্রীভগবান্ বলিলেন—আমি লোকক্ষয়কারী মহাকাল, আমি এখন সংহার-কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুমি যুদ্ধ না করিলেও প্রতিপক্ষ সৈন্যদলে কেহই জীবিত থাকিবে না। বস্তুতঃ আমি সকলকেই নিহত করিয়া রাখিয়াছি। তুমি এখন নিমিত্তমাত্র হও।

শ্রীভগবানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জুন কম্পিতকলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণামপূর্বক গদ্‌গদস্বরে পুনরায় ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে বলিলেন—তোমার এই উগ্রমূর্তি আর দর্শন করিতে পারি না, আমি ভয়ে বিহ্বল হইয়াছি, আমাকে তোমার পূর্ব সৌম্য মূর্তি দেখাও। হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

তখন শ্রীভগবান্ তাঁহার সৌম্যমূর্তি ধারণ করিয়া অর্জুনকে আশ্বস্ত করিলেন এবং বলিলেন, তুমি আমার যে বিশ্বরূপ দর্শন করিলে তাহা দেবগণেরও দর্শন করা সম্ভব নহে; অনন্যা ভক্তি ব্যতীত বিশ্বরূপের দর্শনলাভ হয় না। যিনি সর্বভূতে বৈরভাবশূন্য, সর্ববিষয়ে আসক্তিশূন্য হইয়া অনন্যভাবে আমাকে আশ্রয় করিয়া সর্বতোভাবে আমার ভজনা করেন এবং নিষ্কামভাবে আমারই কর্মবোধে যথাপ্রাপ্ত নিয়ত কর্ম সম্পাদন করেন, আমার ঈদৃশ ভক্তই আমাকে প্রাপ্ত হন। এই বলিয়া শ্রীভগবান্ অর্জুনকে ঈশ্বরার্পণপূর্বক অনাসক্ত চিত্তে যুদ্ধাদি সমস্ত কর্ম করিবার জন্য গীতার্থ সারভূত চরম উপদেশ প্রদান করিলেন।

বিশ্বরূপ ও ভূমাবাদ

'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম'—ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এ সমস্তই ব্রহ্ম। এই দুইটি শ্রুতিবাক্যকে সনাতন ধর্মের ভিত্তি বলা যায়। কিন্তু এই বাক্য দুইটির ব্যাখ্যায় বৈদান্তিকগণের মধ্যে মর্মান্তিক মতভেদ আছে। এক পক্ষ বলেন,—ব্রহ্ম কেবল এক নহেন, তিনি অদ্বিতীয় অর্থাৎ তাঁহা ভিন্ন অন্য কিছু নাই, তিনি অখণ্ড অদ্বৈত তত্ত্ব, সমস্ত দ্বৈত বর্জিত, তাঁহার মধ্যে নানাত্ব নাই ('নেহ নানাস্তি কিঞ্চন'—কঠ), তিনি ভূমা। এই যে দৃশ্যপ্রপঞ্চ, বহু-বিভক্ত জগৎ যাহা আমরা দেখি, ইহার বাস্তব সত্তা নাই; একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, তিনিই একমাত্র সত্য বস্তু। ভ্রমবশতঃ সেই ব্রহ্ম-বস্তুতেই জগতের অধ্যাস হয়—যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, মরীচিকায় জলভ্রম হয়। এই ভ্রমের কারণ মায়া বা অজ্ঞান, অজ্ঞান বিদূরিত হইলেই ব্রহ্ম উদ্ভাসিত হন। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু যেমন অলীক, স্বপ্ন ভাঙ্গিলে আর তাহার বোধ থাকে না, এই জগৎও সেইরূপ স্বপ্নবৎ অলীক, অজ্ঞান দূর হইলে উহার জ্ঞান থাকে না। ('অদ্বিতীয়-ব্রহ্মতত্ত্বে স্বপ্নোঽয়ং অখিলং জগৎ' ৩৪।৩৫ পৃষ্ঠা এবং 'মায়া-তত্ত্ব' বিবৃতি-সূচী দ্রঃ)।

অপরপক্ষ বলেন—ব্রহ্ম অদ্বিতীয় তাহা ঠিক, ব্রহ্মই এই সমস্ত হইয়াছেন ('তৎ সর্বমভবৎ'—বৃহ. উপ.)। তিনিই জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান

কারণ। তিনি আপনাকে জগৎরূপে পরিণত করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে বহু শ্রুতিবাক্য আছে। যথা—আমি এক আছি, বহু হইব, আমি সৃষ্টি করিব ('একোঽহং বহু স্যাম্ প্রজায়েয়')। তিনি এই সমস্ত সৃষ্টি করিলেন, সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবেশ করিলেন ('স ইদং সর্বম্ অসৃজত; তৎসৃষ্ট্বা তদেব অনুপ্রাবিশৎ'—তৈত্তিঃ ২।৬); কিরূপে কি উপাদানে সৃষ্টি করিলেন?—আপনিই আপনাকে এইরূপ করিলেন ('তদাত্মানং স্বয়মকুরুত'—তৈত্তিঃ ২।৭)। সুতরাং জগৎ মিথ্যা নহে, জগৎ ব্রহ্মের শরীর ('জগৎ সর্বং শরীরং তে')। বিশ্ব তাঁহার রূপ বা দেহ, এইজন্য তিনি বিশ্বরূপ।

কিন্তু বিশ্ব বলিতে আমরা কি বুঝি? সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া যে গ্রহরাজি ঘুরিতেছে, সেই সমস্ত লইয়া সৌরজগৎ (Solar System)। ইহাকেই আমরা সাধারণতঃ বিশ্ব বলি; হিন্দুশাস্ত্রে ইহার নাম ব্রহ্মাণ্ড। আমাদের পৃথিবী উহার অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র গ্রহ। কিন্তু এইরূপ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটি নয়, অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড আছে; ধূলিকণারও সংখ্যা করা যায়, কিন্তু বিশ্বের সংখ্যা করা যায় না ('সংখ্যা চেৎ রজসামস্তি বিশ্বানাং ন কদাচন')। জ্যোতির্বিজ্ঞানও বলে, আকাশে যে অসংখ্য নক্ষত্র দৃষ্ট হয় উহার প্রত্যেকটিই একটি সূর্য, এবং প্রত্যেক সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া এক একটি ব্রহ্মাণ্ড। এই অনন্ত কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁহার রূপ তিনিই বিশ্বরূপ। তিনিই ভূমা। ইহা ভূমাবাদের অন্য দিক্।

'একোঽপ্যসৌ রচয়িতুং জগদণ্ডকোটিং

*   *   *

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।' —ব্রহ্ম-সংহিতা

—এক হইলেও যিনি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়াছেন, যাঁহার দেহে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করিতেছে, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।

এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন বর্ণিত হইয়াছে। এই জন্য ইহাকে 'বিশ্বরূপ-দর্শন-যোগ' বলে।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে **বিশ্বরূপদর্শনযোগো** নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ।

দ্বাদশ অধ্যায়

ভক্তিযোগ

অর্জুন উবাচ

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ ১

শ্রীভগবান্ উবাচ

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২

১। অর্জুনঃ উবাচ—এবং (এইরূপে) সততযুক্তাঃ (সতত ত্বদ্গতচিত্ত হইয়া) যে ভক্তাঃ (যে ভক্তগণ) ত্বাং পর্যুপাসতে (তোমাকে উপাসনা করেন), যে চ অপি (যাঁহারা) অব্যক্তম্ অক্ষরং (অব্যক্ত অক্ষরকে) [চিন্তা করেন], তেষাং (তাঁহাদিগের মধ্যে) কে (কাহারা) যোগবিত্তমাঃ (শ্রেষ্ঠ সাধক)?

যোগবিত্তমাঃ—যোগ শব্দের অর্থ ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় বা সাধনমার্গ। সেই উপায় যিনি জানেন, তিনি যোগবিৎ বা সাধক। সেই সাধকের মধ্যে যিনি সর্বোত্তম, তিনি যোগবিত্তম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সাধক।

অর্জুন বলিলেন—সতত ত্বদ্গতচিত্ত হইয়া যে-সকল ভক্ত তোমার উপাসনা করেন, এবং যাঁহারা অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা করেন, এই উভয়েব মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাধক কে? ১

সগুণ উপাসক ও নির্গুণ উপাসক মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

'এবং'—এইরূপে, অর্থাৎ একাদশ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে যে নিষ্কাম কর্মযুক্ত ভক্তির সাধন উক্ত হইয়াছে, তাহাই লক্ষ্য করা হইয়াছে। এইরূপ সগুণ ঈশ্বরের উপাসক এবং নির্গুণ ব্রহ্মোপাসক, ইঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে—ইহাই অর্জুনের প্রশ্ন।

২। শ্রীভগবান্ উবাচ—ময়ি (আমাতে) মনঃ আবেশ্য (মন নিবিষ্ট করিয়া) নিত্যযুক্তাঃ (নিত্যযুক্ত হইয়া) পরয়া শ্রদ্ধয়া উপেতাঃ (পরমশ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) যে (যাঁহারা) মাম্ উপাসতে (আমাকে উপাসনা করেন), তে (তাঁহারা) যুক্ততমাঃ (শ্রেষ্ঠ সাধক), মে মতাঃ (আমার মতে)।

যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে।
সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪

সগুণোপাসনাই শ্রেষ্ঠ ও সুসাধ্য ২-৮

শ্রীভগবান্ কহিলেন—যাঁহারা আমাতে মন নিবিষ্ট করিয়া নিত্যযুক্ত হইয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে আমার উপাসনা করেন, তাঁহারাই আমার মতে যুক্ততম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সাধক। ২

এই শ্লোকে স্পষ্টই বলা হইল যে, ব্যক্তোপাসনা বা ভক্তিমার্গই শ্রেষ্ঠ। তবে জ্ঞানমার্গে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা কি নিষ্ফল? না, তা নয়। জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মোপাসনা দ্বারাও তাঁহাকেই পাওয়া যায়। (পরের শ্লোক)।

৩-৪। যে তু (কিন্তু যাঁহারা) সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ (সর্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া) সর্বভূতহিতে রতাঃ (সর্বপ্রাণীর মঙ্গলকার্যে নিরত) [হইয়া] ইন্দ্রিয়গ্রামং সংনিয়ম্য (ইন্দ্রিয়গণকে সম্যক্ সংযত করিয়া), অব্যক্তম্ (ইন্দ্রিয়ের অগোচর) অনির্দেশ্যং (অনির্বচনীয়) সর্বত্রগম্ (সর্বব্যাপী) অচিন্ত্যং অচিন্তনীয়) কূটস্থম্ (সকলের মূলে অবস্থিত) অচলং (স্পন্দনরহিত) ধ্রুবম্ (নিত্য) অক্ষরং (নির্বিশেষ ব্রহ্মকে) পর্যুপাসতে (উপাসনা করেন), তে (তাঁহারা) মাম্ এব (আমাকেই) প্রাপ্নুবন্তি (প্রাপ্ত হন)।

কূটস্থ—ইহার নানা অর্থ হয়। (১) যিনি এই মিথ্যাভূত মায়িক জগতের অধিষ্ঠানরূপে অবস্থিত, অথচ নিত্য নির্বিকার (কূট=মায়া, অজ্ঞান, মিথ্যাভূত জগৎ-প্রপঞ্চ)। (২) গিরিশৃঙ্গবৎ নিশ্চলভাবে অবস্থিত (কূট=গিরিশৃঙ্গ)। (৩) সকল বস্তুর মূলে অবস্থিত। (৪) অপরিবর্তনীয়।

অনির্দেশ্য—যাহার জাতি, গুণ, ক্রিয়া, সম্বন্ধ কিছুই নির্দেশ করা যায় না।

কিন্তু যাঁহারা সর্বত্র সমবুদ্ধিযুক্ত এবং সর্বপ্রাণীর হিতপরায়ণ হইয়া ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া সেই অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্বব্যাপী, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব, অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারাও আমাকেই প্রাপ্ত হন। ৩-৪

নির্গুণ উপাসনায়ও আমাকেই পাওয়া যায়, কারণ আমি নির্গুণ-গুণী পুরুষোত্তম। সগুণ-নির্গুণ দুইই আমার বিভিন্ন বিভাবমাত্র। তবে সগুণ উপাসনা শ্রেষ্ঠ কেন?—কারণ নির্গুণ উপাসনা দেহধারীর পক্ষে দুঃসাধ্য। (পরের শ্লোকে)।

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ৫
যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬
তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭

৫। তেষাম্ অব্যক্তাসক্তচেতসাম্ (অব্যক্ত ব্রহ্মে আসক্তচিত্ত সেই ব্যক্তিগণের) অধিকতরঃ ক্লেশঃ [হয়], হি (যেহেতু) অব্যক্তা গতিঃ (অব্যক্ত ব্রহ্মবিষয়িণী নিষ্ঠা), দেহবদ্ভিঃ (দেহধারী অর্থাৎ দেহাভিমানী ব্যক্তিগণ কর্তৃক) দুঃখম্ অবাপ্যতে (দুঃখে লব্ধ হয়)।

দেহবদ্ভিঃ—'দেহাত্মাভিমানবদ্ভিঃ'—যাহাদের দেহে আত্মবোধ আছে এইরূপ ব্যক্তিগণ কর্তৃক।

অব্যক্ত নির্গুণব্রহ্মে আসক্তচিত্ত সেই সাধকগণের সিদ্ধি লাভে অধিকতর ক্লেশ হয়, কারণ দেহধারিগণ অতি কষ্টে নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়ক নিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন। ৫

দেহধারিগণের পক্ষে নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়ক নিষ্ঠা লাভ করা অতি কষ্টকর। কারণ, দেহাত্মবোধ বিদূরিত না হইলে নির্গুণভাবে স্থিতিলাভ করা যায় না।

৬-৭। হে পার্থ, যে তু (কিন্তু যাঁহারা) সর্বাণি কর্মাণি (সমস্ত কর্ম) ময়ি সংন্যস্য (আমাতে অর্পণ করিয়া) মৎপরাঃ (মৎপরায়ণ হইয়া) অনন্যেন এব যোগেন (অনন্য ভক্তিযোগ সহকারে) মাং ধ্যায়ন্তঃ (আমাকে ধ্যান করতঃ) উপাসতে (উপাসনা করেন), ময়ি আবেশিত চেতসাং তেষাং (আমাতে সমর্পিতচিত্ত তাঁহাদিগের) মৃত্যুসংসারসাগরাৎ (মৃত্যুময় সংসারসাগর হইতে) ন চিরাৎ (অবিলম্বেই) অহং (আমি) সমুদ্ধর্তা (উদ্ধারকর্তা) ভবামি (হই)।

কিন্তু যাঁহারা সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পিত করিয়া, একমাত্র আমাতেই চিত্ত একাগ্র করিয়া ধ্যাননিরত হইয়া আমার উপাসনা করেন, হে পার্থ, আমাতে সমর্পিত-চিত্ত সেই ভক্তগণকে আমি অচিরাৎ সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। ৬-৭

কিন্তু আমার ভক্তগণ আমার উপাসনা করিলে আমার প্রসাদে অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। সেই উপাসনার দুইটি কথা উল্লেখযোগ্য—

মষ্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্ধ্বং ন সংশয়ঃ ॥ ৮

(১) সর্বকর্ম আমাতে সমর্পণ; (২) অনন্যভক্তিযোগে আমার উপাসনা। স্থতরাং ভক্তিমার্গেও কর্মত্যাগের কোন প্রয়োজন নাই। ঈশ্বরে সর্বকর্ম সমর্পণের উপদেশ হইতে বরং ইহাই বুঝা যায় যে, ভক্তিমার্গেও নিষ্কাম ভাবে কর্ম করাই কর্তব্য।

৮। ময়ি এব (আমাতেই) মনঃ আধৎস্ব (স্থাপন কর), ময়ি (আমাতে) বুদ্ধিং নিবেশয় (নিবিষ্ট কর), অতঃ ঊর্ধ্বং (ইহার পরে অর্থাৎ দেহান্তে) ময়ি এব (আমাতেই) নিবসিষ্যসি (বাস করিবে), সংশয়ঃ ন [অস্তি] (সংশয় নাই)।

আমাতেই মন স্থাপন কর, আমাতে বুদ্ধি নিবিষ্ট কর, তাহা হইলে দেহান্তে আমাতেই স্থিতি করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ৮

মন—সঙ্কল্পবিকল্পাত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তি। **বুদ্ধি**—নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তি। দুইটি শব্দই ব্যবহার করার তাৎপর্য এই যে, বহির্মুখ বিষয়াসক্ত মনকে আমাতেই স্থির রাখিয়া আমারই ধ্যানে নিমগ্ন হও, আমাতেই চিত্ত সমাহিত কর। এই হেতুই 'সমাধাতুং' অর্থাৎ 'সমাহিত করিতে' এই শব্দ পরের শ্লোকে ব্যবহৃত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, 'ময়ি এব' অর্থাৎ আমাতেই 'ন তু স্বাত্মনি' কিন্তু আত্মাতে নয়, অর্থাৎ 'যোগমার্গ' বা 'জ্ঞানমার্গ' এই কথাদ্বারা নিষেধ করা হইয়াছে। অবশ্য গীতায় ভক্তিমার্গেরই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু অধিকার-ভেদে অন্যান্য মার্গেরও বিধান আছে। এই অধ্যায়ে আত্মসংস্থ যোগও উল্লিখিত হইয়াছে।

ব্যক্ত ও অব্যক্তের উপাসনা—ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠতা

পরমেশ্বরের দুই বিভাব—ব্যক্ত ও অব্যক্ত। যিনি সগুণ, সাকার স্বরূপে লীলাবতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই আবার বিশ্বাত্মা, অব্যক্ত নির্গুণস্বরূপে তিনি অচিন্ত্য, অনির্দেশ্য, নির্বিশেষ পরব্রহ্ম। প্রথম শ্লোকে অর্জুনের প্রশ্ন এই যে—ভক্তিমার্গে ব্যক্তস্বরূপের উপাসক এবং জ্ঞানমার্গে নির্গুণ ব্রহ্মচিন্তক—এ উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন যে, ভগবদ্ভক্তই শ্রেষ্ঠ সাধক, কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্মচিন্তা করেন তাঁহারাও তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন। কিন্তু দেহাভিমানী জীবের পক্ষে ব্রহ্মচিন্তা অধিকতর ক্লেশকর, কেননা দেহাত্মবোধ বিদূরিত না হইলে নির্গুণভাবে স্থিতিলাভ হয় না। কিন্তু যাঁহারা অনন্যা-ভক্তি সহকারে ভগবানের শরণ লইয়া তাঁহার উপাসনা করেন, তাঁহারা ভগবৎকৃপায় মৃত্যুময় সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারেন।

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১০

কিন্তু যাঁহারা কেবল আত্মস্বাতন্ত্র্যবলে মায়া-নির্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে যত্ন করেন, তাঁহাদিগকে অধিক ক্লেশ পাইতে হয়। ইহাদ্বারা ভক্তিমার্গ অধিকতর সুলভ ও সুখসাধ্য বলিয়া কথিত হইল। ৯।২ শ্লোকেও তাহাই বলা হইয়াছে (৩১১ পৃষ্ঠা ৯।২ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

এ স্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, (১) এই সকল শ্লোকে শ্রীভগবান্ সম্বন্ধে 'তুমি' 'তোমার', বা 'আমি' 'আমার' ইত্যাদি যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে তাঁহার সগুণ স্বরূপই লক্ষ্য করে, নির্গুণ স্বরূপ বুঝায় না। (২) দ্বিতীয়তঃ, এই ভক্তিমার্গের সাধনায়ও ঈশ্বরে সর্বকর্ম সমর্পণেরই উপদেশ, কর্মত্যাগের কথা নাই। (৩) নির্গুণ ব্রহ্মচিন্তা বা অব্যক্ত উপাসনা কষ্টকর হইলেও তাহা দ্বারাও সেই এক বস্তুই লাভ হয় ('তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব'), কারণ তিনি নির্গুণ-গুণী পুরুষোত্তম (১৫।১৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

৯। হে ধনঞ্জয়, অথ (যদি) ময়ি (আমাতে) চিত্তং স্থিরং সমাধাতুং (চিত্তকে স্থির ভাবে সমাহিত করিতে) ন শক্নোষি (না পার), ততঃ অভ্যাস-যোগেন (তবে অভ্যাসযোগ দ্বারা) মাম্ আপ্তুম্ (আমাকে পাইতে) ইচ্ছ (ইচ্ছা কর)।

অভ্যাসযোগেন—বিক্ষিপ্তং চিত্তং পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহৃত্য মদনুস্মরণলক্ষণঃ যঃ অভ্যাসযোগস্তেন—বিক্ষিপ্ত চিত্তকে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহারপূর্বক, ক্রমাগত আমার স্মরণরূপ যে অভ্যাস-যোগ তদ্দ্বারা।

ভক্তিযুক্ত কর্মযোগের শ্রেষ্ঠতা ৯-১২

হে ধনঞ্জয়, যদি আমাতে চিত্ত স্থির রাখিতে না পার, তাহা হইলে পুনঃ পুনঃ অভ্যাসদ্বারা চিত্তকে সমাহিত করিয়া আমাকে পাইতে চেষ্টা কর। ৯

১০। [যদি] অভ্যাসে অপি অসমর্থঃ অসি (হও) [তবে] মৎকর্মপরমঃ (আমার কর্মপরায়ণ) ভব (হও), মদর্থং (আমার প্রীতির জন্য) কর্মণি কুর্বন্ অপি (কর্মসকল করিলেও) সিদ্ধিম্ অবাপ্স্যসি (সিদ্ধিলাভ করিবে)।

মৎকর্মপরমঃ—মদর্থং কর্ম, মৎকর্ম, তৎ পরমঃ মৎকর্মপরমঃ—আমার প্রীতির জন্য অথবা আমাতে ভক্তি-উৎপাদক যে কর্ম। সেই কর্ম কি?

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥ ১১

ভক্তিশাস্ত্রে নববিধ ভক্তির সাধন উল্লিখিত আছে। যথা—শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পদসেবা, অর্চনা, বন্দনা, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন ; এই সকল যিনি আচরণ করেন, তাঁহাকেই ভগবৎকর্মপরায়ণ বলা হয়।

যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তবে মৎকর্মপরায়ণ হও (অর্থাৎ শ্রবণ, কীর্তন, পূজাপাঠ ইত্যাদি কর্মের অনুষ্ঠান কর), আমার প্রীতি সাধনার্থ কর্মের অনুষ্ঠান করিলেও তুমি সিদ্ধি লাভ করিবে। ১০

১১। অথ এতৎ অপি কর্তুম্ (যদি ইহাও করিতে) অশক্তঃ অসি (হও) ততঃ (তবে) মদ্‌যোগম্ (আমাতে কর্মার্পণরূপ যোগ) আশ্রিতঃ (আশ্রয় করিয়া) যতাত্মবান্ (সংযতচিত্ত হইয়া) সর্বকর্মফলত্যাগং কুরু (সর্বকর্মফল ত্যাগ কর)।

মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ—ময়ি ক্রিয়মাণানি কর্মাণি সংন্যস্য যৎকরণং তেষামনুষ্ঠানং স মদ্‌যোগঃ, তমাশ্রিতঃ সন্ (শঙ্কর)—ক্রিয়মাণ সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পণরূপ যে যোগ, তাহা আশ্রয় করিয়া। মদ্‌যোগম্—মদেকশরণম্ (শ্রীধর)।

যদি ইহাতেও অশক্ত হও, তাহা হইলে মদ্‌যোগ অর্থাৎ আমাতে কর্মার্পণরূপ যোগ আশ্রয় করিয়া সংযতাত্মা হইয়া সমস্ত কর্মের ফল ত্যাগ কর। ১১

ভগবৎ প্রাপ্তির বিবিধ পথ—পূর্বে শ্রীভগবান্ বলিলেন, অব্যক্তের চিন্তা দুঃসাধ্য, ব্যক্ত উপাসনাই সুখসাধ্য, অতএব তুমি আমার ব্যক্ত স্বরূপেই চিত্ত স্থির কর। কিন্তু চিত্ত স্থির করাও সহজ নহে। অর্জুন পূর্বে বলিয়াছেন, উহাও দুঃসাধ্য বোধ হয় (৬।৩৪ শ্লোক)। তাই শ্রীভগবান্ পরে বলিলেন—(১) যদি আমাতে চিত্ত স্থির করিতে না পার, তবে অভ্যাস-যোগ দ্বারা আমাতে মন স্থির করিতে চেষ্টা কর। চিত্তকে সমস্ত বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া কোন একটি বিষয়ে পুনঃ পুনঃ স্থাপনের নাম অভ্যাস-যোগ, ষষ্ঠ অধ্যায়ে ইহা বিস্তারিত উল্লিখিত হইয়াছে। (২) যদি এই অভ্যাস-যোগেও অসমর্থ হও, তবে আমার লাভার্থ আমাতে ভক্তি-উৎপাদক শাস্ত্রোক্ত কর্মাদি (যেমন—শ্রবণ, কীর্তন, ভাগবত-শাস্ত্রাদি পাঠ, পূজার্চনা ইত্যাদি) করিলেও সিদ্ধি লাভ করিবে। (৩) তাহাতেও যদি অসমর্থ হও, তাহা হইলে প্রথম হইতেই মদ্‌যোগ অর্থাৎ আমাতে সর্বকর্ম-সমর্পণরূপ কর্মযোগ আশ্রয় করিয়া তারপর সংযতচিত্ত হইয়া সমস্ত কর্মফল ত্যাগ কর।

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্॥ ১২

১২। অভ্যাসাৎ (অভ্যাসযোগ অপেক্ষা) জ্ঞানং শ্রেয়ঃ (শ্রেষ্ঠ); জ্ঞানাৎ (জ্ঞান অপেক্ষা) ধ্যানং বিশিষ্যতে (শ্রেষ্ঠ হয়); ধ্যানাৎ (ধ্যান অপেক্ষা) কর্মফলত্যাগঃ [শ্রেষ্ঠ]; অনন্তরং ত্যাগাৎ (ত্যাগ হইতে) শান্তিঃ [হয়]।

অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ; জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ। ধ্যান অপেক্ষা কর্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ। এইরূপ ত্যাগের পরই শান্তি লাভ হইয়া থাকে। ১২

ভক্তিযুক্ত কর্মযোগের শ্রেষ্ঠতা

এইরূপ বিবিধ সাধন-প্রণালীর উল্লেখ করিয়া পরিশেষে শ্রীভগবান্ বলিলেন,—অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান ভাল, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান ভাল এবং ধ্যান অপেক্ষা কর্মফলত্যাগ অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ। যদি উপাস্য-তত্ত্ব বিষয়ে কোন জ্ঞানই না থাকে, তবে শুধু প্রাণায়ামাদি বা নাম-জপাদি অভ্যাসদ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি কিছু হয় না। কিছু না বুঝিয়া অভ্যাস করা অপেক্ষা বোঝাটা ভাল। তাই বলা হইতেছে যে, অজ্ঞের পক্ষে কেবল অভ্যাস অপেক্ষা অধ্যাত্মতত্ত্ব বা উপাস্যের গুণকর্মাদি শ্রবণরূপ জ্ঞানালোচনা ভাল। আবার এইরূপ পরোক্ষজ্ঞানের বাহ্য আলোচনা অপেক্ষা ইষ্টবিষয়ে গুরু, শাস্ত্র ও সাধুজন মুখে যাহা জানা যায় তাহার প্রগাঢ় চিন্তা করা অর্থাৎ ইষ্টবস্তুর ধ্যান করা আরও ভাল। আবার এইরূপ ধ্যান অপেক্ষাও কর্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ; কারণ, কর্মফলের আসক্তি বা বাসনা দ্বারা যদি চিত্ত কলুষিত থাকে তবে ইষ্টবস্তুতে স্থায়িভাবে চিত্তসমাধান করা সম্ভবপর হয় না। ধ্যানের অবস্থায় চিত্ত সমাহিত হইলেও ধ্যানভঙ্গে ব্যুত্থান অবস্থায় ব্যবহারিক জগতে আসিয়া আবার যদি ফলাকাঙ্ক্ষায় চিত্ত ইতস্ততঃ ধাবিত হয় তাহা হইলে ধর্ম-জীবনে উন্নতি কিছুই হয় না, কেবল অভিমান, কপটতা ও ধর্মধ্বজিতা প্রভৃতির বৃদ্ধি হয় মাত্র। দেহধারী জীব অভ্যাসযোগীই হউন, জ্ঞানমার্গী সন্ন্যাসীই হউন বা ভগবৎ-ধ্যানপরায়ণ ভক্তই হউন, সর্বথা কর্মত্যাগ কিছুতেই করিতে পারেন না (গীতা ১৮।১১, ৩।৫; ভাগবত ৫।১।১৩-১৬)। সুতরাং ফলকামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম করিয়া যাওয়াই শ্রেষ্ঠ পথ, কেননা কামনা থাকিতে অভ্যাসযোগ, জ্ঞান, ধ্যান—কিছুতেই সিদ্ধিলাভ হয় না।

১২শ শ্লোকে 'জ্ঞান' ও 'ধ্যান' শব্দ কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা লক্ষ করা প্রয়োজন। অধ্যাত্মশাস্ত্র বলেন, 'অভেদদর্শনং জ্ঞানং ধ্যানং নির্বিষয়ং মনঃ'। এই অভেদ দর্শনরূপ জ্ঞানের লক্ষণ গীতায়ও পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে এবং এই 'জ্ঞান অপেক্ষা পবিত্র কিছুই নাই', 'জ্ঞানীই আমার আত্ম-স্বরূপ' ইত্যাদি কথাও বলা হইয়াছে (গীতা ৭।১৭।১৯, ৪।৩৫।৩৮, ১৮।২০, ১৩।১১ ইত্যাদি) এবং মন নির্বিষয় করিয়া ধ্যান-যোগদ্বারা এই অবস্থা লাভ করা যায়, ষষ্ঠ অধ্যায়ে একথাও বলা হইয়াছে। (৬।২৪-২৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

এই জ্ঞান লাভই জীবের পরম নিঃশ্রেয়স, কিন্তু এস্থলে জ্ঞান ও ধ্যান শব্দ এ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই; এস্থলে জ্ঞান অর্থ অনাত্মজ্ঞের পরোক্ষ জ্ঞান, আত্মজ্ঞের অপরোক্ষানুভূতি নহে এবং ধ্যান অর্থ অত্যাগীর উপাস্য চিন্তা, ত্যাগী সাধকের তাদাত্ম্য লাভ নহে, ও সকল সিদ্ধাবস্থা, উহা অপেক্ষা আর একটি শ্রেষ্ঠ ইহা বলা চলে না।

কিন্তু অভ্যাসযোগী, পাতঞ্জল-যোগমার্গী, জ্ঞানযোগী ব্রহ্মসাধক বা ভাগবত-ভক্তিমার্গাবলম্বী যে সকল টীকাকার আছেন, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে সকলেই সন্ন্যাসবাদী এবং কর্মত্যাগের পক্ষপাতী। তাঁহারা কেহই কর্মফলত্যাগের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেন না, সুতরাং গীতার এই ১২শ শ্লোকের মর্ম তাঁহারা অন্যরূপে বুঝাইতে চাহেন। তাঁহারা বলেন—এস্থলে কর্মফলত্যাগের প্রশংসা রোচনার্থক অর্থবাদ বা স্তুতিবাদ মাত্র। ইহা প্রকৃতপক্ষে নিকৃষ্ট মার্গ, পূর্বোপদিষ্ট অভ্যাসাদি অন্য উপায় অবলম্বনে যে অশক্ত তাহার জন্যই এই ব্যবস্থা। ইহাই প্রথম বা প্রধান কথা নয়। অজ্ঞ ব্যক্তিকে কর্মে প্রবৃত্ত করার জন্যই এই কর্মফলত্যাগের প্রশংসা, বস্তুতঃ ইহা জ্ঞানীর জন্য নহে। 'অজ্ঞস্য কর্মণি প্রবৃত্তস্য পূর্বোপদিষ্টোপায়ানুষ্ঠানাশক্তৌ সর্বকর্মণাং ফলত্যাগঃ শ্রেয়ঃসাধনমুপদিষ্টং ন প্রথমমেব। সর্বকর্মফলত্যাগস্তুতিরিয়ং প্ররোচনার্থা' (শাঙ্কর-ভাষ্য)। এরূপ ব্যাখ্যা আধুনিক গীতাচার্যগণ অনেকেই গ্রহণ করেন না।

'বর্তমান সময়ে গীতার ভক্তিযুক্ত কর্মযোগ সম্প্রদায় লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে। এই সম্প্রদায় পাতঞ্জল-যোগ, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিন সম্প্রদায় হইতে পৃথক্ এবং এই কারণেই ঐ সম্প্রদায়ের কোন টীকাকার পাওয়া যায় না, অতএব আজকালকার গীতার উপর যত টীকা পাওয়া যায়, সেগুলিতে কর্মফলত্যাগের শ্রেষ্ঠতা অর্থবাদাত্মক বুঝানো হইয়াছে। কিন্তু আমার মতে উহা ভুল।'

—গীতারহস্য, লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক

রহস্য—কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ কেন ?

প্রঃ। শ্রীভগবান্ এস্থলে অভ্যাস এবং পূজার্চনাদি অন্য উপায়ে অশক্ত হইলে শেষে ফলত্যাগ করিয়া কর্মযোগ অবলম্বনের উপদেশ দিলেন। ইহাতে কি ইহাই বুঝায় না যে, ইহা সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের নিকৃষ্ট মার্গ এবং সর্বাপেক্ষা সহজ ? কোন একটি না পারিলে কেহ তদপেক্ষা কঠিন অন্য একটি করিতে বলে না।

উঃ। এখানে কোন উচ্চ বা নিম্ন স্তরের কথা হইতেছে না। অভ্যাসাদি প্রত্যেক উপায়েই সিদ্ধিলাভ হইতে পারে, তবে গীতার মতে কর্মযোগই সর্বাপেক্ষা সহজসাধ্য। কিন্তু সুসাধ্য হইলেই যে নিকৃষ্ট হইবে, একথার কোন যুক্তি নাই।

প্রঃ। কিন্তু যে অভ্যাস বা জ্ঞান-ধ্যানাদিতে অসমর্থ, সে নিষ্কাম কর্মেই বা সমর্থ হইবে কিরূপে ? কামনা ত্যাগ, অহং ত্যাগ, ভগবানে সর্বকর্ম সমর্পণ, এগুলি কি সহজ কথা ? বস্তুতঃ কর্মযোগকে সহজ বলাই নিরর্থক বলিয়া বোধ হয়।

উঃ। সহজ এই জন্য যে, ইহা সর্বাঙ্গসুন্দররূপে সম্পন্ন করিতে না পারিলেও একেবারে নিষ্ফল হয় না—কিন্তু যোগাভ্যাসাদি কর্ম সম্যক্ অনুষ্ঠিত না হইলে কোন লাভই হয় না, বরং অনেক স্থলে অভিমানাদি উপস্থিত হওয়াতে বিপরীত ফল ফলে (২।৪০ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। দ্বিতীয়তঃ, ইহাতে বিধি-নিষেধের কঠোর গণ্ডীর মধ্যে থাকিতে হয় না, সুতরাং পদে পদে বাধা-বিঘ্নের আশঙ্কা থাকে না। তৃতীয়তঃ, ইহাতে ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়, তাঁহাকে সম্পূর্ণ 'বকলমা' দিতে হয়। সুতরাং সাধকের লাভালাভ, সিদ্ধি-অসিদ্ধি বিষয়ে আর কোন ভাবনা-চিন্তা করিতে হয় না, কেননা তাঁহার অভয়বাণীই আছে, একান্তে আমার শরণ লও ('মামেকং শরণং ব্রজ')—সব আমিই করিয়া দিব—ভয় নাই ('মা শুচ')। অন্যান্য সকল সাধনায়ই আত্মস্বাতন্ত্র্যের উপর নির্ভর করিতে হয়, পদস্খলন হইলেই বিপদ। এক্ষেত্রে কিন্তু তিনি সর্বদাই হাত ধরিয়া আছেন, পতনের ভয় কি ?

প্রঃ। ব্রহ্মচিন্তক জ্ঞানবাদীরা কিন্তু বলেন যে, অর্জুন উচ্চাঙ্গের উপাসনায় অনধিকারী, তাই শ্রীভগবান্ চিত্তশুদ্ধির জন্য এই সর্বনিম্নস্তরের কর্মযোগ তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছেন।

উঃ। শ্রীভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন যে, নির্গুণ উপাসনা দেহধারীর পক্ষে দুঃসাধ্য। তবে এ কথাটা মনে রাখিলেই হয় যে, যিনি বিশ্বরূপ দেখিতে অধিকারী হইয়াছিলেন, তিনি যদি অনধিকারীই হন, তবে সেই অনধিকারীর দলে থাকাটাই আমাদের মত ক্ষুদ্র জীবের শ্রেয়ঃকল্প ও সকল সাম্প্রদায়িক মত স্বকপোল-কল্পিত।

অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫

১৩-১৪। সর্বভূতানাম্ অদ্বেষ্টা (সব প্রাণীর প্রতি দ্বেষরহিত), মৈত্রঃ (মৈত্রীভাবাপন্ন), করুণঃ চ এব (এবং দয়াবান্), নির্মমঃ (মমত্ববুদ্ধিহীন), নিরহঙ্কারঃ (অহঙ্কারশূন্য), সমদুঃখসুখঃ (সুখে দুঃখে সমচিত্ত), ক্ষমী (ক্ষমাশীল), সততং সন্তুষ্টঃ (সদানন্দ), যোগী (সমাহিত-চিত্ত), যতাত্মা (সংযতস্বভাব) দৃঢ়নিশ্চয়ঃ (দৃঢ়বিশ্বাসী), ময়ি অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ (যাঁহার মন বুদ্ধি আমাতে অর্পিত), যঃ মদ্ভক্তঃ (ঈদৃশ যিনি আমার ভক্ত), সঃ (তিনি) মে (আমার) প্রিয়ঃ।

দৃঢ়নিশ্চয়—দৃঢ়ো মদ্বিষয়ো নিশ্চয়ো যস্য—মদ্বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয়, দৃঢ়বিশ্বাসী (শ্রীধর); দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্ (নীলকণ্ঠ); স্থিরপ্রজ্ঞ (মধুসূদন)।

কর্মফলত্যাগী ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ—ধর্মামৃত ১৩-২০

যিনি কাহাকেও দ্বেষ করেন না; যিনি সকলের প্রতি মিত্র-ভাবাপন্ন ও দয়াবান্; যিনি মমত্ববুদ্ধি ও অহংকার-বর্জিত, যিনি সুখে দুঃখে সমভাবাপন্ন, সদাসন্তুষ্ট, সমাহিতচিত্ত, সংযতস্বভাব, দৃঢ়বিশ্বাসী, যাঁহার মনবুদ্ধি আমাতে অর্পিত, ঈদৃশ মদ্ভক্ত আমার প্রিয়। ১৩-১৪

১৫। যস্মাৎ (যাহা হইতে) লোকঃ (কোন লোক) ন উদ্বিজতে (উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না), যঃ চ (এবং যিনি) লোকাৎ (অন্য লোক হইতে) ন উদ্বিজতে (উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না), যঃ চ (এবং যিনি) হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তঃ (যিনি হর্ষ, অমর্ষ, ভয় ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত) সঃ মে প্রিয়ঃ।

অমর্ষ—(১) অভিলষিত বস্তুর অপ্রাপ্তিতে অসহিষ্ণুতা (শঙ্কর)।
(২) পরের লাভে অসহিষ্ণুতা, পরশ্রীকাতরতা (শ্রীধর)।

যাঁহা হইতে কোন প্রাণী উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না এবং যিনি স্বয়ংও কোন প্রাণী-কর্তৃক উত্যক্ত হন না, এবং যিনি হর্ষ, অমর্ষ, ভয় ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত, তিনি আমার প্রিয়। ১৫

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৬
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৭

প্রঃ। সাধু ব্যক্তি কাহাকেও পীড়া দেন না, ইহা ঠিক। কিন্তু দুষ্ট লোকে বা হিংস্র প্রাণীতে সাধু ব্যক্তিকে ত হিংসা করিতে পারে, পীড়া দিতে পারে। সুতরাং তিনি অন্য কর্তৃক উত্যক্ত হন না, একথা কিরূপে বলা যায়?

উঃ। যিনি হিংসাদি জয় করিয়াছেন, যিনি সর্বভূতে সমচিত্ত, তাঁহাকে দুষ্টলোক কেন, হিংস্র জন্তুও হিংসা করে না। "অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ" (২১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। অপর অর্থ এই—উদ্বেগপ্রাপ্ত হইয়াও তিনি উদ্বিগ্ন হন না।

১৬। অনপেক্ষঃ (নিস্পৃহঃ), শুচিঃ (শৌচসম্পন্ন), দক্ষঃ (অনলস), উদাসীনঃ (পক্ষপাতরহিত), গতব্যথঃ (মনপীড়াশূন্য), সর্বারম্ভপরিত্যাগী (সকাম কর্মানুষ্ঠানে উদ্যমহীন) যঃ মদ্ভক্তঃ সঃ মে প্রিয়ঃ।

অনপেক্ষ—দেহেন্দ্রিয়, রূপ, রসাদি কোন বিষয়ে যাঁহার অপেক্ষা নাই, স্পৃহা নাই, রুচি নাই। **শুচি**—বাহ্যাভ্যন্তরে সদা পবিত্র (২১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। **দক্ষ**—যথাপ্রাপ্ত কর্তব্য কার্যে অনলস। **উদাসীন**—যিনি পক্ষ বিশেষ অবলম্বন করিয়া শত্রুতা বা মিত্রতা করেন না, সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্য। **গতব্যথ**—কাম-ক্রোধাদি রিপু, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব, লোকের নিন্দা-তিরস্কার ইত্যাদি কিছুতেই যাঁহার মনে পীড়া বা ব্যথা উৎপন্ন হয় না।

সর্বারম্ভপরিত্যাগী—'ইহামূত্রফলভোগার্থানি কামহেতূনি কর্মাণি সর্বারম্ভাঃ তান্ পরিত্যক্তুং শীলমস্যেতি' (শঙ্কর)—ঐহিক বা পারত্রিক ফল কামনা করিয়া যে কর্মের উদ্যম তাহাকেই আরম্ভ বলে। যিনি ফল কামনা করিয়া কোন কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন না, যথাপ্রাপ্ত কর্তব্যকর্ম নিষ্কামভাবে করিয়া থাকেন, তিনিই সর্বারম্ভপরিত্যাগী (৪।১৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

যিনি সর্ব বিষয়ে নিস্পৃহ, শৌচসম্পন্ন, কর্তব্য কর্মে অনলস, পক্ষপাতশূন্য, যাহাকে কিছুতেই মনঃপীড়া দিতে পারে না এবং ফল কামনা করিয়া যিনি কোন কর্ম আরম্ভ করেন না, এতাদৃশ ভক্ত আমার প্রিয়। ১৬

১৭। যঃ ন হৃষ্যতি (হৃষ্ট হন না), ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না), ন শোচতি (শোক করেন না), ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষা করেন না), শুভাশুভপরিত্যাগী (পাপপুণ্যত্যাগী) যঃ ভক্তিমান্ সঃ মে প্রিয়ঃ।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ॥ ১৮
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥ ১৯
যে তু ধর্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥ ২০

শুভাশুভপরিত্যাগী—অর্থাৎ যিনি স্বর্গাদি কামনায় অথবা নরকাদির ভয়ে কোন কর্ম করেন না, যিনি ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত, সমত্ববুদ্ধিযুক্ত, সুখদুঃখ, পাপপুণ্যাদি দ্বন্দ্ববর্জিত (২।৫০-৫১ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

যিনি ইষ্টলাভে হৃষ্ট হন না, অপ্রাপ্য বস্তুলাভের আকাঙ্ক্ষা করেন না, যিনি কর্মের শুভাশুভ ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়াছেন, ঈদৃশ ভক্তিমান্ সাধক আমার প্রিয়। ১৭

১৮-১৯। শত্রৌ চ মিত্রে চ (শত্রু ও মিত্রে) তথা মানাপমানয়োঃ (মানে ও অপমানে) সমঃ (সমবুদ্ধিসম্পন্ন), শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু (শীত, উষ্ণ, সুখ ও দুঃখে) সমঃ, সঙ্গবিবর্জিতঃ (সর্ববিষয়ে অনাসক্ত), তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ (নিন্দা ও স্তুতিতে সমত্ববুদ্ধিযুক্ত), মৌনী (সংযতবাক্), যেন কেনচিৎ সন্তুষ্টঃ (যাহা পাওয়া যায় তাহাতেই সন্তুষ্ট), অনিকেতঃ (নির্দিষ্ট বাসস্থানহীন, অথবা গৃহাদিতে মমতাবর্জিত) স্থিরমতিঃ (স্থিরচিত্ত), ভক্তিমান্ নরঃ মে প্রিয়ঃ (আমার প্রিয়)।

যিনি শত্রু-মিত্রে, মান-অপমানে, শীত-উষ্ণে, সুখ-দুঃখে সমত্ব-বুদ্ধিসম্পন্ন, যিনি সর্ববিষয়ে আসক্তি-বর্জিত, স্তুতি বা নিন্দাতে যাঁহার তুল্য জ্ঞান, যিনি সংযতবাক্, যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট, গৃহাদিতে মমত্ববুদ্ধি-বর্জিত এবং স্থিরচিত্ত, ঈদৃশ ভক্তিমান্ ব্যক্তি আমার প্রিয়। ১৮-১৯

২০। যে তু (যাহারা) যথোক্তম্ (পূর্বোক্ত) ইদং ধর্মামৃতং (এই অমৃততুল্য ধর্ম) শ্রদ্দধানাঃ (শ্রদ্ধাবান্) মৎপরমাঃ (মৎপরায়ণ হইয়া) পর্যুপাসতে (অনুষ্ঠান করেন), তে ভক্তাঃ (সেই ভক্তগণ) মে অতীব প্রিয়াঃ (আমার অত্যন্ত প্রিয়)।

যাঁহারা শ্রদ্ধাবান্ ও মৎপরায়ণ হইয়া পূর্বোক্ত অমৃততুল্য ধর্মের অনুষ্ঠান করেন, সেই সকল ভক্তিমান্ আমার অতীব প্রিয়। ২০

ধর্মামৃত। ১২শ শ্লোকে কর্মফলত্যাগকেই শ্রেষ্ঠ সাধন বলা হইয়াছে। কর্মফলত্যাগ অর্থ কামনাত্যাগ, কামনাত্যাগেই পরম শান্তি। এইরূপে সমত্ববুদ্ধি

ও শান্তি লাভ করিলে সাধকের যেরূপ উন্নত অবস্থা হয়, তাহাই এই কয়েকটি শ্লোকে (১৩শ-২০শ) বর্ণিত হইয়াছে। যিনি এই সমস্ত সদ্‌গুণ লাভে সমর্থ, তিনিই প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত। এই সকলের অনুশীলনই ধর্মামৃত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই অমৃতস্বরূপ ধর্মসমূহ আচরণ করিলে ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করা যায়, ইহাই ভক্তির শ্রেষ্ঠ সাধন। পূজার্চনাদি অনুষ্ঠান চিত্তশুদ্ধিকর গৌণ সাধন, উহা ভক্তির জনক মাত্র।

"এখন বুঝিলে ভক্তি কি? ঘরে কপাট দিয়া পূজার ভাণ করিয়া বসিলে ভক্ত হয় না,...'হা ঈশ্বর!' 'হা ঈশ্বর!' বলিয়া গোলযোগ করিয়া বেড়াইলে ভক্ত হয় না। যে আত্মজয়ী, যাহার চিত্ত সংযত, যে সমদর্শী, যে পরহিতে রত, সেই ভক্ত। ঈশ্বরকে সর্বদা অন্তরে বিদ্যমান জানিয়া যে আপনার চরিত্র পবিত্র না করিয়াছে, যাহার চরিত্র ঈশ্বরানুরাগী নহে, সে ভক্ত নহে। যাহার সমস্ত চরিত্র ভক্তির দ্বারা শাসিত না হইয়াছে সে ভক্ত নহে। গীতোক্ত স্থূলকথা এই। এরূপ উদার এবং প্রশস্ত ভক্তিবাদ জগতে আর কোথাও নাই। এই জন্য ভগবদ্গীতা জগতের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।" —বঙ্কিমচন্দ্র

মনে রাখিতে হইবে যে, এস্থলে ভক্তের লক্ষণ যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ (২।৫৫-৭২) এবং ১৩শ অধ্যায়ের জ্ঞানীর লক্ষণ (১৩।৭-১১)—এ সকল প্রায় একরূপই। বস্তুতঃ, পরাভক্তি ও পরমজ্ঞানে কোন পার্থক্য নাই। কামনাত্যাগ উভয়েরই মূলকথা এবং ত্যাগজনিত শান্তি ও সমত্ববুদ্ধি উহার সুধাময় ফল। গীতার কথা এই যে, এইরূপ ভক্তিযুক্ত জ্ঞান লাভ করিয়াও কর্মটা ত্যাগ করিতে হয় না, ভগবানের কর্মবোধে—লোক-সংগ্রহার্থ নির্লিপ্ত ভাবে করিয়া যাইতে হয়। ইহাই কর্মযোগ, সুতরাং জ্ঞানী, ভক্ত, কর্মযোগী—একই।

কিন্তু জ্ঞানবাদী টীকাকারগণ জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির সমুচ্চয় স্বীকার করেন না এবং তাঁহারা এগুলিকে সন্ন্যাসীর লক্ষণ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন—"অদ্বেষ্টা সর্বভূতানামিত্যাদিনা অক্ষরোপাসকানাং নিবৃত্তসর্বৈষণানাং সন্ন্যাসিনাং পরমার্থজ্ঞাননিষ্ঠানাং ধর্মজাতং প্রক্রান্তম্"—অর্থাৎ এই সকল শ্লোকে অক্ষরোপাসক, নিষ্কাম, পরমার্থনিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণের ধর্ম উক্ত হইয়াছে। কিন্তু এস্থলে অক্ষরোপাসনা ও সন্ন্যাসমার্গের কোন প্রসঙ্গ নাই, বরং সগুণ উপাসনা ও কর্মযোগেরই শ্রেষ্ঠতা বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং এগুলি নিষ্কামকর্মনিষ্ঠ জ্ঞানী ভক্তেরই লক্ষণ, ইহাই সরল সঙ্গত ব্যাখ্যা বলিয়া মনে হয়।

প্রঃ। এ বিষয়ে সন্দেহ আছে, এই ভক্ত-লক্ষণগুলির মধ্যে 'সর্বারম্ভ-পরিত্যাগী' ও 'অনিকেত' এই দুইটি শব্দ আছে। একটিতে বুঝায় কর্মত্যাগী, অপরটিতে বুঝায় গৃহত্যাগী। সুতরাং এ সন্ন্যাসীর ধর্ম বই আর কি?

উঃ। না, "সর্বারম্ভপরিত্যাগী"র অর্থ সর্বকর্মত্যাগী নয়। ঐহিক বা পারত্রিক ফল কামনা করিয়া কর্মের উদ্যোগ করার নামই আরম্ভ—(ইহামুত্র ফলভোগার্থানি কামহেতুনি কর্মাণি সর্বারম্ভাঃ তান্ পরিত্যক্তুং শীলমস্য)—যিনি এইরূপ কোন ফল কামনা করিয়া কর্মোদ্যোগ করেন না, যখন যাহা উপস্থিত হয় করিয়া যান, তিনিই সর্বারম্ভপরিত্যাগী। ৪।১৯ শ্লোকে এই কথাই বলা হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যাগযজ্ঞাদি সম্পন্ন করিয়াও এইরূপ সর্বারম্ভপরিত্যাগী ছিলেন (১০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সেইরূপ, 'অনিকেত' শব্দের অর্থ, যাহার গৃহাদিতে মমত্ববুদ্ধি বা 'আমার "আমার' ভাব নাই। রাজর্ষি জনক রাজা হইয়াও—'অকিঞ্চন' এবং গৃহে থাকিয়াও এইরূপ 'অনিকেত' ছিলেন। তাই তিনি বলিয়াছিলেন—'মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চন' (মহাভাঃ শান্তি ১৭।১৯)। শ্রীমদ্ভাগবতে গার্হস্থ্য ধর্মের বর্ণনায় আছে—গৃহে অতিথিবং বাস করিবে (গৃহেষ্বতিথিবদ্ বসন্ ন গৃহৈরনুবধ্যেত নির্মমো নিরহঙ্কৃতঃ—ভাগবত ১১।১৭।৪৫)। 'অনিকেত' শব্দের ইহাই অর্থ; 'অনিকেত' শব্দটিও ভাগবতে আছে এবং বৈষ্ণবাচার্যগণ উহার 'গৃহাদৌ মমতাভিমানশূন্যঃ' এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে, ভক্তরাজ প্রহ্লাদের চরিত্রে পূর্বোক্ত সকলগুলি গুণেরই (১৩-২০শ শ্লোক) সমাবেশ ছিল। বিস্তারিত গ্রন্থকার-প্রণীত 'শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

দ্বাদশ অধ্যায়—বিশ্লেষণ ও সার-সংক্ষেপ
ভক্তিযোগ

অর্জুনের প্রশ্নঃ১—সগুণ উপাসক ও নির্গুণ উপাসক মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? ২—৮ ভগবানের উত্তর—সগুণোপাসনাই শ্রেষ্ঠ ও সুসাধ্য; নির্গুণোপাসনায়ও একই গতি, কিন্তু উহা দুঃসাধ্য; ৯-১২ ভক্তিমার্গের বিবিধ পথ—ভক্তিযুক্ত কর্মযোগের শ্রেষ্ঠতা; ১৩-১৯ কর্মফলত্যাগী ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ—ধর্মামৃত; ২০ এই ধর্মাচরণকারী ভক্ত ভগবানের অতি প্রিয়।

ব্যক্ত ও অব্যক্ত উপাসনা। একাদশ অধ্যায়ের শেষে শ্রীভগবান্ বলিলেন—যিনি সঙ্গবর্জিত ও মৎপরায়ণ হইয়া অনন্যভাবে আমাকে ভজনা করেন, তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন। এই কথা শ্রবণ করিয়া অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 'তোমার' অর্থাৎ সগুণ ঈশ্বরের উপাসক এবং নির্গুণ অক্ষরোপাসক—ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

ভক্তিমার্গে সগুণ উপাসনার শ্রেষ্ঠতা। তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন, ভক্তিমার্গে নিত্যযুক্ত হইয়া যাঁহারা আমার সগুণ স্বরূপের উপাসনা করেন তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ, এই আমার মত। তবে যাঁহারা সংযতেন্দ্রিয় ও সর্ববিষয়ে

সমত্ববুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া সর্বভূতহিতে নিরত থাকিয়া অব্যক্ত ব্রহ্মচিন্তা করেন, তাঁহারাও আমাকে প্রাপ্ত হন, কিন্তু অব্যক্তের উপাসনা দেহাভিমানী জীবের পক্ষে অধিকতর আয়াসসাধ্য, কেননা দেহাত্মবোধ সম্পূর্ণ বিদূরিত না হইলে নির্গুণ ভাবে স্থিতি লাভ করা যায় না। কিন্তু যাঁহারা সর্ব কর্ম আমাতে অর্পণ করিয়া মচ্চিত্ত হইয়া অনন্যভক্তিযোগে আমার ব্যক্ত স্বরূপে উপাসনা করেন, আমি অচিরেই তাঁহাদিগকে সংসার হইতে উদ্ধার করি, সুতরাং তুমি আমাতেই চিত্ত সমাহিত কর।

ব্যক্ত উপাসনায় বিবিধ পথ—কর্মফল ত্যাগের শ্রেষ্ঠতা। মন একান্ত চঞ্চল বলিয়া চিত্ত স্থির করা সহজ নহে। যদি আমাতে চিত্ত স্থির করিতে না পার, তবে অভ্যাস দ্বারা বিক্ষিপ্ত চিত্তকে পুনঃ পুনঃ বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া আমাতে সমাহিত করিতে চেষ্টা কর। যদি এই অভ্যাস-যোগেও অসমর্থ হও, তবে আমার প্রীত্যর্থে আমাতে ভক্তির উৎপাদক যে সকল কর্ম—যেমন সাধুসঙ্গ, ভাগবত শাস্ত্রাদি পাঠ, আমার লীলাকথাদি শ্রবণ, মদ্‌গুণানুকীর্তন, পূজার্চনা ইত্যাদি কর্ম করিয়া যাও, তাহাতেও সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। যদি তাহাতেও তুমি অশক্ত হও, তবে মদ্‌যোগ অর্থাৎ আমাতে কর্মার্পণরূপ যে যোগ তাহা আশ্রয় কর, পরে সংযতচিত্ত হইয়া ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া অনাসক্ত চিত্তে যথাপ্রাপ্ত কর্ম করিতে থাক। জ্ঞানবর্জিত অভ্যাসযোগ অপেক্ষা জ্ঞানালোচনা শ্রেষ্ঠ, পরোক্ষ জ্ঞানালোচনা হইতে ইষ্টবস্তুর ধ্যান-ধারণা শ্রেষ্ঠ, আবার ফলাসক্ত চিত্তে ধ্যান-ধারণা অপেক্ষা ফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া সর্ব কর্ম করাই শ্রেষ্ঠ। কেননা ত্যাগ হইতেই পরম শান্তি লাভ হয়, সর্ব বিষয়ে সমত্ববুদ্ধি জন্মে।

ধর্মামৃত। এইরূপ ত্যাগী ভক্তিমান্ কর্মযোগীর লক্ষণ কি এবং তিনি লোক-ব্যবহারে কিরূপ আচরণ করেন তাহা শুন—আমার ভক্ত কাহাকেও দ্বেষ করেন না, তিনি সকলের প্রতিই মিত্রভাবাপন্ন, দয়ালু ও ক্ষমাবান্, তিনি সমত্ববুদ্ধি ও অহঙ্কারবর্জিত, তিনি শত্রু-মিত্র, মান-অপমান, শীত-উষ্ণ, শুভ-অশুভ, নিন্দা-স্তুতি, হর্ষ-দ্বেষ ইত্যাদি দ্বন্দ্ববর্জিত—সর্বত্র সমত্ববুদ্ধিসম্পন্ন। তিনি উদাসীন হইয়াও অনলস, গৃহে থাকিয়াও গৃহাদিতে মমত্ববুদ্ধিহীন। তুমি এই সকল গুণলাভে যত্নপর হও। যিনি মৎপরায়ণ হইয়া শ্রদ্ধা সহকারে এই অমৃততুল্য ধর্মের আচরণ করেন, তিনিই আমার পরমপ্রিয় ভক্ত।

এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ ভক্তিমার্গে সগুণ উপাসনার বর্ণনা করা হইয়াছে, এই হেতু ইহাকে **ভক্তিযোগ** বলে।

গীতার ৭ম হইতে ১২শ অধ্যায়ে অর্থাৎ দ্বিতীয় ষট্‌কে **ভক্তি-তত্ত্বই** নানাভাবে আলোচিত হইয়াছে, এই হেতু উহাকে **ভক্তিকাণ্ড** কহে। (৭।২ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে **ভক্তিযোগো** নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগযোগ

অর্জুন উবাচ

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।
এতদ্‌বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ কেশব ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্‌বিদঃ ॥ ১

অর্জুনঃ উবাচ—হে কেশব, প্রকৃতিং পুরুষং চ এব, ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞং চ এব জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ, এতৎ বেদিতুম্ (জানিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি)।

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ—দেহতত্ত্বের ব্যাখ্যা ১-৬

[অর্জুন কহিলেন—হে কেশব, প্রকৃতি ও পুরুষ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয় এইগুলি জানিতে আমি ইচ্ছা করি।]

অনেকেই এই শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য ও শ্রীধরস্বামী এইটি গ্রহণ করেন নাই। এই অধ্যায়ে যে কয়েকটি তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহাই এখানে অর্জুনের মুখে প্রশ্নস্বরূপ দেওয়া হইয়াছে। বোধ হয়, এই তত্ত্বগুলির আলোচনা এস্থলে কি হেতু আরম্ভ হইল, তাহা বুঝাইবার জন্যই এই শ্লোকটি কেহ পরে বসাইয়া দিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে, এই বিষয়টির এস্থলে অবতারণার বিশেষ কারণ আছে। সপ্তম অধ্যায়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা আরম্ভ করিয়া ভগবান্ পরা ও অপরা প্রকৃতির সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বা পুরুষ-প্রকৃতি-ভাবে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করেন নাই। উহার সম্যক্ আলোচনা ব্যতীত তত্ত্বজ্ঞান-উপদেশ অসম্পূর্ণ থাকে, এই হেতুই এই অধ্যায়ে এই বিষয়টির অবতারণা। পরবর্তী দুই অধ্যায়েও এই প্রকৃতি বা ত্রিগুণ তত্ত্বেরই নানা ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

১। শ্রীভগবান্ উবাচ—হে কৌন্তেয়, ইদং শরীরং ক্ষেত্রম্ ইতি (ক্ষেত্র বলিয়া) অভিধীয়তে (অভিহিত হয়); যঃ (যিনি) এতৎ বেত্তি (ইহাকে জানেন), তদ্বিদঃ (ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবেত্তাগণ) তং (তাহাকে) ক্ষেত্রজ্ঞঃ ইতি প্রাহুঃ (ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া থাকেন)।

যঃ এতৎ বেত্তি—যিনি ক্ষেত্রকে জানেন অর্থাৎ যিনি ক্ষেত্র সম্বন্ধে 'আমি' 'আমার' এইরূপ অভিমান করেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ বা আত্মা।

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্ জ্ঞানং মতং মম ॥ ২
তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্‌বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥ ৩

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে কৌন্তেয়, এই দেহকে ক্ষেত্র বলা হয় এবং যিনি এই ক্ষেত্রকে জানেন (অর্থাৎ 'আমি' 'আমার' এইরূপ মনে করেন) তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ (জীবাত্মা); ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবেত্তা পণ্ডিতগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। ১

ক্ষেত্র যেরূপ শস্যাদির উৎপত্তিভূমি, সেইরূপ এই দেহও সুখদুঃখময় সংসারের উৎপত্তিভূমি। এই হেতু ভোগায়তন দেহকে ক্ষেত্র বলা হয়। আর যিনি 'আমার দেহ, আমি সুখী, আমি দুঃখী'—দেহ সম্বন্ধে এইরূপ 'আমি' 'আমি' করেন সেই আমিই ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্র—দেহ, ক্ষেত্রজ্ঞ—জীবাত্মা।

২। হে ভারত, সর্বক্ষেত্রেষু অপি (সমস্ত ক্ষেত্রেই) মাং চ ক্ষেত্রজ্ঞং বিদ্ধি (আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিও); ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের) যৎ জ্ঞানম্ (যে জ্ঞান) তৎ জ্ঞানং (তাহাই সম্যক্ জ্ঞান), মম মতং (ইহা আমার অভিমত)। অথবা, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ যৎ জ্ঞানং তৎ মম জ্ঞানং মতম্ (তাহাই আমার জ্ঞান, ইহা সর্বসম্মত)।

হে ভারত, সমুদয়, ক্ষেত্রে আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিও; ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান তাহাই প্রকৃত জ্ঞান, ইহাই আমার মত। অথবা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান তাহাই আমার (পরমেশ্বরের) জ্ঞান, ইহাই সর্বসম্মত। ২

৭।৫ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, আমার পরা প্রকৃতি জীবভূতা এবং ১৫।৭ শ্লোকে ও পরে ১৩।২২ শ্লোকে এ বিষয় আরও স্পষ্ট করা হইয়াছে। তিনি ক্ষেত্রজ্ঞরূপে সর্বদেহে বিরাজ করেন। এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে পার্থক্যজ্ঞান, তাহাই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান। এই শ্লোকে 'চাপি' শব্দের দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, আমি কেবল ক্ষেত্রজ্ঞ নহি, ক্ষেত্রও আমি। কারণ প্রকৃতির পরিণামই দেহ এবং সেই প্রকৃতি, আমার বিভাব ও শক্তি (৭।৪, ৭।১০)।

৩। তৎ ক্ষেত্রং (সেই ক্ষেত্র), যৎ চ (যাহা), যাদৃক্ চ (যেরূপ) যদ্‌বিকারি (যেরূপ বিকারযুক্ত), যতঃ চ যৎ (যাহা হইতে যাহা), হয়], সঃ চ (এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ), যঃ (যেরূপ), যৎপ্রভাবঃ চ (যেরূপ

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৪

প্রভাব-বিশিষ্ট), তৎ মে (তাহা আমার নিকট), সমাসেন (সংক্ষেপে) শৃণু (শ্রবণ কর)।

সেই ক্ষেত্র কি, উহা কি প্রকার, উহা কি প্রকার বিকার-বিশিষ্ট এবং ইহার মধ্যেও কি হইতে কি হয়, এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ কে এবং তাহার প্রভাব কিরূপ, এইসকল তত্ত্ব সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রবণ কর। ৩

সেই ক্ষেত্র (দেহ) কিরূপ জড়স্বভাব, কিরূপ ইচ্ছাদি ধর্মযুক্ত, কিরূপ ইন্দ্রিয়াদি বিকারযুক্ত এবং ঐ ইন্দ্রিয়-বিকার হইতে কিরূপ কার্যাদি উৎপন্ন হয়, এই সকল তত্ত্ব এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞের স্বভাব প্রভাব কিরূপ, তাহাই ভগবান্ এখন সংক্ষেপে বলিবেন।

৪। ঋষিভিঃ (ঋষিগণ কর্তৃক), বিবিধৈঃ ছন্দোভিঃ (বিবিধ ছন্দে), পৃথক্ বহুধা (পৃথক্ পৃথক্ অনেক প্রকারে), [এই ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ব] গীতম্ (ব্যাখ্যাত হইয়াছে); বিনিশ্চিতৈঃ (সংশয়শূন্য), হেতুমদ্ভিঃ (যুক্তিযুক্ত), ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ এব চ (ব্রহ্মসূত্রপদসমূহের দ্বারাও) (ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

ঋষিগণ কর্তৃক নানা ছন্দে পৃথক্ পৃথক নানা প্রকারে এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রপদসমূহেও যুক্তিযুক্ত বিচারসহ নিঃসন্দিগ্ধরূপে এই বিষয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ৪

ব্রহ্মসূত্র বলিতে বেদান্ত দর্শন বুঝায়। বিভিন্ন ঋষিগণ বিভিন্ন উপনিষদে পৃথক্ পৃথক্ অধ্যাত্মতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। যুক্তিযুক্ত বিচার বিতর্ক দ্বারা ঐ সকল বিভিন্ন মতের সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধান করিয়া বেদান্তদর্শন রচিত হইয়াছে। এই শ্লোকে তাহাই বলা হইল। ঋষিগণ বিভিন্ন উপনিষদে পৃথক্ ভাবে যাহা আলোচনা করিয়াছেন, ব্রহ্মসূত্র তাহাই কার্য-কারণহেতু দেখাইয়া নিঃসন্দিগ্ধরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই হেতু উহার অপর নাম 'উত্তর মীমাংসা' এবং উহাতে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের বিচার আছে বলিয়া উহাকে 'শারীরক সূত্র'ও বলে (শরীর=ক্ষেত্র)। ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শন গীতার পরে রচিত হইয়াছে মনে করিয়া কেহ কেহ 'ব্রহ্মসূত্র' পদে ব্রহ্মপ্রতিপাদক সূত্র অর্থাৎ উপনিষদাদি এইরূপ অর্থ করেন। কিন্তু লোকমান্য তিলক প্রভৃতি আধুনিক পণ্ডিতগণের মত এই যে বর্তমান মহাভারত, গীতা এবং বেদান্তদর্শন বা ব্রহ্মসূত্র, এই তিনই বাদরায়ণ ব্যাসদেবেরই প্রণীত। এই হেতু ব্রহ্মসূত্রকে ব্যাসসূত্রও বলে।

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥ ৫
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্॥ ৬

৫-৬। মহাভূতানি (পঞ্চ স্থূলভূত), অহঙ্কারঃ, বুদ্ধি, অব্যক্তম্ এব চ (ও মূল প্রকৃতি), দশ ইন্দ্রিয়াণি (দশ ইন্দ্রিয়), একং চ (এবং এক), [মন] পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচরাঃ চ (পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয়), ইচ্ছা, দ্বেষঃ, সুখং, দুঃখং, সংঘাতঃ (দেহেন্দ্রিয়াদির সংহতি), চেতনা, ধৃতিঃ (ধৈর্য) এতৎ (ইহা) সবিকারং (বিকারের সহিত), ক্ষেত্রং সমাসেন (সমুদয়ে), উদাহৃতম্ (কথিত হইল)।

ক্ষিতি আদি পঞ্চমহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি (মহত্তত্ত্ব), মূল প্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয়, মন এবং রূপরসাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয় (পঞ্চতন্মাত্র) এবং ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত, চেতনা ও ধৃতি এই সমুদয়কে সবিকার ক্ষেত্র বলে। ৫-৬

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ। আমি আছি, আমি সুখী, আমি দুঃখী, 'আমার দেহ', 'আমার গৃহ'—এইরূপ 'আমি' 'আমি' সকলেই করে। এই 'আমি' কে? আর্য ঋষিগণ এই তত্ত্বের সম্যক্ আলোচনা করিয়া শেষে স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন যে, এই 'আমি' দেহ নহে, হস্তপদাদি ইন্দ্রিয় নহে, মনও নহে, বুদ্ধিও নহে, 'আমি' এ সকলের অতীত কোন বস্তু, যাহার নাম জীব ও জীবাত্মা। কৃষক যেমন ক্ষেত্র হইতে ফল উৎপন্ন করিয়া ভোগ করে, জীবও তদ্রূপ এই দেহ অবলম্বন করিয়া প্রাক্তন-কর্মজনিত সুখ-দুঃখাদি ভোগ করেন, এই জন্য এই দেহের নাম ক্ষেত্র। আবার ক্ষেত্রস্বামী যেমন জানেন যে, ইহা আমার ক্ষেত্র, সুতরাং আমি মালিক, আমিই ভোক্তা, এইরূপ অভিমান করেন, সেইরূপ জীবও এই দেহ আমারই ভোগভূমি বলিয়া জানেন এবং আমার দেহ, আমার মন ইত্যাদি রূপ অভিমান করেন। এই হেতু জীবকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়। সুতরাং বেদান্তমতে দেহ ও আত্মার যে তত্ত্ব বা বিচার তাহারই নাম ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিচার। সাংখ্যদর্শনও ঠিক এইরূপে এই বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মহৎ-আদি ২৪ তত্ত্ব সমন্বিত দেহাদি স্থূল জগৎ প্রকৃতিরই বিকার, অব্যক্ত প্রকৃতিই জড় জগতের আদি মূল কারণ এবং এই প্রকৃতি ও

পুরুষের সংযোগেই জগৎ সৃষ্টি। (৭।৪ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। সাংখ্যমতে ইহারই নাম প্রকৃতি-পুরুষ বিচার। দেহই প্রকৃতি, আত্মাই পুরুষ। কিন্তু ভগবান্ পূর্বে বলিয়াছেন—এই প্রকৃতি ও পুরুষ আমারই অংশ, আমারই পরা ও অপরা প্রকৃতি (৭।৪-৫)। সৃষ্টির মূল কারণই আমি—পরমেশ্বর, পরমাত্মা বা পুরুষোত্তম। এস্থলেও তাহাই বলিলেন, ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি অর্থাৎ আমিই ক্ষেত্রজ্ঞ (পুরুষ, আত্মা)। আবার ক্ষেত্রও আমিই ('চ'কারে ইহাই বুঝায়)।

ক্ষেত্র বা দেহতত্ত্ব। ১-২ শ্লোকে ক্ষেত্রজ্ঞের পরিচয় দিয়া পরে ক্ষেত্র বা দেহটার স্বরূপ কি এবং উহাতে কি কি বস্তুর সমাবেশ হয়, তাহাই ৫-৬ শ্লোকে বর্ণনা করা হইয়াছে। ১ মূল প্রকৃতি, ১ বুদ্ধি (মহত্তত্ত্ব), ১ অহঙ্কার, ১০ ইন্দ্রিয়, ১ মন, ৫ তন্মাত্র, ৫ স্থূলভূত—এই ২৪ তত্ত্ব সাংখ্যমতে দেহের উপাদান (২৫১ পৃষ্ঠা)। এগুলি সমস্তই এস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে এবং এতদ্ব্যতীত ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত, চেতনা, ধৃতি—এই কয়েকটি অতিরিক্ত তত্ত্বের এস্থলে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ—মনেরই গুণ। সুতরাং মনেই উহাদের সমাবেশ হয়; আবার পৃথক্ উল্লেখ না করিলেও চলিত; কিন্তু কোন কোন মতে এগুলিকে আত্মার গুণ বলিয়া বর্ণনা করা হয়। সেই ভ্রমপূর্ণ মত খণ্ডনার্থ এগুলিকে দেহের মধ্যে সমাবেশ করিতে হইবে, একথা স্পষ্ট করিয়া বলা হইল। এ সকল ব্যতীত জীবদেহে প্রাণের ক্রিয়া বা চেষ্টা-চাঞ্চল্য যে একটা লক্ষিত হয় তাহারই নাম চেতনা। মনে রাখিতে হইবে, এই চেতনা ও চৈতন্য বা জীব-চৈতন্য এক কথা নহে; সুষুপ্তি অবস্থায় চেতনা অর্থাৎ প্রাণের ক্রিয়া থাকে, কিন্তু চৈতন্য বা আমি-জ্ঞান থাকে না, বস্তুতঃ এই চেতনা নামক ক্রিয়া জড় দেহেরই গুণ, আত্মার নহে; এই জন্য ইহাকে ক্ষেত্রের মধ্যেই সমাবেশ করা হয়। আবার মন প্রাণ ইত্যাদির ক্রিয়া যে শক্তির দ্বারা স্থির থাকে, শরীরের মধ্যে এইরূপ একটি পৃথক্ শক্তিরও অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, ইহার নাম ধৃতি (১৮।৩৩-৩৫ দ্রষ্টব্য); ইহাও জড়দেহেরই গুণ। এই সকল ব্যতীত সংঘাত বলিয়া একটি তত্ত্বও ক্ষেত্রের মধ্যে ধরা হইয়াছে। 'সংঘাত' অর্থ সমুচ্চয় বা সংহতি। জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়, উভয়েন্দ্রিয় মন, প্রাণ ইত্যাদি শারীরিক ও মানসিক সমস্ত তত্ত্বের যে সংহতি বা সমুচ্চয়, দার্শনিক ভাষায় তাহারই নাম সংঘাত বা শরীর। কেহ কেহ বলেন যে, দেহেন্দ্রিয়াদি সংযোগে 'সংঘাত' নামে একটি বিশিষ্ট নূতন পদার্থ উৎপন্ন হয়, উহাই 'আমি'; বস্তুতঃ, 'আমি'

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্ ।
আচার্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৭
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৮
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু ।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ৯
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥ ১০
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ ।
এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥ ১১

বা আত্মা বলিয়া কোন পৃথক্ বস্তু নাই। এই মত গীতার মান্য নহে। গীতার মতে মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়াদির সংযোগে 'সংঘাত' বলিয়া যে বস্তুর কল্পনা করা হয়, বস্তুতঃ সকল জড়বর্গের সমুচ্চয়াত্মক শরীরই সেই সংঘাত এবং এই হেতু ক্ষেত্রের মধ্যেই উহার সমাবেশ করা হইয়াছে।

৭-১১। অমানিত্বম্ (শ্লাঘা-রাহিত্য), অদম্ভিত্বম্ (দম্ভ রাহিত্য) অহিংসা (পরপীড়া-বর্জন), ক্ষান্তিঃ (ক্ষমা), আর্জবম্ (সরলতা), আচার্যোপাসনং (গুরুসেবা), শৌচং (পবিত্রতা, সদাচার), স্থৈর্যম্ (সৎ কার্যে একনিষ্ঠা), আত্মবিনিগ্রহঃ (আত্মসংযম), ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্ (ইন্দ্রিয়-ভোগ্যবিষয়ে বৈরাগ্য), অনহঙ্কারঃ এব চ (নিরহঙ্কারিতা), জন্ম-মৃত্যু-জরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ (জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিতে দুঃখরূপ দোষের পুনঃ পুনঃ আলোচনা), অসক্তিঃ (বিষয়ে অনাসক্তি), পুত্রদারগৃহাদিষু অনভিষ্বঙ্গঃ (স্ত্রীপুত্রগৃহাদিতে মমত্বের অভাব), ইষ্টানিষ্ট-উপপত্তিষু (ইষ্ট বা অনিষ্ট লাভে) নিত্যং সমচিত্তত্বং (সর্বদা চিত্তের সমান ভাব), ময়ি (আমাতে) অনন্যযোগেন অব্যভিচারিণী ভক্তিঃ (আমি ভিন্ন আর গতি নাই এই ভাবে আমাতে ঐকান্তিক ভক্তি), বিবিক্তদেশসেবিত্বং (নির্জন স্থানে বাস), জনসংসদি অরতিঃ (জনতায় অর্থাৎ অনেক লোকের সংসর্গে বিরাগ) অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং (আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা), তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ (তত্ত্বজ্ঞানের অনুসন্ধান),—এতৎজ্ঞানম্ ইতি প্রোক্তম্ (এইগুলিকে জ্ঞান বলা হয়), যৎ অতঃ অন্যথা (যাহা ইহার বিপরীত), তৎ অজ্ঞানম্ (তাহা অজ্ঞান)।

অমানিত্বং—উৎকৃষ্টজনেষু অবধীরণারাহিত্যং (রামানুজ)—আমি বড়, তুমি ছোট—এই যে অভিমান, ইহার নাম মানিত্ব ; ইহার অভাবই অমানিত্ব। **অদম্ভিত্বং**—নিজের কর্ম বা যশঃ প্রচারের নাম দম্ভ, তাহার অভাব। **অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং**—আত্মাদিবিষয়ং জ্ঞানমধ্যাত্মজ্ঞানম্ তস্মিন্ নিত্যভাবঃ—আত্মাদিবিষয়ক জ্ঞানের নিত্য অনুশীলন—(শঙ্কর)। **তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্**—তত্ত্বজ্ঞানস্য অর্থঃ প্রয়োজনং মোক্ষঃ তস্য দর্শনম্ সর্বোৎকৃষ্টত্বাৎ আলোচনম্ (শ্রীধর)—তত্ত্বজ্ঞানের ফল যে মোক্ষ তৎসম্বন্ধে আলোচনা।

শ্লাঘা-রাহিত্য, দম্ভ-রাহিত্য, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, গুরুসেবা, শৌচ, সৎকার্যে একনিষ্ঠা, আত্মসংযম, বিষয়-বৈরাগ্য, নিরহঙ্কারিতা, জন্ম-মৃত্যু-জরাব্যাধিতে দুঃখ দর্শন, বিষয়ে বা কর্মে অনাসক্তি, স্ত্রী-পুত্র-গৃহাদিতে মমত্ববোধের অভাব, ইষ্টানিষ্টলাভে সমচিত্ততা, আমাতে (ভগবান বাসুদেবে) অনন্যভাবে ঐকান্তিক ভক্তি, পবিত্র নির্জন স্থানে বাস, প্রাকৃত জনসমাজে বিরক্তি, সর্বদা অধ্যাত্মজ্ঞানের অনুশীলন (নিত্য আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা), তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন আলোচনা—এই সকলকে জ্ঞান বলা হয় ; ইহার বিপরীত যাহা, তাহা অজ্ঞান। ৭-১১

জ্ঞানের সাধনা বা জ্ঞানীর লক্ষণ—পূর্বে বলা হইয়াছে—'যাহা পিণ্ডে তাহা ব্রহ্মাণ্ডে' অর্থাৎ এই নশ্বর দেহেন্দ্রিয়াদির অতিরিক্ত যে অবিনশ্বর আত্মতত্ত্ব এবং নামরূপাত্মক নশ্বর ব্যক্ত জগতে অভিব্যাপ্ত যে অবিনশ্বর ব্রহ্মতত্ত্ব—এই উভয়ই এক ; জীব, প্রকৃতি বা মায়ামুক্ত হইলেই এই একত্ব-জ্ঞান লাভ করে, উহাই প্রকৃত জ্ঞান। ইহাই আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান, দেহাত্মবিবেক, পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক, ব্রাহ্মী স্থিতি, কৈবল্য মুক্তি ইত্যাদি নানা কথায় ব্যক্ত করা হয়। জ্ঞানের এইরূপ লক্ষণ গীতায় বহু স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে। শাস্ত্রাদি পাঠে ব্রহ্মস্বরূপ সম্বন্ধে যে অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মে তাহা প্রকৃত জ্ঞান নহে। অর্থাৎ জ্ঞান অর্থ কেবল কেতাবী জ্ঞান নহে। বেদান্তী ও ব্রহ্মজ্ঞানী এক কথা নহে। যিনি এই জ্ঞান লাভ করেন, তাঁহার সর্বত্র সাম্যবুদ্ধি জন্মে, তাঁহার সর্বসময়ে শুদ্ধ বুদ্ধি, শুদ্ধ বাসনা ও শুদ্ধ আচরণ পরিদৃষ্ট হয় এবং তাঁহার অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব প্রভৃতি গুণের উদ্রেক হয়। এই হেতুই কেবল উপদেশ-জনিত জ্ঞান বা শাস্ত্র-পাণ্ডিত্যকেই জ্ঞান না বলিয়া 'অমানিত্ব' 'অদম্ভিত্ব' প্রভৃতি সদ্‌গুণকেই প্রকৃত জ্ঞান বা জ্ঞানীর লক্ষণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে হইলে এই কুড়িটি সদ্‌গুণের অনুশীলন একান্ত আবশ্যক। এই হেতু এইগুলিকে জ্ঞানের সাধনও

বলা যায়। আধ্যাত্মিক উন্নতিকামী ব্যক্তিমাত্রেরই এই ধর্মগুলির অভ্যাস করা প্রয়োজন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মতাবলম্বী শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় বলেন যে, এই ২০টি গুণের মধ্যে ১৮টি জ্ঞানী ও ভক্ত উভয়ের পক্ষেই প্রযোজ্য, কিন্তু শেষ দুইটি অর্থাৎ অধ্যাত্মজ্ঞাননিষ্ঠা ও তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন—এই দুইটি কেবল জ্ঞানমার্গীর জন্য, ভক্তের জন্য নহে। অবশ্য, 'অহং ব্রহ্মাস্মি (আমিই ব্রহ্ম)' এইরূপ অদ্বৈত ব্রহ্মচিন্তায় ভক্তির স্থান নাই বলিলেই চলে, সুতরাং ভক্তগণের পক্ষে জীবেশ্বরের অভেদচিন্তা অস্বাভাবিক এবং উহা সর্বথা পরিত্যাজ্য, এ বিধানও অযৌক্তিক নহে। কিন্তু গীতায় ভগবান্ পূর্বে "জ্ঞানী ভক্তই আমার অতীব প্রিয়, জ্ঞানীই আমার আত্মস্বরূপ (৭।১৭-১৮ শ্লোক)" ইত্যাদি কথায় জ্ঞানভক্তির সমুচ্চয়ই উদ্দেশ করিয়াছেন। এস্থলেও 'আমাতে অব্যভিচারিণী ভক্তিই' জ্ঞানের অন্যতম লক্ষণরূপে নির্দেশ করিয়া জ্ঞান-ভক্তির সমুচ্চয়ই নির্দেশ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ বিশুদ্ধ ভক্তি, জ্ঞান ও কর্মদ্বারা অসংবৃত, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই স্থলে বিবেচ্য এই যে, গীতায় ও বৈষ্ণব-শাস্ত্রে জ্ঞান ও কর্ম কথা-দুইটি এক অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। এই কথাটি বুঝিতে না পারিলে গোস্বামীপাদগণের উপদিষ্ট ভক্তিমার্গ ও গীতোক্ত ভক্তিমার্গের সামঞ্জস্যবিধান হয় না। অন্যত্র এ বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

এস্থলে 'বিবিক্তদেশসেবিত্বং' 'অরতিঃ জনসংসদি' 'পুত্রদারগৃহাদিষু অসক্তি' ইত্যাদি কথা থাকাতে অনেকে এগুলিকে সন্ন্যাসমার্গের উপদেশ বলিয়াই ব্যাখ্যা করেন। গীতায় সন্ন্যাস অর্থ কর্মত্যাগ নহে, ফল-সন্ন্যাস—আসক্তি ত্যাগ। এই ত্যাগ ব্যতীত জ্ঞানই বল, ভক্তিই বল, কোন পথেই সফলতা লাভের আশা নাই। সর্বদা বিষয়-সংসর্গে, লোক-কোলাহলে, বিষয়-চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত থাকিলে আধ্যাত্মিক উন্নতির কোনই সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানভক্তির অনুশীলনার্থ নির্জন পবিত্র স্থানে অবস্থান করতঃ ঈশ্বরচিন্তা করা একান্তই প্রয়োজন। কিন্তু জ্ঞানলাভ করিয়া যথাপ্রাপ্ত কর্ম করিতে কোন বাধা নাই। ইহাই গীতোক্ত কর্মযোগ, ইহা সন্ন্যাসমার্গ নহে।

শ্রীঅরবিন্দ প্রত্যক্ষভাবে দেশসেবা ত্যাগ করিয়া বিবিক্তদেশসেবিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, মহাত্মা গান্ধী দেশসেবায় নিযুক্ত থাকিয়াও সপ্তাহে অন্ততঃ এক দিনের জন্য মৌনাবলম্বন ব্রত গ্রহণ করিয়া জনসংসর্গ ত্যাগ বা বিবিক্তদেশ-সেবিত্বের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। জ্ঞানভক্তির অনুশীলনার্থ ইহা প্রয়োজনীয়।

জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্ জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে।
অনাদি মৎপরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে ॥ ১২

কিন্তু ইঁহারা কর্মত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন না, ইঁহারা ছিলেন কর্মযোগী। এ প্রসঙ্গে রাজর্ষি জনকের দৃষ্টান্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১২। যৎ জ্ঞেয়ং (যাহা জ্ঞাতব্য বস্তু), যৎ জ্ঞাত্বা (যাহা জানিয়া) [সাধক] অমৃতম্ (মোক্ষং) অশ্নুতে (লাভ করেন), তৎ প্রবক্ষ্যামি (তাহা বলিব), তৎ অনাদি (আদ্যন্তহীন) মৎপরং ব্রহ্ম (আমার নির্বিশেষ স্বরূপ ব্রহ্ম); ন সৎ (সৎ নহেন) ন অসৎ (অসৎ নহেন) উচ্যতে (এইরূপ বলা হইয়া থাকে)।

মৎপরং ব্রহ্ম—'মম বিষ্ণোঃ পরং নির্বিশেষরূপং ব্রহ্ম' (শ্রীধর)—'যাহা আমার পর অর্থাৎ নির্বিশেষ বিভাব, সেই ব্রহ্ম' অথবা 'অহং বাসুদেবাখ্যা পরাশক্তির্যস্য তৎ মৎপরং—'আমি বাসুদেব যাহার পরাশক্তি বা প্রতিষ্ঠা সেই ব্রহ্ম' (১৪।২৭ শ্লোক)। কেহ কেহ 'অনাদিমৎ পরংব্রহ্ম' এইরূপে পদচ্ছেদ করেন; তাহাতে অর্থ হয় যে 'যাহা অনাদি পরব্রহ্ম'; কিন্তু 'অনাদিমৎ' পদটি ব্যাকরণদুষ্ট। বহুব্রীহি সমাসনিষ্পন্ন অনাদি শব্দের উত্তর 'মৎ' প্রত্যয় হয় না। তবে, 'ন আদিমৎ অনাদিমৎ', এইরূপে সমাস করিয়া পদপূরণার্থ বলিয়া সমর্থন করা যাইতে পারে। যাঁহারা নির্গুণব্রহ্মবাদী অর্থাৎ 'ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ নির্বিশেষ, সবিশেষ নয়', ইহাই যাহাদের মত, তাঁহারা 'অনাদিমৎ' পাঠই গ্রহণ করেন, কেননা 'মৎপরং' পাঠে ব্রহ্মের সবিশেষ-নির্বিশেষ উভয় স্বরূপই স্বীকার করিতে হয়। (১৪।২৭ দ্রষ্টব্য)।

জ্ঞেয়তত্ত্ব ব্রহ্মস্বরূপ—ভক্তিদ্বারা লভ্য ১২-১৮

যাহা জ্ঞাতব্য বস্তু, যাহা জ্ঞাত হইলে অমৃত অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করা যায়, তাহা বলিতেছি; তাহা আদ্যন্তহীন, আমার নির্বিশেষ স্বরূপ ব্রহ্ম; তৎসম্বন্ধে বলা হয় যে, তিনি সৎও নহেন, অসৎও নহেন। ১২

ন সৎ নাসৎ—সৎও নহেন, অসৎও নহেন [৩২০ পৃষ্ঠা (৩) দ্রষ্টব্য]।

১৩। তৎ সর্বতঃ পাণিপাদং (সর্বত্র হস্তপদবিশিষ্ট) সর্বতোঽক্ষি-শিরোমুখং (সর্বত্র চক্ষু, মস্তক ও মুখবিশিষ্ট) সর্বতঃ শ্রুতিমৎ (সর্বত্র শ্রবণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট) [হইয়া] লোকে সর্বম্ আবৃত্য (সমস্ত পদার্থ ব্যাপিয়া) তিষ্ঠতি (অবস্থান করিতেছেন)।

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩
সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।
অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৪
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৫

সর্বতঃ পাণিপাদং—সর্বতঃ সর্বত্র পাণয়ঃ পাদশ্চ যস্য তৎ। **সর্বতোঽক্ষি-শিরোমুখং**—সর্বতঃ সর্বত্র অক্ষীণি শিরাংসি মুখানি চ যস্য তৎ।

সর্বদিকে তাঁহার হস্তপদ, সর্বদিকে তাঁহার চক্ষু, মস্তক ও মুখ, সর্বদিকে তাঁহার কর্ণ; এইরূপে এই লোকে সমস্ত পদার্থ ব্যাপিয়া তিনি অবস্থিত আছেন। ১৩

এই শ্লোকটি সম্পূর্ণ শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ হইতে আসিয়াছে। (শ্বেতঃ ৩।১৬)। ইহা একাদশ অধ্যায়োক্ত বিশ্বরূপেরই বর্ণনা। পুরুষ-সূক্তের "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ" ইত্যাদি বর্ণনা দ্রষ্টব্য (৩৫৯ পৃঃ)। এই সকল বর্ণনায় 'সর্বতঃ', 'সহস্র' ইত্যাদি শব্দের অর্থ '**অনন্ত**'।

১৪। সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং (সমস্ত ইন্দ্রিয়গুণের প্রকাশক), সর্বেন্দ্রিয়-বিবর্জিতম্ (সমস্ত ইন্দ্রিয়বিহীন), অসক্তং (নিঃসঙ্গ), সর্বভৃৎ এব চ (সকল বস্তুর আধারস্বরূপ) নির্গুণং (গুণরহিত) গুণভোক্তৃ চ (এবং সকল গুণের ভোক্তা, পালক)।

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসম্—সর্বেষাম্ চক্ষুরাদীনাম্ ইন্দ্রিয়াণাং গুণেষু রূপাদ্যা-কারাসু বৃত্তিষু তত্তদাকারেণ ভাসতে যৎ তৎ (শ্রীধর)—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিতে যাহার আভাস বা প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় অর্থাৎ আমাদের বোধ হয় যেন আত্মাই ঐ সকল ইন্দ্রিয় ব্যাপারে ব্যাপৃত আছেন।

তিনি চক্ষুরাদি সমুদয় ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে প্রকাশমান অথচ সর্বেন্দ্রিয়-বিবর্জিত নিঃসঙ্গ অর্থাৎ সর্বসঙ্গশূন্য অথচ সকলের আধারস্বরূপ, নির্গুণ অথচ সত্ত্বাদি গুণের ভোক্তা বা পালক। ১৪

এই শ্লোকে সগুণ-নির্গুণ উভয় বিভাবই বর্ণিত হইয়াছে। "ভূতভৃৎ ন চ ভূতস্থঃ" ইত্যাদি ৯।৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১৫। তৎ (তিনি) ভূতানাং (ভূতসমূহের) বহিঃ চ অন্তঃ চ (বাহিরে ও ভিতরে) [আছেন]; অচরং চরম্ এব চ (স্থাবর এবং জঙ্গমও), সূক্ষ্মত্বাৎ (সূক্ষ্মতার জন্য, সূক্ষ্মভাবশতঃ) অবিজ্ঞেয়ং; দূরস্থং চ অন্তিকে চ (দূরেও নিকটেও)।

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্তৃ চ তজ্ জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৬
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্ ॥ ১৭

সর্বভূতের অন্তরে এবং বাহিরেও তিনি, চল এবং অচলও তিনি; সূক্ষ্মতাবশতঃ তিনি অবিজ্ঞেয়; এবং তিনি দূরে থাকিয়াও নিকটে স্থিত। ১৫

১৬। তৎ (তিনি) অবিভক্তং (অপরিচ্ছিন্ন) [হইয়াও] ভূতেষু চ (সর্বভূতে) বিভক্তমিব স্থিতং (ভিন্ন ভিন্ন হইয়া যেন অবস্থিত) [আছেন], ভূতভর্তৃ (ভূতসকলের পালনকর্তা), গ্রসিষ্ণু (গ্রাসকর্তা, সংহর্তা), প্রভবিষ্ণু চ (এবং সৃষ্টিকর্তা বলিয়া) [তাঁহাকে] জ্ঞেয়ম্ (জানিবে)।

তিনি (তত্ত্বতঃ বা স্বরূপতঃ) অপরিচ্ছিন্ন হইলেও সর্বভূতে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হন। তাঁহাকে ভূতসকলের পালনকর্তা, সংহর্তা ও সৃষ্টিকর্তা জানিবে। ১৬

১৭। তৎ (তিনি) জ্যোতিষাম্ অপি (জ্যোতিঃসমূহেরও, সূর্যাদিরও) জ্যোতিঃ, তমসঃ (তমঃশক্তির, অন্ধকারের, অবিদ্যার) পরম্ (অতীত) [বলিয়া] উচ্যতে (কথিত হন); [তিনি] জ্ঞানং, জ্ঞেয়ং, জ্ঞানগম্যং (জ্ঞানদ্বারা লভ্য), সর্বস্য হৃদি বিষ্ঠিতং (অধিষ্ঠিত)। ['ধিষ্ঠিতং' পাঠান্তর আছে—অর্থ একই]।

তিনি জ্যোতিঃসকলেরও (সূর্যাদিরও) জ্যোতিঃ, তিনি তমের অর্থাৎ অবিদ্যারূপ অন্ধকারের অতীত; তিনি বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রকাশমান জ্ঞান, তিনি জ্ঞেয় তত্ত্ব; তিনি জ্ঞানের দ্বারা লভ্য; তিনি সর্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত আছেন। ১৭

জ্ঞেয়তত্ত্ব—এস্থলে (১১-১৭ শ্লোকে) জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্বের বর্ণনা হইতেছে। এই বর্ণনা উপনিষদের বর্ণনার অনুরূপ এবং অনেক স্থলে বিভিন্ন উপনিষদের বাক্যাদি শব্দশঃ গৃহীত হইয়াছে। উপনিষদে ব্রহ্মস্বরূপ কোথাও সগুণ, কোথাও নির্গুণ, কোথাও বা সগুণ-নির্গুণ উভয়রূপে বর্ণিত হইয়াছে। এস্থলেও সগুণ-নির্গুণ উভয়াত্মক বর্ণনাই একসঙ্গে হইয়াছে। তাই বলা হইতেছে,

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্‌বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৮
প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥ ১৯

তিনি নির্গুণ অথচ গুণভোক্তা, অবিভক্ত হইয়াও বিভক্তরূপে পরিদৃষ্ট, তিনি সর্বেন্দ্রিয়-বিবর্জিত অথচ তাঁহাতে সর্বেন্দ্রিয়গুণের আভাস আছে ইত্যাদি।

মহাভারতে নারায়ণীয় বা ভাগবত ধর্ম বর্ণনায় এবং গীতায় ১৫।১৬-১৮ শ্লোকে পরমাত্মা পুরুষোত্তমরূপে যে অদ্বয় মূল তত্ত্বের বর্ণনা আছে, তাহাই নির্গুণ উভয়াত্মক বর্ণনা, এ উভয় এক তত্ত্বই।

১৮। ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ (এই ক্ষেত্র ও জ্ঞান এবং জ্ঞেয়) সমাসতঃ (সংক্ষেপে) উক্তম্ (কথিত হইল); মদ্‌ভক্তঃ এতৎ বিজ্ঞায় (ইহা জানিয়া) মদ্ভাবায় উপপদ্যতে (আমার ভাব প্রাপ্তির যোগ্য হন)।

মদ্ভাব—আমার ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মভাব, অথবা আমাতে ভাব বা প্রেম বা ভক্তি, অথবা আমার স্বরূপ ইত্যাদি নানারূপ অর্থ হইতে পারে। (৪।১০ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

এই প্রকারে ক্ষেত্র, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় কাহাকে বলে সংক্ষেপে কথিত হইল। আমার ভক্ত ইহা জানিয়া আমার ভাব বা স্বরূপ বুঝিতে পারেন, বা আমার দিব্য প্রকৃতি প্রাপ্ত হন। ১৮

৭।২৯ ও ৮।২২ প্রভৃতি শ্লোকে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মতত্ত্ব ভক্তিদ্বারা লভ্য, এস্থলেও সেই ভক্তির প্রসঙ্গই পুনরায় উল্লেখ করা হইল। ব্রহ্মভাবের সহিত ভক্তির কি সম্পর্ক, ৮।২২ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৯। প্রকৃতিং পুরুষম্ এব চ উভৌ অপি (উভয়কেই) অনাদী বিদ্ধি (অনাদি জানিও), বিকারান্ চ গুণান্ এব চ (বিকার ও গুণসমূহ) প্রকৃতিসম্ভবান্ (প্রকৃতি হইতে জাত) বিদ্ধি (জানিও)।

বিকারান্—বিকারসমূহ অর্থাৎ প্রকৃতির পরিণাম দেহেন্দ্রিয়াদি।

গুণান্—গুণসমূহ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের পরিণাম সুখ, দুঃখ ও মোহাদি।

'গুণ' বলিতে রূপরসাদি ইন্দ্রিয়বিষয়ও বুঝায়। (৩।২৮ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

কার্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥ ২০
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু॥ ২১

প্রকৃতি-পুরুষবিবেক—ইহাতে পুনর্জন্ম নিবৃত্তি ১৯-২৩

প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিও। দেহেন্দ্রিয়াদি বিকারসমূহ এবং সুখ, দুঃখ, মোহাদি গুণসমূহ প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে জানিবে। ১৯

পূর্বে বেদান্তানুসারে যে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের বিচার হইয়াছে উহাই আবার সাংখ্য দৃষ্টিতে এই কয়েকটি শ্লোকে আলোচনা করা হইয়াছে। (২৫১-৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

সাংখ্যমতে পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ই অনাদি এবং স্বতন্ত্র মূলতত্ত্ব, কিন্তু বেদান্তী বলেন প্রকৃতি স্বতন্ত্র নহে, উহা পরমেশ্বর হইতেই উৎপন্ন, পরমেশ্বরেরই শক্তি এবং এই হেতুই অনাদি। গীতায় ইহাদিগকেই অপরা ও পরা প্রকৃতি বলা হইয়াছে। (৭।৪-৫ শ্লোক)।

২০। কার্যকারণকর্তৃত্বে (কার্য ও কারণের কর্তৃত্বে) প্রকৃতিঃ হেতুঃ (কারণ) উচ্যতে (উক্ত হন), পুরুষঃ সুখদুঃখানাং (সুখদুঃখসমূহের) ভোক্তৃত্বে (ভোগবিষয়ে) হেতুঃ উচ্যতে (কারণ বলিয়া কথিত হন)।

কার্যকারণকর্তৃত্বে—কার্যং শরীরং কারণাদি সুখ-দুঃখসাধনানীন্দ্রিয়াণি তেষাং কর্তৃত্বে তদাকারপরিণামে (শ্রীধর)। কার্য অর্থ শরীর এবং কারণ অর্থ—সুখদুঃখাদির সাধন ইন্দ্রিয়সমূহ। 'কারণ' স্থলে 'করণ' এইরূপ পাঠান্তর আছে। দশ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও চিত্ত, এই ত্রয়োদশটিকে 'করণ' বলে। সুতরাং 'কার্যকরণ' অর্থও 'দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি' হয়।

শরীর ও ইন্দ্রিয়গণের কর্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতিই কারণ, এবং সুখ-দুঃখ-ভোগ বিষয়ে পুরুষই (ক্ষেত্রজ্ঞ) কারণ বলিয়া উক্ত হন। ২০

তাৎপর্য—প্রকৃতিই ক্রিয়াশক্তির মূল। পুরুষ অকর্তা। কিন্তু অকর্তা হইলেও আমি সুখী, আমি দুঃখী ইত্যাদি অভিমান করাতে সুখদুঃখের ভোক্তা বলিয়া বিবেচিত হন। পুরুষের এই সুখদুঃখের ভোক্তৃত্ব কি কারণে ঘটে? (পরের শ্লোক)।

২১। হি (যেহেতু) পুরুষঃ প্রকৃতিস্থঃ (প্রকৃতিতে স্থিত হইয়া) প্রকৃতিজান্ গুণান্ (প্রকৃতিজাত সুখদুঃখমোহাদি গুণ) ভুঙ্‌ক্তে (ভোগ করেন);

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥ ২২

অস্য (পুরুষের) সদসদ্যোনিজন্মসু (সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্ম ধারণ বিষয়ে) গুণসঙ্গঃ (গুণসমূহের সহিত সংযোগ) কারণম্ (হেতু)।

পুরুষ, প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতির গুণসমূহ ভোগ করেন এবং ঐ গুণসমূহের সংসর্গই পুরুষের সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্মগ্রহণের কারণ হয়। ২১

পুরুষের সংসারিত্বের কারণ—পুরুষ প্রকৃতির সংসর্গবশতঃ প্রকৃতির গুণ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের ধর্ম সুখ-দুঃখ-মোহাদিতে আবদ্ধ হইয়া পড়েন এবং আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি কর্তা, আমার কর্ম ইত্যাদি অভিমান করতঃ কর্মপাশে আবদ্ধ হন। এই সকল কর্মের ফলভোগের জন্য তাহাকে পুনঃ পুনঃ সদসদ্-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। সত্ত্বগুণের প্রাবল্যে দেব-যোনিতে, রজোগুণের উৎকর্ষে মনুষ্য-যোনিতে এবং তমোগুণের আধিক্যে পশ্বাদিযোনিতে তাহার জন্ম হয়। সুতরাং এই প্রকৃতির সংসর্গ হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে তাহার জন্মকর্মের বন্ধন হইতে নিস্তার নাই।

যিনি পুরুষকে প্রকৃতি হইতে পৃথক্ বলিয়া জানেন, যিনি জানেন যে পুরুষ অকর্তা, উদাসীন, উপদ্রষ্টা মাত্র—তিনিই জ্ঞানী, তিনিই মুক্ত। এইরূপ নিঃসঙ্গ হইয়া কর্ম করিলেও তাহার কর্মবন্ধন হয় না। ('সর্বথা বর্তমানোঽপি' ইত্যাদি পরে ২৩ শ্লোক)। কিন্তু তাঁহাকে জানিবার উপায় কি? (পরে ২৪-২৫ শ্লোক)।

২২। অস্মিন্ দেহে (এই দেহে) পরঃ পুরুষঃ (পরমপুরুষ) উপদ্রষ্টা (সাক্ষি-স্বরূপ), অনুমন্তা (অনুমোদনকারী), ভর্তা (ভরণকর্তা), ভোক্তা, মহেশ্বরঃ, পরমাত্মা চ ইতি অপি উক্তঃ (এই বলিয়াও উক্ত হন)।

উপদ্রষ্টা—সমীপে থাকিয়া যিনি দেখেন অথচ নিজে ব্যাপৃত হন না। **অনুমন্তা**—অর্থাৎ যিনি নিবারণ করেন না, বরং প্রকৃতির কার্য অনুমোদন করেন, অর্থাৎ ইহাতে পরিতোষ লাভ করেন বলিয়া অনুমিত হন। **ভর্তা**—ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি জড় হইলেও চৈতন্যময় পুরুষের চৈতন্যাভাসে উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। ইহাকেই পুরুষের ভরণ বলা হইয়াছে এবং এই হেতুই পুরুষকে ভর্তা বলা হয়। **ভোক্তা**—তিনি স্বরূপতঃ নির্বিকার ও নির্লিপ্ত হইলেও সুখ-দুঃখাদি যেন উপলব্ধি করেন অর্থাৎ নিত্য চৈতন্যময় বলিয়া সুখ-দুঃখাদি বৃত্তিকেও চৈতন্যগ্রস্ত করিয়া প্রকাশ করেন, তাই তিনি ভোক্তা।

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥ ২৩
ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে ॥ ২৪

এই দেহে যে পরম পুরুষ আছেন, তিনি উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর ও পরমাত্মা বলিয়াও উক্ত হন। ২২

সাংখ্যদর্শন যাঁহাকে স্বতন্ত্র মূলতত্ত্ব পুরুষ বলেন, তাঁহাকেই এস্থলে পরমপুরুষ পরমাত্মা বলা হইতেছে। সুতরাং এস্থলে সাংখ্য ও বেদান্তের সমন্বয় হইয়া গেল।

২৩। যঃ এবং (এই প্রকারে) পুরুষং গুণৈঃ সহ (গুণসমূহের সহিত) প্রকৃতিং চ বেত্তি (জানেন) সঃ সর্বথা বর্তমানঃ অপি (যে কোন অবস্থায় বর্তমান থাকুন না কেন) ভূয়ঃ (পুনরায়) ন অভিজায়তে (জন্মলাভ করেন না)

যিনি এই প্রকার পুরুষতত্ত্ব এবং বিকারাদি গুণ সহিত প্রকৃতিতত্ত্ব অবগত হন, তিনি যে অবস্থায় থাকুন না কেন, পুনরায় জন্মলাভ করেন না অর্থাৎ মুক্ত হন। ২৩

তাৎপর্য। প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকজ্ঞান অর্থাৎ পার্থক্য জ্ঞানেই কৈবল্য মুক্তি—যাঁহার এই জ্ঞান হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে ধর্ম-কর্ম, বিধি-নিষেধ কিছু নাই, অনাসক্তভাবে কর্ম করিলেও তাঁহার কর্মবন্ধন নাই, কেননা তিনি ত্রিগুণাতীত মুক্তপুরুষ। প্রকৃতিই মায়া, উহাই সংসারের কারণ, সুতরাং তিনি মায়ামুক্ত, তাঁহার সংসারের ক্ষয় হইয়াছে, তিনি পরম-পুরুষকে দেখিয়াছেন। সেই দর্শন কিরূপে হয়, উহার বিভিন্ন মার্গ পরবর্তী দুই শ্লোকে (২৪-২৫শ) বলিতেছেন।

২৪। কেচিৎ (কেহ কেহ) ধ্যানেন (ধ্যানের দ্বারা) আত্মনা আত্মনি (আপনিই আপনাতে) আত্মানম্ (আত্মাকে) পশ্যন্তি (দর্শন করেন); অন্যে (অন্য কেহ) সাংখ্যেন যোগেন (সাংখ্যযোগ দ্বারা), অপরে চ (আবার অন্য কেহ কেহ) কর্মযোগেন (কর্মযোগ দ্বারা) [আত্মাকে দর্শন করেন]।

আত্মনি আত্মনা আত্মানং পশ্যন্তি—আত্মাতে আত্মাদ্বারা আত্মাকে দেখেন।

আত্মন্ শব্দে দেহ, মন, বুদ্ধি এবং আপন অর্থাৎ নিজ, এই সকল অর্থও হয়; সুতরাং কেহ কেহ অর্থ করেন—বুদ্ধিতে মনদ্বারা আত্মাকে দেখেন; কেহ অর্থ করেন,—দেহে মনদ্বারা আত্মাকে দেখেন; কিন্তু আত্মা প্রকৃতপক্ষে মনবুদ্ধির অগোচর। অবশ্য 'বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে বিশুদ্ধ মনদ্বারা' এইরূপ বলা হয়। বিশুদ্ধ

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥ ২৫

মন অর্থ কামনাশূন্য নির্বিষয় মন। মন যখন নির্বিষয় হয়, তখন আর উহা মন থাকে না, আত্মাকারাকারিত হয়। এই অবস্থায়ই আত্মদর্শন হয়। সুতরাং বুদ্ধিতে মনদ্বারা আত্মদর্শন করেন, এইরূপ ব্যাখ্যায় কথাটা কিছু জটিল হয়। সুতরাং 'আপনি আপনাতে আত্মদর্শন করেন', এইরূপ ব্যাখ্যাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। বিশেষতঃ পরবর্তী শ্লোকে 'অন্য কেহ কেহ অপরের নিকট শুনিয়া' ইত্যাদি কথা থাকায় এই শ্লোকে 'আপনিই আপনাতে দর্শন করেন'—এইরূপ অর্থই সমীচীন বলিয়া বোধ হয় (৬।২০ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

সাংখ্যযোগেন—সাংখ্যযোগ দ্বারা অর্থাৎ সর্বকর্মসন্ন্যাস করিয়া আত্মানাত্ম-বিবেক দ্বারা পরমার্থ জ্ঞান লাভ। ইহাকে জ্ঞানযোগ বা সন্ন্যাসযোগ কহে।

আত্মদর্শনের বিভিন্ন মার্গ ২৪-২৫

কেহ কেহ স্বয়ং আপনি আপনাতেই ধ্যানের দ্বারা আত্মদর্শন করেন। কেহ কেহ সাংখ্যযোগ দ্বারা এবং অন্য কেহ কেহ কর্মযোগের দ্বারা আত্মাকে দর্শন করেন। ২৪

২৫। অন্যে তু (আবার অন্য কেহ কেহ) এবম্ অজানন্তঃ (এই প্রকারে আপনি আপনিই না জানিতে পারিয়া) অন্যেভ্যঃ শ্রুত্বা (অন্যের নিকট শুনিয়া) উপাসতে (উপাসনা করেন); তে অপি (তাহারাও) শ্রুতি-পরায়ণাঃ (উপদেশ-শ্রবণনিরত হইয়া), মৃত্যুম্ অতিতরন্তি এব (মৃত্যুকে অতিক্রম করেন)।

শ্রুতিপরায়ণাঃ—কেবল পরোপদেশপ্রমাণাঃ স্বয়ং বিবেকরহিতাঃ (শঙ্কর)—আচার্যের উপদেশ শ্রবণ করিয়া এবং উহাই প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিয়া যাঁহারা পরমেশ্বরের ভজনা করেন।

আবার অন্য কেহ কেহ এইরূপ আপনা আপনি আত্মাকে না জানিয়া অন্যের নিকট শুনিয়া উপাসনা করেন। শ্রদ্ধাপূর্বক উপদেশ শ্রবণ করিয়া উপাসনা করতঃ তাঁহারাও মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। ২৫

বিবিধ সাধন-পথ—২৪শ-২৫শ শ্লোকে ৪টি বিভিন্ন সাধন-মার্গের উল্লেখ করা হইয়াছে।—

১। **ধ্যানযোগ বা আত্মসংস্থ-যোগ**—ষষ্ঠ অধ্যায়ে ইহার বিস্তারিত বর্ণনা আছে (৬।১১-২৯ এবং ২১৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্‌বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৬

২। **সাংখ্যযোগ বা জ্ঞানযোগ**—অর্থাৎ জ্ঞানমার্গে আত্মানাত্মবিচার-দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ (৩।৩, ৪।১০, ৪।৩৪-৩৮, ৫।১৭ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)। সাংখ্যযোগিগণ সন্ন্যাসবাদী; গীতার মতে সাংখ্যযোগে যে ফল লাভ হয়, কর্মযোগেও তাহাই হয়; সুতরাং গীতা জ্ঞানোত্তর কর্মত্যাগের অনুমোদন করেন নাই (৫।২-৫, ১৭৮-১৭৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

৩। **কর্মযোগ**—অর্থাৎ নিষ্কাম বুদ্ধিতে পরমেশ্বরে সর্বকর্ম সমর্পণপূর্বক ফলাকাঙ্ক্ষা ও কর্তৃত্বাভিমান বর্জন করিয়া তাঁহারই কর্মবোধে যথাপ্রাপ্ত কর্তব্য কর্ম করা। (গীতার ভাষায় 'স্বধর্ম পালন করা')। এই কর্মযোগদ্বারা সিদ্ধিলাভ করা যায়, গীতা তাহা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন (২।৫১, ৩।৭-৮, ৩।১৯-২০, ৩।২৫, ৩।৩০-৩১, ৪।২০-২৩, ৫।৪-৫, ৯।২৭-২৮, ১৮।৪৬, ১৮।৫৬ ইত্যাদি।

৪। **ভক্তিযোগ**—অর্থাৎ আপ্তবাক্যে বিশ্বাস রাখিয়া শ্রদ্ধাপূর্বক ভগবানের উপাসনা করা। জ্ঞানমার্গ অপেক্ষা ভক্তিমার্গ অধিকতর সুখসাধ্য, একথা গীতায় পূর্বে স্পষ্টই বলা হইয়াছে (৯।২, ১২।২-৮ ইত্যাদি)।

ধ্যান, জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি—গীতা এই চারিটি বিভিন্ন মার্গের উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহার যে কোন মার্গে সাধন আরম্ভ হউক না কেন, শেষে পরমেশ্বর প্রাপ্তি বা মোক্ষলাভ হয়ই, ইহাই গীতার উদার মত। গীতোক্ত যোগ বলিতে ইহার ঠিক কোন একটি বুঝায় না। গীতা এই চারিটি মার্গের সমন্বয় করিয়া অপূর্ব যোগধর্ম শিক্ষা দিয়াছেন। সেই যোগ কি তাহা পূর্বে নানা স্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে। (২৩৮-২৪৩ পৃঃ, ১১৬ পৃঃ,১৭১-১৭২ পৃঃ ও ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

২৬। হে ভরতর্ষভ, যাবৎ কিঞ্চিৎ স্থাবরজঙ্গমম্ (যাহা কিছু স্থাবর ও জঙ্গম) সত্ত্বং (পদার্থ) সংজায়তে (উৎপন্ন হয়), তৎ (তাহা) ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগাৎ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতে) [হয়] বিদ্ধি (জানিও)।

পুরুষ-প্রকৃতি-সংযোগে সৃষ্টি—নানাত্বের মধ্যে একত্ব দর্শন, প্রকৃতি ও পুরুষের পার্থক্য দর্শনেই মুক্তি ২৬-৩৪

হে ভরতর্ষভ, স্থাবর জঙ্গম যত কিছু পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা সমস্তই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতে হইয়া থাকে জানিবে। ২৬

পুরুষ (ক্ষেত্রজ্ঞ) ও প্রকৃতি (ক্ষেত্র) অর্থাৎ গীতোক্ত পরা ও অপরা প্রকৃতির সংযোগেই জগৎ সৃষ্টি। একথা পূর্বেও হইয়াছে। (৭।৬)

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৭
সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২৮

বেদান্ত মতে এ সংযোগকে অধ্যাস, ঈক্ষণ ইত্যাদি বলা হয়। এই অধ্যাসের ফলে ক্ষেত্রজ্ঞের ধর্ম ক্ষেত্রে আরোপিত হয় এবং ক্ষেত্রের ধর্ম ক্ষেত্রজ্ঞে আরোপিত হয়। (২৫০-২৫১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

২৭। সর্বেষু ভূতেষু (সর্বভূতে) সমং তিষ্ঠন্তং (নির্বিশেষ রূপে, সমভাবে স্থিত) বিনশ্যৎসু (সমস্ত বিনষ্ট হইলেও) অবিনশ্যন্তং (অবিনাশী) পরমেশ্বরং যঃ পশ্যতি (যিনি দর্শন করেন), সঃ পশ্যতি (তিনি দর্শন করেন)।

যিনি সর্বভূতে সমভাবে অবস্থিত এবং সমস্ত বিনষ্ট হইলেও যিনি বিনষ্ট হন না, সেই পরমেশ্বরকে যিনি সম্যক্ দর্শন করিয়াছেন, তিনিই যথার্থদর্শী। ২৭

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বা প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে সৃষ্টি, একথা পূর্বে বলা হইয়াছে। এই সংযোগের মধ্যে যিনি বিয়োগ দর্শন করেন অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে পুরুষের, বা দেহ হইতে আত্মার পার্থক্য দর্শন করেন, এবং সেই এক বস্তুই সর্বত্র সমভাবে বিদ্যমান ইহা অনুভব করেন, তিনিই মুক্ত। এই শ্লোক এবং পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে এই তত্ত্বই বিবৃত হইয়াছে।

২৮। হি (যেহেতু) সর্বত্র সমং (সর্বভূতে সমান) সমবস্থিতম্ (এককভাবে অবস্থিত) ঈশ্বরং পশ্যন্ (দেখিয়া) আত্মনা আত্মানং (আত্মাদ্বারা আত্মাকে অর্থাৎ আপনি আপনাকে) ন হিনস্তি (হিংসা করেন না, হনন করেন না), ততঃ (সেই হেতু) [তিনি] পরাং গতিং যাতি (পরম গতি প্রাপ্ত হন)।

যিনি সর্বভূতে সমান ও সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে দর্শন করেন, তিনি আত্মাদ্বারা আত্মাকে হনন করেন না এবং সেই হেতু তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন। ২৮

আত্মঘাতী—সর্বজীবের মধ্যে একমাত্র মানব-জন্মই মোক্ষোপযোগী। মানব আত্মচেষ্টা দ্বারা আত্মাকে অবিদ্যাজাল হইতে অর্থাৎ প্রকৃতি-সংসর্গ হইতে মুক্ত করিয়া সর্বত্র সমবস্থিত পরম পুরুষের স্বরূপ অবগত হইয়া সেই আনন্দস্বরূপে স্থিতিলাভ করিতে পারে। ৬।৫-৬ শ্লোকে 'উদ্ধরেৎ আত্মনা আত্মানম্' ইত্যাদি বাক্যে এই কথা বলা হইয়াছে। যে এই দুর্লভ মানব-জন্ম লাভ করিয়া আত্মার

প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি॥ ২৯
যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥ ৩০

উদ্ধারের চেষ্টা করে না সে আত্মঘাতী, সে আত্মার দ্বারা আত্মাকে হনন করে। তাহার অধোগতি হয় সন্দেহ নাই।

অসূর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥

"যাহারা আত্মঘাতী তাহারা প্রগাঢ় তিমিরাবৃত অসুরলোকেই গমন করিয়া থাকে" (ঈশোপনিষৎ ৩ এবং ভাগবত ১১।৫।১৬ দ্রষ্টব্য)। [পরন্তু, 'আত্মার দ্বারা আত্মাকে হত্যা করার' অন্যরূপ অর্থও হয়। সর্বভূতেই এক আত্মা অবস্থিত—এই জ্ঞান যাঁহার হইয়াছে, তিনি অন্য জীবের হিংসা করেন না, কেননা তাঁহার আত্ম-পর ভেদ নাই। তিনি জানেন যে, পরহিংসা ও আত্মহিংসা এক কথা। স্বামী বিবেকানন্দ এইরূপ অর্থ ই গ্রহণ করিয়াছেন।]

২৯। যঃ চ (যিনি) কর্মাণি (কর্মসকল) প্রকৃত্যা এব (প্রকৃতি কর্তৃক) সর্বশঃ (সর্বপ্রকারে) ক্রিয়মাণানি (সম্পাদিত) তথা আত্মানম্ (এবং আত্মাকে) অকর্তারং (অকর্তা) পশ্যতি (দেখেন) সঃ পশ্যতি (তিনিই যথার্থ দেখেন)।

প্রকৃতিই সমস্ত প্রকারে সমস্ত কর্ম করেন এবং আত্মা অকর্তা, ইহা যিনি দর্শন করেন তিনিই যথার্থদর্শী। ২৯

আত্মার অকর্তৃত্ব—আত্মা অকর্তা, নিঃসঙ্গ, প্রকৃতির সান্নিধ্যবশতঃ তাহাতে কর্তৃত্বাদি আরোপিত হয়। যিনি আপনাকে অকর্তা বলিয়া বুঝিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী, তিনি শুভাশুভ যে কর্ম করুন না কেন, তাহাতে তাঁহার কর্মবন্ধন হয় না। (৩৭-৩৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

৩০। যদা (যখন) [আত্মদর্শী সাধক] ভূতপৃথক্‌ভাবম্ (ভূতসমূহের পৃথক্ ভাব, পৃথক্ত্ব, নানাত্ব) একস্থং (এক আত্মাতে অবস্থিত), ততঃ এব চ (এবং তাহা হইতেই) বিস্তারম্ (বিস্তার, অভিব্যক্তি, বিকাশ) অনুপশ্যতি (দর্শন করেন), তদা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে (ব্রহ্মভাব লাভ করেন)।

যখন তত্ত্বদর্শী সাধক ভূতসমূহের পৃথক্ পৃথক্ ভাব, অর্থাৎ নানাত্ব একস্থ অর্থাৎ এক ব্রহ্মবস্তুতেই অবস্থিত এবং সেই ব্রহ্ম হইতেই এই নানাত্বের বিস্তার দর্শন করেন, তখন তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। ৩০

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥ ৩১
যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥ ৩২
যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥ ৩৩

জগতের নানাত্বের মধ্যে যিনি একমাত্র ব্রহ্মসত্তাই অনুভব করেন এবং সেই এক ব্রহ্ম হইতেই এই নানাত্বের অভিব্যক্তি, ইহা যখন সাধক বুঝিতে পারেন, তখন তাঁহার ব্রহ্মভাব লাভ হয়।

৩১। হে কৌন্তেয়, অনাদিত্বাৎ নির্গুণত্বাৎ (অনাদি ও নির্গুণ স্বরূপ বলিয়া) অয়ম্ অব্যয়ঃ পরমাত্মা (এই বিকারহীন পরমাত্মা) শরীরস্থঃ অপি (শরীরে থাকিয়াও) ন করোতি (কিছু করেন না) ন লিপ্যতে (কিছুতেই লিপ্ত হন না)।

হে কৌন্তেয়, অনাদি ও নির্গুণ বলিয়া এই পরামাত্মা অবিকারী; অতএব দেহে থাকিয়াও তিনি কিছুই করেন না এবং কর্মফলে লিপ্ত হন না। ৩১

৩২। যথা সর্বগতম্ আকাশং (সর্বত্র অবস্থিত আকাশ) সৌক্ষ্ম্যাৎ (সূক্ষ্মতাবশতঃ) ন উপলিপ্যতে (কিছুতেই লিপ্ত হয় না) তথা (সেইরূপ) সর্বত্র (সর্ববিধ) দেহে অবস্থিতঃ আত্মা ন উপলিপ্যতে (লিপ্ত হন না)।

যেমন আকাশ সর্ববস্তুতে অবস্থিত থাকিলেও অতি সূক্ষ্মতা-হেতু কোন বস্তুতে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ আত্মা সর্বদেহে অবস্থিত থাকিলেও কিছুতেই লিপ্ত হন না। ৩২

যেমন আকাশ সর্বব্যাপী হইয়াও সুগন্ধ, দুর্গন্ধ, সলিল, পঙ্কাদির দোষ-গুণে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ আত্মা সর্বদেহে অবস্থিত থাকিলেও দৈহিক দোষ-গুণে লিপ্ত হন না।

৩৩। হে ভারত, যথা একঃ রবিঃ ইমং (এই) কৃৎস্নং লোকং (সমস্ত জগৎকে) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করে) তথা ক্ষেত্রী (আত্মা) কৃৎস্নং ক্ষেত্রং (সমস্ত দেহকে) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করেন)।

হে ভারত, যেমন এক সূর্য সমস্ত জগৎকে প্রকাশিত করেন, সেইরূপ এক ক্ষেত্রজ্ঞ (আত্মা) সমস্ত ক্ষেত্র বা দেহকে প্রকাশিত করেন। ৩৩

সূর্যের সহিত উপমার তাৎপর্য এই যে, যেমন এক সূর্য সকলের প্রকাশক অথচ নির্লিপ্ত, আত্মাও সেইরূপ।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ॥ ৩৪

৩৪। যে (যাঁহারা) এবং (এই প্রকারে) ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ অন্তরং (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভেদ) ভূত-প্রকৃতিমোক্ষঞ্চ (এবং ভূতসমূহের প্রকৃতি হইতে মোক্ষের উপায়) জ্ঞানচক্ষুষা বিদুঃ (জ্ঞানচক্ষু দ্বারা জানিতে পারেন) তে পরং যান্তি (তাঁহারা পরমপদ প্রাপ্ত হন)।

ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং—ভূতানাং প্রকৃতিরবিদ্যালক্ষণা অব্যক্তাখ্যা তস্যাঃ মোক্ষণম্ (শঙ্কর)—ভূতগণের যে মূল প্রকৃতি, যাহাকে অব্যক্ত বা অবিদ্যা বলে, তাহা হইতে মোক্ষ; অথবা 'প্রকৃতি হইতে মোক্ষ' এরূপ অর্থ না করিয়া 'প্রকৃতির মোক্ষ' এরূপ অর্থও করা যাইতে পারে। সাংখ্যশাস্ত্র বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে পুরুষ বা আত্মার বন্ধনও নাই, মোক্ষও নাই। তিনি নিত্য-মুক্ত-শুদ্ধস্বভাব। প্রকৃতির গুণসঙ্গবশতঃই উহাতে কর্তৃত্বাদি আরোপিত হয় এবং প্রকাশিত হয়। সুতরাং সংযোগ ও বিয়োগ বা বন্ধন ও মোক্ষ প্রকৃতিরই ধর্ম। উহা আত্মাতে আরোপিত হয়।

যাঁহারা জ্ঞানচক্ষু দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভেদ এবং ভূতপ্রকৃতি অর্থাৎ অবিদ্যা হইতে মোক্ষ কি প্রকার তাহা দর্শন করেন (জানিতে পারেন), তাঁহারা পরমপদ প্রাপ্ত হন। ৩৪

এই শেষ শ্লোকে এই অধ্যায়ের সারার্থ সংক্ষেপে বলা হইল। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বা দেহ ও আত্মার প্রভেদ দর্শনেই মুক্তি। দেহাত্মবোধ অর্থাৎ দেহে আত্ম-বোধই অজ্ঞান, দেহাত্মবিবেক অর্থাৎ দেহ ও আত্মার পার্থক্য-জ্ঞানই জ্ঞান।

ত্রয়োদশ অধ্যায়—বিশ্লেষণ ও সার-সংক্ষেপ

১-৬ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ—দেহতত্ত্বের ব্যাখ্যা; ৭-১১ জ্ঞানের লক্ষণ বা সাধন; ১২-১৭ জ্ঞেয় তত্ত্ব—ব্রহ্মস্বরূপ; ১৮ ভক্তিদ্বারা এই জ্ঞান লাভ হয়, উহার ফল; ১৯-২৩ প্রকৃতিপুরুষ-বিবেক—ইহাতে পুনর্জন্ম নিবৃত্তি; ২৪-২৫ আত্মদর্শনের বিভিন্ন মার্গ; ২৬-৩৪ পুরুষ-প্রকৃতি সংযোগে সৃষ্টি—প্রকৃতির কর্তৃত্ব, আত্মার অকর্তৃত্ব ও নির্লিপ্ততা—নানাত্বের মধ্যে একত্ব দর্শন ও প্রকৃতি হইতে পুরুষের পার্থক্য দর্শনেই মুক্তি।

দ্বাদশ অধ্যায়ে পরমেশ্বরের অব্যক্ত ও ব্যক্ত উভয়বিধ স্বরূপের উল্লেখ করা হইয়াছে এবং অব্যক্তের চিন্তা দেহাভিমানী জীবের পক্ষে দুঃসাধ্য, এই কথা বলিয়া ভগবান্ প্রিয় ভক্তকে ব্যক্ত উপাসনার উপদেশ দিয়াছেন, এবং একথাও বলিয়াছেন যে, অব্যক্ত উপাসকও 'আমাকেই' প্রাপ্ত হয়। সেই জ্ঞেয় অব্যক্ত তত্ত্ব কি, 'আমি'ই বা কে, কেনই বা অব্যক্ত উপাসনা কষ্টকর, তাহাই এখন বলিতেছেন, অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ, দেহ ও আত্মা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় ইত্যাদি তত্ত্ব এক্ষণে বিস্তারিত বর্ণনা করিতেছেন। এই সকলের বর্ণনা ব্যতিরেকে পরমেশ্বরের সমগ্র স্বরূপ বোধগম্য হয় না।

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ। এই ভোগায়তন দেহকেই ক্ষেত্র বলা হয় এবং 'এই দেহ আমার' দেহসম্বন্ধে যিনি এইরূপ অভিমান করেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ (আত্মা)। প্রকৃতি, বুদ্ধি (মহত্তত্ত্ব), অহঙ্কার ইত্যাদি সাংখ্যের ২৪ তত্ত্ব (২৫১-২৫২ পৃঃ) এবং ইচ্ছা, দ্বেষ ইত্যাদি মোট ৩৭টি তত্ত্ব ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত এবং ইহার অতিরিক্ত যে একটি তত্ত্ব, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ, জীব বা পুরুষ। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—সর্বক্ষেত্রে আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে ('মমৈবাংশো জীবভূতঃ') আর প্রকৃতি সম্ভূত সবিকার ক্ষেত্রজ্ঞ প্রকৃতপক্ষে আমা হইতেই উদ্ভূত ; উহাই আমার অপরা প্রকৃতি আর পুরুষ আমার পরা প্রকৃতি (৭।৪-৫)।

জ্ঞানীর লক্ষণ বা জ্ঞানের সাধন। এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। উহাই পরমেশ্বরের জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান। এই জ্ঞান লাভ করিতে কতকগুলি সদ্গুণ আয়ত্ত করিতে হয়, কেবল শাস্ত্রাভ্যাসে বা পরোপদেশ শ্রবণে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। প্রকৃত তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীর লক্ষণ তাঁহার স্বভাবে ও ব্যবহারে প্রকাশিত হয়, শাস্ত্র-পাণ্ডিত্যে নহে। সুতরাং প্রত্যেকেরই এমন ভাবে কর্মজীবন নিয়মিত করা কর্তব্য যাহাতে এই সদ্গুণগুলি সম্যক্ অভ্যস্ত হয়। ৭ম-১১শ শ্লোকে অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব ইত্যাদি এই ২০টি সদ্গুণের বর্ণনা করা হইয়াছে এবং উহাকেই জ্ঞান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, কারণ উহাই জ্ঞানের সাধন বা জ্ঞানীর লক্ষণ।

জ্ঞেয় তত্ত্ব—ব্রহ্মস্বরূপ। পূর্বোক্ত গুণরাজির অনুশীলন দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয় তাহা দ্বারা সেই পরম তত্ত্ব জানা যায়। তাহাই জ্ঞেয় বস্তু, তাঁহাকে জানিতে হইবে। তাহা অনাদি, তাহা সৎও নহে, অসৎও নহে, অর্থাৎ ব্যক্ত জগৎ ও অব্যক্ত প্রকৃতির অতীত। তিনি বিশ্বরূপ ; তিনি সর্বেন্দ্রিয়-বিবর্জিত, কিন্তু চক্ষুরাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে আভাসমান ; তিনি সর্বসম্পর্কশূন্য অথচ

সকলের আধারস্বরূপ, নির্গুণ অথচ সত্ত্বাদি গুণের পালক। তিনিই স্থাবর ও জঙ্গম, তিনি অন্তরে ও বাহিরে, তিনি দূরে ও নিকটে, তিনি অবিভক্ত বা অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও পরিচ্ছিন্ন বা বিভক্ত মত পরিদৃষ্ট, তিনি অতি সূক্ষ্ম বলিয়া অবিজ্ঞেয়; তিনি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-কর্তা; তিনিই সূর্যাদি জ্যোতিষ্কগণের জ্যোতিঃ-স্বরূপ। তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয় ও জ্ঞান-গম্য; তিনি সকলের হৃদয়েই অধিষ্ঠিত আছেন।

প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক। এই জ্ঞেয় বস্তুই ক্ষেত্রজ্ঞ, পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম এবং প্রকৃতি-সম্ভূত দেহেন্দ্রিয়াদিই ক্ষেত্র। বেদান্তে যাহা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, সাংখ্য-শাস্ত্রের পরিভাষায় তাহাই প্রকৃতি ও পুরুষ এবং ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-জ্ঞানই সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক। এই জ্ঞান লাভ হইলেই সংসার ক্ষয় হয়। পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ই অনাদি। দেহেন্দ্রিয়াদি বিকার ও সুখদুঃখাদি গুণসমূহ প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। প্রকৃতিই ক্রিয়াশক্তির মূল; পুরুষ অকর্তা, কিন্তু অকর্তা হইলেও পুরুষ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতির গুণসমূহ ভোগ করেন এবং এই প্রকৃতির গুণ-সংসর্গই পুরুষের সংসারিত্ব অর্থাৎ সদসৎ যোনিতে জন্মগ্রহণের কারণ হয়। এই গুণ-সংসর্গ হইতে মুক্ত হইলেই পুরুষের আত্মস্বরূপ প্রতিভাত হয়। সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষ স্বতন্ত্র মূলতত্ত্ব। বেদান্ত ও গীতা মতে পরব্রহ্ম বা পরমাত্মাই মূলতত্ত্ব এবং দেহস্থিত এই পুরুষই পরমাত্মা। যিনি এই পুরুষকে পরমাত্মা বলিয়া জানেন, তিনিই মুক্ত। এই ভাবে গীতা সাংখ্যশাস্ত্রের উপপত্তি সর্বথা ত্যাগ না করিয়া বেদান্তের সঙ্গে সামঞ্জস্য করিয়া দিয়াছেন।

আত্মদর্শনের বিবিধ পথ। এক্ষণে এই পরমাত্মা বা পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভের চারিটি বিভিন্ন মার্গ কথিত হইতেছে। পাতঞ্জল **যোগমার্গে** ধ্যান-ধারণা-সমাধি দ্বারা কেহ কেহ আত্মদর্শন লাভ করেন, কেহ কেহ **জ্ঞানমার্গে** আত্মানাত্ম-বিচারদ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন, কেহ কেহ **কর্মযোগ-মার্গ** অনুসরণ করিয়া নিষ্কাম বুদ্ধিতে পরমেশ্বরার্পণপূর্বক কর্ম করিয়াও আত্ম-জ্ঞান লাভ করেন, আবার অনেকে এইরূপ সাক্ষাৎ আত্মদর্শন করিতে না পারিলেও আপ্তবাক্যে বিশ্বাস রাখিয়া **ভক্তিমার্গে** পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়াও সদ্গতি লাভ করেন। গীতায় জ্ঞান-কর্মমিশ্র ভগবদ্-ভক্তির প্রাধান্য থাকিলেও সকল মার্গেই সিদ্ধিলাভ হইতে পারে, তাহা গীতায় স্বীকৃত। এই বিষয়ে গীতার ন্যায় উদার মত অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয় না।

উপসংহার—যাহা পিণ্ডে, তাহাই ব্রহ্মাণ্ডে। সংক্ষেপে প্রকৃত তত্ত্বকথা হইতেছে এই যে, পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগে সৃষ্টি; পুরুষ কিন্তু অকর্তা ও অসঙ্গ; প্রকৃতির গুণসঙ্গবশতঃই উহাতে কর্তৃত্বাদি আরোপিত হয়। অজ্ঞান কাটিয়া গেলেই প্রকৃতির সঙ্গ ছাড়িয়া যায়; তখন পুরুষের পরমাত্ম-স্বরূপ প্রতিভাত হয়। বস্তুতঃ, দেহে যিনি ক্ষেত্রজ্ঞরূপে অবস্থিত, সর্বভূতে তিনিই অব্যক্ত মূর্তিতে অবস্থিত। তিনিই পরমাত্মা, জগতের নানাত্বের মধ্যে যিনি সেই এক ব্রহ্মসত্তাই উপলব্ধি করেন এবং সেই এক হইতেই এই নানাত্বের অভিব্যক্তি, ইহা বুঝিতে পারেন, তিনিই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া মুক্তি লাভ করেন। এই অবস্থাই সর্বভূতাত্মৈক্যজ্ঞান, দেহাত্মবিবেক, পুরুষপ্রকৃতিবিবেক, ব্রহ্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, সংসার-ক্ষয় ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত হয়।

এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বা পুরুষ-প্রকৃতি বর্ণিত হইয়াছে। এই জন্য ইহাকে **ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগযোগ** বা পুরুষ-প্রকৃতিবিবেক-যোগ বলে।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে **ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগযোগো** নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

চতুর্দশ অধ্যায়

গুণত্রয়-বিভাগযোগ

শ্রীভগবান্ উবাচ

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্ ।
যজ্ জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥ ১
ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২

১। শ্রীভগবান্ উবাচ—জ্ঞানানাম্ (সকল জ্ঞানের মধ্যে) উত্তমং পরং জ্ঞানং (উত্তম পরম জ্ঞান) ভূয়ঃ (পুনর্বার) প্রবক্ষ্যামি (বলিতেছি), যৎ জ্ঞাত্বা (যাহা জানিয়া) সর্বে মুনয়ঃ (সকল মুনিগণ) ইতঃ (এই দেহ-বন্ধন হইতে) পরাং সিদ্ধিং গতাঃ (পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন)।

সৃষ্টি-রহস্য—ঈশ্বর পিতৃস্বরূপ, প্রকৃতি মাতৃস্বরূপিণী ১-৪

শ্রীভগবান্ বলিলেন—আমি পুনরায় জ্ঞানসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম জ্ঞান বলিতেছি, যাহা জানিয়া মুনিগণ এই দেহবন্ধন হইতে মোক্ষলাভ করিয়াছেন। ১

পূর্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, সকল কর্তৃত্বই প্রকৃতির, পুরুষ অকর্তা। প্রকৃতির গুণসঙ্গবশতঃই জীবের সদসদ্ যোনিতে জন্ম ও সুখ-দুঃখ ভোগ অর্থাৎ সংসারিত্ব। এই গুণ কি, উহাদের লক্ষণ কি, উহারা কি ভাবে জীবকে আবদ্ধ করে, কিরূপে প্রকৃতি হইতে বিবিধ সৃষ্টি হয়, ইত্যাদি বিষয় বিস্তারিত কিছুই বলা হয় নাই। সেই হেতু এই প্রকৃতি-তত্ত্ব বা ত্রিগুণ-তত্ত্বই আবার বলিতেছেন। এই হেতুই 'ভূয়ঃ' অর্থাৎ পুনরায় শব্দ ব্যবহৃত হয়।

২। ইদং জ্ঞানম্ উপাশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) মম সাধর্ম্যম্ (স্বরূপতা) আগতাঃ (প্রাপ্ত হইয়া) সর্গে চ অপি (সৃষ্টিকালেও) ন উপজায়ন্তে (জন্মগ্রহণ করেন না), প্রলয়ে চ ন ব্যথন্তি (ব্যথিত হন না)।

সাধর্ম্য—স্বরূপতা অর্থাৎ আমি যেমন ত্রিগুণাতীত এইরূপ ত্রিগুণাতীত অবস্থা।

এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া যাঁহারা আমার সাধর্ম্য লাভ করেন অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হন, তাঁহারা সৃষ্টিকালেও জন্মগ্রহণ করেন না, প্রলয়কালেও ব্যথিত হন না (অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু অতিক্রম করেন)। ২

মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ৩
সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪
সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫

৩। হে ভারত, মহদ্‌ব্রহ্ম (প্রকৃতি) মম যোনিঃ (গর্ভাধানস্থান), তস্মিন্ (তাহাতে) অহং (আমি) গর্ভং (সৃষ্টির বীজ) দধামি (নিক্ষেপ করি), ততঃ (তাহা হইতে) সর্বভূতানাং (সর্বভূতের) সম্ভবঃ ভবতি (উৎপত্তি হয়)।

হে ভারত, প্রকৃতিই আমার গর্ভাধান-স্থান। আমি তাহাতে গর্ভাধান করি, তাহা হইতেই সর্বভূতের উৎপত্তি হয়। ৩

মহদ্‌ব্রহ্ম অর্থ প্রকৃতি; 'গর্ভাধান করি' অর্থ এই—সর্বভূতের জন্মকারণ স্বরূপ বীজ প্রকৃতিরূপ যোনিতে আধান করি। তাৎপর্য এই যে, ভূতগণকে তাহাদের স্বীয় প্রাক্তন কর্মানুরূপ ক্ষেত্রের সহিত সংযোজিত করি। এই সংযোজনই গর্ভাধান। অথবা প্রকৃতিতে আমার সঙ্কল্পিত বীজ আধান করি অর্থাৎ আমার সঙ্কল্পানুসারেই প্রকৃতি সৃষ্টি করে। প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বরের সৃষ্টি-সঙ্কল্পই গর্ভাধানস্বরূপ। প্রকৃতির স্বতন্ত্র সৃষ্টি-সামর্থ্য নাই।

৪। হে কৌন্তেয়, সর্বযোনিষু (সমস্ত যোনিতে) যাঃ মূর্তয়ঃ (যে মূর্তি-সকল) সম্ভবন্তি (উৎপন্ন হয়) মহদ্‌ব্রহ্ম (প্রকৃতি) তাসাং যোনিঃ (তাহাদের মাতৃস্থানীয়া), অহং বীজপ্রদঃ পিতা (গর্ভাধানকর্তা পিতা)। ৪

হে কৌন্তেয়, দেব-মনুষ্যাদি বিভিন্ন যোনিতে যে সকল শরীর উৎপন্ন হয়, প্রকৃতি তাহাদের মাতৃস্থানীয়া এবং আমিই গর্ভাধানকর্তা পিতা। ৪

এই গর্ভাধান কি তাহা পূর্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে। বেদান্তে ইহাকেই 'ঈক্ষণ' বলে। (২৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

৫। হে মহাবাহো, সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি (এই) প্রকৃতিসম্ভবাঃ গুণাঃ (প্রকৃতিজাত গুণত্রয়) দেহে অব্যয়ং (অবিকারী) দেহিনং (আত্মাকে) নিবধ্নন্তি (আবদ্ধ করিয়া রাখে)।

ত্রিগুণের বন্ধন ৫-৯

হে মহাবাহো, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রকৃতিজাত এই তিন গুণ দেহমধ্যে অব্যয় আত্মাকে বন্ধন করিয়া রাখে। ৫

তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬

জীবাত্মা অবিকারী হইলেও প্রকৃতির গুণসঙ্গবশতঃ দেহাত্মভাব প্রাপ্ত হওয়ায় সুখ-দুঃখ মোহাদিতে জড়িত হইয়া পড়েন। ৫।৬।৭।৮ এই চারিটি শ্লোকে ত্রিগুণের বন্ধন অর্থাৎ প্রকৃতি-সংযোগে পুরুষের সংসারবন্ধন বর্ণনা করা হইতেছে।

৬। হে অনঘ (নিষ্পাপ অর্জুন), তত্র (সেই গুণত্রয়ের মধ্যে) নির্মলত্বাৎ (নির্মল স্বচ্ছস্বভাব হওয়া বশতঃ) প্রকাশকম্ (প্রকাশশীল) অনাময়ং (নিরুপদ্রব, নির্দোষ) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) সুখসঙ্গেন জ্ঞানসঙ্গেন চ (সুখ ও জ্ঞানের সঙ্গদ্বারা) বধ্নাতি (আত্মাকে বন্ধন করে)।

হে অনঘ, এই তিন গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্মল বলিয়া প্রকাশক এবং নির্দোষ ; এই সত্ত্বগুণ সুখসঙ্গ ও জ্ঞানসঙ্গদ্বারা আত্মাকে বন্ধন করিয়া রাখে। ৬

সত্ত্বগুণের বন্ধন কিরূপ। সত্ত্বগুণের মুখ্য ধর্ম দুইটি, সুখ ও জ্ঞান। এই সুখ ও জ্ঞানকেও বন্ধনের কারণ বলা হইতেছে। এই সুখ বলিতে আত্মানন্দ বুঝায় না। সুখ-দুঃখাদি ক্ষেত্রের ধর্ম, দেহধর্ম, উহা আত্মার ধর্ম নহে, সুতরাং অবিদ্যা (১৩।৬)—(ইচ্ছাদি ধৃত্যন্তং ক্ষেত্রস্যৈব বিষয়স্য ধর্ম ইত্যুক্তং ভগবতা সৈষা অবিদ্যা—শঙ্কর); আর এই জ্ঞান, আত্মজ্ঞান নহে। বস্তুতঃ সত্ত্বগুণের দ্বিবিধ প্রকারভেদ আছে—(১) মিশ্র-সত্ত্ব অর্থাৎ রজস্তমো-মিশ্রিত সত্ত্ব এবং (২) শুদ্ধসত্ত্ব অর্থাৎ রজস্তমোবর্জিত সত্ত্ব। এস্থলে সত্ত্বাদি তিনটি গুণের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ বর্ণিত হইলেও উহারা পৃথক্ থাকে না, সর্বদা একসঙ্গেই থাকে। এই একসঙ্গে থাকাকালে অপর দুইটিকে অভিভূত করিয়া সত্ত্বগুণ প্রবল হইলে যে লক্ষণ উপস্থিত হয়, উহাই মিশ্র সত্ত্বের লক্ষণ। উহা উচ্চ অবস্থা হইলেও মোক্ষদায়ক নহে, কেননা উহাতে রজঃ ও তমঃ মিশ্রিত থাকায় 'আমি জ্ঞানী' ইত্যাদি আত্মাভিমান থাকে, উহাও ত্রৈগুণ্যের অবস্থা, মোক্ষের অবস্থা নহে।

ত্রিগুণের বর্ণনায় অবশ্য তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক—এই ত্রিবিধ অবস্থাই পৃথক্ ভাবে বর্ণনা করিতে হয়—এ সকলই বদ্ধাবস্থা, ইহার অতীত ত্রিগুণাতীত অবস্থাই মোক্ষাবস্থা। শ্রীভাগবতে এই হেতুই ভক্তিতত্ত্ব বর্ণনপ্রসঙ্গে

তামসিক, রাজসিক, সাত্ত্বিক—এই তিন প্রকার ভক্তির লক্ষণ বর্ণনা করিয়া পরে নির্গুণা ভক্তির বর্ণনা করা হইয়াছে এবং সে স্থলে ইহাও বলা হইয়াছে যে, এই নির্গুণা ভক্তির উৎকর্ষাবস্থায় ভেদজ্ঞান বিদূরিত হয়, তখন ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া জীব ভাগবত জীবন বা ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়—'যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে' (ভাঃ ৩।২৯।৭-১৪)। সেইরূপ গীতাতেও তমঃ, রজঃ, সত্ত্ব—এই ত্রিগুণকে পৃথক্‌ভাবে বন্ধনের কারণ বলিয়া পরের অধ্যায়ের শেষে ত্রিগুণাতীত অবস্থার বর্ণনায় অহৈতুকী নির্গুণা ভক্তিদ্বারাই ব্রহ্মভাব লাভ হয় —এই কথাই বলা হইয়াছে (২৬-২৭শ শ্লোক)। কিন্তু গীতাতে অনেক স্থলেই বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের অবস্থাকেই ত্রিগুণাতীত অবস্থা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে, যেমন ৮।২০ শ্লোকে সাত্ত্বিক জ্ঞানের যে বর্ণনা, উহা প্রকৃতপক্ষে স্থিতাবস্থার বর্ণনা (অপিচ, ২।৪৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। বস্তুতঃ, ত্রিগুণাতীতের অবস্থার যে লক্ষণ, উহাই রজস্তমোবর্জিত বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের লক্ষণ এবং উহাই হইতেছে নির্দ্বন্দ্বভাব, বিমল সদানন্দ এবং অপরোক্ষ আত্মানুভূতির অবস্থা। গীতায় নিস্ত্রৈগুণ্য বা ত্রিগুণাতীত বলিতে 'নিত্য শুদ্ধসত্ত্বগুণাশ্রিত' বুঝায়, এই হেতুই ২।৪৫ শ্লোকে শ্রীভগবান্ অর্জুনকে 'নিস্ত্রৈগুণ্য' হইতে বলিয়াও 'নিত্যসত্ত্বস্থ' হইতে বলিয়াছেন। পূর্বোক্ত কথাগুলি অনুধাবন করিলেই একই সত্ত্বগুণকে অনেক স্থলেই মোক্ষের কারণ এবং ১৪।৬ শ্লোকে বন্ধনের কারণ কেন বলা হইতেছে, তাহা বুঝা যাইবে।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য 'বিবেকচূড়ামণি'তে এই দ্বিবিধ সত্ত্বগুণের লক্ষণ ও পার্থক্য স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। যথা, শুদ্ধসত্ত্বের লক্ষণ—

বিশুদ্ধসত্ত্বস্য গুণাঃ প্রসাদঃ স্বাত্মানুভূতিঃ পরমা প্রশান্তিঃ।
তৃপ্তিঃ প্রহর্ষঃ পরমাত্মনিষ্ঠা যয়া সদানন্দরসং সমৃচ্ছতি ॥

এ শ্লোকের মর্ম এই যে, বিশুদ্ধ সত্ত্বের সার ধর্ম দুইটি—(১) আত্মজ্ঞান (আত্মানুভূতি, পরমাত্মনিষ্ঠা); (২) আত্মানন্দ (প্রসাদ, প্রশান্তি, তৃপ্তি, প্রহর্ষ, সদানন্দ)।

মিশ্র সত্ত্বগুণের লক্ষণ—'সত্ত্বং বিশুদ্ধং জলবৎ তথাপি।
তাভ্যাং মিলিত্বা সরণায় কল্পতে।'

'মিশ্রস্য সত্ত্বস্য ভবন্তি ধর্মাঃ ত্বমানিতাদ্যা নিয়মা যমাদ্যাঃ।
শ্রদ্ধা চ ভক্তিশ্চ মুমুক্ষুতা চ দৈবী চ সম্পত্তিরসন্নিবৃত্তিঃ ॥'

এই কথার মর্ম এই যে—সত্ত্বগুণ জলের ন্যায় নির্মল হইলেও অপর দুইটির সহিত মিশ্রিত থাকায় উহা বন্ধনের কারণ হয়। এইরূপ মিশ্রসত্ত্বের লক্ষণ—

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্॥ ৭

কর্তৃত্বাভিমান, যমনিয়মাদি, শ্রদ্ধা, ভক্তি, মুমুক্ষুতা, শমদমাদি দৈবী সম্পদ্, অনিত্য বস্তুতে বিরাগ। মূল কথা এই—মিশ্রসত্ত্ব মুমুক্ষুর সাধনাবস্থার লক্ষণ; শুদ্ধসত্ত্ব মুক্তের সিদ্ধাবস্থার লক্ষণ।

"সত্ত্বগুণের খুব প্রাধান্য হইলেও তাহা প্রকৃত স্বাধীনতার অবস্থা নহে (উহাও বন্ধনের অবস্থা)। কারণ, গীতা দেখাইয়াছেন যে, অন্যান্য গুণের ন্যায় সত্ত্বও বন্ধন করে এবং অন্যান্য গুণের ন্যায়ই বাসনা ও অহঙ্কারের দ্বারাই বন্ধন করে। সত্ত্বের বাসনা মহত্তর, সত্ত্বের অহঙ্কার শুদ্ধতর, কিন্তু যত দিন এই দুইটি—বাসনা ও অহঙ্কার—যে কোন আকারে জীবকে ধরিয়া থাকে, তত দিন কোন স্বাধীনতা নাই। যে মানুষ সাধু, জ্ঞানী, তাঁহার ভিতর সাধুর 'অহং' রহিয়াছে, জ্ঞানীর 'অহং' রহিয়াছে এবং তিনি এই সাত্ত্বিক অহঙ্কারের তৃপ্তি করিতে চান। প্রকৃত স্বাধীনতা, চরম স্বরাজ্য তখনই আরম্ভ হইবে যখন প্রাকৃত আত্মার উপরে আমরা পরমাত্মাকে দেখিতে পাইব, ধরিতে পারিব। আমাদের ক্ষুদ্র 'আমি'—আমাদের অহঙ্কার এই পরমাত্মাকে দেখিতে দেয় না। ইহার জন্য আমাদিগকে গুণত্রয়ের বহু ঊর্ধ্বে উঠিতে হইবে, ত্রিগুণাতীত হইতে হইবে, কারণ পরমাত্মা সত্ত্বগুণেরও উপরে। আমাদিগকে সত্ত্বের ভিতর দিয়াই উঠিতে হইবে বটে, কিন্তু যতক্ষণ আমরা সত্ত্বকে ছাড়াইয়া না যাইব, ততক্ষণ সেখানে পৌঁছিতে পারিব না। কেবল তখনই আমরা নিশ্চিত হইয়া তাঁহাতে বাস করিতে পারি, যখন আমাদের সমস্ত বাসনা দূর হইয়া গিয়াছে।"—শ্রীঅরবিন্দের গীতা (অনিলবরণ)।

৭। হে কৌন্তেয়, রজঃ (রজোগুণ) রাগাত্মকম্ (অনুরাগ স্বরূপ) তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্ (তৃষ্ণা ও আসক্তির উৎপাদক) বিদ্ধি (জানিও), তৎ (তাহা) কর্মসঙ্গেন (কর্মাসক্তি দ্বারা) দেহিনং নিবধ্নাতি (আত্মাকে আবদ্ধ করে)।

তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবং—তৃষ্ণা অপ্রাপ্তেঽর্থেঽভিলাষঃ সঙ্গঃ প্রাপ্তেঽর্থে প্রীতিঃ, তয়োঃ সমুদ্ভবো যস্মাৎ তৎ (শ্রীধর)— তৃষ্ণা=অপ্রাপ্ত বস্তুতে অভিলাষ; সঙ্গ=প্রাপ্ত বস্তুতে প্রীতি বা আসক্তি, এই উভয় যাহা হইতে উৎপন্ন হয়।

হে অর্জুন, রজোগুণ রাগাত্মক, তৃষ্ণা ও আসক্তি উহা হইতে উৎপন্ন হয়। উহা কর্মাসক্তিদ্বারা দেহীকে বন্ধন করে। ৭

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥ ৮
সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ৯
রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০

৮। হে ভারত, তমঃ তু অজ্ঞানজং (অজ্ঞান হইতে জাত), সর্বদেহিনাং (সর্বজীবের) মোহনং (ভ্রান্তিজনক) বিদ্ধি (জানিও); তৎ (তাহা) প্রমাদ-আলস্য-নিদ্রাভিঃ (ভ্রম বা অনবধানতা, আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা) নিবধ্নাতি (আত্মাকে বন্ধন করিয়া থাকে)।

হে ভারত, তমোগুণ অজ্ঞানজাত এবং দেহিগণের ভ্রান্তিজনক। ইহা প্রমাদ (অনবধানতা), আলস্য ও নিদ্রা (চিত্তের অবসাদ) দ্বারা জীবকে আবদ্ধ করে। ৮

৯। হে ভারত, সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি (সংশ্লিষ্ট করে), রজঃ কর্মণি (কর্মে) উত (এবং) তমঃ তু জ্ঞানম্ আবৃত্য (আচ্ছাদন করিয়া) প্রমাদে সঞ্জয়তি (সংশ্লিষ্ট করে)।

হে ভারত, সত্ত্বগুণ সুখে এবং রজোগুণ কর্মে জীবকে আসক্ত করে। কিন্তু তমোগুণ জ্ঞানকে আবৃত করিয়া প্রমাদ (কর্তব্যমূঢ়তা বা অনবধানতা) উৎপন্ন করে। ৯

১০। হে ভারত, সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) রজঃ তমঃ চ (রজঃ ও তমোগুণকে) অভিভূয় (অভিভূত করিয়া) ভবতি (প্রবল হয়), রজঃ (রজোগুণ) সত্ত্বং তমঃ চ (সত্ত্ব ও তমোগুণকে) [অভিভূত করিয়া], তথা তমঃ (এবং তমোগুণ) সত্ত্বং রজঃ এব চ (সত্ত্ব ও রজোগুণকে) [অভিভূত করিয়া প্রবল হয়]।

সাত্ত্বিকাদি তিন প্রকার স্বভাবের লক্ষণ ১০-১৩

হে ভারত, সত্ত্বগুণ রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া প্রবল হয়, রজোগুণ তমঃ ও সত্ত্বগুণকে অভিভূত করিয়া প্রবল হয় এবং তমোগুণ রজঃ ও সত্ত্বগুণকে অভিভূত করিয়া প্রবল হয়। ১০

এই তিন গুণ কখনও পৃথক্ পৃথক্ থাকে না, তিনটি একত্রই থাকে। কিন্তু জীবের পূর্ব কর্মানুরূপ অদৃষ্টবশে কখনও সত্ত্বগুণ অপর দুইটিকে অভিভূত করিয়া

সর্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্ বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১
লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২
অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩

প্রবল হয় এবং জীবকে সুখাদিতে আসক্ত করে। এইরূপ কোথাও রজোগুণ প্রবল হইয়া কর্মাসক্তি জন্মায় বা তমোগুণ প্রবল হইয়া নিদ্রা, প্রমাদ, আলস্যাদি উৎপন্ন করে। এই হেতুই বিভিন্ন জীবের সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এইরূপ বিভিন্ন প্রকৃতি দৃষ্ট হয়।

এই কয়েকটি শ্লোকে (১০ম-১৩শ) সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস এই তিন প্রকার স্বভাবের লক্ষণ বলা হইতেছে।

১১। যদা অস্মিন্ (এই) দেহে সর্বদ্বারেষু (সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারে) জ্ঞানং প্রকাশঃ (জ্ঞানরূপ প্রকাশ) উপজায়তে (উৎপন্ন হয়) তদা উত (তখনই) সত্ত্বং বিবৃদ্ধম্ (প্রবল হইয়াছে) ইতি বিদ্যাৎ (ইহা জানিবে)।

যখনই এই দেহে শ্রোত্রাদি সর্ব ইন্দ্রিয়দ্বারে জ্ঞানাত্মক প্রকাশ অর্থাৎ নির্মল জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন জানিবে যে, সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ১১

এস্থলে 'উত' শব্দদ্বারা সুখাদি লক্ষণও বুঝিতে হইবে।

১২। হে ভরতর্ষভ, লোভঃ (পরদ্রব্যগ্রহণেচ্ছা), প্রবৃত্তিঃ (সর্বদা কর্মকরণেচ্ছা), কর্মণাম্ আরম্ভঃ (কর্মে উদ্যম), অশমঃ (অশান্তি, অস্থিরতা), স্পৃহা (বিষয়াকাঙ্ক্ষা),—এতানি (এই সকল চিহ্ন) রজসি বিবৃদ্ধে (রজোগুণ বৃদ্ধি পাইলে) জায়ন্তে (উৎপন্ন হয়)।

অশমঃ—অশান্তি, অতৃপ্তি; সর্বদা ইহা করিয়া উহা করিব—ইত্যাদি রূপ অস্থিরতা।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ, লোভ, সর্বদা কর্মে প্রবৃত্তি এবং সর্ব কর্মে উদ্যম, শান্তি ও তৃপ্তির অভাব, বিষয়স্পৃহা—এইসকল লক্ষণ রজোগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে উৎপন্ন হয়। ১২

১৩। হে কুরুনন্দন, অপ্রকাশঃ (অন্ধকার, বিবেকভ্রংশ) অপ্রবৃত্তিঃ চ (অনুদ্যম, আলস্য) প্রমাদঃ (কর্তব্যের বিস্মৃতি, অনবধানতা) মোহঃ (বিপর্যয়-বুদ্ধি, মিথ্যা অভিনিবেশ) এব চ—এতানি তমসি বিবৃদ্ধে জায়ন্তে।

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪
রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৫
কর্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥ ১৬

হে কুরুনন্দন, তমোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে বিবেকভ্রংশ, নিরুদ্যমতা, কর্তব্যের বিস্মরণ এবং মোহ বা বুদ্ধি-বিপর্যয়—এই সকল লক্ষণ উৎপন্ন হয়। ১৩

১৪। যদা তু (যখন) সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে (সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পাইলে) দেহভৃৎ (জীব) প্রলয়ং (মৃত্যু) যাতি (প্রাপ্ত হয়), তদা উত্তমবিদাম্ (উত্তম তত্ত্বজ্ঞানীদিগের) অমলান্ লোকান্ (নির্মল লোকসমূহ) প্রতিপদ্যতে (প্রাপ্ত হয়)।

তিন প্রকার গুণের বিশেষ বিশেষ ফল ১৪-১৮

সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে যদি জীবের মৃত্যু হয়, তবে তিনি উত্তম তত্ত্ববিদ্‌গণের প্রাপ্য প্রকাশময় দিব্য লোকসকল প্রাপ্ত হন। ১৪

উত্তমবিদাং—উত্তমবিদ্‌গণের অর্থাৎ মহদাদি-তত্ত্ববিদ্‌গণের (শঙ্কর); হিরণ্যগর্ভাদির উপাসকগণের (শ্রীধর); উত্তম তত্ত্ব-জ্ঞানীদিগের অর্থাৎ দেবতা প্রভৃতির (তিলক)।

১৫। রজসি (রজোগুণের বৃদ্ধিকালে) প্রলয়ং গত্বা (মৃত্যু প্রাপ্ত হইলে) কর্মসঙ্গিষু (কর্মে আসক্ত মনুষ্যমধ্যে) জায়তে (জন্ম লাভ করে), তথা তমসি (তমোগুণের বৃদ্ধিকালে) প্রলীনঃ (মৃত ব্যক্তি), মূঢ়যোনিষু (পশ্বাদি যোনিতে) জায়তে (জন্মলাভ করে)।

রজোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে কর্মাসক্ত মনুষ্য-যোনিতে জন্ম হয় এবং তমোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে পশ্বাদি মূঢ়-যোনিতে জন্ম হয়। ১৫

১৬। [জ্ঞানিগণ] সুকৃতস্য কর্মণঃ (পুণ্যকর্মের, সাত্ত্বিক কর্মের) সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলম্ আহুঃ (বলিয়াছেন); রজসঃ তু (রাজসিক কর্মের) ফলং দুঃখং; তমসঃ (তামসিক কর্মের) ফলম্ অজ্ঞানম্।

সাত্ত্বিক পুণ্য কর্মের ফল নির্মল সুখ, রাজসিক কর্মের ফল দুঃখ এবং তামসিক কর্মের ফল অজ্ঞান, তত্ত্বদর্শিগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। ১৬

সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭
ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮
নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥ ১৯

১৭। সত্ত্বাৎ (সত্ত্বগুণ হইতে) জ্ঞানং সংজায়তে (উৎপন্ন হয়); রজসঃ (রজোগুণ হইতে) লোভঃ এব চ [হয়]; তমসঃ (তমোগুণ হইতে) অজ্ঞানং প্রমাদমোহৌ এব চ (অজ্ঞান এবং প্রমাদ ও মোহ) ভবতঃ (হয়)।

সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়; রজোগুণ হইতে লোভ এবং তমোগুণ হইতে অজ্ঞান, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১৭

১৮। সত্ত্বস্থাঃ (সত্ত্বগুণপ্রধান ব্যক্তিগণ) ঊর্ধ্বং (ঊর্ধ্বে অর্থাৎ স্বর্গাদি লোকে) গচ্ছন্তি (গমন করেন); রাজসাঃ (রজোগুণ-প্রধান ব্যক্তিগণ) মধ্যে তিষ্ঠন্তি (মধ্যে অর্থাৎ মনুষ্য-লোকে থাকেন), জঘন্যগুণবৃত্তিস্থাঃ (নিকৃষ্ট গুণবৃত্তিসম্পন্ন) তামসাঃ (তমোগুণ-বিশিষ্ট লোকেরা) অধঃ গচ্ছন্তি (অধোগতি প্রাপ্ত হয়)।

জঘন্যগুণবৃত্তিস্থাঃ—জঘন্যো নিকৃষ্টঃ তমোগুণঃ তস্য বৃত্তিঃ প্রমাদমোহাদিঃ তত্র স্থিতাঃ (শ্রীধর)।

সত্ত্বগুণপ্রধান ব্যক্তি ঊর্ধ্বলোকে অর্থাৎ স্বর্গাদি লোকে গমন করেন; রজঃপ্রধান ব্যক্তিগণ মধ্যলোকে অর্থাৎ ভূলোকে অবস্থান করেন; এবং প্রমাদ-মোহাদি নিকৃষ্টগুণসম্পন্ন তমঃপ্রধান ব্যক্তিগণ অধোগামী হয় (তমিস্রাদি নরক বা পশ্বাদি যোনি প্রাপ্ত হয়)। ১৮

১৪শ হইতে ১৮শ শ্লোকে গুণত্রয়ের বিশেষ বিশেষ ফল বর্ণিত হইল। এস্থলে বলা হইয়াছে, সত্ত্বগুণ-প্রধান ব্যক্তিগণ স্বর্গাদি দিব্যলোক প্রাপ্ত হন। কিন্তু তাহা হইলেও তাহাদের মোক্ষলাভ বা ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে না। ঐ সকল লোক হইতেও পতন আছে। তবে মোক্ষলাভ কিসে হয়?—পরের দুই শ্লোক।

১৯। যদা দ্রষ্টা (উদাসীনরূপে দর্শকস্বরূপ পুরুষ) গুণেভ্যঃ (তিন গুণভিন্ন) অন্যং কর্তারং (অন্য কর্তা) ন অনুপশ্যতি (না দেখেন), গুণেভ্যঃ চ পরং (গুণসমূহের অতীত বস্তুকে) বেত্তি (জানেন), [তদা] সঃ (তিনি) মদ্ভাবম্ (আমার ভাব, ব্রহ্মভাব) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন)।

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ ২০

অর্জুন উবাচ
কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ততে ॥ ২১

ত্রিগুণাতীত হইতে মোক্ষ ১৯-২০

যখন দ্রষ্টা জীব গুণ ভিন্ন অন্য কাহাকেও কর্তা না দেখেন (অর্থাৎ প্রকৃতিই কর্ম করে, আমি করি না, ইহা বুঝিতে পারেন) এবং তিন গুণের অতীত পরম বস্তুকে অর্থাৎ আত্মাকে জ্ঞাত হন, তখন তিনি আমার ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মভাব বা ত্রিগুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হন। ১৯

২০। দেহী (জীব) দেহসমুদ্ভবান্ (দেহোৎপত্তির বীজস্বরূপ) এতান্ ত্রীন্ গুণান্ (এই তিন গুণ) অতীত্য (অতিক্রম করিয়া) জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈঃ রিমুক্তঃ (জন্মমৃত্যুজরাদুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া) অমৃতম্ অশ্নুতে (অমৃত অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেন)।

দেহ-সমুদ্ভবান্—দেহঃ সমুদ্ভবঃ পরিণামো যেষাং তান্ দেহোৎপত্তিবীজভূতামিত্যর্থঃ (শ্রীধর)।

জীব দেহোৎপত্তির কারণভূত এই তিন গুণ অতিক্রম করিয়া জন্মমৃত্যু জরাদুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেন। ২০

প্রকৃতির গুণসঙ্গবশতঃই জীবের দেহোৎপত্তি ও সংসারিত্ব। এই ত্রিগুণ অতিক্রম করিতে পারিলেই মোক্ষ। তাহার উপায় কি? সাংখ্যদর্শন বলেন যে, জীব যখন বুঝিতে পারে যে প্রকৃতি পৃথক্, আমি পৃথক্, তখনই তাহার মুক্তি হয়। কিন্তু বেদান্ত ও গীতা সাংখ্যের এই প্রকৃতি-পুরুষরূপী দ্বৈতকে মূল তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করেন না। সুতরাং এই কথাটিই গীতায় এইরূপ ভাবে বলা হয় যে, প্রকৃতি ও পুরুষের উপরে যে পরমাত্মা বা পুরুষোত্তম আছেন, সেই পরমাত্মাকে যখন জীব জানিতে পারে, তখনই তাহার মোক্ষ বা ব্রহ্মলাভ হয়।

২১। অর্জুনঃ উবাচ—হে প্রভো, কৈঃ লিঙ্গৈঃ (কি কি চিহ্নদ্বারা) [জীব] এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতীতঃ (এই গুণত্রয় হইতে মুক্ত) ভবতি (হন), কিম্ আচারঃ (কিরূপ আচার-যুক্ত), কথং চ (এবং কি প্রকারে) এতান্ ত্রীন্ গুণান্ (এই তিন গুণ) অতিবর্ত্ততে (অতিক্রম করেন)?

শ্রীভগবান্ উবাচ

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ২২
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ ২৩

অর্জুন কহিলেন,—হে প্রভো, কোন্ লক্ষণের দ্বারা জানা যায় যে জীব ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়াছেন? তাঁহার আচার কিরূপ? এবং কি প্রকারে তিনি ত্রিগুণ অতিক্রম করেন? ২১

পূর্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, ত্রিগুণাতীত হইলেই মোক্ষ লাভ হয়। এক্ষণে অর্জুন জানিতে চাহিতেছেন যে, ত্রিগুণাতীতের লক্ষণ কি এবং ত্রিগুণাতীত হওয়ার উপায় কি? দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞ সম্বন্ধেও এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন (২।৫৪)। এই স্থিতপ্রজ্ঞ এবং ত্রিগুণাতীতের অবস্থা, একই। ইহাকেই **ব্রাহ্মীস্থিতি** বলে।

২২। শ্রীভগবান্ উবাচ—হে পাণ্ডব, প্রকাশঞ্চ (প্রকাশ অর্থাৎ জ্ঞান) প্রবৃত্তিং চ (কর্মপ্রবৃত্তি) মোহমেব চ (এবং মোহ) সংপ্রবৃত্তানি (প্রবৃত্ত হইলে) [যিনি] ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না), নিবৃত্তানি চ (এবং উহারা নিবৃত্ত থাকিলেও) ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষা করেন না) [তিনি গুণাতীত বলিয়া কথিত হন]।

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে পাণ্ডব, সত্ত্বগুণের কার্য প্রকাশ বা জ্ঞান, রজোগুণের ধর্ম কর্ম-প্রবৃত্তি এবং তমোগুণের ধর্ম মোহ, এই সকল গুণধর্ম প্রবৃত্ত হইলেও যিনি দুঃখবুদ্ধিতে দ্বেষ করেন না এবং ঐ সকল কার্যে নিবৃত্ত থাকিলেও যিনি সুখবুদ্ধিতে উহা আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনিই গুণাতীত বলিয়া উক্ত হন। ২২

তাৎপর্য এই যে, দেহে প্রকৃতির কার্য চলিতেছে চলুক। আমি উহাতে লিপ্ত নই। আমি অকর্তা, উদাসীন, সাক্ষিস্বরূপ। এই জ্ঞান যাঁহার হইয়াছে তিনিই ত্রিগুণাতীত। দেহ থাকিতে ত্রিগুণের কার্য চলিবেই, কিন্তু দেহী যখন ইহাতে লিপ্ত হন না, তখনই তিনি ত্রিগুণাতীত হন।

২৩। যঃ (যিনি) উদাসীনবৎ আসীনঃ (স্থিত হইয়া) গুণৈঃ ন বিচাল্যতে (গুণসমূহ কর্তৃক বিচলিত হন না), গুণাঃ বর্তন্তে (গুণসমূহ স্বকার্য করিতেছে) ইত্যেবং (এইরূপে, ইহা জানিয়া) যঃ অবতিষ্ঠতি (যিনি অবস্থান করেন), ন ইঙ্গতে (চলেন না, চঞ্চল হন না), [তিনি গুণাতীত বলিয়া উক্ত হন]।

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্য প্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্য নিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥ ২৪
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫

যিনি উদাসীনের ন্যায় সাক্ষিস্বরূপে অবস্থান করেন, সত্ত্বাদিগুণ-কার্য সুখদুঃখাদি কর্তৃক বিচালিত হন না, গুণসকল স্ব স্ব কার্যে বর্তমান আছে, আমার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই, ইহা মনে করিয়া যিনি চঞ্চল হন না, তিনি গুণাতীত বলিয়া কথিত হন। ২৩

২৪। (যঃ) সমদুঃখসুখঃ (সুখ-দুঃখে সমজ্ঞানবিশিষ্ট) স্বস্থঃ (আত্মস্বরূপে অবস্থিত) সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ (মৃত্তিকা, প্রস্তর ও সুবর্ণে সমজ্ঞান-সম্পন্ন) তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ (প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ে সমবুদ্ধিসম্পন্ন) ধীরঃ (ধীমান্) তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ (নিজের নিন্দা ও প্রশংসায় তুল্যবুদ্ধি), [তিনিই গুণাতীত বলিয়া উক্ত হন]।

যাঁহার নিকট সুখদুঃখ সমান, যিনি স্বস্থ অর্থাৎ আত্মরূপেই স্থিত, মৃত্তিকা, প্রস্তর ও সুবর্ণ যাঁহার নিকট সমান, যিনি প্রিয় ও অপ্রিয় এবং আপনার নিন্দা ও প্রশংসা তুল্য মনে করেন, যিনি ধীমান্ বা ধৈর্যযুক্ত, তিনিই গুণাতীত বলিয়া অভিহিত হন। ২৪

২৫। যঃ মানাপমানয়োঃ তুল্যঃ (মান ও অপমানে সমবুদ্ধিসম্পন্ন) মিত্রারিপক্ষয়োঃ (মিত্রপক্ষে ও শত্রুপক্ষে) তুল্যঃ (সমবুদ্ধিসম্পন্ন) সর্বারম্ভপরিত্যাগী (সর্বপ্রকার উদ্যম পরিত্যাগী) সঃ গুণাতীতঃ উচ্যতে (কথিত হন)।

সর্বারম্ভপরিত্যাগী—৪০৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

মানে ও অপমানে, শত্রুপক্ষ ও মিত্রপক্ষে যাঁহার তুল্যজ্ঞান এবং ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া যিনি কর্মোদ্যম করেন না, এরূপ ব্যক্তি গুণাতীত বলিয়া কথিত হন। ২৫

ত্রিগুণাতীতের লক্ষণ। ২১শ-২৫শ শ্লোকে ত্রিগুণাতীত পুরুষের লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। দেহে গুণের কার্য চলিতে থাকিলেও যিনি উদাসীনের ন্যায় সাক্ষিস্বরূপে অবস্থিত থাকেন, গুণকার্য সুখদুঃখ মোহাদি কর্তৃক বিচালিত হন না, তিনিই ত্রিগুণাতীত; তিনি নির্দ্বন্দ্ব, নিঃসঙ্গ, সর্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন।

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২৬
ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥ ২৭

সাংখ্যের পরিভাষায় যাহা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, বেদান্তের ভাষায় তাহাই অজ্ঞান বা মায়া। সুতরাং ত্রিগুণাতীত অবস্থাই হইতেছে মায়ামুক্ত হইয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হওয়া, ইহাই ব্রাহ্মীস্থিতি (২।৭২)। এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, দ্বিতীয় অধ্যায়ের স্থিতপ্রজ্ঞের বর্ণনা (২।৫৫-৭২), দ্বাদশ অধ্যায়ের ভক্তের লক্ষণ (১২।১৩-২০) এবং ৩য়, ৪র্থ প্রভৃতি অধ্যায়ে বর্ণিত কর্মযোগীর লক্ষণ (৩।২৫।২৮।৩০, ৪।১৮-২৩, ৫।৭, ১৮।২৬), এ সকলই মূলতঃ এক, বর্ণনাও অনেক স্থলেই শব্দশঃ একরূপ। স্থূল কথা এই, জ্ঞান, কর্ম, যোগ, ভক্তি—যিনি যে পথই অবলম্বন করুন না কেন, শেষে সিদ্ধাবস্থায় লক্ষণ একরূপই দাঁড়ায়। গীতার বিশেষত্ব এই যে, গীতা জ্ঞানোত্তর কর্মের নিষেধ করেন নাই, বরং লোকসংগ্রহার্থ কর্মের উপদেশ দিয়াছেন এবং জ্ঞান-কর্মের সঙ্গেই ভক্তি সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। গীতামতে ভক্তিদ্বারাই ত্রিগুণাতীত হইয়া ব্রহ্মভাব লাভ হয়। (পরের শ্লোক)।

২৬। যঃ চ (যিনি) মাম্ (আমাকে) অব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন (ঐকান্তিক ভক্তিযোগ সহকারে) সেবতে (সেবা করেন) সঃ এতান্ গুণান্ সমতীত্য (এই সকল গুণ অতিক্রম করিয়া) ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে (ব্রহ্মভাব লাভে সমর্থ হন)।

যিনি ঐকান্তিক ভক্তিযোগ সহকারে আমার সেবা করেন, তিনি এই তিন গুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব লাভে সমর্থ হন। ২৬

২৭। হি (যেহেতু) অহং (আমি বাসুদেব) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) প্রতিষ্ঠা (স্থিতিস্থান, আশ্রয়), অব্যয়স্য (নিত্য) অমৃতস্য (মোক্ষের) [প্রতিষ্ঠা], শাশ্বতস্য (চিরন্তন) ধর্মস্য চ (ধর্মেরও) [প্রতিষ্ঠা]; ঐকান্তিকস্য চ (অখণ্ডিত, ঐকান্তিক) সুখস্য (সুখের) [প্রতিষ্ঠা]; অথবা অহম্ (আমি) অব্যয়স্য অমৃতস্য চ ব্রহ্মণঃ— আমি অব্যয় অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। (অপরাংশ পূর্ববৎ)।

প্রতিষ্ঠা—প্রতিমা ; ঘনীভূতং ব্রহ্মৈবাহং যথা ঘনীভূতঃ প্রকাশ এব সূর্যমণ্ডলং তদ্বদ্ ইত্যর্থঃ (শ্রীধর)।—আমি বাসুদেব ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ ঘনীভূত ব্রহ্ম, যেমন সূর্যমণ্ডল ঘনীভূত প্রকাশস্বরূপ তদ্রূপ।

যেহেতু আমি ব্রহ্মের নিত্য অমৃতের অর্থাৎ মোক্ষের, সনাতন ধর্মের এবং ঐকান্তিক সুখের প্রতিষ্ঠা (অথবা আমি অমৃত ও অব্যয় ব্রহ্মের, শাশ্বত ধর্মের এবং ঐকান্তিক সুখের প্রতিষ্ঠা)। ২৭

আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা—ভগবৎ-তত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব

সাংখ্যমতে ত্রিগুণাতীত হইয়া 'কেবল হওয়া' বা কৈবল্যলাভের একমাত্র উপায় পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞান। পাতঞ্জলমতে ধ্যান-ধারণা ও পরিশেষে নির্বীজ সমাধি ; সাংখ্যে যাহাকে প্রকৃতি বলে, অদ্বৈত বেদান্তে তাহাই অজ্ঞান বা মায়া ; বেদান্তমতে, তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন দ্বারা এই অজ্ঞান বা মায়া কাটিয়া অপরোক্ষ আত্মানুভূতি বা ব্রহ্মভাব লাভ হয়। এস্থলে কিন্তু শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, 'আমাকে একান্ত ভক্তিযোগে সেবা করিলেই ত্রিগুণাতীত হইয়া ব্রহ্মভাব লাভ করা যায় ; কারণ, আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা।' ৭।২৯ শ্লোকেও এইরূপ কথাই আছে। আবার অন্যত্র আছে, 'ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইলে আমাতে পরাভক্তি জন্মে' (১৮।৫৪)। এই 'আমি' কে, ব্রহ্ম কোন্ বস্তু, আর ব্রহ্মভাবই বা কি ? 'আমি' বলিতে অবশ্য এস্থলে বুঝায় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু ভগবানে ও ব্রহ্মে কি কোন পার্থক্য আছে ? আছেও ; নাইও। স্বরূপতঃ না থাকিলেও সাধকের নিকট যে পার্থক্য আছে তাহা বুঝা যায় দ্বাদশ অধ্যায়ে অর্জুনের প্রশ্নে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমাকে যাঁহারা ত্বদ্গতচিত্ত হইয়া ভজনা করেন, আর যাঁহারা অক্ষর ব্রহ্ম চিন্তা করেন, এ উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাধক কে ?' তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন—'আমার ভক্তই শ্রেষ্ঠ সাধক, তবে অক্ষর ব্রহ্মচিন্তকেরাও আমাকেই পান।' এই কথার মর্ম এই যে, অক্ষর ব্রহ্ম আমিই, ব্রহ্মভাব আমারই বিভাব, নির্গুণভাবে আমি অক্ষর ব্রহ্ম, সগুণভাবে আমি বিশ্বরূপ, লীলাভাবে আমি অবতার—আমি পুরুষোত্তমই পরতত্ত্ব—'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় (৭।৭)'—ব্রহ্ম, আত্মা, বিরাট্, বৈশ্বানর, তৈজস, প্রাজ্ঞ, তুরীয়—সকলই আমি, সকল অবস্থাই আমার বিভাব বা বিভিন্ন ভাব। এই সগুণ-নির্গুণ, সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কর্তা, যজ্ঞ-তপস্যার ভোক্তা, সর্বলোকমহেশ্বর পরমাত্মা পুরুষোত্তমই ভগবৎ-তত্ত্ব ; আর উহার যে অনির্দেশ্য, অক্ষর, নির্বিশেষ নির্গুণ বিভাব, তাহাই ব্রহ্মতত্ত্ব। এই অর্থে বলা হইয়াছে, আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, শাশ্বত ধর্মের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।

কিন্তু মায়াবাদী বেদান্তী বলেন,—নির্বিশেষ ব্রহ্মই পরতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, মায়ার বিজৃম্ভণ উপাধি-কল্পিত অবস্তু—'ঈশ্বরত্বঞ্চ জীবত্বং—উপাধিদ্বয়কল্পিতং' (পঞ্চদশী) ;

পক্ষান্তরে ভাগবত-শাস্ত্রী বলেন, স্বয়ং ভগবান্ই পরতত্ত্ব, ব্রহ্ম তাঁহার অঙ্গজ্যোতিঃ—'যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা' (চরিতামৃত)।

বৈষ্ণব গোস্বামীপাদের এই উক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বেদান্তী বলেন—'ওকথায় বেদ অমান্য করা হয়, কোন ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রে এমন কথা নাই।' কিন্তু কথাটার রূপকের ভাষা ত্যাগ করিলে উহা 'আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা' গীতোক্ত এই ভগবদ্বাক্যের অনুবাদ বলিয়াই বোধ হয়; গীতা অবশ্য ঋষি-প্রণীত শাস্ত্র। বস্তুতঃ গীতা ভাগবত-ধর্মের গ্রন্থ, ব্রহ্মতত্ত্ব ও ভগবৎ-তত্ত্ব ইহাতে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত; বাসুদেব-ভক্তিই ইহার প্রধান কথা; ভগবান্ বাসুদেবই পরব্রহ্ম—সগুণও তিনি নির্গুণও তিনি, তিনিই সমস্ত—তাঁহা ভিন্ন আর কিছু নাই—'সর্বং ত্বমেব সগুণো বিগুণশ্চ ভূমন্ নান্যৎ ত্বদস্ত্যপি মনোবচসা নিরুক্তম্' (ভাগবত ৭।৯।৪৮)। প্রশ্ন হইতে পারে,—তিনিই যখন পরব্রহ্ম, তখন 'আমি ব্রহ্ম' বলিলেই হয়, 'আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা',—একথারই বা কি প্রয়োজন? এস্থলে প্রয়োজন আছে। ত্রিগুণাতীত কথাটা সাংখ্যদর্শনের, উহা নিরীশ্বর। সাংখ্যমতে একমাত্র জ্ঞানই কৈবল্য লাভের উপায় ('জ্ঞানান্মুক্তিঃ'—সাংখ্যসূত্র ৩।২৩)। বেদান্ত মতেও জ্ঞানই ব্রহ্মভাব বা মোক্ষলাভের উপায়, ব্রহ্মসূত্রে কোথাও 'ভক্তি' শব্দ নাই। কিন্তু এস্থলে ভগবান্ বলিতেছেন,—ত্রিগুণাতীত হইয়া ব্রহ্মভাব লাভের উপায় আমাতে (অর্থাৎ ভগবান্ বাসুদেবে) অব্যভিচারিণী ভক্তি। কাজেই তাঁহাকে বুঝিতে হইল যে, ব্রহ্মভাব আমারই অর্থাৎ ভগবান্ পুরুষোত্তমেরই বিভাব অর্থাৎ ভগবৎ-তত্ত্বেই প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং ভগবান্ ভক্তিদ্বারাই অধিগম্য। সাধনপথে ভক্তির উপযোগিতা স্বীকার করিলেই ভগবত্তত্ত্বের শ্রেষ্ঠতা স্বতঃই আসিবে, এই হেতু গীতা বেদান্তাদি শাস্ত্রের মূলতত্ত্ব স্বীকার করিলেও উহাতে ঈশ্বর-বাদেরই প্রাধান্য (১৯৩ পৃষ্ঠা ও ১৫।১৮ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

'গীতা সাধারণভাবে সেই সেই দর্শনের (সাংখ্য, বেদান্তাদির) মূল প্রতিপাদ্য অঙ্গীকার করিয়া তাহার সহিত ঈশ্বরবাদ সংযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে সুসম্পূর্ণ করিয়াছেন।...এই ঈশ্বরবাদই গীতার প্রাণ; গীতার আদি, অন্ত, মধ্য—সমস্তই ঈশ্বরবাদে সমুজ্জ্বল।'—বেদান্তরত্ন হীরেন্দ্রনাথ, গীতায় ঈশ্বরবাদ।

কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরতত্ত্বকে গৌণ করিয়া ব্রহ্মতত্ত্বই পরতত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে 'আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা', এই কথার সরল অর্থ গ্রহণ করা চলে না; কাজেই তাঁহারা এই বাক্যের শব্দার্থ লইয়া অনেক 'টানাবুনা'

করিয়াছেন। কেহ বলেন, এ স্থলে 'আমি' বলিতে বুঝায় 'নিরুপাধিক ব্রহ্ম' এবং 'ব্রহ্ম' বলিতে বুঝায় 'সোপাধিক ব্রহ্ম' এবং কেহ বলেন, এস্থলে 'ব্রহ্ম' অর্থ প্রকৃতি, 'আমি' পরব্রহ্ম ; কেহ বলেন, এস্থলে 'ব্রহ্ম' অর্থ বেদ ইত্যাদি। এরকম ব্যাখ্যায় পূর্বাপর সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয় না। উহা 'গরজমূলক, সরল নহে।'

আবার এই মতাবলম্বী কেহ কেহ পূর্বোক্ত সরল অর্থই গ্রহণ করেন, কিন্তু বলেন যে, সম্ভবতঃ এই শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত। 'প্রক্ষেপের' কারণস্বরূপ বলেন—

"পূর্ব শ্লোকে বলা হইতেছে যে, কৃষ্ণকে ভক্তি করিলে ব্রহ্মভাব লাভ করা যায়। ইহাতে ব্রহ্মেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়। ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তিই লক্ষ্য। ইহার উপায় কৃষ্ণভক্তি। যাহা লক্ষ্য তাহাই শ্রেষ্ঠতর ; লক্ষ্য অপেক্ষা পথ শ্রেষ্ঠ হয় না। কিন্তু কৃষ্ণভক্তি অপেক্ষা পরব্রহ্ম প্রাপ্তি শ্রেষ্ঠ হইবে, বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ এভাব পছন্দ করেন নাই। ব্রহ্মকে হীন করিয়া কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ করা আবশ্যক হইয়াছিল। এই জন্য কোন বৈষ্ণব পণ্ডিত 'ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহং' ইত্যাদি অংশ সংযোজন করিয়াছেন।"—স্বর্গত মহেশচন্দ্র ঘোষ, প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৩৫।

এ সম্বন্ধে বিবেচ্য এই যে,—শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য এই শ্লোক গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং প্রক্ষেপ হইলে তাঁহার পূর্ববর্তী কালে হইয়াছে। সেই প্রাচীনকালে কোন বৈষ্ণব পণ্ডিত উক্তরূপ উদ্দেশ্য লইয়া বৈষ্ণবগণের নমস্য শ্রীগীতার মধ্যে কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত করা আবশ্যক বোধ করিয়াছেন, এরূপ সিদ্ধান্ত বিশেষ প্রমাণ-সাপেক্ষ। সে যাহা হউক, পূর্বোক্তরূপ যুক্তি অবলম্বন করিলে শ্রীগীতার অন্যান্য স্থলের আলোচনায় ইহার ঠিক বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। এস্থলে যেমন বলা হইয়াছে, আমাকে ভক্তি করিলে 'ব্রহ্মভাব' লাভ হয় (১৪।২৬), আবার ১৮।৫৪-৫৫ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, 'ব্রহ্মভাব লাভ হইলে আমাতে পরা ভক্তি জন্মে এবং ভক্তিদ্বারাই আমাকে তত্ত্বতঃ জানিয়া আমাতে প্রবেশ করা যায়।' পূর্বোক্ত যুক্তি-বলেই বলা যায় যে, এস্থলে ব্রহ্মভাব হইতে কৃষ্ণভক্তিকেই শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে এবং ব্রহ্মতত্ত্বের উপরে ভগবত্তত্ত্বকে স্থাপন করা হইয়াছে। বস্তুতঃ কৃষ্ণ বড় কি ব্রহ্ম বড়, এরূপ ধারণা সাম্প্রদায়িক সংস্কারবশতঃ উপস্থিত হয়। উভয়ই তত্ত্বতঃ একই বস্তুর বিভিন্ন বিভাব। পূর্বোক্ত উভয় স্থলের সংযোগে এইরূপ অর্থ ই স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, পরম জ্ঞান ও পরাভক্তি একই অবস্থা এবং যে পরম পুরুষকে ভক্তি করা যায় এবং যাঁহাতে প্রবেশ করা যায়, ব্রহ্মভাব তাঁহারই একটি বিভাব, সুতরাং তাঁহার অন্তর্ভুক্ত।

চতুর্দশ অধ্যায়—বিশ্লেষণ ও সার-সংক্ষেপ—গুণত্রয়-বিভাগযোগ

১-৪ সৃষ্টি-রহস্য—পরমেশ্বর ভূতগণের পিতৃস্বরূপ, প্রকৃতি মাতৃস্বরূপিণী; ৫—৯ ত্রিগুণের বন্ধন; ১০—১৩ সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ স্বভাবের লক্ষণ; ১৪—১৮ গুণত্রয়ের বিশেষ বিশেষ ফল; ১৯—২০ ত্রিগুণাতীত হইলে মোক্ষ; ২১—২৫ ত্রিগুণাতীতের লক্ষণ; ২৬—২৭ ভগবানে একান্ত ভক্তিদ্বারা ত্রিগুণাতীত হইয়া ব্রহ্মভাব লাভ হয়, কারণ তিনিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে পুরুষ-প্রকৃতি বিচারে বলা হইয়াছে যে পুরুষ অকর্তা, নিঃসঙ্গ; প্রকৃতির গুণসঙ্গবশতঃই পুরুষের সদসৎ যোনিতে জন্ম বা সংসারিত্ব। এই ত্রিগুণের লক্ষণ কি, কি ভাবে উহারা জীবকে আবদ্ধ করে, কিরূপে ত্রিগুণাতীত হইয়া মুক্ত হওয়া যায়, ত্রিগুণাতীতের লক্ষণ কি—এই সকল বিষয় বিস্তারিত বলা হয় নাই। আবার, দ্বিতীয় অধ্যায়ে কর্মযোগের উপদেশ প্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বলিয়াছেন, তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও, নির্দ্বন্দ্ব হও, নিত্যসত্ত্বস্থ হও। এ সকল কথার প্রকৃত তাৎপর্য পূর্বে বলা হয় নাই। এই হেতুই এই অধ্যায়ে এই ত্রিগুণতত্ত্ব পুনরায় বিস্তারিত ভাবে বলিতেছেন।

সৃষ্টি-রহস্য। এই চরাচর জগৎ প্রকৃতিরই পরিণাম, কিন্তু প্রকৃতির স্বয়ং সৃষ্টির সামর্থ্য নাই, পরমেশ্বরের সৃষ্টি-সঙ্কল্পই প্রকৃতিতে গর্ভাধানস্বরূপ; উহা হইতে ভূতসৃষ্টি। পরমেশ্বর ভূতগণের পিতৃস্বরূপ এবং প্রকৃতি মাতৃ-স্বরূপিণী। [কিন্তু নিরীশ্বর সাংখ্যমতে প্রকৃতি প্রসবধর্মী অর্থাৎ স্বয়ংই সৃষ্টিসমর্থা; গীতার উহা মান্য নহে]।

পুরুষের সংসার-বন্ধন। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—প্রকৃতির এই তিন গুণ। এই গুণসঙ্গবশতঃ পুরুষের সংসারবন্ধন। মিশ্র সত্ত্বগুণের মুখ্য ধর্ম সুখ ও জ্ঞান; উহার ফলে জীব বিষয়-সুখ ও বৈষয়িক জ্ঞানে আবদ্ধ হইয়া 'আমি সুখী' 'আমি জ্ঞানী' ইত্যাদিরূপ অভিমান করতঃ বিষয়ে আবদ্ধ হয়। রজোগুণের ধর্ম রাগাত্মক, উহার ফল তৃষ্ণা ও আসক্তি—উহাতে জীব বিবিধ কর্মে আসক্ত হইয়া দুঃখভোগ করে। তমোগুণের ধর্ম মোহ, অজ্ঞান—উহা প্রমাদ, আলস্য, নিদ্রাদি দ্বারা জীবকে আবদ্ধ করে। এই তিন গুণ পৃথক্ পৃথক্ থাকে না, অপর দুইটিকে অভিভূত করিয়া কোন একটি প্রবল হয়। [গুণত্রয়ের বৈষম্যই সৃষ্টি। গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই অব্যক্তাবস্থা বা প্রলয়]।

সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ স্বভাবের লক্ষণ। সত্ত্বগুণ প্রবল হইলে সর্ব ইন্দ্রিয়-দ্বারে প্রকাশ বা নির্মল জ্ঞান উৎপন্ন হয়। রজোগুণ প্রবল হইলে প্রবল বিষয়-স্পৃহা, কর্ম-প্রবৃত্তি, অস্থিরতা ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। তমোগুণ প্রবল হইলে

অনুদ্যম, কর্তব্যের বিস্মৃতি, বুদ্ধি-বিপর্যয় প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। সাত্ত্বিক কর্মের ফল সুখ, রাজসিক কর্মের ফল দুঃখ, তামসিক কর্মের ফল অজ্ঞান।

সত্ত্বগুণবৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে স্বর্গাদি দিব্যলোক প্রাপ্তি হয়, রজোগুণ বৃদ্ধি-কালে মৃত্যু হইলে মনুষ্যযোনিতে জন্ম হয় এবং তমোগুণ বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে পশ্বাদি মূঢ়-যোনিতে জন্ম হয়। সাত্ত্বিকগুণের প্রাবল্যে স্বর্গাদি লাভ হয় বটে, ত্রিগুণাতীত না হইলে মোক্ষলাভ হয় না।

ত্রিগুণাতীতের লক্ষণ—ত্রিগুণাতীত হইবার উপায়। দেহে গুণের কার্য চলিতে থাকিলেও যিনি উদাসীনের ন্যায় সাক্ষিস্বরূপে অবস্থিতি করেন সত্ত্বাদি-গুণকর্ম সুখদুঃখাদি কর্তৃক বিচালিত হন না, তিনিই ত্রিগুণাতীত; যাঁহার সর্ববিষয়ে সমত্ববুদ্ধি, যাঁহার নিকট সুখ-দুঃখ, মান-অপমান, স্তুতি-নিন্দা, শত্রু-মিত্র সকলই সমান, তিনিই ত্রিগুণাতীত।

যিনি একনিষ্ঠ ভক্তিযোগ সহকারে ভগবান্ পুরুষোত্তমের ভজনা করেন, তিনিই ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। কারণ নির্গুণ ব্রহ্মভাব, শাশ্বত ধর্ম, ঐকান্তিক সুখ, এ সকলেরই একমাত্র আশ্রয় বা প্রতিষ্ঠা তিনিই।

এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ ত্রিগুণতত্ত্বই বর্ণিত হইয়াছে, এই হেতু ইহাকে গুণত্রয়-বিভাগযোগ বলে।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে **গুণত্রয়-বিভাগযোগো** নাম চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চদশ অধ্যায়

পুরুষোত্তম-যোগ

শ্রীভগবান্ উবাচ

উর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্ ।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১

১। উর্ধ্বমূলম্ (উর্ধ্বে যাহার মূল) অধঃশাখম্ (অধোদিকে যাহার শাখা) অশ্বত্থম্ (সেই অশ্বত্থকে) [বেদবিদ্‌গণ] অব্যয়ং (অবিনাশী) প্রাহুঃ (বলেন) ; যস্য পর্ণানি (যাহার পত্রসমূহ) ছন্দাংসি (বেদসকল) তং যঃ বেদ (তাঁহাকে যিনি জানেন) সঃ বেদবিৎ (তিনি বেদবেত্তা)।

সংসার অশ্বত্থবৃক্ষ-স্বরূপ ১-২

[বেদবিদ্‌গণ] বলিয়া থাকেন যে, [সংসাররূপ] অশ্বত্থের মূল উর্ধ্বদিকে এবং শাখাসমূহ অধোগামী ; উহা অবিনাশী ; বেদসমূহ উহার পত্রস্বরূপ ; যিনি এই অশ্বত্থকে জানেন তিনিই বেদবিৎ। ১

উর্ধ্বমূলং—উর্ধ্বমুত্তমঃ ক্ষরাক্ষরাভ্যামুৎকৃষ্টঃ পুরুষোত্তমঃ মূলং যস্য তম্ (শ্রীধর) —উর্ধ্ব অর্থাৎ ক্ষর ও অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম যাহার মূল। পুরুষোত্তম বা পরমাত্মা হইতেই সংসারের সৃষ্টি, উহার মূল কারণ তিনিই।

সংসারবৃক্ষ। এস্থলে সংসারকে অশ্বত্থ বৃক্ষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। এই সংসারবৃক্ষ উর্ধ্বমূল, কেননা পুরুষোত্তম বা পরমাত্মা হইতেই এই বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে। এই হেতু ইহাকে ব্রহ্মবৃক্ষও বলা হয়। (কঠ ৬।১, মহাভাঃ অশ্ব ৩৫।৪৭)। এই বৃক্ষের শাখাস্থানীয় মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার প্রভৃতি পরিণামগুলি ক্রমশঃ অধোগামী, এই হেতু ইহা অধঃশাখ। পুরুষোত্তম বা পরব্রহ্ম হইতে কিরূপে প্রকৃতির বিস্তার হইয়াছে তাহা ২৫১ পৃষ্ঠার বংশবৃক্ষে দ্রষ্টব্য। এই সংসার-বৃক্ষ অব্যয়, কারণ ইহা অনাদি কাল হইতে প্রবৃত্ত। বেদত্রয় এই সংসার-বৃক্ষের পত্র, কারণ পত্রসমূহ যেমন বৃক্ষের আচ্ছাদনহেতু রক্ষার কারণ, সেইরূপ বেদত্রয়ও ধর্মাধর্ম প্রতিপাদন দ্বারা ছায়ার ন্যায় সর্বজীবের রক্ষক ও আশ্রয়স্বরূপ। এই সংসার-বৃক্ষকে যিনি জানেন তিনি বেদজ্ঞ, কারণ সমূল সংসার-বৃক্ষকে জানিলে জীব, জগৎ, ব্রহ্ম এই তিনেরই জ্ঞান হয়, আর জানিবার কিছু অবশিষ্ট থাকে না।

চতুর্দশ অধ্যায়ের শেষে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, যে অনন্যা ভক্তিযোগে আমার সেবা করে সে ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয় ; আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা

অধশ্চোর্ধ্বং প্রসৃতাস্তস্য শাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ ২

(১৪।২৬-২৭)। ত্রিগুণাতীত হওয়ার অর্থ, এই সংসার-প্রপঞ্চ অতিক্রম করা। ইহাকে সংসার-ক্ষয় বলে। সুতরাং এই কথাটি বুঝাইবার জন্যই সংসার কি, উহার মূল কারণ কোথায়, এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ তাহাই বর্ণনা করা হইয়াছে এবং শেষে সর্বকারণের কারণ যে তিনিই এই কথা বলিয়া পুরুষোত্তমরূপে শ্রীভগবান্ আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন। এই পুরুষোত্তম-তত্ত্বই ভাগবত ধর্মের ও গীতার কেন্দ্র-স্বরূপ।

২। তস্য (তাহার) গুণপ্রবৃদ্ধাঃ (গুণসমূহদ্বারা বিশেষরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত) বিষয়-প্রবালাঃ (বিষয়রূপ পল্লব-বিশিষ্ট) শাখাঃ (শাখাসমূহ) অধঃ ঊর্ধ্বং চ (অধোভাগে ও ঊর্ধ্বভাগে) প্রসৃতাঃ (বিস্তৃত); মনুষ্যলোকে কর্মানুবন্ধীনি (ধর্মাধর্মরূপ কর্মের কারণ) মূলানি (মূলসমূহ) অধঃ চ (নিম্নদিকেও) অনুসন্ততানি (ক্রমে বিস্তৃত হইয়াছে)।

কর্মানুবন্ধীনি—কর্ম ধর্মাধর্মলক্ষণং অনুবন্ধঃ পশ্চাদ্ভাবী যেষাং তানি (শঙ্কর)—ধর্মাধর্মলক্ষণ কর্মই যাহার উত্তরকালে ভাবী ফল, সেই বাসনারূপ মূলকে কর্মানুবন্ধী বলা হইয়াছে। **গুণপ্রবৃদ্ধাঃ**—গুণৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ জলসেচনৈরিব যথাযথং প্রবৃদ্ধাঃ বৃদ্ধিং প্রাপ্তাঃ (শ্রীধর)—সত্ত্বাদিগুণরূপ জলসেচনের দ্বারা উপযুক্তরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। **বিষয়প্রবালাঃ**—বিষয়াঃ রূপাদয়ঃ প্রবালাঃ বালপল্লব-স্থানীয়াঃ যাসাং তাঃ (শ্রীধর)—রূপরসাদি বিষয় যাহার তরুণপল্লব-স্থানীয়, তদ্রূপ।

সত্ত্বাদিগুণের দ্বারা বিশেষরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, বিষয়রূপ তরুণপল্লব-বিশিষ্ট উহার শাখাসকল অধোভাগে ও ঊর্ধ্বভাগে বিস্তৃত; উহার (বাসনারূপ) মূলসমূহ মনুষ্যলোকে অধোভাগে বিস্তৃত রহিয়াছে। ঐ মূলসমূহ ধর্মাধর্মরূপ কর্মের কারণ বা প্রসূতি। ২

সংসারবৃক্ষের তাৎপর্য। পূর্ব শ্লোকে সংসার-বৃক্ষের বৈদিক বর্ণনার উল্লেখ করা হইয়াছে। এই শ্লোকে সাংখ্য-দৃষ্টিতে উহারই বিস্তারিত বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সংসার প্রকৃতিরই বিস্তার। সুতরাং ঐ বৃক্ষের শাখাসকল গুণ-প্রবৃদ্ধ, অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিন গুণের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়সমূহ উহার প্রবাল বা তরুণপল্লব-স্থানীয়। এই হেতু উহা বিষয়-প্রবাল। উহার শাখাসমূহ ঊর্ধ্ব ও অধোদিকে বিস্তৃত অর্থাৎ কর্মানুসারে জীবসকল অধোদিকে পশ্বাদি যোনিতে এবং ঊর্ধ্ব দিকে দেবাদি যোনিতে প্রাদুর্ভূত হইয়া

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥ ৩
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৪

থাকে। উহার বাসনারূপ মূলসকল কর্মানুবন্ধী অর্থাৎ ধর্মাধর্মরূপ কর্মের প্রসূতি। এই মূলসকল অধোদিকে মনুষ্য-লোকে বিস্তৃত রহিয়াছে, কারণ মনুষ্যগণেরই কর্মাধিকার ও কর্মফল বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ। পূর্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে, পরমেশ্বরই উহার প্রধান মূল। এই শ্লোকোক্ত মূলগুলি অবান্তর মূল (ঝুরি)। বাসনাদ্বারাই লোক ধর্মাধর্মে প্রবৃত্ত হয়, সুতরাং বাসনাজালই এই অবান্তর মূল।

৩-৪। ইহ (এই সংসারে) অস্য (এই বৃক্ষের) রূপং ন উপলভ্যতে (রূপ উপলব্ধ হয় না); তথা (সেইরূপ) ন অন্তঃ, ন চ আদিঃ, ন চ সংপ্রতিষ্ঠা (স্থিতি) [উপলব্ধ হয় না]; এবং (এই) সুবিরূঢ়মূলম্ অশ্বত্থং (সুদৃঢ়মূল অশ্বত্থকে) দৃঢ়েন অসঙ্গশস্ত্রেণ (তীব্র বৈরাগ্যরূপ শস্ত্রদ্বারা) ছিত্ত্বা (ছেদন করিয়া) ততঃ (তদনন্তর) যস্মিন্ গতাঃ (যে স্থানে গত) [ব্যক্তি] ভূয়ঃ ন নিবর্তন্তি (পুনরায় প্রত্যাবর্তন করে না), যতঃ (যাহা হইতে) এষা (এই) পুরাণী (চিরন্তনী, সনাতনী) প্রবৃত্তিঃ (সংসার-গতি) প্রসৃতা (বিস্তৃত হইয়াছে), তম্ এব চ আদ্যং পুরুষং (সেই আদি পুরুষকে) প্রপদ্যে (আশ্রয়রূপে গ্রহণ করি) [এইরূপ সংকল্প করিয়া] তৎ পদং (সেই পদ) পরিমার্গিতব্যং (অন্বেষণ করিতে হইবে)।

বৈরাগ্য-অস্ত্রে সংসারবৃক্ষ ছেদনে অব্যয়পদ প্রাপ্তি ৩-৬

এ সংসারে স্থিত জীবগণ সংসার-বৃক্ষের পূর্বোক্ত ঊর্ধ্বমূলাদি রূপ উপলব্ধি করিতে পারে না। সেইরূপ উহার আদি, অন্ত এবং স্থিতিও উপলব্ধি করিতে পারে না। এই সুদৃঢ়মূল অশ্বত্থবৃক্ষকে তীব্র বৈরাগ্যরূপ শস্ত্রদ্বারা ছেদন করিয়া তৎপর যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না, যাঁহা হইতে এই সংসার-প্রবৃত্তির বিস্তার হইয়াছে, 'আমি সেই আদি পুরুষের শরণ লইতেছি' এই বলিয়া তাঁহার অন্বেষণ করিতে হইবে। ৩-৪

তাৎপর্য। মায়াবদ্ধ জীব এই সংসারের প্রকৃত স্বরূপ যে কি তাহা বুঝিতে পারে না; ইহার আদি কোথায়, ইহার অন্ত কোথায়, উহার স্থিতি কোথায় অর্থাৎ কি আধার অবলম্বন করিয়া উহা অবস্থিত আছে, তাহাও সে কিছুই

নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫
ন তদ্‌ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬

জানে না। বাসনা ত্যাগ না হইলে মায়া দূর হয় না, তত্ত্বজ্ঞান হয় না। সুতরাং বৈরাগ্যরূপ অস্ত্রদ্বারা মায়াবন্ধন ছেদন করা কর্তব্য। তৎপর যাঁহা হইতে এই সংসার-প্রবৃত্তি বিস্তৃত হইয়াছে, সেই ভক্তবৎসল পরমেশ্বরকেই আশ্রয় করিয়া ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে তাঁহার অন্বেষণ করিতে হইবে। কারণ তাঁহার কৃপা ব্যতীত ত্রিগুণ অতিক্রম করা যায় না, সংসার-বন্ধন ঘুচে না। (৭।১৪, ১৪।২৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

৫। নির্মানমোহাঃ (মান ও মোহবর্জিত) জিতসঙ্গদোষাঃ (আসক্তিরূপ দোষজয়ী) অধ্যাত্মনিত্যাঃ (আত্মজ্ঞানে নিষ্ঠাবান্) বিনিবৃত্তকামাঃ (কামনা-বর্জিত) সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ দ্বন্দ্বৈঃ বিমুক্তাঃ (সুখদুঃখরূপ দ্বন্দ্ব হইতে নির্মুক্ত) অমূঢ়াঃ (অবিদ্যাবিহীন, বিবেকী সাধুগণ) তৎ অব্যয়ং পদং গচ্ছন্তি (সেই অব্যয়পদ প্রাপ্ত হন)।

নির্মান-মোহাঃ—নির্গতৌ মানমোহৌ যেভ্যঃ তে। **জিতসঙ্গদোষাঃ**—জিতঃ পুত্রাদি সঙ্গরূপো দোষো যৈঃ তে (শ্রীধর)।

যাঁহাদের অভিমান ও মোহ নাই, যাঁহারা সংসার-আসক্তি জয় করিয়াছেন, যাঁহারা আত্মতত্ত্বে নিষ্ঠাবান্, যাঁহাদের কামনা নিবৃত্ত হইয়াছে, যাঁহারা সুখদুঃখ-সংজ্ঞক দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত, তাদৃশ বিবেকী পুরুষগণ সেই অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন। ৫

৬। যৎ গত্বা (যাহা প্রাপ্ত হইয়া) [সাধক] ন নিবর্তন্তে (প্রত্যাবর্তন করেন না) তৎ (তাহা) সূর্যঃ ন ভাসয়তে (সূর্য প্রকাশ করিতে পারে না), ন শশাঙ্কঃ (চন্দ্রও না), ন পাবকঃ (অগ্নিও না); তৎ (তাহা) মম পরমং ধাম (আমার পরম স্বরূপ)।

যে পদ প্রাপ্ত হইলে সাধক আর সংসারে প্রত্যাবর্তন করেন না, যে পদ সূর্য, চন্দ্র বা অগ্নি প্রকাশ করিতে পারে না, তাহাই আমার পরম স্বরূপ। ৬

তিনি স্বপ্রকাশ। তাঁহার প্রকাশেই জগৎ প্রকাশিত। জড় পদার্থ চন্দ্র-সূর্যাদি তাঁহাকে প্রকাশ করিবে কিরূপে? এই শ্লোকটি প্রায় অক্ষরশঃই শ্বেতাশ্বতর ও কঠোপনিষদে আছে।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭

৭। মম এব সনাতনঃ অংশঃ (আমারই সনাতন অংশ) জীবভূতঃ (স্বরূপ) [হইয়া] প্রকৃতিস্থানি (প্রকৃতিতে অবস্থিত) মনঃষষ্ঠানি ইন্দ্রিয়াণি (মনের সহিত ছয় অর্থাৎ মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে) জীবলোকে কর্ষতি (সংসারে আকর্ষণ করিয়া থাকে)।

মনঃষষ্ঠানি—মনঃ ষষ্ঠং যেষাং তানি—মন যাহাদিগের ষষ্ঠ সেই ইন্দ্রিয়সকল অর্থাৎ মনের সহিত পঞ্চ ইন্দ্রিয়।

জীবের স্বরূপ—জন্মান্তর-রহস্য ৭-১১

আমারই সনাতন অংশ জীব হইয়া প্রকৃতিতে অবস্থিত মন ও পাঁচ ইন্দ্রিয়কে সংসারে অর্থাৎ কর্মভূমিতে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। ৭

পূর্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে জীবের প্রত্যাবর্তন হয় না। মোক্ষ বা ঈশ্বরপ্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত জীবের পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু জরাদুঃখাদি ভোগ করিতে হয়। এই কথা স্পষ্টীকৃত করার উদ্দেশ্যেই জীবের স্বরূপ কি, কিরূপে তাহার উৎক্রমণ হয়, ইত্যাদি বিষয় এই কয়েকটি শ্লোকে বলা হইতেছে।

জীব ও ব্রহ্মে ভেদ ও অভেদ। জীব ও ব্রহ্ম এক, না পৃথক্? এ সম্বন্ধে নানারূপ মতভেদ আছে এবং এই সকল মতভেদ লইয়াই দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি নানাবিধ মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। এ সম্বন্ধে গীতার মত কি তাহাই আমাদের দ্রষ্টব্য। গীতার নানাস্থলেই জীবব্রহ্মৈক্যবাদই স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মার অবিনাশিতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—জীব অজ, নিত্য, সনাতন, অবিনাশী, অবিকারী, সর্বব্যাপী, অচিন্ত্য, অমেয় ইত্যাদি (২।১৭-২৫)। অবিকারিত্ব, সর্বব্যাপিত্ব, উৎপত্তি-বিনাশ-রাহিত্য ইত্যাদি ব্রহ্মেরই লক্ষণ। অন্যত্র শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—আমিই সর্বভূতাশয়স্থিত আত্মা (১০।২০), আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিও (১৩।২), আসুরী প্রকৃতির লোক শরীরস্থ আমাকে কষ্ট দেয় (১৭।৬) ইত্যাদি। এই সকল স্থলে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, ভগবান্ই দেহে জীবরূপে অবস্থিত আছেন। 'তত্ত্বমসি', 'সোঽহং', 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'—চারি বেদের এই চারিটি মহাবাক্যও এই সত্যই প্রচার করিতেছে যে, জীবই ব্রহ্ম। কিন্তু এস্থলে (১৫।৭ শ্লোকে) বলা হইল—'জীব আমার সনাতন অংশ'। এ অংশ কিরূপ? অদ্বৈতবাদী বলেন—ব্রহ্ম অখণ্ড, অপরিচ্ছিন্ন, নিরবয়ব অদ্বয় বস্তু, উহার খণ্ডিত অংশ কল্পনা করা

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮

যায় না। এ স্থলে 'অংশ' বলিতে এইরূপ বুঝিতে হইবে—যেমন ঘটাকাশ, মঠাকাশ ইত্যাদি মহাকাশের অংশ। ঘটের বা মঠের মধ্যে যে আকাশ আছে, তাহাকে মহাকাশের অংশ বলা যায়, ঘট বা মঠ ভাঙ্গিলে এক অপরিচ্ছিন্ন আকাশই থাকে। জীবেরও দেহোপাধিবশতঃ ব্রহ্ম হইতে পার্থক্য, দেহোপাধি-নাশে এক অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মসত্তাই অবশিষ্ট থাকে ('ব্রহ্মাদ্বয়ং শিষ্যতে')।

অপর পক্ষে কেহ কেহ বলেন—জীব ও ঈশ্বর উভয়ই চিদ্রূপ—চেতন। এই নিমিত্ত অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের চেতনাংশের সাদৃশ্যেই উভয়ের একত্ব। কিন্তু তাহা হইলেও জীব ব্রহ্মের রশ্মি-পরমাণুস্থানীয়; যেমন তেজোময় সূর্য হইতে অনন্ত রশ্মি বহির্গত হয়, অথবা অগ্নিপিণ্ড হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গসমূহ নির্গত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে জীবসমূহের উৎপত্তি ('যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ' ইত্যাদি মুণ্ডক ২।১।১)। অগ্নি ভিন্ন স্ফুলিঙ্গের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই, ব্রহ্ম ভিন্নও জীবের পৃথক্ সত্তা নাই। স্ফুলিঙ্গ অগ্নিই বটে, কিন্তু ঠিক অগ্নিও নয়, অগ্নি-কণা। জীব ও ব্রহ্মেও সেইরূপ অভেদ ও ভেদ আছে, জীব ব্রহ্মকণা। ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের **'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ'**।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য কতকটা এইরূপ ভাবেই জীবব্রহ্মের ভেদাভেদের রহস্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"চৈতন্যঞ্চাবশিষ্টং জীবেশ্বরয়োর্যথাগ্নি-বিস্ফুলিঙ্গয়োরৌষ্ণ্যম্।" "অতো ভেদাভেদাগমাভ্যামংশত্বাবগমঃ"—জীব-ব্রহ্মের চৈতন্যাংশে কোন বৈশিষ্ট্য না থাকিলেও, যেমন অগ্নি ও অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের উষ্ণতাংশে ভেদ প্রতীত হয়, এইরূপ ভেদাভেদ বোধ হওয়ায় অংশের অবগতি হইয়া থাকে।

বস্তুতঃ অংশ ও অংশীতে স্বরূপতঃ কোন ভেদ হইতে পারে না; যতক্ষণ আমিত্বের উপাধি ততক্ষণই ভেদ। মুক্তিই অভেদ। কিন্তু ভক্ত মুক্তি চান না, 'আমি'টা ত্যাগ করিতে চান না। তিনি বলেন—'চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি',—তাই তিনি অভেদও মান্য করেন না। তাই ভক্তিশাস্ত্রে বলেন—জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস।

৮। ঈশ্বরঃ (দেহাদির অধিপতি জীবাত্মা) যৎ (যদা, যখন) শরীরম্ উৎক্রামতি (শরীর ত্যাগ করেন) যৎ চ অপি (এবং যখন) [শরীরম্] অবাপ্নোতি (অন্য শরীর প্রাপ্ত হন) [তদা], বায়ুঃ আশয়াৎ (পুষ্পাদি আধার হইতে) গন্ধান্ ইব (গন্ধকণাসমূহ গ্রহণের ন্যায়), এতানি (এই ছয় ইন্দ্রিয়কে) গৃহীত্বা (গ্রহণ করিয়া) সংযাতি (গমন করেন)।

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯

যেমন বায়ু পুষ্পাদি হইতে গন্ধবিশিষ্ট সূক্ষ্ম কণাসমূহ লইয়া যায় তদ্রূপ যখন জীব এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেহে প্রবেশ করেন, তখন এই সকলকে (এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মনকে) সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। ৮

৯। অয়ং (এই জীব) শ্রোত্রং (কর্ণ), চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ (ত্বক্), রসনং (জিহ্বা), ঘ্রাণম্ এব চ (নাসিকা) মনঃ চ (ও মনকে) অধিষ্ঠায় (আশ্রয়পূর্বক) বিষয়ান্ উপসেবতে (বিষয়সকল ভোগ করেন)।

জীবাত্মা কর্ণ, চক্ষু, ত্বক্, রসনা, নাসিকা এবং মনকে আশ্রয় করিয়া শব্দাদি বিষয়সকল ভোগ করিয়া থাকেন। ৯

জন্মান্তর-রহস্য—জীবের উৎক্রান্তি—সূক্ষ্ম শরীর

প্রঃ। আত্মা অকর্তা, উদাসীন, নিত্যমুক্ত। প্রকৃতি বা দেহ-বন্ধনবশতঃই তিনি বদ্ধ হন। মৃত্যুর পর যখন সেই দেহ-বন্ধন চলিয়া যায়, তখনই ত তিনি মুক্ত হইয়া স্ব-স্বরূপ লাভ করিতে পারেন। তখন আর প্রকৃতি থাকে কোথায়? দ্বিতীয়তঃ, জীব একদেহে পাপপুণ্যাদি সঞ্চয় করে, জন্মান্তরে অন্য দেহে তাহার ফল ভোগ করে, এই বা কিরূপ ব্যবস্থা?

উঃ। মৃত্যুর পর জীবের দেহবন্ধনও ঘুচে না, অন্য দেহেও পাপপুণ্যাদির ফলভোগ হয় না, এই দেহই থাকে। দেহ দুইটি—(১) স্থূল শরীর, আর (২) সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গশরীর। চর্মচক্ষুতে স্থূল শরীরই দেখা যায়, সূক্ষ্ম শরীর দেখিতে জ্ঞানচক্ষু চাই। তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, সূক্ষ্ম শরীর লইয়া জীব কিরূপে যাতায়াত করে এবং পাপপুণ্যাদির ফলভোগ করে তাহা অজ্ঞ লোকে দেখিতে পায় না, উহা জ্ঞানিগণ জ্ঞাননেত্রে দর্শন করিয়া থাকেন (১০ম শ্লোক)।

এই দৃশ্য স্থূল শরীর ও অদৃশ্য সূক্ষ্ম শরীর কোন্‌টি কিসের দ্বারা গঠিত?—পূর্বে বলা হইয়াছে, সাংখ্যোক্ত ২৪ তত্ত্ব (প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়াদি) দ্বারা এই দেহ গঠিত (২৫১ পৃষ্ঠা ও ১৩।৫-৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। তন্মধ্যে ক্ষিতি, অপ্ প্রভৃতি পাঁচটি স্থূল পদার্থ, বাকী মহত্তত্ত্ব হইতে পঞ্চতন্মাত্র পর্যন্ত ১৮টি সূক্ষ্ম পদার্থ এবং প্রকৃতি, সকলের নির্বিশেষ কারণ-স্বরূপ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পদার্থ

ক্ষিত্যাদি পঞ্চ স্থূলভূতদ্বারা নির্মিত যে শরীর তাহাই স্থূলশরীর; মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, দশেন্দ্রিয়, মন ও পঞ্চতন্মাত্র, এই ১৮টি দ্বারা গঠিত দেহ সূক্ষ্ম শরীর, আর সকলের মূল কারণ প্রকৃতিকেই কারণ-শরীর কহে। মৃত্যুকালে পঞ্চভূতাত্মক স্থূল শরীরই বিনষ্ট হয়, সূক্ষ্ম শরীর লইয়া জীব উৎক্রমণ করে এবং পূর্ব কর্মানুযায়ী নূতন স্থূল-দেহ ধারণ করিয়া ঐ সূক্ষ্ম শরীর লইয়াই পাপপুণ্যাদি ফলভোগ করে এবং এই কারণেই উহার মন, বুদ্ধি, ধর্মাধর্মাদি সংস্কার অর্থাৎ স্বভাব পূর্বজন্মানুযায়ীই হয়। তবে জন্মগ্রহণ-কালে পিতামাতার দেহ হইতে লিঙ্গ-শরীর যে দ্রব্য আকর্ষণ করিয়া লয় তাহাতে তাহার দেহ-স্বভাবের ন্যূনাধিক ভাবান্তর ঘটিয়া থাকে। সুতরাং কেবল স্থূল দেহের সংসর্গ লোপ হইলেই জীবের মুক্তি হয় না, সূক্ষ্ম শরীরও যখন লোপ পায়, তখনই জীবের সত্যস্বরূপ প্রতিভাত হয়।

এস্থলে পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মন এই ৬টিকেই সূক্ষ্ম শরীর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (৯ম শ্লোক); 'ঘ্রাণমেব চ' এবং 'মনশ্চ' এই দুই পদের চ-কার দ্বারা বুঝাইতেছে যে, উহার মধ্যেই পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও অহঙ্কারেরও সমাবেশ করিতে হইবে। দ্রষ্টব্য এই, 'ইন্দ্রিয়' বলিতে চক্ষু-কর্ণাদি স্থূল ইন্দ্রিয়যন্ত্র বুঝায় না, উহা স্থূল দেহের অন্তর্গত, প্রকৃত ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়-শক্তি সূক্ষ্ম তত্ত্ব।

ইহাই সাংখ্যোক্ত সূক্ষ্ম শরীর। বেদান্ত মতে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ এবং বুদ্ধি ও মন এই সপ্তদশ অবয়বে সূক্ষ্ম শরীর গঠিত। সাংখ্যমতে পঞ্চ প্রাণ একাদশ ইন্দ্রিয়েরই অন্তর্ভূত। আত্মার এই বিভিন্ন আবরণ বা শরীরকে কোষও বলা হয়। **কোষ** পাঁচটি—(১) অন্নময় কোষ, ইহাই পঞ্চভূতাত্মক স্থূল শরীর; (২) মনোময় কোষ (মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়); (৩) প্রাণময় কোষ (প্রাণ ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়); (৪) বিজ্ঞানময় কোষ (বুদ্ধি ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়)—এই তিনটি মিলিয়া সূক্ষ্ম শরীর; (৫) আনন্দময় কোষ, (অবিদ্যা বা প্রকৃতি), ইহাকেই কারণ-শরীর বলে।

মহাভারতে উল্লেখ আছে, যম সত্যবানের শরীর হইতে এক অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত পুরুষকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিলেন ('অঙ্গুষ্ঠমাত্র-পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমো বলাৎ')। ইহাই সূক্ষ্মশরীর। যোগিগণ সূক্ষ্মদেহ লইয়া স্থূলদেহ হইতে বহির্গত হইয়া অন্য শরীরে প্রবেশ করিতে পারেন (মহাভারতে জনক-সুলভা সংবাদ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)।

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০
যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১
যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তৎ তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥ ১২

১০। গুণান্বিতং (সত্ত্বাদি গুণসংযুক্ত) স্থিতং বা অপি ভুঞ্জানং (দেহে স্থিত ও বিষয়ভোগনিরত) বা উৎক্রামন্তং (অথবা দেহান্তরে গমনশীল) [জীবকে] বিমূঢ়াঃ (মূঢ় ব্যক্তিগণ) ন অনুপশ্যন্তি (দেখিতে পায় না), জ্ঞানচক্ষুষঃ (জ্ঞাননেত্রবিশিষ্ট বিবেকিগণ) পশ্যন্তি (দেখিতে পান)।

জীব কিরূপে সত্ত্বাদি গুণসংযুক্ত হইয়া দেহে অবস্থিত থাকিয়া বিষয়সমূহ ভোগ করেন, অথবা কিরূপে দেহ হইতে উৎক্রান্ত হন, তাহা অজ্ঞ ব্যক্তিগণ দেখিতে পান না, কিন্তু জ্ঞানিগণ জ্ঞাননেত্রে দর্শন করিয়া থাকেন। ১০

১১। যতন্তঃ (যত্নশীল) যোগিনঃ (যোগিগণ) আত্মনি অবস্থিতং (আপনার নিজ দেহে অবস্থিত) এবং (ইহাকে) পশ্যন্তি (দেখিয়া থাকেন), যতন্তঃ অপি (যত্ন করিলেও) অকৃতাত্মনঃ (অবিশুদ্ধচিত্ত, অজিতেন্দ্রিয়), অচেতসঃ (অবিবেকিগণ) এনং ন পশ্যন্তি (ইহাকে দেখিতে পায় না)।

সাধনে যত্নশীল যোগিগণ আপনাতে অবস্থিত এই আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন, কিন্তু যাহারা অজিতেন্দ্রিয় ও অবিবেকী তাহারা যত্ন করিলেও ইঁহাকে দেখিতে পায় না। ১১

দেহস্থিত জীব কিরূপে ত্রিগুণের দ্বারা বদ্ধ হইয়া বিষয় ভোগ করেন, অথবা কিরূপে এক দেহ হইতে বহির্গত হইয়া দেহান্তরে প্রবেশ করেন, এই জীব কে, তাহার প্রকৃত স্বরূপ কি—এই সকল তত্ত্ব দুর্জ্ঞেয়। কেবল শাস্ত্রাভ্যাসে আত্মদর্শন হয় না। যাঁহারা ইন্দ্রিয় জয় করিয়া যোগযুক্ত চিত্তে সাধনা করেন, তাঁহারাই আত্মাকে দর্শন করিতে পারেন। অবিবেকিগণ শাস্ত্রাদি প্রমাণ অবলম্বনে চেষ্টা করিলেও আত্মতত্ত্ব বুঝিতে পারে না। ইহাই পূর্বোক্ত দুই শ্লোকের তাৎপর্য।

১২। আদিত্যগতং (সূর্যস্থিত) যৎ তেজঃ (যে তেজ) অখিলং জগৎ ভাসয়তে (সমস্ত জগৎকে আলোকিত করে), চন্দ্রমসি চ যৎ যৎ চ অগ্নৌ (যাহা চন্দ্রে ও অগ্নিতে), তৎ তেজঃ মামকং বিদ্ধি (সেই তেজ আমারই জানিও)।

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ॥ ১৩
অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্॥ ১৪

ঈশ্বরের বিশ্বানুগতা—তিনিই সর্বকারণের কারণ ১২-১৫

যে তেজ সূর্যে থাকিয়া সমগ্র জগৎ উদ্ভাসিত করে এবং যে তেজ চন্দ্রমা ও অগ্নিতে আছে, তাহা আমারই তেজ জানিবে। ১২

এই কয়েকটি শ্লোকে পরমেশ্বরের বিশ্বানুগতা পুনরায় বর্ণনা করা হইয়াছে। (১০।৩৯।৪১।৪২ দ্রঃ)।

১৩। অহং চ (আমি) গাম্ (পৃথিবীতে) আবিশ্য (প্রবিষ্ট হইয়া) ওজসা (বলের দ্বারা) ভূতানি ধারয়ামি (ভূতগণকে ধারণ করিয়া আছি), রসাত্মকঃ (রসময়) সোমঃ চ ভূত্বা (চন্দ্ররূপ হইয়া) সর্বাঃ ওষধীঃ (ওষধিসকলকে) পুষ্ণামি (পুষ্ট করিতেছি)।

আমি পৃথিবীতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া স্বকীয় বলের দ্বারা ভূতগণকে ধারণ করিয়া আছি। আমি অমৃতরসযুক্ত চন্দ্ররূপ ধারণ করিয়া ব্রীহি যবাদি ওষধিগণকে পরিপুষ্ট করিয়া থাকি। ১৩

শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণনা আছে যে, চন্দ্র জলময় ও সর্বরসের আধার এবং চন্দ্রের এই রসাত্মক গুণেই বনস্পতিগণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

১৪। অহং বৈশ্বানরঃ (জঠরাগ্নি) ভূত্বা (হইয়া) প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ (প্রাণিগণের দেহে অবস্থান করিয়া) প্রাণাপানসমাযুক্তঃ (প্রাণ ও অপান বায়ু সহ মিলিত হইয়া) চতুর্বিধম্ অন্নং (চারি প্রকার খাদ্য) পচামি (পরিপাক করি)।

চতুর্বিধম্ অন্নম্—চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় এই চতুর্বিধ খাদ্য।

আমি বৈশ্বানর (জঠরাগ্নি) রূপে প্রাণিগণের দেহে অবস্থান করি এবং প্রাণ ও অপান বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া চর্ব্য চূষ্যাদি চতুর্বিধ খাদ্য পরিপাক করি। ১৪

দেহ যন্ত্রে একখণ্ড রুটি ফেলিয়া দিলে উহা রক্তে পরিণত হয়। দেহাভ্যন্তরীণ কি কি প্রক্রিয়াদ্বারা এই পরিপাক-ক্রিয়া সাধিত হয়, তাহা জড়বিজ্ঞান বলিতে পারে। কিন্তু কোন্ শক্তিবলে এই কার্য সাধিত হয়, তাহা জড়বিজ্ঞান জানে না। উহা ঐশ্বরিক শক্তি।

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানম্ অপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্॥ ১৫
দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥ ১৬
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ ১৭

১৫। অহং সর্বস্য হৃদি (সকল হৃদয়ে) সন্নিবিষ্টঃ, মত্তঃ (আমা হইতে) স্মৃতিঃ জ্ঞানং, অপোহনঞ্চ (এবং উহাদের অভাব); অহম্ এব (আমিই) সর্বৈঃ বেদৈঃ বেদ্যঃ (সকল বেদের জ্ঞাতব্য), বেদান্তকৃৎ (বেদান্তার্থ-প্রকাশক), বেদবিৎ চ (এবং বেদার্থবেত্তা) অহম্ এব (আমিই)।

আমি অন্তর্যামিরূপে সকল প্রাণীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছি, আমা হইতেই প্রাণিগণের স্মৃতি ও জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং আমা হইতেই স্মৃতি ও জ্ঞানের বিলোপও সাধিত হয়; আমিই বেদসমূহের একমাত্র জ্ঞাতব্য, আমিই আচার্যরূপে বেদান্তের অর্থ-প্রকাশক এবং আমিই বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বেদার্থ পরিজ্ঞাত হই। ১৫

আত্মচৈতন্য প্রভাবে জীবের স্মৃতি ও জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে এবং যে মোহবশতঃ স্মৃতি ও জ্ঞানের লোপ হয়, সেই মোহও তাঁহা হইতেই জাত। সমস্ত বেদেই তাঁহাকে জানিতে উপদেশ করেন। বেদব্যাসাদিরূপে তিনিই বেদার্থ-প্রকাশক এবং বেদবেত্তা বা ব্রহ্মবেত্তাও তিনিই, ব্রহ্ম না হইলে ব্রহ্মকে জানা যায় না।

১৬। ক্ষরঃ চ অক্ষরঃ চ (ক্ষর ও অক্ষর) দ্বৌ এব ইমৌ পুরুষৌ (এই দুই পুরুষ) লোকে (জগতে) [প্রসিদ্ধ আছে]; সর্বাণি ভূতানি (সমস্ত ভূত) ক্ষরঃ (নশ্বর পুরুষ), কূটস্থঃ(অবিকারী আত্মা), অক্ষরঃ (অবিনাশী পুরুষ) উচ্যতে (কথিত হন)।

ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তম তত্ত্ব ১৬-২০

ক্ষর ও অক্ষর দুই পুরুষ ইহলোকে প্রসিদ্ধ আছে। তন্মধ্যে সর্বভূত ক্ষর পুরুষ এবং কূটস্থ অক্ষর পুরুষ বলিয়া কথিত হন। ১৬

১৭। অন্যঃ তু (ইহা হইতে ভিন্ন), উত্তমঃ পুরুষঃ পরমাত্মা ইতি উদাহৃতঃ (পরমাত্মা বলিয়া কথিত হন), ঈশ্বরঃ অব্যয়ঃ (ঈশ্বর নির্বিকার) যঃ (যিনি) লোকত্রয়ম্ (লোকত্রয়ে) আবিশ্য (প্রবিষ্ট হইয়া) বিভর্তি (পালন করিতেছে)।

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮

অন্য এক উত্তম পুরুষ পরমাত্মা বলিয়া কথিত হন। তিনি লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সকলকে পালন করিতেছেন, তিনি অব্যয়, তিনি ঈশ্বর। ১৭

১৮। যস্মাৎ (যেহেতু) অহং (আমি) ক্ষরমতীতঃ (ক্ষরের অতীত) অক্ষরাৎ অপি উত্তমঃ চ (অক্ষর হইতেও উত্তম), অতঃ (সেই হেতু) লোকে (লোকব্যবহারে, পুরাণে) বেদে চ (এবং বেদে) পুরুষোত্তমঃ [ইতি] প্রথিতঃ অস্মি (পুরুষোত্তম বলিয়া খ্যাত আছি)।

যেহেতু আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হইতেও উত্তম, সেই হেতু আমি লোক-ব্যবহারে এবং বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া খ্যাত। ১৮

পুরুষোত্তম-তত্ত্ব

এস্থলে তিনটি পুরুষের কথা বলা হইতেছে—ক্ষর পুরুষ, অক্ষর পুরুষ ও উত্তম পুরুষ বা পুরুষোত্তম। ইহার কোন্‌টিতে কোন্ তত্ত্ব প্রকাশ করে? শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—ক্ষর পুরুষ সর্বভূত, অক্ষর কূটস্থ পুরুষ এবং আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হইতেও উত্তম, এই হেতু আমি পুরুষোত্তম।

সাধারণতঃ কূটস্থ অক্ষর বলিতে নির্গুণ নির্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বই বুঝায়। গীতায়ও অনেক স্থলেই এই অর্থেই কূটস্থ ও অক্ষর শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। (গীতা ৮।৩।২০, ১১।৩৭, ১২।৩)। এস্থলে কিন্তু বলা হইতেছে, আমি অক্ষর হইতেও উত্তম। উপনিষদে এবং ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মই অদ্বয় পরতত্ত্ব। ব্রহ্মস্বরূপ কোথাও নির্গুণ, কোথাও সগুণ, কোথাও সগুণ-নির্গুণ উভয়রূপেই বর্ণনা করা হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি কোন কোন উপনিষদে মূল তত্ত্বের বর্ণনায় দেব, ঈশ্বর, পুরুষ প্রভৃতি শব্দও ব্যবহৃত হইয়াছে। ভাগবত-শাস্ত্রে উপনিষদের এই দেব, ঈশ্বর বা সগুণ-ব্রহ্মই পুরুষোত্তম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন এবং নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব অপেক্ষা ইঁহাকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হইয়াছে; কেননা ভক্তিমার্গে অনির্দেশ্য অচিন্ত্য নির্গুণ তত্ত্বের বিশেষ উপযোগিতা নাই। মহাভারতের নারায়ণীয় পর্বাধ্যায়ে (যাহা ভাগবত শাস্ত্রের বা সাত্বত ধর্মের মূল) এই পুরুষোত্তম শব্দ পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে এবং তিনি নির্গুণ হইয়াও গুণধারক, তিনিই অব্যয়, পরমাত্মা, পরমেশ্বর, ইহা স্পষ্টই বলা হইয়াছে। পুরাণাদিতে ভগবান্ পুরুষোত্তমই পরতত্ত্ব ও পরব্রহ্ম বলিয়া কীর্তিত এবং

অনেক স্থানেই তাঁহার নির্বিশেষ নির্গুণ স্বরূপ অপেক্ষা সবিশেষ সগুণ বিভাবেরই বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হইয়াছে। গীতাও ভাগবত ধর্মেরই গ্রন্থ, উহাতেও পুরুষোত্তম বা ভগবত্তত্বই পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠ স্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন এবং উহাতেই ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা, এরূপ বর্ণনাও আছে (১৪।২৭)।

মোট কথা, 'ব্রহ্মই সমস্ত' (সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম) এই বৈদান্তিক মূলতত্ত্বই গীতার প্রতিপাদ্য। পূর্বোক্ত তিন পুরুষ সেই মূল তত্ত্বেরই বিশ্লেষণ। ঐ তিন পুরুষ এক তত্ত্বেরই তিন বিভাব। এই পরিণামী চেতনাচেতনাত্মক জগৎ (সর্বভূতানি) তাঁহা হইতেই জল-বুদ্বুদের ন্যায় উত্থিত হইয়া আবার তাঁহাতেই বিলীন হয়। তাঁহার অপরা ও পরা প্রকৃতি সংযোগে উহা সৃষ্ট এবং তাঁহার জীবভূতা পরা প্রকৃতিই উহা ধারণ করিয়া আছে (৭।৪-৬)। ইহাই **ক্ষরভাব** এবং তাঁহার অপরিণামী, নির্বিশেষ,কূটস্থ, নির্গুণ স্বরূপই অক্ষরপুরুষ বা **অক্ষর ভাব**, আর **পুরুষোত্তম** ভাবে তিনি নির্গুণ হইয়াও সগুণ, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা, যজ্ঞ-তপস্যার ভোক্তা, সর্বভূতের 'গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ' (৯।১৮)। গীতার মতে, ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ 'সমগ্র' স্বরূপ (৭।১)।

শ্রীঅরবিন্দ এই তিনটি তত্ত্ব এইরূপভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"ক্ষর হইতেছে সচল পরিণামী—আত্মার বহুভূত বহু-রূপে যে পরিণাম, তাহাকেই ক্ষর পুরুষ বলা হইতেছে। এখানে পুরুষ বলিতে ভগবানের বহুরূপ (Multiplicity of the Divine Being) বুঝাইতেছে—পুরুষ এই প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র নহে, ইহা প্রকৃতিরই অন্তর্গত। অক্ষর হইতেছে অচল, অপরিণামী, নীরব, নিষ্ক্রিয় পুরুষ—ইহা ভগবানের একরূপ (The Unity of the Divine Being), প্রকৃতির সাক্ষী ; কিন্তু প্রকৃতি ও তাহার কার্য হইতে এই পুরুষ মুক্ত। পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম, পরম পুরুষই উত্তম, উল্লিখিত পরিণামী বহুত্ব ও অপরিণামী একত্ব এই দুই-ই উত্তমের। তাঁহার প্রকৃতির, তাঁহার শক্তির বিরাট্ ক্রিয়ার বলে, তাঁহার ইচ্ছা ও প্রভাবের বশেই তিনি নিজেকে সংসারে ব্যক্ত করিয়াছেন। আবার আরও মহান্ নীরবতা ও অচলতার দ্বারা নিজেকে স্বতন্ত্র নির্লিপ্ত রাখিয়াছেন ; তথাপি তিনি পুরুষোত্তমরূপে প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্রতা এবং প্রকৃতিতে লিপ্ততা এই দুইয়েরই উপরে। পুরুষোত্তম সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা উপনিষদে প্রায়ই সূচিত হইলেও গীতাতেই ইহা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং তাহার পর হইতে ভারতীয় ধর্মচিন্তার উপর এই ধারণা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। যে সর্বোত্তম

ভক্তিযোগ অদ্বৈতবাদের কঠিন নিগড় ছাড়াইয়া যাইতে চায়, ইহাই (অর্থাৎ এই পুরুষোত্তম-তত্ত্ব) তাহার ভিত্তি ; ভক্তিরসাত্মক পুরাণ-সমূহের মূলে এই পুরুষোত্তম-বাদ নিহিত রহিয়াছে।"—শ্রীঅরবিন্দের গীতা।

এই পুরুষোত্তম-বাদ দ্বারাই গীতা জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। ব্রহ্মবাদে উহা হয় না, কেননা মায়াবাদিগণের ব্রহ্ম নীরব, অক্ষর, নিষ্ক্রিয় ; সাংখ্যদিগের পুরুষও তদ্রূপ ; সুতরাং এই উভয় মতেই কর্মত্যাগ ভিন্ন মোক্ষলাভের অন্য উপায় নাই এবং এই মোক্ষ বা মিলনে ভক্তিরও স্থান নাই। কিন্তু গীতায় পুরুষোত্তম যেমন সম, শান্ত, নির্গুণ, অনন্ত, অখিলাত্মা, আবার তিনিই গুণ-পালক গুণ-ধারক, প্রকৃতি বা কর্মের প্রেরয়িতা, যজ্ঞ-তপস্যার ভোক্তা, সর্বলোকমহেশ্বর। সুতরাং সর্বভূতাত্মৈক্য-জ্ঞানই পুরুষোত্তমের জ্ঞান, সর্বভূতে প্রীতি ও সেই সর্বশরণে আত্ম-সমর্পণই পুরুষোত্তমে ভক্তি এবং সর্বলোকসংগ্রহার্থ নিষ্কাম কর্ম পুরুষোত্তমেরই কর্ম ('মৎকর্মকৃৎ')—এইরূপ জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের মিলনের দ্বারা আত্মা সর্বোচ্চ ঐশ্বরিক অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়,—যিনি একই কালে অনন্ত আধ্যাত্মিক শান্তি এবং অনন্ত বিশ্বব্যাপী কর্ম উভয়েরই অধীশ্বর সেই পুরুষোত্তমের মধ্যে বাস করেন ('স যোগী ময়ি বর্ততে', 'বিশতে তদনন্তরম্')। ইহাই গীতার গুহ্য সারতত্ত্ব ('গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদং' ১৫।২০), ইহাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণোক্ত ভাগবত ধর্ম, ইহার অন্তর্নিবিষ্ট সার্বভৌম দার্শনিক তত্ত্ব ও ধর্মনীতি জাতিধর্মনির্বিশেষে মানবমাত্রেরই অধিগম্য। এরূপ উদার, সর্বতঃপূর্ণ সর্বাঙ্গসুন্দর ধর্মতত্ত্ব জগতে আর কোথাও প্রচলিত হয় নাই। (এই প্রসঙ্গে ২১৮-২২২, ২৭২-২৭৮ পৃষ্ঠা ও ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

কিন্তু সকলে গীতার এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেন না বা স্বীকার করেন না। সুতরাং এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বহু সাম্প্রদায়িক মতভেদ আছে। কেহ বলেন, এস্থলে অক্ষর বলিতে বুঝায় অব্যক্ত প্রকৃতি বা মায়া, আর ক্ষর বলিতে বুঝায় ব্যক্ত জগৎ। আর ব্যক্ত সৃষ্টি ও অব্যক্ত প্রকৃতির অতীত যে ব্রহ্ম তিনিই পুরুষোত্তম। কেহ বলেন,—এখানে ক্ষর বলিতে বুঝায় প্রকৃতি এবং অক্ষর বলিতে বুঝায় পুরুষ বা জীবাত্মা এবং উভয়ের অতীত পরব্রহ্মই পুরুষোত্তম। এই মতে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ১।৮, ১।১০ মন্ত্রের 'ক্ষর' ও 'অক্ষর' শব্দের অর্থ ইহাই, কিন্তু উহার পূর্বোক্ত রূপ ব্যাখ্যাও হয়। কেহ আবার বলেন, 'অবিদ্যার বহু-মূর্তিতে অবস্থিত যে চৈতন্য তিনিই ক্ষর জীব, মায়ার এক মূর্তিতে অবস্থিত যে

চৈতন্য তিনি অক্ষর ঈশ্বর এবং মায়াতীত যিনি তিনি পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম'। এই যে অবিদ্যা ও মায়ার পার্থক্য এবং মায়াতীত ব্রহ্ম হইতে মায়াধীশ ঈশ্বরের গৌণত্ব, ইহা পরবর্তিকালীন অদ্বৈতবেদান্তীদিগের একটি মত। গীতায় 'মায়া' ও 'ঈশ্বর' শব্দ ঠিক এ অর্থে কোথাও ব্যবহৃত হয় নাই। এই স্থলে যাহাকে অক্ষর হইতেও উত্তম বলা হইতেছে তাহাকেই অব্যয় ঈশ্বর বলা হইয়াছে (১৬শ।১৭শ)। বস্তুতঃ এই সকল ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে গীতার বিভিন্ন স্থলে পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষা হয় না এবং গীতার ভাষায়ও এরূপ ব্যাখ্যা সমর্থন করে না। এই প্রসঙ্গে এই কয়েকটি কথা বিবেচ্য।—

(১) এই স্থলে পূর্বে বলা হইল যে, লোকে ক্ষর ও অক্ষর এই দুই পুরুষ আছে। উহা কি? তৃতীয় মুণ্ডকে (৩।১।১) রূপকের ভাষায় দুই পুরুষের বর্ণনা আছে—'দ্বা সুপর্ণা সংযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে'—দুইটি সুন্দর পক্ষী (জীব ও ব্রহ্ম) একই বৃক্ষে (দেহে) অধিষ্ঠিত আছে, তাহারা পরস্পর সখা। শ্বেতাশ্বতরে এই তত্ত্ব লক্ষ করিয়াই বলা হইয়াছে, "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বৌ ঈশানীশৌ" (১।৯)—একজন অজ্ঞ, একজন প্রাজ্ঞ, একজন অনীশ, একজন ঈশ। এই উপনিষদেই অন্যত্র একটি ত্রিবর্ণা অজা (ত্রিগুণা প্রকৃতি) ও দুইটি অজ পুরুষের (জীব ও ব্রহ্ম) কথা আছে। মহাভারতেও চারিটি অধ্যায়ে ক্ষরাক্ষরের সুদীর্ঘ বিচার আছে। তথায়ও অক্ষর বলিতে অপরিণামী নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব এবং ক্ষর বলিতে পরিণামী, প্রকৃতিজড়িত জীবতত্ত্বই বুঝান হইয়াছে। (শাং ৩০২-৩০৫)। সুতরাং দেখা যায়, জীব বা প্রকৃতিকে অক্ষর পুরুষ কোথাও বলা হয় নাই। গীতায়ও 'অক্ষর' ও 'কূটস্থ', সর্বত্রই ব্রহ্মবস্তু বুঝাইতেই ব্যবহৃত হইয়াছে (৮।৩।২০, ১১।৩৭, ১২।৩)

(২) এস্থলে বলা হইতেছে, 'অক্ষর হইতেও (অপি) আমি উত্তম।' প্রকৃতি হইতে পরমেশ্বর উত্তম—একথা বলিতে 'অপি'র প্রয়োজন হয় না, উহা সর্ববাদিসম্মত। কিন্তু যাঁহাকে পরতত্ত্ব অক্ষর ব্রহ্ম বলা হয়, তাহা হইতেও উত্তম, এই বৈশিষ্ট্য প্রকাশার্থই 'অপি' ব্যবহৃত হইয়াছে। নচেৎ 'অপি'র কোন অর্থ হয় না।

(৩) পরে বলা হইতেছে যে, ইহা অতি গুহ্যতম শাস্ত্র। যে আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানে, সে আমাকে সর্বভাবে ভজনা করে, ইত্যাদি। পরব্রহ্ম প্রকৃতি হইতে উত্তম বা নশ্বর জগৎ-প্রপঞ্চের অতীত, ইহাই যদি এস্থলে বলার উদ্দেশ্য হয়, তবে এ তত্ত্ব এমন গুহ্যতম হইল কিসে? আর 'আমাকে

সর্বতোভাবে ভজনা করে', অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বে এ কথারই বা সার্থকতা কি? প্রকৃত কথা হইতেছে এই—উপনিষদের ব্রহ্মবাদ পূর্বাবধিই সুপ্রচলিত ছিল, উহার সহিত নিষ্কাম কর্ম ও ভক্তির সংযোগ করিয়া যে ভাগবত ধর্মের প্রচার হয়, তাহাতে পুরুষোত্তমই উপনিষদের ব্রহ্মের স্থান অধিকার করেন। এই ধর্ম পূর্বে অনেক বার প্রাদুর্ভূত হইয়াও অন্তর্হিত হইয়াছে এবং এই ধর্মই শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বলিতেছেন, একথা গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে এবং মহাভারতে অন্যত্রও স্পষ্টতঃ আছে(মহা ভাঃ শা-৩৪৬, ৩৪৮) এবং ভাগবতেও ইহাকে 'মদ্ধর্ম' বলিয়া উল্লেখ করিয়া, 'তুমি ইহা অভক্তকে বলিবে না', শ্রীভগবান্ ভক্ত উদ্ধবকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন (ভাগবত, ১১।২৯)। মহাভারতীয় নারায়ণীয় পর্বাধ্যায়ে এই পুরুষোত্তম-তত্ত্ব ও ভাগবত ধর্মের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। তথায়ও ইহাকে সর্বশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ', 'উত্তম রহস্য' ('শাস্ত্রাণাং শাস্ত্রমুত্তমম্', 'রহস্যচৈতদুত্তমম্'—শাং), 'অভক্তকে অদেয়' ('নাবাসুদেবভক্তায় ত্বয়া দেয়ং কথঞ্চন') ইত্যাদি বলা হইয়াছে। এস্থলেও সেই মহাভারতীয় পুরুষোত্তম তত্ত্বই বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহাকেই নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব হইতেও উত্তম বলা হইয়াছে। পুরুষোত্তম পরব্রহ্মই বটেন, কিন্তু উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বে অবতারবাদ ও ভক্তির প্রসঙ্গ নাই। ভাগবত-ধর্মে ঐ দুইটির প্রাধান্য থাকাতেই পুরুষোত্তম তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য জন্মিয়াছে। ইহাই 'উত্তম রহস্য'।

(৪) পুরুষোত্তম তত্ত্বের-এই বৈশিষ্ট্য স্বীকার না করিলে গীতার অন্যান্য স্থলেরও অর্থসঙ্গতি হয় না। শ্রীভগবান্ ১৪।২৭ শ্লোকে বলিতেছেন, 'আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা', ১৮।৫৪ শ্লোকে বলিতেছেন, 'ব্রহ্মভাব লাভ করিলে আমাতে ভক্তি জন্মে এবং ভক্তিদ্বারা তত্ত্বতঃ জানিয়া আমাতে প্রবেশ করা যায়' (১৮।৫৫)। আবার অন্যত্র ব্রহ্মনির্বাণ বা আত্মদর্শন লাভ করার পরও ভগবদ্দর্শনের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করিতেছেন (৬।২৯।৩০ ইত্যাদি)। নির্গুণ ব্রহ্মই পরতত্ত্ব এবং ব্রাহ্মী স্থিতিই গীতার শেষ কথা হইলে এই সকল শ্লোকের কোন অর্থ হয় না। বস্তুতঃ নির্গুণ-গুণী পুরুষোত্তমই যে পরতত্ত্ব এবং অনির্দেশ্য ব্রহ্মতত্ত্ব হইতেও উত্তম, এ সকল শ্লোক এই মর্মেরই পরিপোষক (১৪।২৭ ১৮।৫৪, ৬।২৯-৩০ শ্লোকের ব্যাখ্যা ও ভূমিকা দ্রষ্টব্য)

আবার কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীগীতার এই শ্লোকগুলি—যে স্থলে শ্রীভগবান্ আপনাকে অক্ষর পুরুষ হইতেও উত্তম বা পুরুষোত্তম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা প্রক্ষিপ্ত। ইঁহারা বলেন—

"গীতার পুরুষোত্তম-বাদ একটি বৈষ্ণব মত। ইহা বৈদান্তিক মত নহে। এই অংশকে প্রক্ষিপ্ত বলিলে গীতার মৌলিক মতের কোন ব্যত্যয় ঘটে না,

গীতার অন্য কোন মত এই অংশের উপর নির্ভর করে না। এই অংশ প্রক্ষিপ্ত করিবার উদ্দেশ্য—বৈষ্ণব মত প্রচার”।—৺মহেশচন্দ্র ঘোষ, প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩৫।

ইহা বৈষ্ণব মত এ কথা ঠিক। তবে বৈষ্ণবগণ বলেন, শ্রীগীতাও বৈষ্ণব গ্রন্থ, ভাগবত ধর্ম বা সাত্বত ধর্মের মূল গ্রন্থ (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। ইহা কেবল নির্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব-প্রতিপাদক বৈদান্তিক গ্রন্থ নহে। ইহা ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্গত (কর্ম) যোগ-শাস্ত্র। ব্রহ্মজ্ঞান, নিষ্কাম কর্ম ও ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তির সমুচ্চয় মূলে অপূর্ব যোগধর্মের প্রচারই ইহার বিশেষত্ব। ইহাই ভাগবত ধর্মের প্রাচীন স্বরূপ এবং এই ধর্ম-প্রচারই গীতার উদ্দেশ্য। (মঃ ভাঃ শাং ৩৪৬।১১, ৩৪৮।৮, গীতা ৪।১-৩ ইত্যাদি দ্রঃ)।

কর্ম-জ্ঞান-ভক্তির সমুচ্চয়ই গীতার মূল প্রতিপাদ্য এ কথা স্বীকার করিলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, এই পুরুষোত্তম-বাদ বা ঈশ্বর-বাদের উপরই এই সমুচ্চয়বাদ সম্পূর্ণ নির্ভর করে। কারণ, বেদান্তের অনির্দেশ্য নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মভাবে কর্ম ও ভক্তির স্থান নাই। এই হেতুই গীতা, ভাগবত প্রভৃতি সাত্বত-ধর্মশাস্ত্রে নিষ্ক্রিয় অক্ষর-ব্রহ্ম অপেক্ষা ক্রিয়াশীল ‘ভক্তের ভগবান্’ ‘নির্গুণ-গুণী’ ব্রহ্মের বৈশিষ্ট্য। ইনিই পুরুষোত্তম। সুতরাং গীতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিলে এ সকল শ্লোক প্রক্ষিপ্ত তো নহেই, বরং বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়াই বোধ হয় (ভূমিকা ও ৪৪৪-৪৪৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

“মায়াবাদীদিগের ব্রহ্ম নীরব অক্ষর নিষ্ক্রিয়। সাংখ্যদের পুরুষও তদ্রূপ। ভগবান্ যদি শুধু এই অক্ষর আত্মা হন এবং তাহা হইতে যে সত্তা প্রকৃতির খেলায় বাহির হইয়াছে তাহাই যদি জীব হয়, তাহা হইলে যে মুহূর্তে জীব ফিরিয়া আসিবে ও আত্মায় প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখনই সমস্ত বন্ধ হইয়া যাইবে, কেবল থাকিবে পরম ঐক্য, পরম নিস্তব্ধতা।···তাহা হইলে সর্বাপেক্ষা ভীষণ ও ধ্বংস-সঙ্কুল কর্ম করিতে পুনঃ পুনঃ আদেশ কেন, এই রথ কেন, এই যুদ্ধ কেন, এই যোদ্ধা কেন, এই দিব্য সারথি কেন? গীতা এই বলিয়া জবাব দিয়াছেন যে, ভগবান্ অক্ষর আত্মা অপেক্ষাও বড়, আরও অধিক ব্যাপক, তিনি একাধারে অক্ষর-ব্রহ্ম বটেন, আবার প্রকৃতির কার্যের অধীশ্বরও বটেন।···জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের মিলনের দ্বারা আত্মা সর্বোচ্চ ঐশ্বরিক অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়, যিনি এক কালে অনন্ত আধ্যাত্মিক শান্তি এবং অনন্ত বিশ্বব্যাপী কর্ম উভয়েরই অধীশ্বর সেই পুরুষোত্তমের মধ্যে বাস করেন। ইহাই গীতার সমন্বয়।”—শ্রীঅরবিন্দের গীতা

যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ববিদ্ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥ ১৯
ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ২০

১৯। হে ভারত, যঃ (যিনি) এবম্ (এই প্রকারে) অসংমূঢ়ঃ (মোহহীন হইয়া) পুরুষোত্তমং মাং জানাতি (পুরুষোত্তম বলিয়া আমাকে জানেন) সঃ সর্ববিদ্ (সর্বজ্ঞ) [হইয়া] সর্বভাবেন (সর্বতোভাবে) মাং ভজতি (আমাকে ভজনা করেন)।

হে ভারত, যিনি মোহমুক্ত হইয়া এই ভাবে আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানিতে পারেন, তিনি সর্বজ্ঞ হন এবং সর্বতোভাবে আমাকে ভজনা করেন। ১৯

'তিনি সর্বজ্ঞ হন'—অর্থাৎ আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানিলে আর জানিবার কিছু অবশিষ্ট থাকে না, সগুণ-নির্গুণ, সাকার-নিরাকার, দ্বৈতাদ্বৈত ইত্যাদি সংশয় আর তাঁহার উপস্থিত হয় না; তিনি জানেন, আমিই নির্গুণ পরব্রহ্ম, আমিই সগুণ বিশ্বরূপ, আমিই সর্বলোক-মহেশ্বর, আমিই লীলায় অবতার, আমিই হৃদয়ে পরমাত্মা, সুতরাং তিনি সকল ভাবেই আমাকে ভজনা করেন।

২০। হে অনঘ (ব্যসনশূন্য), হে ভারত, ইতি ইদং গুহ্যতমং শাস্ত্রং (এই পরম গুহ্যতত্ত্ব) ময়া উক্তম্ (আমাকর্তৃক কথিত হইল), [মনুষ্য] এতদ্ বুদ্ধা (ইহা বুঝিয়া) বুদ্ধিমান্ কৃতকৃত্যশ্চ (জ্ঞানী ও কৃতার্থ) স্যাৎ (হইয়া থাকে)।

হে নিষ্পাপ, আমি এই অতি গুহ্যকথা তোমাকে কহিলাম। যে কেহ ইহা জানিলে জ্ঞানী ও কৃতকৃত্য হয়। (অতএব তুমিও যে কৃতার্থ হইবে তাহাতে সন্দেহ কি ?) ২০

পঞ্চদশ অধ্যায়—বিশ্লেষণ ও সার-সংক্ষেপ

সংসার-বৃক্ষ ; পুরুষোত্তম-তত্ত্ব

১-২ সংসার অশ্বত্থবৃক্ষ-স্বরূপ ; ৩-৬ বৈরাগ্য-অস্ত্রে সংসার-বৃক্ষচ্ছেদনে অব্যয়পদ প্রাপ্তি—অব্যয়পদের বর্ণনা ; ৭-১১ জীবের স্বরূপ—জন্মান্তর-রহস্য—লিঙ্গ শরীর ; ১২-১৫ পরমেশ্বরের বিশ্বানুগতা—তিনিই সর্বকারণের কারণ; ১৬-১৮ ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তম-তত্ত্ব ; ১৯-২০ পুরুষোত্তম-জ্ঞানেই সর্বজ্ঞতা ; কারণ তিনিই সর্ব।

পূর্ব অধ্যায়ের শেষে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, যে আমাকে অনন্যভাবে ভজনা করে, সে ত্রিগুণাতীত হইয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। ত্রিগুণাতীত হওয়ার অর্থ সংসারের মায়াপ্রপঞ্চ অতিক্রম করা, ইহাকেই সংসার-ক্ষয় বলে। এই কথাটি আরও স্পষ্টীকৃত করিবার উদ্দেশ্যেই এই অধ্যায়ে প্রথমতঃ সংসার কি, উহার মূল কোথায়, জীবের জন্ম ও উৎক্রান্তি কিরূপে হয় ইত্যাদি বর্ণনা করিয়া পরিশেষে ভগবান্ পুরুষোত্তমরূপে আত্ম-পরিচয় দিয়া বলিতেছেন যে, উহাই পরতত্ত্ব এবং তাঁহাকে পুরুষোত্তমরূপে জানিলেই জীব কৃতার্থ হয় ও সর্বতোভাবে তাঁহার ভজনা করে।

সংসার-বৃক্ষ। এই সংসার অশ্বত্থ-বৃক্ষস্বরূপ ; উহার প্রধান মূল উর্ধ্বদিকে (পরব্রহ্ম); উহার শাখাসমূহ অধোদিকে বিস্তৃত (দেবাদি যোনি ও পশ্বাদি যোনিতে জীবজন্ম); বেদসমূহ উহার পত্র-স্বরূপ (ধর্মাধর্ম প্রতিপাদন দ্বারা পত্রের ন্যায় রক্ষকস্বরূপ); শব্দস্পর্শাদি বিষয়সমূহ উহার প্রবাল বা তরুণ পল্লবস্থানীয় ; উহার বাসনারূপ অবান্তর মূলসকল ধর্মাধর্মরূপ কর্মের প্রসূতি। মায়াবদ্ধ জীব ইহার প্রকৃত স্বরূপ জানে না, বৈরাগ্যরূপ অস্ত্রদ্বারা মায়াবন্ধন ছেদন করিয়া সংসার-প্রবৃত্তির আদি কারণ পরমেশ্বরের পরমপদ অন্বেষণ করা কর্তব্য। অভিমান, আসক্তি, কামনা ও সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হইলে সেই পরমপদ লাভ হয়। সেই অব্যয় পদ প্রাপ্তি হইলে আর সংসারে প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না।

জীবের জন্মকর্ম। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, জীব আমারই সনাতন অংশ। উহা কর্মফলে সদসদ্যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া সুখদুঃখাদি ভোগ করে। উহা দেহত্যাগ কালে সূক্ষ্ম শরীর লইয়া উৎক্রান্ত হয় এবং স্বকর্মানুযায়ী নূতন স্থূল শরীর ধারণ করিয়া ঐ সূক্ষ্ম শরীর লইয়াই পুনরায় বিষয়সমূহ ভোগ করিতে থাকে। জীবের এই জন্মকর্মতত্ত্ব অজ্ঞ ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারে না, কিন্তু জ্ঞানিগণ জ্ঞাননেত্রে উহা দর্শন করিয়া থাকেন।

আমিই সর্বকারণের কারণ। চন্দ্রসূর্যাদি সমস্তই আমার সত্তায় সত্তাবান্, আমার শক্তিতে শক্তিমান্। আমিই পৃথিবীতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ভূতগণকে ধারণ করিয়া আছি। আমার শক্তিতেই ওষধিসমূহ পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। আমি জঠরাগ্নিরূপে দেহ রক্ষা করি, আমি অন্তর্যামিরূপে সর্বজীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছি। আমিই বেদসমূহে একমাত্র জ্ঞাতব্য এবং আমিই আচার্যরূপে বেদান্তের অর্থ-প্রকাশক।

আমিই পরতত্ত্ব পুরুষোত্তম। লোকে ক্ষর (সর্বভূত, প্রকৃতিজড়িত জীব) ও অক্ষর (কূটস্থ নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব) এই দুই পুরুষ প্রথিত আছে। আমি ক্ষরের অতীত এবং কূটস্থ হইতেও উত্তম, এই হেতু আমি পুরুষোত্তম বলিয়া খ্যাত। আমাকে পুরুষোত্তমরূপে জানিলে আর কিছুই জানিবার অবশিষ্ট থাকে না। তখন জীব বুঝিতে পারে যে, আমিই নির্গুণ, আমিই সগুণ, আমিই বিশ্বরূপ, আমিই অবতার, আমিই আত্মা। এই পুরুষোত্তম-তত্ত্ব অতি গুহ্য। ইহা জানিলে জীব কৃতকৃত্য হয়; সে সর্বতোভাবে আমাকে ভজনা করে।

এই অধ্যায়ে প্রধান আলোচনার বিষয় পুরুষোত্তম তত্ত্ব। এই হেতু ইহাকে **পুরুষোত্তম-যোগ** বলে।

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে **পুরুষোত্তমযোগো** নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

ষোড়শ অধ্যায়

দৈবাসুর-সম্পদ্-বিভাগযোগ

শ্রীভগবান্ উবাচ

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্ ॥ ১
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ২
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥ ৩

১।২।৩। শ্রীভগবান্ উবাচ—অভয়ং (ভয়াভাব), সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ (চিত্তশুদ্ধি), জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ (আত্মজ্ঞান ও কর্মযোগে অবস্থিতি অথবা জ্ঞানযোগে নিষ্ঠা), দানং (দান), দমঃ চ (বাহ্যেন্দ্রিয়-সংযম), যজ্ঞঃ চ (অগ্নিহোত্রাদি), স্বাধ্যায়ঃ (শাস্ত্রপাঠ, ব্রহ্মযজ্ঞ বা জপযজ্ঞ), তপঃ (তপস্যা), আর্জবম্ (সরলতা), অহিংসা (পরপীড়া বর্জন), সত্যম্, অক্রোধঃ (ক্রোধহীনতা), ত্যাগঃ (কামনা বা কর্মফল ত্যাগ), শান্তিঃ, অপৈশুনম্ (পরনিন্দাবর্জন, উদারতা), ভূতেষু দয়া (জীবে দয়া), অলোলুপ্ত্বম্ (লোভশূন্যতা), মার্দবম্ (মৃদুতা), হ্রীঃ (কুকর্মে লোকলজ্জা), অচাপলং (অচাঞ্চল্য), তেজঃ (তেজস্বিতা), ক্ষমা, ধৃতিঃ, শৌচম্, অদ্রোহঃ (অবিরোধ, জিঘাংসা-রাহিত্য), নাতিমানিতা (অনভিমান)—হে ভারত, [এই সকল গুণ] দৈবীং সম্পদম্ অভিজাতস্য (দৈবী সম্পদ্ অভিমুখে জাত ব্যক্তির) ভবন্তি (হইয়া থাকে)।

সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ—অন্তঃকরণের শুদ্ধ ভাব অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি (শঙ্কর), শুদ্ধ সাত্ত্বিকবৃত্তি (তিলক)। **জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ**—জ্ঞানযোগে একান্ত নিষ্ঠা (শঙ্কর, শ্রীধর); জ্ঞান ও কর্মযোগে যুগপৎ অবস্থিতি (তিলক, ৪।৪১-৪২ শ্লোক দ্রঃ। **অহিংসা, সত্য**—২১৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য। **শৌচ, তপঃ, স্বাধ্যায়**—২১৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য। **নাতিমানিতা**—আমি অতিশয় পূজ্য—এইরূপ অভিমান বর্জন।

দৈবী সম্পদ্ বর্ণন—দৈবী প্রকৃতির ছাব্বিশ গুণ ১-৩

নির্ভীকতা, চিত্তশুদ্ধি, আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা ও কর্মযোগে তৎপরতা, দান, বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম, যজ্ঞ, শাস্ত্র-অধ্যয়ন, তপঃ, সরলতা, অহিংসা, সত্য,

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥ ৪
দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব ॥ ৫

অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, পরনিন্দাবর্জন, জীবে দয়া, লোভহীনতা, মৃদুতা (অক্রৌর্য), কু-কর্মে লজ্জা, অচাঞ্চল্য, তেজস্বিতা, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, দ্রোহ বা হিংসা না করা, অনভিমান,—হে ভারত, এই সকল গুণ দৈবী সম্পদ্ অভিমুখে জাত পুরুষের হইয়া থাকে। (অর্থাৎ যাঁহারা পূর্বজন্মের কর্মফলে দৈবী সম্পদ্ ভোগার্থ জন্মগ্রহণ করেন তাঁহাদেরই এই সকল সাত্ত্বিক গুণ জন্মিয়া থাকে)। ১।২।৩

সপ্তম অধ্যায়ে যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা আরম্ভ হইয়াছিল, পঞ্চদশ অধ্যায়ে উহা শেষ হইল এবং পরিশেষে শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তমরূপে আত্মপরিচয় দিয়া বলিলেন, যে এই গুহ্য-তত্ত্ব বুঝিতে পারে সে জ্ঞানী ও কৃতার্থ হয়। কিন্তু নবম অধ্যায়ে সংক্ষেপে বলিয়াছেন যে, আসুরিক প্রকৃতির লোক তাঁহাকে চিনে না, সুতরাং অবজ্ঞা করে ; দৈবী বা সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক তাঁহাকে ভক্তি করে (৯।১১-১৩ শ্লোক)। এই উভয় প্রকৃতির বিস্তারিত বর্ণনা এই অধ্যায়ে করা হইতেছে এবং আসুরী প্রকৃতির কিরূপে সংশোধন হয় তাহাও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

প্রথমতঃ এই অধ্যায়ের প্রথম তিন শ্লোকে দৈবী সম্পদ্ বা সাত্ত্বিক গুণ বর্ণিত হইয়াছে। এই ছাব্বিশটি সাত্ত্বিক গুণ এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়োক্ত কুড়িটি জ্ঞানীর লক্ষণ (১৩।৭-১১) প্রায় একই। কেননা, জ্ঞান সত্ত্বগুণেরই ধর্ম। এই হেতুই পরবর্তী শ্লোকে অজ্ঞানকে আসুরী সম্পদের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

৪। হে পার্থ, দম্ভঃ, দর্পঃ, অভিমানঃ, ক্রোধঃ, পারুষ্যম্ (নিষ্ঠুরতা), অজ্ঞানং চ এব, আসুরীং সম্পদম্ অভিজাতস্য (আসুরী সম্পদ্ অভিমুখে জাত ব্যক্তির) [হইয়া থাকে]।

আসুরী প্রকৃতির লক্ষণ ৪

হে পার্থ, দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা এবং অজ্ঞান আসুরী সম্পদ্-অভিমুখে জাত ব্যক্তি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ এই সকল রাজসিক এবং তামসিক প্রকৃতির লোকের ধর্ম। ৪

৫। দৈবী সম্পদ্ বিমোক্ষায় (মোক্ষের নিমিত্ত), আসুরী [সম্পদ্] নিবন্ধায় মতা (বন্ধনের নিমিত্ত হয়) ; হে পাণ্ডব, মা শুচঃ (শোক করিও না), দৈবীং সম্পদম্ অভিজাতঃ অসি (দৈবী সম্পদ্ অভিমুখে জন্মিয়াছ)।

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু॥ ৬
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥ ৭

দৈবী সম্পদে মোক্ষলাভ—আসুরী বন্ধন-হেতু ৫

দৈবী সম্পদ্ মোক্ষের হেতু এবং আসুরী সম্পদ্ সংসার-বন্ধনের কারণ হয়। হে পাণ্ডব, শোক করিও না; কারণ তুমি দৈবী সম্পদ্ অভিমুখে জন্মিয়াছ। ৫

৬। হে পার্থ, অস্মিন্ (এই) লোকে দৈবঃ আসুরঃ চ দ্বৌ (দুই) ভূতসর্গৌ (ভূতসৃষ্টি) [আছে]; দৈবঃ বিস্তরশঃ (বিস্তৃতভাবে) প্রোক্তঃ (বলা হইয়াছে); আসুরং মে (আমার নিকট) শৃণু (শোন)।

আসুরী প্রকৃতির বিস্তারিত বর্ণনা ৬-২০

হে পার্থ, এ জগতে দৈব ও আসুর এই দুই প্রকার প্রাণীর সৃষ্টি হয়। দৈবী প্রকৃতির বর্ণনা সবিস্তার করিয়াছি, এক্ষণে আসুরী প্রকৃতির কথা আমার নিকট শ্রবণ কর। ৬

দৈবী প্রকৃতির বর্ণনা এই অধ্যায়ে প্রথম তিন শ্লোকে বিস্তৃত ভাবে করা হইয়াছে। অধিকন্তু দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞের বর্ণনা (২।৫৫-৭২), দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবদ্ভক্তের বর্ণনা (১২।১৩-২০), ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জ্ঞানীর লক্ষণ (১৩।৮-১২), চতুর্দশ অধ্যায়ে ত্রিগুণাতীতের বর্ণনা (১৪।২২-২৫), এ সকলই দৈবী সম্পদের বর্ণনা। কিন্তু আসুরী সম্পদের বর্ণনা মাত্র নবম অধ্যায়ে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে (৯।১১-১২)। এক্ষণে উহাই এই অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বলিতেছেন।

৭। আসুরাঃ জনাঃ (অসুরস্বভাব ব্যক্তিগণ) প্রবৃত্তিং চ (ধর্মে প্রবৃত্তি) নিবৃত্তিং চ (বা অধর্ম হইতে নিবৃত্তি) ন বিদুঃ (জানে না); তেষু (তাহাদের মধ্যে) ন শৌচং ন আচারঃ ন চ অপি সত্যং বিদ্যতে (বিদ্যমান নাই)।

আসুরভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ জানে না যে, ধর্মে প্রবৃত্তিই বা কি আর অধর্ম হইতে নিবৃত্তিই বা কি, অর্থাৎ তাহাদের ধর্মাধর্ম, কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞান নাই। অতএব তাহাদের মধ্যে শৌচ, সদাচার বা সত্য কিছুই নাই। ৭

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥ ৮

৮। তে (তাহারা) জগৎ (জগৎকে) অসত্যম্ (মিথ্যা ব্যবহার পরিপূর্ণ), অপ্রতিষ্ঠম্ (ধর্মাধর্মের ব্যবস্থাশূন্য), অনীশ্বরম্ (ঈশ্বরবিহীন), অপরস্পরসম্ভূতম্ (স্ত্রী-পুরুষ সংযোগজাত অথবা সৃষ্ট্যুৎপত্তিক্রম-পরিশূন্য), কিমন্যৎ (ইহার অন্য কারণ নাই) [কেবল] কামহৈতুকম্ (কামজনিত অথবা কাম ভোগার্থ) আহুঃ (বলিয়া থাকে)।

অসত্যং—নাস্তি সত্যং বেদপুরাণাদি প্রমাণং যত্র তাদৃশম্ (শ্রীধর) ; যথা—বয়মনৃতপ্রায়াঃ তথেদং জগৎ সর্বম্ অসত্যম্ (শঙ্কর)।—তাহারা বেদপুরাণাদি প্রামাণ্য স্বীকার করে না, অথবা তাহারা বলে, জগতে সকলই মিথ্যা ব্যবহারে পূর্ণ, সত্য বলিতে কিছু নাই।

অপ্রতিষ্ঠং—নাস্তি ধর্মাধর্মরূপা প্রতিষ্ঠা ব্যবস্থা হেতুঃ যস্য তৎ (শ্রীধর) —জগতে ধর্মাধর্মরূপ কোন ব্যবস্থা নাই।

অপরস্পরসম্ভূতং—অপরশ্চ পরশ্চেতি অপরস্পরং অপরস্পরতঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ অন্যোন্যসংযোগাৎ সম্ভূতঃ (শঙ্কর, শ্রীধর)—স্ত্রী-পুরুষের অন্যোন্যসংযোগে জাত। কিন্তু লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক এই শব্দের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, 'অপরস্পরসম্ভূত' অর্থ সৃষ্ট্যুৎপত্তির পরপম্পরাক্রম-পরিশূন্য অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, ইত্যাদি পরম্পরাক্রমে পরমেশ্বর হইতে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে, এই সকল শাস্ত্রবাক্য ইহারা স্বীকার করে না।

কামহৈতুকম্—স্ত্রী-পুরুষের কামসম্ভূত ; অথবা লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলকের মতে, মানুষের কেবল কামনা ভোগার্থ।

এই আসুর প্রকৃতির লোকেরা বলিয়া থাকে যে, এই জগতে সত্য বলিয়া কোন পদার্থ নাই, সকলই অসত্য ; জগতে ধর্মাধর্মেরও কোন ব্যবস্থা নাই এবং ধর্মাধর্মের ব্যবস্থাপক ঈশ্বর বলিয়াও কোন বস্তু নাই। ইহা কেবল স্ত্রী-পুরুষের অন্যোন্যসংযোগে জাত। স্ত্রী-পুরুষের কামই ইহার একমাত্র কারণ, ইহার অন্য কারণ নাই। (অথবা মতান্তরে, জগতের শাস্ত্রোক্ত কোন সৃষ্টি-পরম্পরা নাই। জগতের সকল পদার্থই মনুষ্যের কামনা-বাসনা তৃপ্ত করিবার জন্য। তাহাদের অন্য কোনও উপযোগ নাই)। ৮

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥ ৯
কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাঽসদ্‌গ্রাহান্ প্রবর্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ ॥ ১০
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ১১
আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥ ১২

৯। এতাং দৃষ্টিম্ (এইরূপ দৃষ্টি, মত বা বুদ্ধি) অবষ্টভ্য (আশ্রয় করিয়া) নষ্টাত্মানঃ (বিকৃতবুদ্ধি) অল্পবুদ্ধয়ঃ (ক্ষুদ্রমতি) উগ্রকর্মাণঃ (ক্রূরকর্মা) অহিতাঃ (অহিতকারী) [ব্যক্তিগণ] জগতঃ (জগতের) ক্ষয়ায় (বিনাশের জন্যই) প্রভবন্তি (উৎপন্ন হয়)।

এতাং দৃষ্টিম্ অবষ্টভ্য—এইরূপ নিরীশ্বরবাদীদিগের দৃষ্টি বা মত অবলম্বন করিয়া। holding this view—*Annie Besant.*

পূর্বোক্ত দৃষ্টি (নিরীশ্বরবাদীদিগের মত) অবলম্বন করিয়া বিকৃতমতি, অল্পবুদ্ধি ক্রূরকর্মা ব্যক্তিগণ অহিতাচরণে প্রবৃত্ত হয়; তাহারা জগতের বিনাশের জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ৯

১০। [তাহারা] দুষ্পূরং কামম্ (দুষ্পূরণীয় কামনা) আশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) দম্ভমানমদান্বিতাঃ (দম্ভ, মান ও মদে মত্ত হইয়া) মোহাৎ (মোহবশতঃ) অসদ্‌গ্রাহান্ (শাস্ত্রবিরুদ্ধ মনগড়া অপসিদ্ধান্ত) গৃহীত্বা (গ্রহণ করিয়া) অশুচিব্রতাঃ (অশুচিব্রতপরায়ণ হইয়া) প্রবর্তন্তে (কার্যে প্রবৃত্ত হয়)।

অসদ্‌গ্রাহান্—অনেন মন্ত্রেণ এতাং দেবতাম্ আরাধ্য মহানিধীন্ সাধয়িষ্যাম ইত্যাদীন্ বেদশাস্ত্রবিরুদ্ধান্ দুরাগ্রহান্ (শ্রীধর)—অমুক মন্ত্রে অমুক মহানিধি পাইব ইত্যাকার দুরাশা। **অশুচিব্রতাঃ**—অশুচীনি শ্মশান-নিষেধণমদ্যমাংসাদি-বিষয়াণি ব্রতাণি যেষাং তে (বলরাম) (৩১৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

যাহা কখনও পূর্ণ হইবার নহে, এইরূপ কামনার বশীভূত হইয়া দম্ভ, অভিমান ও গর্বে মত্ত হইয়া, তন্ত্রমন্ত্রাদি দ্বারা স্ত্রী-রত্নাদি প্রাপ্ত হইব, অবিবেকবশতঃ এইরূপ দুরাশার বশবর্তী হইয়া অশুচিব্রত অবলম্বন করতঃ তাহারা কর্মে (ক্ষুদ্র দেবতাদির উপাসনায়) প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ১০

১১-১২। প্রলয়ান্তাম্ (মৃত্যুকাল পর্যন্ত স্থিতিশীল) অপরিমেয়াম্ (অপরিমিত) চিন্তাম্ (বিষয়চিন্তা) উপাশ্রিতাঃ (অবলম্বন করিয়া)

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥ ১৩
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥ ১৪
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥ ১৫
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥ ১৬

কামোপভোগপরমাঃ (কামভোগই যাহাদের পরম পুরুষার্থ তাদৃশ) এতাবৎ ইতি নিশ্চিতাঃ (এইরূপ স্থিরনিশ্চয়) [অতএব] আশাপাশশতৈঃ বদ্ধাঃ (শত শত আশারূপ রজ্জুদ্বারা বদ্ধ হইয়া) কামক্রোধপরায়ণাঃ কামভোগার্থং (বিষয়ভোগের জন্য) অন্যায়েন (অসৎ পথ অবলম্বন-পূর্বক) অর্থসঞ্চয়ান্ ঈহন্তে (অর্থসঞ্চয় ইচ্ছা করে)।

এতাবদ্ ইতি নিশ্চিতাঃ—কামোপভোগ এব পরমঃ পুরুষার্থঃ নান্যদস্তীতি কৃতনিশ্চয়াঃ—বিষয়ভোগই পরম পুরুষার্থ, এতদ্ভিন্ন জীবনের অন্য লক্ষ্য নাই, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া।

মৃত্যুকাল পর্যন্ত অপরিমেয় বিষয়-চিন্তা আশ্রয় করিয়া (যাবজ্জীবন নিরন্তর বিষয়চিন্তাপরায়ণ হইয়া) বিষয়ভোগনিরত এই সকল ব্যক্তি নিশ্চয় করে যে, কামোপভোগই পরম পুরুষার্থ, এতদ্ব্যতীত জীবনের অন্য লক্ষ্য নাই, সুতরাং ইহারা শত শত আশাপাশে বদ্ধ এবং কামক্রোধপরায়ণ হইয়া অসৎ মার্গ অবলম্বনপূর্বক অর্থ-সংগ্রহে সচেষ্ট হয়। ১১-১২

১৩-১৬। অদ্য ময়া (মৎকর্তৃক) ইদং লব্ধম্ (ইহা লাভ হইল), ইমং মনোরথং (এই অভিলষিত বস্তু) প্রাপ্স্যে (পরে পাইব), ইদম্ অস্তি (ইহা আছে), পুনঃ মে (আমার) ইদং ধনম্ অপি (এই ধনও) ভবিষ্যতি (হইবে), অসৌ (ঐ) শত্রুঃ ময়া হতঃ (আমাকর্তৃক হত হইয়াছে), অপরান্ অপি চ (অন্যান্যদিগকেও) হনিষ্যে (হনন করিব), অহম্ (আমি) ঈশ্বরঃ (প্রভু) অহং ভোগী (ভোগাধিকারী, ভোগকর্তা), অহং সিদ্ধঃ (কৃতকৃত্য), বলবান্, সুখী, [আমি] আঢ্যঃ (ধনবান্), অভিজনবান্ (কুলীন) অস্মি (হই), ময়া

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্বকম্ ॥ ১৭

সদৃশঃ (আমার তুল্য) অন্যঃ কঃ অস্তি (আর কে আছে) ? [আমি] যক্ষ্যে (যজ্ঞ করিব), দাস্যামি (দান করিব), মোদিষ্যে (আমোদ করিব) ইতি অজ্ঞান-বিমোহিতাঃ (এই প্রকার অজ্ঞানে বিমূঢ়) অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ (অনেক প্রকার কল্পনায় বিক্ষিপ্তচিত্ত) [তৈরেব] মোহজালসমাবৃতাঃ (মোহজালে জড়িত) কামভোগেষু প্রসক্তাঃ (বিষয়ভোগে আসক্ত) [ব্যক্তিগণ] অশুচৌ নরকে (অপবিত্র নরকে) পতন্তি (পতিত হয়)

যক্ষ্যে, দাস্যামি, মোদিষ্যে—যজ্ঞ করিব, দান করিব, আমোদ করিব। এই যজ্ঞ আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য, দান মানের জন্য, আমোদ বিষয় উপভোগ, সুতরাং এ সকল অজ্ঞান-প্রসূত এবং নরকের হেতু।

অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ—অনেকেষু মনোরথেষু প্রবৃত্তং চিত্তং অনেকচিত্তং তেন বিভ্রান্তাঃ বিক্ষিপ্তাঃ (শ্রীধর)—নানা বিষয়ে প্রবৃত্তিবশতঃ বিভ্রান্তচিত্ত।

অদ্য আমার এই লাভ হইল, পরে এই ইষ্টবস্তু পাইব, এই ধন আমার আছে, এই ধন আমার পরে হইবে, এই শত্রুকে আমি পরাজিত করিয়াছি, অন্যান্যকেও হত করিব ; আমি সকলের প্রভু, আমিই সকল ভোগের অধিকারী, আমি কৃতকৃত্য, আমি বলবান্, আমি সুখী, আমি ধনবান্, আমি কুলীন, আমার তুল্য আর কে আছে ? আমি যজ্ঞ করিব, দান করিব, মজা করিব—এই প্রকার অজ্ঞানে বিমূঢ়, বিবিধ বিষয়-চিন্তায় বিভ্রান্তচিত্ত, মোহজালে জড়িত, বিষয়ভোগে আসক্ত ব্যক্তিগণ অপবিত্র নরকে পতিত হয়। ১৩-১৬

১৭। আত্মসম্ভাবিতাঃ (আত্মশ্লাঘা-বিশিষ্ট, আত্মপ্রশংসাকারী), স্তব্ধাঃ (অনম্র, অবিনয়ী), ধনমানমদান্বিতাঃ (ধন নিমিত্ত অভিমান ও অহঙ্কারবিশিষ্ট), তে (তাহারা) দম্ভেন (দম্ভ সহকারে) নামযজ্ঞৈঃ (নামমাত্র যজ্ঞের দ্বারা) অবিধিপূর্বকং যজন্তে (যজ্ঞ করে)।

আত্মসম্ভাবিতাঃ—আত্মনৈব সম্ভাবিতা পূজ্যতাং নীতাঃ ন তু সাধুভিঃ কৈশ্চিৎ (শ্রীধর)—'আপনি আপনিই রায় মহাশয়' (Self-glorifying—*Annie Besant*)। **ধনমান-মদান্বিতাঃ**—ধনগর্বে মোহিত (Filled with the pride and intoxication of wealth—*Annie Besant*)।

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥ ১৮
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥ ১৯
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥ ২০

আত্মশ্লাঘাযুক্ত, অবিনয়ী, ধনমানের গর্বে বিমূঢ় সেই আসুর প্রকৃতির ব্যক্তিগণ দম্ভ প্রকাশ করিয়া অবিধিপূর্বক নামমাত্র যজ্ঞ করে। (৯।১২ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। ১৭

১৮। অহঙ্কারং, বলং, দর্পং, কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ (**অবলম্বনপূর্বক**) [সেই ব্যক্তিগণ] আত্মপরদেহেষু (নিজের ও অন্যের দেহস্থিত) মাং (আমার প্রতি) প্রদ্বিষন্তঃ (দ্বেষ করিয়া) অভ্যসূয়কাঃ (অসূয়কারী) [হয়]।

সাধুগণের অসূয়াকারী সেই সকল ব্যক্তি অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া স্বদেহে ও পরদেহে অবস্থিত আত্মরূপী আমাকে দ্বেষ করিয়া থাকে। ১৮

স্বদেহে ও পরদেহে আমাকে দ্বেষ করিয়া থাকে—এ কথার তাৎপর্য এই যে, আমি অন্তর্যামিরূপে সকলের মধ্যেই আছি, কিন্তু দম্ভবশে আমার অন্তর্যামিত্ব অস্বীকার করিয়া স্বদেহস্থিত আমাকে দ্বেষ করে এবং প্রাণি-হিংসাদি দ্বারা অন্য দেহেও আমাকে দ্বেষ করিয়া থাকে।

অভ্যসূয়কাঃ—সন্মার্গবর্তিনাং গুণেষু দোষারোপকাঃ—সাধুপুরুষগণের অসূয়াকারী।

১৯। অহং (আমি) দ্বিষতঃ (দ্বেষ-পরবশ) ক্রূরান্ (ক্রূরকর্মা) নরাধমান্ (নরাধম) অশুভান্ তান্ (অশুভ-কর্মকারী তাহাদিগকে) সংসারেষু (সংসারে) আসুরীষু যোনিষু (পশ্বাদি পাপ-যোনিতে) অজস্রং (পুনঃ পুনঃ) ক্ষিপামি (নিক্ষেপ করি)।

এইরূপ দ্বেষপরবশ, ক্রূরমতি, নরাধম, আসুরপুরুষগণকে আমি সংসারে (ব্যাঘ্র-সর্পাদি) আসুরী যোনিতে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করিয়া থাকি। ১৯

২০। হে কৌন্তেয়, জন্মনি জন্মনি (জন্মে জন্মে) আসুরীং যোনিম্ আপন্নাঃ (আসুরী যোনি প্রাপ্ত) মূঢ়াঃ (মূঢ়ব্যক্তিগণ) মাম্ অপ্রাপ্য এব (আমাকে না পাইয়া) ততঃ অধমাং গতিং যান্তি (আরও অধোগতি লাভ করে)।

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ২১
এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২২

হে কৌন্তেয়, এই সকল মূঢ় ব্যক্তি জন্মে জন্মে আসুরী যোনি প্রাপ্ত হয় এবং আমাকে না পাইয়া শেষে আরও অধোগতি (কৃমিকীটাদি যোনি) প্রাপ্ত হয়। ২০

৪র্থ হইতে ২০শ শ্লোক পর্যন্ত আসুরী প্রকৃতির লোকদিগের এবং তাহাদের অধোগতির বর্ণনা হইয়া গেল। এক্ষণে এই অধোগতির মূল কারণ কি এবং তাহা নিবারণের উপায় কি তাহাই বলা হইতেছে।

২১। কামঃ, ক্রোধঃ তথা লোভঃ—ইদং ত্রিবিধং (এই তিন প্রকার) নরকস্য দ্বারম্ (নরকের দ্বার) আত্মনঃ নাশনং (আত্মার নাশক); [অতএব] তস্মাৎ এতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ (ত্যাগ করিবে)।

নরকের ত্রিবিধ দ্বার—কাম, ক্রোধ, লোভ—
স্বেচ্ছাচারের দোষ ২১-২৪

কাম, ক্রোধ এবং লোভ—এই তিনটি নরকের দ্বারস্বরূপ, ইহারা আত্মার বিনাশের মূল (জীবের অধোগতির কারণ)। সুতরাং এই তিনটিকে ত্যাগ করিবে। ২১

২২। হে কৌন্তেয়, এতৈঃ ত্রিভিঃ (এই তিন) তমোদ্বারৈঃ বিমুক্তঃ (নরকের দ্বার হইতে মুক্ত হইয়া) নরঃ আত্মনঃ শ্রেয়ঃ (কল্যাণ) আচরতি (সাধন করে), ততঃ (তদনন্তর) পরাং গতিং যাতি (পরমগতি প্রাপ্ত হয়)।

হে কৌন্তেয়, নরকের দ্বারস্বরূপ এই তিনটি (কাম, ক্রোধ ও লোভ) হইতে মুক্ত হইলে মানুষ আপনার কল্যাণ সাধনপূর্বক পরমগতি প্রাপ্ত হয়। ২২

দম্ভ, দর্প, অভিমানাদি আসুর স্বভাবের যে সকল দোষ উল্লিখিত হইয়াছে সে সকলেরই মূলে কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটি আছে। এই তিনটিকে ত্যাগ করিতে পারিলেই আপনার শ্রেয়ঃ সাধনার্থ কর্ম করা যায় এবং তজ্জন্য পরিশেষে মোক্ষও লাভ হয়। কি উপায়ে ইহাদিগকে ত্যাগ করা যায় এবং আপনার শ্রেয়ঃসাধন কর্ম কি? (পরের দুই শ্লোক)

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ২৩
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি ॥ ২৪

২৩। যঃ শাস্ত্রবিধিম্ উৎসৃজ্য (যে শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া) কামকারতঃ (যথেচ্ছাচারী হইয়া) বর্ততে (কর্মে প্রবৃত্ত হয়), সঃ (সেই ব্যক্তি) সিদ্ধিং ন অবাপ্নোতি (সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না), ন সুখং (না সুখ), ন পরাং গতিম্ (না পরাগতি, মোক্ষ)।

সিদ্ধি—পুরুষার্থ প্রাপ্তির যোগ্যতা (শঙ্কর); তত্ত্বজ্ঞান (শ্রীধর)।

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না, তাহার শান্তি-সুখও হয় না, মোক্ষলাভও হয় না। ২৩

২৪। তস্মাৎ (সুতরাং, সেই হেতু) কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ (কর্তব্য ও অকর্তব্যের নিরূপণে) শাস্ত্রং তে প্রমাণম্ (তোমার প্রমাণস্বরূপ); [সুতরাং] ইহ (এই লোকে থাকিয়া অথবা কর্মাধিকারে বর্তমান থাকিয়া) শাস্ত্রবিধানোক্তং জ্ঞাত্বা (শাস্ত্রের বিধান বা ব্যবস্থা জানিয়া) কর্ম কর্তুম্ অর্হসি (কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হও)।

ইহ—কর্মাধিকারে বর্তমান থাকিয়া (শ্রীধর); এই লোকে (তিলক); এই কর্মাধিকার-ভূমিতে অর্থাৎ ভারতবর্ষে (শঙ্কর)। ভারতবর্ষ কর্মভূমি, মোক্ষ সাধনার শ্রেষ্ঠ স্থান, দেবগণও এস্থানে জন্মগ্রহণ বাঞ্ছা করেন, শাস্ত্রে নানা স্থানে ইহা উল্লিখিত আছে। যথা—

"জ্ঞেয়ং তদ্ভারতবর্ষং সর্বকর্মফলপ্রদং," "অদ্যাপি দেবা ইচ্ছন্তি জন্ম ভারতভূতলে" ইত্যাদি (বৃহন্নারদীয় পুরাণ ৩।৪৯-৫৬, ৬৯-৭৯ ; অপিচ, ভাগবত ৫।১৯-২১)।

শাস্ত্র—শাস্ত্র বলিতে শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি সকলই বুঝায়। কর্তব্যাকর্তব্য-নির্ণায়ক শাস্ত্রকে ধর্মশাস্ত্র বলে। আধুনিকগণ ইহাকে নীতিশাস্ত্র বলেন। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে নীতিশাস্ত্র বলিতে কেবল রাজনীতিই বুঝায়। উহা ধর্মশাস্ত্রেরই অন্তর্গত।

অতএব কর্তব্য-অকর্তব্য নির্ধারণে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ, সুতরাং তুমি শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থা জানিয়া যথাধিকার কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হও। ২৪

স্থূল কথা এই যে, **স্বধর্মাচরণ** না করিয়া স্বেচ্ছাচারের অনুবর্তী হইলে কামক্রোধাদি ত্যাগ করা যায় না, স্বধর্মাচরণেই সংশুদ্ধি, সম্যক্ জ্ঞান ও মোক্ষ লাভ হয়। তোমার স্বধর্ম কি, সে বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ, সুতরাং শাস্ত্রীয় বিধান মানিয়া তদনুসারে কর্ম কর।

গীতা ও ধর্মশাস্ত্র—৮৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

ষোড়শ অধ্যায়—বিশ্লেষণ ও সার-সংক্ষেপ

দৈব ও আসুর সম্পদ্

১-৩ দৈবী সম্পদ্ বর্ণন—দৈবী প্রকৃতির ছাব্বিশ গুণ, ৪ আসুরী প্রকৃতির লক্ষণ; ৫ দৈবী সম্পদ্ মোক্ষসেতু, আসুরী বন্ধন-হেতু, ৬-২০ আসুরী প্রকৃতির বিস্তারিত বর্ণনা; ২১-২২ নরকের তিন প্রকার দ্বার—কাম, ক্রোধ, লোভ; উহা ত্যাগে শ্রেয়োলাভ; ২৩-২৪ শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘনের দোষ, কার্যাকার্য নির্ণয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ. শাস্ত্রবিধি পালনের উপদেশ।

শ্রীভগবান্ পঞ্চদশ অধ্যায়ের শেষে বলিয়াছেন, যে আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানে, সে-ই জ্ঞানী ও কৃতকৃত্য হয়। কিন্তু নবম অধ্যায়ে সংক্ষেপে বলিয়াছেন যে, আসুরী প্রকৃতির লোক তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ জানে না, তাহারা বিবিধ কামনার বশবর্তী হইয়া দম্ভাদি সহকারে যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান ও ক্ষুদ্র দেবতাদির আরাধনা করে। কিন্তু সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক তাঁহার প্রকৃত তত্ত্ব জানিয়া তাঁহারই ভজন-পূজন করেন (৯।১১।১৪)। দৈব (সত্ত্বপ্রধান) ও আসুরী (রজস্তমোপ্রধান), এই দুই প্রকার স্বভাব বা সম্পদ্ লইয়া জীব জন্মগ্রহণ করে, এই দুই প্রকার স্বভাবের বিস্তারিত বর্ণনা এই অধ্যায়ে করা হইয়াছে।

দৈবী সম্পদ্—প্রথম তিনটি শ্লোকে ভয়াভাব, চিত্তশুদ্ধি, আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা প্রভৃতি দৈবী প্রকৃতির ২৬টি গুণ নির্দেশ করা হইয়াছে। এইগুলি মোক্ষপথের সহায়। অর্জুন দৈবী সম্পদ্ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; সুতরাং শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, তাঁহার শোকের কারণ নাই।

আসুর-প্রকৃতি লোকের স্বভাব। দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নির্দয়তা ও অজ্ঞান—এগুলি আসুরী সম্পদ্ অর্থাৎ রজস্তমোগুণাক্রান্ত লোকের স্বভাব। এ সকল বন্ধনের কারণ। আসুরী প্রকৃতির লোকের ধর্মাধর্ম, কর্তব্যাকর্তব্য-জ্ঞান নাই। তাহারা শৌচ ও সদাচার জানে না, তাহারা সত্য, ধর্ম, শাস্ত্র, গুরু, ঈশ্বর বলিয়া কিছু মানে না। এই সকল বিকৃতমতি, ক্রূরকর্মা অসুরগণ

জগতের বিনাশের জন্যই উৎপন্ন হয়। কামোপভোগই ইহাদের পরম পুরুষার্থ। ইহারা শত শত আশা-পাশে বদ্ধ হইয়া আজীবন বিষয়-সেবায় রত থাকে এবং অসৎ পথ অবলম্বন করিয়া অর্থসংগ্রহে সচেষ্ট হয়। ইহারা সততদম্ভ করিয়া বলে—আমি প্রভু, আমি ধনী, আমি মানী, আমি যজ্ঞ করি, দান করি, আড়ম্বর করি—ইহাদের 'আমিই' সব। এই আত্মশ্লাঘাযুক্ত ধনমানমদান্বিত মূঢ়গণ অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া সর্বভূতের অহিতসাধনে রত হয়। এই মূঢ়মতি আসুর প্রকৃতির লোকগণ পুনঃ পুনঃ আসুরযোনি প্রাপ্ত হয় এবং ক্রমশঃ অধোগতি লাভ করে।

আসুর স্বভাবের মূল কারণ—দম্ভ, দর্প, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি আসুর স্বভাবের যে সকল দোষ উল্লিখিত হইল, কাম ক্রোধ লোভ—এই তিনটিই উহার মূল কারণ। এই তিনটিই নরকের দ্বারস্বরূপ, এই তিনটি ত্যাগ করিতে পারিলেই স্বভাবের সংশোধন হইয়া শ্রেয়োলাভ হয়।

শাস্ত্রবিধির প্রয়োজনীয়তা। কি প্রকারে জীবন পরিচালনা করিলে কাম, ক্রোধ, লোভাদি জয় করিয়া নিজের পারলৌকিক বা আধ্যাত্মিক মঙ্গল ও সমাজের হিতসাধন করা যায়, তাহাই শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে। সমাজের স্বেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণপূর্বক ধর্ম ও লোকরক্ষার উদ্দেশ্যেই শাস্ত্রবিধি প্রবর্তিত হইয়াছে। সুতরাং শাস্ত্রবিহিত কর্ম করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য। ধর্মাধর্ম নির্ণয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ।

[দেশ-কাল-পাত্রভেদে বিভিন্ন সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে শাস্ত্রবিধির পরিবর্তন হয়, এইরূপ পরিবর্তন ব্যতীত সমাজ রক্ষা হয় না, উহাই যুগধর্ম; শাস্ত্রবিধি অনুসারে কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয়ে এদিকেও দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।]

এই অধ্যায়ে দৈব ও আসুর সম্পদের বিস্তারিত বর্ণনা করা হইয়াছে। এই হেতু ইহাকে **দৈবাসুরসম্পদ্-বিভাগযোগ** বলে।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে **দৈবাসুর-সম্পদ্-বিভাগযোগো** নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তদশ অধ্যায়

শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগযোগ

অর্জুন উবাচ

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ।

তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ॥ ১

শ্রীভগবান্ উবাচ

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা ।

সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ২

১। অর্জুনঃ উবাচ—হে কৃষ্ণ, যে (যাহারা) শাস্ত্রবিধিম্ উৎসৃজ্য (শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া) শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ (শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) যজন্তে (যজ্ঞ পূজাদি করে), তেষাং (তাহাদিগের) নিষ্ঠা (অনুরক্তি) কা (কিরূপ)? সত্ত্বং (সাত্ত্বিকী)? রজঃ (রাজসী)? আহো (অথবা) তমঃ (তামসী)?

তিন প্রকার শ্রদ্ধা ১-৪

অর্জুন কহিলেন—হে কৃষ্ণ, যাঁহারা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া (অথচ) শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যাগযজ্ঞ পূজাদি করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের নিষ্ঠা কিরূপ? সাত্ত্বিকী, না রাজসী, না তামসী? ১

অর্জুনের প্রশ্ন—শ্রদ্ধাশীলের নিষ্ঠা কিরূপ? পূর্ব অধ্যায়ের শেষে ১৬।২৩ শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, যাঁহারা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া কর্ম করেন, তাঁহাদের ঐ কর্মে সিদ্ধিলাভ হয় না। কিন্তু এইরূপ অনেক লোক আছেন, যাঁহারা শাস্ত্রবিধি অগ্রাহ্য বা অনাদর করেন না, অথচ অজ্ঞানতাবশতঃ অথবা কষ্টকর মনে করিয়া বা আলস্যবশতঃ শাস্ত্রবিধি যথাযথ পালন করেন না, কিন্তু লৌকিক আচারের অনুবর্তী হইয়া শ্রদ্ধা সহকারে পূজার্চনাদি করিয়া থাকেন। এখন অর্জুন প্রশ্ন করিতেছেন যে, এইসকল শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তির যে নিষ্ঠা, তাহাকে কি বলা যাইবে? সাত্ত্বিকী, না রাজসী, না তামসী? মনে রাখিতে হইবে যে, যাঁহারা অশ্রদ্ধাপূর্বক শাস্ত্র ও ধর্মকে অগ্রাহ্য করেন, এইস্থলে সেই আসুরী প্রকৃতির লোকদিগের কথা বলা হইতেছে না। শ্রদ্ধাশীল লোকেরও প্রকৃতিভেদে শ্রদ্ধা কিরূপ বিভিন্ন হয় এবং ত্রিগুণভেদে আহার, যজ্ঞ, তপ, দান ইত্যাদিও কিরূপ বিভিন্ন হয়, তাহাই এই অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন।

২। শ্রীভগবান্ উবাচ—দেহিনাং (দেহীদিগের) সাত্ত্বিকী, রাজসী চ তামসী চ ইতি ত্রিবিধা এব (এই তিন প্রকার) শ্রদ্ধা ভবতি (আছে); সা (তাহা) স্বভাবজা (স্বাভাবিক, পূর্বজন্মসংস্কারসম্ভূত); তাং শৃণু (তাহা শোন)।

সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ৩
যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪

শ্রীভগবান্ কহিলেন, দেহীদিগের সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী, এই তিন প্রকারের শ্রদ্ধা আছে, উহা স্বভাবজাত অর্থাৎ পূর্বজন্মের সংস্কার-প্রসূত ; তাহা বিস্তারিত বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২

স্বভাব—১১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৩। হে ভারত (অর্জুন) সর্বস্য (সকলের) শ্রদ্ধা (ভক্তি) সত্ত্বানুরূপা (নিজ অন্তঃকরণ-বৃত্তির অনুরূপ) ভবতি (হইয়া থাকে); অয়ং পুরুষঃ (এই জীব) শ্রদ্ধাময়ঃ, যঃ (যিনি) যচ্ছ্রদ্ধঃ (যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত) স এব (সেইরূপই) সঃ (তিনি)।

সত্ত্বানুরূপা—বিশিষ্টসংস্কারোপেতান্তঃকরণানুরূপা (শঙ্কর)—এস্থলে সত্ত্ব শব্দের অর্থ বিশিষ্ট সংস্কারযুক্ত অন্তঃকরণ। ইহাকেই স্বভাব বলে। যাহার অন্তঃকরণে যেরূপ সংস্কার প্রবল, সেই সংস্কারের অনুরূপই তাহার শ্রদ্ধা হইয়া থাকে। পূর্ব শ্লোকের 'স্বভাবজা' এবং এই 'সত্ত্বানুরূপা' একই কথা।

পুরুষঃ—সংসারী জীবঃ (শঙ্কর)।

হে ভারত, সকলেরই শ্রদ্ধা নিজ নিজ অন্তঃকরণ-প্রবৃত্তি বা স্বভাবের অনুরূপ হইয়া থাকে। মনুষ্য শ্রদ্ধাময়; যে যেইরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত, সে সেইরূপই হয়। ৩

এই কথার তাৎপর্য এই যে, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক, এই ত্রিবিধ স্বভাব-ভেদে শ্রদ্ধাও ত্রিবিধ হয়। যে সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাযুক্ত তাহার কর্মও তদনুরূপই হয়। যেমন, সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক দেবতার পূজা করে ইত্যাদি। (পরের শ্লোক)।

কেহ কেহ এই শ্লোকার্ধের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, পুরুষ অর্থাৎ পরমেশ্বর শ্রদ্ধাময়; যে যেইরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত তাহার নিকট তিনি সেইরূপই হন। কিন্তু এই শ্লোকের ভাষায় ঠিক এইরূপ অর্থ ব্যক্ত হয় বলিয়া বোধ হয় না। কোন প্রসিদ্ধ টীকাকারই এইরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই।

৪। সাত্ত্বিকাঃ দেবান্ যজন্তে (পূজা করে); রাজসাঃ যক্ষ-রক্ষাংসি (যক্ষরক্ষোদিগকে), অন্যে তামসাঃ জনাঃ (অন্য তামসিক ব্যক্তিগণ) প্রেতান্ ভূতগণান্ চ যজন্তে।

সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ দেবগণের পূজা করেন, রাজসিক প্রকৃতির ব্যক্তিগণ যক্ষরক্ষদিগের পূজা করেন এবং তামসিক প্রকৃতির ব্যক্তিগণ ভূত-প্রেতের পূজা করিয়া থাকে। ৪

কিন্তু সকাম দেবোপাসনা মিশ্রসাত্ত্বিক (৫৩৩ পৃঃ), উহা শুদ্ধ সাত্ত্বিক আরাধনা নহে, উহাতে রজোগুণের মিশ্রণ আছে। উহাতে কাম্যবস্তু বা দেব-লোকাদি প্রাপ্তি হয়, ভগবৎ-প্রাপ্তি হয় না (৭ ২৩)। নিষ্কামভাবে একমাত্র ভগবানের আরাধনাই শুদ্ধ সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা, ভাগবতে ইহাকেই নির্গুণা শ্রদ্ধা বলা হইয়াছে (ভাগবত ১১।২৫।২৬)।

ত্রিবিধ শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাই উপাসনার প্রাণ; যজ্ঞ, দান, ব্রত-নিয়মাদিরও মুখ্য কথা শ্রদ্ধা। প্রেমভক্তি-পথের প্রথম কথাই শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা হইতে ক্রমে রুচি, রাগ, ভাব ও নির্মল প্রেমের বিকাশ—ভক্তিশাস্ত্র এইরূপ ক্রমোল্লেখ করেন (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১।৪।১১, চরিতামৃত মধ্য ২৩।৯।১০)।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, যাঁহারা শাস্ত্রবিধি জানেন না অথবা মানেন না, অথচ শ্রদ্ধাসহকারে যজ্ঞপূজাদি করেন তাহাদের এই নিষ্ঠা সাত্ত্বিক, রাজসিক, না তামসিক? তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন, শ্রদ্ধাসকলের একই রূপ হয় না, ইহার কারণ, শ্রদ্ধা স্বভাবজা, সত্ত্বানুরূপা অর্থাৎ স্বীয় স্বভাবানুযায়ী যাঁহার অন্তঃকরণের যেইরূপ সংস্কার তাঁহার শ্রদ্ধাও তদনুরূপই হয়। শ্রদ্ধা মনের ধর্ম, মন স্বভাবতঃই অন্ধ, শ্রদ্ধাও অন্ধ; বুদ্ধিদ্বারা চালিত না হইলে উহা অযোগ্য বস্তুতেই শ্রদ্ধা জন্মাইয়া জীবকে অধঃপাতিত করে। পক্ষান্তরে মনে যদি শ্রদ্ধা না থাকে, লোকে যদি কেবল বুদ্ধিদ্বারাই চালিত হয়, তবে কেবল শুষ্ক পাণ্ডিত্য, বিতর্ক ও নাস্তিকতা আনয়ন করে। বুদ্ধিও সাত্ত্বিকাদি-ভেদে ত্রিবিধ (১৮।৩০-৩২) এবং শ্রদ্ধা এই বুদ্ধিকর্তৃক চালিত হয় বলিয়া উহাও ত্রিবিধ হয়। দস্যুগণ নরবলি দিয়া কালীপূজা করে, তাহাদের এই পূজা বা শ্রদ্ধা ঘোর তামসিক, উহা তামসিক বুদ্ধি হইতে জাত; তামসিক বুদ্ধিতে অধর্মই ধর্ম বলিয়া বোধ হয় ('অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা' ১৮।৩২)। কেহ কেহ ছাগমহিষাদি বলিদান করেন, এই শ্রদ্ধা রাজসিক বুদ্ধিপ্রসূত; রাজসিক বুদ্ধি শাস্ত্রাদির প্রকৃত মর্ম যথাযথ বুঝিতে পারে না ('অযথাবৎ প্রজানাতি' (১৮।৩১)। কেহ কেহ আবার ছাগমহিষাদিকে কামক্রোধাদি পাশব বৃত্তির প্রতীকমাত্র বুঝিয়া ঐ সকল রিপুকে বলিদান করাই মায়ের শ্রেষ্ঠ অর্চনা বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা কার্যাকার্য, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি ঠিক ঠিক বুঝেন (১৮।৩০)। ইহাই সাত্ত্বিকবুদ্ধি-প্রসূত সাত্ত্বিকশ্রদ্ধা।

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥ ৬
আহারস্ত্বপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ৭

কিন্তু শ্রদ্ধা যখন স্বভাবানুযায়ী হয়, তখন উহার পরিবর্তন কিরূপে হইতে পারে? সত্ত্বশুদ্ধি বা স্বভাবের পরিবর্তন হইলেই শ্রদ্ধাও শুদ্ধ হয়। রজস্তমোবৃত্তি দমন করিয়া শুদ্ধ সত্ত্বগুণে অবস্থিতি করা সকল সাধনারই উদ্দেশ্য। স্বভাব পরিবর্তন পক্ষে আহারশুদ্ধি, সাধুসঙ্গ প্রভৃতির উপযোগিতা সর্বশাস্ত্রেই কীর্তিত হয়।

৫-৬। দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ (দম্ভ ও অহঙ্কারযুক্ত) কামরাগবলান্বিতাঃ (কাম, আসক্তি ও বলযুক্ত) অচেতসঃ জনাঃ (অবিবেকী ব্যক্তিগণ) শরীরস্থং ভূতগ্রামং (দেহস্থিত পঞ্চভূতসমূহকে) অন্তঃশরীরস্থং মাং চ (এবং শরীরের মধ্যে অবস্থিত আত্মস্বরূপ আমাকে) কর্শয়ন্তঃ (ক্লিষ্ট করিয়া) অশাস্ত্রবিহিতং (শাস্ত্রবিরুদ্ধ) ঘোরং তপঃ তপ্যন্তে (কঠোর তপস্যা আচরণ করে), তান্ (তাহাদিগকে) আসুরনিশ্চয়ান্ (আসুরব্রত, আসুরবুদ্ধিবিশিষ্ট) বিদ্ধি (জানিও)।

শরীরস্থং ভূতগ্রামম্—পৃথিব্যাদি পঞ্চ মহাভূত, যাহাদ্বারা এই শরীর নির্মিত। **আসুরনিশ্চয়ান্**—আসুরো নিশ্চয়ো যেষাং তে—আসুরবুদ্ধিবিশিষ্ট।

আসুরী তপস্যা ৫-৬

দম্ভ, অহঙ্কার, কামনা ও আসক্তিযুক্ত এবং বলগর্বিত হইয়া যে সকল অবিবেকী ব্যক্তি শরীরস্থ ভূতগণকে এবং অন্তর্যামিরূপে দেহমধ্যস্থ আমাকে কৃশ করিয়া (কষ্ট দিয়া) শাস্ত্রবিধিবিরুদ্ধ অত্যুগ্র তপস্যাদি করিয়া থাকে, তাহাদিগকে আসুরবুদ্ধিবিশিষ্ট বলিয়া জানিবে। ৫-৬

৭। সর্বস্য (সকলের, সকল প্রাণীর) আহারঃ তু অপি ত্রিবিধঃ প্রিয়ঃ ভবতি (হয়); তথা (এবং) যজ্ঞঃ তপঃ দানং চ [ত্রিবিধ]; তেষাম্ ইমং ভেদং (তাহাদিগের এই প্রভেদ) শৃণু (শ্রবণ কর)।

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮
কট্‌ম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯

সাত্ত্বিকাদি-ভেদে তিন প্রকার আহার ৭-২০

[প্রকৃতিভেদে] সকলেরই প্রিয় আহারও ত্রিবিধ হইয়া থাকে ; সেইরূপ যজ্ঞ, তপস্যা এবং দানও ত্রিবিধ ; উহাদের মধ্যে যেরূপ প্রভেদ তাহা শ্রবণ কর। ৭

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতিভেদে আহার, যজ্ঞ, তপস্যা এবং দান ত্রিবিধ হয়। এই সকলের প্রভেদ পরবর্তী শ্লোকসমূহে বর্ণিত হইয়াছে।

৮। আয়ুঃসত্ত্ব-বলারোগ্য-সুখ-প্রীতিবিবর্ধনাঃ (আয়ু, উৎসাহ, বল, আরোগ্য, চিত্তপ্রসন্নতা ও রুচি—এ সকলের বৃদ্ধিকর), রস্যাঃ (সরস, মধুর) স্নিগ্ধাঃ (ঘৃতাদি স্নেহযুক্ত) স্থিরাঃ (সারবান্) হৃদ্যাঃ (হৃদয়ানন্দকর) আহারাঃ (আহারসকল) সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ (সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয়)।

সত্ত্ব—উৎসাহ (শ্রীধর) ; স্থৈর্য বা বীর্য (আনন্দগিরি), সাত্ত্বিক বৃত্তি (তিলক)। **হৃদ্য**—যাহা দেখিলেই মন প্রফুল্ল হয়। **স্থির**—সারবান্ (শ্রীধর)—অথবা দেহে যাহার বল বা শক্তি বহু কাল থাকে (শঙ্কর)।

সাত্ত্বিক আহার—যাহা আয়ু, উৎসাহ, বল, আরোগ্য, চিত্ত-প্রসন্নতা ও রুচি—এ সকলের বর্ধনকারী এবং সরস, স্নেহযুক্ত, সারবান্ এবং প্রীতিকর—এইরূপ আহার সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয়। ৮

৯। কট্‌ম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ (অতি কটু, অম্ল, লবণাক্ত, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ ও প্রদাহকারী) দুঃখশোকাময়প্রদাঃ (দুঃখ, শোক ও রোগজনক), আহারাঃ (আহারসকল) রাজসস্য ইষ্টাঃ (রাজস ব্যক্তিগণের প্রিয়)।

অত্যুষ্ণ—অতি উষ্ণ। এই (অতি) শব্দ কটু, অম্ল ও লবণ, এই তিন শব্দের সহিতও প্রযোজ্য (শঙ্কর)। কটু বলিতে ঝাল বোঝায়। কিন্তু পরে তীক্ষ্ণ শব্দ থাকাতে কেহ কেহ 'কটু' অর্থ করেন 'অতি তিক্ত'। **তীক্ষ্ণ**—যেমন লঙ্কা মরিচাদি। **বিদাহী**—যেমন সর্ষপাদি। **রুক্ষ**—যেমন কঙ্গু (কাঙনি ধান্য) প্রভৃতি।

রাজস আহার—অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, বিদাহী এবং দুঃখ, শোক ও রোগ উৎপাদক আহার রাজস ব্যক্তিগণের প্রিয়। ৯

যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥ ১০

১০। যাতযামং (অনেকক্ষণ পূর্বে পাক করা, শৈত্যাবস্থা প্রাপ্ত), গতরসং চ (এবং নির্গতরস), পূতি (দুর্গন্ধ) পর্যুষিতং (পূর্বদিন পক্ক, বাসি) উচ্ছিষ্টম্ অপি চ (এবং অন্যের ভোজনাবশিষ্ট) অমেধ্যং (অপবিত্র) যৎ ভোজনং (যে ভোজন) [তাহা] তামসপ্রিয়ম্ (তামস ব্যক্তিগণের প্রিয়)।

যাতযামং—যাতো যামঃ প্রহরো যস্য (শ্রীধর), যাহা পাক করার পর প্রহর অতীত হইয়াছে, অর্থাৎ যাহা বাসি হইয়া গিয়াছে। **গতরসং**—যাহার রস শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, বা নিষ্কাশিত হইয়াছে অথবা যাহা অতি পক্ক, পোড়া।

তামস আহার—যে খাদ্য বহু পূর্বে পক্ক, যাহার রস শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, যাহা দুর্গন্ধি, পর্য্যুষিত (বাসি), উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র, তাহা তামস ব্যক্তিগণের প্রিয়। ১০

আহার-শুদ্ধি

সর্বপ্রকার সাধনপক্ষেই, বিশেষতঃ ভক্তিমার্গে, আহারশুদ্ধির বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়। শ্রুতি বলেন—'আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ' (ছান্দোগ্য ৭।২৬)—'আহার শুদ্ধ হইলে চিত্ত শুদ্ধ হয়, চিত্ত শুদ্ধ হইলে সেই শুদ্ধ চিত্তে সর্বদা ঈশ্বরের স্মৃতি অব্যাহত থাকে।' শ্রীমৎ রামানুজাচার্য এস্থলে 'আহার' শব্দ খাদ্য অর্থেই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে খাদ্যের ত্রিবিধ দোষ পরিহার করা কর্তব্য। ১ম, **জাতিদোষ** অর্থাৎ খাদ্যের প্রকৃতিগত দোষ—যেমন মদ্য, মাংস, রশুন, পেঁয়াজ ইত্যাদি উত্তেজক খাদ্য পরিত্যাগ করা বিধেয়; ২য়, **আশ্রয়-দোষ**—অর্থাৎ যে ব্যক্তির নিকট হইতে খাদ্য গ্রহণ করা যায়, তাহার দোষে খাদ্যে যে দোষ জন্মে; অশুচি, অতিকৃপণ, আসুর-স্বভাব, কুৎসিত-রোগাক্রান্ত খাদ্যবিক্রেতা, দাতা, পাচক বা পরিবেশনকারী প্রভৃতি এই শ্রেণীর মধ্যে গণ্য। ৩য়, **নিমিত্ত দোষ** অর্থাৎ খাদ্যে ধূলি, ময়লা, কেশ, মুখের লালা ইত্যাদি অপবিত্র দ্রব্যের সংস্পর্শ। এইরূপ দূষিত খাদ্য সর্বথা পরিত্যাজ্য।

কিন্তু শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য এস্থলে 'আহার' শব্দের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন—'আহ্রিয়তে ইতি আহারঃ'—যাহা গ্রহণ করা যায় তাহাই আহার অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়জ্ঞানই আহার। তাঁহার মতে আহারশুদ্ধি অর্থ রাগ, দ্বেষ, মোহ এই ত্রিবিধ দোষবর্জিত হইয়া ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়গ্রহণ।

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ॥ ১১

এইরূপে আসক্তি এবং বিদ্বেষাদি-বিমুক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-বিষয় গ্রহণ করিতে পারিলেই চিত্ত নির্মল ও প্রসন্ন থাকে (গীতা ২৬৪) এবং এইরূপ চিত্তেই ঈশ্বরের স্মৃতি অবিচলিত থাকে।

"এই দুইটি ব্যাখ্যা আপাতবিরোধী বলিয়া বোধ হইলেও উভয়টিই সত্য ও প্রয়োজনীয়। সূক্ষ্ম শরীর বা মনের সংযম মাংস-পিণ্ডময় স্থূল শরীরের সংযম হইতে উচ্চতর কার্য বটে, কিন্তু সূক্ষ্মের সংযম করিতে হইলে অগ্রে স্থূলের সংযম করা বিশেষ আবশ্যক। সুতরাং ইহা যুক্তিসিদ্ধ বোধ হইতেছে যে, খাদ্যাখাদ্যের বিচার মনের স্থিরতারূপ উচ্চাবস্থা লাভের জন্য বিশেষ আবশ্যক। নতুবা সহজে এই স্থিরতা লাভ করা যায় না। কিন্তু আজকাল আমাদের অনেক সম্প্রদায়ে এই আহারাদির বিচারের এত বাড়াবাড়ি, এত অর্থহীন নিয়মের বাঁধাবাঁধি, এই বিষয়ে এত গোঁড়ামি যে, তাঁহারা যেন ধর্মটিকে রান্নাঘরের ভিতর পুরিয়াছেন। এইরূপ ধর্ম এক বিশেষ প্রকার খাঁটি জড়বাদ মাত্র। উহা জ্ঞান নহে, ভক্তিও নহে, কর্মও নহে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ, ভক্তিযোগ

১১। অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ (ফলাকাঙ্ক্ষাহীন ব্যক্তিগণ কর্তৃক) যষ্টব্যম্ এব (যজ্ঞ করাই কর্তব্য) ইতি মনঃ সমাধায় (এইভাবে মনকে সমাহিত করিয়া) বিধিদিষ্টঃ (শাস্ত্রবিধি অনুসারে) যঃ যজ্ঞঃ ইজ্যতে (যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়) সঃ (তাহা) সাত্ত্বিকঃ।

সাত্ত্বিকাদি তিন প্রকার যজ্ঞ ১১-১৩

ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া 'যজ্ঞ করিতে হয় তাই করি' এইরূপ অবশ্য-কর্তব্য বোধে শাস্ত্রবিধি অনুসারে শান্তচিত্তে যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা **সাত্ত্বিক যজ্ঞ**। ১১

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ সাত্ত্বিক যজ্ঞ করিতেই উপদেশ দিয়াছিলেন এবং তিনিও নিষ্কাম ভাবে উহা সম্পন্ন করিয়াছিলেন (১০০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত যুধিষ্ঠির-বাক্য দ্রষ্টব্য)।

১৭।১১-১৩ এই এই তিন শ্লোকে সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ যজ্ঞের কথা বলা হইতেছে।

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্॥ ১২
বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে॥ ১৩
দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।
ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥ ১৪
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥ ১৫

১২। ফলম্ অভিসন্ধায় তু (কিন্তু ফল কামনা করিয়া) অপি চ,দম্ভার্থম্ এব (এবং ধার্মিকত্ব বা নিজ মহত্ত্ব দেখাইবার অহঙ্কারে) যৎ ইজ্যতে (যাহা অনুষ্ঠিত হয়), হে ভরতশ্রেষ্ঠ, তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি (জানিও)।

কিন্তু হে ভরতশ্রেষ্ঠ (অর্জুন), ফল লাভের উদ্দেশ্যে এবং দম্ভার্থে (নিজ ঐশ্বর্য, মহত্ত্ব বা ধার্মিকতা প্রকাশার্থ) যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় তাহাকে **রাজস যজ্ঞ** বলিয়া জানিবে। ১২

১৩। বিধিহীনম্ (শাস্ত্রোক্তবিধিশূন্য) অসৃষ্টান্নং (অন্নদানবিহীন) মন্ত্রহীনম্ (মন্ত্রবর্জিত) অদক্ষিণং (দক্ষিণাহীন) শ্রদ্ধাবিরহিতং (শ্রদ্ধাশূন্য) যজ্ঞং (যজ্ঞকে) তামসং পরিচক্ষতে (তামস বলে)।

শাস্ত্রোক্ত বিধিশূন্য, অন্নদানবিহীন, শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রহীন, দক্ষিণাহীন, শ্রদ্ধাশূন্য যজ্ঞকে **তামস-যজ্ঞ** বলে। ১৩

১৪। দেব-দ্বিজ-গুরু-প্রাজ্ঞপূজনং (দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও বিদ্বান্ ব্যক্তির পূজা), শৌচম্, আর্জবম্ (সরলতা), ব্রহ্মচর্যম্, অহিংসা চ শারীরং তপঃ উচ্যতে (কথিত হয়)।

শৌচ, ব্রহ্মচর্য, অহিংসা—(২১৫-২১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

শারীরাদি ও সাত্ত্বিকাদি-ভেদে ত্রিবিধ তপস্যা ১৪-১৯

দেব, দ্বিজ, গুরু, বিদ্বান্ ব্যক্তির পূজা, শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য, অহিংসা, এই সকলকে **শারীর তপস্যা** বলে। ১৪

১৪।১৫।১৬ শ্লোকে শারীরাদি ভেদে ত্রিবিধ তপস্যার বর্ণনা হইতেছে।

১৫। অনুদ্বেগকরং (অপরুষ, যাহা অন্যের মনঃকষ্টদায়ক হয় না), সত্যং (যথার্থ), প্রিয়হিতং চ (প্রিয় ও হিতজনক) যদ্ বাক্যং (যে বাক্য)

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে॥ ১৬

স্বাধ্যায়াভ্যসনং চ এব (এবং শাস্ত্রাভ্যাস) বাঙ্‌ময়ং তপঃ (বাচিক তপস্যা) উচ্যতে (কথিত হয়)।

যাহা কাহারও উদ্বেগকর হয় না, যাহা সত্য, প্রিয় ও হিতকর এইরূপ বাক্য এবং যথাবিধি শাস্ত্রাভ্যাস—এই সকলকে বাঙ্‌ময় বা **বাচিক তপস্যা** বলা হয়। ১৫

সত্য, প্রিয় এবং হিত-বাক্য—এই সকল কথায় মনু-স্মৃতির প্রসিদ্ধ শ্লোকটির স্মরণ হয়। যথা—

"সত্যং ব্রূয়াৎ, প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াদেষ ধর্মঃ সনাতনঃ॥" —মনু ৪।১৩৮

অপ্রিয় সত্য—উদ্ধৃত শ্লোকে বলা হইতেছে যে, অপ্রিয় সত্য বলা অনুচিত। ইহার অর্থ এই যে, অনর্থক অর্থাৎ বিনা প্রয়োজনে অপ্রিয় কথা সত্য হইলেও প্রকাশ করিবে না। কিন্তু প্রয়োজনানুরোধে লোকহিতার্থ অপ্রিয় সত্যও বলিতে হয়, কিন্তু উহা বলার সৎসাহস সকলের নাই—'অপ্রিয়স্য চ সত্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ'—(মহাভারতে বিদুরবাক্য)—অপ্রিয় সত্য ও হিতবাক্য বলার ও শোনার লোক অতি বিরল।

১৬। মনঃপ্রসাদঃ (চিত্তের প্রসন্নতা) সৌম্যত্বং (অক্রূরতা) মৌনং (মৌনভাব), আত্মবিনিগ্রহঃ (মনঃসংযম), ভাবসংশুদ্ধিঃ (ব্যবহারে অকপটতা অথবা চিত্তশুদ্ধি) ইতি এতৎ (এ সকল) মানসং তপঃ উচ্যতে (কথিত হয়)।

সৌম্যত্বং—অক্রূরতা (শ্রীধর), সৌমনস্যম্—মুখের প্রসন্নতা প্রভৃতি কার্যের দ্বারা অন্তঃকরণের যে বৃত্তিবিশেষ অনুমিত হয় তাহাই সৌম্যত্ব (শঙ্কর); **মৌন**—বাক্‌সংযম, মনঃসংযম হইলেই বাক্‌সংযম সম্ভবপর, এই হেতু ইহা মানস তপের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। অথবা মৌনং মুনের্ভাবঃ মননম্ ইত্যর্থঃ (শ্রীধর), মুনিদিগের উপযুক্ত বৃত্তি বা ভাব, মননাদি। **ভাবসংশুদ্ধি**—পরৈর্ব্যবহারকালেঽমায়াবিত্বং (শঙ্কর, শ্রীধর)—অপরের সহিত ব্যবহার কালে কপটতারাহিত্য; অথবা চিত্তশুদ্ধি।

চিত্তের প্রসন্নতা, অক্রূরতা, বাক্-সংযম, আত্মসংযম বা মনসংযম এবং অন্যের সহিত ব্যবহারে কপটতারাহিত্য, এই সকলকে **মানসিক তপস্যা** বলে। ১৬

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭
সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥ ১৮

১৭। অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ (ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য) **যুক্তৈঃ** (একাগ্রচিত্ত, ঈশ্বরে ভক্তিযুক্ত) নরৈঃ (নরগণ কর্তৃক) পরয়া শ্রদ্ধয়া তপ্তং (পরম শ্রদ্ধা সহকারে অনুষ্ঠিত) তৎ ত্রিবিধং তপঃ (পূর্বোক্ত তিন প্রকারের তপস্যাকে) সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে (সাত্ত্বিক বলে)।

পূর্বোক্ত ত্রিবিধ তপস্যা যদি ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য, ঈশ্বরে একাগ্রচিত্ত ব্যক্তিগণ কর্তৃক পরম শ্রদ্ধা সহকারে অনুষ্ঠিত হয়, তবে তাহাকে **সাত্ত্বিক তপস্যা** বলে। ১৭

পূর্বে তিনটি শ্লোকে কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ তপস্যার বর্ণনা করা হইয়াছে। এই ত্রিবিধ তপস্যার **প্রত্যেকটিই** আবার সাত্ত্বিকাদি ভেদে তিন প্রকার। তাহাই এখন তিনটি শ্লোকে বলা হইতেছে।

১৮। সৎকারমানপূজার্থং (সৎকার, মান ও পূজালাভের জন্য) দম্ভেন চ এব (এবং দম্ভ সহকারে) যৎ তপঃ ক্রিয়তে (যে তপ অনুষ্ঠিত হয়) ইহ (এই লোকে) চলম্ (অনিত্য), অধ্রুবং (অনিশ্চিত) তৎ তপঃ (সেই তপস্যা) রাজসং প্রোক্তং (রাজস বলা হয়)।

সৎকারমানপূজার্থং—সৎকার শব্দের অর্থ সাধুকার অর্থাৎ এই ব্যক্তি বড় সাধু, তপস্বী—এইরূপ যে প্রশংসা-বাক্যাদি (সাধুরয়মিতি তাপসোঽয়মিত্যাদি বাক্পূজা)। **মান**—মানন, অর্থাৎ প্রত্যুত্থান (আসিতে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়ান), অভিবাদন প্রভৃতি দ্বারা সম্মান প্রদর্শন।

পূজা—অর্থাৎ পাদ প্রক্ষালন, আসনাদি দান, ভোজন করান ইত্যাদি।

এইসকল লাভ করিবার জন্যই যে তপস্যা, তাহাকে রাজসিক তপস্যা বলে।

সৎকার, মান ও পূজা লাভ করিবার জন্য দম্ভ সহকারে যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয় এবং ইহলোকে যাহার ফল অনিত্য এবং অনিশ্চিত, তাহাকে **রাজস তপস্যা** বলে। ১৮

এইরূপ তপস্যায় আত্মোন্নতি বা পারলৌকিক কোন স্থায়ী ফল হয় না, কেবল ইহলোকে ক্ষণস্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ হইতে পারে। কিন্তু সেইরূপ প্রতিষ্ঠা লাভও যে হইবে তাহারও নিশ্চয়তা নাই। এই জন্য ইহাকে অনিত্য ও অধ্রুব বলা হইয়াছে।

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তৎ তামসমুদাহৃতম্॥ ১৯
দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥ ২০

১৯। মূঢ়গ্রাহেণ (মূঢ় বুদ্ধিবশে, সদসদ্ বিবেচনা পরিত্যাগপূর্বক) আত্মনঃ পীড়য়া (নিজেকে কষ্ট দিয়া) পরস্য উৎসাদনার্থং বা (অথবা পরের বিনাশার্থ) যৎ তপঃ ক্রিয়তে (যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়), তৎ তামসম্ উদাহৃতম্ (তাহাকে তামস বলে)।

মোহাচ্ছন্নবুদ্ধিবশে নিজের শরীরাদিকেও পীড়া দিয়া অথবা জারণ, মারণাদি অভিচার দ্বারা পরের বিনাশার্থ যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে **তামস তপস্যা** বলে। ১৯

২০। দাতব্যম্ ইতি (দেওয়া কর্তব্য এইরূপ বুদ্ধিতে, কেবল কর্তব্যানুরোধে) অনুপকারিণে (অনুপকারী ব্যক্তিকে) দেশে কালে চ পাত্রে চ (উপযুক্ত দেশে, উপযুক্ত সময়ে এবং উপযুক্ত পাত্রে) যৎ দানং দীয়তে (যে দান করা হয়) তৎ দানং (সেই দান) সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ (সাত্ত্বিক বলিয়া উক্ত হয়)।

সাত্ত্বিকাদি-ভেদে তিন প্রকারের দান ২০-২২

"দান করা উচিত, তাই দান করি" এইরূপ কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে উপযুক্ত দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া অনুপকারী ব্যক্তিকে (অর্থাৎ প্রত্যুপকারের আশা না রাখিয়া) যে দান করা হয়, তাহাকে **সাত্ত্বিক দান** বলে। ২০

সাত্ত্বিক দান কাহাকে বলে?

সাত্ত্বিক দানের তিনটি লক্ষণ এস্থলে উক্ত হইল—(১) স্বর্গাদি কোন রূপ ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া 'দান করিতে হয় তাই দান করি' এইরূপ নিষ্কাম বুদ্ধিতে দান করিবে। (২) যে পূর্বে উপকার করিয়াছে অথবা যে পরে প্রত্যুপকার করিতে পারে এইরূপ ব্যক্তিকে দান করিলে তাহা সাত্ত্বিক হয় না, কারণ প্রকৃতপক্ষে উহা দান নহে, উহা আদান প্রদান অর্থাৎ বিনিময় বা বাণিজ্য। (৩) উপযুক্ত দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া দান করিতে হইবে। উপযুক্ত দেশ, কাল ও পাত্র কিরূপ? যেমন যে গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব, তথায়ই পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠায় জলদানের ফল হয়, বড় সহরে উহার কোন প্রয়োজন নাই। এইরূপ হইল দেশের বিচার। কলেরার প্রাদুর্ভাবমাত্রেই

ঔষধ দানের ব্যবস্থা করা বিধেয়, পূর্বে বা পরে উহাতে অর্থব্যয় করা নিষ্ফল। এইরূপ কালের বিচার। অভাবগ্রস্ত বিপন্ন ব্যক্তিকেই দান করিতে হয়, অর্থশালীকে দান করা নিষ্ফল। এইরূপ হইল পাত্রের বিচার। বস্তুতঃ সকল কর্মই দেশকালপাত্র বিবেচনা করিয়াই করিতে হয়, নচেৎ নিষ্ফল হয়; ইহার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু প্রাচীন টীকাকারগণ সকলেই দেশ-কালাদির অর্থ কিছু সঙ্কীর্ণ ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, দেশে অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রাদি পুণ্যক্ষেত্রে, কালে অর্থাৎ সংক্রান্তি গ্রহণাদি পুণ্যকালে, পাত্রে অর্থাৎ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণাদিকে (শঙ্কর)।

কিন্তু আধুনিকগণ ঠিক এইরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থ অনুমোদন করেন না। এই সকল ব্যাখ্যা সম্বন্ধে মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"সর্বনাশ! আমি যদি স্বদেশে বসিয়া (অর্থাৎ পুণ্যক্ষেত্রাদিতে নয়) ১লা হইতে ২৯শে তারিখের মধ্যে (অর্থাৎ সংক্রান্তিতে নয়) কোন দিনে অতি দীনদুঃখী, পীড়ায় কাতর একজন মুচি বা ডোমকে (অর্থাৎ ব্রাহ্মণদিগকে নয়) কিছু দান করি, তবে সে দান ভগবদভিপ্রেত দান হইল না। এইরূপে কখন কখন ভাষ্যকারদিগের বিচারে অতি উন্নত, উদার ও সার্বভৌমিক যে ধর্ম তাহা অতি সঙ্কীর্ণ এবং অনুদার উপধর্মে পরিণত হইয়াছে। ইহারা যাহা বলেন তাহা ভগবদ্বাক্যে নাই, স্মৃতিশাস্ত্রে আছে। কিন্তু বিনা বিচারে ঋষিদিগের বাক্যসকল মস্তকের উপর এতকাল বহন করিয়া এই বিশৃঙ্খলা, অধর্ম ও দুর্দশায় আসিয়া পড়িয়াছি। এখন আর বিনা বিচারে বহন কর্তব্য নহে।"

প্রকৃত পক্ষে এ বিষয়ে ঋষিশাস্ত্রের কোনরূপ অনুদারতা নাই। শাস্ত্রের মর্ম বুঝিবার বা বুঝাইবার ত্রুটীতে আমাদের দুর্দশা। শাস্ত্রে দীনদুঃখী, আর্ত, পীড়িত, অভ্যাগত, এমন কি পশুপক্ষী, বৃক্ষলতাদির পর্যন্ত ধারণ-পোষণের ব্যবস্থা আছে। সর্বভূতের রক্ষাই গার্হস্থ্য ধর্ম, ইহাই শাস্ত্রের অনুশাসন। তবে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দান সর্বশ্রেষ্ঠ দান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, ইহাতে অযৌক্তিকতা বা অনুদারতা কিছু নাই। ব্রাহ্মণগণই হিন্দু-সমাজের প্রতিষ্ঠা ও বর্ণাশ্রম ধর্মাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা রাজত্ব, প্রভুত্ব, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যাদি অর্থাগমের যাবতীয় কর্মেই অন্য জাতির অধিকার দিয়াছেন, নিজেরা উঞ্ছবৃত্তি বা অযাচিত দানের (প্রতিগ্রহ) উপর নির্ভর করিয়া সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনে সন্তুষ্ট থাকিয়া সমাজে ধর্ম (যজন-যাজন) ও জ্ঞান (অধ্যয়ন, অধ্যাপনা) বিস্তারের ভার লইয়াছেন। ঈদৃশ পরার্থপর ত্যাগী ব্রাহ্মণজাতির রক্ষাকল্পে শাস্ত্রের যে সকল ব্যবস্থা তাহা যে সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত ও সমাজরক্ষার অনুকূল

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্॥ ২১
অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতম্ তৎ তামসমুদাহৃতম্॥ ২২

তাহা কে অস্বীকার করিবে? আবার, বেদজ্ঞানহীন নিরগ্নি (অর্থাৎ স্বধর্ম পালনে পরাঙ্মুখ) দ্বিজবন্ধুদিগকে দান করিলে নিরয়গামী হইতে হয়, শাস্ত্রে এমন কঠোর অনুশাসনও রহিয়াছে। সুতরাং ঋষিশাস্ত্রের অনুদারতা বা পক্ষপাতিতা কোথাও নাই।

গ্রহণাদি সময়ে বা পুণ্যক্ষেত্রাদিতে লোকের সাত্ত্বিক ভাব বৃদ্ধি হওয়ারই সম্ভাবনা থাকে, এই হেতু সেই কাল বা স্থান-দানাদি কর্মে প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকিবে, কেননা দানাদি কর্ম সাত্ত্বিক শ্রদ্ধার সহিত নিষ্পন্ন না হইলে নিষ্ফল হয় (গীতা ১৭।২৮)। কিন্তু কাল পরিবর্তনে ব্রাহ্মণজাতির ব্রাহ্মণত্ব বা তীর্থক্ষেত্রাদির মাহাত্ম্য যদি লোপ পায় এবং তদ্দরুণ লোকের ভক্তিশ্রদ্ধার যদি ব্যত্যয় ঘটে, তবে এই সকল বিধি-ব্যবস্থার কোন মূল্য থাকে না, তাহা বলাই বাহুল্য। সে স্থলে শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম ও উদ্দেশ্য বুঝিয়া তদনুসারে কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় করাই শ্রেয়কল্প, সংস্কারবশতঃ প্রাণহীন অনুষ্ঠান লইয়া বসিয়া থাকিলে ক্রমশঃ অধোগতি সুনিশ্চিত।

২১। পুনঃ যৎ তু (পরন্তু যাহা) প্রত্যুপকারার্থং (প্রত্যুপকারের আশায়) বা ফলম্ উদ্দিশ্য (অথবা স্বর্গাদি ফল কামনায়) পরিক্লিষ্টং (চিত্তক্লেশ সহকারে, বড় কষ্টের সহিত অনিচ্ছা সত্ত্বে) দীয়তে (দেওয়া হয়), তদ্দানং (সেই দান) রাজসং স্মৃতম্ (কথিত হয়)।

পরন্তু প্রত্যুপকারের আশায় অথবা স্বর্গাদি ফল কামনায় অতি কষ্টের সহিত যে দান করা হয়, তাহাকে **রাজস দান** বলে। ২১

২২। অদেশকালে (অনুপযুক্ত দেশে ও কালে) অপাত্রেভ্যঃ চ (এবং অপাত্রে) যৎ দানং দীয়তে (যে দান করা হয়) [এবং] অসৎকৃতং (বিনা সৎকারে) অবজ্ঞাতং (অবজ্ঞাসহকারে) [যদ্দানং দীয়তে (যে দান করা হয়)] তৎ তামসম্ উদাহৃতম্ (তাহাকে তামস বলে)।

অসৎকৃতম্—সৎকারশূন্য অর্থাৎ প্রিয় বচন, আদর-অভ্যর্থনাদি শিষ্টাচারশূন্য। দেশ, কাল পাত্র সম্বন্ধে ২০শ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

অনুপযুক্ত দেশে, অনুপযুক্ত কালে এবং অনুপযুক্ত পাত্রে যে দান এবং (উপযুক্ত দেশকালপাত্রে প্রদত্ত হইলেও) সৎকারশূন্য এবং অবজ্ঞাসহকারে কৃত যে দান, তাহাকে **তামস দান** বলে। ২২

ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥ ২৩
তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্॥ ২৪
তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ॥ ২৫

২৩। ওঁ তৎ সৎ ইতি ত্রিবিধঃ (এই তিন প্রকার) ব্রহ্মণঃ নির্দেশঃ (ব্রহ্মের নাম নির্দেশ) স্মৃতঃ (শাস্ত্রে উক্ত অথবা বেদবিদ্‌গণ কর্তৃক চিন্তিত হয়); তেন (তদ্দ্বারা) ব্রাহ্মণাঃ চ বেদাঃ চ যজ্ঞাঃ পুরা (পূর্বকালে) বিহিতাঃ (সৃষ্ট হইয়াছে)।

যজ্ঞদানাদি কর্মে ব্রহ্মনির্দেশ ২৩-২৮

(শাস্ত্রে) 'ওঁ তৎ সৎ' এই তিন প্রকারে পরব্রহ্মের নাম নির্দেশ করা হইয়াছে-; এই নির্দেশ হইতেই পূর্বকালে বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সৃষ্ট হইয়াছে। ২৩

২৪। তস্মাৎ (সেই হেতু) ওম্ ইতি উদাহৃত্য (ওঁ এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া) ব্রহ্মবাদিনাং (ব্রহ্মবাদিগণের) বিধানোক্তাঃ (শাস্ত্রোক্ত) যজ্ঞদান-তপঃক্রিয়াঃ (যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি কর্ম) সততং প্রবর্ত্তন্তে (সর্বদা অনুষ্ঠিত হয়)।

এই হেতু ব্রহ্মবাদিগণের যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি শাস্ত্রোক্ত কর্ম সর্বদা 'ওঁ' উচ্চারণ করিয়া অনুষ্ঠিত হয়॥ ২৪

এই হেতু, অর্থাৎ সৃষ্টির প্রারম্ভেই পরব্রহ্ম হইতে যজ্ঞাদি উৎপন্ন হইয়াছে এবং 'ওঁ' এই শব্দ ব্রহ্মবাচক বলিয়া, ব্রহ্মবিদ্‌গণের যজ্ঞাদি কর্ম উহা উচ্চারণ করিয়াই অনুষ্ঠিত হয়।

২৫। তৎ ইতি (তৎ এই শব্দ) [উচ্চারণ করিয়া] মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ (মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ কর্তৃক) ফলম্ অনভিসন্ধায় (ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া) বিবিধাঃ যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ দানক্রিয়াঃ চ (বিবিধ যজ্ঞতপ-ক্রিয়া ও দানকর্ম) ক্রিয়ন্তে (অনুষ্ঠিত হয়)।

যাঁহারা মোক্ষ কামনা করেন, তাঁহারা ফল কামনা ত্যাগ করিয়া 'তৎ' এই শব্দ উচ্চারণপূর্বক বিবিধ যজ্ঞ তপস্যা এবং দানক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন। ২৫

'তৎ' শব্দও ব্রহ্মবাচক। উহা পরম পবিত্র ও চিত্তশুদ্ধিকর। সুতরাং নিষ্কাম কর্মমাত্রই এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া অনুষ্ঠিত হয়।

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে॥ ২৬
যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে॥ ২৭

২৬। হে পার্থ, সদ্ভাবে (আছে এই অর্থে অর্থাৎ অস্তিত্ব বুঝাইতে) সাধুভাবে চ (এবং শ্রেষ্ঠ অর্থ বুঝাইতে) সৎ ইতি এতৎ (সৎ এই শব্দ) প্রযুজ্যতে (প্রযুক্ত হয়), তথা প্রশস্তে কর্মণি এব (মঙ্গলজনক কার্যে) সৎ শব্দঃ যুজ্যতে (সৎ শব্দ ব্যবহৃত হয়)।

সদ্ভাব—সদ্ভাব অর্থাৎ থাকার ভাব বা অস্ত্যর্থে। শঙ্কর বলেন—'অসতঃ সদ্ভাবে যথা অবিদ্যমানস্য পুত্রস্য জন্মনি'। অসতের সদ্ভাব; যেমন—পুত্র ছিল না, পুত্র হইলে পুত্রের সদ্ভাব হইয়াছে বলা যায়।

হে পার্থ, সদ্ভাব ও সাধুভাবে অর্থাৎ কোন বস্তুর অস্তিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব নির্দেশার্থ সৎ শব্দ প্রযুক্ত হয়; এবং (বিবাহাদি) মঙ্গল কর্মেও সৎ শব্দ ব্যবহৃত হয়। ২৬

২৭। যজ্ঞে, তপসি (তপস্যায়) দানে চ স্থিতিঃ (নিষ্ঠা, তৎপর হইয়া থাকা) সৎ ইতি চ উচ্যতে (সৎ বলিয়া কথিত হয়), তদর্থীয়ং কর্ম চ (ঐ সকলের উদ্দেশ্যে যে কর্ম তাহাও) সৎ ইতি এব অভিধীয়তে (সৎ বলিয়া কথিত হয়)।

তদর্থীয়ং কর্ম—তপঃ ও দানের উদ্দেশ্যে যে সকল কর্ম করা হয়; অথবা ঈশ্বরের উদ্দেশে যে কিছু কর্ম করা হয় (শঙ্কর)।

যজ্ঞ, তপস্যা ও দানে স্থিতি অর্থাৎ নিষ্ঠা বা তৎপর হইয়া থাকাকেও সৎ বলে এবং এই সকলের জন্য যে কিছু কর্ম করিতে হয় তাহাও সৎ বলিয়া কথিত হয়। ২৭

১৭।২৪ শ্লোকে ব্রহ্মবাদিগণের যজ্ঞ, দান ও তপঃক্রিয়ার কথা বলা হইয়াছে; উহাতে ওঁ প্রযোজ্য। ১৭।২৫শ শ্লোকে নিষ্কাম কর্মীদিগের যজ্ঞাদির কথা বলা হইয়াছে। উহাতে তৎ শব্দ প্রযোজ্য। ১৭।২৬ শ্লোকে যে কোন সৎকর্ম ও বিবাহাদি প্রশস্ত কর্ম এবং ১৭ ২৭ শ্লোকে সকাম যজ্ঞাদির কথা বলা হইয়াছে। উহাতেও সৎ শব্দ প্রযোজ্য। কারণ উহা সকাম হইলেও মোক্ষানুকূল।

ওঁ তৎ সৎ। ওঁ তৎ সৎ—এই তিনটিই ব্রহ্মবাচক। তিনটির পৃথক্‌ও ব্যবহার হয়, এক সঙ্গেও প্রয়োগ হয়। ওঁ (অ-উ-ম্) বা প্রণব, গূঢ়াক্ষররূপী বৈদিক মন্ত্র।

ঋষিশাস্ত্রে ইহার নানারূপ ব্যাখ্যা আছে। (ছান্দো ১।১, মৈত্র্য ৬।৩।৪, মাণ্ডু ১।১২ ইত্যাদি)। যথা—

ওঁ॥ ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্বং তস্যোপব্যাখ্যানং ভূতং ভবদ্‌ভবিষ্যদিতি সর্বমোঙ্কার এব। যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব ॥ ১ ॥—"ওঁ এই অক্ষরটিই এই সমস্ত (জগৎ); তাহার উপব্যাখ্যা—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সমস্ত ওঙ্কার। ত্রিকালাতীত যে অন্য পদার্থ অর্থাৎ ব্রহ্ম, তাহাও ওঙ্কার।" (মাণ্ডুক্য)।

এইরূপ 'তৎ' এবং 'সৎ' শব্দও ব্রহ্মবাচক। যথা—'তৎ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম' 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ' (ছান্দো ৯।২।১)। আবার 'ওঁ তৎ সৎ' এই তিনটি একত্রও ব্রহ্ম নির্দেশার্থ ব্যবহৃত হয়। এই মন্ত্রের নানারূপ ব্যাখ্যা আছে। লোকমান্য তিলক ইহার এইরূপ অর্থ করেন—"ওঁ গূঢ়াক্ষররূপী বৈদিক মন্ত্র। 'তৎ' তাহা অর্থাৎ দৃশ্য জগতের অতীত দূরবর্তী অনির্বাচ্য তত্ত্ব; এবং 'সৎ' অর্থাৎ চক্ষুর সম্মুখস্থ দৃশ্য জগৎ; এই তিন মিলিয়া সমস্তই ব্রহ্ম, ইহাই এই সঙ্কল্পের অর্থ (গীতা ৩২০ পৃঃ (৪) দ্রষ্টব্য)।"

এস্থলে বলা হইতেছে যে,—'ওঁ তৎ সৎ' এই ব্রহ্মনির্দেশ হইতে ব্রাহ্মণাদি কর্তা, করণরূপ বেদ এবং কর্মরূপ যজ্ঞ সৃষ্টি হইয়াছে। ইহারই নাম শব্দব্রহ্মবাদ। এই ওঙ্কারই জগতের অভিব্যক্তির আদি কারণ শব্দব্রহ্ম। ইহার নাম স্ফোট। স্ফোট হইতে কিরূপে জগৎ সৃষ্টি হইল তাহা শ্রীমদ্ভাগবত এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

সমাধিমগ্ন পরমেষ্ঠি ব্রহ্মার হৃদাকাশ হইতে প্রথমতঃ নাদ উৎপন্ন হইল। অতঃপর সেই নাদ হইতে ত্রিমাত্র ওঙ্কার উৎপন্ন হইল। তাহা সপ্রকাশ পরমাত্মা ব্রহ্মের সাক্ষাদ্‌বাচক শব্দ এবং সমস্ত বৈদিক মন্ত্রোপনিষদের নিত্য বীজস্বরূপ। প্রথমতঃ সেই অব্যক্ত ওঙ্কারের অকার, উকার, মকার এই তিন বর্ণ প্রকাশ পাইল এবং উহা হইতে ক্রমশঃ সত্ত্বাদি গুণ, ঋগাদি বেদ, ভূর্ভুবাদি লোক অর্থাৎ জগৎপ্রপঞ্চ সৃষ্ট হইল।(ভাগবত ১২।৬।৩৩-৩৭)

"ভারতীয় দর্শনমতে সমুদয় জগৎ নামরূপাত্মক।...এই ব্যক্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎই রূপ, ইহার পশ্চাতে অনন্ত অব্যক্ত স্ফোট রহিয়াছে; স্ফোট অর্থ সমুদয় জগতের অভিব্যক্তির কারণ শব্দব্রহ্ম। সমুদয় নাম বা ভাবের নিত্য সমবায়ী উপাদানস্বরূপ নিত্য স্ফোটই সেই শক্তি যদ্দ্বারা ভগবান্ এই জগৎ সৃজন করেন; শুধু তাহাই নহে, ভগবান্ প্রথমতঃ আপনাকে স্ফোটরূপে পরিণত করেন। এই স্ফোটের একমাত্র বাচক শব্দ ওঁ।"—স্বামী বিবেকানন্দ॥

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮

কর্মে ব্রহ্মনির্দেশ। পূর্বে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মবাচক স্ফোটরূপী ওঙ্কার হইতেই জগতের সৃষ্টি। জগতের ধারণ-পোষণের জন্য যজ্ঞসৃষ্টি। যজ্ঞ শব্দে ব্যাপক অর্থে চাতুর্বর্ণ্যের আচরণীয় সমস্ত কর্ম বুঝায়। এই যজ্ঞ-কর্মের ব্যবস্থাই বেদে আছে এবং যজ্ঞরক্ষার ভার প্রধানতঃ ব্রাহ্মণের উপর। ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ পরব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে ; সুতরাং ব্রহ্মবাচক 'ওঁ তৎ সৎ' এই সঙ্কল্পই সমগ্র সৃষ্টির মূল। যজ্ঞ বা কর্মদ্বারাই সৃষ্টিরক্ষা হয়, সুতরাং 'ওঁ তৎ সৎ' এই সঙ্কল্প দ্বারাই সমস্ত কর্ম করিতে হয়। ইহার স্থূল মর্ম এই যে, সর্বকর্মই পরমাত্মাকে স্মরণ করিয়া ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে করিবে অর্থাৎ কর্মকে ব্রহ্মকর্মে পরিণত করিবে, তাহা ত্যাগ করিবে না। কর্মে ব্রহ্মনির্দেশ দ্বারা এই তত্ত্বই পরিস্ফুট করা হইয়াছে। গীতায় কর্মযোগ-মার্গের আলোচনায় এই কথাটি প্রণিধানযোগ্য। ইহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, গীতা বৈদিক যাগযজ্ঞ ত্যাগ করিতে বলেন না, অথবা নিবৃত্তিমূলক সন্ন্যাসবাদও প্রচার করেন না, নিষ্কামভাবে ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে যথাপ্রাপ্ত কর্ম করিতে হইবে ইহাই গীতার উপদেশ।

"ইহা হইতে সিদ্ধ হইতেছে যে, যে কর্মের ব্রহ্মনির্দেশেই সমাবেশ হয় এবং যাহা ব্রহ্মদেবের সঙ্গেই উৎপন্ন হইয়াছে (৩।১০) এবং যাহা কেহ ছাড়িয়া থাকিতেও পারে না, সেই কর্ম ছাড়িয়া দেওয়ার উপদেশ করা অনুচিত। 'ওঁ তৎ সৎ' রূপ ব্রহ্মনির্দেশের উক্ত কর্মযোগ-প্রধান অর্থকে এই অধ্যায়েই, কর্ম-বিভাগের সঙ্গেই, ব্যাখ্যা করিবার হেতুও উহাই। (গীতারহস্য, লোকমান্য তিলক)

২৮। হে পার্থ, **অশ্রদ্ধয়া** (অশ্রদ্ধাপূর্বক কৃত) হুতং (হোম) দত্তং (দান), তপ্তং তপঃ (অনুষ্ঠিত তপস্যা), যৎ চ কৃতং (এবং অন্য যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয়) [সে সমস্ত] অসৎ ইতি উচ্যতে (অসৎ বলিয়া উক্ত হয়)। তৎ (তাহা) ন ইহ (না ইহলোকে) নো [ন+উ] প্রেত্য (না পরলোকে) [ফল দান করে]।

হে পার্থ, হোম, দান, তপস্যা বা অন্য কিছু যাহা অশ্রদ্ধাপূর্বক অনুষ্ঠিত হয়, সে সমুদয় অসৎ বলিয়া কথিত হয়। সে সকল না ইহলোকে ন পরলোকে ফলদায়ক হয়। ২৮

সপ্তম অধ্যায়—বিশ্লেষণ ও সার-সংক্ষেপ

শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ যোগ

১—৪ অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ত্রিবিধ শ্রদ্ধা বর্ণন ; ৫—৬ আসুরী-তপস্যা ; ৭—১০ সাত্ত্বিকাদি-ভেদে ত্রিবিধ আহার ; ১১—১৩ ত্রিবিধ যজ্ঞ ; ১৪—১৬ শারীরাদি-ভেদে ত্রিবিধ তপস্যা ; ১৭—১৯ উহারা প্রত্যেকে সাত্ত্বিকাদি-ভেদে ত্রিবিধ ; ২০—২২ সাত্ত্বিকাদি ভেদে ত্রিবিধ দান ; ২৩—২৭ যজ্ঞ-দানাদি কর্মে ব্রহ্ম-নির্দেশ ; ২৮ অশ্রদ্ধাসহ কৃত যজ্ঞ-দানাদি অসৎ ও নিষ্ফল।

পূর্ব অধ্যায়ের শেষে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, কার্যাকার্য-নির্ণয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ। কিন্তু অনেকে শাস্ত্র অমান্য না করিলেও অজ্ঞানতা বা আলস্যবশতঃ শাস্ত্রবিধির অনুবর্তন করে না, অথচ শ্রদ্ধাপূর্বক পূজার্চনাদি করে। ইহাদের নিষ্ঠা কিরূপ, সাত্ত্বিক, রাজসিক না তামসিক, ইহাই এক্ষণে অর্জুনের প্রশ্ন।

শ্রদ্ধা ত্রিবিধ। তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন যে, মনুষ্যের শ্রদ্ধা স্বভাবজাত অর্থাৎ পূর্বজন্মের সংস্কার-প্রসূত ; সুতরাং যাহার অন্তঃকরণের যেরূপ সংস্কার তাহার শ্রদ্ধাও সেইরূপই হয়। সাত্ত্বিকাদি গুণভেদে জীবের ত্রিবিধ স্বভাব হয় ; সুতরাং তাহার শ্রদ্ধাও স্বভাব-ভেদে সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক এইরূপ ত্রিবিধ হয়। সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি দেবতার পূজা করে, রাজসিক প্রকৃতির লোক যক্ষরক্ষাদির পূজা করে, তামসিক প্রকৃতির লোক ভূতপ্রেতের পূজা করে। [কিন্তু শাস্ত্রোজ্জ্বলা বুদ্ধিদ্বারা যদি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা মার্জিত হয় তবে উহা বিশুদ্ধ হইয়া একমাত্র ঈশ্বরে অর্পিত হয়।]

ত্রিবিধ আহারাদি। শ্রদ্ধা যেরূপ ত্রিবিধ, সেইরূপ আহার, যজ্ঞ, তপস্যা এবং দানও প্রকৃতিভেদে ত্রিবিধ হয়। ৭ম-২৩শ শ্লোকে এই সকল বর্ণিত হইয়াছে।

কর্মে ব্রহ্মনির্দেশ। ব্রাহ্মণাদি প্রজাসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই প্রজারক্ষার জন্য যজ্ঞাদি কর্মেরও সৃষ্টি হইয়াছে। পরব্রহ্ম হইতে এ সকলের উদ্ভব। 'ওঁ তৎ সৎ' ব্রহ্মবাচক সঙ্কল্প। সুতরাং স্বধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের যজ্ঞ, দান, তপস্যাদি শাস্ত্রোক্ত সমস্ত কর্মই 'ওঁ' এই ব্রহ্মবাচক সঙ্কল্প করিয়া সম্পন্ন করা কর্তব্য। মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি যে নিষ্কাম কর্ম করেন তাহাতে ব্রহ্মবাচক 'তৎ' এই সঙ্কল্প প্রযোজ্য। 'সৎ' শব্দে ব্রহ্মও বুঝায় এবং 'অস্তিত্ব' ও 'সাধুতা'ও বুঝায়। নিষ্কাম না হইলেও লোক-রক্ষার অনুকূল বিবাহাদি পবিত্র শুভকর্মে 'সৎ' শব্দ প্রযোজ্য, কেননা শাস্ত্রানুসারে কৃত সৎকর্মেরও ব্রহ্মেই সমাবেশ হয়।

শ্রদ্ধাই যজ্ঞদানতপস্যাদি ধর্মকর্মের প্রাণস্বরূপ ; শ্রদ্ধার সহিত সম্পন্ন হইলেই ঐ সকল কল্যাণকর সৎকর্ম বলিয়া উক্ত হয়। অশ্রদ্ধা-সহকারে কৃত যজ্ঞদানাদি যে কোন কর্ম, তাহা অসৎ কর্ম বলিয়া গণ্য। উহা কি ইহকালে কি পরকালে কুত্রাপি ফলদায়ক হয় না।

এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ শ্রদ্ধার স্বরূপ এবং উহার ত্রিবিধ ভেদ বর্ণিত হইয়াছে। এই জন্য ইহাকে **শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগযোগ** বলে।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে **শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগযোগো** নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টাদশ অধ্যায়

মোক্ষযোগ

অর্জুন উবাচ

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন ॥ ১

শ্রীভগবান্ উবাচ

কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২

১। অর্জুনঃ উবাচ—হে মহাবাহো, হে হৃষীকেশ, হে কেশিনিসূদন, সন্ন্যাসস্য ত্যাগস্য চ তত্ত্বং (সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব) পৃথক্ বেদিতুম্ (পৃথক্‌রূপে জানিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি)।

কেশিনিসূদন—শ্রীকৃষ্ণ ব্রজলীলায় কেশী নামক অসুরকে বধ করিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার নাম কেশিনিসূদন।

সন্ন্যাস ও ত্যাগের ব্যাখ্যা—যজ্ঞাদি নিষ্কাম ভাবে কর্তব্য ১-৬

অর্জুন কহিলেন—হে মহাবাহো, হে হৃষীকেশ, হে কেশিনিসূদন, সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব কি, তাহা পৃথক্ ভাবে জানিতে ইচ্ছা করি। ১

সন্ন্যাস এবং ত্যাগ এই দুইটির ধাত্বর্থ একই। উভয়ের অর্থই পরিত্যাগ করা, ছাড়া। কিন্তু 'সন্ন্যাস' শব্দের একটি বিশেষ অর্থ এই যে, সর্বকর্ম ত্যাগ করিয়া চতুর্থ আশ্রম অবলম্বন করা। এই চতুর্থাশ্রম শাস্ত্রবিহিত এবং সন্ন্যাস অবলম্বন ব্যতীত মোক্ষলাভ হয় না, এই মতও সুপ্রচলিত। অর্জুনও মনে করিয়াছিলেন, শ্রীভগবান্ অবশ্য এই কথা শেষে বলিবেন। কিন্তু তিনি এ পর্যন্ত কোথাও কর্মত্যাগের উপদেশ দিলেন না। তিনি আরও এই কথা বলিলেন যে, যিনি আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেন তিনিই নিত্যসন্ন্যাসী। সেই জন্যই অর্জুন প্রশ্ন করিলেন যে, তিনি ত্যাগ ও সন্ন্যাস এই শব্দ দুইটি কি অর্থে ব্যবহার করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে অর্থগত কোন পার্থক্য আছে কিনা এবং থাকিলে, তাহা কি? এই কথার উত্তরেই শ্রীভগবান্ কর্মযোগ-মার্গের সারার্থ পুনরায় স্পষ্টীকৃত করিয়া গীতাশাস্ত্রের উপসংহার করিয়াছেন।

২। শ্রীভগবান্ উবাচ—কবয়ঃ (পণ্ডিতগণ) কাম্যানাং কর্মণাং (কাম্য কর্মসকলের) ন্যাসং (ত্যাগকে) সন্ন্যাসং বিদুঃ (সন্ন্যাস বলিয়া জানেন) বিচক্ষণাঃ (বিচক্ষণ, তত্ত্বদর্শিগণ) সর্বকর্মফলত্যাগং (সর্ববিধ কর্মের ফল ত্যাগকে) ত্যাগং প্রাহুঃ (ত্যাগ বলেন)।

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩
নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্তিতঃ ॥ ৪
যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ৫

শ্রীভগবান্ বলিলেন—কাম্য কর্মের ত্যাগকেই পণ্ডিতগণ সন্ন্যাস বলিয়া জানেন ; এবং সমস্ত কর্মের ফল-ত্যাগকেই সূক্ষ্মদর্শিগণ ত্যাগ বলিয়া থাকেন। ২

কাম্য কর্মের ত্যাগই সন্ন্যাস। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতগণ বলেন যে, সকল কর্মের ফল-ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ ; সুতরাং যিনি ফল ত্যাগ করেন, তিনি কর্ম করিলেও প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাসী (৬।১-২ দ্রষ্টব্য)।

৩। একে মনীষিণঃ (কোন কোন পণ্ডিতগণ) কর্ম দোষবৎ (কর্ম দোষযুক্ত) ইতি ত্যাজ্যং (এই হেতু ত্যাজ্য) প্রাহুঃ (বলেন) ; অপরে চ (অপর কেহ কেহ) যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যম্ ইতি (ত্যাজ্য নহে, এইরূপ বলেন)।

কোন কোন পণ্ডিতগণ (সাংখ্য পণ্ডিতগণ) বলেন যে, কর্মমাত্রই দোষযুক্ত, অতএব ত্যাজ্য ; অন্য কেহ কেহ (মীমাংসকগণ) বলেন যে, যজ্ঞ, দান ও তপঃকর্ম ত্যাজ্য নহে। ৩

৪। হে ভরতসত্তম, তত্র ত্যাগে (সেই ত্যাগ বিষয়ে) মে নিশ্চয়ং (আমার সিদ্ধান্ত) শৃণু (শুন) ; হে পুরুষব্যাঘ্র, ত্যাগং হি ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্তিতঃ (কথিত হইয়াছে)।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ, ত্যাগ বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর; হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, ত্যাগ ত্রিবিধ বলিয়া কথিত হইয়াছে। (পরের ৭-৯ শ্লোক)। ৪

৫। যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যম্ (ত্যাজ্য নহে) ; তৎ (তাহা) কার্যমেব (নিশ্চয়ই কর্তব্য)। [যেহেতু] যজ্ঞঃ দানং তপঃ চ মনীষিণাম্ এব (ধীমান্‌-গণেরও) পাবনানি (চিত্তশুদ্ধিকর)।

যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম ত্যাজ্য নহে, উহা করাই কর্তব্য। যজ্ঞ, দান ও তপস্যা বিদ্বান্‌গণেরও চিত্তশুদ্ধিকর। ৫

তপঃ—ত্রিবিধ তপঃ ১৭।১৪-১৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥ ৬
নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাৎ তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ৭
দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮

৬। হে পার্থ, তু (কিন্তু) এতানি কর্মাণি অপি (এ সকল কর্মও) সঙ্গং (আসক্তি, কর্তৃত্বাভিনিবেশ) ফলানি চ (এবং ফলকামনা) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) কর্তব্যানি (অবশ্যকর্তব্য) ইতি মে (.ইহা আমার) নিশ্চিতম্ উত্তমং মতম্ (মত)

হে পার্থ, এই সকল কর্মও কর্তৃত্বাভিমান ও ফল কামনা ত্যাগ করিয়া করা কর্তব্য। ইহাই আমার নিশ্চিত মত এবং ইহাই উত্তম মত। ৬

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, কর্তৃত্বাভিমান ও ফলকামনা বর্জন করিয়া ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম করা উচিত। শ্রৌত স্মার্ত যজ্ঞদানাদি কর্মও ঠিক সেই ভাবেই করা কর্তব্য। ইহাই নিষ্কাম কর্মযোগ।

৭। নিয়তস্য কর্মণঃ তু (স্বধর্মরূপে নির্দিষ্ট যে কর্ম তাহার) সন্ন্যাসঃ (ত্যাগ) ন উপপদ্যতে (যুক্তিযুক্ত নয়); মোহাৎ (মোহবশতঃ) তস্য পরিত্যাগঃ (তাহার পরিত্যাগ) তামসঃ পরিকীর্তিতঃ (তামস বলিয়া কথিত হয়)।

নিয়ত কর্ম—স্বধর্মানুসারে যথাধিকার প্রাপ্ত কর্ম। ১৮।৪৭ শ্লোকে ইহাকেই 'স্বভাবনিয়ত' কর্ম বলা হইয়াছে। জীবের স্বভাব বা প্রকৃতির গুণভেদবশতঃই বর্ণভেদ ও কর্মভেদ শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। সুতরাং যথাধিকার শাস্ত্রবিহিত কর্মই নিয়ত কর্ম। ইহাকেই স্বধর্ম, স্বকর্ম, সহজ কর্ম, স্বভাবজ কর্ম ইত্যাদি বলা হইয়াছে (১৮।৪২-৪৮)। অপিচ ৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ত্রিবিধ ত্যাগ—কর্মফল ত্যাগী সাত্ত্বিক ত্যাগী ৭-১২

স্বধর্ম বলিয়া যাহার যে কর্ম নির্দিষ্ট আছে, সেই কর্ম ত্যাগ করা কর্তব্য নহে। মোহবশতঃ সেই কর্ম ত্যাগ করাকে তামসত্যাগ বলে। ৭

৮। [যিনি] দুঃখম্ ইতি এব (দুঃখকর বলিয়া) কায়ক্লেশভয়াৎ (দৈহিক ক্লেশের ভয়ে) যৎ কর্ম ত্যজেৎ (কর্তব্য কর্ম ত্যাগ করেন) সঃ (তিনি) রাজসং ত্যাগং কৃত্বা (রাজস ত্যাগ করিয়া) ত্যাগফলং ন এব লভেৎ (ত্যাগের ফল লাভ করেন না)।

কার্যমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ৯
ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০
ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১

কর্মানুষ্ঠান দুঃখকর মনে করিয়া কায়িক ক্লেশের ভয়ে যে কর্মত্যাগ করা হয়, তাহা রাজসত্যাগ। যিনি এই ভাবে কর্মত্যাগ করেন, তিনি প্রকৃত ত্যাগের ফল লাভ করেন না। ৮

ত্যাগের ফল কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করা। কিন্তু কায়ক্লেশভয়ে কর্তব্য কর্ম ত্যাগ করিলে তাহাতে মোক্ষ লাভ হয় না। এইরূপ ত্যাগকে রাজসত্যাগ বলে।

৯। হে অর্জুন, সঙ্গং (আসক্তি, কর্তৃত্বাভিমান) ফলং চ এব (এবং ফলকামনা) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) কার্যম্ ইতি এব (কেবল কর্তব্য) যৎ নিয়তং কর্ম (অবশ্যকর্তব্যরূপে বিহিত যে কর্ম) ক্রিয়তে (অনুষ্ঠিত হয়), সঃ ত্যাগঃ (সেই ত্যাগ) সাত্ত্বিকঃ মতঃ (সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হয়)।

হে অর্জুন, কর্তৃত্বাভিমান ও ফলকামনা ত্যাগ করিয়া, কেবল কর্তব্য বলিয়া যে বিহিত কর্ম করা হয়, তাহাই সাত্ত্বিক ত্যাগ বলিয়া কথিত হয়। (অর্থাৎ কর্তৃত্বাভিমান ও ফলকামনা ত্যাগই সাত্ত্বিক ত্যাগ, কর্মত্যাগ নহে)। ৯

১০। সত্ত্বসমাবিষ্টঃ (সত্ত্বগুণসম্পন্ন) মেধাবী (জ্ঞানী, স্থিরবুদ্ধি) ছিন্নসংশয়ঃ (সংশয়শূন্য) ত্যাগী (সাত্ত্বিক ত্যাগী) অকুশলং (দুঃখকর, অকল্যাণকর) কর্ম ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না); কুশলে (সুখকর, কল্যাণকর) কর্মে ন অনুষজ্জতে (আসক্ত হয় না)।

সত্ত্বগুণবিশিষ্ট, স্থিরবুদ্ধি, সংশয়শূন্য পূর্বোক্ত সাত্ত্বিক ত্যাগী পুরুষ দুঃখকর কর্মেও দ্বেষ করেন না এবং সুখকর কর্মেও আসক্ত হন না। (অর্থাৎ রাগদ্বেষ হইতে বিমুক্ত থাকিয়া কেবল কর্তব্যবোধে কর্ম করিয়া থাকেন)। ১০

ইহাই **সাত্ত্বিক ত্যাগীর** লক্ষণ।

১১। দেহভৃতা (দেহধারী ব্যক্তি) অশেষতঃ (নিঃশেষরূপে) কর্মাণি ত্যক্তুং (কর্মসমূহ ত্যাগ করিতে) ন হি শক্যং (সক্ষম হয় না); যঃ তু (কিন্তু, যিনি) কর্মফলত্যাগী, সঃ ত্যাগী ইতি অভিধীয়তে (কথিত হন)।

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ ॥ ১২
পঞ্চৈমানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম্ ॥ ১৩

যে দেহ ধারণ করে তাহার পক্ষে কর্ম সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা সম্ভবপর নয়; অতএব যিনি (কর্ম করিয়াও) কর্মফল ত্যাগ করেন, তিনিই প্রকৃত ত্যাগী বলিয়া কথিত হন। ১১

১২। অনিষ্টম্ (অকল্যাণকর) ইষ্টং (কল্যাণকর) মিশ্রং (ইষ্টানিষ্ট উভয়মিশ্র) ত্রিবিধং (তিন প্রকার) কর্মণঃ ফলম্ (কর্মের ফল) অত্যাগিনাং (সকাম ব্যক্তিগণের) প্রেত্য (পরলোকে) ভবতি (হইয়া থাকে); তু (কিন্তু) সন্ন্যাসিনাং (ফলত্যাগিগণের) ন ক্বচিৎ (কখনও হয় না)।

অত্যাগিনাং—যাঁহারা কর্মফল ত্যাগ করেন না তাঁহাদের অর্থাৎ সকাম ব্যক্তিগণের। **সন্ন্যাসিনাং**—'সন্ন্যাসিশব্দেনাত্র ফলত্যাগসাম্যাৎ প্রকৃতাঃ কর্মফলত্যাগিনোঽপি গৃহ্যন্তে' (শ্রীধর)—সন্ন্যাসী শব্দের অর্থ এখানে কর্মত্যাগী নয়, কর্মফলত্যাগী (৬।১ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

যাঁহারা ফল-কামনা ত্যাগ করেন না সেই অত্যাগী পুরুষগণের মৃত্যুর পরে অনিষ্ট, ইষ্ট ও ইষ্টানিষ্ট-মিশ্র, তাঁহাদের কর্মানুসারে এই তিন প্রকার ফল লাভ হয়। কিন্তু সন্ন্যাসীদের অর্থাৎ যাঁহারা কর্মফল ত্যাগ করিয়া কর্ম করেন, তাঁহাদের কখনও ফল লাভ হয় না। (অর্থাৎ তাঁহারা কর্ম করিলেও কর্মে আবদ্ধ হন না))। ১২

১৩। হে মহাবাহো, সর্বকর্মণাং সিদ্ধয়ে (সকল কর্মেরই সম্পাদনের পক্ষে) সাংখ্যে কৃতান্তে (সাংখ্য বা বেদান্ত সিদ্ধান্তে) প্রোক্তানি (বর্ণিত) ইমানি পঞ্চকারণানি (এই পাঁচটি কারণ) মে নিবোধ (আমার নিকট অবগত হও)।

সাংখ্যে কৃতান্তে—এস্থলে 'সাংখ্যে' পদটি 'কৃতান্ত' পদের বিশেষণ। সাংখ্য বলিতে কাপিল সাংখ্যও বুঝায়, বেদান্তশাস্ত্রও বুঝায়। 'কৃতান্ত' শব্দে 'সিদ্ধান্ত শাস্ত্র' বুঝায়। (কৃতোঽন্তো নির্ণয়োঽস্মিন্নিতি কৃতান্তম্)। সুতরাং 'সাংখ্যে কৃতান্তে' পদে কাপিল সাংখ্যশাস্ত্র বা বেদান্তশাস্ত্র উভয়ই বুঝাইতে পারে। (মহাঃ শাঃ ৩৪৭।৮৭ দ্রষ্টব্য)।

কর্ম সম্পাদনে পঞ্চবিধ কারণ ১৩-১৫

হে মহাবাহো, যে কোন কর্ম সম্পাদনের পক্ষে পাঁচটি কারণ সাংখ্য-সিদ্ধান্তে বর্ণিত আছে, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। ১৩

অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণং চ পৃথগ্‌বিধম্‌।
বিবিধাশ্চ পৃথক্‌ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্‌॥ ১৪

১৪। অধিষ্ঠানং (স্থান, দেহ) তথা কর্তা (অহঙ্কার) পৃথগ্‌বিধং করণং (বিবিধ সাধন) বিবিধাঃ পৃথক্‌ চেষ্টাঃ চ (পৃথক্‌ পৃথক্‌ চেষ্টা বা ব্যাপার), অত্র পঞ্চমং দৈবম্‌ এব চ (ইহাদের মধ্যে পঞ্চম দৈব)।

অধিষ্ঠান (স্থান), কর্তা, বিবিধ করণ বা সাধন (যন্ত্র), কর্তার অনেক প্রকার চেষ্টা বা ব্যাপার এবং পঞ্চম কারণ দৈব। ১৪

কোন কর্ম হইতে গেলেই কর্তা, করণ বা সাধন (যন্ত্র), অধিকরণ বা স্থান এবং কর্তার নানাবিধ চেষ্টা প্রয়োজন। বেদান্তাদি শাস্ত্রের পরিভাষায় অহঙ্কারই কর্তা, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় করণ, দেহই অধিষ্ঠান এবং প্রাণ অপানাদির ব্যাপারই চেষ্টা বলিয়া গৃহীত হয়। এই সকলের সহায়তায়ই কর্ম সম্পন্ন হয়। এতদ্ব্যতীতও আমাদের প্রযত্নের প্রয়োজক ও অনুকূল এমন কোন ব্যাপার আছে যাহা আমরা জানি না এবং দেখি না—ইহাকেই দৈব বলা হয়।

দৈব কি ?

শাস্ত্রে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের প্রত্যেকের আনুকূল্যকারী এক একটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উল্লেখ আছে। যেমন, শরীরের দেবতা পৃথিবী, চক্ষুর দেবতা অর্ক, হস্তের দেবতা ইন্দ্র, অহঙ্কারের দেবতা রুদ্র, মনের দেবতা চন্দ্র, ইত্যাদি। এই দেবগণের সাহায্যে ও শক্তিতেই ইন্দ্রিয়াদির কার্য সম্পন্ন হয়। অনেক টীকাকার ইহাকেই 'দৈব' বলিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, এস্থলে 'দৈব' বলিতে বুঝিতে হইবে 'সর্বপ্রেরক অন্তর্যামী'। কেহ আবার বলেন, 'দৈব' অর্থ 'ধর্মাধর্ম-সংস্কার'। এই ব্যাখ্যাগুলি আপাততঃ বিভিন্ন বোধ হইলেও মূল তত্ত্বটি একই। সেইটিই বুঝা প্রয়োজন। প্রশ্ন এই—জীব কর্ম করে কেন ? কর্ম-প্রবৃত্তি কোথা হইতে আসিল ? জন্ম, কর্ম, সংসার, সৃষ্টি—ইহার আদি কোথায়, ইহার মূল কারণ কি ? ইহার মূলে ব্রহ্মসঙ্কল্প—'একোঽহং বহু স্যাম্‌'—'আমি এক আছি, বহু হইব'—পরব্রহ্মের এই সঙ্কল্প হইতেই ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্যন্ত সর্বভূতের উৎপত্তি ও সকলের স্ব স্ব কার্যে প্রবৃত্তি—'সর্বে বহামো বলিমীশ্বরায় প্রোতা নসীব দ্বিপদে চতুষ্পদঃ'—বলীবর্দাদি চতুষ্পদ জন্তু যেমন নাসিকায় বদ্ধ হইয়া মনুষ্যের ইচ্ছায় তাহার নিমিত্ত কর্ম করে, আমরা সকলেই সেইরূপ ত্রিগুণে বদ্ধ হইয়া ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাঁহার নিমিত্ত কর্ম করি' (শ্রীভাগবতে ব্রহ্মার বাক্য ৫।১।১৪)।

শরীরবাঙ্‌মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ॥ ১৫

সুতরাং সৃষ্টিকালে যাহার ললাটে যাহা লিখিত হইয়াছে অর্থাৎ যাহার পক্ষে যাহা নির্দিষ্ট হইয়াছে, সকলেই তদনুসারে কর্ম করিতেছে, ইহার অন্যথা করিবার কাহারও সাধ্য নাই। ললাটে লিখিতং যত্তু ষষ্ঠীজাগরবাসরে।
ন হরিঃ শঙ্করো ব্রহ্মা চান্যথা কর্তুমর্হতি॥

বারদীর শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবা বলেন, এস্থলে 'ষষ্ঠীজাগরবাসরে' অর্থ—'সৃষ্টির প্রাক্কালে' (ধর্মসার-সংগ্রহ)।

এই ঈশ্বর-সঙ্কল্পকেই মহানিয়তি বা দৈব বলে। হরিহরব্রহ্মাও ইহা লঙ্ঘন করিতে পারেন না, কেননা তাঁহারাও এই সঙ্কল্পের অধীন। সৃষ্টি হইতে প্রলয় পর্যন্ত জগতে যাহা কিছু কর্ম হয় তাহা এই নিয়তিবলেই সম্পন্ন হয়। এই নিয়তিবলেই চন্দ্র-সূর্য, বায়ু-বরুণাদি স্ব স্ব কার্যে ব্যাপৃত আছেন, এই নিয়তি-বলেই আদিত্যাদি দেবগণ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের শক্তি দান করিতেছেন, এই হেতু এই শক্তিকে 'দৈব' বলা হইয়াছে। এই ঈশ্বর-সঙ্কল্পকেই কেহ কেহ 'সর্বপ্রেরক অন্তর্যামী' বলিয়াছেন। এই নিয়তিই প্রাক্তন বা পূর্বজন্মের ধর্মাধর্ম সংস্কাররূপে প্রকাশিত হয় এবং জন্মে জন্মে জীবের জন্মকর্মের ফলবৈষম্য উৎপন্ন করে, ইহাকেই লোকে অদৃষ্ট বলে। এখন বুঝা গেল, উপরের তিনটি ব্যাখ্যার মূল কি।

অনেকে মনে করেন, দৈবের যখন খণ্ডন নাই, তখন পুরুষকার অবলম্বন করা বৃথা। তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, দৈব পুরুষকাররূপেই কর্মের নিয়ন্তা হয়, পুরুষকার আশ্রয় করিয়াই দৈব ফল প্রদান করে। শস্য উৎপাদনার্থ বীজ ও ক্ষেত্র উভয়েরই প্রয়োজন; দৈব কর্মের বীজস্বরূপ এবং সুপ্রযুক্ত পুরুষকার কর্ষিত ক্ষেত্রস্বরূপ; এই উভয়ের সংযোগে কর্মফল লাভ হয়।

'ক্ষেত্রং পুরুষকারস্তু দৈবং বীজমুদাহৃতম্। ক্ষেত্রবীজসমাযোগাত্ততঃ শস্যং সমৃধ্যতে'
'তথা পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিধ্যতি।' —মভাঃ, অনু ৬।৭।৮

বিষয় দুরবগাহ, সম্যক্ আলোচনা এস্থলে অসম্ভব। যোগবাশিষ্ঠ, উৎপত্তি প্রকরণ ৬২ অধ্যায় এবং মহাভারত, অনুশাসনপর্ব, ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে এ বিষয়ের আলোচনা আছে। (অপিচ ২৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

১৫। নরঃ শরীরবাঙ্‌মনোভিঃ (শরীর, মন ও বাক্য দ্বারা) যৎ ন্যায্যং বা বিপরীতং বা (ন্যায্য বা অন্যায্য যে কোন কর্ম) প্রারভতে (আরম্ভ করে), এতে পঞ্চ (এই পাঁচটি) তস্য হেতবঃ (তাহার কারণ)।

তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ॥ ১৬
যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥ ১৭

মনুষ্য শরীর, মন ও বাক্যদ্বারা ন্যায্য বা অন্যায্য যে কোন কর্ম করে, পূর্বোক্ত পাঁচটি তাহার কারণ। ১৫

১৬। তত্র এবং সতি (এইরূপ ব্যাপার হইলেও), যঃ (যে) কেবলম্ (নিঃসঙ্গ, নিরুপাধি) আত্মানম্ (আত্মাকে) কর্তারং পশ্যতি (কর্তা বলিয়া দেখে), অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ (অসংস্কৃত বুদ্ধিহেতু) সঃ দুর্মতিঃ (সেই দুর্বুদ্ধি) ন পশ্যতি ([সত্যকে] সম্যক্ দর্শন করে না)।

অহংবুদ্ধি না থাকিলে ফলভাগিত্ব নাই ১৬-১৭

বাস্তবিক অবস্থা এইরূপ হইলেও (অর্থাৎ পূর্বোক্ত পাঁচটিই কর্মের কারণ হইলেও) নিঃসঙ্গ আত্মাকে যে কর্তা বলিয়া মনে করে, তাহার বুদ্ধি শাস্ত্রাদি জ্ঞানের দ্বারা পরিমার্জিত না হওয়ায় সে প্রকৃত তত্ত্ব দেখিতে পায় না। ১৬

১৭। যস্য (যাহার) অহংকৃতঃ ভাবঃ ('আমি কর্তা' এইভাব) ন (নাই), যস্য বুদ্ধিঃ ন লিপ্যতে (আসক্ত হয় না), সঃ ইমান্ লোকান্ (এই সমস্ত লোক) হত্বা অপি (হনন করিলেও) ন হন্তি (হনন করেন না), ন নিবধ্যতে (এবং তাহার ফলে আবদ্ধ হন না)।

যাঁহার 'আমি কর্তা' এই ভাব নাই, যাঁহার বুদ্ধি কর্মের ফলাফলে আসক্ত হয় না, তিনি সমস্ত লোক হনন করিলেও কিছুই হনন করেন না এবং তাহার ফলে আবদ্ধও হন না। ১৭

স্থিতপ্রজ্ঞ কর্মযোগী পাপপুণ্যের অতীত। পূর্বে অনেক বার বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতিই কর্ম করে, আত্মা অকর্তা, নিঃসঙ্গ; এস্থলে সেই কথাই দৃঢ়ীকরণার্থ বলা হইল যে, দেহ ইন্দ্রিয় অহঙ্কার এবং দৈব বা ঈশ্বর-সংকল্প এই সকলই কর্মঘটনার কারণ, আত্মা বা 'আমি' ইহার কোনটির মধ্যেই নয়। সুতরাং যে মনে করে, আত্মা বা 'আমিই' কর্তা, সে অজ্ঞান, সে প্রকৃত তত্ত্ব জানে না। এই অজ্ঞানতাপ্রসূত কর্তৃত্বাভিমানবশতঃই তাহার কর্মবন্ধন হয়। যাঁহার অহং অভিমান নাই, বুদ্ধি যাহার নির্লিপ্ত, তাঁহার কর্মবন্ধন হয় না, সে কর্ম

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা।
করণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮

লোকরক্ষাই হউক, লোকহত্যাই হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। এইরূপ কর্তৃত্বাভিমান ও কামনাবর্জিত আত্মজ্ঞানী পুরুষই স্থিতপ্রজ্ঞ, ব্রহ্মভূত, ত্রিগুণাতীত, জীবন্মুক্ত ইত্যাদি নামে অভিহিত হন। ঈদৃশ শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত-স্বভাব ব্যক্তিগণের ব্যবহার সম্বন্ধে পাপ-পুণ্য, ধর্ম-অধর্ম, নীতি-অনীতি ইত্যাদির বিচার চলে না, কেননা তাঁহারা পাপ-পুণ্যাদি দ্বন্দ্বের অতীত—'নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ' (শঙ্করাচার্য)। কৌষীতকী উপনিষদে ইন্দ্র প্রতর্দনকে বলিতেছেন যে, বৃত্র অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে বধ করিলেও আমার পাপ হয় না, একথার মর্মও ইহাই। গীতার কর্মযোগীর লক্ষণও ইহাই, এইকথা পূর্বে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে (গীতা ২।২০, ২।৪৭, ৩।২৭, ৫।৮-১৫, ১৩।২৯, কৌষীতকী ৩।১, পঞ্চদশী ১৪।১৬।১৭।১৯ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)।

১৮। জ্ঞানং, জ্ঞেয়ং, পরিজ্ঞাতা [এই] ত্রিবিধঃ কর্মচোদনা (কর্ম প্রবৃত্তির হেতু); কারণ, কর্ম, কর্তা ইতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ (ক্রিয়ার আশ্রয়)।

সাত্ত্বিকাদি-ভেদে জ্ঞান, কর্ম, কর্তা ত্রিবিধ এবং কর্তার বুদ্ধি, ধৃতি ও সুখ ত্রিবিধ ১৮-৪০

জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা, এই তিনটি কর্মচোদনা অর্থাৎ কর্ম-প্রবর্তক বা কর্মপ্রবৃত্তির হেতু। করণ, কর্ম, কর্তা, এই তিনটি কর্মসংগ্রহ বা ক্রিয়ার আশ্রয়। ১৮

তাৎপর্য—কর্মচোদনা ও কর্মসংগ্রহ দার্শনিক পারিভাষিক শব্দ। কোন কর্ম আরম্ভ করিবার পূর্বে একটি প্রেরণা চাই, এই প্রেরণার জন্য জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, এই তিনটির প্রয়োজন। এই বিষয় আমার ইষ্ট, এইরূপ যে বোধ তাহাই জ্ঞান, সেই ইষ্ট বিষয়ই জ্ঞেয়; এবং সেই ইষ্ট বিষয়ে যাঁহার জ্ঞান জন্মে তিনিই জ্ঞাতা। যেমন, বস্ত্রবয়ন কর্ম হইতে গেলেই কোন ব্যক্তির (জ্ঞাতা) বস্ত্রের (জ্ঞেয়) আবশ্যকতার বোধ (জ্ঞান) চাই, ইহাকেই চোদনা বা প্রেরণা বলে; এই প্রেরণা হইতেই তন্তুবায় (কর্তা) তাঁতের দ্বারা (করণ) বস্ত্রবয়ন (কর্ম) করে। ইহাই কর্মসংগ্রহ। স্থুল কথা, কর্মচোদনা হইতেছে কর্মবিষয়ক মানসিক প্রেরণা এবং কর্মসংগ্রহ হইতেছে উহার বাহ্য প্রকাশ।

জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ॥ ১৯
সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্‌ ॥ ২০

১৯। গুণসংখ্যানে (সাংখ্যশাস্ত্রে) জ্ঞানং, কর্ম চ, কর্তা চ, গুণভেদতঃ ত্রিধা এব (গুণভেদে তিন প্রকার) প্রোচ্যতে (অভিহিত হয়); তানি অপি (সে সকলও) যথাবৎ শৃণু (শ্রবণ কর)।

গুণসংখ্যানে—গুণাঃ সম্যক্‌ কার্যভেদেন খ্যায়ন্তে প্রতিপাদ্যন্তে অস্মিন্‌ ইতি গুণসংখ্যানং সাংখ্যশাস্ত্রং তস্মিন্‌ (শ্রীধর)।

কাপিল সাংখ্যশাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা সত্ত্বাদি গুণভেদে তিন প্রকার কথিত হইয়াছে, সে সকল যথাবৎ কহিতেছি, শ্রবণ কর। ১৯

পূর্ব শ্লোকে জ্ঞান, জ্ঞেয়, পরিজ্ঞাতা—এই তিনটি কর্মপ্রবর্তক এবং কর্ম, কর্তা, করণ—এই তিনটি কর্মাশ্রয় বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে কর্তা, কর্ম ও জ্ঞান—এই তিনটির গুণভেদে ব্যাখ্যা করা হইতেছে। পরিজ্ঞাতাকে কর্তার এবং জ্ঞেয়কে কর্মজ্ঞানেরই অন্তর্নিবিষ্ট বলা যায় এবং করণ বা ইন্দ্রিয়াদি যন্ত্রমাত্র, উহা বুদ্ধি ও ধৃতির অন্তর্ভুক্ত বলা যায়। সুতরাং ঐ তিনটির গুণভেদে পৃথগ্‌ ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

২০। [জ্ঞানী ব্যক্তি] যেন (যেই জ্ঞানদ্বারা) বিভক্তেষু (ভিন্ন ভিন্ন রূপে (স্থিত) সর্বভূতেষু (সর্বভূতে) অবিভক্তম্‌ (অবিভক্তভাবে স্থিত) একম্‌ অব্যয়ং ভাবম্‌ (অদ্বয় নিত্যবস্তু) ঈক্ষতে (দর্শন করেন), তৎজ্ঞানং (সেই জ্ঞান) সাত্ত্বিকং বিদ্ধি (জানিও)।

ভাবং—বস্তু। ভাবশব্দো বস্তুবাচী—একম্‌ আত্মবস্তু ইত্যর্থঃ (শঙ্কর)।

যে জ্ঞানদ্বারা পরস্পর বিভক্তভাবে প্রতীয়মান সর্বভূতে এক অদ্বয় অব্যয় বস্তু (পরমাত্মতত্ত্ব) পরিদৃষ্ট হয়, সেই **জ্ঞান সাত্ত্বিক** জানিবে। ২০

সাত্ত্বিক-জ্ঞান। জগতের নানাত্বের মধ্যে যে একত্ব দর্শন তাহাই প্রকৃত জ্ঞান। একমাত্র অদ্বয় অব্যয় সদ্বস্তুই আছেন. যাহা কিছু ছিল, আছে বা থাকিতে পারে, সমস্তই তাঁহাতেই আছে, তিনি 'সর্ব'। এ জগতে নানাত্ব নাই—'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন', সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময়—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', সর্বত্রই বাসুদেব—'বাসুদেবঃ সর্বমিতি' (৭।১৯); ইহাই অদ্বৈত জ্ঞান; এই জ্ঞান লাভ জীবের পরম নিঃশ্রেয়স, উহাই মুক্তি। আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান

পৃথক্‌ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানাভাবান্‌ পৃথগ্‌বিধান।
বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্‌॥ ২১
যৎ তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্‌ কার্যে সক্তমহৈতুকম্‌।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তৎ তামসমুদাহৃতম্‌॥ ২২

ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান, সর্বত্র সমদর্শন ইত্যাদি নানা কথায় এই জ্ঞানের বর্ণনা পূর্বে নানা স্থানে করা হইয়াছে (৪।৩৫-৪২, ৫।৭।১৯, ৬।২৯।৩০, ৭।১৯, ১০।১১)। এই সাত্ত্বিক জ্ঞানলাভ করিয়া সাত্ত্বিক কর্তা বা কর্মযোগী (১৮।২৬) সাত্ত্বিক কর্ম বা নিষ্কাম কর্ম (১৮।২৩) করেন। এই হেতুই এস্থলে কর্মতত্ত্বের বর্ণনায় এই সাত্ত্বিক জ্ঞান, কর্ম ও কর্তার প্রসঙ্গ আসিয়াছে।

২১। যৎ তু জ্ঞানং পৃথক্‌ত্বেন (পৃথক পৃথগ্‌ রূপে) সর্বেষু ভূতেষু (সর্বভূতে) পৃথগ্‌বিধান্‌ (ভিন্ন ভিন্ন) নানা ভাবান্‌ (নানা ভাবে) বেত্তি (জানে) তৎ জ্ঞানং রাজসং বিদ্ধি (জানিবে)।

যে জ্ঞানের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভূতসমূহে পৃথক্‌ পৃথগ্‌ ভাবের অনুভূতি হয় তাহা **রাজস জ্ঞান**। ২১

সর্বভূতে ভেদবুদ্ধি, একত্বের মধ্যে নানাত্ব দর্শন, ইহাই বদ্ধ জীবের জ্ঞান বা অজ্ঞান। ইহাতেই বদ্ধ হইয়া জীব জন্মমৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হয়—'মৃত্যোঃ সঃ মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি' (কঠ, ২।১।১১)। এই রাজস জ্ঞান বা ভেদজ্ঞান হইতেই সংসার, ইহা হইতেই রাগদ্বেষ দম্ভদর্পাদি সর্ববিধ রাজস প্রবৃত্তি ও কাম্য কর্মের উৎপত্তি।

২২। যৎ তু (যে জ্ঞান) একস্মিন্‌ কার্যে (কোন এক বিষয়ে) কৃৎস্নবৎ (সম্পূর্ণরূপে) সক্তম্‌ (আসক্ত, অভিনিবিষ্ট), অহৈতুকম্‌ (যুক্তি-বিরুদ্ধ), অতত্ত্বার্থবৎ (প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধী, অযথার্থ) অল্পং চ (অল্পবিষয়ক, তুচ্ছ), তৎ তামসম্‌ উদাহৃতম্‌ (তাহা তামস বলিয়া উক্ত হয়)।

যাহা প্রকৃত তত্ত্ব তাহা না বুঝিয়া, ইহাই যাহা কিছু সমস্ত, এইরূপ বুদ্ধিতে কোন একমাত্র বিষয়ে আসক্ত থাকে সেই যুক্তিবিরুদ্ধ, অযথার্থ, তুচ্ছ জ্ঞানকে **তামস জ্ঞান** কহে। ২২

তামস জ্ঞান তুচ্ছ একই বিষয়ে অভিনিবিষ্ট থাকে, উহার বাহিরে যায় না। যেমন—অনেক লোক আছে, যাহারা মৃত্তিকা, পাথর, বৃক্ষাদিকেই মনে করে ঈশ্বর, উহা ব্যতীত ঈশ্বরের অন্যবিধ স্বরূপ বা সত্তার ধারণা তাহাদের নাই। উহাই তাহাদের একমাত্র উপাস্য বস্তু। ইহা অযৌক্তিক তুচ্ছ তামস জ্ঞান।

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্ ।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম যৎ তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩
যৎ তু কামেপ্সুনা কর্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪

আবার এমন অনেক লোক আছে—যাহাদের জ্ঞান, চিন্তা বা দৃষ্টি নিজের দেহ বা পরিবারের বাহিরে বড় যায় না। দেহের বা পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই তাহাদের সারসর্বস্ব, তাহারা একমাত্র তাহাতেই আসক্ত, অন্য চিন্তা, অন্য জ্ঞান তাহাদের নাই। ইহাও তামসিক জ্ঞান।

২৩। অফলপ্রেপ্সুনা (ফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগী ব্যক্তি কর্তৃক) নিয়তং (অবশ্য-কর্তব্যরূপে বিহিত) সঙ্গরহিতম্ (অনাসক্ত ভাবে) অরাগদ্বেষতঃ (অনুরাগ ও বিদ্বেষ বর্জিত হইয়া) কৃতং (অনুষ্ঠিত) যৎ কর্ম (যে কর্ম) তৎ সাত্ত্বিকম্ উচ্যতে (তাহা সাত্ত্বিক বলিয়া উক্ত হয়)।

কর্মকর্তা ফলকামনা পরিত্যাগপূর্বক রাগদ্বেষ-বর্জিত হইয়া অনাসক্ত-ভাবে অবশ্যকর্তব্যরূপে বিহিত যে কর্ম করেন, তাহাকে **সাত্ত্বিক কর্ম** বলা হয়। ২৩

নিয়তং কর্ম—১৮।৭ শ্লোক ও ৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এই সাত্ত্বিক কর্মই নিষ্কাম কর্ম। ৩য় ও ৪র্থ অধ্যায়ে, বিশেষতঃ ৪।১৮-২২ শ্লোকসমূহে ইহার বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে।

২৪। পুনঃ (এবং) কামেপ্সুনা (ফলকামী ব্যক্তি কর্তৃক) সাহঙ্কারণ বা (বা অহঙ্কারী ব্যক্তি কর্তৃক) বহুলায়াসং (বহু ক্লেশ ও পরিশ্রম সহকারে) যৎ ক্রিয়তে (যাহা অনুষ্ঠিত হয়) তৎ রাজসম্ উদাহৃতম্ (তাহা রাজস বলিয়া উক্ত হয়)।

আর, ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া অথবা অহঙ্কার সহকারে বহু আয়াস স্বীকার করিয়া যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা **রাজস কর্ম** বলিয়া কথিত হয়। ২৪

কামনা ও অহঙ্কার থাকিলেই দুরাকাঙ্ক্ষা ও দুশ্চিন্তা অনিবার্য। অনেক-স্থলে নিজের অত্যধিক স্বার্থচিন্তায় অপরের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি থাকে না, তাহাতে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। আবার দুরাকাঙ্ক্ষাবশতঃ অনেকে কঠোর শারীরিক কষ্ট সহ্য করিয়াও স্বার্থ সাধনে যত্নপর হয়, এই সব কারণেই বলা হইয়াছে যে, সকাম কর্ম বহু আয়াসসাধ্য।

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্ ।
মোহাদারভ্যতে কর্ম যৎ তৎ তামসমুচ্যতে ॥ ২৫

২৫। অনুবন্ধং (ভাবিফল), ক্ষয়ং (অর্থাদির নাশ), হিংসা, পৌরুষং চ (স্বীয় সামর্থ্য) অনপেক্ষ্য (বিবেচনা না করিয়া) মোহাৎ (অবিবেকবশতঃ) যৎ কর্ম আরভ্যতে (যে কর্ম আরম্ভ করা হয়) তৎ তামসম্ উচ্যতে (তাহা তামস বলিয়া উক্ত হয়)।

ভাবিফল কি হইবে, নিজের সামর্থ্য কতটুকু, প্রাণিহিংসাদি হইবে কিনা, পরিণামে কিরূপ হানি হওয়ার সম্ভাবনা—এইসকল বিচার না করিয়া মোহবশতঃ যে কর্ম আরম্ভ করা হয়, তাহা **তামস কর্ম** বলিয়া কথিত হয়। ২৫

ত্রিবিধ কর্ম। কর্মবিচারের কষ্টিপাথর কর্তার বুদ্ধি। পূর্বোক্ত তিনটি শ্লোকে সাত্ত্বিকাদি-ভেদে কর্মের ত্রিবিধ বিভাগ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে সাত্ত্বিক কর্মই নিষ্কাম কর্ম; রাজসিক ও তামসিক কর্ম সকাম কর্ম। সকাম কর্মের কতকগুলিকে শাস্ত্রে নিষিদ্ধ কর্ম বলা হইয়া থাকে। সুতরাং এই ত্রিবিধ বিভাগে সকল কর্মেরই সমাবেশ হয়। কিন্তু এস্থলে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, কর্মের এই শ্রেণী-বিভাগ কর্মেরই বাহ্য প্রকৃতি বা পরিণাম বিচার করিয়া করা হয় নাই, কর্তার বুদ্ধি অনুসারেই কর্মের সাত্ত্বিকাদি প্রকারভেদ করা হইয়াছে। গীতার মতে কর্মের কর্তব্যাকর্তব্য-বিচারে কর্মের ফলাফল না দেখিয়া কর্তার বাসনাত্মিকা বুদ্ধিরই বিচার করা হয়। এইরূপ বিচারে হিংসাত্মক যুদ্ধাদি কর্মও সাত্ত্বিক হইতে পারে, আবার অবস্থা-বিশেষে লোকহিতকর দানাদি কর্মও রাজসিক বা তামসিক হইতে পারে। আবার একই কর্ম এক জনের পক্ষে সাত্ত্বিক হইতে পারে, অপরেরই পক্ষে রাজসিক বা তামসিক হইতে পারে। যেমন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকর্ম। ইহা অর্জুনের পক্ষে সাত্ত্বিক, কেননা তিনি স্বধর্ম বলিয়া নিষ্কামভাবে উহা অনুষ্ঠান করিয়াছেন (১৮।২৩ শ্লোক)। কর্ণাদি যোদ্ধগণের পক্ষে ইহা রাজসিক, কেননা তাঁহারা ধনমানাদির আশায় উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন (১৮।২৪ শ্লোক); দুর্যোধনের পক্ষে উহা তামসিক, কেননা তিনি নিজের সামর্থ্য, শক্তিক্ষয়, ভাবিফল ইত্যাদি বিবেচনা না করিয়া মোহবশতঃ উহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন (১৮।২৫ শ্লোক)।

সুতরাং কর্মবিচারে কর্তার বুদ্ধি শুদ্ধ কি অশুদ্ধ তাহাই দ্রষ্টব্য। সাম্যবুদ্ধিই নিষ্কামকর্মের বীজ। এই হেতু এই সাম্যবুদ্ধি অবলম্বন করিয়াই যুদ্ধ করিবার জন্ম শ্রীভগবান্ পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছেন (২।৪৮-৫১ শ্লোক)।

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬
রাগী কর্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ২৭
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮

২৬। **মুক্তসঙ্গঃ** (আসক্তিশূন্য), অনহংবাদী (যে 'আমি' 'আমি' বলে না, কর্তৃত্বাভিমানবর্জিত), ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ (ধৈর্যশীল ও উৎসাহশীল), সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ নির্বিকারঃ (সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে নির্বিকার, হর্ষবিষাদশূন্য) কর্তা সাত্ত্বিকঃ উচ্যতে (কথিত হয়)।

যিনি আসক্তিবর্জিত, যিনি 'আমি', 'আমার' বলেন না অর্থাৎ কর্তৃত্বাভিমান ও মমত্ববর্জিত, যিনি সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে হর্ষবিষাদশূন্য হইয়া নির্বিকার চিত্তে ধৈর্য ও উৎসাহ সহকারে কর্ম করেন, তাঁহাকে **সাত্ত্বিক কর্তা** বলে। ২৬

সাত্ত্বিক কর্তাই গীতোক্ত কর্মযোগী। তিনি আসক্তিহীন 'রাগদ্বেষবিমুক্ত'; "দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা, সুখে বিগতস্পৃহ"। তাঁহার 'আমি' 'আমার' ঘুচিয়া গিয়াছে। তাঁহার কর্তৃত্বাভিমান নাই, মমত্ববুদ্ধি নাই, অভিমান, গৌরব ও প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা নাই। তাঁহার ফলাকাঙ্ক্ষা নাই, সুতরাং তিনি ধৈর্যশীল ও উৎসাহপূর্ণ, বিষম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তিনি অচল, অটল, স্থির, উদ্যমশীল। তিনি লোকসংগ্রহার্থ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকাম হইয়া সর্বহিতকল্পে কর্ম করিতেছেন—এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই তিনি সর্বাবস্থায় আনন্দ ও উৎসাহপূর্ণ থাকেন।

২৭। রাগী (বিষয়ানুরাগী), কর্মফলপ্রেপ্সুঃ (কর্মফলকামী), লুব্ধঃ (পরস্বাভিলাষী), হিংসাত্মকঃ (পরপীড়ক), অশুচিঃ (শৌচাচারহীন) হর্ষশোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ (কথিত হয়)।

বিষয়াসক্ত, কর্মফলাকাঙ্ক্ষী, লোভী, হিংসাপরায়ণ, শৌচাচারহীন, সিদ্ধিলাভে হর্ষান্বিত ও অসিদ্ধিতে শোকান্বিত—এরূপ কর্তাকে **রাজস কর্তা** বলে। ২৭

২৮। **অযুক্তঃ** (অসমাহিত, চঞ্চলবুদ্ধি), **প্রাকৃতঃ** (অসংস্কৃতবুদ্ধি, অসভ্য), **স্তব্ধঃ** (অনম্র, গর্বস্ফীত), **শঠঃ** (মায়াবী, বঞ্চক), **নৈষ্কৃতিকঃ** (পরবৃত্তিচ্ছেদনকারী, অথবা পরাপমানকারী), **অলসঃ, বিষাদী, দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামসঃ উচ্যতে।**

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্‌ত্বেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্যাকার্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩০

প্রাকৃতঃ—অত্যন্তাসংস্কৃতবুদ্ধিঃ (শঙ্কর); 'vulgar'। **স্তব্ধঃ**—দণ্ডবৎ, ন নমতি কস্মৈচিৎ (শঙ্কর)—দণ্ডের ন্যায়, কাহারও নিকট যে মাথা নোয়ায় না; অনম্র, উদ্ধত। **নৈষ্কৃতিকঃ** ('নৈকৃতিকঃ' পাঠান্তর আছে)—পরবৃত্তিচ্ছেদনপরঃ (শঙ্কর), পরাপমানী (শ্রীধর)। **দীর্ঘসূত্রী**—আজ না কাল করিব এইরূপ ভাবে যে কাল-বিলম্ব করে।

যে অস্থিরমতি, অভদ্র, অনম্র, শঠ, পরবৃত্তিনাশক, অলস, সদা অবসন্নচিত্ত ও দীর্ঘসূত্রী, তাহাকে **তামস কর্তা** বলে। ২৮

ত্রিবিধ কর্তার বর্ণনা হইল। এক্ষণে পরবর্তী শ্লোকসমূহে বুদ্ধি, ধৃতি ও সুখেরও ত্রিবিধ প্রকারভেদ বলা হইবে।

২৯। হে ধনঞ্জয়, বুদ্ধেঃ ধৃতেঃ চ (বুদ্ধির এবং ধৃতির) গুণতঃ এব ত্রিবিধং ভেদং (গুণানুসারে তিন প্রকার ভেদ) পৃথক্‌ত্বেন (পৃথক্ পৃথগ্ রূপে) অশেষেণ (সমগ্ররূপে) প্রোচ্যমানং (যাহা বলা হইবে), শৃণু (তাহা শুন)।

হে ধনঞ্জয়, বুদ্ধির ও ধৃতিরও যে গুণানুসারে তিনপ্রকার ভেদ হয় তাহা পৃথক্ পৃথক্ সুস্পষ্টরূপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২৯

৩০। হে পার্থ, প্রবৃত্তিং চ (কর্ম অথবা ধর্মে প্রবৃত্তি), নিবৃত্তিং চ (কর্ম বা অধর্ম হইতে নিবৃত্তি) কার্যাকার্যে (কর্তব্য ও অকর্তব্য বিষয়); ভয়াভয়ে (ভয় এবং অভয়), বন্ধং মোক্ষং চ যা বেত্তি (জানে) সা বুদ্ধিঃ সাত্ত্বিকী।

হে পার্থ, কর্ম করা অথবা কর্ম হইতে নিবৃত্ত থাকা (অর্থাৎ কর্মমার্গ বা সন্ন্যাস), কর্তব্য কি, অকর্তব্য কি, কিসে ভয়, কিসে অভয়, কিসে বন্ধ, কিসে মোক্ষ, এই সকল যে বুদ্ধিদ্বারা যথাযথরূপে বুঝা যায়, তাহাই **সাত্ত্বিকী বুদ্ধি**। ৩০

সাত্ত্বিকী বুদ্ধি ও সদসদ্বিবেক (Conscience)। বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা বা নির্ণয়কারিণী অন্তঃকরণবৃত্তি। ইহা ভালমন্দ বিচার করিয়া কর্তব্য নির্ণয় করে। পাশ্চাত্ত্য নীতিশাস্ত্রে এইরূপ এক মতবাদ আছে যে, মানুষের এক স্বতন্ত্র স্বয়ম্ভু ঈশ্বরদত্ত শক্তি আছে যাহাদ্বারা সে বিনা বিচারে স্বভাবতঃই

যয়া ধর্মমধর্মঞ্চ কার্যঞ্চাকার্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১
অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২
ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩

(intuitionally) ভালমন্দ নির্ণয় করিতে পারে। ইহাকে সদসদ্বিবেক বা Conscience বলা হয়। কিন্তু চোর ও সাধুর Conscience পৃথক্ হয় কেন, পাশ্চাত্ত্য শাস্ত্র তাহার সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন না। ভারতীয় দর্শনে এরূপ কোন স্বতন্ত্র শক্তির অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। হিন্দু-দর্শনমতে ভালমন্দ বা যাহা কিছু বিচারের শক্তি একমাত্র বুদ্ধির। বুদ্ধি যখন আত্মনিষ্ঠ হইয়া শুদ্ধ হয় তখনই তাহার বিচার যথার্থরূপ হয়, কেননা তখন উহা আত্মার প্রেরণা বা স্বাধর্ম্য লাভ করে, ইহাই সাত্ত্বিকী বুদ্ধি। তাই কবি বলিয়াছেন—'সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ' (কালিদাস)। এস্থলে 'সতাং হি' সৎলোকের বুদ্ধি অর্থাৎ সাত্ত্বিকী বুদ্ধিই সন্দেহস্থলে প্রমাণস্বরূপ, ইহাই বুঝিতে হইবে। কিন্তু রাজসী ও তামসী বুদ্ধি লোককে বিপথে চালিত করে। এই হেতুই পাশ্চাত্ত্যগণ যাহাকে Conscience বলেন, তাহা সকলের সমান হয় না। কেননা প্রকৃতির গুণভেদে বুদ্ধি বিভিন্ন হয়।

৩১। হে পার্থ, [মনুষ্য] যয়া (যে বুদ্ধি দ্বারা) ধর্মম্ অধর্মং চ কার্যম্ অকার্যম্ এব চ অযথাবৎ (অযথার্থরূপে) প্রজানাতি (বুঝে), সা রাজসী বুদ্ধিঃ।

হে পার্থ, যে বুদ্ধিদ্বারা ধর্ম ও অধর্ম, কার্য ও অকার্য যথার্থরূপে বুঝা যায় না, তাহা **রাজসী বুদ্ধি**। ৩১

৩২। হে পার্থ, যা (যে বুদ্ধি) অধর্মং ধর্মম্ ইতি মন্যতে (মনে করে), সর্বার্থান্ (সকল বিষয়ই) বিপরীতান্ চ (বিপরীত, উল্টা) [বুঝে], তমসা আবৃতা (অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্না) সা বুদ্ধিঃ তামসী।

হে পার্থ, যে বুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন থাকাতে অধর্মকে ধর্ম মনে করে এবং সকল বিষয়ই বিপরীত বুঝে, তাহা **তামসী বুদ্ধি**। ৩২

বুদ্ধির ত্রিবিধ ভেদবশতঃ কিরূপে লোকের শ্রদ্ধা ও উপাসনা-প্রণালী প্রভৃতিরও পার্থক্য হয়, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। (৪৮৩-৪৮৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

৩৩। হে পার্থ, যোগেন (যোগবলে, একাগ্রতা বা সমাধি-হেতু) অব্যভিচারিণ্যা (অবিচলিত, ঐকান্তিক) যয়া ধৃত্যা (যে ধৃতিদ্বারা) মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ ধারয়তে (ধৃত হয়, নিয়মিত হয়) সা ধৃতিঃ সাত্ত্বিকী।

যয়া তু ধর্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪
যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩৫

যোগেন—চিত্তৈকাগ্রেণ (শ্রীধর); সমাধিনা (শঙ্কর); কর্মফলত্যাগরূপ যোগের দ্বারা (লোকমান্য তিলক)। সর্বত্র সমদর্শনরূপ যোগবলে।

যে অবিচলিত ধৃতিদ্বারা মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সমাধি বা সমদর্শনরূপ যোগবলে নিয়মিত হয়, তাহা **সাত্ত্বিকী ধৃতি**। ৩৩

তাৎপর্য—নির্ণয় করা বুদ্ধির কার্য। যে শক্তির দ্বারা সেই নির্ণয় বা নিশ্চয় স্থির থাকে, ইন্দ্রিয়াদি যাহাতে সুনিয়মিত হইয়া অবিচলিত ভাবে বুদ্ধির নিশ্চয়ানুসারে কার্য করে, সেই শক্তিই ধৈর্য বা ধৃতি। সাত্ত্বিকী ধৃতি তাহাই যাহাতে সাত্ত্বিকী বুদ্ধির নির্ণয়ানুসারে ইন্দ্রিয়াদি সাত্ত্বিক কর্মে লাগিয়া থাকে। এই হেতু যোগবলের প্রয়োজন, তাই বলা হইতেছে 'যোগেন'—এই যোগ কি? ঈশ্বরে বা আত্মতত্ত্বে একনিষ্ঠতা বা সর্বত্র সমচিত্ততা বা কর্মফলত্যাগজনিত শান্তচিত্ততা।

৩৪। হে পার্থ, হে অর্জুন, [মনুষ্য] যয়া ধৃত্যা তু (যে ধৃতির দ্বারা] ধর্মকামার্থান্ (ধর্ম, কাম ও অর্থ) ধারয়তে (ধারণ করিয়া থাকে, ত্যাগ করে না), প্রসঙ্গেন (প্রসঙ্গক্রমে) ফলাকাঙ্ক্ষী [হয়], সা রাজসী ধৃতিঃ।

ধর্ম—যজ্ঞাদি কর্মজনিত পুণ্য। **কাম**—ইন্দ্রিয়ভোগ-জনিত সুখ। **অর্থ**—ধনসম্পত্তি। এই তিনটিই প্রবৃত্তিমূলক; মোক্ষ নিবৃত্তিমূলক।

হে পার্থ, হে অর্জুন, যে ধৃতিদ্বারা মনুষ্য ধর্ম, অর্থ ও কামোপভোগেই লাগিয়া থাকে এবং সেই সেই প্রসঙ্গে ফলাকাঙ্ক্ষী হয়, তাহা **রাজসী ধৃতি**। ৩৪

৩৫। হে পার্থ, দুর্মেধাঃ (অবিবেকী, দুর্বুদ্ধি ব্যক্তি) যয়া (যাহা দ্বারা) স্বপ্ন (নিদ্রা), ভয়ং, শোকং, বিষাদং মদং চ এব ন বিমুঞ্চতি (পরিত্যাগ করে না) সা ধৃতিঃ তামসী।

হে পার্থ, যে ধৃতিদ্বারা দুর্বুদ্ধি ব্যক্তি নিদ্রা, ভয়, শোক, বিষাদ এবং মদ ছাড়িতে পারে না অর্থাৎ যাহাতে মনুষ্যকে এই সকল বিষয়ে আবদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা **তামসী ধৃতি**। ৩৫

ধৃতি সেই মানসিক শক্তি যাহাতে মনুষ্য কোন কর্মে দৃঢ়ভাবে লাগিয়া থাকিতে পারে। যাহা দ্বারা সাত্ত্বিক বা নিষ্কাম কর্মে লাগিয়া থাকে তাহা সাত্ত্বিকী ধৃতি, যাহাতে অর্থকামাদি রাজসিক বিষয়ে লাগিয়া থাকে তাহা রাজসী ধৃতি এবং যাহাতে শোক, ভয় ইত্যাদি তামসিক ভাবে লাগিয়া থাকে তাহা তামসী ধৃতি—ইহাই ত্রিবিধ ধৃতির স্থূল মর্ম।

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ ॥ ৩৬
অভ্যাসাদ্ রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি।
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধি-প্রসাদজম্ ॥ ৩৭

৩৬। হে ভরতর্ষভ (অর্জুন), ইদানীং ত্রিবিধং সুখং তু মে (আমার নিকট) শৃণু (শুন)।

হে ভরতর্ষভ, এক্ষণে আমার নিকট ত্রিবিধ সুখের বিষয় শ্রবণ কর। ৩৬

এ পর্যন্ত কর্মতত্ত্ব বর্ণন প্রসঙ্গে কর্মের প্রবর্তক, ক্রিয়ার আশ্রয় এবং সাধন—অর্থাৎ জ্ঞান, কর্তা, কর্ম, বুদ্ধি, ধৃতি ইত্যাদির ত্রিবিধ ভেদ বর্ণন হইল। এক্ষণে কর্মের ফল অর্থাৎ সুখেরও ত্রিবিধ ভেদ বর্ণনা করা হইতেছে।

৩৭। যত্র (যে সুখে) (মনুষ্য) অভ্যাসাৎ রমতে (ক্রমে ক্রমে অভ্যাসদ্বারা প্রীতি লাভ করে), দুঃখান্তং চ নিগচ্ছতি (এবং দুঃখের অবসান প্রাপ্ত হয়), যত্তৎ (যাহা) অগ্রে বিষম্ ইব (বিষের ন্যায়), পরিণামে (শেষে) অমৃতোপমম্ (অমৃততুল্য), আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ (আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধির প্রসন্নতা হইতে জাত) তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তম্ (সেই সুখ সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হয়)।

যে সুখে ক্রমে ক্রমে অভ্যাসবশতঃ আনন্দ লাভ হয় (হঠাৎ নহে), যাহা লাভ হইলে দুঃখের অন্ত হয়, যাহা অগ্রে বিষের ন্যায়, পরিণামে অমৃততুল্য, যাহা আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধির প্রসন্নতা হইতে জন্মে, তাহাই **সাত্ত্বিক সুখ**। ৩৭

সাত্ত্বিক সুখ এবং রাজসিক বা বৈষয়িক সুখ পরস্পর বিপরীত। যেমন—(১) বৈষয়িক সুখ বিষয়সংসর্গবশতঃ সহসা উৎপন্ন হয়, কিন্তু সাত্ত্বিক সুখ অভ্যাস দ্বারা অর্থাৎ সাধন করিতে করিতে ক্রমে আয়ত্ত হয়, হঠাৎ উৎপন্ন হয় না। (২) বৈষয়িক সুখের সহিত দুঃখ মিশ্রিত থাকে, সাত্ত্বিক সুখে দুঃখের একেবারে অবসান হয়। (৩) বৈষয়িক সুখ অগ্রে অমৃততুল্য পরে বিষবৎ ; সাত্ত্বিক সুখ অগ্রে বৈরাগ্যাদি অভ্যাসের দরুণ বিষবৎ, পরিণামে সাধনে সিদ্ধিলাভ করিলে, অমৃতোপম। (৪) বৈষয়িক সুখ বাহ্য বিষয়ে ইন্দ্রিয়সংযোগবশতঃ উৎপন্ন হয়, সাত্ত্বিক সুখ আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজ অর্থাৎ নিজের নিষ্কাম শুদ্ধ নির্মল বুদ্ধির প্রসন্নতা হইতে উৎপন্ন হয় (২।৬৪-৬৫), অথবা আত্মতত্ত্ব অনুধ্যানে নিবিষ্ট যে বুদ্ধি তাহার নির্মলতা হইতে জাত, বাহ্যবস্তু হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্ ।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮
যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯
ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভির্গুণৈঃ ॥ ৪০

৩৮। বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ (বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগবশতঃ) যত্তৎ (যে সুখ) অগ্রে অমৃতোপমম্ (অমৃততুল্য) পরিণামে বিষম্ ইব (বিষবৎ), তৎ সুখং রাজসং স্মৃতং (কথিত হয়)।

রূপরসাদি বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের সংযোগবশতঃ যে সুখ উৎপন্ন হয় এবং যাহা অগ্রে অমৃতের ন্যায় কিন্তু পরিণামে বিষতুল্য হয়, সেই সুখকে **রাজস সুখ** কহে। [ইহারই নাম বৈষয়িক বা আধিভৌতিক সুখ]। ৩৮

৩৯। যৎ চ সুখম্ (যে সুখ) অগ্রে (প্রথমে) অনুবন্ধে চ (পরিণামেও) আত্মনং মোহনং (বুদ্ধির মোহকর) নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং (নিদ্রা, আলস্য ও অনবধানতা হইতে জাত) তৎ তামসম্ উদাহৃতম্ (তাহাকে তামস বলে)।

প্রমাদ—কর্তব্যের ভ্রম বা বিস্মৃতি। অনবধানতা।

যে সুখ প্রথমে এবং পরিণামেও আত্মার বা বুদ্ধির মোহজনক এবং যাহা নিদ্রা, আলস্য ও কর্তব্যবিস্মৃতি হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাকে **তামস সুখ** বলে। ৩৯

কর্তব্যবিস্মৃত হইয়া নিদ্রালস্যে সময় কর্তনেও কেহ সুখ পায়, ইহা মনুষ্যকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখে।

৪০। পৃথিব্যাং (পৃথিবীতে) দিবি বা (অথবা স্বর্গে) দেবেষু বা পুনঃ (কিংবা দেবগণের মধ্যে) তৎ সত্ত্বং নাস্তি (এমন প্রাণী বা বস্তু নাই) যৎ (যাহা) প্রকৃতিজৈঃ এভিঃ ত্রিভিঃ গুণৈঃ (প্রকৃতিজাত এই তিন গুণ হইতে) মুক্তং স্যাৎ (মুক্ত আছে)।

পৃথিবীতে, স্বর্গে অথবা দেবগণের মধ্যেও এমন প্রাণী বা বস্তু নাই যাহা প্রকৃতিজাত সত্ত্বাদি গুণ হইতে মুক্ত। ৪০

১৮শ শ্লোক হইতে ৩৯শ শ্লোকে শ্রীভগবান্ **কর্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ** করিয়া দেখাইয়াছেন যে জ্ঞান, কর্ম, কর্তা, বুদ্ধি, ধৃতি ও সুখ—এ সকল পরস্পর

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ৪১
শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪২

সম্বন্ধ এবং প্রত্যেকেই সত্ত্বাদি গুণভেদে ত্রিবিধ এবং তন্মধ্যে সাত্ত্বিক ভাবই শ্রেষ্ঠ ও মোক্ষানুকূল; যেমন—সাত্ত্বিক জ্ঞান (নানাত্বে একত্ববোধ, সর্বভূতে সমদর্শন) হইতে সাত্ত্বিক কর্তা (মুক্তসঙ্গ কর্মযোগী) সাত্ত্বিক কর্ম (নিষ্কাম কর্ম) করেন। তাঁহার সাত্ত্বিকী বুদ্ধি (বন্ধ-মোক্ষ-নির্ণয়-সমর্থা) এই কর্ম নিশ্চয় করিয়া দেয় এবং সাত্ত্বিকী ধৃতি (যোগশক্তি) তাঁহাকে এই কার্যে স্থির রাখে এবং এইরূপে এই সাত্ত্বিক কর্মের যে অমৃতোপম ফল সাত্ত্বিক সুখ (আত্মার অদ্বয় নির্মল আনন্দ) তাহা তিনি লাভ করেন। এইরূপ রাজসিক ও তামসিক জ্ঞান হইতেও তদনুরূপ কর্ম ও ফল হয়।

এই জগৎ প্রকৃতিরই পরিণাম, সুতরাং প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণ হইতে কোন বস্তুই মুক্ত নহে। এই স্বাভাবিক গুণভেদ অনুসারেই লোকের কর্মও নিয়মিত হয়। ইহাকেই স্বভাবনিয়ত কর্ম বা স্বকর্ম বা স্বধর্ম বলে। কিন্তু কাহার কি স্বভাব এবং কি কর্ম তাহা কিরূপে বুঝিব?—চাতুর্বর্ণ্যাদি ব্যবস্থা এই ভিত্তিতেই হইয়াছে (পরের শ্লোক)।

৪১। হে পরন্তপ, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রগণের) কর্মাণি (কর্মসমূহ) স্বভাবপ্রভবৈঃ গুণৈঃ (স্বভাবজাত গুণানুসারে) প্রবিভক্তানি (বিভক্ত হইয়াছে)।

চাতুর্বর্ণ্য ধর্ম ও স্বভাবনিয়ত কর্ম বা স্বধর্ম ৪১-৪৪

হে পরন্তপ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের কর্মসকল স্বভাবজাত গুণানুসারে পৃথক্ পৃথক্ বিভক্ত হইয়াছে। ৪১

৪২। শমঃ (মনঃসংযম), দমঃ (ইন্দ্রিয়-সংযম), তপঃ, শৌচং, ক্ষান্তিঃ (ক্ষমা), আর্জবং (সরলতা, কৌটিল্যহীনতা), জ্ঞানং (শাস্ত্রপাণ্ডিত্য), বিজ্ঞানম্ (শাস্ত্রার্থতত্ত্বনিশ্চয়, আত্মতত্ত্বানুভব) আস্তিক্যম্ এব চ (এবং সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা, পরলোকাদিতে বিশ্বাস) স্বভাবজম্ ব্রহ্মকর্ম।

তপঃ, শৌচ, জ্ঞান, বিজ্ঞান—২১৬ ও ২৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা—এই সমস্ত ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম (লক্ষণ)। ৪২

শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্ ।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪৩
কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্ ।
পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪

এস্থলে শমদমাদি যে সকল ব্রহ্মকর্ম বলা হইল, শ্রীভাগবতে উহাকেই 'ব্রহ্মলক্ষণ' বলা হইয়াছে এবং তদনুসারে অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি তাহাদের কর্ম নির্দিষ্ট হইয়াছে। একথার এইরূপ মর্মই গ্রহণ করিতে হইবে।

৪৩। শৌর্যং (পরাক্রম), তেজঃ (বীর্য), ধৃতিঃ (ধৈর্য), দাক্ষ্যং (কার্যদক্ষতা), যুদ্ধে অপি অপলায়নংচ(যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা), দানম্ (মুক্তহস্ততা, ঔদার্য), ঈশ্বরভাবঃ চ (শাসনক্ষমতা)—স্বভাবজং ক্ষাত্রং কর্ম।

পরাক্রম, তেজ, ধৈর্য, কার্যকুশলতা, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দানে মুক্তহস্ততা, শাসন-ক্ষমতা, এইগুলি ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কর্ম (লক্ষণ)।৪৩

শ্রীভাগবতে এইগুলিকে ক্ষাত্র-লক্ষণ বলা হইয়াছে এবং তদনুসারে প্রজাপালনাদি তাহাদের কর্ম বলা হইয়াছে।

৪৪। কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং (কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য) স্বভাবজং বৈশ্যকর্ম; পরিচর্যাত্মকং কর্ম (সেবাত্মক কর্ম) শূদ্রস্য অপি স্বভাবজম্ (শূদ্রের স্বভাবসিদ্ধ)।

গৌরক্ষ্যং—গাং রক্ষতীতি গোরক্ষঃ তস্য ভাবো গৌরক্ষ্যম্। গোরক্ষা।

কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য বৈশ্যদিগের এবং সেবাত্মক কর্ম শূদ্রদিগের স্বভাবজাত। ৪৪

গুণভেদে বর্ণভেদ ও কর্মভেদ। এস্থলে ব্রাহ্মণাদির যে বিভিন্ন লক্ষণ ও কর্মভেদ বলা হইল তাহা প্রকৃতির গুণভেদানুসারেই নির্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মণ সত্ত্বগুণপ্রধান, শমদমাদি তাঁহার স্বভাবের প্রধান গুণ এবং তদনুসারেই যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ, তাঁহার পক্ষে এই ছয়টি কর্ম নির্দিষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে যাজন, অধ্যাপনা ও প্রতিগ্রহ (অযাচিত দানগ্রহণ), এই তিনটি ব্রাহ্মণের জীবিকার্থ বিশেষ ধর্ম। ক্ষত্রিয়ের প্রকৃতি সত্ত্বসংমিশ্রিত রজোগুণপ্রধান এবং শৌর্য-বীর্যাদি তাহার চরিত্রের প্রধান গুণ, এই হেতু যজন, অধ্যয়ন, দান এই সকল ব্যতীতও রাজ্যরক্ষা, প্রজাপালনাদি কর্ম তাহার পক্ষে বিহিত হইয়াছে। বৈশ্য-চরিত্রে তমঃসংমিশ্রিত রজোগুণের আধিক্য,

এই হেতু কৃষিবাণিজ্যাদি তাহার কর্ম নির্দিষ্ট হইয়াছে। শূদ্রের প্রকৃতিতে রজঃ-সংমিশ্রিত তমোগুণের আধিক্য, তাহারা স্বভাবতঃই জড়বুদ্ধি, এই হেতু কেবল পরিচর্যাত্মক কর্ম তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। এইরূপে ব্রাহ্মণের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের তেজ, বৈশ্যের ধন ও শূদ্রের সেবা দ্বারা সমাজ-রক্ষার সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা হইয়াছে। সুতরাং সকলেরই সমাজ-রক্ষার অনুকূল এই ব্যবস্থা অনুসরণ করিয়া, স্বধর্ম পালন করা উচিত, ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। মনুষ্য স্বধর্ম পালন করিলেই পরম সিদ্ধি লাভ করিতে পারে।

রহস্য—বর্ণভেদ ও জাতিভেদ

প্রঃ। কিন্তু বর্তমান কালে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতির মধ্যেও শমদমাদি গুণের প্রাধান্য দৃষ্ট হয় না, আবার শূদ্রাদি জাতির মধ্যেও অনেক স্থলে ঐসকল গুণ পরিদৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ বর্তমান সমাজে বর্ণভেদ থাকিলেও বর্ণধর্ম নাই বলিলেই চলে। সুতরাং শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ অনুসারে স্ববর্ণ ও স্বধর্ম নির্ণয় করা চলে না, কাজেই গীতোক্ত স্বধর্ম পালন একরূপ অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। অথবা 'স্বধর্ম' কথার অর্থেরই সম্প্রসারণ করিতে হয়। এ অবস্থায় কর্তব্য কি?

উঃ। কেবল বর্তমান কালে নয়, মহাভারতীয় যুগেও বংশানুক্রমিক বর্ণধর্মের অনেক ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। বস্তুতঃ উহা অবশ্যম্ভাবী। জীবের স্বভাব সংগঠনের দুইটি কারণ বর্তমান—একটি পূর্বজন্ম-সংস্কার এবং তদুপযোগী বিধি-নির্দিষ্ট বংশানুক্রম (Law of Heredity); অপরটি ইহজন্মের শিক্ষা-সংসর্গাদি পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে স্বভাবের স্বতঃ-পরিবর্তন (Law of Spontaneous Variation)। এই দ্বিতীয় নিয়ম না থাকিলে সংসারে উন্নতি-অবনতি বলিয়া কোন কথা থাকিত না। কাল-পরিবর্তনে লোক-স্বভাবের পরিবর্তন হইবেই, উহা চিরকাল একরূপ থাকিতে পারে না। আর্য ঋষিগণ এ তত্ত্ব বুঝিতেন এবং প্রাচীন শাস্ত্রাদির আলোচনায় এ কথা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, তাঁহাদের ব্যবস্থিত বর্ণভেদ ও বর্ণধর্ম গুণানুগত ছিল, মূলতঃ জাতিগত ছিল না। শ্রীগীতায়ও ইহা স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে (৪।১৩, ১৮।৪১ শ্লোক)। বস্তুতঃ 'জাতিভেদ' শব্দই অপেক্ষাকৃত আধুনিক, প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে প্রায় সর্বত্রই 'বর্ণভেদ' শব্দ দেখা যায়। জাতি ও বর্ণ এক কথা নহে। বর্ণ বলিতে এস্থলে প্রাকৃতিক সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণ বুঝায়; এই ত্রিগুণের ন্যূনাধিক্যবশতঃ যে ভেদ তাহাই বর্ণভেদ। এই জগৎ প্রকৃতিরই পরিণাম, সুতরাং পৃথিবীতে, আকাশে বা স্বর্গে কোথায়ও এমন

প্রাণী বা বস্তু নাই যাহা ত্রিগুণ হইতে মুক্ত (১৮।৪০)। সুতরাং বর্ণভেদ কেবল মনুষ্যমধ্যে নহে, উহা দেবতার মধ্যেও আছে, গ্রহ-নক্ষত্রেও আছে, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ-লতাদিতেও আছে, এমন কি জড়পদার্থেও আছে, ইহাই হিন্দু-দর্শনের ও হিন্দু-শাস্ত্রের ব্যাপক সিদ্ধান্ত। তবে জড়পদার্থে বা বৃক্ষ-লতাদিতে সত্ত্ব ও রজোগুণ, তমোগুণদ্বারা সম্পূর্ণ আবৃত থাকে, এই হেতু তাহাতে এই ভেদ স্পষ্ট প্রতীত হয় না ; কিন্তু মনুষ্যের মধ্যে তিন গুণই সম্যক্ পরিস্ফুট, তাই উহাদের মধ্যে গুণগত বর্ণভেদ বিশেষ স্পষ্ট।

প্রঃ। বর্ণভেদ গুণানুগত এই কথা শাস্ত্রে অনেক স্থলেই দেখিয়াছি, কিন্তু 'বর্ণ' বলিতে যে ত্রিগুণ বুঝায় ইহা কোথাও দেখি নাই, শুনিও নাই, অভিধানেও বলে না। 'বর্ণ' শব্দের এরূপ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ আনুমানিক। বর্ণ বলিতে বুঝায় রং—শ্বেত, পীত, লোহিত ইত্যাদি, ইহাই তো জানি।

উঃ। হিন্দু-সমাজের এই ভেদকে বর্ণভেদ কেন বলে এ প্রশ্নের সন্তোষ-জনক উত্তর কোথাও পাওয়া যায় নাই। তবে শাস্ত্রালোচনায় যাহা বুঝিয়াছি তাহাই বলিতেছি। একথা স্বীকার্য যে, এ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ই আমাদের অনুমান-প্রসূত, তবে এ অনুমানের যথেষ্ট ভিত্তি আছে। অনুমানের ভিত্তি শাস্ত্রসঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত হইলে উহাও প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয়। বর্ণ বলিতে শ্বেত, পীতাদি রং বুঝায় তা ঠিক, প্রাচীন শাস্ত্রাদিতেও এইরূপ বর্ণনা আছে যে, সত্ত্বগুণ শ্বেতবর্ণ, রজোগুণ রক্তবর্ণ ও তমোগুণ কৃষ্ণবর্ণ এবং এই রূপক কল্পনা হইতেই সত্ত্বগুণ-প্রধান ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণ, রজোগুণপ্রধান ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, রজস্তমোগুণপ্রধান বৈশ্য মিশ্র পীতবর্ণ এবং তমোগুণপ্রধান শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ, এইরূপ বর্ণনার উৎপত্তি এবং অনেকস্থলে সিত (শ্বেত), অসিত (কৃষ্ণ), পীত, রক্ত, এই শব্দগুলিই ব্রাহ্মণ, শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় জাতি সম্পর্কে ব্যবহৃত হইয়াছে (মভা শাং ১৮৮।৪।৫।১১-১৪)। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে একটি 'লোহিতশুক্লকৃষ্ণা' ত্রিবর্ণ অজার উল্লেখ আছে। ইহাতে সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে বুঝাইতেছে। (শ্বেত উ, ৪।৫)। বস্তুতঃ সত্ত্বাদি গুণ বুঝাইতে শ্বেত-পীতাদি বর্ণ শব্দের ব্যবহার প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে সুপ্রচলিত ছিল। এই হেতুই সত্ত্বাদিগুণ-বৈষম্যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদির যে ভেদ তাহার নাম হইয়াছে 'বর্ণভেদ'। পরবর্তী কালে বর্ণভেদ বংশানুগত হইয়া ক্রমে বিভিন্ন বৃত্তিভেদ অনুসারে অসংখ্য জাতির উৎপত্তি হইয়াছে এবং উহার নাম 'জাতিভেদ' হইয়াছে। এই আধুনিক **জাতিভেদ** (Caste System) এবং আর্যশাস্ত্রের ব্যবস্থিত প্রাচীন **বর্ণভেদ** এক বস্তু নয়। বর্ণভেদ মূলতঃ **গুণানুগত**, জাতিভেদ সম্পূর্ণ ই **বংশানুগত**।

প্রঃ। এই ব্যাখ্যা যদি ঠিক হয় তাহা হইলে ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যেও কাহারও শমদমাদি সত্ত্বগুণের লক্ষণ বর্তমান না থাকিলে তিনি হীনবর্ণ হন, পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যেও কাহারও ঐ সকল গুণ থাকিলে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিতে হয়। শাস্ত্রের কি ইহাই অভিপ্রায়, ইহাই মর্ম ?

উঃ। মর্ম, অভিপ্রায় কেন, অনেক স্থলে স্পষ্ট বিধানই ঐরূপ আছে। শ্রীমদ্ভাগবত পূর্বোক্তরূপে শমদমাদি ব্রাহ্মণের, শৌর্যবীর্যাদি ক্ষত্রিয়ের ইত্যাদি ক্রমে চতুর্বর্ণের লক্ষণ নির্দেশ করিয়া তৎপর বলিতেছেন—

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকং।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দিশেৎ ॥" —ভাঃ ৭।১১।৩৫

—যে পুরুষের বর্ণজ্ঞাপক যে লক্ষণ বলা হইল যদি তদন্যবর্ণেও সেই লক্ষণ দেখিতে পাও, তবে সেই ব্যক্তিকেও সেই লক্ষণ নিমিত্ত সেই বর্ণ বলিয়া নির্দেশ করিবে, অর্থাৎ যদি শমদমাদি লক্ষণ ব্রাহ্মণেতর জাতিতেও দেখা যায়, তবে সেই লক্ষণদ্বারাই তাহাকে ব্রাহ্মণ বর্ণ বলিয়া নির্দেশ করিবে, তাহার জাতি অনুসারে বর্ণ নির্দেশ হইবে না। ('শমদমাদিকং যদি জাত্যন্তরেঽপি দৃশ্যেত তজ্জাত্যন্তরমপি তেনৈব ব্রাহ্মণাদি শব্দেনৈব বিনির্দিশেদিতি'—চক্রবর্তী ; 'শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি ব্যবহারো মুখ্যঃ ন তু জাতিমাত্রাদিতি'—স্বামী)। এস্থলে স্পষ্টই বলা হইল যে, শমদমাদি গুণভেদেই যে কোন ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করিতে হইবে, তাহার জাতি অনুসারে নহে, অর্থাৎ বর্ণভেদ গুণগত, জাতিগত নহে। বস্তুতঃ এক্ষণে যেমন প্রচলিত জাতিভেদের যৌক্তিকতা লইয়াই সন্দেহ ও সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, সেকালেও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের নিকট এই সমস্যাই উপস্থিত হইয়াছিল। মহাভারতে এই প্রশ্ন অনেক বার উত্থাপিত হইয়াছে এবং সেকালের শ্রেষ্ঠ নীতিজ্ঞগণ সকলেই ঠিক পূর্বোক্তরূপ মতই প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ কে, ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি, জাতিভেদ গুণানুগত না বংশানুগত ইত্যাদি প্রশ্ন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট একাধিক বার উত্থাপিত হইয়াছে। তদুত্তরে তিনি বলিয়াছেন—

"আমার এই বোধ হয়, সর্ববর্ণের সঙ্কর হেতু মনুষ্যমাত্রেতে জাতিনিশ্চয় দুঃসাধ্য। বর্ণসকলের সংস্কারাদি কৃত হইলেও যদি সচ্চরিত্রতা বিদ্যমান না থাকে, তবে সে স্থলে সঙ্করকে বলবান্ মনে করিতে হইবে। যে শূদ্রে শমদমাদি লক্ষণ থাকে সে শূদ্র শূদ্র নয়, ব্রাহ্মণই ; আর যে ব্রাহ্মণে উহা না থাকে সে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয়, শূদ্রই ('শূদ্রে তু যদ্ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে। ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ')"—মভাঃ বন ১৮০, অপিচ বন ৩১২।১০৮।

ভৃগু-ভরদ্বাজ-সংবাদে মহর্ষি ভৃগু বর্ণভেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলিতেছেন—পূর্বে এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্মাকর্তৃক সৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণময় ছিল, পরে স্ব স্ব কর্মদ্বারা পৃথক্ কৃত ব্রাহ্মণেরাই অন্য বর্ণে গমন করিয়াছেন ("ইত্যেতৈঃ কর্মভির্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ'—মভা, শাং ১৮৮)। তৎপর তিনি কোন্ কর্মদ্বারা ব্রাহ্মণ হয়, কোন্ কর্মদ্বারা ক্ষত্রিয় হয় ইত্যাদি বর্ণনা করিয়া বলিলেন যে, এইরূপ গুণকর্মানুসারে বর্ণ নির্ণয় করিতে হইবে, জাতি অনুসারে নয় (মভা, শাং ১৮৯।১-৮)।

উমা-মহেশ্বর-সংবাদে মহাদেব বলিতেছেন—ব্রাহ্মণ-যোনিতে জন্ম, উপনয়নাদি সংস্কার বা বেদাধ্যয়নাদি ব্রাহ্মণত্বের কারণ নহে, একমাত্র চরিত্রই ব্রাহ্মণত্বের কারণ—('ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ। কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্')—শুদ্ধচিত্ত জিতেন্দ্রিয় শূদ্রও পবিত্র কর্মদ্বারা দ্বিজবৎ সেব্য হন, উহা স্বয়ং ব্রহ্মার অনুশাসন ('শুদ্ধাত্মা বিজিতেন্দ্রিয় শূদ্রোঽপি দ্বিজবৎ সেব্য, ইতি ব্রহ্মাঽব্রবীৎ স্বয়ং'), কেননা সচ্চরিত্র শূদ্র ব্রাহ্মণত্বই লাভ করেন ('বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং নিযচ্ছতি'—মভা. অনু, ১৪৪)। ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণাদি পর্যালোচনা করিলেও এই তত্ত্বই পাওয়া যায়। অত্রিসংহিতায় ব্রাহ্মণকে দেবব্রাহ্মণ, রাজা-ব্রাহ্মণ, বৈশ্য-ব্রাহ্মণ, শূদ্র-ব্রাহ্মণ, ম্লেচ্ছ-ব্রাহ্মণ ইত্যাদি দশ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই শ্রেণী-বিভাগের মূলও গুণকর্মানুগত। ভক্তিশাস্ত্রের 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ' ইত্যাদি কথার মর্মও উহাই—তবে ভক্তিশাস্ত্রে ভক্তির মর্যাদা সর্বোপরি, এই যা বিশেষ।

সুতরাং সর্বত্রই দেখা যায়, বর্ণভেদ গুণকর্মানুগত, অর্থাৎ ব্যক্তিগত, বংশগত নয়। গুণকর্মানুসারে শ্রেণী-বিভাগ ও মর্যাদার তারতম্য সকল দেশে, সকল সমাজেই আছে, উহা সামাজিক ও ব্যক্তিগত উন্নতির অনুকূল, পরিপন্থী নহে। আমাদের শাস্ত্রেও ব্যক্তিগত যোগ্যতানুসারেই বর্ণভেদের ব্যবস্থা ছিল—কালক্রমে উহা বংশগত হওয়াতেই অবনতির কারণ হইয়াছে। প্রকৃতিভেদে মনুষ্যে মনুষ্যে ভেদ চিরকালই থাকিবে, উহারই নাম বর্ণভেদ। উহা পূর্বে কেবল আভিজাত্য-মূলক ছিল না, স্বাভাবিক গুণানুগত ছিল। পুনরায়, ব্যক্তিগত গুণ ও যোগ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে উহা স্বভাবনিয়ত হয় না (১৮।৪৭ দ্রঃ), জীবের মোক্ষানুকূল বা সমাজের কল্যাণকর হইতে পারে না।

প্রঃ। কিন্তু বর্তমান জাতিভেদ গুণানুগত করা একরূপ অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। স্বধর্মভ্রষ্ট বিবিধ বর্ণকে স্বভাবানুরূপ স্বধর্মে নিয়োজিত করিবে কে? নিরঙ্কুশ রাজশক্তি বা সমাজশক্তি ভিন্ন তাহা হয় না। আর উহাতে সর্বদা সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও বিপ্লব উপস্থিত হইবারই সম্ভাবনা।

উঃ। তা ঠিক, প্রকৃতপক্ষে উহা রাজশক্তিরও কর্ম নয়, লোকরক্ষার্থ প্রত্যেক বর্ণকেই স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত রাখা হিন্দু-রাজগণের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা সম্ভবপর হয় তখনই যখন সমাজ ক্ষুদ্রাবয়ব থাকে, বর্ণধর্ম গুণানুগত, রাজবিধির অনুগত ও সুনিশ্চিত থাকে এবং বিভিন্ন বর্ণের লোকসংখ্যা এমন থাকে যে, অধিকাংশ লোক জীবিকার্জনের জন্য বর্ণধর্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য না হয়। বর্তমান হিন্দু-সমাজের অবস্থা ইহার বিপরীত এবং প্রাচীনকালেও পূর্বোক্তরূপ অবস্থা যে অধিক দিন কখনও বিদ্যমান ছিল তাহারও বিশিষ্ট প্রমাণ নাই। অথচ বংশানুগত জাতিভেদ অতি প্রাচীনকাল হইতেই বর্তমান আছে। এই হেতুই শাস্ত্রে বিধান আছে যে, জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেও ব্রাহ্মণোচিত গুণগ্রাম না থাকিলে তাহাকে অব্রাহ্মণই জ্ঞান করিতে হইবে এবং ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যেও কেহ শমদমাদি গুণগ্রামে ভূষিত হইলে তিনি ব্রাহ্মণোচিত সম্মানই লাভ করিবেন। এমন কি, আবশ্যক হইলে ব্রাহ্মণগণও ব্রাহ্মণেতর জাতীয় সুযোগ্য ব্যক্তির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া শিক্ষাদীক্ষা লাভ করিবেন এবং সেই গুরুর প্রতি শিষ্যজনোচিত ব্যবহার করিবেন, শাস্ত্রে এ সকল (মনু ২।২৩৮-৪১) বিধানও রহিয়াছে। বস্তুতঃ এ সকল বিষয়ে শাস্ত্রবিধি কোনক্রমেই অনুদার বা অযৌক্তিক নহে, শাস্ত্র সর্বদাই ব্যক্তিগত গুণগ্রামের উপরই বিশেষ লক্ষ রাখিয়াছিলেন, বৃথা আভিজাত্যের প্রশ্রয় দেন নাই।

কার্যতঃও দেখা যায়, রাজর্ষি জনক, পাঞ্চালরাজ প্রবাহণ, পাণ্ডব-পিতামহ ভীষ্মদেব, পুরাণ-বক্তা সূত, বারাণসীর ধর্মব্যাধ, বিদেহ রাজ্যের বণিক তুলাধার প্রভৃতি মুনি-ঋষিদিগকেও তত্ত্বোপদেশ দিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণের নিকট যথোচিত সম্মানও লাভ করিয়াছেন, কিন্তু সেজন্য তাঁহাদিগের ব্রাহ্মণ জাতিভুক্ত হওয়ার কোন প্রয়োজন হয় নাই।

ব্রাহ্মণগণই হিন্দু-সমাজের ধর্ম-ব্যবস্থাপক ছিলেন অথচ তাঁহারা নিজেদের জন্য যেরূপ কঠোর সংযম ও ত্যাগের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং কেবল ব্যবস্থা নয়, কার্যতঃ ধর্ম-জীবনে বহুকাল ব্যাপিয়া আধ্যাত্মিকতার যে উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন তাহা স্মরণ করিলে স্বতঃই তাঁহাদের চরণোদ্দেশে মস্তক অবনত হইয়া আসে। ব্রাহ্মণ সাধারণ মনুষ্য নহেন, ব্রাহ্মণ মনুষ্যত্বের পূর্ণাদর্শ—ব্রাহ্মণ মূর্তিমান্ সনাতন ধর্ম ('মূর্তিঃ ধর্মস্য শাশ্বতী'—মনু)। সমস্ত ধর্মশাস্ত্রবিধির মূল উদ্দেশ্যই সমাজকে সেই ধর্মাদর্শের দিকে চালিত করা। সকলেরই তাহাতে অধিকার আছে। তবে অসহিষ্ণু হইলে চলিবে না, ধৈর্যসহকারে সাধনা চাই।

সাধনার দ্বারা ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যেও অনেক মহাপুরুষ সিদ্ধ জীবন লাভ করিয়া সকল বর্ণেরই নমস্য হইয়া আছেন এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। বস্তুতঃ জাতিতে মর্যাদা বা হীনতা নাই, জাতির পূজা কেহ করে না, সকলেই গুণের পূজা করিয়া থাকেন—ন জাতিঃ পূজ্যতে রাজন্ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ (গৌতম-সংহিতা)।

আধুনিক হিন্দু-সমাজের বিভিন্ন জাতি-নির্ণয় সমাজ-তত্ত্ব ও ঐতিহাসিক আলোচনার অন্তর্ভুক্ত, কেননা নানারূপ ধর্ম-বিপ্লব, রাষ্ট্র-বিপ্লব ও সমাজ-বিপ্লবে আধুনিক সমাজ-প্রকৃতির আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অধুনা যাহাদিগকে শূদ্র বলা হয় তাহারা সকলেই যে প্রাচীন শাস্ত্রোক্ত শূদ্রজাতিভুক্ত তাহা নহে এবং যাহারা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি উচ্চবর্ণভুক্ত বলিয়া পরিচিত, তাহাদেরও তদনুরূপ বর্ণ-বিশুদ্ধি নাই। ধর্মশাস্ত্র-দৃষ্টিতে এই কথাটি মনে রাখিলেই হয় যে, যিনি যে দেহ লইয়া যেখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন উহাই তাঁহার উপযোগী, কেননা উহা তাঁহার প্রাক্তন কর্মানুযায়ী বিধি-নির্দিষ্ট স্থান। ঐ স্থানে থাকিয়াই নিজের প্রকৃতি, শিক্ষাদীক্ষা ও যোগ্যতানুসারে যিনি যে কর্ম অবলম্বন করিয়াছেন তাহাই তাঁহার স্বধর্ম। উহাই ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে নিষ্কামভাবে করিতে পারিলেই গীতোক্ত স্বধর্ম পালন করা হয়। উহা দ্বারা এক জন্মেই হউক বা জন্মে জন্মে ক্রমোন্নতি দ্বারাই হউক—তাহার পরিণামে মোক্ষলাভ হইবে। জন্মান্তর-বাদ ও কর্মফলে বিশ্বাসের নাম আস্তিক্য বুদ্ধি। উহা হিন্দুধর্মের একটি বিশেষ লক্ষণ। জন্মান্তরবাদ হিন্দুশাস্ত্রের মেরুদণ্ডস্বরূপ, উহা অস্বীকার করিলে সমস্ত শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা পঙ্গু হইয়া পড়ে, শাস্ত্রীয় বিচারও সম্ভবপর হয় না। (১২০-১২৪ ও ১৪৪-১৪৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

গীতার কালে চাতুর্বর্ণ্য-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, এই কারণেই এই সামাজিক কর্ম চাতুর্বর্ণ্য বিভাগানুসারে প্রত্যেকের ভাগে আসে, এইরূপ বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহা হইতেই গীতার নীতি-তত্ত্ব যে চাতুর্বর্ণ্য সমাজ-ব্যবস্থার উপরেই অবলম্বিত এরূপ যেন মনে করা না হয়।...চাতুর্বর্ণ্য-ব্যবস্থা যদি কোথাও প্রচলিত নাও থাকে, অথবা পঙ্গুভাবে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে সেস্থলেও তৎকাল-প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থানুসারে সমাজের ধারণ-পোষণের যে যে কর্ম নিজেদের ভাগে আসিবে তাহা লোক-সংগ্রহার্থ ধৈর্য ও উৎসাহ সহকারে এবং নিষ্কামবুদ্ধিতে কর্তব্য বোধে করিতে থাকা উচিত—ইহাই সমস্ত গীতাশাস্ত্রের ব্যাপক সিদ্ধান্ত।—গীতারহস্য, লোকমান্য তিলক। (অপিচ, ১২০-১২৪পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬

৪৫। স্বে স্বে কর্মণি (নিজ নিজ কর্মে) অভিরতঃ নরঃ (নিষ্ঠাবান্, তৎপর মনুষ্য) সংসিদ্ধিং লভতে (সিদ্ধিলাভ করে); স্বকর্মনিরতঃ (স্বকর্মে নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি) যথা সিদ্ধিং বিন্দতি (যেরূপে সিদ্ধি লাভ করে) তৎ শৃণু (তাহা শুন)।

স্বধর্ম অত্যাজ্য, নিরাসক্তবুদ্ধিতে স্বধর্মাচরণে সিদ্ধি ৪৫-৪৯

নিজ নিজ কর্মে নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি সিদ্ধি লাভ করে ; স্বকর্মে তৎপর থাকিলে কিরূপে মনুষ্য সিদ্ধিলাভ করে তাহা শুন। ৪৫

৪৬। যতঃ (যাহা হইতে) ভূতানাং প্রবৃত্তিঃ (কর্মচেষ্টা বা উৎপত্তি), যেন (যাহা কর্তৃক) ইদং সর্বং (এই সমস্ত জগৎ) ততম্ (ব্যাপ্ত আছে), মানবঃ স্বকর্মণা (নিজ কর্ম দ্বারা) তম্ অভ্যর্চ্য (তাঁহার অর্চনা করিয়া) সিদ্ধিং বিন্দতি (সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে)।

যাঁহা হইতে ভূতসমূহের উৎপত্তি বা জীবের কর্মচেষ্টা, যিনি এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন, মানব নিজ কর্মদ্বারা তাঁহার অর্চনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। ৪৬

স্বধর্ম বা কর্তব্য পালনই ঈশ্বরের অর্চনা—তাহাতেই সিদ্ধি

পূর্বে চতুর্বর্ণের স্বভাব-নিয়ত কর্মসমূহের নির্দেশ করা হইয়াছে। কর্ম ভগবানেরই সৃষ্টি এবং তাহা হইতেই জীবের কর্ম-প্রবৃত্তি। ইহাই তাঁহার লীলা। জীব কর্মে বিরত হইলে তৎক্ষণাৎ ভবলীলা শেষ হয়। সুতরাং তাঁহার সৃষ্টি রক্ষার্থ গীতার ভাষায় লোকসংগ্রহার্থ বা ভক্তিশাস্ত্রের ভাষায় তাঁহার লীলাপুষ্টির জন্য জীবের যথাপ্রাপ্ত কর্ম করিতে হয়। ইহাই তাঁহার অর্চনা, কেবল পুষ্প-পত্রেই তাঁহার অর্চনা হয় না। এই স্বধর্ম-পালনরূপ ভগবদর্চনা দ্বারাই জীব সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। হিন্দুর কর্ম-জীবনে ও ধর্ম-জীবনে পার্থক্য নাই। তাহার সমস্ত কর্মই ধর্মশাস্ত্রনির্দিষ্ট। এই সমস্ত কর্ম ফলকামনা ত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকাম হইয়া অর্থাৎ ঈশ্বরের কর্মবোধে তাঁহারই প্রীতি-কামনায় করিতে পারিলেই তাঁহার অর্চনা হয় এবং তাহাতেই সদ্গতি লাভ হয়, ইহা সমস্ত ভক্তিশাস্ত্রেরই সিদ্ধান্ত।

'বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যৎ তত্তোষকারণম্ ॥ —বিষ্ণুপুরাণ

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্ নাপ্নোতি কিল্বিষং ॥ ৪৭
সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥ ৪৮

'ইতি মাং যঃ স্বধর্মেণ ভজেন্নিত্যমনন্যভাক্' ইত্যাদি (ভাগবত, ১১।১৮। ৪৩।৪৫।৪৬)

'বিষ্ণুস্তুষ্যতি বিপ্রেন্দ্রঃ কর্মযোগরতাত্মনাম্'

'বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্'... 'বর্ণাশ্রমাচারবতা পূজ্যতে হরিরব্যয়ঃ' ইত্যাদি। (বৃহঃ নাঃ পুঃ ১৩।৬।৩৪)

৪৭। বিগুণঃ [অপি] (দোষবিশিষ্ট হইলেও) স্বধর্মঃ সু-অনুষ্ঠিতাৎ (উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত) পরধর্মাৎ (পরের ধর্ম হইতে) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ); স্বভাবনিয়তং (স্বাভাবিক গুণানুগত) কর্ম কুর্বন্ (করিলে) [মনুষ্যঃ] কিল্বিষং (পাপ) ন আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয় না)।

স্বধর্ম—৩।৩৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

স্বভাবনিয়ত—স্বভাব বা প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণানুসারে নির্দিষ্ট; শাস্ত্রে চাতুর্বর্ণ্যের কর্ম এই গুণানুসারে নির্দিষ্ট হইয়াছে, সুতরাং স্বভাবনিয়ত কর্ম বলিতে শাস্ত্র-বিহিত চাতুর্বর্ণ্য ধর্মই বুঝায়। কিন্তু বর্তমান কোন জাতিতে শাস্ত্রোক্ত বর্ণ-লক্ষণ বিদ্যমান না থাকিলে সেই বর্ণের পক্ষে শাস্ত্রবিহিত যে কর্ম, তাহা প্রকৃতপক্ষে তাহার পক্ষে স্বভাবনিয়ত হইবে না, ইহা বলাই বাহুল্য।

স্বধর্ম দোষ-বিশিষ্ট হইলেও সম্যক্ অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। স্বভাব-নির্দিষ্ট কর্ম করিয়া লোকে পাপভাগী হয় না। ৪৭

৪৮। হে কৌন্তেয়, সহজং কর্ম (স্বভাবজাত কর্ম) সদোষম্ অপি (দোষযুক্ত হইলেও) ন ত্যজেৎ (ত্যাগ করিবে না); হি (যেহেতু) সর্বারম্ভাঃ (সকল কর্মই) ধূমেন অগ্নি ইব (ধূমদ্বারা যেমন অগ্নি তদ্রূপ) দোষেণ আবৃতাঃ (দোষদ্বারা আবৃত)।

হে কৌন্তেয়, স্বভাবজ কর্ম দোষযুক্ত হইলেও তাহা ত্যাগ করিতে নাই। অগ্নি যেমন ধূমদ্বারা আবৃত থাকে, তদ্রূপ কর্মমাত্রই দোষযুক্ত। ৪৮

তাৎপর্য—ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধকর্মে বা কৃষকের কৃষিকর্মেও প্রাণিহিংসা অনিবার্য; কিন্তু এইরূপ হিংসাদিযুক্ত হইলেও তাহা ত্যাগ করিয়া অন্য বর্ণের কর্ম গ্রহণ করা কর্তব্য নয়। কেননা কর্মমাত্রই দোষযুক্ত, যেহেতু উহা বন্ধনের কারণ, কর্ম করিলেই তাহার শুভাশুভ ফলভোগার্থ পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ ও সংসার-যাতনা

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯

ভোগ অনিবার্য। তবে কর্মত্যাগই ত শ্রেয়ঃকল্প? না, কর্ম করিয়াও যাহাতে কর্মবন্ধন না হয় তাহার উপায় আছে। (পরের শ্লোক)।

৪৯। সর্বত্র অসক্তবুদ্ধিঃ (সর্ববিষয়ে আসক্তিশূন্য), জিতাত্মা (সংযতচিত্ত) বিগতস্পৃহঃ (স্পৃহাশূন্য ব্যক্তি) সন্ন্যাসেন (কর্মফলত্যাগ দ্বারা) পরমং নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধিম্ (কর্মবন্ধন ক্ষয়রূপ পরম সিদ্ধি) অধিগচ্ছতি (লাভ করেন)।

জিতাত্মা—জিতেন্দ্রিয় (শঙ্কর); নিরহঙ্কার (শ্রীধর)। **সন্ন্যাসেন**—'কর্মাসক্তিতৎফলয়োস্ত্যাগলক্ষণেন সন্ন্যাসেন'—কর্মাসক্তি ও কর্মফল ত্যাগ রূপ সন্ন্যাস দ্বারা, কর্মত্যাগ দ্বারা নহে (শ্রীধর)।

যিনি সর্ববিষয়ে অনাসক্ত, জিতেন্দ্রিয় ও নিস্পৃহ, তিনি কর্মফল ত্যাগের দ্বারা নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি লাভ করেন অর্থাৎ কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হন। ৪৯

নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি। পূর্বে বলা হইয়াছে, কর্মমাত্রই দোষযুক্ত বা বন্ধনের কারণ। কর্মফলেই দেহধারণ, আবার দেহধারণ হইলেই কর্ম। এই জন্ম-কর্মচক্রের নিবৃত্তি নাই। সমগ্র অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের মূল কথাই হইতেছে, কিরূপে জীব এই কর্মচক্র হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে তাহার উপায় নির্দেশ। এই অবস্থাকেই নৈষ্কর্ম্য বলে এবং কর্মবন্ধন হইতে মুক্তির নামই 'নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি'। ইহার উপায় কি? সন্ন্যাসবাদী বেদান্তী বলেন, আত্মজ্ঞান ভিন্ন কর্ম-বন্ধন হইতে মুক্তি নাই, এবং কর্ম থাকিতে জ্ঞানও হয় না; সুতরাং সর্ব কর্ম ত্যাগ করিয়া নিবৃত্তিমার্গ বা সন্ন্যাস গ্রহণই অমৃতত্ব লাভের একমাত্র উপায় ('কর্মণা বধ্যতে জন্তুঃ বিদ্যয়া তু প্রমুচ্যতে', 'ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ' ইত্যাদি)। সুতরাং তাঁহারা 'নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি' অর্থ করেন, কর্মশূন্যতা বা কর্ম-ত্যাগ এবং ত্যাগানন্তর জ্ঞানলাভ। গীতা বলেন, জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাই, তা ঠিক, কিন্তু সেই জ্ঞান, কর্ম-ও-ভক্তি-নিরপেক্ষ নহে; কর্ম ত্যাগ করিলেই নৈষ্কর্ম্য লাভ হয় না, বস্তুতঃ দেহধারী জীব নিঃশেষে কর্ম ত্যাগ করিতেই পারে না (৩।৪-৫, ১৮।১১)। কর্মের বন্ধকত্বের কারণ বাসনা বা আসক্তি; আসক্তি ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম করিলেই নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধি লাভ করা যায় অর্থাৎ কর্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়, সেজন্য কর্মত্যাগ করার প্রয়োজন হয় না। এস্থলে 'সন্ন্যাসেন'—'সন্ন্যাসদ্বারা'—শব্দ আছে। ইহার অর্থ কর্ম-সন্ন্যাস নহে,

ইহার অর্থ ফল-সন্ন্যাস অর্থাৎ কর্মফল ত্যাগ করিয়া, সর্বকর্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া, এই অর্থ। এই অর্থে 'সন্ন্যাস', 'সন্ন্যাসী', 'সন্ন্যস্ত' শব্দ গীতায় অনেক বার ব্যবহৃত হইয়াছে (৩-৩০, ৪।৪১, ৬।১, ৯।২৮ ইত্যাদি। বস্তুতঃ পূর্ব শ্লোকেই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, কর্ম দোষযুক্ত হইলেও ত্যাগ করা কর্তব্য নয়। কর্মকে দোষমুক্ত করার কি উপায় তাহাই ৪৯শ শ্লোকে বলা হইল। পরে ৫৬শ শ্লোকেও স্পষ্টই আছে, সর্ব কর্ম করিয়াও ভগবৎ-প্রসাদে শাশ্বত অব্যয় পদ লাভ হয়। সুতরাং কর্মত্যাগের কোন প্রসঙ্গই এখানে নাই।

কর্ম করিলেও যাহা না করার সমান হয় অর্থাৎ যখন কর্মের পাপপুণ্যের বন্ধন কর্তার হয় না, সেই অবস্থাকেই 'নৈষ্কর্ম্য' বলে। (পূর্বে 'কর্মে অকর্ম দর্শন' ইত্যাদি কথায় এই অবস্থায়ই নানা স্থানে বর্ণনা করা হইয়াছে, ৪।১৮-২৩ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)।—গীতা রহস্য, লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক।

বস্তুতঃ 'নৈষ্কর্ম্য' শব্দের অর্থ যে কর্মত্যাগ নয় তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচনায়ও স্পষ্ট বুঝা যায়। যথা—

(ক) 'নারায়ণো নরঋষিপ্রবরঃ প্রশান্তঃ নৈষ্কর্ম্যলক্ষণমুবাচ চচার কর্ম' (ভাঃ ১১।৪।৬)—এস্থলে ভাগবত ধর্মের আদি প্রবর্তক ভগবান্ নরনারায়ণ ঋষি সম্বন্ধে বলা হইতেছে যে, তিনি নৈষ্কর্ম্য-লক্ষণ কর্ম (অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম) উপদেশ দিয়াছেন এবং নিজে কর্ম আচরণ করিয়াছেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যাহা বলিতেছেন ঠিক তাহাই।

(খ) বেদোক্তমেব কুর্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্যং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ ॥—ভাঃ ১১।৩।৪৭

এস্থলে বলা হইতেছে আসক্তিশূন্য ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম (গীতার 'নিয়ত কর্ম') করিলেই নৈষ্কর্ম্য লাভ হয়। ৪৯ শ্লোকে ঠিক এই কথাই আছে।

(গ) তন্ত্রং সাত্বতমাচষ্ট নৈষ্কর্ম্যং কর্মণাং যতঃ। (ভাঃ ১।৩।৮)

—নির্গতং কর্মত্বং বন্ধনহেতুত্বং যেভ্যস্তানি নিষ্কর্মাণি তেষাং ভাবো নৈষ্কর্ম্যং কর্মণামেব মোচকত্বং যতো ভবতি তদাচষ্টে ইত্যর্থঃ—(শ্রীধর স্বামী)।

এস্থলে সাত্বত ধর্ম সম্বন্ধে বলা হইতেছে যে, উহাতে কর্মের নৈষ্কর্ম্য হয় অর্থাৎ কর্মের বন্ধকত্ব ঘুচে (গীতা ৪।১৭-২৩)।

এ সকল স্থলে স্পষ্টই বলা হইতেছে যে, অনাসক্ত চিত্তে ঈশ্বরার্পণপূর্বক কর্ম করাই নৈষ্কর্ম্যের অবস্থা, উহা কর্মশূন্যতা নহে। অথচ সন্ন্যাসবাদী টীকাকারগণ সকলেই 'নৈষ্কর্ম্য' শব্দের কর্মত্যাগ অর্থ গ্রহণ করিয়া ভাগবত ধর্ম সন্ন্যাসাত্মক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু শব্দার্থের 'টানাবুনা' না করিলে ভাগবত-উক্তির এরূপ ব্যাখ্যা করা যায় না।

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫০
বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥ ৫১
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩

৫০। হে কৌন্তেয়, সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ (সিদ্ধি-প্রাপ্ত ব্যক্তি) যথা (যে প্রকারে) ব্রহ্ম আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন) তথা (তাহা) সমাসেন (সংক্ষেপে) মে নিবোধ (আমার নিকট শ্রবণ কর); যা (যাহা, যে ব্রহ্মপ্রাপ্তি) জ্ঞানস্য পরা নিষ্ঠা (জ্ঞানের চরম নিষ্ঠা, প্রকর্ষ বা পরিসমাপ্তি)।

নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধির ফলে মোক্ষ কিরূপে হয় ? ৫০-৫৬

হে কৌন্তেয়, এইরূপে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি-প্রাপ্ত ব্যক্তি যে প্রকারে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর; উহাই জ্ঞানের চরম অবস্থা। ৫০

৫১।৫২।৫৩। বিশুদ্ধয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ (বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক বুদ্ধিযুক্ত হইয়া); ধৃত্যা (ধৃতিদ্বারা) আত্মানং নিয়ম্য (ঐ বুদ্ধিকে সংযত করিয়া অথবা আত্মসংযম করিয়া), শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ত্যক্ত্বা (শব্দাদি বিষয়সমূহ ত্যাগ করিয়া), রাগদ্বেষৌ চ ব্যুদস্য (এবং রাগদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া), বিবিক্তসেবী (নির্জনদেশে অবস্থান করিয়া), লঘ্বাশী (মিতভোজী হইয়া), যতবাক্-কায়-মানসঃ (বাক্য, শরীর, ও মনকে সংযত করিয়া), নিত্যং ধ্যানযোগপরঃ (সর্বদা ধ্যানে নিরত থাকিয়া), বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ (বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া), অহঙ্কারং, বলং (দুশ্চেষ্টা, পাশবিক বল) দর্পং, কামং, ক্রোধং, পরিগ্রহং (বাহ্য ভোগসাধনরূপ প্রতিগ্রহ) বিমুচ্য (ত্যাগ করিয়া) নির্মমঃ (মমত্ববুদ্ধিহীন) শান্তঃ (প্রশান্তচিত্ত) [সাধক] ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে (ব্রহ্মভাব লাভের উপযুক্ত হন)।

পরিগ্রহম্—শরীরধারণপ্রসঙ্গেন ধর্মানুষ্ঠাননিমিত্তেন বা বাহ্যঃ পরিগ্রহঃ প্রাপ্তঃ তম্ (শঙ্কর)—শরীরধারণার্থ বা ধর্মানুষ্ঠানার্থ লোকের নিকট হইতে অর্থ বা দ্রব্যাদি গ্রহণ। প্রকৃত যোগযুক্ত সাধু পুরুষ এ সকলও ত্যাগ করেন।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমং সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৫৪

বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক বুদ্ধিযুক্ত হইয়া, ধৈর্যসহ আত্মসংযমন করিয়া, শব্দাদি বিষয়সমূহ ত্যাগ করিয়া, রাগদ্বেষ বর্জন করিয়া, নির্জন স্থানে অবস্থিত ও মিতভোজী হইয়া, বাক্য, শরীর ও মনকে সংযত করিয়া, বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া, সর্বদা ধ্যানে নিরত থাকিয়া, অহঙ্কার, বল (পাশবিক শক্তির ব্যবহার), দর্প, কাম, ক্রোধ এবং বাহ্য ভোগ-সাধনার্থ প্রাপ্ত দ্রব্যাদি বর্জন করতঃ মমত্ববুদ্ধিহীন প্রশান্তচিত্ত সাধক ব্রহ্মভাব লাভে সমর্থ হন। ৫১।৫২।৫৩

৫১।৫২।৫৩তম,এই তিনটি শ্লোকে সাধকের যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে তাহা কর্মত্যাগী সন্ন্যাসীর লক্ষণ বলিয়াই বোধ হয়। বস্তুতঃ শব্দাদি বিষয় ত্যাগ, নিত্যধ্যানযোগপরতা, বিবিক্তদেশসেবিত্ব ইত্যাদি লক্ষণদ্বারা নির্বিঘ্নচিত্ত কর্মত্যাগী সিদ্ধপুরুষের বর্ণনাই করা হইয়াছে, সন্দেহ নাই। প্রকৃতপক্ষে, কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী বা নিষ্কাম ভক্তের চরম স্থিতি প্রায় একরূপই হয়, সুতরাং উক্ত বর্ণনা ১৪শ অধ্যায়ের ত্রিগুণাতীতের বর্ণনা (৪৪২ পৃঃ দ্রষ্টব্য) বা ১২শ অধ্যায়ের জ্ঞানী ভক্তের বর্ণনারই অনুরূপ। এইরূপ উচ্চ অবস্থা লাভ করিয়া যখন সাধক ধ্যাননিরত হইয়া সম্পূর্ণ শান্ত সমাহিত অবস্থায় থাকেন, তখন আর কর্ম থাকিবে কিরূপে ? কিন্তু ব্যুত্থিত অবস্থায় ঈদৃশ সিদ্ধ পুরুষগণও অনেকে লোকশিক্ষার্থ বা লোকরক্ষার্থ অনাসক্তভাবে কর্ম করিয়া থাকেন্ এবং গীতার মতে উহা করাই কর্তব্য। এই হেতুই ৩য় অধ্যায়ে ১৭।১৮শ শ্লোকে এইরূপ আত্মনিষ্ঠ আত্মতৃপ্ত সিদ্ধ পুরুষগণের নিজের কোন কর্তব্য নাই একথা বলিয়া শ্রীভগবান্ ১৯শ শ্লোকে সেই হেতুই অনাসক্ত ভাবে কর্ম করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এস্থলেও সেইরূপ ব্রহ্মভূত সিদ্ধপুরুষগণের অবস্থা বর্ণনা করিয়া পরেই বলিতেছেন, সর্বকর্ম করিয়াও আমার প্রসাদে অব্যয়পদ লাভ হয় (১৮।৫৬)। সুতরাং গীতার লক্ষ্য যে কর্মত্যাগ নয়, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

৫৪। ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত ব্যক্তি) প্রসন্নাত্মা (প্রসন্নচিত্ত হইয়া) ন শোচতি (শোক করেন না), ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষা করেন না); সর্বভূতেষু সমঃ (সর্বভূতে সমদর্শী হইয়া) পরাং মদ্ভক্তিং (আমাতে পরাভক্তি) লভতে (লাভ করেন)।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫
সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্‌ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৬

ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইলে পর তিনি প্রসন্নচিত্ত হইয়া (নষ্ট বস্তুর জন্য) শোক করেন না, বা (অপ্রাপ্ত বস্তুর জন্য) আকাঙ্ক্ষাও করেন না। তিনি সর্বভূতে সমদর্শী হন এবং আমাতে পরা ভক্তি লাভ করেন। ৫৪

৫৫। ভক্ত্যা (ভক্তিদ্বারা) [আমি] যাবান্ যঃ অস্মি (যে যে বহুরূপ, এবং একরূপ হই) তত্ত্বতঃ অভিজানাতি (স্বরূপতঃ তাহা জানিতে পারেন); ততঃ (পরে) মাং (আমাকে) তত্ত্বতঃ জ্ঞাত্বা (স্বরূপতঃ জানিয়া) তদনন্তরং (তাহার পর) বিশতে (প্রবেশ করেন)।

যাবান্ যশ্চ—আমি কত রূপ এবং কি অর্থাৎ আমার প্রকৃত স্বরূপ কি, আমার কি কি বিভাব, কত বিভূতি, আমিই নির্গুণ পরব্রহ্ম, সগুণ ঈশ্বর, আমিই বিশ্বময়, বিশ্বরূপ, হৃদয়ে পরমাত্মা, লীলায় অবতার; আমার নানা বিভাব, অনন্ত বিভূতি। এই তত্ত্বই অন্যত্র 'সমগ্রং মাং' কথায় ব্যক্ত করা হইয়াছে। (যিনি) এইরূপ পরাভক্তিদ্বারা আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে পারেন, (তিনিই) বুঝিতে পারেন—আমি কে, আমার কত বিভাব, আমার সমগ্র স্বরূপ কি; এবং এইরূপে আমাকে স্বরূপতঃ জানিয়া তদনন্তর (তিনি) আমাতে প্রবেশ করেন। ৫৫

৫৬। [তিনি] সদা সর্বকর্মাণি কুর্বাণঃ অপি (সর্ব কর্ম করিয়াও) মদ্‌ব্যপাশ্রয়ঃ (আমাকে আশ্রয় করিয়া) মৎপ্রসাদাৎ (আমার অনুগ্রহে) শাশ্বতম্ অব্যয়ং পদম্ (নিত্য, অক্ষয় স্থান) অবাপ্নোতি (প্রাপ্ত হন)।

আমাকে আশ্রয় করিয়া সর্বদা সর্বকর্ম করিতে থাকিলেও আমার প্রসাদে শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন। ৫৬

কর্মযোগে সিদ্ধিলাভ কিরূপে হয়? উপসংহারে ১৮।৪১-৬২ শ্লোকে শ্রীভগবান্ গীতোক্ত কর্মযোগের সারকথা বলিয়া কর্মদ্বারা কিরূপে সিদ্ধিলাভ হয়, তাহা স্পষ্টীকৃত করিতেছেন। এই কয়েকটি শ্লোকের স্থূল মর্ম এই—

(১) প্রকৃতি হইতে কেহই মুক্ত নহে। চাতুর্বর্ণ্যাদি ব্যবস্থা প্রকৃতির গুণভেদানুসারেই নিয়মিত হইয়াছে। সুতরাং বর্ণধর্ম স্বভাবনিয়ত, উহা পালন না করিলে সৃষ্টিরক্ষা হয় না, সুতরাং ভগবানের সৃষ্টিরক্ষার্থে প্রত্যেকেরই

যথাধিকার স্বকর্মে নিরত থাকা কর্তব্য। যথাবিহিত স্বধর্ম পালন দ্বারা সর্বেশ্বরেরই অর্চনা করা হয়, কেননা তাহা হইতেই জগতের বিস্তার ও জীবের কর্ম-প্রবৃত্তি (৪১-৪৬ শ্লোক)।

(২) কিন্তু কর্ম করিতে হইলেই ত প্রকৃতির মধ্যেই থাকিতে হইল এবং কর্মের ফলভোগও অনিবার্য—সুতরাং পুনঃ পুনঃ জন্ম আর কর্ম। তবে কি এই ভবচক্র হইতে নিষ্কৃতি নাই ?—না, তাহা নহে ? কর্ম করিয়াও কর্মবন্ধন এড়ান যায়, নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধি লাভ করা যায়। আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম করিলে তাহাতে বন্ধন হয় না ; নিষ্কাম কর্মে বন্ধন নাই ; উহারই নাম নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধি (৪৭-৪৯)।

(৩) কর্মবন্ধন বরং ঘুচিল, নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধি লাভ হইল, তাহাতেই কি ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হওয়া যায় ?—হাঁ, কিরূপে শুন। —নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি লাভ হইলে রাগদ্বেষ দূর হয়, সাত্ত্বিকী বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, অহঙ্কার, দর্প, কাম-ক্রোধাদি লোপ পায়, তখন যোগী শব্দাদি বিষয় ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করতঃ ধ্যান-যোগে রত থাকেন ; এইরূপে তিনি ব্রহ্মভূত হইয়া যান। (৫০-৫৩)।

(৪) ব্রহ্মভূত হইলেই ত মোক্ষ ? উহাই ত সিদ্ধির চরম অবস্থা ?—উহারও উপরের অবস্থা আছে। ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হইলে সর্বভূতে সমদর্শন ও নির্মল চিত্তপ্রসাদ লাভ হয়, তখন সর্বভূত-মহেশ্বর শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তমে পরাভক্তি জন্মে। এই অবস্থা লক্ষ করিয়াই শ্রীভাগবত বলিয়াছেন—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥ —ভাঃ ১।৭।১০

যাঁহারা আত্মারাম, যাঁহাদের অবিদ্যা-গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে, সেই মুনিগণও উরুক্রমে (শ্রীভগবানে) অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন ; হরির এমনি গুণ। (শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক ব্যাখ্যাত এই শ্লোকের ৬৪ প্রকার ব্যাখ্যা, চরিতামৃতে মধ্য ২৪ অঃ দ্রষ্টব্য)।

এই পরাভক্তি জন্মিলে ভগবানের প্রকৃত সমগ্র স্বরূপ যথার্থরূপে উপলব্ধ হয় এবং সাধক তাঁহাকে স্বরূপতঃ জানিয়া তাঁহাতেই তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হন। (৫৪-৫৫)

নিষ্কাম কর্ম হইতে কিরূপে ভগবৎ-প্রাপ্তি হয় ইহাই তাহার ক্রম।

এস্থলে জ্ঞানবাদী ও ভক্তিবাদীর মধ্যে এক সূক্ষ্ম তর্ক উপস্থিত হয়। জ্ঞানবাদী বলেন, জ্ঞান ব্যতীত মুক্তি নাই এবং এই হেতুই 'ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা'—আমাকে স্বরূপতঃ জানিয়া আমাতে প্রবেশ করেন, এস্থলে এই কথা আছে। ভক্তিবাদী বলেন, ব্রহ্মভাব লাভেই জীবের মুক্তি, ইহাই জ্ঞানমার্গের

চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭
মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ৫৮

চরম অবস্থা। কিন্তু এস্থলে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, ব্রহ্মভাব লাভ হইলেই আমাতে পরাভক্তি জন্মে এবং ভক্তিদ্বারাই আমার স্বরূপের অবগতি হইলে ভক্ত আমাকে প্রাপ্ত হন। সুতরাং এস্থলে ভক্তিরই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে; বস্তুতঃ পরম জ্ঞান ও পরা ভক্তিতে কোন পার্থক্য নাই, সাধক যে পথেই সাধনা আরম্ভ করুক না কেন, একটি থাকিলে অপরটি আসিবেই, সুতরাং জ্ঞান-ভক্তির প্রাধান্য লইয়া বিবাদ নিরর্থক।

৫৭। চেতসা (মনের দ্বারা) সর্বকর্মাণি (সমস্ত কর্ম) ময়ি সংন্যস্য (আমাতে সমর্পণ করিয়া) মৎপরঃ (মৎপরায়ণ হইয়া) বুদ্ধিযোগম্ উপাশ্রিত্য (সমত্ববুদ্ধিরূপ যোগ আশ্রয় করিয়া) সততং মচ্চিত্তঃ ভব (আমাতে নিবিষ্টচিত্ত হও)।

বুদ্ধিযোগ—গীতায় শ্রীভগবান্ যে যোগ বলিতেছেন, তাহাকে কখনও বুদ্ধিযোগ, কখনও বা কেবল যোগ শব্দদ্বারাই প্রকাশ করিয়াছেন। এস্থলে বুদ্ধি অর্থ শুদ্ধ সাম্য-বুদ্ধি, উহাই কর্মযোগের মূল, কর্ম করিবার সময় বুদ্ধিকে স্থির, পবিত্র, সম ও শুদ্ধ রাখাই সেই যোগ, 'যুক্তি' বা কৌশল যাহাতে কর্মের বন্ধন হয় না, সে কর্ম যাহাই হউক না কেন। এই হেতুই "কর্ম হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ" ইত্যাদি পূর্বে বলা হইয়াছে (২।৪৮-৫১ শ্লোক এবং ২২৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

২।৩০, ৪।৪২, ৮।৭ প্রভৃতি শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে, এ শ্লোকে উপসংহারে তাহারই পুনরুক্তি করা হইয়াছে।

কর্মযোগ অবলম্বনের শেষ উপদেশ ৫৭-৫৮

মনে মনে সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া, মৎপরায়ণ হইয়া, সাম্য-বুদ্ধিরূপ যোগ অবলম্বন করিয়া, সর্বদা আমাতে চিত্ত রাখ (এবং যথাধিকার স্বকর্ম করিতে থাক)। ৫৭

৫৮। মচ্চিত্তঃ (মদ্গতচিত্ত হইলে) ত্বং মৎপ্রসাদাৎ (তুমি আমার অনুগ্রহে) সর্বদুর্গাণি (সমস্ত সঙ্কট, দুঃখ) তরিষ্যসি (উত্তীর্ণ হইবে); অথ চেৎ (যদি) অহঙ্কারাৎ (অহঙ্কারবশতঃ) ন শ্রোষ্যসি (আমার কথা না শুন), বিনঙ্ক্ষ্যসি (তবে বিনষ্ট হইবে)।

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি ॥ ৫৯
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা।
কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥ ৬০

আমাতে চিত্ত রাখিলে তুমি আমার অনুগ্রহে সমস্ত সঙ্কট অর্থাৎ কর্মের শুভাশুভ ফল অতিক্রম করিবে। আর যদি আমার কথা না শুন, তবে বিনাশ-প্রাপ্ত হইবে। ৫৮

৫৯। অহঙ্কারম্ আশ্রিত্য (অহঙ্কার আশ্রয় করিয়া) ন যোৎস্যে (যুদ্ধ করিব না) ইতি যৎ মন্যসে (এইরূপ যে মনে করিতেছ), তে এষঃ ব্যবসায়ঃ (তোমার এই নিশ্চয়) মিথ্যা; প্রকৃতিঃ ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি (প্রকৃতি তোমাকে প্রবর্তিত করিবে)।

জীবের প্রকৃতি-পারতন্ত্র্য—ভগবানের কৃপা ভিন্ন মায়াত্যাগ হয় না ৫৯-৬০

তুমি অহঙ্কারবশতঃ এই যে মনে করিতেছ আমি যুদ্ধ করিব না, তোমার এই সঙ্কল্প মিথ্যা; প্রকৃতিই (তোমার ক্ষত্রিয় স্বভাব) তোমাকে (যুদ্ধকর্মে) প্রবর্তিত করিবে। (৩।২৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। ৫৯

৬০। [হে] কৌন্তেয়, মোহাৎ (মোহবশতঃ) যৎ কর্তুং ন ইচ্ছসি (যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ না) স্বভাবজেন স্বেন কর্মণা (স্বভাবজাত স্বীয় কর্মদ্বারা) নিবদ্ধঃ (আবদ্ধ হওয়ায়), অবশঃ (অবশ হইয়া) তৎ অপি করিষ্যসি (তাহাই করিবে)।

হে কৌন্তেয়, মোহবশতঃ তুমি যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, স্বভাবজ স্বীয় কর্মে আবদ্ধ থাকায় তোমাকে অবশ হইয়া তাহা করিতে হইবে। ৬০

প্রত্যেক জীবই পূর্বজন্ম-সংস্কারজাত স্বভাবানুসারে স্বীয় স্বীয় কর্মে আবদ্ধ আছে, তাহাকে অবশভাবেই সেই কর্ম করিতে হয়। সাংখ্যশাস্ত্রের পরিভাষায় বলা হয় প্রকৃতিই সেই কর্ম করান; পূর্ব শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে। বেদান্ত ও ভক্তি-শাস্ত্রে বলা হয় অন্তর্যামী বা ঈশ্বরই মায়ার দ্বারা সেই কর্ম করান, পরের শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে।

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৬১
তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥ ৬২
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩

৬১। হে অর্জুন, ঈশ্বরঃ মায়য়া (মায়া দ্বারা) যন্ত্রারূঢ়ানি [ইব] সর্বভূতানি ভ্রাময়ন্ (যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায় সর্বজীবকে ভ্রমণ করাইয়া) সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে (সর্ব জীবের হৃদয়ে) তিষ্ঠতি (অধিষ্ঠিত আছেন)।

হে অর্জুন, ঈশ্বর সর্ব জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া মায়াদ্বারা যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায় তাহাদিগকে ভ্রমণ করাইতেছেন। ৬১

সূত্রধর যেমন অন্তরালে থাকিয়া কৃত্রিম পুত্তলিকাদিগকে যন্ত্রদ্বারা রঙ্গমঞ্চে ইচ্ছামত নাচায়, ঈশ্বরও সেইরূপ হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া মায়াদ্বারা জীবগণকে সংসার-রঙ্গমঞ্চে নাচাইতেছেন।

৬২। হে ভারত, সর্বভাবেন (সর্বতোভাবে) তম্ এব শরণং গচ্ছ, তৎপ্রসাদাৎ (তাঁহার অনুগ্রহে) পরাং শান্তিং (পরম শান্তি) শাশ্বতং স্থানং চ (ও নিত্যধাম) প্রাপ্স্যসি (পাইবে)।

হে ভারত, সর্বতোভাবে তাঁহারই শরণ লও; তাঁহার প্রসাদে পরম শান্তি ও চিরন্তন স্থান প্রাপ্ত হইবে। ৬২

৬৩। ইতি গুহ্যাৎ গুহ্যতরং জ্ঞানং (এই গুহ্য হইতেও গুহ্য তত্ত্বজ্ঞান) ময়া তে আখ্যাতম্ (আমাকর্তৃক তোমার নিকট উক্ত হইল)। এতদ্ (ইহা) অশেষেণ বিমৃশ্য (সম্পূর্ণরূপে পর্যালোচনা করিয়া)) যথা ইচ্ছসি তথা কুরু (যাহা ইচ্ছা হয়, কর)।

আমি তোমার নিকট এই গুহ্য হইতেও গুহ্য তত্ত্বকথা ব্যাখ্যা করিলাম, তুমি ইহা বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিয়া যাহা ইচ্ছা হয় তাহা কর। ৬৩

প্রকৃতি-পারতন্ত্র্য ও আত্মস্বাতন্ত্র্য। এস্থলে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—তুমি ইচ্ছা না করিলেও প্রকৃতি তোমাকে স্বাভাবিক কর্মে প্রবর্তিত করিবে, তোমাকে অবশভাবেই সে কর্ম করিতে হইবে। অন্যত্রও আছে,—'প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি' (৩।৩৩ শ্লোক)। প্রকৃতির প্রেরণায় কর্ম, কর্মফলে সদসৎ যোনিতে জন্ম, জন্মিয়া আবার কর্ম, কর্মফলে আবার জন্ম।

সুতরাং দেখা যায়, জীবকে অবিরত জন্ম-কর্মের ভবচক্রেই ঘুরিতে হয়। এই প্রকৃতি-পারতন্ত্র্য বা কর্মবিপাক হইতে মুক্তিলাভের উপায় কি? জ্ঞানলাভার্থ, মোক্ষার্থ জীবের কি কোন স্বাতন্ত্র্য নাই। অধ্যাত্মশাস্ত্র বলেন, আছে। পরমাত্মা শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব এবং তিনিই বা তাঁহারই সনাতন অংশ জীবাত্মরূপে দেহে আছেন; তিনি কখনও প্রকৃতির পরতন্ত্র হইতে পারেন না। দেহেন্দ্রিয়াদির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ায় তাঁহাকে বদ্ধ ও পরাধীনের ন্যায় বোধ হয়; তিনি মায়াধীন হন। কিন্তু তাহা হইলেও স্বতঃই তাঁহার মুক্ত হইবার প্রেরণা আসে। গুরূপদেশ, সাধুসঙ্গ প্রভৃতি অনুকূল অবস্থায় সেই প্রেরণা মন এবং বুদ্ধির উপর কার্য করে, তাহাতেই মনুষ্যের মনে আত্মোন্নতি বা মোক্ষানুকূল কর্ম করিবার প্রবৃত্তি জন্মে। কথাটা অন্যভাবেও বুঝান যায়। আমাদের মধ্যে দুইটি 'আমি' আছে। একটি—কাঁচা আমি, বদ্ধ আমি, অহঙ্কারী আমি, প্রকৃতির দাস আমি (Lower-self, ego-sense); আর একটি—পাকা 'আমি', শুদ্ধ, বুদ্ধ স্বতন্ত্র 'আমি' (Higher self, soul)। এই পাকা 'আমি'দ্বারা কাঁচা 'আমি' উদ্ধার করিতে হইবে, ৬।৫-৬ শ্লোকে 'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্' ইত্যাদি কথার মর্ম ইহাই (২০১-০৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এই গেল জ্ঞানমার্গের কথা। কিন্তু ভক্তিমার্গে বলা হয় যে, শ্রীভগবান্ই অন্তর্যামিরূপে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া জীবকে যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায় মায়াদ্বারা চালাইতেছেন, সুতরাং সর্বতোভাবে তাঁহার শরণ লইলেই তাঁহার প্রসাদে মুক্তিলাভ হয় (৮।২২, ১০।১০, ১৮।৬১-৬২)। ইহাই **কৃপাবাদ**। মনে রাখা প্রয়োজন, কৃপাবাদ অর্থ নিশ্চেষ্টতা নয়, আত্মচেষ্টা ব্যতীত ভগবৎকৃপা হয় না, "ন ঋতে শ্রান্তস্য সখ্যায় দেবাঃ" (ঋক্ ৪।৩৩।২১)—নিজে শ্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত দেবতারাও সাহায্য করেন না।

পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণ ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্য (Freedom of the Will) সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছেন, কিন্তু কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। আর্য ঋষিগণ সাংখ্য-বেদান্তাদি শাস্ত্রে মনস্তত্ত্ব ও আত্মতত্ত্বের যে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, 'ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্য' শব্দটিই একরূপ অর্থহীন। কারণ, ইচ্ছা মনের ধর্ম; মন বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়, মনবুদ্ধি প্রকৃতিরই পরিণাম এবং প্রকৃতির গুণানুসারেই বিভিন্ন হয়, সুতরাং ইচ্ছাও সর্বদাই প্রকৃতির অধীন—উহার স্বাতন্ত্র্য নাই। উহার স্বাতন্ত্র্য তখনই হয়, যখন জীব ত্রিগুণাতীত বা নিত্যসত্ত্বস্থ হয়, অর্থাৎ জীবের স্বাতন্ত্র্য-ইচ্ছা থাকে না, যখন জীবের ইচ্ছা এবং

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢমিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥ ৬৪
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥ ৬৫
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬

ঈশ্বরেচ্ছা এক হইয়া যায়—প্রকৃতপক্ষে উহা আত্ম-স্বাতন্ত্র্য, 'ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্য' নহে। এই হেতুই গীতায় মিশ্র-সাত্ত্বিক বুদ্ধিকেও বন্ধনের কারণই বলা হইয়াছে (৪৩৩-৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

৬৪। সর্বগুহ্যতমং (সর্বাপেক্ষা গুহ্যতম) মে পরমং বচঃ (আমার উৎকৃষ্ট বাক্য) ভূয়ঃ শৃণু (পুনরায় শ্রবণ কর); [তুমি] মে দৃঢ়ম্ ইষ্টঃ অসি (আমার অত্যন্ত প্রিয় হও); ততঃ (সেই হেতু) তে হিতং বক্ষ্যামি (তোমাকে হিতকর কথা বলিতেছি)।

সর্বধর্ম ত্যাগ করিয়া আমার শরণ লও ৬৪-৬৬

এখন সর্বাপেক্ষা গুহ্যতম পরমশ্রেয়ঃসাধন আমার কথা শ্রবণ কর; তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, এই হেতু তোমাকে এই কল্যাণকর কথা বলিতেছি। ৬৪

৬৫। [তুমি] মন্মনাঃ (মদেকচিত্ত), মদ্ভক্তঃ (আমার ভক্তঃ), মদ্‌যাজী (আমার পূজক) ভব (হও), মাং নমস্কুরু (আমাকে নমস্কার কর), [আমি] তে সত্যং প্রতিজানে (তোমার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি) মাম্ এব এষ্যসি (আমাকেই পাইবে), [কেননা তুমি] মে প্রিয়ঃ অসি (আমার প্রিয় হও)।

তুমি একমাত্র আমাতেই চিত্ত রাখ, আমাকে ভক্তি কর, আমাকে পূজা কর, আমাকে নমস্কার কর। আমি সত্য প্রতিজ্ঞাপূর্বক বলিতেছি, তুমি আমাকেই পাইবে, কেননা তুমি আমার প্রিয়। ৬৫

৬৬। সর্বধর্মান্ (সকল ধর্ম) পরিত্যজ্য (পরিত্যাগ করিয়া) এবং মাং (কেবলমাত্র আমাকে) শরণং ব্রজ (আশ্রয় কর): অহং (আমি) ত্বাং (তোমাকে) সর্বপাপেভ্যঃ (সমস্ত পাপ হইতে) মোক্ষয়িষ্যামি (মুক্ত করিব), মা শুচঃ (শোক করিও না)।

['অহং ত্বা···মোচয়িষ্যামি'—পাঠান্তর আছে]।

সকল ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি একমাত্র আমারই শরণ লও; আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না। ৬৬

সর্বধর্মত্যাগ—গীতার ভক্তিমূলক উপসংহার

শ্রীভগবান্ উপসংহারে সর্বগুহ্যতম এই কথা বলিলেন—"সর্বধর্ম ত্যাগ করিয়া আমার শরণ লও।" এস্থলে 'ধর্ম' বলিতে কি বুঝায়? ভগবৎ-প্রাপ্তি, মোক্ষলাভ বা স্বর্গাদি পারলৌকিক মঙ্গল লাভার্থ যে সকল অনুষ্ঠেয় কর্ম শাস্ত্রাদিতে নির্দিষ্ট আছে, ব্যাপক অর্থে তাহাকেই ধর্ম বলে; যেমন—গার্হস্থ্য-ধর্ম, সন্ন্যাস-ধর্ম, রাজ-ধর্ম, পাতিব্রত্য-ধর্ম, দান-ধর্ম, অহিংসা-ধর্ম ইত্যাদি। এই অর্থে 'ধর্ম' শব্দ মহাভারতে পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে এবং এই সকল বিভিন্ন ধর্মের গণ্ডগোলে পড়িয়া যে অনেক সময় দিশেহারা হইতে হয়, স্থলবিশেষে তাহার উল্লেখ আছে। যথা—

"সেই বিপ্র বেদোক্ত ধর্ম, শাস্ত্রোক্ত ধর্ম, শিষ্টগণের আচরিত ধর্ম—এই ত্রিবিধ ধর্ম মনে মনে চিন্তা করিয়া কি করিলে আমার শুভ হয়, কোন্ ধর্ম আমার পরম অবলম্বন, ইহা ভাবিতে ভাবিতে নিয়ত খিন্ন হইতে লাগিলেন।" ইত্যাদি(মভাঃ শাং ৩৫৩।৩৫৪, অপিচ অশ্ব ৪৯ দ্রষ্টব্য)।

উপরি-উদ্ধৃত বাক্যসমূহে 'ধর্ম' শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এই শ্লোকেও 'ধর্ম' শব্দ ঠিক সেই অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে এবং পূর্বোক্ত বিপ্র যেমন নানারূপ ধর্ম-সঙ্কটে পড়িয়া কর্তব্য-বিমূঢ় হইয়াছিলেন, অর্জুনও তদ্রূপ 'ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ' (২।৭) অর্থাৎ কার্যাকার্য নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার মোহ অপসারণার্থে শ্রীভগবান্ এ পর্যন্ত কর্মজ্ঞান-ভক্তিমিশ্র অপূর্ব যোগধর্মের উপদেশ প্রদান করিলেন। পরিশেষে সর্বগুহ্যতম এই সারকথাটি বলিয়া দিলেন—শ্রুতি, স্মৃতি বা লোকাচারমূলক নানা ধর্মের নানারূপ বিধিনিষেধের দাসত্ব ত্যাগ করিয়া ('বিধিকৈঙ্কর্যং ত্যক্ত্বা'—শ্রীধর; abandoning all rules of conduct—*Aurobindo*) তুমি সর্বতোভাবে আমার শরণ লও, আমার কর্মবোধে যথাপ্রাপ্ত কর্তব্য কর্ম করিয়া যাও, তোমার কোন ভয় নাই, আমিই তোমাকে সর্বপাপ হইতে মুক্ত করিব। ইহাই গীতায় শ্রীভগবানের অভয়বাণী, ইহাই ভক্তিমার্গের সারকথা। ইহারই নাম ভগবৎ-শরণাগতি বা আত্মসমর্পণ-যোগ। ভক্তিশাস্ত্রে শরণাগতির ষড়্‌বিধ লক্ষণ বর্ণিত আছে। যথা—

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥

শ্রীভগবানের প্রীতিজনক কার্যে প্রবৃত্তি, প্রতিকূল কার্য হইতে নিবৃত্তি, তিনি রক্ষা করিবেন বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস, রক্ষাকর্তা বলিয়া তাঁহাকেই বরণ,

তাঁহাতে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ এবং 'রক্ষা কর' বলিয়া দৈন্য ও আর্তি প্রকাশ—এই ছয়টি শরণাগতির লক্ষণ (বায়ুপুরাণ; হরিভক্তি-বিলাস ১১।৪১৭; চরিতামৃত, মধ্য ২৩।৮৩)

শ্রীভাগবতেও সর্বধর্মত্যাগী ভগবদ্ভক্তকেই শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। যথা—

প্রাজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান।

ধর্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজেৎ স তু সত্তমঃ ॥

আমাকর্তৃক বিহিত বেদোক্ত ধর্মসকলের আচরণে সত্ত্বশুদ্ধ্যাদি গুণ ও অনাচরণে দোষ, ইহা জানিয়াও যিনি সর্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকেই ভজনা করেন তিনিও সাধুশ্রেষ্ঠ (ভাঃ ১১।১১।৩২, অপিচ ১১।২৯।৩৩-৩৪)।

সর্বকর্মত্যাগ এবং শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণের তত্ত্ব ভক্তিশাস্ত্রানুসারে পূর্বে ব্যাখ্যাত হইল। কিন্তু এই শ্লোকের জ্ঞানমূলক ব্যাখ্যাও আছে। কেহ কেহ বলেন, এস্থলে ধর্ম শব্দে অধর্মেরও সন্নিবেশ করিতে হইবে ('ধর্মশব্দেনাত্র অধর্মোঽপি গৃহ্যতে, সর্বধর্মান্ সর্বকর্মাণীত্যেতৎ'—শাঙ্করভাষ্য)। ধর্মাধর্ম প্রকৃতির, পুরুষ ধর্মাধর্মের অতীত। সুতরাং ধর্মাধর্ম ত্যাগ করার অর্থ এই, প্রকৃতি হইতে মুক্ত হইয়া সর্বকর্ম ত্যাগ করিয়া ধর্মাধর্মের অতীত নির্গুণ ব্রহ্মের আশ্রয় লও। কঠোপনিষদে (২।১৪) এবং মহাভারতে 'ত্যজ ধর্মমধর্মঞ্চ' (শাং ৩২৯, ৩৩১) ইত্যাদি শ্লোকে এইরূপ জ্ঞানমার্গের উপদেশ আছে। জ্ঞানী, স্থিতপ্রজ্ঞ, কর্মযোগীও ধর্মাধর্মের অতীত, গীতায়ও একথা পূর্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু এস্থলে "মদ্ভক্ত হও, মদ্‌যাজী হও, আমাকে নমস্কার কর, একমাত্র আমার আশ্রয় লও" ইত্যাদি কথায় যে নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, এরূপ বোধ হয় না।

এ প্রসঙ্গে লোকমান্য তিলক বলেন—"এখানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজের ব্যক্ত স্বরূপের বিষয়ই বলিতেছেন; এই কারণে আমার দৃঢ়মত এই যে, এই উপসংহার ভক্তিপ্রধানই, এখানে নির্গুণ ব্রহ্ম বিবক্ষিত নহে। ···নানা মার্গের গণ্ডগোলের মধ্যে পড়িলে মন হতবুদ্ধি হইতে পারে বলিয়া শুধু অর্জুনকে নহে, অর্জুনকে উপলক্ষ করিয়া ভগবান্ সকলকেই এই নিশ্চিত আশ্বাস দিতেছেন যে, অনেক ধর্মমার্গ ছাড়িয়া তুমি শুধু আমারই শরণ লও, আমি তোমাকে সর্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব"······শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ স্বর্ণপাত্রস্থিত উপাদেয় অন্নের মধ্যে 'ভক্তিরূপ' এই অন্তিম গ্রাসটি বড়ই মধুর; ইহাই 'প্রেমগ্রাস'।

—গীতা-রহস্য

ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥ ৬৭
য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮

৬৭। ইদং (ইহা) তে (তোমার) অতপস্কায় (তপস্যাবিহীন, স্বধর্মানুষ্ঠানহীন ব্যক্তিকে) ন বাচ্যং (বলা উচিত নয়), ন অভক্তায় (ভক্তিহীনকেও নহে), ন চ অশুশ্রূষবে (শ্রবণে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকেও নহে), ন চ মাং যঃ অভ্যসূয়তি (যে আমাকে অসূয়া করে তাহাকেও নহে)।

অতপস্কায়—তপোরহিতায় (শঙ্কর), স্বধর্মানুষ্ঠানরহিতায় (শ্রীধর)—যে তপস্যাহীন বা স্বধর্মানুষ্ঠানহীন। **অশুশ্রূষবে**—পরিচর্যামকুর্বতে শ্রোতুমনিচ্ছতে বা (শঙ্কর)—যে গুরুসেবাদি করে না অথবা শ্রবণে অনিচ্ছুক।

গীতা-জ্ঞানের অধিকারী, গীতার পাঠ, ব্যাখ্যা ও শ্রবণের ফল ৬৭-৭১

যে তপস্যা করে না বা স্বধর্মানুষ্ঠান করে না, যে অভক্ত, যে শুনিবার ইচ্ছা রাখে না এবং যে আমাকে নিন্দা করে, এরূপ ব্যক্তিকে তুমি গীতাশাস্ত্র বলিবে না। ৬৭

৬৮। যঃ (যে) ইদং পরমং গুহ্যং (এই পরম গুহ্য শাস্ত্র) মদ্ভক্তেষু (আমার ভক্তগণ মধ্যে) অভিধাস্যতি (ব্যাখ্যা করিবেন) [তিনি] ময়ি পরাং ভক্তিং কৃত্বা (আমাতে পরা ভক্তি করিয়া), মাম্ এব এষ্যতি (আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন), [ইহা] অসংশয়ঃ (নিঃসন্দেহ)।

যিনি এই পরম গুহ্যশাস্ত্র আমার ভক্তগণের নিকট ব্যাখ্যা করিবেন, তিনি আমাকে পরাভক্তি করায় (অর্থাৎ এই কার্যে আমি ভগবানেরই উপাসনা করিতেছি এইরূপ মনে করায়) আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। ৬৮

গীতাজ্ঞানের অধিকারী কে? সকল ধর্মই উপযুক্ত শিষ্য-পরম্পরায় লোকমধ্যে প্রচারিত হয় এবং এইরূপে বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। শ্রীভগবান্ এই শ্লোকে গীতোক্ত ধর্মের পরম্পরা রক্ষার্থ—এই ধর্মে শিক্ষা-দীক্ষালাভের অধিকারী কে, তাহাই নির্দেশ করিতেছেন ('শাস্ত্রসম্প্রদায়-বিধিমাহ'—শঙ্কর; 'সম্প্রদায়-প্রবর্তনে নিয়মমাহ'—শ্রীধর)। কিন্তু গীতা-ধর্ম অবলম্বনে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় নাই, কেননা সকলেই ইহাকে আপনার বলিয়া মনে করেন। ইহাই গীতার বিশিষ্টতা।

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥ ৬৯

এস্থলে বলা হইয়াছে, চারি প্রকার ব্যক্তি গীতা শ্রবণের অনধিকারী। প্রথমতঃ, অতপস্ক অর্থাৎ যে তপঃ করে না। যাহা যাহার পক্ষে শাস্ত্রবিহিত, অর্থাৎ যাহা যাহার স্বধর্ম তাহাই তাহার তপঃ, মন্বাদি শাস্ত্রে এইরূপ উল্লেখ আছে (মনু ১১।২৩৬, হারীত স্মৃতি ৭।৯-১১)। এই অর্থ গ্রহণ করিয়াই শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন, অতপস্ক অর্থ স্বধর্মানুষ্ঠান-রহিত। যে স্বধর্ম কি তাহা জানে না এবং স্বধর্মের অনুষ্ঠান করে না, তাহার নিকট গীতার বিশেষ মূল্য নাই, গীতায়ও তাহার অধিকার নাই, কেননা স্বধর্মপালন গীতোক্ত ধর্মের একটি প্রধান অঙ্গ। দ্বিতীয়তঃ, যে অভক্ত, যাহার ঈশ্বরে ভক্তি-শ্রদ্ধা নাই, শুষ্ক জ্ঞান ও শাস্ত্রপাণ্ডিত্য যাহার সম্বল, এইরূপ ব্যক্তি গীতাশ্রবণে অনধিকারী, কেননা গীতা আদ্যোপান্ত ভক্তিবাদে সমুজ্জ্বল, ভক্তিহীনের নিকট ইহার মর্ম প্রতিভাত হইবে না, বরং কদর্থ হওয়ার সম্ভাবনা। তৃতীয়তঃ, যে শুশ্রূষাপরায়ণ নহে, সেও গীতাজ্ঞানে অনধিকারী। শুশ্রূষা শব্দের দুই অর্থ—(১) শ্রবণের ইচ্ছা, বা (২) পরিচর্যা, সেবা। এস্থলে যে কোন অর্থ গ্রহণ করা যায়। যে শ্রদ্ধান্বিত ও আগ্রহশীল হইয়া ধর্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করে তাহাকেই উপদেশ দেওয়া কর্তব্য, গায়ে পড়িয়া উপদেশ দিলে বিপরীত ফল ফলে। অথবা যে সেবাপরায়ণ নহে, সেও ইহা গ্রহণে অনধিকারী; কেননা লোক-সেবাই ভগবানের অর্চনা; ইহা ভাগবত-ধর্মের একটি মুখ্য তত্ত্ব। সেবা-মাহাত্ম্য যে বুঝে নাই, সে ভাগবত-ধর্মও বুঝিবে না (২২৩-২৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। চতুর্থ, অনধিকারী, যাহারা শ্রীভগবানের অসূয়াকারী, যাহাদিগকে 'অসুর', 'পাষণ্ডী' ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। এস্থলে শ্রীভগবানের অবতার-স্বরূপের কথাই বলা হইতেছে, যেমন— শ্রীকৃষ্ণাবতারে ভীষ্মদেব, সঞ্জয়, দ্রুপদ, পাণ্ডবগণ—ইঁহারা ছিলেন ভগবদ্ভক্ত; পক্ষান্তরে কংস, শিশুপাল, জরাসন্ধ, দুর্যোধন প্রভৃতি ছিলেন ভগবদ্বিদ্বেষী। ইহাদের গীতায় অধিকার নাই; কেননা, যাহারা শ্রীভগবান্‌কেই মানে না, তাহারা ভাগবত-ধর্ম কিরূপে বুঝিবে?

৬৯। মনুষ্যেষু (মনুষ্যগণমধ্যে) তস্মাৎ (তাহা অর্থাৎ গীতা-ব্যাখ্যাতা অপেক্ষা) কশ্চিৎ (কেহ) মে প্রিয়কৃত্তমঃ চ ন (আমার অধিক প্রিয়কারী নাই), তস্মাৎ অন্যঃ (তাহা অপেক্ষা অন্য কেহ) মে প্রিয়তরঃ চ (আমার অধিক প্রিয়) ভুবি ন ভবিতা (পৃথিবীতে হইবে না)।

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাঁল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্মণাম্ ॥ ৭১
কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২

মনুষ্যমধ্যে গীতা-ব্যাখ্যাতা অপেক্ষা আমার অধিক প্রিয়কারী আর কেহ নাই এবং পৃথিবীতে তাহা অপেক্ষা আমার অধিক প্রিয় আর কেহ হইবেও না। ৬৯

৭০। যঃ চ (আর যিনি) আবয়োঃ (আমাদের উভয়ের) ইমং (এই) ধর্ম্ম্যং সংবাদম্ (ধর্মবিষয়ক কথোপকথন) অধ্যেষ্যতে (অধ্যয়ন করিবেন) তেন (তাহা কর্তৃক) অহং (আমি)) জ্ঞানযজ্ঞেন ইষ্টঃ (জ্ঞানযজ্ঞদ্বারা পূজিত) স্যাম্ (হইব), ইতি মে মতিঃ (ইহা আমার মত)।

আর যিনি আমাদের এই ধর্মসংবাদ (গীতাশাস্ত্র) অধ্যয়ন করিবেন, তিনি জ্ঞানযজ্ঞদ্বারা আমার অর্চনা করিলেন, ইহাই আমি মনে করিব। ৭০

৭১। শ্রদ্ধাবান্ অনসূয়ঃ চ (ও অসূয়াশূন্য) যঃ নরঃ (যে ব্যক্তি) শৃণুয়াৎ অপি (কেবলমাত্র শ্রবণ করেন) সঃ অপি মুক্তঃ (তিনিও মুক্ত হইয়া) পুণ্যকর্মণাম্ (পুণ্যকর্মকারিগণের) শুভান্ লোকান্ (শুভ লোকসকল) প্রাপ্নুয়াৎ (প্রাপ্ত হন)।

যিনি শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াশূন্য হইয়া শ্রবণ করেন, তিনিও পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পুণ্যবান্‌গণের প্রাপ্য শুভ লোকসকল প্রাপ্ত হন। ৭১

৭২। হে পার্থ, ত্বয়া (তোমা কর্তৃক) একাগ্রেণ চেতসা (একাগ্রচিত্তে) এতৎ শ্রুতং কচ্চিৎ (ইহা শুনা হইয়াছে ত)? হে ধনঞ্জয়, তে অজ্ঞানসম্মোহঃ (অজ্ঞানজনিত মোহ) প্রনষ্টঃ কচ্চিৎ (বিনষ্ট হইল ত)?

কচ্চিৎ—কি? ত?—প্রশ্নবোধক অব্যয়।

অর্জুনের মোহনাশ ও যুদ্ধে ইচ্ছা প্রকাশ ৭২-৭৩

হে পার্থ, তুমি একাগ্রমনে ইহা শুনিয়াছ ত? হে ধনঞ্জয়, তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ দূর হইয়াছে ত? ৭২

অর্জুন উবাচ

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্ ॥ ৭৪

ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবানেতদ্ গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ং ॥ ৭৫

৭৩। অর্জুনঃ উবাচ—হে অচ্যুত, ত্বৎপ্রসাদাৎ (তোমার প্রসাদে) মোহঃ নষ্টঃ, ময়া (আমা কর্তৃক) স্মৃতিঃ (কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞান) লব্ধা (লাভ হইল), গতসন্দেহঃ (নিঃসংশয় হইয়া) স্থিতঃ অস্মি (স্থির হইয়াছি), তব বচনং করিষ্যে (তোমার কথামত কার্য করিব)।

অর্জুন বলিলেন,—হে অচ্যুত, তোমার প্রসাদে আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে, আমার কর্তব্যাকর্তব্য-জ্ঞান লাভ হইল, আমি স্থির হইয়াছি, আমার আর সংশয় নাই, আমি তোমার উপদেশ মত কার্য (যুদ্ধ) করিব। ৭৩

৭৪। সঞ্জয়ঃ উবাচ—ইতি (এইরূপে) অহং মহাত্মনঃ বাসুদেবস্য পার্থস্য চ (মহাত্মা বাসুদেবের এবং অর্জুনের) ইমং রোমহর্ষণম্ অদ্ভুতং সংবাদম্ (এই রোমাঞ্চকর অদ্ভুত কথোপকথন) অশ্রৌষম্ (শ্রবণ করিয়াছি)।

সঞ্জয়কৃত উপসংহার ৭৪-৭৮

সঞ্জয় বলিলেন,—এইরূপে মহাত্মা বাসুদেব এবং অর্জুনের এই অদ্ভুত লোমহর্ষকর সংবাদ আমি শ্রবণ করিয়াছি। ৭৪

মহাভারতে ভীষ্মপর্বের ধৃতরাষ্ট্র-সঞ্জয় সংবাদের অন্তর্গত এই কৃষ্ণার্জুন-সংবাদ বা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। পূর্ব শ্লোকে কৃষ্ণার্জুন-সংবাদ শেষ হইল এবং ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়ের কথোপকথন পুনরায় আরম্ভ হইল।

৭৫। অহং ব্যাসপ্রসাদাৎ (ব্যাসদেবের অনুগ্রহে) এতৎ পরং গুহ্যং যোগং (এই পরম গুহ্য যোগশাস্ত্র) সাক্ষাৎ কথয়তঃ (বক্তা) স্বয়ং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ (স্বয়ং যোগেশ্বর কৃষ্ণ হইতে) শ্রুতবান্ (শুনিয়াছি)।

ব্যাসদেবের প্রসাদে সাক্ষাৎ যোগেশ্বর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতেই আমি এই যোগশাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছি। ৭৫

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ॥ ৭৬
তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ॥ ৭৭
যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥ ৭৮

ব্যাসপ্রসাদাৎ—ব্যাসদেবের প্রসাদে অর্থাৎ ব্যাসদেব দিব্য চক্ষুকর্ণ প্রদান করাতে (১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। **যোগেশ্বর**—(২৮৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

এই গীতাশাস্ত্রকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও সঞ্জয়—তিন জনেই যোগশাস্ত্র বলিয়াছেন (৪।১, ৬।৩৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। মোহপ্রাপ্ত অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবর্তন করণার্থই গীতারম্ভ হইয়াছে এবং এই যোগশাস্ত্র শ্রবণ করিয়া অর্জুনও 'নষ্টো মোহঃ' হইয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন (১৮।৭৩)। সুতরাং এই গীতাশাস্ত্র কেবল সাংখ্যজ্ঞান ও নিবৃত্তিলক্ষণ সন্ন্যাসমার্গের উপদেশ দিয়াছেন, এরূপ মতবাদ সমীচীন বোধ হয় না। 'যোগ' বলিতে সমত্ববুদ্ধি ও কর্মযোগ বুঝায়, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে (ভূমিকা ও ১৩৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

৭৬। হে রাজন্, কেশবার্জুনয়োঃ (কেশব ও অর্জুনের) ইমং (এই) পুণ্যম্ (পবিত্র) অদ্ভুতং সংবাদং সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য (পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া) মুহুর্মুহুঃ হৃষ্যামি (ক্ষণে ক্ষণে হৃষ্ট হইতেছি)।

হে রাজন্, কেশব ও অর্জুনের এই পবিত্র অদ্ভুত সংবাদ বারংবার স্মরণ করিয়া মুহুর্মুহুঃ হর্ষ হইতেছে। ৭৬

৭৭। হে রাজন্, হরেঃ (হরির) তৎ অত্যদ্ভুতং রূপং (সেই অতি অদ্ভুত বিশ্বরূপ) সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য (পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া) মে (আমার) মহান্ বিস্ময়ঃ চ (অতিশয় বিস্ময় হইতেছে), [আমি] পুনঃ পুনঃ হৃষ্যামি (হৃষ্ট হইতেছি)।

হে রাজন্, হরির সেই অতি অদ্ভুত বিশ্বরূপ স্মরণ করিয়া আমার অতিশয় বিস্ময় জন্মিতেছে এবং বার বার হর্ষ হইতেছে। ৭৭

৭৮। যত্র (যে পক্ষে) যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ, যত্র ধনুর্ধরঃ পার্থঃ, তত্র শ্রীঃ (লক্ষ্মী), বিজয়ঃ, ভূতিঃ (অভ্যুদয়, সম্পদবৃদ্ধি), ধ্রুবা নীতিঃ (অখণ্ডিত রাজনীতি), ইতি মম মতিঃ (ইহা আমার মত)।

যোগেশ্বর—'যোগ' অর্থ উপায়, কৌশল, যুক্তি। যিনি যোগের ঈশ্বর অর্থাৎ অপূর্ব কৌশলী (২৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

যে পক্ষে যোগেশ্বর কৃষ্ণ এবং যেখানে ধনুর্ধর পার্থ, সেখানেই লক্ষ্মী, বিজয়, উত্তরোত্তর ঐশ্বর্যবৃদ্ধি ও অখণ্ডিত রাজনীতি আছে, ইহাই আমার মত। ৭৮

[অতএব আপনি পুত্রগণের জয়লাভের আশা ত্যাগ করুন, পাণ্ডবগণের সঙ্গে সন্ধি করুন।]

এস্থলে "যোগেশ্বর ও ধনুর্ধর" এই বিশেষণের সার্থকতা লক্ষ করিবার বিষয়। যুক্তি ও শক্তি মিলিত হইলেই কার্য-সফলতা সম্ভবপর, নচেৎ কেবল বলে বা কেবল বুদ্ধিদ্বারা কৃতকার্য হওয়া যায় না। জরাসন্ধ-বধের সফলতা সম্বন্ধে যুধিষ্ঠিরের সন্দেহ নিরসনার্থ শ্রীকৃষ্ণ ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন—"ময়ি নীতির্বলং ভীমে রক্ষিতারাবয়োর্জয়ঃ" (মভাঃ সভাঃ ২০।৩)।

অষ্টাদশ অধ্যায়—বিশ্লেষণ ও সার-সংক্ষেপ

মোক্ষযোগ

১-৬ সন্ন্যাস ও ত্যাগের ব্যাখ্যা—যজ্ঞাদি নিঃসঙ্গ বুদ্ধিতে কর্তব্য ; ৭-১২ ত্রিবিধ ত্যাগ—কর্মফলত্যাগী সাত্ত্বিক ত্যাগী ; ১১-১৭ কর্ম-সম্পাদনে পঞ্চবিধ কারণ—অহঙ্কারবুদ্ধি না থাকিলে কর্মের ফলভাগিত্ব নাই ; ১৮-১৯ কর্মতত্ত্ব-বিশ্লেষণ—কর্ম-প্রেরণা, কর্ম-সংগ্রহ ; ২০-৩৯ সাত্ত্বিকাদি গুণভেদে জ্ঞান, কর্ম, কর্তা ত্রিবিধ এবং কর্তার বুদ্ধি ধৃতি ও সুখও ত্রিবিধ, তন্মধ্যে সাত্ত্বিক ভাব মোক্ষপ্রদ ; ৪০ কিছুই ত্রিগুণ হইতে মুক্ত নহে ; ৪১-৪৪ চাতুর্বর্ণ্য ধর্ম ও স্বভাবনিয়ত কর্ম বা স্বধর্ম ; ৪৫-৪৯ স্বধর্ম অত্যাজ্য, নিঃসঙ্গবুদ্ধিতে স্বধর্মাচরণে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি ; ৫০-৫৬ কর্মযোগে মোক্ষ বা ভগবৎ-প্রাপ্তি কিরূপে হয় ; ৫৭-৫৮ কর্মযোগ অবলম্বনের শেষ উপদেশ ; ৫৯-৬৩ জীবের প্রকৃতি-পারতন্ত্র্য, ভগবানের কৃপা ভিন্ন মায়া ত্যাগ হয় না ; ৬৪-৬৬ 'সর্ব ধর্ম ত্যাগ করিয়া আমার শরণ লও'—ভগবানের শেষ অভয়বাণী ; ৬৭ গীতা-জ্ঞানের অধিকারী ; ৬৮-৭১ গীতাব্যাখ্যা, গীতাপাঠ, গীতা শ্রবণের ফল ; ৭২-৭৩ অর্জুনের মোহনাশ ও যুদ্ধে ইচ্ছা প্রকাশ ; ৭৪-৭৮ সঞ্জয়কৃত উপসংহার।

ত্যাগ ও সন্ন্যাস। বেদের উপনিষৎ ভাগে প্রধানতঃ নিবৃত্তিমার্গ, অর্থাৎ সর্বকর্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণই মোক্ষ লাভের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া উপদিষ্ট

হইয়াছে। স্মার্তমতেও মোক্ষলাভার্থ অন্তিমে চতুর্থাশ্রম বা সন্ন্যাসেরই ব্যবস্থা। কিন্তু শ্রীভগবান্ এ পর্যন্ত 'ত্যাগ' ও 'সন্ন্যাস' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে কর্মত্যাগ লক্ষ্য করেন নাই, ফলত্যাগই লক্ষ্য করিয়াছেন এবং ফলত্যাগী কর্মযোগীই নিত্য-সন্ন্যাসী, কর্মযোগ ও সন্ন্যাস একই, এইরূপ কথাও বলিয়াছেন (৫।৩-৪, ৬।১-২)। সুতরাং অর্জুনের এক্ষণে প্রশ্ন এই, ত্যাগ ও সন্ন্যাস—এ দুইটি কথার কোন্‌টিতে কি অর্থ প্রকাশ করে।

উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন যে, কাম্য কর্মের ত্যাগকেই সন্ন্যাস বলা হয়, কিন্তু বিচক্ষণেরা সর্বকর্মের ফলমাত্র ত্যাগকেই ত্যাগ বলেন; সুতরাং যে ফলত্যাগী সেই প্রকৃত সন্ন্যাসী। সাংখ্যমতে কর্মমাত্রই দোষযুক্ত বলিয়া ত্যাজ্য, মীমাংসামতে যজ্ঞ, তপঃ ও দানকর্ম ত্যাজ্য নহে। এ সম্বন্ধে আমার নিশ্চিত মত এই যে, যজ্ঞাদি কর্ম ফলত্যাগ করিয়া করিলেই উহা চিত্তশুদ্ধিকর হয়, উহা একেবারে ত্যাজ্য নহে। স্বধর্ম বলিয়া যাহার যে কর্ম নির্দিষ্ট আছে তাহা মোহবুদ্ধিতে ত্যাগ করা তামস ত্যাগ, দুঃখবুদ্ধিতে ত্যাগ করা রাজস ত্যাগ এবং আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন করিয়া কর্ম করাই সাত্ত্বিক ত্যাগ। দেহধারী জীব সর্বথা কর্মত্যাগ করিতে পারে না, যে ফলত্যাগী সে-ই প্রকৃত ত্যাগী। ফলত্যাগী ব্যক্তি কর্ম করিলেও কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না, যিনি ফলকামনা ত্যাগ করেন না, তিনিই কর্মের শুভাশুভ ফলে আবদ্ধ হন। (১৮।১-১২ শ্লোক)।

কর্মতত্ত্ব-বিশ্লেষণ। যে কোন কর্ম সম্পাদনের পক্ষে অধিষ্ঠান, কর্তা, করণ, নানাবিধ চেষ্টা এবং দৈব—এই সকল কারণ বিদ্যমান থাকে। সুতরাং যে মনে করে, কেবল 'আমিই' কর্ম করি, সে দুর্মতি প্রকৃত তত্ত্ব বুঝে না; যাহার 'আমি কর্তা' এই ভাব নাই, তিনি কর্মের শুভাশুভ ফলে আবদ্ধ হন না। জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা, এই তিনটি কর্ম-প্রবৃত্তির হেতু এবং কর্তা, কর্ম, করণ, এই তিনটি ক্রিয়ার আশ্রয়। তন্মধ্যে জ্ঞান, কর্তা ও কর্ম গুণভেদে ত্রিবিধ হয়। আবার কর্তার বুদ্ধি, ধৃতি এবং যে সুখলাভার্থ কর্ম করা হয় সেই সুখও গুণভেদে ত্রিবিধ। এইরূপ গুণভেদবশতঃই বিভিন্ন কর্তার বিভিন্ন কর্মের বিভিন্ন ফল হয়। তন্মধ্যে সাত্ত্বিক ভাবই শ্রেষ্ঠ ও মোক্ষদায়ক। যেমন, সাত্ত্বিক জ্ঞান (সর্বত্র সমদর্শন) হইতে সাত্ত্বিক কর্তা (কর্মযোগী) সাত্ত্বিক কর্ম (নিষ্কাম কর্ম) করেন, তাঁহার সাত্ত্বিকী বুদ্ধি (বন্ধমোক্ষ-নির্ণয়-সমর্থা) এই কর্ম নিশ্চয় করিয়া দেয় এবং সাত্ত্বিকী ধৃতি তাঁহাকে এই কর্মে স্থির রাখে এবং তিনি এই সাত্ত্বিক কর্মের যে ফল সাত্ত্বিক সুখ, নির্মল আত্মপ্রসাদ (আত্মানন্দ), তাহা

লাভ করেন ; রাজসিক ও তামসিক কর্তার কর্ম এবং তাহার ফলও এইরূপ গুণভেদে বিভিন্ন হয়। (১৮।১৩-৪০)

চাতুর্বর্ণ্য ধর্ম বা স্বভাব-নিয়ত-কর্ম। এই জগৎপ্রপঞ্চ প্রকৃতিরই পরিণাম, এই হেতু কোন বস্তুই প্রকৃতির গুণ হইতে মুক্ত নহে। সনাতন ধর্মে চাতুর্বর্ণ্যাদি ব্যবস্থা প্রকৃতির গুণভেদ অনুসারে হইয়াছে। সুতরাং ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের যাহার যে কর্ম শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহাই তাহার স্বভাবজ বা স্বভাবনিয়ত কর্ম বা স্বধর্ম। এই স্বধর্ম কোন বিষয়ে দোষযুক্ত হইলেও উহা ত্যাগ করিয়া অন্য বর্ণের ধর্ম (পরধর্ম) গ্রহণ করা কর্তব্য নহে। প্রত্যেকেরই স্বধর্ম পালন না করিলে ভগবানের সৃষ্টি রক্ষা হয় না। তাঁহার ইচ্ছায়ই জীবের কর্মপ্রবৃত্তি ও জগতের বিস্তার, সুতরাং লোকসংগ্রহার্থ অনাসক্তচিত্তে স্বধর্মপালনই তাঁহার প্রকৃষ্ট অর্চনা। (১৮।৪১-৪৬)

কর্মযোগে মোক্ষলাভ কিরূপে হয়। অবশ্য, কর্মমাত্রই দোষদুষ্ট, কর্ম করিলেই তাহার ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু ফলত্যাগ করিয়া অনাসক্তচিত্তে কর্ম করিলে, তাহাতে বন্ধন হয় না। ইহাকেই **নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধি** বলে। নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি লাভ হইলে রাগদ্বেষাদি দূর হয়, তখন যোগী ব্রহ্মভূত হন। ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইলে সর্বভূতে সমদর্শন ও নির্মল চিত্তপ্রসাদ লাভ হয়। তখন ভগবান্ পুরুষোত্তমে পরাভক্তি জন্মে, পরাভক্তিদ্বারা শ্রীভগবানের সমগ্র স্বরূপ তত্ত্বতঃ উপলব্ধ হয় এবং সাধক তাঁহাকে তত্ত্বতঃ জানিয়া তাঁহাতেই তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হন। (১৮।৪৭-৫৫)

শেষ উপদেশ। "এইরূপে সর্ব কর্ম করিয়াও আমার ভক্ত কর্মযোগী আমার প্রসাদে শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন। সুতরাং মনে মনে সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পণ করিয়া সর্বদা আমাতেই চিত্ত রাখ এবং যথাধিকার স্বকর্ম করিতে থাক, তাহা হইলেই তুমি আমার প্রসাদে কর্মের শুভাশুভ ফল অতিক্রম করিয়া মুক্ত হইতে পারিবে।" (১৮।৫৬-৬৩)

শেষ অভয়বাণী—সর্বধর্মত্যাগ। "সর্বশেষে আমার সর্বগুহ্যতম উপদেশ শ্রবণ কর। শাস্ত্রাদিতে মোক্ষলাভের নানা মার্গ উপদিষ্ট হইয়াছে, নানা বিধি-নিষেধ আছে। ঐ সকল বিভিন্ন মার্গের গণ্ডগোলে না পড়িয়া, নানা ধর্মের নানা রূপ বিধি-নিষেধের দাসত্ব ত্যাগ করিয়া তুমি সর্বতোভাবে আমার শরণ লও, আমি তোমাকে সর্বপাপ হইতে মুক্ত করিব, ভয় নাই।" (১৮।৬৪-৬৬)

উপসংহার। এই স্থলে গীতার উপদেশ শেষ হইল। অতঃপর গীতাজ্ঞানের অধিকারী, গীতাপাঠের ফল, গীতা ব্যাখ্যার ফল এবং গীতাশ্রবণের

ফল বলিয়া শ্রীভগবান্ অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি একাগ্রমনে উপদেশ **শ্রবণ** করিয়াছেন কিনা এবং তাঁহার মোহ দূর হইল কিনা। তদুত্তরে অর্জুন বলিলেন—তোমার কৃপায় আমার মোহ দূর হইয়াছে, আমার আর সংশয় নাই, আমি তোমার বাক্য পালন করিব। (১৮।৬৭-৭৩)

সঞ্জয়-বাক্য। ধৃতরাষ্ট্র সমীপে পূর্বোক্ত শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদ বা গীতাশাস্ত্র বলিয়া সঞ্জয় বলিলেন—আমি ব্যাসদেবের প্রসাদে যোগেশ্বর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়াছি। এই পবিত্র অদ্ভুত সংবাদ বারংবার স্মরণ করিয়া আমার মুহুর্মুহুঃ হর্ষ হইতেছে। আমার নিশ্চিত মত এই যে, যে পক্ষে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এবং যে পক্ষে ধনুর্ধর পার্থ, সে পক্ষেই রাজলক্ষ্মী, বিজয়, অভ্যুদয় ও অখণ্ডিত রাজনীতি আছে। [অতএব আপনি পুত্রগণের বিজয়-আশা ত্যাগ করুন, পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করুন]। (১৮।৭৪-৭৮)

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে **মোক্ষযোগো** নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

এই অধ্যায়ে সমগ্র গীতাশাস্ত্রের সার-সংগ্রহ করিয়া মোক্ষলাভ কিরূপে হয় তাহাই প্রধানতঃ বর্ণনা করা হইয়াছে। এই হেতু ইহাকে **মোক্ষযোগ বলে**।

গীতার শেষ ছয় অধ্যায়ে (**তৃতীয় ষট্‌ক**) ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব, ত্রিগুণ-তত্ত্ব ইত্যাদি নানাবিধ জ্ঞানের আলোচনা আছে; এই হেতু ইহাকে **'জ্ঞানকাণ্ড'** বলা হয়।

ইতি শ্রীমদ্ জগদীশচন্দ্র ঘোষ-প্রণীত 'গীতার্থ-দীপিকা' নামক ভাষা-তাৎপর্য ব্যাখ্যা **সমাপ্তম্**।

॥ ওঁ তৎসৎ শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ॥

॥ শান্তিঃ পুষ্টিস্তুষ্টিশ্চাস্তু ॥

শ্রীশ্রীগীতা-মাহাত্ম্য

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

ঋষিঃ উবাচ

গীতায়াশ্চৈব মাহাত্ম্যং যথাবৎ সূত মে বদ।
পুরা নারায়ণক্ষেত্রে ব্যাসেন মুনিনোদিতম্॥ ১

সূত উবাচ

ভদ্রং ভগবতা পৃষ্টং যদ্ধি গুপ্ততমং পরম্।
শক্যতে কেন তদ্বক্তুং গীতামাহাত্ম্যমুত্তমম্॥ ২
কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক্ কিঞ্চিৎ কুন্তীসুতঃ ফলম্।
ব্যাসো বা ব্যাসপুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যোঽথ মৈথিলঃ॥ ৩
অন্যে শ্রবণতঃ শ্রুত্বা লেশং সঙ্কীর্তয়ন্তি চ।
তস্মাৎ কিঞ্চিদ্ বদাম্যত্র ব্যাসস্যাস্যান্ময়া শ্রুতম্॥ ৪
সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥ ৫
সারথ্যমর্জুনস্যাদৌ কুর্বন্ গীতামৃতং দদৌ।
লোকত্রয়োপকারায় তস্মৈ কৃষ্ণাত্মনে নমঃ॥ ৬

ঋষি কহিলেন—হে সূত, পুরাকালে নারায়ণ-ক্ষেত্রে ব্যাসদেব-কর্তৃক গীতা-মাহাত্ম্য যেরূপ কীর্তিত হইয়াছিল, আপনি তাহা যথাযথ বর্ণন-করুন। ১॥

সূত কহিলেন—ভগবন্, আপনি উত্তম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন; ইহা পরম গোপন বস্তু, সেই উত্তম গীতা-মাহাত্ম্য কে বর্ণন করিতে সমর্থ? ২॥

কৃষ্ণই ইহা সম্যগ্‌রূপে জানেন, কুন্তীসুত অর্জুন, ব্যাসদেব, ব্যাসপুত্র শুকদেব, যাজ্ঞবল্ক্য ও মিথিলাধিপ জনক কথঞ্চিৎ অবগত আছেন। ৩॥

অন্যান্য সকলে অপরের নিকট শ্রবণ করিয়া তাহার লেশমাত্র কীর্তন করেন; আমিও ব্যাসদেবের মুখ হইতে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, তাহাই এস্থলে কিঞ্চিৎ বলিতেছি। ৪॥ সমগ্র উপনিষদ্‌রাশি গাভীস্বরূপ, গোপালনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দোহনকর্তা, অর্জুন বৎস এবং মহৎ গীতামৃত দুগ্ধস্বরূপ, সুধীগণ তাহা পান করেন। ৫॥ যিনি লোকত্রয়ের উপকারার্থ প্রথমে অর্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়া এই গীতামৃত প্রদান করিয়াছেন, সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার। ৬॥

সংসারসাগরং ঘোরং তর্তুমিচ্ছতি যো নরঃ।
গীতানাবং সমাসাদ্য পারং যাতি সুখেন সঃ॥ ৭
গীতাজ্ঞানং শ্রুতং নৈব সদৈবাভ্যাসযোগতঃ।
মোক্ষমিচ্ছতি মূঢ়াত্মা যাতি বালকহাস্যতাম্॥ ৮
যে শৃণ্বন্তি পঠন্ত্যেব গীতাশাস্ত্রমহর্নিশম্।
ন তে বৈ মানুষা জ্ঞেয়া দেবরূপা ন সংশয়ঃ॥ ৯
গীতাজ্ঞানেন সম্বোধং কৃষ্ণঃ প্রাহার্জুনায় বৈ।
ভক্তিতত্ত্বং পরং তত্র সগুণং বাথ নির্গুণম্॥ ১০
সোপানাষ্টাদশৈরেবং ভক্তিমুক্তিসমুচ্ছ্রিতৈঃ।
ক্রমশশ্চিত্তশুদ্ধিঃ স্যাৎ প্রেমভক্ত্যাদি কর্মণি॥ ১১
সাধোর্গীতাম্ভসি স্নানং সংসারমলনাশনম্।
শ্রদ্ধাহীনস্য তৎকার্যং হস্তিস্নানং বৃথৈব তৎ॥ ১২
গীতায়াশ্চ ন জানাতি পঠনং নৈব পাঠনম্।
স এব মানুষে লোকে মোঘকর্মকরো ভবেৎ॥ ১৩
তস্মাদ্ গীতাং ন জানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
ধিক্ তস্য মানুষং দেহং বিজ্ঞানং কুলশীলতাম্॥ ১৪

যে মানব ঘোর সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি গীতারূপ নৌকার আশ্রয় গ্রহণ করিলে সুখে পার হইতে পারেন। ৭॥

যে পুনঃ পুনঃ শ্রবণ ও অভ্যাসদ্বারা গীতাজ্ঞান লাভ করে নাই, সে মূঢ় যদি মোক্ষ বাঞ্ছা করে, তবে বালকের নিকটও উপহাসাস্পদ হয়। ৮॥ যাঁহারা অহর্নিশ গীতাশাস্ত্র শ্রবণ বা অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদিগকে মনুষ্যজ্ঞান করিবে না, তাঁহারা নিঃসংশয়ে দেবস্বরূপ। ৯॥ যে গীতাজ্ঞান দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে প্রবোধ দিয়াছিলেন, তাহাতে সগুণ অথবা নির্গুণ উৎকৃষ্ট ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ১০॥ গীতার ভক্তিমুক্তিপ্রধান অষ্টাদশ (অধ্যায়রূপ) সোপান দ্বারা প্রেমভক্তি আদি কর্মে ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি হয়। ১১॥

সাধুগণের গীতারূপ পবিত্র সলিলে স্নান সংসার মলনাশক, কিন্তু শ্রদ্ধাহীনের ঐ কার্য হস্তি-স্নানের ন্যায় নিষ্ফল হয়। ১২॥ যে ব্যক্তি গীতাশাস্ত্র অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা করে নাই, মনুষ্যলোকে সে বৃথা কর্মকারী। ১৩॥ অতএব যে গীতাশাস্ত্র জানে না, তাহা অপেক্ষা অধম আর কেহ নাই, তাহার জ্ঞান, কুলশীল ও মনুষ্য-দেহকে ধিক্। ১৪॥

গীতার্থং ন বিজানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
ধিক্ শরীরং শুভং শীলং বিভবং তদ্‌গৃহাশ্রমম্॥ ১৫
গীতাশাস্ত্রং ন জানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
ধিক্ প্রারব্ধং প্রতিষ্ঠাঞ্চ পূজাং মানং মহত্তমম্॥ ১৬
গীতাশাস্ত্রে মতির্নাস্তি সর্বং তন্নিষ্ফলং জগুঃ।
ধিক্ তস্য জ্ঞানদাতারং ব্রতং নিষ্ঠাং তপো যশঃ॥ ১৭
গীতার্থ-পঠনং নাস্তি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
গীতাগীতং ন যজ্‌জ্ঞানং তদ্বিদ্ধ্যাসুরসম্মতম্॥ ১৮
তন্মোঘং ধর্মরহিতং বেদবেদান্তগর্হিতম্।
তস্মাদ্ধর্মময়ী গীতা সর্বজ্ঞান-প্রযোজিকা।
সর্বশাস্ত্রসারভূতা বিশুদ্ধা সা বিশিষ্যতে॥ ১৯
যোঽধীতে বিষ্ণুপর্বাহে গীতাং শ্রীহরিবাসরে।
স্বপন্ জাগ্রন্ চলংস্তিষ্ঠন্ শত্রুভির্ন স হীয়তে॥ ২০
শালগ্রামশিলায়াং বা দেবাগারে শিবালয়ে।
তীর্থে নদ্যাং পঠেদ্ গীতাং সৌভাগ্যং লভতে ধ্রুবম্॥ ২১

গীতার্থ যে না জানে তাহা অপেক্ষা অধম আর কেহ নাই, তাহার মনুষ্য-দেহ, সদাচার, কল্যাণ, বিভব ও গৃহাশ্রমে ধিক্। ১৫

গীতাশাস্ত্র যে জানে না তাহা অপেক্ষা অধম আর কেহই নাই; তাহার অদৃষ্ট, প্রতিষ্ঠা, পূজা, মান-মহত্ত্বে ধিক। ১৬॥ গীতাশাস্ত্রে যাহার মতি নাই, তাহার সমস্তই নিষ্ফল, তাহার শিক্ষাদাতাকে ধিক্, তাহার ব্রত, নিষ্ঠা, তপস্যা ও যশে ধিক্। ১৭॥ যে গীতার্থ পাঠ করে নাই, তাহা অপেক্ষা অধম আর কেহ নাই; যে জ্ঞান গীতা-সম্মত নহে তাহা আসুর জ্ঞান; তাহা নিষ্ফল, ধর্মরহিত এবং বেদবেদান্ত-বহির্ভূত, যেহেতু ধর্মময়ী গীতা সর্বজ্ঞানপ্রদায়িনী; গীতা সর্বশাস্ত্রের সারভূত ও বিশুদ্ধ, তাহার তুল্য আর কিছু নাই। ১৮, ১৯॥

যে ব্যক্তি একাদশী বা বিষ্ণুর পর্বদিবসে গীতা পাঠ করেন, তিনি স্বপ্নে, জাগরণে, গমনে বা অবস্থানে, কোন অবস্থাতেই শত্রু-কর্তৃক পীড়িত হন না। ২০॥ শালগ্রাম শিলার নিকটে, দেবালয়ে, শিবমন্দিরে, তীর্থস্থানে বা নদীতটে গীতা পাঠ করিলে নিশ্চয়ই সৌভাগ্য লাভ হয়। ২১॥

দেবকীনন্দনঃ কৃষ্ণো গীতাপাঠেন তুষ্যতি।
যথা ন বেদৈর্দানেন যজ্ঞতীর্থব্রতাদিভিঃ ॥ ২২
গীতাধীতা চ যেনাপি ভক্তিভাবেন চেতসা।
বেদশাস্ত্রপুরাণানি তেনাধীতানি সর্বশঃ ॥ ২৩
যোগস্থানে সিদ্ধপীঠে শিলাগ্রে সৎসভাসু চ।
যজ্ঞে চ বিষ্ণুভক্তাগ্রে পঠন্ সিদ্ধিং পরাং লভেৎ ॥ ২৪
গীতাপাঠঞ্চ শ্রবণং যঃ করোতি দিনে দিনে।
ক্রতবো বাজিমেধাদ্যাঃ কৃতাস্তেন সদক্ষিণাঃ ॥ ২৫
যঃ শৃণোতি চ গীতার্থং কীর্তয়ত্যেব যঃ পরম্।
শ্রাবয়েচ্চ পরার্থং বৈ স প্রয়াতি পরং পদম্ ॥ ২৬
গীতায়াঃ পুস্তকং শুদ্ধং যোঽর্পয়ত্যেব সাদরাৎ।
বিধিনা ভক্তিভাবেন তস্য ভার্যা প্রিয়া ভবেৎ ॥ ২৭
যশঃ সৌভাগ্যমারোগ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
দয়িতানাং প্রিয়ো ভূত্বা পরমং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮
অভিচারোদ্ভবং দুঃখং বরশাপাগতঞ্চ যৎ।
নোপসর্পতি তত্রৈব যত্র গীতার্চনং গৃহে ॥ ২৯

দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ গীতাপাঠে যেরূপ পরিতুষ্ট হন, বেদপাঠ, দান, যজ্ঞ, তীর্থদর্শন বা ব্রতাদি দ্বারা সেরূপ প্রসন্ন হন না। ২২ ॥

যিনি ভক্তিভাবে গীতা পাঠ করেন, তিনি বেদ-পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্র পাঠের ফল প্রাপ্ত হন। ২৩ ॥ যোগস্থানে, সিদ্ধপীঠে, শিলাময় দেবমূর্তির সমীপে, সাধুজনের সভাতে, যজ্ঞে বা বিষ্ণুভক্তের নিকটে গীতা পাঠ করিলে পরম সিদ্ধি লাভ হয়। ২৪ ॥ যিনি প্রতিদিন গীতাপাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি দক্ষিণা-সহ অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করেন বলিতে হইবে (অর্থাৎ ঐরূপ ফলপ্রাপ্ত হন)। ২৫ ॥ যিনি গীতার্থ শ্রবণ করেন অথবা কীর্তন করেন কিংবা অপরকে শ্রবণ করান, তিনি পরম পদ লাভ করেন। ২৬ ॥ যিনি যথাবিধি ভক্তিভাবে পরিশুদ্ধ গীতা পুস্তক সাদরে দান করেন, তাঁহার ভার্যা প্রিয় হয়; এবং তিনি যশঃ, সৌভাগ্য ও আরোগ্য লাভ করিয়া দয়িতাগণের প্রিয় হইয়া পরম সুখ ভোগ করেন, ইহাতে সংশয় নাই। ২৭, ২৮ ॥ যে গৃহে গীতার অর্চনা হয়, তথায় অভিচারোদ্ভূত বা ভয়ানক অভিশাপজনিত কোন দুঃখ উপস্থিত হয় না। ২৯ ॥

তাপত্রয়োদ্ভবা পীড়া নৈব ব্যাধির্ভবেৎ ক্বচিৎ।
ন শাপো নৈব পাপঞ্চ দুর্গতির্নরকং ন চ ॥ ৩০
বিস্ফোটকাদয়ো দেহে না বাধন্তে কদাচনঃ।
লভেৎ কৃষ্ণপদে দাস্যং ভক্তিঞ্চাব্যভিচারিণীম্ ॥ ৩১
জায়তে সততং সখ্যং সর্বজীবগণৈঃ সহ।
প্রারব্ধং ভুঞ্জতো বাপি গীতাভ্যাসরতস্য চ।
স মুক্তঃ স সুখী লোকে কর্মণা নোপলিপ্যতে ॥ ৩২
মহাপাপাতিপাপানি গীতাধ্যায়ী করোতি চেৎ।
ন কিঞ্চিৎ স্পৃশ্যতে তস্য নলিনীদলমম্ভসা ॥ ৩৩
অনাচারোদ্ভবং পাপমবাচ্যাদি কৃতঞ্চ যৎ।
অভক্ষ্যভক্ষজং দোষমস্পর্শস্পর্শজং তথা ॥ ৩৪
জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং নিত্যমিন্দ্রিয়ৈর্জনিতঞ্চ যৎ।
তৎ সর্বং নাশমায়াতি গীতাপাঠেন তৎক্ষণাৎ ॥ ৩৫
সর্বত্র প্রতিভুক্ত্বা চ প্রতিগৃহ্য চ সর্বশঃ।
গীতাপাঠং প্রকুর্বাণো ন লিপ্যতে কদাচন ॥ ৩৬
রত্নপূর্ণাং মহীং সর্বাং প্রতিগৃহ্যাবিধানতঃ।
গীতাপাঠেন চৈকেন শুদ্ধস্ফটিকবৎ সদা ॥ ৩৭

তথায় ত্রিতাপজনিত পীড়া, কোন প্রকার ব্যাধি, শাপ, পাপ, দুর্গতি বা নরক ঘটে না। ৩০ ॥

গীতার্চনা বা পাঠ করিলে দেহে বিস্ফোটকাদি হয় না; বরং উহাতে শ্রীকৃষ্ণচরণেই দাসত্ব ও অব্যভিচারিণী ভক্তি লাভ হয়। ৩১ ॥ গীতাভ্যাসরত ব্যক্তি প্রারব্ধ কর্মভোগের অধীন থাকিলেও সর্বজীবের সহিত সখ্যভাব লাভ করেন, তিনি সুখী ও মুক্ত হন, কর্ম তাঁহাকে বন্ধন করিতে পারে না। ৩২ ॥ মহাপাপ বা অতিপাপ করিলেও নলিনীদলগত জলের ন্যায় সেই পাপ গীতাধ্যায়ী ব্যক্তিকে স্পর্শ করিতে পারে না। ৩৩ ॥

অনাচার, অবাচ্য কথন, অভক্ষ্য ভক্ষণ এবং অস্পৃশ্য স্পর্শজনিত পাপ-সকল এবং জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত বা ইন্দ্রিয়জনিত যে কোন দোষই হউক না কেন, তাহা গীতা-পাঠমাত্রই বিনষ্ট হয়। ৩৪, ৩৫ ॥ সকলের অন্ন ভোজন এবং সর্বত্র প্রতিগ্রহ করিলেও গীতাপাঠকারীকে তজ্জনিত পাপ স্পর্শ করে না। ৩৬ ॥ অন্যায়পূর্বক রত্নপূর্ণা মহী প্রতিগ্রহ করিলেও একবার মাত্র গীতাপাঠ দ্বারা সে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বচ্ছ-স্ফটিকবৎ নির্মল হইয়া যায়। ৩৭ ॥

যস্যান্তঃকরণং নিত্যং গীতায়াং রমতে সদা।
স সাগ্নিকঃ সদা জাপী ক্রিয়াবান্ স চ পণ্ডিতঃ ॥ ৩৮
দর্শনীয়ঃ স ধনবান্ স যোগী জ্ঞানবান্ অপি।
স এব যাজ্ঞিকো যাজী সর্ববেদার্থদর্শকঃ ॥ ৩৯
গীতায়াঃ পুস্তকং যত্র নিত্যপাঠশ্চ বর্ততে।
তত্র সর্বাণি তীর্থানি প্রয়াগাদীনি ভূতলে ॥ ৪০
নিবসন্তি সদা দেহে দেহশেষেঽপি সর্বদা।
সর্বে দেবাশ্চ ঋষয়ো যোগিনো দেহরক্ষকাঃ ॥ ৪১
গোপালো বালকৃষ্ণোঽপি নারদ-ধ্রুবপার্ষদৈঃ।
সহায়ো জায়তে শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ততে ॥ ৪২
যত্র গীতা বিচারশ্চ পঠনং পাঠনং তথা।
মোদতে তত্র শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ রাধয়া সহ ॥ ৪৩

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ

গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সারমুত্তমম্।
গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্ ॥ ৪৪
গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরমং পদম্।
গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমো গুরুঃ ॥ ৪৫

যাঁহার অন্তঃকরণ সর্বদা গীতায় অনুরক্ত থাকে, তিনিই সাগ্নিক, জাপক, ক্রিয়ান্বিত ও পণ্ডিত; তিনিই দর্শনীয়, ধনবান্, যোগী ও জ্ঞানবান্; তিনিই যাজ্ঞিক, যাজক ও সর্ববেদার্থদর্শী। ৩৮, ৩৯ ॥ যে স্থানে গীতা-পুস্তক থাকে এবং নিত্য গীতাপাঠ হয় তথায় ভূতলের প্রয়াগাদি সমুদয় তীর্থই বিদ্যমান থাকে। ৪০ ॥ যাঁহার গীতাপাঠাদিতে প্রবৃত্তি হয়, তাঁহার জীবিতকালে ও দেহাবসানেও সমস্ত দেবতা, ঋষিগণ ও যোগিগণ তাঁহার দেহরক্ষক হন; বালগোপাল কৃষ্ণ, নারদ-ধ্রুবাদি পার্ষদ সহিত অবিলম্বে তাঁহার সহায় হইয়া থাকেন। ৪১, ৪২ ॥ যে স্থানে গীতাশাস্ত্রের বিচার, অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা হয়, তথায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকা সহ আনন্দে বিরাজ করেন। ৪৩ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে পার্থ, গীতাই আমার হৃদয়, গীতাই আমার সারসর্বস্ব, গীতাই আমার অত্যুগ্র এবং অব্যয় জ্ঞানস্বরূপ; গীতা আমার উত্তমস্থান, গীতা আমার পরম পদ, গীতা আমার পরম গুহ্য, গীতা আমার পরম গুরু; ৪৪-৪৫

গীতাশ্রয়েঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহং।
গীতাজ্ঞানং সমাশ্রিত্য ত্রিলোকীং পালয়াম্যহম্॥ ৪৬
গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ।
অর্ধমাত্রাঽহরা নিত্যমনির্বাচ্যপদাত্মিকা॥ ৪৭
গীতা নামানি বক্ষ্যামি গুহ্যানি শৃণু পাণ্ডব।
কীর্তনাৎ সর্বপাপানি বিলয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ॥ ৪৮
গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্যা পতিব্রতা।
ব্রহ্মাবলির্ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী॥ ৪৯
অর্ধমাত্রা চিতা নন্দা ভবঘ্নী ভ্রান্তিনাশিনী।
বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী॥ ৫০
ইত্যেতানি জপেন্নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ।
জ্ঞানসিদ্ধিং লভেন্নিত্যং তথান্তে পরমং পদম্॥ ৫১
পাঠেঽসমর্থঃ সম্পূর্ণংতদর্ধপাঠমাচরেৎ।
তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৫২
ত্রিভাগং পঠমানস্তু সোমযাগফলং লভেৎ।
ষড়ংশং জপমানস্তু গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ॥ ৫৩

গীতার আশ্রয়েই আমি থাকি, গীতাই আমার পরম গৃহ, গীতাজ্ঞান আশ্রয় করিয়াই আমি ত্রিলোক পালন করি। ৪৬॥

গীতা আমার ব্রহ্মরূপা পরমা বিদ্যা, ইহাতে সংশয় নাই; গীতা অর্ধমাত্রারূপিণী, নিত্যা, অনির্বচনীয়পদস্বরূপিণী। ৪৭॥ হে পাণ্ডব, আমি গীতার গুহ্য নামসমূহ বলিতেছি, শ্রবণ কর; ঐ নামসকল কীর্তন করিলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। ৪৮॥ গঙ্গা, গীতা, সাবিত্রী, সীতা, সত্যা, পতিব্রতা, ব্রহ্মাবলি, ব্রহ্মবিদ্যা, ত্রিসন্ধ্যা, মুক্তিগেহিনী,, অর্ধমাত্রা, চিতা নন্দা, ভবঘ্নী, ভ্রান্তিনাশিনী, বেদত্রয়ী, পরানন্দা, তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী। ৪৯, ৫০॥ যে ব্যক্তি স্থিরচিত্তে প্রত্যহ এই সকল নাম জপ করেন, তিনি ইহলোকে নিত্য জ্ঞানসিদ্ধি ও অন্তে পরম পদ প্রাপ্ত হন। ৫১॥ গীতা সম্পূর্ণ পাঠে অসমর্থ হইলে অর্ধেক পাঠ করিবে, তাহাতে গোদানের ফললাভ হইবে, সন্দেহ নাই। ৫২॥ এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করিলে সোমযাগের এবং এক-ষষ্ঠাংশ পাঠ করিলে গঙ্গাস্নানের ফল লাভ হয়। ৫৩॥

তথাধ্যায়দ্বয়ং নিত্যং পঠমানো নিরন্তরম্।
ইন্দ্রলোকমবাপ্নোতি কল্পমেকং বসেদ্ ধ্রুবম্॥ ৫৪
একমধ্যায়কং নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুতঃ।
রুদ্রলোকমবাপ্নোতি গণো ভূত্বা বসেচ্চিরম্॥ ৫৫
অধ্যায়ার্ধঞ্চ পাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে জনঃ।
প্রাপ্নোতি রবিলোকং স মন্বন্তরসমাঃ শতম্॥ ৫৬
গীতায়াঃ শ্লোকদশকং সপ্তপঞ্চচতুষ্টয়ম্।
ত্রিদ্ব্যেকমেকমর্ধং বা শ্লোকানাং যঃ পঠেন্নরঃ।
চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্ষাণামযুতং তথা॥ ৫৭
গীতার্থমেকপাদঞ্চ শ্লোকমধ্যায়মেব চ।
স্মরংস্ত্যক্ত্বা জনো দেহং প্রয়াতি পরমং পদম্॥ ৫৮
গীতার্থমপি পাঠং বা শৃণুয়াদন্তকালতঃ।
মহাপাতকযুক্তোঽপি মুক্তিভাগী ভবেজ্জনঃ॥ ৫৯
গীতাপুস্তকসংযুক্তঃ প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা প্রয়াতি যঃ।
বৈকুণ্ঠং সমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ মোদতে॥ ৬০
গীতাধ্যায়সমাযুক্তো মৃতো মানুষতাং ব্রজেৎ।
গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃত্বা লভতে মুক্তিমুত্তমাম্॥ ৬১

যিনি নিত্য দুই অধ্যায় পাঠ করেন তিনি ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন এবং তথায় এক কল্পকাল বাস করিয়া থাকেন। ৫৪॥ যিনি ভক্তিভাবে নিত্য এক অধ্যায় পাঠ করেন, তিনি রুদ্রলোক প্রাপ্ত হন এবং তথায় গণরূপে চিরকাল বসতি করেন। ৫৫॥ যিনি এক অধ্যায়ের অর্ধাংশ বা চতুর্থাংশ নিত্য পাঠ করেন, তিনি সূর্যলোক প্রাপ্ত হইয়া শত মন্বন্তর তথায় বাস করেন। ৫৬॥ যিনি গীতার দশ, সাত, পাঁচ, চারি, তিন, দুই, এক বা অর্ধ শ্লোকও পাঠ করেন, তিনি অযুত বৎসর কাল চন্দ্রলোকে বাস করেন। ৫৭॥ যিনি গীতার এক অধ্যায়ের, এক শ্লোকের বা এক চরণের অর্থ স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন, তিনি পরম পদ প্রাপ্ত হন। ৫৮॥ অন্তিমকালে গীতার্থ পাঠ বা শ্রবণ করিলে মহাপাতকী ব্যক্তিও মুক্তিভাগী হইয়া থাকেন। ৫৯॥ যিনি গীতাপুস্তক সংযুক্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, তিনি বৈকুণ্ঠধামে যাইয়া বিষ্ণুর সহিত আনন্দ ভোগ করেন। ৬০॥ গীতার এক অধ্যায় সহযোগে মৃত্যু হইলে মনুষ্যজন্ম লাভ হয় এবং পুনর্বার গীতাভ্যাস করিয়া উত্তমা মুক্তিলাভ করা যায়। ৬১॥ 'গীতা' এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া মৃত্যু হইলেও

গীতেত্যুচ্চারসংযুক্তো ম্রিয়মাণো গতিং লভেৎ।
যদ্ যৎ কর্ম চ সর্বত্র গীতাপাঠপ্রকীর্তিমৎ।
তত্তৎ কর্ম চ নির্দোষং ভূত্বা পূর্ণত্বমাপ্নুয়াৎ॥ ৬২
পিতৃনুদ্দিশ্য যঃ শ্রাদ্ধে গীতাপাঠং করোতি হি।
সন্তুষ্টাঃ পিতরস্তস্য নিরয়াদ্ যান্তি স্বর্গতিম্॥ ৬৩
গীতাপাঠেন সন্তুষ্টাঃ পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ।
পিতৃলোকং প্রয়ান্ত্যেব পুত্রাশীর্বাদতৎপরাঃ॥ ৬৪
গীতাপুস্তকদানঞ্চ ধেনুপুচ্ছসমন্বিতম্।
কৃত্বা চ তদ্দিনে সম্যক্ কৃতার্থো জায়তে জনঃ॥ ৬৫
পুস্তকং হেমসংযুক্তং গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ।
দত্ত্বা বিপ্রায় বিদুষে জায়তে ন পুনর্ভবম্॥ ৬৬
শতপুস্তকদানঞ্চ গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ।
স যাতি ব্রহ্মসদনং পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্॥ ৬৭
গীতাদানপ্রভাবেন সপ্তকল্পমিতাঃ সমাঃ।
বিষ্ণুলোকমবাপ্যান্তে বিষ্ণুনা সহ মোদতে॥ ৬৮
সম্যক্ শ্রুত্বা চ গীতার্থং পুস্তকং যঃ প্রদাপয়েৎ।
তস্মৈ প্রীতঃ শ্রীভগবান্ দদাতি মানসেপ্সিতম্॥ ৬৯

সদ্গতি লাভ হয়। যে কর্মই অনুষ্ঠান করা হউক, তৎকালে গীতা পাঠ করিলে সেই কর্ম নির্দোষ হইয়া সম্পূর্ণ ফলদানে সমর্থ হয়। ৬২॥

যিনি পিতৃলোকের উদ্দেশে শ্রাদ্ধে গীতাপাঠ করেন, তাঁহার পিতৃগণ নরকস্থ থাকিলেও সন্তুষ্ট হইয়া স্বর্গে গমন করেন। ৬৩॥ গীতাপাঠে সন্তুষ্ট পিতৃগণ শ্রাদ্ধে তৃপ্তিলাভ করিয়া পিতৃলোকে গমন করেন এবং পুত্রকে আশীর্বাদ করিয়া থাকেন। ৬৪॥ ধেনুপুচ্ছ (চামর) সহিত গীতা-পুস্তক দান করিলে দাতা সেই দিনই সম্যক্‌রূপে কৃতার্থ হন। ৬৫॥ যিনি সুবর্ণ-সংযুক্ত করিয়া গীতাপুস্তক বিদ্বান্ বিপ্রকে দান করেন, তাঁহার আর পুনর্জন্ম হয় না। ৬৬॥

যিনি শতখণ্ড গীতাপুস্তক দান করেন, তিনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তাঁহার আর পুনরাবৃত্তি হয় না। ৬৭॥ গীতাদানের প্রভাবে দাতা বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়া সপ্তকল্পকাল বিষ্ণুর সহিত পরম সুখে বাস করিতে পারেন। ৬৮॥ গীতার্থ সম্যক্‌রূপে শ্রবণ করিয়া যিনি গীতা দান করেন, শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহার অভীষ্ট প্রদান করেন। ৬৯॥ হে ভারত,

দেহং মানুষমাশ্রিত্য চাতুর্বর্ণ্যেষু ভারত।
ন শৃণোতি ন পঠতি গীতামমৃতরূপিণীম্।
হস্তাত্ত্যক্ত্বামৃতং প্রাপ্তং স নরো বিষমশ্নুতে॥ ৭০
জনঃ সংসারদুঃখার্তো গীতাজ্ঞানং সমালভেৎ।
পীত্বা গীতামৃতং লোকে লব্ধ্বা ভক্তিং সুখী ভবেৎ॥ ৭১
গীতামাশ্রিত্য বহবো ভূভুজো জনকাদয়ঃ।
নির্ধূতকল্মষা লোকে গতাস্তে পরমং পদম্॥ ৭২
গীতাসু ন বিশেষোঽস্তি জনেষূচ্চারকেষু চ।
জ্ঞানেষ্বেব সমগ্রেষু সমা ব্রহ্মস্বরূপিণী॥ ৭৩
যোঽভিমানেন গর্বেণ গীতানিন্দাং করোতি চ।
সমেতি নরকং ঘোরং যাবদাহূতসংপ্লবম্॥ ৭৪
অহঙ্কারেণ মূঢ়াত্মা গীতার্থং নৈব মন্যতে।
কুম্ভীপাকেষু পচ্যেত যাবৎ কল্পক্ষয়ো ভবেৎ॥ ৭৫
গীতার্থং বাচ্যমানং যো ন শৃণোতি সমীপতঃ।
স শূকরভবং যোনিমনেকামধিগচ্ছতি॥ ৭৬
চৌর্যং কৃত্বা চ গীতায়াঃ পুস্তকং যঃ সমানয়েৎ।
ন তস্য সফলং কিঞ্চিৎ পঠনঞ্চ বৃথা ভবেৎ॥ ৭৭

চাতুর্বর্ণ্য মধ্যে মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া যে ব্যক্তি অমৃতরূপিণী গীতা পাঠ বা শ্রবণ করে না, সে প্রাপ্ত অমৃত হস্ত হইতে ফেলিয়া দিয়া বিষ ভক্ষণ করে। ৭০॥

সংসার-দুঃখার্ত ব্যক্তি গীতাজ্ঞান লাভ এবং গীতামৃত পান করিয়া ভগবানে ভক্তিলাভ করতঃ সুখী হইয়া থাকেন। ৭১॥ জনকাদি রাজগণ গীতা আশ্রয় করিয়া নিষ্পাপ হইয়া পরম পদ লাভ করিয়াছেন। ৭২॥ গীতাপাঠে উচ্চ-নীচ ইতর-বিশেষ নাই, ব্রহ্ম-স্বরূপিণী গীতা সমভাবে সকলকেই জ্ঞান দান করেন। ৭৩॥ যে অভিমান বা গর্ববশতঃ গীতা নিন্দা করে, সে প্রলয়কাল পর্যন্ত ঘোর নরকে বাস করিয়া থাকে। ৭৪॥ যে মূঢ়াত্মা অহঙ্কারবশতঃ গীতার্থ অমান্য করে, সে কল্পক্ষয় পর্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে পচিতে থাকে। ৭৫॥ যে ব্যক্তি সমীপে থাকিয়াও কথ্যমান গীতাব্যাখ্যা শ্রবণ না করে, সে অনেক বার শূকরযোনি প্রাপ্ত হয়। ৭৬॥ যে ব্যক্তি গীতা-পুস্তক চুরি করিয়া আনে তাহার কিছুই সফল হয় না, তাহার গীতাপাঠও বিফল। ৭৭॥

যঃ শ্রুত্বা নৈব গীতার্থং মোদতে পরমার্থতঃ।
নৈব তস্য ফলং লোকে প্রমত্তস্য যথা শ্রমঃ ॥ ৭৮
গীতাং শ্রুত্বা হিরণ্যঞ্চ ভোজ্যং পট্টাম্বরং তথা।
নিবেদয়েৎ প্রদানার্থং প্রীতয়ে পরমাত্মনঃ ॥ ৭৯
বাচকং পূজয়েদ্ভক্ত্যা দ্রব্যবস্ত্রাদ্যুপস্করৈঃ।
অনেকৈর্বহুধা প্রীত্যা তুষ্যতাং ভগবান্ হরিঃ ॥ ৮০

সূত উবাচ

মাহাত্ম্যমেতদ্গীতায়াঃ কৃষ্ণপ্রোক্তং পুরাতনম্।
গীতান্তে পঠতে যস্তু যথোক্তফলভাগ্ ভবেৎ ॥ ৮১
গীতায়াঃ পঠনং কৃত্বা মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ।
বৃথা পাঠফলং তস্য শ্রম এব উদাহৃতঃ ॥ ৮২
এতন্মাহাত্ম্যসংযুক্তং গীতাপাঠং করোতিঃ যঃ।
শ্রদ্ধয়া যঃ শৃণোত্যেব পরমাং গতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৮৩
শ্রুত্বা গীতামর্থযুক্তাং মাহাত্ম্যং যঃ শৃণোতি চ।
তস্য পুণ্যফলং লোকে ভবেৎ সর্বসুখাবহম্ ॥ ৮৪

যে ব্যক্তি গীতার্থ শ্রবণ না করিয়া পরমার্থ বিষয়ে যত্নবান্ হয়, উন্মত্তের বৃথাশ্রমের ন্যায় তাহার তাহাতে কোন ফল লাভ হয় না। ৭৮॥

গীতা শ্রবণ করিয়া সুবর্ণ, ভোজ্য ও পট্টবস্ত্র পরমাত্মার প্রীতির জন্য নিবেদন করিবে। ৭৯॥ গীতা-ব্যাখ্যাতাকে নানা দ্রব্য ও বস্ত্রাদি উপকরণ দ্বারা ভক্তি ও প্রীতিপূর্বক পূজা করিবে, তাহাতে ভগবান্ হরির প্রীতি জন্মিবে। ৮০॥

সূত বলিলেন—যিনি শ্রীকৃষ্ণোক্ত এই পুরাতন গীতা-মাহাত্ম্য গীতা পাঠান্তে পাঠ করিয়া থাকেন, তিনি যথোক্ত ফলভাগী হন। ৮১॥

যিনি গীতাপাঠ করিয়া গীতা-মাহাত্ম্য পাঠ করেন না, তাঁহার গীতাপাঠে কোন ফল হয় না, তাঁহার পরিশ্রম বৃথা। ৮২॥

যিনি এই মাহাত্ম্য সহিত গীতা পাঠ করেন এবং যিনি শ্রদ্ধাপূর্বক উহা শ্রবণ করেন, তাঁহারা উভয়েই পরম গতি প্রাপ্ত হন। ৮৩॥

অর্থ সহিত গীতা শ্রবণ করিয়া যিনি মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন, জগতে তাঁহার পুণ্যফল সর্বসুখাবহ হইয়া থাকে। ৮৪॥

ইতি শ্রীবৈষ্ণবীয় তন্ত্রসারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-মাহাত্ম্যম্

সমাপ্তম্

শ্লোক-সূচী

শ্রীগীতা—অভিমত (সংক্ষিপ্ত)

আনন্দবাজার পত্রিকা—জগদীশবাবুর গীতাখানি দীর্ঘকাল যাবৎ বাঙ্গালী পাঠকগণকে গীতার মর্ম ও মাধুর্য আস্বাদনে সহায়তা করিয়া আসিতেছে। প্রাঞ্জল অথচ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা। গ্রন্থখানা সাধারণ পাঠকগণের পক্ষে যেমন উপযোগী হইয়াছে, তেমনি সুশিক্ষিত পাঠকগণ উহা পাঠে পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিবেন। গ্রন্থকার পণ্ডিত ও শাস্ত্রদর্শী। **আমরা প্রত্যেক স্বধর্মনিষ্ঠ হিন্দুকে এই গ্রন্থ ক্রয় করিতে অনুরোধ করি।**

দেশ—জগদীশবাবুর গীতাখানি সর্বশ্রেণীর পাঠকের নিত্য পাঠযোগ্য হইয়াছে। সাধারণ পাঠকদের জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গীতাব্যাখ্যাকারীদের মত ও আলোচনাসহ 'গীতার্থ-দীপিকা' নামে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বিস্তৃত ভূমিকায় গীতা-সম্পর্কিত বহু জ্ঞাতব্য তথ্য স্থান পাইয়াছে। **গীতাধ্যায়ীদের নিকট বইখানা অপরিহার্য বলিয়াই আমরা মনে করি।**

প্রবর্তক—বাজারে প্রচলিত গীতার বহু সংস্করণের মধ্যে 'জগদীশ ঘোষের গীতা এই নাম জানে না এমন শিক্ষিত লোক খুব কমই আছেন। গ্রন্থকার প্রাচীন ও আধুনিক, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য গীতা-ব্যাখ্যাতৃগণের আলোচনা নিরপেক্ষ ভাবে পাঠকদের সামনে উপস্থিত করিয়াছেন।'

যুগান্তর—গীতার সুসম্পাদিত সংস্করণ। শঙ্কর, শ্রীধর হইতে তিলক অরবিন্দ পর্যন্ত প্রাচীন ও আধুনিক গীতাচার্যগণের মত বিশদভাবে ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। গীতা বুঝিবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় সাংখ্যবেদান্তাদি শাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ও দার্শনিক পরিভাষা প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় গ্রন্থখানিকে আকর্ষণীয় করিয়াছে। **এরূপ প্রাঞ্জল টীকা-টিপ্পনী-ভাষ্য-রহস্যাদি গীতা-সাহিত্যে অধিক নাই।** ভূমিকায় সনাতন ধর্মের পরিচয়, সমন্বয়বাদ, গীতার মূল শিক্ষা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের আলোচনা আছে।

দৈনিক বসুমতী—প্রত্যেকটি শ্লোককে সহজবোধ্য করিবার জন্য শ্রীগীতায় উহার ভাষামুখে অন্বয়, কঠিন শব্দের ব্যাখ্যা ও সহজ ভাষায় উহার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। সংস্কৃত যাঁহারা ভাল জানেন না, তাঁহাদের কাছেও পুস্তকখানি সহজবোধ্য।

উদ্বোধন—গ্রন্থখানি অল্প সংস্কৃতজ্ঞ অথচ তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের পক্ষে যে বেশ উপাদেয় হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। সর্বান্তঃকরণে ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। ভূমিকায় প্রদত্ত সুচিন্তিত আধ্যাত্মিক ও ঐতিহাসিক তত্ত্বের আলোচনা বুদ্ধিজীবিগণের বিচার-সৌকর্ষ সাধন করিবে।

উজ্জ্বল ভারত—গ্রন্থখানি নিজের মধ্যে নিজে পূর্ণ—ইহা জনসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে—প্রাচীনের চিন্তাধারা এই গ্রন্থখানির ভিতর দিয়া নবীনের ছাঁচে গড়িয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়াছে বলিয়াই এই গ্রন্থের এতটা প্রসার সম্ভবপর হইয়াছে। গ্রন্থখানি সফল হইয়াছে। ইহার আরও প্রচার কামনা করি।

শ্রীসুদর্শন পত্রিকা—গ্রন্থকারের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও সাধনা গীতার গোপন রহস্যের উপর যে আলোকপাত করিয়াছে তাহাতে সুধী পাঠকবৃন্দ চমৎকৃত না হইয়া পারিবেন না। স্বধর্মনিষ্ঠ প্রত্যেক গীতাধ্যায়ী ব্যক্তির পক্ষে এই গ্রন্থখানি অপরিহার্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

Amrita Bazar Patrika—A notable feature of Jagadish Babu's Geeta is the author's inimitable method of presentation which makes the most abstruse points easily intelligible. It is very helpful for a thorough grasp of the Geeta. Indeed the work is a store-house of ancient knowledge.

Hindustan Standard—The author seems to have spared no pains to make the Gita understandable to the common reader. The discussions will enable the reader to make his way with mysteries of the Gita.

Advance—His method of treatment is very attractive—consumate skill of presentation with a lucidity all its own.

শ্রীমৎ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী লিখিয়াছেন—গীতার মর্ম উদ্ঘাটন করতে যদি লালসা থাকে তবে জগদীশচন্দ্রের শ্রীগীতা পাঠ করুন। শ্রীগীতার অপূর্ব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান জগদীশচন্দ্রের অক্ষয় কীর্তি। তাঁর শ্রীগীতা ভারতীয় জাতীয় সম্পদ; যেমন কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরামদাসের মহাভারত, কালীসিংহের মহাভারত, সেইরূপ বাংলাভাষায় শ্রীজগদীশচন্দ্রের শ্রীগীতা। যতদিন বাংলাভাষা থাকবে, ততদিন থাকবে জগদীশচন্দ্রের শ্রীগীতা আর জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর হৃদয়-মন্দিরে। জগদীশচন্দ্র কেবল শ্রীগীতার আলোচনাই করেন নি। এই মহাগ্রন্থ নিয়ে তিনি করেছেন জীবনব্যাপী কঠোর সাধনা; আর সেই সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন।

গীতার একখানি ইংরেজী সংস্করণও জগদীশচন্দ্রের সুযোগ্য পুত্র শ্রীঅনিলচন্দ্র প্রকাশ করেছেন। জগদীশচন্দ্রের আর একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম'। এই গ্রন্থে একাধারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব ও লীলার সুন্দর প্রাণস্পর্শী আলোচনা করেছেন কৃষ্ণনিষ্ঠপ্রাণ গ্রন্থকার জগদীশচন্দ্র। সবই শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা। এই গ্রন্থকে শ্রীগীতার পরিপূরক গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। বাংলা ভাষায় এইরূপ আলোচনা বিরল। কৃষ্ণানুরাগ-ভরা ব্যাখ্যানে সচ্চিদানন্দের প্রেমতত্ত্ব জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

পুণ্যপুরুষ জগদীশচন্দ্র তাঁর গীতার সঙ্গেই অমর হয়ে আছেন। তাঁর কীর্তির মতই তিনিও চিরজীবী। —মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

মনস্বী গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ-প্রণীত

শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা **কর্মবাণী**

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.-প্রণীত

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম

শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব ও শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে এমন সর্বতঃপূর্ণ, সারগর্ভ মূলস্পর্শী আলোচনা এ পর্যন্ত আর হয় নাই, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। এই আলোচনা গ্রন্থকারের স্বকীয় মতবাদে ভারাক্রান্ত নহে, ইহা আদ্যোপান্ত শাস্ত্র-ব্যাখ্যা। শত শত প্রামাণিক শাস্ত্রবাক্যাদি প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ সহ উদ্ধৃত হইয়াছে। বৃহদাকার গ্রন্থ, মূল্য ১৫·০০।

এই গ্রন্থে প্রধানতঃ চারিটি বিষয় আলোচিত হইয়াছে—

(ক) "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ" বস্তুটি কি, এই তত্ত্বের শাস্ত্রীয় আলোচনা—এই আলোচনায় বেদান্ত, পুরাণ ও বৈষ্ণব শাস্ত্রাদির **সামঞ্জস্য ও সমন্বয়** প্রদর্শিত হইয়াছে, **বিরোধ খণ্ডিত** হইয়াছে।

(খ) দ্বিতীয়তঃ—**লীলা-তত্ত্বের আলোচনা**—লীলাতে সৎ-চিৎ-আনন্দময়ের প্রকাশ—সেই "সর্বৈশ্বর্য সর্বশক্তি সর্বরসপূর্ণ" সচ্চিদানন্দ স্বরূপের লীলাকথা পুরাণাদিতে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা।

(গ) তৃতীয়তঃ—তাঁহার লীলাকথার অনুধ্যানে **জীবনের লক্ষ্যবিষয়ে শিক্ষা** লাভ।

(ঘ) চতুর্থতঃ—তিনি পরমভক্ত অর্জুন ও উদ্ধবকে 'আমার মত', 'আমার ধর্ম' বলিয়া যে বিশিষ্ট শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহার ব্যাখ্যা। **'শ্রীশ্রীকৃষ্ণকথামৃত'** প্রসঙ্গে শ্রীমুখ-নিঃসৃত সেই অপূর্ব উপদেশসমূহ সবিস্তার সানুবাদ উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম—অভিমত (সংক্ষিপ্ত)

আনন্দবাজার পত্রিকা।—বঙ্কিমচন্দ্রের পরে আজ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ-জীবন বিবৃত করিয়া বঙ্গভাষাতে যত গ্রন্থ লেখা হইয়াছে এই 'শ্রীকৃষ্ণ' গ্রন্থখানাকে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া যাইতে পারে। লেখক গ্রন্থখানাকে **অপূর্ব রসমধুর করিয়া তুলিয়াছেন**। এই গ্রন্থ **একাধারে ধর্ম ও দর্শন গ্রন্থ**।

দেশ—জগদীশবাবু লব্ধপ্রতিষ্ঠ গীতা-ব্যাখ্যাতা। তাঁহার এই গ্রন্থে তিনি ভক্তির দৃষ্টিতে, প্রেমের দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানা আশা করি **শীঘ্রই রসিক ও ভক্ত সমাজে অবিচলিত আসন লাভ করিবে**। গ্রন্থখানা **মধুর রসের আকর**। বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব সকলকেই আমরা গ্রন্থখানা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

যুগান্তর—গীতা-সম্পাদক লিখিত এই বইখানি নানাভাবেই বৈচিত্র্যপূর্ণ। অতি নিপুণতার সহিত শ্রীকৃষ্ণ-লীলা ও তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আলোচনা পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক। গ্রন্থখানি **ভক্ত, জ্ঞানী, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু, সকলের নিকটেই আদরণীয় হইবে**।

প্রবর্তক—রসঘন বিশুদ্ধ মাধুর্য-বিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্র ও মহাভাবময়ী শ্রীমতী রাধার রস-বিলাস বর্ণনা প্রসঙ্গে ভক্তিমান্ গ্রন্থকার যে অভিনিবেশের পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।